১৩২০ সালের

বর্ণানুক্রমিক সূচী

(বৈশাখ—আশ্বিন)

বিষয়			পৃষ্ঠা
অন্তিমে (নাটিকা) ...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, বি, এ	...	৪২২
আমার বোম্বাই-প্রবাস (সচিত্র) ...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৪০, ১৪৮, ২৩৭, ৩০৬, ৫১১, ৫৯৫
আমেরিকার চিঠির কয়েকটি অংশ (সচিত্র)	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১০৭
আইনের প্যাঁচ (গল্প) ...	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি, এল		১৮৮
[illegible]র বর্ষা (কবিতা) ...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, বি, এ	...	২১৫
আগে আগে (কবিতা) ...	শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী এম, এ, বি, এল		২৮৬
'[illegible] প্রথম দিবসে' (কবিতা)...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, বি, এ	...	৪৬৯
আ[illegible] ([illegible]বিতা) ...	শ্রীসুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	..	৪৭২
আর্য্যনারীর প্রাচীন অবস্থা ...	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি, এল	...	৬২৪
আসন্ন সন্ধ্যা (কবিতা) ...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, বি, এ	...	৫২৫
ইংরাজ রমণীর গৃহস্থালী ...	শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক, এম, এ, এম, ডি	...	২৪৯
কাল-বৈশাখী (কবিতা) ...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি, এ	...	১৫
কালিদাসের নাটক ...	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৮১, ১৬৬, ২৫৭
[illegible]কাল (কবিতা) ...	শ্রীবিভূতিভূষণ মজুমদার	...	৮৪
কুণাল (বৌদ্ধ গল্প) ...	শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত	...	২১৯
কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (সচিত্র) ...	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি, এল		৩৩৯
[illegible]ফিয়ৎ (কবিতা) ...	শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম, এ, বার-এ্যাট-ল	...	৬৩৭
[illegible]রিয়া (গল্প) ...	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি, আই, ই	...	৬৫০
[illegible]লপিটদিগের আমোদ-প্রমোদ ...	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা	...	১১৫
[illegible]প্রসঙ্গ (সচিত্র) ...	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ নাগ	...	৫৩
চীনের শিল্প ...	শ্রীআশুতোষ রায়	...	১২২
চিঠি বই (কবিতা) ...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, বি, এ	...	৪৪১

বিষয়		পৃষ্ঠা
জাপানে নববর্ষ (সচিত্র) ...	শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৩১
জাতি-বিরোধ ...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, বি, এ ...	১৩৭০
জাতীয় কাল-বৈশাখ (সচিত্র) ...	শ্রীমতী সরলা দেবী বি, এ শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী প্রভৃতি ...	২০৬
জলছবি (গল্পগুচ্ছ) ...	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ...	[illegible]
জাহ্নবী-তীরে (গল্প) ...	শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত ...	২৭০
জাপানের ঝরণা (সচিত্র) ...	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ...	৪১৭
তিব্বতীয় স্বরলিপি (সচিত্র) ...	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	২২৯
তুমি আমার (কবিতা) ...	রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবী ...	২৪৮
ত্রিমূর্ত্তি (কবিতা) ...	শ্রীমুনীন্দ্রকুমার ঘোষ ...	৫০১
তুকারাম ...	শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত ...	৫৮১
তন্দ্রাপথে (কবিতা) ...	শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৬৮০
তামাকু-তত্ত্ব (সচিত্র) ...	শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ	৭১৬
দুপুরে ও নিশীথে (কবিতা) ...	শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী ...	৬৫[illegible]
দক্ষিণ মেরু আবিষ্কার-কাহিনী (সচিত্র)	শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার ...	[illegible]৯৩
দেবদাসী (গল্প) ...	শ্রীমতী অনুরূপা দেবী ...	২৭৩
দিবা-স্বপ্ন (কবিতা) ...	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মৈত্র বি, এ ...	৩০৬
দৈত্যের স্বর্গ (গল্প) ...	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ...	৫৪৪
নববর্ষ (কবিতা) ...	শ্রীজগদীশচন্দ্র তরফদার ...	১
নববর্ষে (কবিতা) ...	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ...	৮১
নবজীবন ...	শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত ...	১১৩
নবাবিষ্কৃত কবি ভাসের গ্রন্থাবলী ...	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৩৫৩
নিরুদ্দেশ (কবিতা) ...	শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী ...	৫৪৩
প্রাক্ ঐতিহাসিক অতিকায় জন্তু (সচিত্র)	শ্রীভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ...	২৯৯
প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা (কবিতা) ...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি, এ ...	[illegible]
প্রাণের কথা (কবিতা) ...	শ্রীমতী হেমলতা দেবী ...	৫৭[illegible]
প্রাণ-প্রতিষ্ঠা (সচিত্র) ...	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি, আই, ই ...	৫৮[illegible]
প্রতিহত (কবিতা) ...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, বি, এ ...	[illegible]
পুরী (সচিত্র) ...	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ...	৬৪১
পত্র-পরিচয় (কবিতা) ...	শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী, বি, এ ...	৭০৬
পাট ও পাত্ত ...	শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায় ...	৫৭১

বিষয়		পৃষ্ঠা
ফোটোগ্রাফির সাহায্যে সৌন্দর্য্য-আবিষ্কার	শ্রীআর্য্যকুমার চৌধুরী ...	৫০২
বৃন্দাবন (সচিত্র) ...	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় ...	১৬
বাগদত্তা (উপন্যাস) ...	...	২৫, ১২৬, ২৩০, ৩৭৯, ৪৯০, ৭০২
বৈজ্ঞানিক জীবনী (সচিত্র) ...	শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী এম, এ ...	৬৬, ৩৬৬
বাস্তুভিটা (গল্প) ...	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি, এল	৭৬
বাল্মীকির মৃত্যু (কবিতা) ...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ...	৯৮
বরপণ ...	শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত ...	৯৯
বিরহে (কবিতা) ...	শ্রীমতী প্রতিভাকুমারী দেবী ...	১৬৯
বিরহ-তপের শেষে (কবিতা) ...	শ্রীকালিদাস রায় বি, এ ...	৪১১
বাঙ্গলা ব্যাকরণ ...	শ্রীপ্রমথ চৌধুরী, এম, এ, বার-য়্যাট-ল	৪৪২
বিক্রমোর্ব্বশী ...	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৫৫৬
বিন্দু (গল্প, সচিত্র) ...	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ...	৬৩১
বিলাতের বিদ্যালয় ...	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৬৫২
ব্রহ্মাণ্ড-তত্ত্ব-করদ্রুম (গল্প) ...	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৬৫৩
বুধ-গ্রহের নূতন তথ্য ...	শ্রীজগদানন্দ রায় ...	৬৬০
বাস্তকাহিনী (গল্প) ...	শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৬৬৭
বন্যাদায় (কবিতা) ...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ...	৭২৬
বঙ্গ সাহিত্যের নবযুগ ...	বীরবল ...	৬৭৩
ভুক্ত-ভোগীর পত্র ...	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৪৪৯
ভ্রম-সংশোধন ...	...	৩৫২, ৭৩৪
মহাসরস্বতী (কবিতা) ...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ...	৫৯২
মূলোচ্ছেদ (নাটিকা) ...	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি, এল	৬১২
মানবের ভবিষ্যৎ ...	শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু ...	৯৬
মিলন (কবিতা) ...	শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ...	১২৩
মক্কার তীর্থযাত্রী (সচিত্র) ...	শ্রীগুরুদাস আদক ...	১২৪
মিলনে (কবিতা) ...	শ্রীমতী প্রতিভাকুমারী দেবী ...	১৬৯
মায়ের ডাক (গল্প) ...	বিজনকুমারী ...	২০০
মশক-সমস্যা (সচিত্র) ...	শ্রীদীনবন্ধু সেন বি, এল ...	২৬১
মাননীয় বিচারপতি হরিনাথ রায় (সচিত্র)	... ...	৩৫১
মুসলমানকোর্টে বাঙ্গালী সেনাপতি ...	শ্রীগণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ ...	৫৫৬
মানুষের স্বাভাবিক খাদ্য কি ? ...	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, এল, এম, এস	৪৩৬

বিষয়		পৃষ্ঠা
মিরজা ইটেসাম উদ্দিনের ইংলণ্ড ভ্রমণ	শ্রীহেমচন্দ্র বক্সী ...	৪৮৬
মরীচিকা (সচিত্র) ...	শ্রীক্ষীরোদকুমার রায় ...	৫৫১
যুগ্মতারা (গল্প) ...	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি, আই, ই ...	৭
যোগীবেশ (কবিতা) ...	শ্রীমতী হেমলতা দেবী ...	৪৪৮
রাজহংসের আবাস-ভূমি (সচিত্র) ...	শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ...	১৭[illegible]
রঙ্গমল্লী (সমালোচনা) ...	শ্রীগোলোকবিহারী মুখোপাধ্যায় ...	২[illegible]
রাবণের চিতা (গল্প) ...	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ...	৪০[illegible]
রাজা ও রাখাল (নাটিকা, সচিত্র) ...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ...	৬৮২
রেলযাত্রী (গল্প) ...	শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল, এম, এ, কাব্যতীর্থ	৪৭৭
রাজকুমার (নাটিকা) ...	শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ ...	৫২৬
লক্ষ্ণৌয়ের রেসিডেন্সী (সচিত্র) ...	শ্রীঅমলচন্দ্র দত্ত ...	৪৮২
শারদোদয় (কবিতা) ...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি, এ ...	৫৮৭
শোক সংবাদ ...	... ...	৭[illegible]
শারীর স্বাস্থ্য-বিধান ...	রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর এম, বি, এফ, সি, এস	৫, ১৬৩, ২৬৬, ৩৬১, ৫৩৫
সৌধ-রহস্য (উপন্যাস) ...	শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী	৮৫, ১৭৬, ২৮৯, ৪৩২, ৫৬০, ৬৯৭
সমালোচনা ...	শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা	১১১, ২২২, ৩৪৯, ৪৬২, ৫৮২
স্বর্গ-সুখ (কবিতা) ...	শ্রীমতী বেলা দেবী ...	১২১
সূর্য্যের তাপ ...	শ্রীশিশিরকুমার মিত্র ...	১৪৩
সুরার সৃষ্টি (নাটিকা) ...	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি, এল	৩০৭
সভাপতির অভিভাষণ (সচিত্র) ...	জষ্টিশ আশুতোষ চৌধুরী এম,এ,এল,এল, বি	৩২৪
স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (সচিত্র)	শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	[illegible]
সুজার মৃত্যু ...	শ্রীতারানাথ রায় ...	৫০৬
সিন্ধু-তাণ্ডব (কবিতা) ...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ...	৫৭০
সতী-স্মৃতি (কবিতা, সচিত্র) ...	শ্রীঅসিতকুমার হালদার ...	৫৭৭
সনেট-পঞ্চাশৎ (সমালোচনা) ...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ...	[illegible]
সনেট কেন চতুর্দ্দশ-পদী ? ...	শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম, এ, বার-য়্যাট-ল	[illegible]
সনেট-সপ্তক ...	শ্রীপ্রমথ চৌধুরী, এম, এ, বার-য়্যাট-ল	৩৪৩
সনেট-সুন্দরী (কবিতা) ...	শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম, এ, বার-য়্যাট-ল	৫৮২
সাময়িক প্রসঙ্গ (সচিত্র) ...	... ...	৭২৮

বিষয়				পৃষ্ঠা
হিন্দোলা	...	শ্রীমতী সরলা দেবী বি, এ	...	৯১
হাসি (কবিতা)	...	শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	...	৪৭২
হোলকা বা হোলির প্রকৃত তত্ত্ব	...	শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ	...	৫৭৩
হুহুকের ধন (গল্প)	...	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি, এল		৭০৭

চিত্র সূচী

বিষয়		পৃষ্ঠা
অজন্তা গুহার নারী	...	৫০
আমীরদিগের সমাধি-মন্দির	...	১৫২
আতাশ্মির রেলগাড়ি	...	৩৭
"অাঁধারেতে ভয় করি না !" শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত		২৭৯
আপ্পা সাহেব বারদ	...	৩৮৭
আশুতোষ চৌধুরী (বিচারপতি)	...	৩৩১
আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথ	...	১০৭
আকাশে জাহাজের প্রতিবিম্ব	...	৫৫৫
আয়েষা শ্রীমতী সুনয়নী দেবী অঙ্কিত	...	৬৬৬
আঠারো নালা	...	৬৪৬
ইগুয়েনোডন্‌	...	৩০৪
ইন্দিরা—রাজকুমারী	...	৭৩১
ইব্রাহিম রোজা	...	৪০২
উটকর্ত্তৃক জল তোলা	...	২৫০
এলিফ্যান্টা গুহা	...	৪৬
	...	৪২১
কর্‌সন্‌দাস মূলজি	...	৬০৯
কণারকের ভগ্ন-মন্দির	...	৬৪৫
কুচবিহারাধিপতি মহারাজ রাজেন্দ্র-নারায়ণ ভূপ (স্বর্গীয়)	...	৭৩৫
কল্যাণী (বহুবর্ণ) শ্রীঅসিতকুমার হালদার অঙ্কিত		১
কাপ্তেন স্কট	...	১৯৪
কাপ্তেন ওটস্‌	...	১৯৭
করুণাময়ী (বহুবর্ণ) শ্রীঅসিতকুমার হালদার অঙ্কিত		২২৫
"কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো !" শ্রীমুকুলচন্দ্র দে অঙ্কিত		২৭১
কমলমনোহরী (বহুবর্ণ) শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মিত্র অঙ্কিত		৩৫৩
কাল বৈশাখী শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত		৪০৭
কেগোন	...	৪১৯
"কূলে একা বসে আছি !" শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত		৫৩৩
কিরিফুরি	...	৪১৯
খুঁজিলাম কত, না পেলাম দেখা তার		৬৯১
গণেন্দ্রনাথ মিত্র (ডাক্তার)	...	৩৫২
গুম্বজ চিত্র	...	৫৯০
গুপ্তোবাড়ী	...	৬৪৯
গুহার ভিতরের স্তূপ	...	৪৯
গোবিন্দদেবের মন্দির	...	১৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
গৌরীশঙ্কর দে (গণিতবিৎ) ...	২০৭
গোল গুম্বজ ...	৪০০
চিনুভাই রণছোড়লাল ...	৬০২
"চুম্বন দাও—অধরের চুম্বন" ...	৬৮৩
"চিরসাথী আজি কর মোরে" ...	৬৯৫
চা বাগান ...	৫৮
চিত্র-সাধনা (ফটো হইতে)	
শ্রীআর্য্যকুমার চৌধুরী গৃহীত	৫০৪
চিত্রকূটে শ্রীরামচন্দ্রের আশ্রম ...	৫৮৩
জগন্নাথের মন্দির ...	৬৪৪
জানকীনাথ ঘোষাল (স্বর্গীয়) ...	২১৪
জুম্মা মসজিদ ...	৫৯৬
ঐ এক অংশ ...	৬০০
জৈন মন্দির—আহমদাবাদ ...	৬০৫
জৈন মন্দির—আবু ...	৪৩
ঝড়ে	
শ্রীসমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত অঙ্কিত ...	৬৪০
ট্রিসেরেটপ্স ...	৩০৬
ডাক্তার উইল্সন্ ...	১৯৫
ডিনোসোর ...	৩০৪
ডিপ্লোডকাস্ ...	৩০৫
"তুষার অমল বক্ষ যেথা কমল নীরবে খোলে"	
শ্রীআর্য্যকুমার চৌধুরী গৃহীত	৫০০
তিব্বতীয় স্বরলিপির ছবি ...	২২৯
তিন দরজা ...	৫৯৭
"দেখ প্রিয়ে, দেখ তুমি কত সুন্দর"	৬৮৮
দেবেন্দ্রনাথ সেন (কবিরাজ) ...	২১২
"দেবদাসী"	
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত	২৭৫
"দিন যে যায় না কি করি !"	
শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত	৪২৯
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (কবিবর) ...	৩৪০
"দৈত্যের স্বর্গ"	
শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত	৫৪৯
ধূমপানাসক্ত বৃদ্ধ ...	৭২২
"ন যযৌ ন তস্থৌ"	
শ্রীদুর্গেশচন্দ্র সিংহ অঙ্কিত	৩১৫
নববর্ষের অভিনন্দন কার্ড ...	৩৫
নিউটন ...	৩৬৯
নাচীর ঝরণা ...	৪১৭
নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (স্বর্গীয়) ...	৪৫৬
নিউটন আবিষ্কৃত দূরবীক্ষণ ...	৩৭৬
পার্ব্বতীর তপস্যা (বহুবর্ণ) ...	১১৩
পুরলক্ষ্মী ...	১৩৬
পুরীর পুরন্ধ্রী	
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত	৬৩১
পুরীর মুড়িয়া ...	৬৪৩
পক্ষযুক্ত সর্প ...	৩০১
প্রাচীন বাদুড় ...	৩০২
প্রাণী-ভবনের সরোবর ...	৩০৩
পুণ্ডলীক মন্দির ...	৩৯৭
ফলাফল—শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত	২৭৫
বল্লভপন্থী মহারাজ ...	৬০৮
"বিন্দি, এখনো জল আনতে যাসনি ?"	
শ্রীঅসিতকুমার হালদার অঙ্কিত	৬৩০
বন্যাপীড়িত পল্লিবাসীর ভিক্ষা ...	৭২৭
বিজাপুরের অষ্ট বাদশা ...	৫১২
ব্যাটল্‌ডোর শ্যাটল্ কক্ খেলা ...	[illegible]
"বর্ষার দিনে"	
শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত	২৮৭
"বাজাও রে মোহন বাঁশী !"	
শ্রীমতী সুনয়নী দেবী অঙ্কিত	৪৪৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
বেলিগার্ড গেট ...	৪৮৫
বারদ ভবন ..	৩৮৮
বিঠোবা মন্দির ...	৩৯৫
বিঠোবা মূর্ত্তি ...	৩৯৫
বিনয়েন্দ্রনাথ সেন (অধ্যাপক) ...	২০৯
ভোলানাথ সারাভাই	৬০১
ভঙ্গ তরঙ্গে রণে ভঙ্গ শ্রীসমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত অঙ্কিত	৬৪০
মরুভূমিতে খেজুর গাছের প্রতিবিম্ব	৫৫৩
মশকের জন্ম ...	২৬৪
মদনমোহনজীর মন্দির ...	২১
মানজাই নাচ ...	৩৯
মুহম্মদের কবর ...	১০৫
মিয়ানির রণক্ষেত্র ...	১৬১
"মা যশোদা" শ্রীমতী সুনয়নী দেবী অঙ্কিত	৫৪১
মালা গাঁথা (ফটো হইতে) শ্রীআর্য্যকুমার চৌধুরী গৃহীত	৫০৭
"মুক্তি হবেনা দেব দর্শনে" শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত	৬৪৭
মেরি কার্পেণ্টার	৬০৩
মোহাফেজ খাঁ মসজিদ ...	৫৯৯
রাণী রূপাবতীর মসজিদ ...	৫৯৮
রঙ্গজীর মন্দির ...	১৭
রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ ...	৪১
রাজহংসের আবাস ভূমি ...	১৭২
রাজহংসের বাসা ...	১৭৩
রাসবিহারী ঘোষ, সি, এস, আই (ডাক্তার) ...	৭৩৩
লক্ষ্ণৌয়ের রেসিডেন্সি ...	৪৮৩
লেফ্টানাণ্ট বাউয়ার্স ...	১৯৯
লালসাবাজের দরগা ...	২৪৬
শিরাইতো ঝরণা-পরিবার ...	৪১৮
শোনাই ...	৪২১
শুক-শূদ্রক-সংবাদ (বহুবর্ণ) শ্রীযামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় অঙ্কিত	৫৮৭
ষ্টেগুসেয়ুরাস ...	৩০০
সুশ্রুতোক্ত যন্ত্রের চিত্র	৭১
" শস্ত্র " ...	৭৩
" বন্ধন "	৭৪, ৭৫
সীতা ও সরমা (রঙিন) ...	৯৮
সেওয়ান দুর্গ ...	১৫৪
সিটি কলেজের ছাত্রগণ কর্ত্তৃক বিপন্নগণের উদ্ধার চেষ্টা	৭২৯
সমুদ্র স্নান ...	৬৪২
সহস্রাধিক রাজহংসের বিচরণ ...	১৭১
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ...	২০৫
সিন্ধু নদীর উপরে কোত্রীর পুল ...	২৩৮
সিন্ধুবাসী দেওয়ান গোপালদাস ...	২৪১
"সচকিতা" শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত	৪৩৯
সাতটি রঙে চিত্রিত কার্ডবোর্ড ...	৩৭৫
সোলাপুর দুর্গ ...	৩৮৭
সিদ্ধার্থের বৈরাগ্য (বহুবর্ণ) শ্রীযামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় অঙ্কিত	৪৭৩
সিদ্ধেশ্বর মন্দির ...	৫৯০
সম্রাট ঔরঙ্গজেবের রাজদরবার ...	৫২২
সতী-স্মৃতি ...	৫৭৭
হরিনাথ রায় (বিচারপতি) ...	৫৫১
হাইদ্রাবাদ ...	১৫১

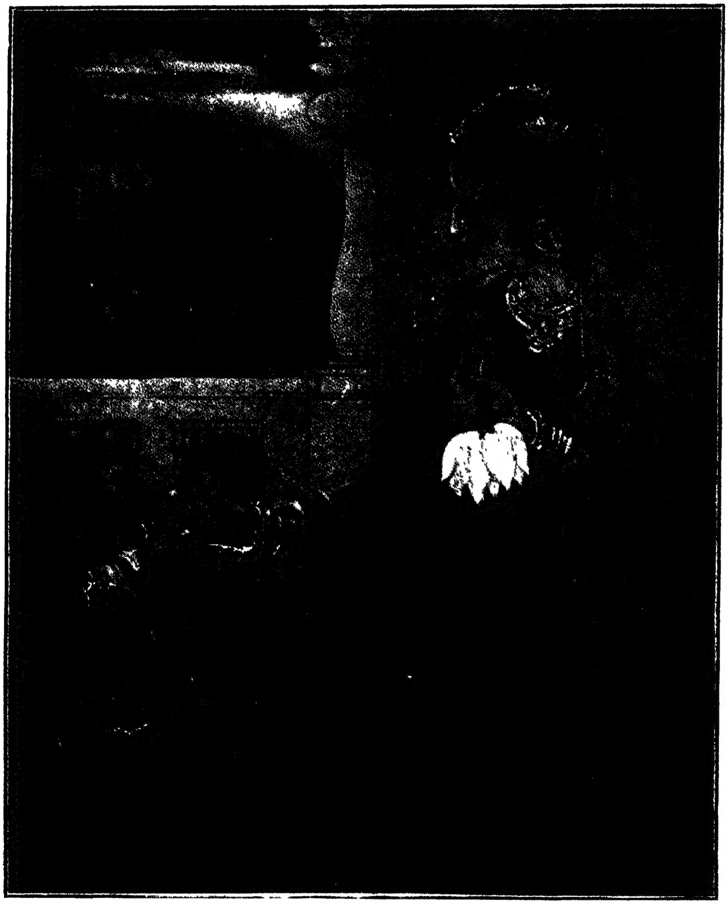

কল্যাণী

শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার অঙ্কিত চিত্র হইতে

ভারতী

৩৭শ বর্ষ] বৈশাখ, ১৩২০ [১ম সংখ্যা

নববর্ষ

১

এস হে অতিথি নব! নব সাধ, নব আশা রাশি
লয়ে এস অনন্ত হরষ;
সুপ্তি-মুক্ত আঁখি পাতে ফুটাইয়া প্রভাতের হাসি
এস তুমি নবীন বরষ।
এ হৃদয় পায়ে দলি, পুরাতন যায় চলি,
অতীতের অন্ধগর্ভে লভিবারে অনন্ত বিশ্রাম;
এস তুমি, নব সাজে, নব হর্ষে বাজুক পরাণ।

২

বিদায়-আসরে ওই থেমে গেল গাজনের ঢাক,
সন্ন্যাসীর উন্মাদ চীৎকার;
ঢলে পড়ে পুরাতন,— জীবনের এই শেষ ডাক
কা'র সাধ্য আছে লঙ্ঘিবার।
কাল সমুদ্রের বুকে, একটি বুদ্বুদ সুখে,
ভেসে উঠে মানবেরে খেলাইল কত শত রঙ্গে;
আজি সেই মিশে যায় অন্তহীন তিমির তরঙ্গে।

৩

স্বাগত আহ্বান গীতি কোকিলের কলকণ্ঠে বাজি
করিতেছে মুখরিত ধরা;
নবীনে বরিতে মরি! প্রকৃতির মঞ্জু কুঞ্জ আজি
স্নিগ্ধ নব পল্লবেতে ভরা।

পুরাতন যায় মিশি, উজলিয়া দশদিশি,
কালের নবীন ঢেউ লীলাভরে আসিতেছে ছুটি ;
জানিনা জীবন-কাব্যে কিবা চিত্র উঠিবে গো ফুটি।

৪

সীমাহীন নভোনীলে ভে'সে গে'ছে পুরাতন গান,
কত শত আশা গেছে ঝরি ;
তবু এ বিশ্বের বুকে,—কার যেন সাধিতে কল্যাণ
ভাসিতেছে জীবনের তরী।
দারিদ্র্যের কশাঘাত, পীড়নের অশ্রুপাত,
তাই লয়ে হে নবীন! তব সনে করি আলিঙ্গন ;
হয় যদি হোক্ তাহে জগতের উদ্দেশ্য সাধন।

৫

কালপ্রবাহের মাঝে আমি ক্ষুদ্র ক্রীড়নকখানি,
ডুবে' ভেসে করিতেছি খেলা ;
কোন্‌দিনে কোন্‌খানে চির অন্ধ যবনিকা টানি ;
ডুবে যাবে জীবনের ভেলা।
খেলাইতে অভাগারে, হে নবীন এলে দ্বারে,
ধন্য মানি আপনারে ; নমি পদে ভাগ্য-বিধাতার ;
হেরিলাম নব বর্ষ, নব হর্ষে প্রসাদে যাঁহার।

৬

ক্লান্তি, অবসাদ রাশি, হিংসা, দ্বেষ, গ্লানি, পরমাদ
যাক্ চলি অতীতের সনে ;
তুমি লয়ে এস বহি শান্তিমাখা পুণ্য আশীর্ব্বাদ ;
পূর্ণ কর নবীন উদ্যমে।
জীবনের যত আশা, প্রেম, প্রীতি ভালবাসা,
অসম্পূর্ণ আছে যাহা ; বিশাল এ বিশ্বখানি মাঝে ;
দাও শক্তি পূর্ণ করি আনি সবে জগতের কাজে।

———

বিনাখরচে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তাহা বড় অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে। আমরা দেখিতে পাই যে সাধারণ চিকিৎসালয়ে অনেক প্লেগ্ রোগী একত্রে থাকিলেও যাহারা তাহাদিগকে দিবারাত্রি শুশ্রূষা করিয়া থাকে, তাহারা ঐ রোগে কদাচ আক্রান্ত হইয়া থাকে। অথচ ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে অপরিস্কার বহুজনতাপূর্ণ পল্লীর মধ্যে কোন বাটীতে একটীমাত্র লোক প্লেগ্‌রোগে আক্রান্ত হইলে উহা দাবানলের ন্যায় সত্বর চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এইজন্য কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে, প্লেগের সময় সাধারণ চিকিৎসালয়ই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ স্থান।

আধুনিক চিকিৎসকদিগের মত এই যে পিতামাতা বা তদূর্দ্ধ পুরুষের মধ্যে যক্ষ্মারোগ থাকিলেই যে সন্তানসন্ততির মধ্যে যক্ষ্মারোগের সঞ্চার হইবে, তাহার কোন প্রমাণ নাই; কিন্তু অনেক স্থলে শুদ্ধ শ্বাসক্রিয়া দ্বারা কলুষিত বায়ু সেবন করিলেই যক্ষ্মারোগ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। অবশ্য ইহা স্বীকার্য্য যে যক্ষ্মারোগের বীজাণুর অভাবে ঐ রোগ উৎপন্ন হয় না। এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে বহুজনপূর্ণ সহরের প্রায় সর্ব্বস্থানের বায়ুমধ্যে এই রোগের বীজাণু অল্পাধিক পরিমাণে সর্ব্বদা বিদ্যমান রহিয়াছে। মুক্তস্থানের বায়ুতে ইহারা সূর্য্যালোক ও বায়ুস্থিত প্রচুর অক্সিজেন্ সংযোগে শীঘ্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু রুদ্ধ গৃহের প্রশ্বাস-কলুষিত বায়ুমধ্যে থাকিলে উহারা বিনষ্ট না হইয়া সত্বর সংখ্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং উহাদিগের সংক্রামকতাধর্ম্মও প্রবল হয়। এইজন্য প্রশ্বাসকলুষিত বায়ুসেবনে এই রোগের বিস্তৃতি সংসাধিত হইতে থাকে। ডাক্তার কার্‌মাইকেল্ ইংলণ্ডের অনেক বিদ্যালয়ের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে পুষ্টিকর খাদ্যের অপ্রতুল না থাকিলেও শুদ্ধ প্রশ্বাস কলুষিত বায়ু সেবন করিয়া এবং খোলা জায়গায় ব্যায়াম চর্চ্চা না করিয়া বালকেরা যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। অধ্যাপক এলিসন্, সর্ জেম্‌স্ ক্লার্ক্, নীল্ আনট্ উইন্‌বি গাই, ম্যাক্‌কর্মক্, গ্রীণ্‌হাউ, কার্ণেলি, হাল্‌ডেন্, এওয়ার্স্‌ন্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ স্বাধীনভাবে গবেষণা করিয়া কার্‌মাইকেলের সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। এক্ষণে ইংলণ্ডে স্বাস্থ্যকর বাসগৃহ নির্ম্মাণ ও স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় নানাবিধ উন্নতি সাধিত হওয়ায় যক্ষ্মারোগ যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে এই রোগ ক্রমশঃ প্রবল হইতে দেখা যাইতেছে এবং ইহার মৃত্যুসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। সমাজহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই ইহা চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত।

ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে সূর্য্যালোক ও মুক্ত বায়ু সংস্পর্শে রোগোৎপাদক বীজাণু সকল শীঘ্র ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এইজন্য যদি সংক্রামক রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সহিত সুস্থ ব্যক্তির এক গৃহে বাস করিতে হয় (যাহা সাধারণ লোকের বাটীতে সকল সময়ে ঘটিয়া থাকে), তাহা হইলে সেই গৃহের বায়ুপথ সকল সর্ব্বদা উন্মুক্ত রাখা উচিত। নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা প্রভৃতি কাশরোগে ফুসফুসের অল্পাধিক স্থান ব্যাধিগ্রস্ত হয়, সুতরাং রক্ত-শোধনের জন্য যে পরিমাণ

বিশুদ্ধ বায়ু নিশ্বাসরূপে গ্রহণ করা উচিত, রোগগ্রস্ত ফুস্‌ফুস্‌ তাহা গ্রহণ করিতে না পারায় রোগীর শরীরস্থিত রক্ত যথারীতি পরিস্কৃত হইতে পায় না, সুতরাং রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এ সময়ে যদি আবার আমরা রোগীকে "ঠাণ্ডা" লাগিবে, এই অমূলক আশঙ্কার বশবর্ত্তী হইয়া গৃহের তাবৎ বায়ুপথ রুদ্ধ করিয়া রাখি, তাহা হইলে রোগীর সাধ্যমত বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিবার যথেষ্ট অসুবিধা উপস্থিত হয়, সুতরাং এরূপ স্থলে আমরা তাহার আরোগ্যের অন্তরায় ও অনেক সময়ে মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকি। দুঃখের বিষয় এই যে বহুদর্শী চিকিৎসকগণ উচিত পরামর্শ দিলেও আমরা ভ্রান্ত সংস্কারবশতঃ তদনুরূপ কার্য্য করিতে সাহসী হই না। ইহা সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে যতক্ষণ রোগী রুদ্ধ গৃহের দূষিত বায়ু সেবন করিতে থাকিবে, ততক্ষণ ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা তাহার রোগের প্রতীকার করিবার চেষ্টা করা বৃথা। যে যক্ষ্মারোগে আমরা রোগীকে রুদ্ধ গৃহমধ্যে আবদ্ধ রাখিতে পারিলে নিরাপদ বিবেচনা করি, সেই দুঃসাধ্য রোগ এক্ষণে, যথায় সর্ব্বদা বরফ পড়িতেছে, এরূপ অত্যধিক শীতল স্থানে উন্মুক্ত বায়ুমধ্যে থাকিয়া, প্রশমিত ও আরোগ্য হইতেছে। সাধারণ হস্পিটালের দরজা জানালা, কি গ্রীষ্ম কি শীত সকল ঋতুতেই, দিবারাত্র মুক্ত রাখা হয়, অথচ তাহাতে রোগীদিগের কোন অনিষ্ট ঘটিতে দেখা যায় না।

নানাবিধ সামাজিক কারণ ও আর্থিক অভাব নিবন্ধন আমরা বহু পরিবার লইয়া ক্ষুদ্র গৃহে বাস করিতে বাধ্য হই। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমরা "হিম" লাগিবার ভয়ে রাত্রিকালে শয়ন-গৃহের প্রায় সমস্ত বায়ু-পথই রুদ্ধ করিয়া দিই। রোগ আমাদের নিত্য সহচর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, সুতরাং গৃহবাসীদিগের মধ্যে দুই একটী রোগী থাকাও অসম্ভব নহে। এস্থলে বলা উচিত যে পীড়িতাবস্থায় আমাদিগের প্রশ্বাস ও ত্বক্‌ দ্বারা অধিক পরিমাণ কার্ব্বনিক্‌ এসিড্‌ গ্যাস্‌ ও নানাবিধ দূষিত অর্গানিক্‌ (organic) পদার্থ নির্গত হইতে থাকে। শিশুসন্তানগণ অনেক সময়ে শয্যার উপরেই রাত্রিকালে মলমূত্র ত্যাগ করিয়া থাকে এবং গৃহিণীদিগের আলস্যবশতঃ তাহা সমস্ত রাত্রি সেই রুদ্ধ গৃহের এক পার্শ্বে সঞ্চিত থাকে। এইরূপে গৃহবাসীদিগের শ্বাসক্রিয়া, রোগীর শরীর হইতে পরিত্যক্ত দূষিত পদার্থ এবং গৃহমধ্যে সঞ্চিত মলমূত্র দ্বারা শয়নগৃহের বায়ু শীঘ্র অত্যন্ত দূষিত হইয়া উঠে। এতদ্ব্যতীত রোগী বা শিশুর পরিচর্য্যা নিবন্ধন অনেক সময়ে গৃহমধ্যে একটী আলোক রাখিবার প্রয়োজন হয়, সুতরাং উক্ত গৃহের বায়ুস্থিত অক্সিজেনের অংশ অত্যন্ত কমিয়া যায় এবং বায়ুমধ্যে কার্ব্বনিক্‌ এসিড্‌ প্রভৃতি দূষিত পদার্থের অংশ যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। গৃহরুদ্ধ থাকে বলিয়া বাহিরের নির্ম্মল বায়ু তন্মধ্যে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রবেশ করিয়া দূষিত বায়ুকে পরিস্কৃত ও স্থানান্তরিত করিতে পারে না, সুতরাং উক্ত গৃহের বায়ু যে কিরূপ বিষাক্ত হয়, তাহা বর্ণনার অতীত। এই দূষিত বায়ু অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হয়, কিন্তু যাহারা গৃহ মধ্যে বাস করে, তাহারা বার বার উহা নিশ্বাস রূপে গ্রহণ করে বলিয়া তাহাদের ঘ্রাণশক্তির তীক্ষ্ণতা কমিয়া যায়,

সুতরাং গৃহবাসীরা উক্ত দুর্গন্ধ অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু বাহির হইতে অন্য ব্যক্তি রুদ্ধ গৃহমধ্যে সহসা প্রবেশ করিলেই উক্ত দুর্গন্ধ সবিশেষ অনুভব করিয়া থাকে। আমরা বার মাস ত্রিশ দিন এইরূপ অবস্থাপন্ন শয়নগৃহের মধ্যে রাত্রি যাপন করিয়া থাকি, সুতরাং ইহাতে আমাদের স্বাস্থ্য যে ভঙ্গ হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি ?

আমরা যে নির্ম্মল বায়ু নিশ্বাসরূপে গ্রহণ করি, তাহাতে শতকরা ·০৪ ভাগ মাত্র কার্ব্বনিক্ এসিড্ গ্যাস্ বিদ্যমান থাকে, কিন্তু যে বায়ু আমরা প্রশ্বাসরূপে ত্যাগ করি, তাহার প্রতি ১০০ ভাগে ৪ ভাগ কার্ব্বনিক্ এসিড্ গ্যাস্ থাকে, সুতরাং গৃহরুদ্ধ থাকিলে উহার বায়ু শ্বাসক্রিয়া দ্বারা যে কত শীঘ্র দূষিত ও বিষাক্ত হইয়া পড়ে, তাহা সহজেই অনুমান করিয়া লইতে পারা যায়। অক্সিজেন্ গ্যাস্ আমাদের জীবন ধারণের সহায়ক। রুদ্ধ গৃহের বায়ুর মধ্যে যে অক্সিজেন্ থাকে, তাহা ক্রমশঃ আমরা নিশ্বাসের সহিত টানিয়া লই, এবং তাহার পরিবর্ত্তে প্রশ্বাসত্যক্ত বিষাক্ত কার্ব্বনিক্ এসিড্ গ্যাস্ দ্বারা গৃহ পরিপূর্ণ হইতে থাকে। গৃহের বায়ুপথ মুক্ত থাকিলে বাহিরের নির্ম্মল বায়ু গৃহস্থিত দূষিত বায়ুর সহিত যথেষ্ট পরিমাণে মিশ্রিত হইয়া কার্ব্বনিক্ এসিডের পরিমাণ কমাইয়া এবং উহার কতকাংশ গৃহ হইতে দূরকরিয়া দিয়া, উহাকে পুনরায় শ্বাসোপযোগী করে। এজন্য কি গ্রীষ্মকাল, কি শীতকাল, কি দিবা, কি রাত্রি, যে গৃহে বাস করা যায়, তাহার বায়ুপথসমূহ রুদ্ধ করা নিতান্ত অসঙ্গত কার্য্য।

ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে নিম্ন বঙ্গদেশে বৎসরের অধিকাংশ সময়ে দক্ষিণ-দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়, এজন্য এদেশের বাসগৃহের দরজা ও জানালাগুলি উত্তর-দক্ষিণ-মুখী ও ঋজু হওয়া উচিত। বায়ু-পথগুলি ঋজু না হইলে গৃহমধ্যে কখনই অবাধে বায়ু সঞ্চালিত হইতে পারে না। কোনও গৃহের একটী মাত্র ঋজু বায়ু-পথ মুক্ত থাকিলে বায়ু সঞ্চালনের যেরূপ সুবিধা হয়, এক দিকে দুই তিনটী বায়ু পথ উন্মুক্ত থাকিলেও সেরূপ সুবিধা হয় না। গৃহের চতুঃপার্শ্বে দরজা জানালা থাকিলে গৃহ মধ্যে আলোক-প্রবেশের ও বায়ুসঞ্চালনের সবিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে। দরজা ও জানালাগুলি দৈর্ঘ্যে ৬½ ফিট্ এবং প্রস্থে ৩½ ফিটের কম হওয়া উচিত নহে। জানালা অপেক্ষা খড়্খড়ি গৃহের বায়ু-সঞ্চালনের পক্ষে অধিক উপযোগী। খড়্খড়ির "পাখি" কেসা থাকিলেও তাহাদিগের ফাঁক দিয়া গৃহে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে। কিন্তু খড়্খড়ির সহিত আমরা যে "সাসি" প্রস্তুত করিয়া থাকি, তাহা প্রভূত অনিষ্টের কারণ। গৃহের শোভার জন্য "সাসি" নির্ম্মিত হইলে ক্ষতি নাই, কিন্তু "সাসি" কখন রুদ্ধ করা উচিত নহে।

প্রত্যেক গৃহের বায়ু-নির্গমনের স্বতন্ত্র পথ থাকা আবশ্যক অর্থাৎ যাহাতে এক গৃহের দূষিত বায়ু অপর গৃহে প্রবেশ না করে, তাহার সুবন্দোবস্ত করা উচিত। গৃহের দেওয়ালের উপরিভাগে কতকগুলি ছিদ্র রাখা কর্ত্তব্য। প্রশ্বাসত্যক্ত বায়ু ও দীপালোক-সম্ভূত কার্ব্বনিক্ এসিড্ গ্যাস্ উষ্ণতা হেতু লঘু হইয়া ঊর্দ্ধে উথিত হয়, সুতরাং দেওয়ালের উপরিভাগে ছাদের নিম্নে কতকগুলি ছিদ্র

থাকিলে তদ্দ্বারা ঐ দূষিত বায়ু গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া যায় এবং মুক্ত দরজা ও জানালা দিয়া বাহিরের নির্ম্মল বায়ু গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহার স্থান অধিকার করে। বিশেষতঃ বিদ্যালয়, কারখানা, সভাগৃহ, নাট্যশালা, উপাসনা-মন্দির প্রভৃতি যে সকল স্থানে একত্রে বহুলোক সমাগত হয়, তথাকার দেওয়ালের উপরিভাগে বহুসংখ্যক ছিদ্র এবং ঐ সকল গৃহের তাবৎ বায়ু-পথ সর্ব্বদা উন্মুক্ত রাখা উচিত। অবশ্য গ্রীষ্মকালে রুদ্ধ গৃহে থাকিতে যে রূপ কষ্ট হয়, শীত কালে সেরূপ হয় না; কিন্তু গৃহ রুদ্ধ করিয়া তন্মধ্যে অবস্থান করিলে তথাকার বায়ু কি গ্রীষ্মকাল, কি শীতকাল, সকল সময়েই সমভাবে দূষিত হইয়া থাকে, সুতরাং শীতকালেও শয়ন গৃহের কয়েকটী বায়ু পথ উন্মুক্ত রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। এদেশে সাহেবেরা শীতকালেও শয়ন গৃহের বায়ু-পথ এককালে বন্ধ করিয়া রাখেন না। তাঁহারা দিবারাত্র নির্ম্মল বায়ু সেবন করেন বলিয়া তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা সুস্থ শরীরে থাকিতে দেখা যায়। পৌষ মাঘ মাসে কলিকাতার বাঙ্গালী-টোলায় সন্ধ্যার পর যে বাটীর প্রতি লক্ষ্য করা যায়, তাহারই দরজা জানালা রুদ্ধ থাকিতে দেখা যায়, সুতরাং বাটীটী যেন পরিত্যক্ত জনশূন্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ঐ সময়ে চৌরঙ্গী মহলে যাইলে দেখা যায় যে সকল বাটীরই দরজা জানালা খোলা রহিয়াছে এবং উহাদিগকে আলোকমালায় সজ্জিত দেখিয়া মনে হয় যেন প্রত্যেক বাটীতে কোন রূপ উৎসবের আয়োজন হইতেছে। আমরা দেখিতে পাই যে এদেশে গ্রীষ্মকাল অপেক্ষা শীতকালে রোগের প্রভাব অধিক এবং মৃত্যু সংখ্যার আতিশয্য হইয়া থাকে। শীতকালে সমস্ত রাত্রি রুদ্ধ গৃহে বাস করিয়া বিষাক্ত বায়ু সেবন করা যে ইহার একটী প্রধান কারণ নহে, তাহা কে বলিতে পারে?

গৃহের মধ্যে অধিবাসীর সংখ্যা অধিক হইলে তাহাদিগের শ্বাসক্রিয়া দ্বারা গৃহমধ্যস্থ বায়ু এত শীঘ্র এবং এত অধিক পরিমাণে দূষিত হয় যে বায়ুপথ সমূহ উন্মুক্ত থাকিলেও বহিঃস্থ নির্ম্মল বায়ু গৃহস্থিত দূষিত বায়ুকে শীঘ্র পরিষ্কৃত করিতে সমর্থ হয় না। এই জন্য প্রত্যেক গৃহের মধ্যে (বিশেষতঃ শয়ন-গৃহে) কতগুলি লোক বায়ুকে অতিরিক্ত ভাবে দূষিত না করিয়া একত্রে অবস্থান করিতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার একটী সহজ উপায় আছে। এই নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার অতিরিক্ত লোকের উক্ত গৃহে বাস করা কোনমতেই যুক্তিসিদ্ধ নহে।

ইহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে শয়ন-গৃহের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা কত, তাহা প্রথমতঃ নির্ণয় করিতে হইবে। মনে কর কোন একটী গৃহের দৈর্ঘ্য ২৫ ফুট্, প্রস্থ ১২ ফুট্ এবং উচ্চতা ১২ ফুট্। এক্ষণে এই সংখ্যাগুলি গুণ করিলে যে গুণফল হইবে, তাহার দ্বারাই গৃহের মধ্যে কত বায়ু-স্থান (Air-space) আছে, তাহা নির্দ্ধারিত হয়। আমাদের গৃহটীর আয়তন (Volume) ২৫ × ১২ × ১২ = ৩৬০০ ঘন ফুট্ (Cubic feet)। ইংলণ্ডে সৈন্যাবাস ও সাধারণ চিকিৎসালয়ে প্রত্যেক সৈনিক পুরুষ বা রোগীর জন্য ৬০০ ঘন ফুট্ পরিমিত স্থান নিরূপিত হইয়া থাকে। কিন্তু

ইংলণ্ডের ভাড়াটিয়া বাটী গুলিতে প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থানের জন্য ৩০০ ঘন ফুট পরিমিত স্থান আইন দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, সুতরাং এই নিয়ম অনুসারে আমাদিগের বিচারাধীন গৃহটীর মধ্যে ১২ জন লোক শয়ন করিতে পারে। কিন্তু শয়ন-গৃহের পক্ষে ৩০০ ঘন ফুট পরিমিত স্থান এক জন মনুষ্যের পক্ষে একেবারেই পর্য্যাপ্ত নহে; শয়ন গৃহে এরূপ অল্প পরিমাণ স্থান হইলে গৃহস্থিত ব্যক্তিগণের স্বাস্থ্য শীঘ্র ভঙ্গ হইয়া যায়, তাহারা দুর্ব্বল হয় এবং রক্তহীনতা (Anæmia) রোগ জন্মে। আমাদের কলিকাতা মিউনিসিপালিটীও ভাড়াটিয়া বাড়াগুলিতে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ন্যূনসংখ্যা এই পরিমাণ স্থান আইন দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন; ইহার পরিবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক। সার্জ্জন্-জেনেরাল্ সর্ সি পি লিউকিস্ তাঁহার ট্রপিকাল্ হাইজিন্ নামক গ্রন্থে ভারতবর্ষে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য শয়নগৃহে ১০০০ ঘন ফুট, (অর্থাৎ ১০×১০×১০) পরিমিত স্থানের ব্যবস্থা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। সকল অবস্থায় যদি ১০০০ ঘন ফুটের সুবিধা না হয়, তাহা হইলে অন্ততঃ ৬০০ ঘন ফুট স্থানের ব্যবস্থা করা উচিত।

আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে সাধারণ লোকের বাটীর গৃহগুলির উচ্চতা প্রায় ১০ হইতে ১২ ফুট হইয়া থাকে। সুতরাং গৃহের উচ্চতা ছাড়িয়া দিয়া যদি আমরা গৃহের শুদ্ধ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ গণনা করি, তাহা হইলে আইন অনুসারে যে ৩০০ ঘন ফুট ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতে একজনের ২৭ বর্গ ফুটের (Square feet) অধিক পরিমাণ স্থান অধিকার করিবার সুবিধা হয় না অর্থাৎ দৈর্ঘ্যে ৬ ফুট এবং প্রস্থে ৪½ ফুটের অধিক স্থান তাহার অংশে পড়ে না (৬×৪½=২৭×১১ ফুট (উচ্চতা) =২৯৭ ঘন ফুট)। ২৭ বর্গ ফুট পরিমিত স্থান এক জনের পক্ষে যে নিতান্ত সঙ্কীর্ণ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শয়নগৃহে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য অন্ততঃ ৪৮ বর্গ ফুট (৮ ফুট দৈর্ঘ্য ×৬ ফুট প্রস্থ) পরিমিত স্থানের বন্দোবস্ত থাকা উচিত। ডাক্তার লিউকিস্ শয়নগৃহে প্রত্যেক লোকের জন্য ১০০ বর্গ ফুট (অর্থাৎ দৈর্ঘ্য ১০ ফুট× প্রস্থ ১০ ফুট) পরিমিত স্থানের ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছেন। গৃহের মধ্যে গৃহশয্যা (Furniture) যত অধিক থাকিবে, ঐ গৃহের বায়ুস্থান ততই কমিয়া যাইবে। এজন্য শয়নগৃহে গৃহশয্যার পরিমাণ যত অল্প হয়, উহা ততই স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে অনুকূল। শয়নগৃহের মধ্যে আলমারি, বাক্স, সিন্দুক, টেবিল্, চেয়ার্ প্রভৃতি আসবাব যত অল্প থাকে, ততই ভাল।

আমাদিগের স্মরণ রাখা উচিত যে রাত্রিকালে গৃহমধ্যে প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিলে গৃহের বায়ু দূষিত হয়। অনেক সময়ে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া গৃহে দীপ জ্বালিয়া রাখিতে হয়, সুতরাং শয়নগৃহের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির যে পরিমাণ স্থানের (৪৮ বর্গ ফুট) উল্লেখ করা গিয়াছে, যাহাতে কোনক্রমে তাহার কম না হয়, তদ্বিষয়ে সবিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। এস্থলে বলা কর্ত্তব্য যে গৃহের মধ্যে যে কোন আলোকই জ্বলুক না কেন, তাহা দ্বারা অল্পাধিক পরিমাণে গৃহের বায়ু দূষিত হইয়া থাকে; কেবল

ইলেক্‌ট্রিক্‌ আলোক দ্বারা বায়ু দূষিত হয় না।

গৃহমধ্যে "টানা পাখা" অথবা ইলেক্‌ট্রিক্‌ পাখা চালাইলে বায়ু সঞ্চালনের পক্ষে কিয়ৎ পরিমাণে সুবিধা হইয়া থাকে। কিন্তু গৃহরুদ্ধ থাকিলে বায়ু-প্রবাহের অভাবে পাখা দ্বারা কেবল ঘরের বায়ুরই নাড়াচাড়া হইয়া থাকে, তাহা পরিষ্কৃত হইবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয় না। তবে তদ্দ্বারা দেহ-নিঃসৃত ঘর্ম্ম শীঘ্র শুকাইয়া যায় বলিয়া শরীর শীতল হয় এবং এই জন্য "টানা পাখা" গ্রীষ্মকালে আরামদায়ক হইয়া থাকে।

আমরা সচরাচর বাটীর নিম্নতলে সুবিধা-মত কোন একটী গৃহে রন্ধনশালা নির্ম্মাণ করিয়া থাকি। ইহাতে বাটীর মধ্যে সকালে ও বৈকালে উনানে আগুন দিবার সময় এত অধিক ধূঁয়া হয় যে সে সময়ে বাটীতে থাকা নিতান্ত কষ্টকর হইয়া উঠে। এতদ্ব্যতীত এই ধূমের জন্য বস্ত্রাদি অতি সত্বর মলিন হইয়া যায়। রন্ধনশালা বসতবাটী হইতে পৃথক্‌ভাবে অবস্থিত হওয়া উচিত এবং তন্মধ্য হইতে ধূম নির্গমনের জন্য সুবন্দোবস্ত করা উচিত। পূর্ব্বে পল্লীগ্রামে গৃহস্থ লোকের বাটীতেও রন্ধনশালা বাসগৃহ হইতে অল্প দূরে নির্ম্মিত হইত। ইহাতে ধূঁয়া, ছাই ইত্যাদি দ্বারা বাস-গৃহ ও বস্ত্রাদি মলিন হয় না এবং আমাদিগের রন্ধনশালাধিষ্ঠাত্রী "অন্নপূর্ণা"দিগেরও দিবসে দুইবেলা "ধূঁয়ার ছলন" করিয়া চক্ষের জলে বক্ষঃ ভাসাইতে হয় না। কলিকাতার স্থানাভাব বশতঃ স্বতন্ত্র স্থানে পাকশালা প্রস্তুত করিবার সর্ব্বদা সুবিধা হয় না। এরূপ স্থলে বাটীর উপরতলে (ছাদের উপর) পাকশালা নির্ম্মাণ করিলে ধূঁয়ার যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারা যায়। যাঁহারা নূতন বাটী প্রস্তুত করিতেছেন, তাঁহারা যেন উনানের সহিত একটী চিম্‌নির বন্দোবস্ত করেন, তাহা হইলে নীচের তলে রান্নাঘর হইলেও বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে না, চিম্‌নি দিয়া সমস্ত ধূঁয়া উপর দিকে উঠিয়া যাইবে। ধূম নির্গমনের জন্য রান্নাঘরের মধ্যে ছাদের নিম্নে দেওয়ালের উপর ছিদ্র রাখা হইয়া থাকে; অভাবপক্ষে এগুলি ভাল, তবে চিম্‌নি দ্বারা ধূঁয়া যেরূপ সহজে বাহির হইয়া যায় এবং রান্না ঘরের মধ্যে ও বাটীর অন্যান্য স্থানে জমিয়া থাকে না, এই ছিদ্রগুলি দ্বারা সেরূপ হয় না।

রান্নাঘরটী গোশালা, অশ্বশালা বা পাইখানার নিকট অবস্থিত হওয়া উচিত নহে। ইহাতে ঐ সকল স্থান হইতে দূষিত বায়ু রান্নাঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া খাদ্যদ্রব্যাদির সহিত মিশ্রিত হইবার সম্ভাবনা। এতদ্ব্যতীত এরূপ স্থানে রান্নাঘর অবস্থিত হইলে তন্মধ্যে মাছির উপদ্রব হইতে দেখা যায়। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে মাছি দ্বারা রোগোৎপাদক বীজাণু একস্থান হইতে অন্যস্থানে পরিবাহিত হয়; ঐ সকল মাছি খাদ্যদ্রব্যের উপর বসিলে উহা বীজাণুদুষ্ট হয় এবং উহার ব্যবহারে নানারূপ সংক্রামক রোগ উৎপন্ন হয়। মাছি তাড়াইবার জন্য রান্নাঘরের জানালা গুলি সূক্ষ্ম জাল দ্বারা আবৃত হওয়া উচিত এবং দরজায় একখানি চিক্‌ ফেলিয়া রাখা আবশ্যক। রান্নাঘরের নিকট তরকারির খোসা, মাছের আঁইস, ভাতের ফেণ এবং অন্য কোন আবর্জ্জনা সঞ্চিত করিয়া রাখা

উচিত নহে; ইহাতে রান্নাঘরের মধ্যে মাছির উপদ্রব হইয়া থাকে।

গোশালা, অশ্বশালা প্রভৃতি গৃহপালিত পশুপক্ষী রাখিবার স্থান বাটী হইতে দূরে অবস্থিত হওয়া উচিত। কলিকাতায় অনেক বাটীতে নিম্নতলে গোশালা বা অশ্বশালা অবস্থিত আছে এবং উপরতলে অধিবাসীগণ বাস করিয়া থাকেন; ইহা যে নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর প্রথা, তাহা কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যক নাই। এরূপ ব্যবস্থায় গৃহবাসীগণকে সতত গোশালা বা অশ্বশালা হইতে উদ্ভূত দূষিত বাষ্প-মিশ্রিত বায়ু সেবন করিতে হয়। গোশালা বা অশ্বশালার মেঝে "পাকা" হওয়া উচিত এবং গৃহের চতুর্দ্দিকে প্রাচীর না রাখিয়া উহা সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত রাখা আবশ্যক। গৃহের "চাল" দুধারে একটু বেশী গড়ানে হইলে রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে পশুগণ সুন্দর-ভাবে রক্ষিত হইতে পারে অথচ চতুর্দ্দিক্ খোলা থাকিবার জন্য বায়ু-সঞ্চালন ও আলোক-প্রবেশের ব্যাঘাত হয় না। এক্ষণে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটী সহরের স্থানে স্থানে কতকগুলি আদর্শ গো-শালা (Model Cowshed) নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এগুলি বড়ই সুন্দর হইয়াছে; আমাদের ঐ দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া অশ্বশালা ও গো-শালা নির্ম্মাণ করা উচিত। গৃহের মেঝে একদিকে একটু ঢালু থাকিবে এবং গৃহের বাহিরে "পাকা" নর্দ্দামা প্রস্তুত করিয়া যাহাতে মল মূত্রাদি দূরে চলিয়া যাইতে পারে (অর্থাৎ নিকটস্থ জমিতে না শোষিত হয়), তাহার সুবন্দোবস্ত করা উচিত। পল্লীগ্রামে বাসগৃহ হইতে বহুদূরে ভূমি খনন করিয়া মল, মূত্র ও অন্যান্য আবর্জ্জনা তন্মধ্যে প্রোথিত করা উচিত। কালে এই সকল পদার্থ উৎকৃষ্ট "সারে" পরিণত হয়, তখন উহা কৃষিকার্য্যের পক্ষে সবিশেষ উপযোগী হইয়া থাকে।

"পাইখানা" বাসগৃহ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত হওয়া আবশ্যক। "পাইখানার" উপরের ও নীচের মেঝে সিমেন্ট্ দ্বারা "পাকা" করিয়া লওয়া উচিত এবং বায়ু ও আলোক প্রবেশের জন্য তন্মধ্যে ২টী জানালা রাখা উচিত। যে "পাইখানা"য় একটী দরজা ব্যতীত অন্য কোন বায়ুপথ থাকে না, তাহা সর্ব্বদা ভিজা ও দুর্গন্ধময় হইতে দেখা যায়। যদি ড্রেনের "পাইখানা" না হয়, তাহা হইলে উহার মধ্য হইতে মেথর যাহাতে মল সহজে স্থানান্তরিত করিতে পারে, তাহার সুবন্দোবস্ত করা একান্ত আবশ্যক। নীচের স্থান সঙ্কীর্ণ হইলে মেথর উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভালরূপে পরিষ্কার করিতে পারে না, সুতরাং চিরদিন পাইখানার নিম্নদেশ নিতান্ত অপরিষ্কার ও দুর্গন্ধময় রহিয়া যায়। এইজন্য "পাইখানার" নিম্নতলে মেথরের "খাটিবার" দরজা ব্যতীত আর একটী ছোট বায়ুপথ রাখা উচিত; তাহা হইলে উহার মধ্যে সর্ব্বদা আলোক ও বায়ু প্রবেশ করিয়া উহাকে শুষ্ক রাখিবে এবং উহার দুর্গন্ধও যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়া যাইবে। "পাইখানার" জল "পাকা" নর্দ্দামা দিয়া বাটী হইতে দূরে যাহাতে নিকাশ হইয়া যায়, তাহার বন্দোবস্ত করা উচিত। "পাইখানার" গাম্‌লা বা বাল্‌তিগুলি আল্‌কাতরা মাখান হইলে উহা সহজেই পরিষ্কৃত হয় এবং মাটীর গাম্‌লার মধ্যে মলমূত্রাদি শোষিত হইতেপারে না।

প্রতি বৎসর একবার করিয়া বাটী চূণকাম (Lime-washing) করা উচিত। যদি বাটীতে কোন সংক্রামক রোগ হয়, তাহা হইলে রোগ মুক্তির পর সমস্ত বাটী (দেওয়াল ও ছাদের নিম্নতল পর্য্যন্ত) ফেনিল্ (Phenyle) দ্বারা ধৌত করিয়া চূণকাম করিয়া লওয়া উচিত।

বাটীর নিকটে দুই চারিটী ছোট গাছ এবং ফুল গাছ থাকিলে লাভ ব্যতীত ক্ষতি নাই—কিন্তু বেশী গাছপালা বা কোন বৃহৎ বৃক্ষ বাটীর নিকটে থাকিলে বায়ু-সঞ্চালন ও আলোক-প্রবেশের ব্যাঘাত হয় এবং অনেক সময়ে ছোট গাছপালার জন্য মশকের উপদ্রব হইয়া থাকে। এ বিষয়ে সবিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত।

মাটীর ঘর নির্ম্মাণ করিতে হইলে প্রত্যেক গৃহে অধিক সংখ্যক বায়ুপথ রাখা এবং সেগুলি পরস্পর ঋজু হওয়া উচিত। জানালাগুলি উচ্চতায় ও প্রস্থে তিন ফিটের কম হওয়া উচিত নহে। মাটীর গৃহে অধিক সংখ্যক বায়ুপথ না থাকিলে প্রচুর পরিমাণ আলোক ও বায়ুর অভাবে গৃহ সর্ব্বদা আর্দ্র থাকে। মেঝে চতুর্দ্দিকের ভূমি হইতে যথেষ্ট উচ্চ হওয়া উচিত এবং সিমেন্ট্ দ্বারা "পাকা" করিয়া লইলেই ভাল হয়। যদি মাটীর মেঝে হয়, তাহা হইলে মধ্যে মধ্যে উহা হইতে কয়েক ইঞ্চি মাটী তুলিয়া লইয়া নূতন মাটী দিয়া পিটিয়া তদুপরি "লেপ" দেওয়া উচিত। অধিকাংশ স্থলে "গোবর মাটীর" লেপ্ দেওয়া হইয়া থাকে, ইহাতে কোন ক্ষতি হইতে দেখা যায় না। তবে পাশ্চাত্য স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ্‌গণ গোবরের পক্ষপাতী নহেন; তাঁহারা বলেন যে মেঝেয় গোবর দিলে মেঝে ভিজা থাকে এবং গৃহে কীটাদির উপদ্রব হয়। আমি পল্লীগ্রামবাসী অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছি যে মেঝেয় গোবর মাটীর লেপ দিলে জমী ভিজা থাকেনা এবং কীটাদিরও উপদ্রব হয় না। তাঁহারা আরো বলেন যে গোবরের লেপ্ দ্বারা "লোণা" নিবারিত হইয়া থাকে। গৃহের "চাল" একটু উচ্চ হওয়া উচিত, নহিলে বায়ু-সঞ্চালনের ব্যাঘাত হয়। বিশেষতঃ গৃহের ছাদ বা "চাল" নীচু হইলে গ্রীষ্মকালে বেশী গরম এবং শীত কালে বেশী শীতল হয়। গৃহের দেওয়ালগুলি চূণকাম করা উচিত এবং মধ্যে মধ্যে চূণকাম বদলান কর্ত্তব্য। গৃহের "চাল" উচ্চ হইলে এবং চতুঃপার্শ্বে প্রশস্ত "দাওয়া" রাখিলে গৃহগুলি বেশ সুশীতল থাকে। বাটীর চতুঃপার্শ্বের জমীতে যাহাতে আবর্জ্জনা ও মলিন জল সঞ্চিত না হইতে পারে (কারণ যে কোন স্থানে জল বদ্ধ থাকিলেই গৃহ আর্দ্র হইবে এবং সেই স্থানে মশকের প্রাদুর্ভাব হইবে), এবং বৃষ্টির জল ভূমির মধ্যে শোষিত না হইয়া যাহাতে সহজে বাটী হইতে দূরে নিকাশ হইয়া যাইতে পারে, তাহার সুব্যবস্থা করা উচিত। মলমূত্রাদি পরিত্যাগ করিবার স্থান বাটী হইতে দূরে নির্ম্মাণ করিবে এবং যাহাতে ঐ সকল পরিত্যক্ত দূষিত পদার্থ শীঘ্র দূরে স্থানান্তরিত হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিবে। মল মূত্রাদি মাঠের মধ্যে গর্ত্ত কাটিয়া তন্মধ্যে প্রোথিত করা উচিত এবং যথেষ্ট পরিমাণ শুষ্ক মাটি দ্বারা উহা চাপা দেওয়া উচিত।

ভূমি নিতান্ত আর্দ্র হইলে কাষ্ঠ বা বাঁশের "মাচান" করিয়া তাহার উপর গৃহাদি নির্ম্মাণ করা উচিত।

কলিকাতায় বাঙ্গালীটোলায় প্রায় সকল বাটীর মধ্যে ড্রেণের পিট্ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা। বাটীর মধ্যে সর্ব্বত্র "পাকা" নর্দ্দামা (Surface drain) করিয়া সেগুলিকে বাটীর বাহিরে ড্রেণের সহিত সংযুক্ত করা উচিত। বাটীর মধ্যে ড্রেণের পিট্ থাকিলে উহা হইতে দুর্গন্ধময় বাষ্প উত্থিত হইয়া গৃহস্থিত বায়ুকে সর্ব্বদা অপরিষ্কৃত করে এবং উহা হইতে নানাবিধ রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে সুবৃহৎ অট্টালিকাই হউক আর ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরই হউক, উহার অভ্যন্তর ও বহিঃপ্রদেশ সর্ব্বদা শুষ্ক ও পরিষ্কার রাখিবার চেষ্টা করিবে। যে গৃহগুলি সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয় না, সেগুলিও প্রত্যহ কয়েক ঘণ্টা কাল খুলিয়া রাখিবে। গৃহের কোন স্থানে বা কোন আসবাবের উপর ধূলা জমিতে দিবে না, অনাবশ্যক কাঠ কুটরা, ভাঙ্গা বোতল, টিন্ বা মাটীর বাসন, পুরাতন বালিস, বিছানা বা কাগজ পত্রাদি বাটীর কোন স্থানে সঞ্চিত হইতে দিবে না; ইহাতে ইঁদুর, বিছা, মাকড়সা ও মশার বাসগৃহের মধ্যে আশ্রয় লইবার বড় সুবিধা হয়। আবশ্যক না থাকিলে ঐ সকল অব্যবহার্য্য পদার্থ পোড়াইয়া ফেলিবে। সর্ব্বদা জল ঢালিয়া বাড়ী ধুইলে বাড়ী বড় স্যাঁৎসেতে হয়, ইহাতে বাটীর ছেলেপুলের সর্দ্দি কাশী সর্ব্বদা লাগিয়া থাকে। ভিজা কাপড় দিয়া গৃহের মেঝে মুছিয়া ফেলিলে উহা শুকাইতে দেরী হয় না। বাটীর চতুঃপার্শ্বে "আগাছা" জন্মিলে তাহা তৎক্ষণাৎ কাটিয়া ফেলিবে, এবং বাটীর আবর্জ্জনা সমূহ এক স্থানে জমা করিয়া "ময়লা"র গাড়ী আসিবামাত্র তাহা স্থানান্তরিত করিবে। বাটীর মধ্যে যেখানে সেখানে থুথু ফেলিবে না; থুথু ফেলিবার জন্য দুই এক স্থানে নির্দ্দিষ্ট পাত্র রাখিয়া দিবে। এক কথায় বাটীখানিকে ছবিখানির মত করিয়া রাখিবে; ইহাতে নিজের চিত্ত এবং যাঁহারা বাটীতে শুভাগমন করিবেন, তাঁহাদেরও চিত্ত সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকিবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচুনীলাল বসু

কাল বৈশাখী

নটরাজ, সাজিলে কি তাণ্ডব নর্ত্তনে?
আন্দোলিয়া দ্রুমদল, গম্ভীর গর্জ্জনে
বাজাইয়া প্রলয় পিণাক ঝটিকার?
ওড়ে ধূলি, ঘোরে পত্র; ছিন্ন লতিকার
প্রাণপণ আগ্রহের একান্ত বন্ধন;
জ্বালামুখী বিদ্যুতের অসহ্য দহন,
পাংশু পুঞ্জীভূত মেঘে আচ্ছন্ন অম্বর!

ভয়ার্ত্ত বসুধা-বক্ষে কাঁপিছে ভূধর;
উঠিতেছে পড়িতেছে উত্তাল স্পন্দনে
সিন্ধু বক্ষে লক্ষ ঊর্ম্মি ব্যাকুল ক্রন্দনে
তোমার চরণ বেষ্টি ভুজঙ্গের মত;
উন্নত অশ্বত্থশাখা জটা সমুদ্ধত,
জাগিছে ঈশান কোণে রক্ত ভয়ঙ্কর
তোমার ললাট দীপ্তি ওগো দিগম্বর!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

বৃন্দাবন

দিল্লী হইতে ট্রেণ ছাড়িল। কামরায় অনেক লোক—সব পাগড়ীবাহী। বাঙ্গালী কেবল আমরা চারিজন। একধারে বেঞ্চে বসিয়া দুইজন পেশোয়ারী মাংস ভক্ষণ করিতেছে—বোধ হয় পবিত্র মাংস! এবং তাহাদের বুকঢাকা দাড়ী বহিয়া বনমধ্যগত স্রোতস্বতীর মত অনবরত ঝোলের স্রোতঃ গড়াইতেছে। আমাদের একজন সঙ্গী সামনের আসনে বসিয়া অবাক হইয়া তাহাদের "রাক্ষুসে" আহার দেখিতেছিলেন। মিয়া সাহেবেরা ঠাহরাইয়া বসিলেন "এ ব্যক্তি ক্ষুধার্ত্ত—; ক্ষুধাতুরকে আহার দেওয়া ধর্ম্ম-সঙ্গত।" এখন, দুর্ভাগ্যবশতঃ সঙ্গীর মুখে দাড়ী ছিল। অতএব স্বজাতি ঠিক করিয়া সাদরে মিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া বসিলেন "আইয়ে"।

সঙ্গী ছিলেন পরম হিন্দু; "দুর্গা দুর্গা" বলিয়া কোঁচার আগা নাকে চাপিয়া ধরিয়া তিনি দশহাত তফাতে গিয়া বসিলেন।

আমিও মুখ ফিরাইয়া বাহিরের দিকে চাহিলাম। গাড়ী তখন ইন্দ্রপ্রস্থের শ্মশান মধ্য দিয়া ছুটিয়াছে; শ্মশানই বটে—মহা শ্মশান! যে শ্মশানে সভ্যতার পরে সভ্যতা, পুরাতনের পরে নূতন, রাজ্যের পরে রাজ্য, সম্রাটের পরে সম্রাট পুড়িয়া ছাই হইয়াছে! ঐ যমুনাস্তম্ভ—ঐ ভাঙ্গা প্রাসাদ - ঐ ধ্বংসধ্বস্ত প্রাচীন দুর্গ—এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইষ্টক-স্তূপ, ছাদশূন্য স্তম্ভশ্রেণী, জনশূন্য রাজপথ! ধূ-ধূ-ধূ-ধূ—যে দিকে চাও - সব ধূ-ধূ-ধূ-ধূ করিতেছে—শুধু উপর দিয়া হু-হু করিয়া ধূলা উড়াইয়া ঝোড়ো হাওয়া রহিয়া রহিয়া বহিয়া যাইতেছে—যেন বলিতেছে,—কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে, কোথায় ভীষ্ম, কোথায় যুধিষ্ঠির, কোথায় দিলীপ, কোথায় পৃথ্বী—কোথায় কুন্তী, কোথায় গান্ধারী, কোথায় দ্রৌপদী, কোথায় সংযুক্তা? কে আছে? কে উত্তর দিবে? শ্মশানই বটে! এ দৃশ্যে তোমার চোখে কি জল আসে না? আমার ত' আসে।

মথুরায় নামিয়া একখানা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া বৃন্দাবনের দিকে চলিলাম। পথের দুধারে খোলা মাঠ - দূরে বন। আশে পাশে হরিণেরা খেলা করিতেছে। গাছের ডালে ময়ূর। মাঝে মাঝে ধনীদের বাগান বাড়ী।

মথুরা হইতে বৃন্দাবন ৬ মাইল উত্তরে। জনসংখ্যা ২৫০০০ হাজারের কিছু কম বেশী হইবে। সহরটি ছোটখাটো। বাড়ীঘর প্রায় পাথরের। রাস্তাগুলি ধূলাভরা। এখানে ধূলাকে ধূলা বলিবার যো নাই। বলিয়াছ কি বৈষ্ণব বাবাজীর কাছে ধমক খাইয়াছ। "পাষণ্ড! এ কি ধূলা—রজঃ রজঃ—চরণরজঃ!" তথাস্ত। কলিকাতার এক বৈষ্ণবকে জানি। তাঁদের কেহ ছানা খান না। তাহা হইলে জীবহিংসা হইবে। কারণ, ছানা মানে পাখীর ছানা, বিড়াল ছানা, কুকুর ছানা! অত্যুক্তি করিতেছি না—সত্য কথা।

বাঙ্গালার প্রিয় দেবতা নন্দদুলালের লীলা-নিকেতন বলিয়া এবং ভক্তচূড়ামণি চৈতন্য দেবের স্মৃতিপূত বলিয়া, বৃন্দাবন, প্রতি

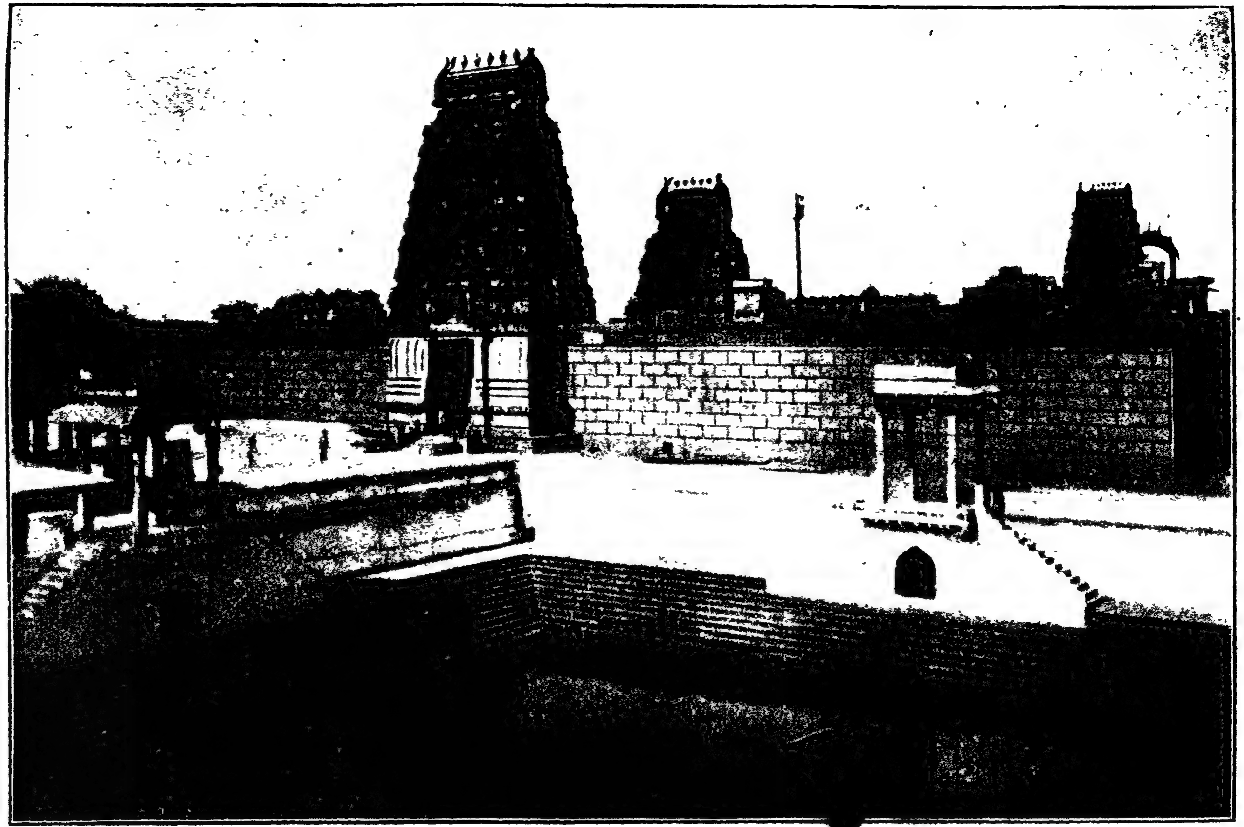

রঙ্গজীর মন্দির (শেঠের বাড়ী)

বঙ্গবাসীর হৃদয়কে প্রেমের বাঁধনে আকর্ষণ করে। তাই এখানে বাঙ্গালীর সংখ্যা অল্প নয়। এমন কি অনেক সময়ে মনে হয়, আমরা বুঝি বাঙ্গালার শ্যামল কোলেই বসিয়া আছি।

মন্দির এখানে পাড়ায় পাড়ায়—গুণিয়া ওঠা ভার। প্রাচীন ও প্রধান মন্দির চারিটি। গোবিন্দদেব, মদনমোহন, গোপীনাথ ও যুগলকিশোর। আধুনিক মন্দিরও অনেক আছে। যেমন, শেঠেদের মন্দির, মদনমোহনের নূতন মন্দির ও ছাতুবাবুর মন্দির প্রভৃতি।

শেঠেদের মন্দিরটি আজকাল খুব প্রসিদ্ধ। ইহা ১৮৪৫—৫১ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হইয়াছে। অপর নাম, রণজীর মন্দির। নির্ম্মাণব্যয় ২৫ লক্ষ টাকা।

মন্দিরের চারিপাশ খুব উঁচু করিয়া প্রাচীর দিয়া ঘেরা—সিংহদ্বারও বেশ জাঁকালো। ভিতরে প্রথমে বাঁধানো প্রাঙ্গণ—মূলমন্দিরের চারিদিক বেষ্টন করিয়াছে। তারপর আবার প্রাচীর। এমন তিনটি প্রাচীর। প্রধান দেবালয়ের সম্মুখে একটি বাঁধানো জলাশয়। তার বাম পার্শ্বে প্রবেশদ্বার। বাহিরের প্রাচীর ২১০ফুট উচ্চ। বাহিরের বেষ্টন কিঞ্চিদধিক ২৬১৮ ফুট। মন্দিরের নির্ম্মাতার নাম, শেঠ লক্ষ্মীচন্দ।

দ্বারের সামনে জুতা খুলিয়া ভিতরে যাইবার উপক্রম করিতেছি—এমন সময়ে দ্বারবান আসিয়া আক্রমণ করিল; বলিল, "পকেটে দেশলাই কি সিগারেট আছে? থাকিলে, বাহিরে রাখিয়া যান।"

পকেটে দেশলাই কি সিগারেট থাকিলে ঠাকুর যে অপবিত্র হইয়া যান, তা এই প্রথম শুনিলাম।

যা হোক,—ভিতরে ত ঢুকিয়া পড়া গেল। ঢুকিয়াই একটি উঠান—তাহার উপরে এক স্বর্ণমণ্ডিত সু-উচ্চ বরুণস্তম্ভ। লোকে ইহাকে "সোনার তালগাছ" বলে। প্রধান মন্দিরের সামনেই দালান—মর্ম্মরবিচিত্র। চারিদিকে চকমিলানো ঘর। ছাদতলে ভাল ভাল ঝাড় লণ্ঠন। আসল কথা, মন্দিরে বড়মানুষী আছে খুব। শিল্পীর নির্ম্মাণকৌশল দেখিলাম, সিংহদ্বারগুলিতে। মন্দিরের প্রধান দ্রষ্টব্য, সুগঠিত ও সুন্দর সিংহদ্বার।

হঠাৎ গোলমাল শুনিয়া দেখি, মন্দিরের দেবতা বাহকস্কন্ধে সিংহাসনে বসিয়া মন্দির পরিক্রমণ করিতেছেন। জিজ্ঞাসার উত্তরে একজন বলিল "ঠাকুর হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছেন!" হায়! মূর্খ মানুষের হাতে পড়িয়া সর্ব্বভূতব্যাপী ভগবানের একি শোচনীয় পরিণাম! আমি পৌত্তলিকতার নিন্দা করিতেছি না। কিন্তু পৌত্তলিকতারও যে গৌরব আছে, স্বেচ্ছাচার মানুষের খেয়ালে পড়িয়া তাহা যদি লুপ্ত হয়, তাহা হইলে দুঃখ না করিয়া উপায় নাই।

বৃন্দাবনের প্রধান দর্শনীয় গোবিন্দদেবের মন্দির।

প্রাচীন হিন্দুশিল্পীর হাতে তৈয়ারী এ শ্রেণীর এমন মন্দির, ভারতের আর কোথাও নাই। মন্দিরটি গ্রীক cross এর আকারে এবং রক্তপ্রস্তরবিরচিত। ইহার গঠন ও পরিমাপপ্রণালী এমন সুন্দর ও নিখুঁত যে, দর্শনমাত্র চিত্তহরণ করে। মিঃ ফার্গুসান, তাঁহার Indian Architectureএ বলিয়াছেন

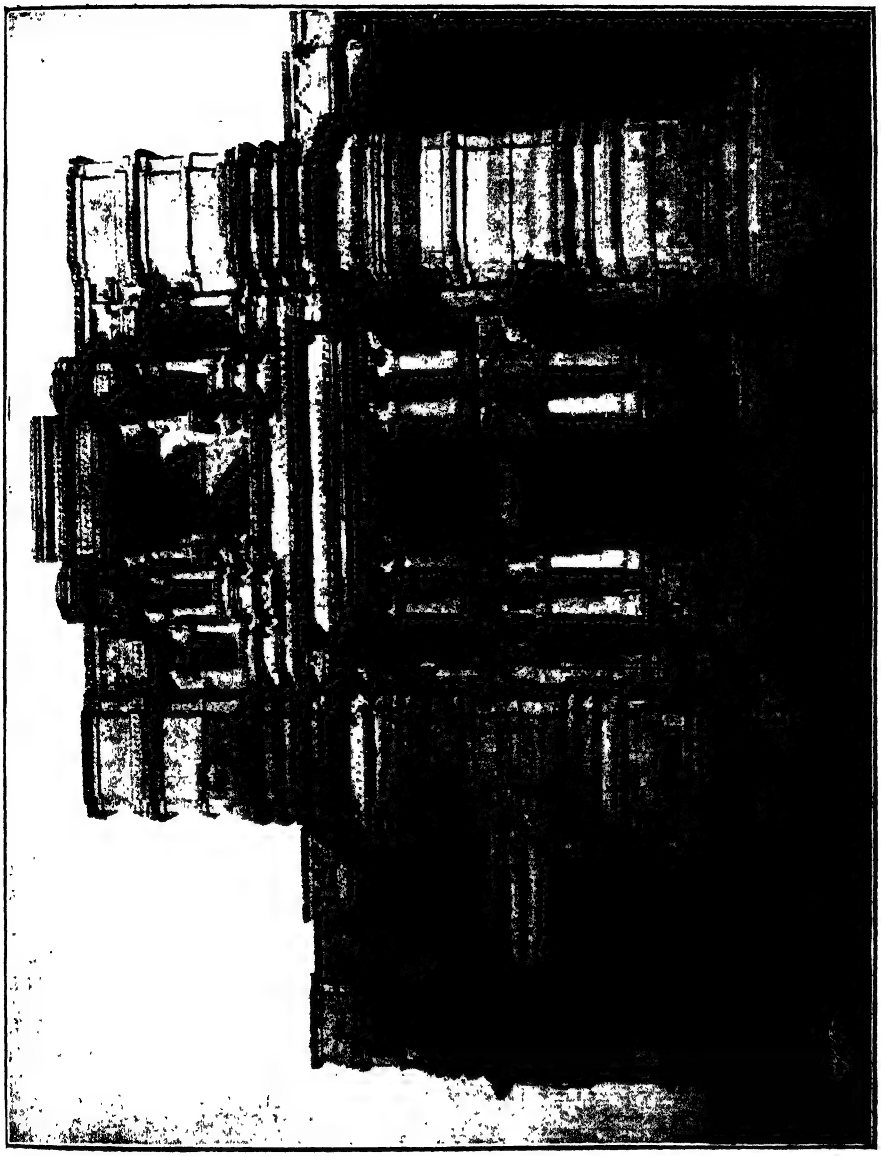

"ইহা ভারতের একটী প্রাণরঞ্জক মন্দির। এ দেশে এই একটী মাত্র সুচারু মন্দির দেখিলাম, যাহা হইতে আমাদের দেশের স্থপতিগণ কেন কোন সংকেত ধার করিতে পারে।"

মন্দিরটী দেখিলেই মনে হয়, ইহা অসম্পূর্ণ। শুনিলাম, আগে মন্দিরচূড়া এত উচ্চ ছিল যে, তাহার আলোক আগ্রার বাদশাহের প্রাসাদ হইতেও দেখা যাইত। আওরঙ্গজেব সেই আলোক দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন কোথা হইতে আলো আসিতেছে ?" উত্তরে শুনিলেন, আলোক গোবিন্দদেবের মন্দিরের। আওরঙ্গজেব ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "কি! আমার প্রাসাদে পৌত্তলিকের আলো আসে?" সিংহাসনে বসিয়া গোবিন্দজী প্রমাদ গণিলেন। এবং দুদিন পরে তাঁর মন্দিরের উচ্চতাগৌরব বিধর্ম্মীর হস্তে খর্ব্বীকৃত হইল। গল্পটি কতটা সত্য, তাহা ঐতিহাসিকের আলোচ্য।

মন্দিরের দেওয়াল চওড়ায় দশ ফুট করিয়া। ভিতরের দৃশ্য বিলাতের সেণ্টপল ক্যাথাড্রেলের মত। ইহার চক্রমধ্য (nave) দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ১০০ ফুট। মন্দির, চতুর্বাহু--সকল দিক সূক্ষ্মাগ্র খিলান-করা ছাদ দিয়া আচ্ছাদিত। মধ্যস্থ গৃহের উপরি ভাগে একটী সুনির্ম্মিত ও সুদর্শন গম্বুজ।

মন্দিরের ভিতরে যাইবার জন্য তিনদিকেই দীর্ঘ সোপান শ্রেণী আছে। পশ্চিম দিকে, দুটি তাকের মাঝে একটী দ্বারপথ। দ্বারের উপরে সমচতুরস্র ক্ষেত্র। শিলারচিত চাঁদোয়ার উপরে নেত্রশোভন ভাস্করকরনৈপুণ্য আছে। এই দ্বারপথ দিয়া সঙ্গীতগৃহে (Choir) যাওয়া যায়। এ গৃহের পরিমাপ ২০ ফুট হইবে। সামনেই গর্ভগৃহ—ইহার দুপাশে দুটি ছোট ঘর—এ ঘরগুলিও ২০ ফুট করিয়া। উপরে খিলানকরা গম্বুজ।

এই মন্দিরের পরিকল্পনা দেখিয়া মনে হয়, ইহাতে পাঁচটি Tower ছিল। একটী মধ্যস্থ গম্বুজের উপরে এবং অপর চারিটি যথাক্রমে সঙ্গীতগৃহ, গর্ভ-গৃহ এবং পার্শ্বস্থ ভজনাগৃহ দুটির উপরে।

মন্দির-গাত্রে চারিদিকেই হিন্দুশিল্পসুলভ ব্রাকেট। এখানকার সুডৌল ও সুশ্রী ব্রাকেট গুলি যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন। আমাদের ধনী বাঙ্গালীরা যদি তাঁহাদের প্রাসাদোপম সৌধনির্ম্মাণকালে যথাস্থানে এমনি দুচারিটি ব্রাকেট বসাইয়া দেন, তাহা হইলে সে সকল অট্টালিকার শোভা যে খুবই চমৎকার হইবে, তা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি। আমি পশ্চিম ভারতের বড় বড় সহরে দেখিয়াছি—সেখানকার নেহাৎ সাদাসিধা বাড়ীগুলিতেও এই ধরণের ব্রাকেট দেওয়া হইয়াছে। ফলে, সেগুলি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

গোবিন্দদেবের মন্দির এখন বড়ই অযত্নে আছে। সকলে ঠাকুর আর পয়সা লইয়া এত ব্যস্ত যে বাড়ীর দিকে কেহ ফিরিয়া চাহিবার সময় পায় না। এদিকে ধূপ-ধূনা দিয়া দেবতার দিল্‌খোস করা হইতেছে, ওদিকে চামচিকা ও বাদুড়েরা যে চব্বিশ ঘণ্টাই গৃহতলে অনধিকার-প্রবেশপূর্ব্বক মলমূত্রাদির দুর্গন্ধে—ঠাকুর ত দূরের কথা—মানুষকেই বিপদগ্রস্ত করিয়া তুলিতেছে—সেদিকে কাহারও চোখ নাই!

মাঝে হইয়াছিল কি,—এক ব্যক্তি

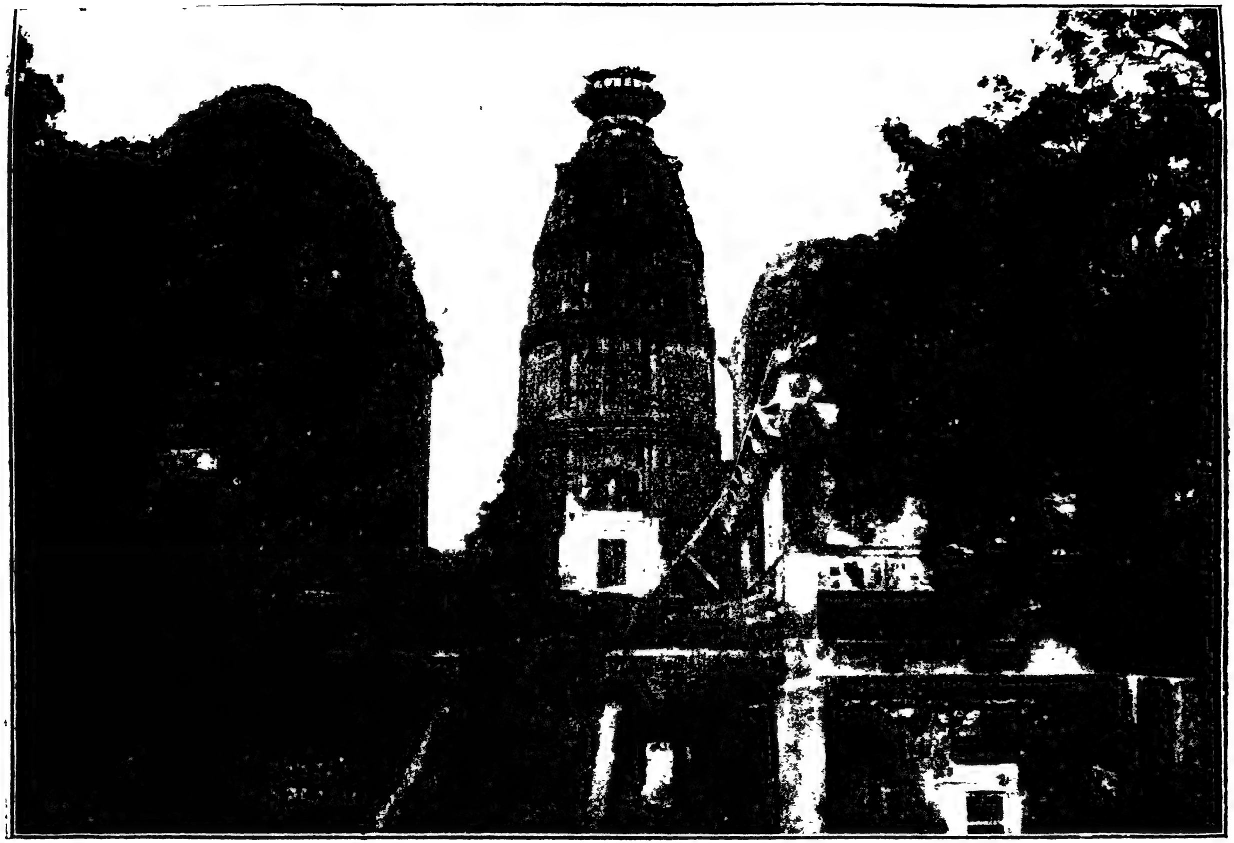

মদনমোহনজীর মন্দির

উৎসবের জন্য মনের মতন ঠাঁই না পাইয়া, এই মন্দিরে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। এবং আপনার সৌন্দর্য্যজ্ঞানের পরিচয় দিবার ও উৎসবটীকে জমকালো করিয়া তুলিবার জন্য, আচ্ছা করিয়া কলিচুণের প্রলেপ দিয়া এখানকার প্রাচীন রক্তপ্রস্তরের স্বাভাবিক সুষমা ঢাকিয়া দিয়াছিল! তার কাজে কেহই বাধা দেয় নাই! একটী গল্প মনে পড়িতেছে। কলিকাতার কোন ধনী মাড়োয়াবীর নবনির্ম্মিত বৈঠকখানার দেওয়ালে এক বিখ্যাত শিল্পী বসিয়া বসিয়া শিল্পসঙ্গত লতাপাতা অঙ্কন করে। কাজ শেষ হইলে গৃহকর্ত্তা আসিয়া সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন "হাঁ—সব ঠিক হয়েছে—কেবল একটী চিজ্ ছাড়া।" "কি হুজুব?" গৃহকর্ত্তা বলিলেন "হনুমানজী। ঐ লতাপাতাব মাঝখানে তুমি হনুমানজীকে এঁকে দাও নি কেন?"

মন্দিরে, সেবায়েৎগণের অত্যাচার বিষম। তারা চাঁদার খাতা খুলিয়া বসিয়া আছে—পয়সা না দিলে প্রবেশ নিষেধ।

লজ্জার কথা! দূর হইতে গোবিন্দদেবকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া বলিলাম "আমার প্রাণের কথা তুমি জান প্রভু! আমি ভাবের ঘরে চুরি করিতেছি না; যদি তুমি যথার্থ ভক্ততারণ হও, তবে হে ঠাকুর! হে ব্রজদুলাল! আমার মানসপূজা গ্রহণ কর।" আমি জানি, পয়সা দিই নাই বলিয়া প্রেমের দেবতা আমাকে আশীর্ব্বাদ করিতে ভুলিয়া যান নাই।

তারপর, মদনমোহনের প্রাচীন মন্দির। চক্রমধ্য ৫৭ ফুট। পশ্চিমদিকে সঙ্গীত-গৃহ—সমচতুরস্র—পরিমাপ, ২০ ফুট। সামনের দেবালয়ের পরিমাপও ঐ। পূর্ব্বদিকে দ্বারপথ। মন্দিরের উচ্চতা বড় জোর ২২ ফুট হইবে। ইহার খিলানকরা ছাদ আজ কালমহিমায় বিগত। সঙ্গীতগৃহেরও ঐ দশা। গর্ভগৃহগাত্রে একটী বক্ররেখাবিশিষ্ট সাদাসিধে অষ্টকৌণিক ক্ষেত্রের ক্রমসূক্ষ্ম বহিঃরেখা (Out line) চূড়ার দিকে উঠিয়া গিয়াছে। ডানদিকে আর একটী ঘর—তাহার শিল্পসৌভাগ্যের অভাব নাই। ইহার বহিঃভিত্তির সর্ব্বস্থলেই সালঙ্কৃত প্যানেল।

প্রকৃত মদনমোহন বিগ্রহ এখন কারাউলিতে। রাজা গোপাল সিংহ (১৭২৫—১৭৫৭) একটী নূতন দেবাগারও নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। বুড়নিবাসী নন্দকুমাব মদনমোহনের বিদ্যমান মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। (১৮২১ খৃঃ অব্দ), গোপীনাথের মন্দিবে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিবার মত কিছুই নাই। ইহার পরিমাপ ও আকৃতি মদনমোহনেরই মত। ইহাও ধ্বংসদশাগ্রস্ত। নির্ম্মাণাব্দ ১৫৪০।

কেশীঘাটের নিকটে যুগলকিশোরের মন্দির। ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। জাহাঙ্গীর তখন ভারত সম্রাট। উল্লেখযোগ্য কিছু নাই।

ব্রহ্মকুণ্ড ও গোবিন্দকুণ্ড সকল তীর্থযাত্রীই দর্শন করেন। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই এই কুণ্ডদ্বয় পবিত্রতাব জন্য প্রসিদ্ধ।

যমুনার পথে যাইতে আর একটী মন্দির দেখিলাম।

নীচের দেওয়ালে এবং উপরের বারান্দায় চমৎকার কারুকার্য্য—চোখ যেন জুড়াইয়া যায়। উপরের বারান্দায় থামের যায়গায়

যুগ্মতারা

অসিধার নখাঘাতে দিল্লীকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া শ্যেনপক্ষীর মত নাদির শাহ্ যেদিন হিন্দুস্থানের তখ্‌তেতাউস ছিনাইয়া লইয়া জয়ডঙ্কা বাজাইয়া চলিয়া গেলেন সেদিন অক্ষম বাদসাহ রঙ্গীলে মহম্মদশাহকে দিল্লীর জগৎ-বিখ্যাত দেওয়ানি আমে শূন্য রত্নবেদীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতে শুনিয়াছিল অনেকেই—

"—সামতে আমালে মা, ই সুবতে নাদির গিরফ্‌ত্"

কপাল ভাঙ্গিয়াছে, আমারই কর্ম্মফল নাদির মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে।

স্বর্গচ্যুত ইন্দ্রের ন্যায় হতভাগ্য সেই মহম্মদ শাহের কপালের দোষ দিয়াছিল অনেকেই এবং তাঁহারই কর্ম্মফল যে ফলিতেছে তাহাও বারবার বলিতে বাকি রাখিল না অনেকেই,—সালেবেগ ছাড়া। সালেবেগ ছিল বাদশাহের মুহুরী এবং চিত্রকর। গীতানুরাগী বাদশাহ সারাদিন ধরিয়া যে সকল গান রচনা করিতেন সেগুলিকে স্বর্ণাক্ষরে সাজাইয়া বিচিত্র চিত্রে ফুটাইয়া বাদশাহের কুতুবখানায় ধরিয়া দেওয়াই তাহার কায ছিল। সে ছিল রঙ্গীলে মহম্মদ-শাহের 'জর্‌রী কলম'—স্বর্ণ লেখনী।

আমদরবারের মণি ভিত্তি আলোকিত করিয়া সোনার অক্ষর জ্বলজ্বল করিতেছে "ভূস্বর্গ যদি কোথাও থাকে তো এইখানে এইখানে"। ঠিক তাহারই নিম্নে হৃতসর্ব্বস্ব মহম্মদ শাহ এই ছবিটা সালেবেগের প্রাণে তীরের মত আসিয়া বিঁধিতে বিলম্ব ঘটে নাই সুতরাং যে সময়ে আর সকলে অদৃষ্টের ফের লইয়া ব্যস্ত সেই সময়ে কথামাত্র না বলিয়া নির্ব্বাক বাদশাহকে যথারীতি কুর্ণিশ করিয়া নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সে দরবার হইতে চলিয়া আসিল ও বাড়ী আসিয়া একটুকরা কাগজে সেইদিনের ছবিটা আর সেই ছবির নীচে মহম্মদ শাহের কাতর অর্দ্ধোক্তিটুকুও লিখিয়া নিজের রং তুলি একখানি রুটী এক ছুরি গুছাইয়া লইয়া অবিলম্বে সালেবেগ দিল্লী ছাড়িয়া কাবুলের পথ ধরিল। সালেবেগের ঘরে এমন কেহ ছিল না যে মহম্মদ শাহের স্বর্ণ লেখনীর খবরদারি করে,—না বিবি না বেটী। সঙ্গীর মধ্যে ছিল এক পোষা বুল্‌বুল্; খাঁচা খুলিয়া দিতেই একদিকে সে উড়িয়া পালাইল। পরদিন কলমের সন্ধানে লোকের উপর লোক আসিয়া যখন বাদশাহকে গিয়া শূন্য খাঁচা ও খালি ঘরের সংবাদ দিল; কলমের কোন সন্ধানই দিল না, তখন মহম্মদ শাহ বড় দুঃখেই বলিয়া উঠিলেন—

"হায় ব্যথিতের আর্ত্তি দুঃখের নিবেদন লিখিয়া প্রচার করিবার উপায় পর্য্যন্ত রহিল না আজ অবধি মনের দুঃখ মনেই থাক প্রকাশে কায নাই।"

* * *

চতুরঙ্গ বাহিনী চলিয়াছে, জয়দুন্দুভি বাজাইয়া নাদির চলিয়াছে, মরুদের মরুভূমির উপর দিয়া খর রৌদ্রের ভিতর দিয়া অসূর্য্যম্পশ্যা রমণীর মত মোগল বাদশাহের রমণীয় সুখশয্যা ময়ূর সিংহাসন চলিয়াছে; আর চলিয়াছে সেই সিংহাসন স্কন্ধে বহিয়া জর্‌রী কলম সালেবেগ সিপাহীর ছদ্মবেশে। অদূরে খর্জ্জুর বনের স্নিগ্ধ ছায়ায় রোজা ইমাম

মুসিরেজা ; আরো দূরে মস্‌হুদের সুদৃঢ় কেল্লা। নাদিরি ফৌজ শাহার হুকুমে তখ্‌তে তাউস ইমাম রৌজায় উপঢৌকন দিয়া কেল্লায় প্রবেশ করিল। বহু অশ্রুপাত বহু রক্তপাতে কলঙ্কিত ময়ূর সিংহাসন পবিত্র মোকবারায় উপহার দিয়া আপনাকে অক্ষয় স্বর্গের অধিকারী জানিয়া নাদির পরম সুখে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন কিন্তু এবার নাদিরি হুকুম তামিল হইল না, মোক্‌বারা হইতে ময়ূর সিংহাসন কে জানে কে উপর্য্যুপরি তিন রাত্রি টানিয়া ফেলিতে লাগিল। চতুর্থ দিনে ক্রোধান্ধ নাদির তলোয়ার খুলিয়া ইমামের রৌজার সম্মুখে সদর্পে দাঁড়াইয়া বারবার বলিতে লাগিলেন "রজা অজমন্ জঙ্গমি ক্ষাহদ্" যুদ্ধং দেহি যুদ্ধং দেহি! প্রতিবারেই ইমাম মুসিরেজর শূন্য রৌজা হইতে প্রতিধ্বনি আসিল "অজমন্ জঙ্গমি ক্ষাহদ্ জঙ্গমি ক্ষাহদ্"। সত্য সত্যই সেই রাত্রে সুখসুপ্ত নাদিরের নিকট যুদ্ধের আহ্বান পৌঁছিল এবং তাহার জীবনযবনিকা শোণিতাক্ত করিয়া ঘাতকের তীক্ষ্ণ ছুরি তাহার জীবন-নাট্যের শেষ অঙ্কে ভীষণ অঙ্কপাত করিয়া গেল।

* * *

গ্রীষ্মের সন্ধ্যা। যমুনার উপর দিয়া দক্ষিণবায়ু বহিতেছে—রঙ্গমহালের সুপ্রশস্ত খোলা ছাদের উপরে সুন্দরী কাহারিঁয়াগণের স্কন্ধে সোনার তামদানে মহম্মদ শা সন্ধ্যাবায়ু সেবন করিয়া বেড়াইতেছেন। আকাশে দুইটি মাত্র তারা দুইখণ্ড কোহিনুরের মত জ্বলিতেছে, নিভিতেছে। ঘরে ঘরে তখনও প্রদীপ জ্বলে নাই। এই সময় তাতারী প্রহরিণী আসিয়া বাদশাহের হস্তে একখানি তসবীর দিয়া জানাইল—নাদির আর নাই; সালেবেগ এইমাত্র মস্‌হুদ হইতে সে সংবাদ লইয়া পৌঁছিয়াছে এবং বাদশাহের জন্য এই সামান্য উপহার হুজুর দরবারে দাখিল করিয়াছে। মহম্মদশা তসবীরখানি যত্নের সহিত উঠাইয়া লইলেন। তসবীরের এক পৃষ্ঠায় দেওয়ানী আমের দৃশ্য,—শূন্য সভায় হৃতসর্ব্বস্ব মোগল বাদশা! এই করুণ দৃশ্য ঘিরিয়া সোনার অক্ষর জ্বলজ্বল করিতেছে— 'সানতে আমালে মা ইস্তুরতে নাদির গ্রীফ্‌ত'। তসবীরের অন্য পৃষ্ঠায় নাদিরের রক্তাক্ত দেহের উপরে ছুরিকাহস্তে সালেবেগ আর সেই ছবি ঘিরিয়া রক্তের অক্ষর মাণিক্যের মত জ্বলিতেছে—

বয়েক্ গর্দ্দিসে চরখ্ নীলোক্ষরি
না নাদির বজা মুন্দ নে নাদরী।

সুনীল নীলাম্বুজের ন্যায় নীলাকাশ একটিবার মাত্র আবর্ত্তিত হইয়াছে কি না ইহারি মধ্যে নাদিরের সঙ্গে নাদিরি হুকুম পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে।

বাদশাহ যখন তসবির হইতে মুখ তুলিলেন তখন আকাশে কেবলমাত্র একটি তারা যমুনার জলে ছায়া ফেলিয়া ঝিক্ ঝিক্ করিতেছে।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শারীর স্বাস্থ্য-বিধান

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(১২)

বাসগৃহ

আমরা এই প্রবন্ধে বাসগৃহ মধ্যে আলোক-প্রবেশ, বায়ু-সঞ্চালন প্রভৃতি অন্যান্য আবশ্যকীয় বিষয়ের ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিব। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বাসগৃহ-নির্ম্মাণের সময়ে যাহাতে তন্মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে বায়ু ও আলোক প্রবেশ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে সবিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। নিম্ন বঙ্গদেশে বৎসরের অধিকাংশ সময়ে দক্ষিণ দিক্ হইতে বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে, এজন্য এপ্রদেশে বাসগৃহগুলি উত্তর-দক্ষিণমুখী হইলে ভাল হয় এবং যাহাতে বাটীর উত্তর ও দক্ষিণ দিকে খানিকটা খোলা জায়গা থাকে, তাহার বন্দোবস্ত করা উচিত। এইজন্য প্রতিবাসীর বাটীর দেওয়াল চাপিয়া গৃহ নিৰ্ম্মাণ করা নিতান্ত অসঙ্গত ব্যবস্থা। ইহাতে উভয়ের বাটীতেই বায়ু-সঞ্চালন ও আলোক-প্রবেশের পক্ষে যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতা সাধিত হয়।

আমরা বাটীর মধ্যে সচরাচর দুইটী অঙ্গনের ব্যবস্থা করিয়া তাহাদিগের চতুঃপার্শ্বে গৃহ নিৰ্ম্মাণ করিয়া থাকি। বাটীর চতুর্দ্দিকে মুক্তস্থান থাকিলে অঙ্গন দুইটী বায়ু-সঞ্চালনের পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করে। কিন্তু বাটীর চতুঃপার্শ্বে খোলা জায়গা না থাকিলে অঙ্গনের বায়ু বাহিরে পরিবাহিত হইবার, অথবা বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ুর সহিত যথোচিত পরিমাণে মিশ্রিত হইয়া পরিষ্কৃত হইবার, সুবিধা হয় না। বিশেষতঃ যদি অঙ্গন অল্পপরিসর হয় এবং চতুর্দ্দিকের গৃহগুলি দ্বিতল বা ত্রিতল উচ্চ হয়, তাহা হইলে অঙ্গনগুলি এক একটী গভীর কূপের ন্যায় অবস্থিত হইয়া গৃহস্থিত দূষিত বায়ুকে সহজে সঞ্চালিত হইয়া পরিষ্কৃত হইতে দেয় না। এরূপ চক্‌বন্দি বাটী কখনই স্বাস্থ্যকর হইতে পারে না। কলিকাতার জমী অতিশয় দুর্ম্মূল্য; এখানে বাটীর মধ্যে দুইটী অঙ্গন এবং বাটীর চতুর্দ্দিকে উপযুক্ত পরিমাণ খোলা জায়গা রাখা অনেকেরই পক্ষে সাধ্যাতীত হইয়া পড়ে। এরূপ স্থলে বাটীর মধ্যে অঙ্গনের বন্দোবস্ত না করিয়া যদি বাটীর চতুঃপার্শ্বে খানিকটা খোলা জায়গা রাখা যায় এবং একহারা অথবা দোহারা দ্বিতল বা ত্রিতল বাটী নিৰ্ম্মাণ করিয়া গৃহগুলির বায়ু-পথ সমূহ খোলা জায়গার উপর অবস্থিত হয়, তাহা হইলে কোন গৃহেই বায়ু বা আলোক প্রবেশের ব্যাঘাত ঘটে না। অল্প পরিসর স্থানের উপর যাঁহাদিগকে বাসগৃহ নিৰ্ম্মাণ করিতে হয়, তাঁহারা যদি পূর্ব্বাহ্ণে এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া গৃহ-নির্ম্মাণ-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাঁহারা যে অনেক অসুবিধার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

আমরা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বাস করি, সুতরাং বাধ্য হইয়া বৎসরের মধ্যে প্রায় নয় মাস কাল দিবাভাগে আমাদিগের বাস-গৃহের দরজা জানালা সমস্তই উন্মুক্ত রাখিতে হয়; এজন্য শীতপ্রধান দেশের ন্যায় গৃহ মধ্যে বায়ু সঞ্চালনের নিমিত্ত এদেশে কোনরূপ বায়ুসাধ্য ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আমাদের সংস্কার ও বাসগৃহ-নির্ম্মাণ প্রণালীর দোষে আমরা প্রকৃতিদত্ত অনায়াস-লভ্য আলোক ও বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের সুখ ভোগ হইতে অনেক সময়ে বঞ্চিত থাকি। বাস্তবিক কত লোক যে বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের অভাবে স্বাস্থ্যহীন ও কঠিন রোগগ্রস্ত হইয়া অকালে মৃত্যু মুখে পতিত হইতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। আমরা "ঠাণ্ডা" লাগিবার অমূলক আশঙ্কায় রাত্রিকালে অনেক সময়ে গৃহের তাবৎ বায়ু-পথ রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিয়া থাকি। সাধারণ লোকের ধারণা এই যে শীতল বায়ু সেবন করিলে উৎকট কাশ-রোগ উৎপন্ন হয়। এ বিশ্বাসটী সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক ও প্রভূত অনিষ্টের কারণ। অবশ্য "ঠাণ্ডা" লাগাইলে সর্দ্দি কাশি হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু বস্ত্র দ্বারা দেহ আবৃত থাকিলে, শয়ন গৃহে কেন, শীত বা বর্ষাকালে খোলা জায়গায় থাকিলেও "ঠাণ্ডা" লাগিবার সম্ভাবনা থাকে না। অধিকাংশ কাশরোগই কোন না কোনরূপ বীজাণু (Bacillus) দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। বহুজনসমাকীর্ণ স্থানের, অথবা যে গৃহে কোন সংক্রামক শ্বাসরোগগ্রস্ত ব্যক্তি বাস করে, সেই গৃহের, বায়ুর মধ্যে ঐ সকল রোগোৎপাদক বীজাণুর প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয় এবং ঐ বীজাণুমিশ্রিত দূষিত বায়ু নিশ্বাসের সহিত আমাদের ফুসফুসের (Lungs) অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া নানাবিধ উৎকট কাশরোগ উৎপাদন করে। অতএব দেখা যাইতেছে যে রুদ্ধ গৃহের দূষিত বায়ু সেবনের দ্বারাই ঐ সকল রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে, ঘর খোলা থাকিলে "ঠাণ্ডা" লাগিয়া কখনই ঐ সকল রোগ উৎপন্ন হয় না। সূর্য্যালোক এবং বায়ুস্থিত অক্সিজেন্ এই সকল বীজাণুর পরম শত্রু; গৃহমধ্যে রৌদ্র ও বায়ুপ্রবেশের যথেষ্ট সুবিধা থাকিলে বায়ুস্থিত রোগোৎপাদক বীজাণু শীঘ্র শীঘ্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সুতরাং দূষিত বায়ুর রোগজননশক্তি শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। ষ্টর্ণবর্গ বলিয়া গিয়াছেন যে রোগোৎপাদক বীজাণু নাশের জন্য রৌদ্র অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর এবং সহজ-লভ্য পদার্থ আর নাই—"One of the most potent and one of the cheapest agents for the destruction of pathogenic bacteria"। একটা সাধারণ ইংরাজী কথা প্রচলিত আছে যে, যে বাটীতে সূর্য্য প্রবেশ করে না, তাহার দ্বার চিকিৎসকের প্রবেশের জন্য সর্ব্বদা মুক্ত থাকে—"Where the sun does not enter, the Doctor does"—ইহা অতি সত্য কথা। সংক্রামক রোগগ্রস্ত ব্যক্তির গৃহমধ্যে আলোক-প্রবেশ ও বায়ু-সঞ্চালনের যথোচিত বন্দোবস্ত থাকিলে শুশ্রূষাকারী সুস্থ ব্যক্তির ঐ রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। যে ভীষণ প্লেগ্ রোগ আমাদের দেশে আবির্ভূত হইয়াছে, তাহারও বীজাণু বিশুদ্ধ বায়ু ও সূর্য্যালোক সংস্পর্শে শীঘ্র বিনষ্ট হইয়া যায়। ঐরূপ ভীষণ রোগের বীজ যে এত সহজে ও

সীতা ও সরমা

Indian Press, Allahabad.

কতগুলি পাষাণখচিত রমণী মূর্ত্তি—তনুকটি, উচ্চউরসা, ভূষণসুষমা! কেহ বাহুলতাদুটি ভঙ্গীভরে লীলায়িত করিয়া, চরণে চরণ দিয়া, কেহ বাদ্যবাদননিযুক্তা হইয়া এবং কেহ বা পীবরবক্ষপার্শ্বে সুকুমার শিশু লইয়া দাঁড়াইয়া। ছাদভার তাহাদের শিরঃপরে সমর্পিত। মূর্ত্তিগুলি শিল্পীর হাতে সুপরিকল্পিত সুগঠন না পাইলেও, নয়নরঞ্জক বটে। বারান্দার শিলা-প্রাচীর এবং ত্রিতলস্থ নহবৎখানায়, সুবিচিত্র জালিকাটা সূক্ষ্ম কার্য্য,—অতি শ্রীধর, অতি সুকুমার এবং পল্লববৎ পেলব। মন্দিরের প্রবেশপথের উপরে ও দুপাশেও পাথর ভেদিয়া লতাপাতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেখিলে মনে হয়, ঠিক যেন মালাচ্যুত এক রাশি মুক্তা কে এখানে ছড়াইয়া দিয়াছে! এই মন্দিরের নাম, শাহজাহাপুরের মন্দির। নির্ম্মাতা, লালা ব্রজকিশোর ক্ষত্রী। নির্ম্মাণাব্দ,—১৮৭০।

নিম্নতলের যে কারুকার্য্যের কথা আগে বলিয়াছি, তাহার দুর্দ্দশার কথা আর কি বলিব। সেই কারুকার্য্য বেমালুম ঢাকিয়া, ময়লা করিয়া ব্যাপারীরা নোংরা দোকান সাজাইয়াছে—অধিকাংশ কাজ দেখিবার যো নাই;—ঠিক যেন বানরের গলায় মুক্তার মালা—পাঁকের ভিতরে গোলাপের তোড়া! দু' এক টাকা ভাড়ার লোভে যদি মন্দিরের বর্ত্তমান অধিকারী এমন কাজ করিয়া থাকেন, তবে তিনি মন্দিরনির্ম্মাতা পূর্ব্বপুরুষের অভিশাপভাগী ত হইবেনই; পরন্তু, তাঁহার আরাধ্য রাধাবল্লভজীও তাঁকে ক্ষমা করিবেন না। আর বাস্তবিক, শিল্পের যুগ চলিয়া গিয়াছে—সৌন্দর্য্যের জন্য সে ব্যগ্র আগ্রহ আর নাই—পয়সার জন্য যত! পয়সা আর পয়সা আর পয়সা। তাজমহলের মত করিয়া দুনিয়ার কে আর কঠিন পাষাণে কোমল কবিতা লিখিবে? কেহ না—কেহ না!

যমুনার ধারে একটা বাঁধানো ছোট গাছ দেখিলাম—তার ডালে ডালে কতকগুলা ন্যাক্‌ড়া জড়ানো। সামনেই ঘাট। নাম, 'বস্ত্রহরণ ঘাট।' কুৎসিত (তা ভিন্ন আর কি বলিব?) কবিকল্পনাকে বাস্তব আকার দিয়া, মূর্খ ঠকাইয়া পাণ্ডারা বেশ দুপয়সা রোজগার করিতেছে। হা কৃষ্ণ! মানুষ তোমার কৃষ্ণ ললাটে কি কলঙ্কের কালি দিতে বাকি রাখিয়াছে? তোমার ক্রোধ কি ঝটিকারূপে আসিয়া এ তুচ্ছ তরু সমূলে উপাড়িয়া ফেলিতে পারে না?

যমুনার ধার এখানে প্রায় আগাগোড়া বাঁধানো। এত দীর্ঘ ঘাটের শ্রেণী ভারতে বোধ হয় আর কোথাও নাই। অনেক ঘাটের ভগ্নদশা—দেখিলেই বোঝা যায়, সেগুলি অনেককালের পুরাতন।

যমুনাও দূরে সরিয়া গিয়াছে। তাহার জলশূন্য গর্ভ ভরিয়া বড় বড় গাছ জন্মিয়াছে—দিক্‌চক্রবাল পর্য্যন্ত ধূ ধূ প্রান্তর। কিন্তু যমুনা বৃন্দাবনকে একেবারে ছাড়িতে পারে নাই—একদিকে এখনও সে প্রাচীন স্মৃতির তটে আসিয়া পুলকে উছলিয়া পড়িতেছে।

তখন চাঁদ উঠিয়াছে—সারা আকাশ ঝল্‌মলে। যমুনার কালো জলে আলো জ্বালিয়া ঢেউয়ের তালে তালে জ্যোৎস্না নাচিতেছে। ঘাটের উপরে বসিয়া কতকালের কথা মনে জাগিল! সেই কৃষ্ণ—সেই রাধা—সেই বাঁশী—যে বাঁশীতে যমুনায় উজান বহিত! সেযে কত

কথা! আমার এ বোবার স্বপ্ন কি করিয়া প্রকাশ করি বল! বাঙ্গলার কত কবিকে অমর করিয়াছে এই বাঁশী, আর ঐ যমুনা! সে বাঁশী আর নাই, সে যমুনা আর আছে কি?

কিন্তু সত্যই বাঁশী বাজিতেছিল—দূরে দূরে—বহু দূরে! বাতাস তার মৃদু সুরটিকে ভাসাইয়া আনিতেছিল।

"বাজিছে শ্যামের বাঁশী, আবার আবার লো!
চল লো রূপসী!
তুলে রাখ্ ব্রজবালা, তোর এ ফুলের ডালা,
রতন-আরসী!
বাঁশী কি বাজিছে হায়? বহিছে মলয় বায়,
হিল্লোলিয়া কেঁপে উঠে এ হিয়া-সরসী।"

মুরলী-গুঞ্জনে কবির গান স্মরণে আনিল।

ফিরিবার পথে, বৃন্দাবনের বাজারটা একবার ঘুরিয়া আসিলাম। বাজারে বিশেষ কিছু নূতনত্ব নাই। তবে খাবারের দোকানে দুধ-ঘি'র জিনিস বেশ শস্তা। দুধের নামে পুকুরের জল খাইয়া অথচ দ্বিগুণ অর্থব্যয় করিয়া কলিকাতার বাবুরা যখন এখানে আসেন, তখন আশ্চর্য্য হইয়া যান। আমার এক বন্ধু বৃন্দাবনের খাবারের কথা পাড়িলে, আকাশের দিকে তাকাইয়া ফোঁশ্ করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেন। এবং দীর্ঘশ্বাসটা অবিলম্বে যখন হ্রস্ব হইয়া আসিত, তখন হতাশভাবে গল্প শুনাইতেন, প্রাণ ভরি ও উদর 'পূর্ত্তি' করিয়া 'বৃন্দাবনী' রাবড়ী খাইয়া তার কি ভয়ানক পেটের ব্যামো হইয়াছিল! গল্পের উপসংহার—"হোক্ ব্যামো! যায় প্রাণ ভিক্ষে মেগে খাব—সেকি যেমন-তেমন রাবড়ী? চারটি গণ্ডায় একটী সের! ওরে বাস্‌রে! ভাব্‌লে আর জ্ঞান থাকে না"—ইত্যাদি।

পথে আরও দেখিলাম, জানুচুম্বিত ডাগর ভুঁড়ি নাচাইয়া, খোলকরতাল বাজাইয়া চির-পরিচিত হৃষ্টপুষ্ট বৈষ্ণব বাবাজীরা গান ধরিয়াছেন

"আমার গৌর নাচে—
নদীয়ার মাঝে আমার গৌর নাচে—"

সে গানে ভক্তিরস আদৌ নাই। বীভৎসরস যথেষ্ট। পাশেই গৌরের নৃত্য-কাহিনীর প্রতি কিছুমাত্র মনঃসংযোগ না করিয়া এক বিধবা বাঙ্গালিনী, একটী পশ্চিমা রমণীর সঙ্গে আকাশভেদী সাধা গলায় ঝগ্‌ড়া বাধাইয়া দিয়াছে।

বৃন্দাবনের মশা এক উল্লেখযোগ্য জীব। রাত্রে বিছানা হইতে টানিয়া শূন্যমার্গে উড়াইয়া লইয়া যাইবার যোগাড় আর কি! সর্ব্বাঙ্গে কাপড় মুড়ি দিয়া পড়িয়া রহিলাম। নাসিকাটি দম্ আটকাইবার ভয়ে খোলা ছিল। সকালে উঠিয়া আরসি লইয়া দেখি—বাপ্! নাকের ডগা বিষম ফুলিয়া ফুটবলের একটী ক্ষুদ্র সংস্করণ হইয়াছে।

সেদিন শাহজীর বাড়ী দেখিতে গেলাম। বেশ বাড়ী। টাকা খরচও তেমনি হইয়াছে। আগাগোড়া মর্ম্মরমণ্ডিত। সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষত্ব এবং নির্ম্মাণচাতুর্য্য দেখিলাম, বারান্দার স্তম্ভশ্রেণীতে। খুব বড় বড় আস্ত মার্ব্বেল পাথর ইস্ক্রুর প্যাঁচের মত করিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া কাটিয়া এই বহুব্যয়সম্ভব স্তম্ভগুলি তৈয়ারি হইয়াছে—দেখিলে দৃষ্টি আর ফিরাইতে ইচ্ছা করে না। আর একটী নূতনত্ব, দেওয়ালের ছবিতে। সাদা পাথরের জমিতে নানা স্বাভাবিক রংয়ের ছোট ছোট পাথরের টুক্‌রা বসাইয়া এই ছবির মূর্ত্তিগুলি ফুটাইয়া

তোলা হইয়াছে। আগ্রার তাজের গায়ে যেরূপ কৌশলে পাথরের চমৎকার ফল ও পাতা বসানো আছে—সেইরূপ। প্রভেদ এই, তাজমহলে স্থধু পুষ্প-পরিকল্পনা আর এখানে মানব মূর্ত্তির রচনা।

এই বাড়ীতে প্রস্তর মূর্ত্তিও আছে—কিন্তু সেগুলি শিল্পের অবমাননা মাত্র; তাহা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিল্পের এক অপূর্ব্ব খিচুড়ী।

শাহজীর গৃহদেবতার সমুখে বসিয়া এক বৃদ্ধ গায়ক সেতার বাজাইয়া গান গাহিতে-ছিলেন—বৃদ্ধ-কণ্ঠে তেমন স্বর সহজে শোনা যায় না। গায়ক ভৈরবীতে রাধিকার ঘুম ভাঙ্গাইতেছিলেন। "ওগো বাধা—ওগো প্যারী! বেলা হ'ল--রোদ উঠিল, তোমার পথপানে চাহিয়া যমুনা যে বিয়াকুল। উঠ, রাজনন্দিনী! জাগ! জাগ!—জলকে চল!" গানের এমনি ভাব। এবং রাগিনীর মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছনায়, প্রক্ষেপে, বিক্ষেপে, —অনুলোমে, বিলোমে,—তানে লয়ে গায়কের ভক্তিসরস প্রার্থনা যেন মূর্ত্তিমান হইয়া ফুটিয়া উঠিতে-ছিল।

যমুনায় স্নান করিতে গেলাম। কিন্তু জলে—ঘাটের তলাতেই হাজার হাজার কুর্ম্মাবতার—পা বাড়াইতেই ভরসা হয় না। জলে যেমন কচ্ছপ—ডাঙ্গায় তেমনি বানর!

আসিবার সময়ে ঘাটের পাশে একটী গাছ দেখিলাম। তার ডালে একটী পাখী বসিয়া আছে। আমি কাছে গেলাম। সে নড়িল না উড়িল না। দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। আরও কাছে গেলাম! আপনার নরম ছোট বুকে চঞ্চু স্থাপন করিয়া সে তেমনি ভাবে ঠায় বসিয়া রহিল। ভাবিলাম, পাখীটি বুঝি অন্ধ। তার পরেই গাছের তলায় দৃষ্টি পড়িল। দেখিলাম, সেখানে আর একটী পাখী, দুই ডানা বিস্তার করিয়া, মরিয়া, পড়িয়া রহিয়াছে। বোধ হয়, জীবিত পাখীটির প্রণয়ী কিংবা প্রণয়িনী। তখন তার স্থিরতার—উদাসীনতার কারণ বুঝিলাম। আর একবার তার দিকে চাহিলাম। আধ্-বোদা চোখে, মৌন ভাষায় সে যেন আমাকে বলিল "মারিবে? আমায় মারিয়া ফেল না। এ শূন্য জীবনে কাজ কি?" হা রে অজ্ঞান জীব! আমার চোখ ভরিয়া জল আসিল। তার পবিত্র শোকে বাধা দিলাম না; আস্তে আস্তে ফিরিয়া আসিলাম।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

বাগ্‌দত্তা *

গত বৎসরের সংক্ষিপ্ত সার

[উমাকান্ত সার্ব্বভৌম সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণপণ্ডিত। তাঁহার দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ ভক্তিনাথ পিতৃপদাঙ্কানুসরণ করিয়াছেন; কনিষ্ঠ শচীকান্ত ইংরাজী শিক্ষা করিয়া স্বতন্ত্রমার্গ অবলম্বনে ইচ্ছুক। ইহা ভিন্ন সে কবি, এবং আধুনিক অনেকেরই মত আস্তিক্যবুদ্ধিহীন। চাকদহগ্রামের শিবনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র মনীশ শচীকান্তের আবাল্যবন্ধু। একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে শচী আসিয়া জানাইল তাহাদের মেসের অল্পদূরে

* শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগীর প্রস্তাব মত গত বৎসরে প্রকাশিত বাগ্‌দত্তার এইরূপ সংক্ষিপ্তসার প্রদত্ত হইল।

নিখিলনাথ নামে একজন ডাক্তার আছেন। তিনি তাহাকে তাঁহার পরমাসুন্দরী ভগিনী দান করিতে চাহেন। নিখিলনাথ রাঢ়ীশ্রেণী শচীকান্ত বারেন্দ্র, মনীশ ইহা স্মরণ করাইয়া দিলে শচী হাসিয়া বলিল, সে এ বিবাহ দ্বারা সমাজ সংস্কার করিতে চাহে। মনীশ ধর্ম্মভীরু, গুরুজনবৎসল, সে বলিল প্রতারণাদ্বারা স্থায়ী ভাল কাজ হওয়া সম্ভব নয়, একথা পিতাকে জানাও। শচী রাজি হয় না,—সে পিতার প্রতি উপযুক্ত ভক্তি-প্রীতিসম্পন্ন ছিল না ভয়ের চক্ষেই কেবল তাঁহাকে দেখিত। কিন্তু কন্যা দেখিবার কালে সহসা এই গুপ্ত বিষয়টি প্রকাশ হইয়া পড়ে, তখন নিখিলনাথ বলেন, যদি শচীকান্তের পিতা এ বিবাহে সম্মতি দান করেন তবেই তিনি তাহাকে ভগিনী দান করিবেন। শচী বাড়ী ফিরিয়া মনীশের সাহায্যে পিতার নিকট হইতে রাঢ়ীবারেন্দ্রবিবাহের অনুমতি পত্র সংগ্রহ পূর্ব্বক কলিকাতায় গিয়া শুনিল, কয়দিন পূর্ব্বেই আকস্মিক বসন্ত রোগে নিখিলনাথের মৃত্যু হইয়াছে, তাহার বৃদ্ধা ঠাকুরমা ও ভগিনী কমল একজন আগন্তুক বৃদ্ধের সহিত কোথায় চলিয়া গিয়াছে কেহই জানে না। সেই অবধি সে তাহার সন্ধান পায় নাই কিন্তু নিজেকে সে তাহার সহিত বাগ্‌দত্ত বলিয়া মনে করিয়া রাখিল। ইহার অব্যবহিত পরেই তাহার বিধবা মাসী একা থাকিতে না পারিয়া সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট হইতে বোনপোটিকে নিজের কাছে আনিতে চাহিলেন। মাসী বড় লোক, জমাজমি ও টাকাকড়ি অনেক আছে, একমাত্র কন্যা কল্যাণী ধনীগৃহের একটিমাত্র বধূ, তাই শ্বশুর শাশুড়ি তাহাকে পিত্রালয়ে সর্ব্বদা পাঠাইতে অনিচ্ছুক। মাসী গিরিজাসুন্দরীর আর একটী অভিপ্রায় ছিল তাঁহার স্বামীর সম্পত্তির অর্দ্ধাংশের অধিকারিণী পিতৃমাতৃহীনা দেবরকন্যার সহিত শচীকান্তের বিবাহ দেওয়া।

মনীশ স্বধর্ম্মে দৃঢ় নিষ্ঠাবান ও স্বদেশের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন। সে সসম্মানে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া খুল্লতাতের অনুমতি গ্রহণান্তর শাস্ত্রজ্ঞানী পণ্ডিত উমাকান্তের নিকট সংস্কৃত দর্শনাদি শিক্ষা ও কনিষ্ঠ চপলমতি অনাবিষ্টচিত্ত সত্যেন্দ্রের অধ্যাপনা করিতে লাগিল। এই সঙ্গে দেশের দরিদ্র সন্তানগণকে শিক্ষা দানব্রতও সে গ্রহণ করিয়াছিল। সত্যেন্দ্রের জননী মনীশের খুড়িমা করুণাময়ী পুত্রকে মনীশের হস্তে দিয়াই নিশ্চিন্ত। মনীশও প্রাণপণে এ বিশ্বাস রক্ষায় সচেষ্ট। কিন্তু সত্যর পড়াশুনায় মন নাই। সে সার্ব্বভৌম মহাশয়ের অতি চঞ্চলা মাতৃহীনা পিতৃত্যক্তা দৌহিত্রী গৌরীর সহিত মাছ ধরিয়া ও ঘুড়ি উড়াইয়াই সময় কাটায়। এই সময়ে শচীকান্তের মাতা গঙ্গামণির আসন্নকাল আগত বুঝিয়া তাঁহাকে কাশীধামে আনয়ন করা হইল। শিবনারায়ণও সস্ত্রীক দীক্ষাগুরু সার্ব্বভৌম মহাশয়ের সঙ্গেই আসিয়াছিলেন। এই সময় একদিন অসিঘাটের নিকটে কমলা ও তাহার পিতামহীর সহিত করুণাময়ীর সাক্ষাৎ ঘটে, তিনি অনাথাদের প্রতি বিশেষ দয়াপরবশ হইয়া পরদিন আবার তাহাদের সন্ধান লইতে যান। ক্রমে জানা যায় কমলা তাঁহার বাল্যসখী নারায়ণীর কন্যা; উভয়ের পিত্রালয়ই ত্রিবেণীতে। করুণাময়ী উভয়কে গৃহে লইয়া আসেন। ক্রমশ আশ্রিতা কমলার রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া শিবনারায়ণ ও করুণাময়ী সার্ব্বভৌম মহাশয়ের অনুমতি গ্রহণান্তে তাহাকে মনীশের ভাবীবধূ রূপে অঙ্গীকার করিলেন, শোকতাপজীর্ণ কমলার পিতামহী এই শুভ সংবাদ লাভের অল্পদিন পরেই পরলোক গমন করিলেন। মণিকর্ণিকায় তাঁহার দেহ নীত হইলে শেষ মুহূর্ত্তে বিশ্বনাথ জাহ্নবী ও সার্ব্বভৌম মহাশয়কে সাক্ষী রাখিয়া তিনি মনীশের হস্তে কমলার হস্ত প্রদান করিলেন। মনীশও গ্রহণ করিলাম বলিয়া অঙ্গীকৃত হইল।

শিবনারায়ণ সপরিবারে দেশে ফিরিলে এত বড় অনূঢ়া কন্যা দেখিয়া গ্রামের লোকে বিস্মিত হইল। 'বিবাহের পূর্ব্বে বরকনে একসঙ্গে বাস করা লইয়া বিদ্রূপ করিতেও ছাড়িল না। মনীশ একথা শুনিতে পাইয়া সত্যকে সঙ্গে লইয়া তাহার পড়ার অছিলায় কলিকাতা চলিয়া গেল।

গৌরী বড় হইয়াছে এই বলিয়া তাহার বড়মামী স্বামীর প্রতি ঝঙ্কার ঝাড়িতেছিলেন, ভক্তিনাথ একদিন

বাহির হইয়া পড়িয়া বরের সন্ধান করিয়া ঘরে ফিরিলেন। বর গ্রামান্তরের; নবন্যায় পাঠ সাঙ্গ করিয়াছে, পিতার চতুষ্পাঠী আছে, অবস্থা মন্দ নয়। কিন্তু গৌরীর মাসী ও পালয়িত্রী বিন্ধ্যবাসিনীর এ সম্বন্ধ ঠিক মনঃপুতঃ হইল না। তিনি মুখে কিছু না বলিলেও গোপনে রোদন করিয়া মনের ব্যথা প্রশমিত করিতেন। সহসা একদিন পথের মধ্যে অতর্কিতভবে অপরিচিত পিতাপুত্রীতে সাক্ষাৎ ঘটিয়া গেল। পিতা ডাক্তার নন্দকিশোর দৈববিড়ম্বনায় নিজ সন্তানের মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া এযাবৎ নিশ্চিন্ত ছিলেন। বিদেশেই সুখহীন নির্ব্বান্ধব জীবন কাটিয়াছে এখন পেন্‌সন লইয়া কলিকাতায় আসিয়া বসিয়াছেন। বলাবাহুল্য এ বিবাহ বন্ধ হইয়া গেল, কন্যাকে লইয়া তিনি স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু গৌরী চির পরিচিতগণকে ছাড়িয়া সহসা চির অপরিচিতকে আপন করিতে পারিল না। পিতার অসীম স্নেহসমুদ্রের পরিমাপ করিবার মত বুদ্ধিশুদ্ধিও তাহার ছিল না।

এদিকে গিরিজাসুন্দরীর দেবরকন্যা বাসন্তীর সহিত শচীকান্তের বিবাহের কথা পাকা করিবার জন্য কন্যার মাতামহ গৃহে আসিলেন, সে কথা কল্যাণীর মুখে শুনিয়া শচীকান্ত বলিয়া বসিল সে বাসন্তীকে কিছুতেই বিবাহ করিতে পারিবে না। মাসীমা ক্রুদ্ধ হইলেন, তিরস্কার করিলেন কিন্তু সে অটল হইয়া রহিল। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে জানাইল বহুদিন হইতেই সে অন্যত্র বাক্‌দত্ত। ইহা শুনিয়া খাঁটি মানুষ গিরিজাসুন্দরী পিছাইয়া গেলেন। বলিলেন তা'হলে সে বাক্‌দান রক্ষা করিতে হইবে বৈ কি। বাসন্তীর মাতামহকে ছলে বিদায় দিলেন। শচী বুঝিল সে যখন বাসন্তীকে ত্যাগ করিল তখন এখানকার আশ্রয় শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। জীবিকার্জ্জনের চেষ্টায় সে কলিকাতায় আসিল এবং ফিরতিমুখে প্লাটফরমে সহসা বন্ধু মনীশের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তাহার অনুরোধে গৃহে আসিতে বাধ্য হইল। ট্রেণে মনীশ তাহাকে নিজের বাক্‌দানের কথা জানাইল। শচী প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিল যে মনীশের বাগ্দত্তার নামও কমলা। বাড়ী আসিয়া কমলাকে সহসা দেখিয়া তাহার চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইল। মনীশের কমলাই যে তাহারি কমলা ইহা সে বুঝিল।]

(২৬)

পরদিন যখন নন্দকিশোরের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি চোখ চাহিয়া প্রথমেই তাহার বিছানার নিকটে অপর শয্যার দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন। গৌরী তখনও ঘুমাইতেছে। হেমন্ত প্রভাতের স্নিগ্ধোজ্জ্বল তপনের দুএকটি রশ্মি সার্সির কাচের উপর পড়িয়া নাচিতেছে, গৃহের মাঝখানে গৌরীর ঘুমন্তমুখ স্বপ্নপুরীর রাজকন্যার মত মোহবিস্তার করিতেছিল। নন্দকিশোর নিঃশব্দে উঠিয়া বসিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, পাছে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এই ভয়ে বোধহয় নিশ্বাসও লইতেছিলেন না।

একটি উড়ন্ত পক্ষী বাতাসে ডানা মেলিয়া নদী পার হইতে হইতে তীক্ষ্ণ কর্কশ স্বরে ডাকিয়া উঠিল,সেই শব্দে চমকিয়া বালিকার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, সে ধীরে ধীরে চোখ মেলিল। যেন সেই মুদ্রিত নেত্রের ছায়াতলে বিশ্বের সমুদয় পুঞ্জীভূত আলোক এতদিন ঘুমাইয়াছিল, তাহাদের পূর্ণ বিকাশের সহিত রাত্রি শেষে তপনোদয়ের মত এখনি তাহা পুলকের স্পন্দনে জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে। কি একটা অননুভূত আবেগে তাহার বক্ষ দুরু দুরু করিতে লাগিল। গৌরী তাহাকে লক্ষ্য করে নাই সে ব্যস্ত ভাবে উঠিয়া আপনা আপনি কহিয়া উঠিল "মাসিমা ডেকে দেয়নি এতবেলা হয়ে গ্যাছে, এক্ষুণি বড় মামী বকবেন, কখন ফুল তুলব ঝাঁটপাটই বা দেব কখন! সহসা নন্দকিশোরের সহাস্য মুখের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সে স্থির হইয়া বসিল "ও হরি! সব ভুলে গেছলুম!" নন্দকিশোর তাহার মুখের ব্যস্তভাব সহসা অবসাদে পরিবর্ত্তিত প্রায় দেখিয়া তাড়াতাড়ি অন্যকথা পাড়িলেন "তুমি পড়তে জানো?" গৌরী মুখ না তুলিয়া ঘাড় নাড়িল "জানি"।

"কি পড়ো ?" "দ্বিতীয় ভাগ"।

"তুমি ফুল ভালবাস ?" এবার নত মুখ একটুখানি উঁচু হইল—"বাসি"।

"আমার বাড়ী অনেক ফুল গাছ আছে।"

"তোমার বাড়ী খুব বড় ?"

"খুব বড়, তাতে সন্ধ্যাবেলা কল টিপ্‌লেই আলো জ্বলে উঠে, তাকে গ্যাসের আলো বলে। কল খুললে বৃষ্টির জলের মত জল পড়ে তাকে বলে জলের কল।"

গৌরীর ভগ্নমনে ক্রমে একটু উৎসাহ জন্মিতেছিল, "সেখানে তাহলে নদী নেই ?" "আছে, সে অনেক দূরে, সেখানে আমরা বিকালে বেড়াতে যাবো, সেখানে গঙ্গা অনেক বড় বড় জাহাজ ষ্টীমার, নৌকায় ভর্ত্তি থাকে, তারে কত আলো জ্বলে।"

এবার কৌতূহলের জয় হইল। "কলকাতাটা চাকদার চাইতে অনেক বড় ?" তারপর পরস্পরে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। অধিক স্থলেই প্রৌঢ় শ্রোতা ও বালিকা বক্তা। কোথাও বা তিনি উত্তরদাতা ও গৌরী প্রশ্নকারিণী, সে প্রশ্নের সীমা ছিল না, সকল প্রশ্ন উত্তরেরও অপেক্ষা করিতেছিল না। দেখিতে দেখিতে অপরিচিত পিতাপুত্রীতে অনেক খানি কাছাকাছি আসিয়া পড়িলেন।

নন্দকিশোর তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে আজ সম্পূর্ণ নূতনতর আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন! চিরশুষ্ক শীর্ণ নদীতে অকস্মাৎ পাষাণ বক্ষবিদারী তীব্র জলস্রোত ছুটিয়া আসিতে থাকিলে তাহা যেমন নিজেকে সামলাইতে না পারিয়া উচ্ছসিত হইয়া উঠে তেমনি করিয়া তাঁহার এই নবভাবের বন্যা তাঁহাকে যেন ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছিল। মাতৃ-হৃদয়ের গভীর উন্মাদনাপূর্ণ স্নেহে তাঁহার সারাচিত্ত ভরিয়া ভরিয়া উঠিতেছে, অথচ এই অনাস্বাদিত সুখ কাঙ্গালের মত তাঁহাকে সঙ্কোচে পীড়িত করিতেও ছাড়িতেছিল না, ব্যাকুল আগ্রহ স্নেহপাত্রীকে বুকে টানিয়া লইতে মুহুর্মুহু বাহু প্রসারিত করিয়া ছুটিতে চাহিতেছিল, কিন্তু দারুণ সন্দেহ মনকে টানিয়া রাখিতেছে। প্রায় পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়সে যে অবলম্বনটি মিলিল সে শিশু প্রকৃতি তথাপি শিশু নহে। তাহাকে বাহুতে দোলাইয়া বুকে চাপিয়া কোলের মধ্যে টানিয়া রাখা যায় না। এদিকে দুরন্ত ক্ষুধা যেন সর্ব্বগ্রাসী ভবে জাগিয়া উঠিয়া অকস্মাৎ-জাগ্রত কুম্ভকর্ণের মত চিরদিনের পাওনা খোরাক দাবী করিতেছিল।

নন্দকিশোর ইতিপূর্ব্বে আর কখনও এমন করিয়া কাহাকেও ভালবাসিবার অবসর লাভ করেন নাই। মধ্যের এই দ্বাদশ বর্ষাধিককাল হৃদয়ের বৃত্তিগুলা অনাহারেই একরূপ জীর্ণ শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছে। ইহার পূর্ব্বেও শৈশবে পিতৃমাতৃহীন নন্দকিশোর একমাত্র পত্নী কাদম্বিনীকেই তাঁহার সমুদয় হৃদয় ভাণ্ডারের অধিকার প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই বা কতদিন! কঠোর অধ্যয়ন কালে বালিকাপত্নীর সহিত ভাল করিয়া দেখা শুনারই অবসর ঘটিয়া উঠে না; শেষ বৎসরের স্মৃতিটুকুই তাঁহার পক্ষে একমাত্র সুখের স্বপ্ন ও জীবনের অবলম্বন, কিন্তু তাহাই বা কতটুকু ?

গৌরীও তাহার অজ্ঞাতে পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। প্রথমকার গভীর দুঃখপূর্ণ বিদ্রোহের ভাবটা মন হইতে অল্পে অল্পে সরিয়া আসিতেছিল। পিতার প্রতি সূক্ষ্ম

অভিমান নিজে স্পষ্ট না বুঝিলেও মনের মধ্যে অনেকখানি স্থান গ্রহণ করিয়াছিল, সেখানে একটা সহানুভূতির ক্ষীণছায়া ক্রমেই জলে পতিত তৈলবিন্দুর মত বিস্তৃত হইতেছিল। মাসিমা ও সত্যদাদা এই দুইটি প্রাণী ব্যতীত তৃতীয় আর একব্যক্তি তাহার হৃদয় মধ্যে অধিকার বিস্তৃত করিয়াছিল, সে কমলা। কিন্তু তাহার অপেক্ষা যেন এই ধীরভাষী, সজলনেত্র বৃদ্ধ ব্যক্তি যিনি তাহার পিতা, তাঁহার আসন আর একটু বিস্তৃত করিতেছিলেন। প্রথম পিতৃস্নেহের পরিচয় বিচ্ছেদের বেদনায় বাধা প্রাপ্ত না হইলে হয়ত আরও পূর্ব্বে সে ইহার প্রভাব অনুভব করিতে পারিত। নন্দকিশোর নৌকা যাত্রা দীর্ঘ করিয়া দিলেন, খাওয়া দাওয়ার পর দ্বিপ্রহরে বৃহৎ তরণী মৃদুমন্দ গতিতে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে থাকে। কিছু দূর আসিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই একটা জায়গায় নোঙ্গর ফেলে। পিতাপুত্রী নৌকা হইতে নামিয়া তীরে তীরে কিছুদূর ঘুরিয়া আসেন, গৌরীর মনে তখন কিছুমাত্র ক্ষোভ থাকে না। বনের ফল ছিঁড়িয়া ফুল তুলিয়া হাজার হাজার প্রশ্নবর্ষণ করিয়া সে যখন নির্জ্জন ভূমে বনচারিণী পরী বালিকার মত হাসির লহর তুলিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় নন্দকিশোরের সারাচিত্ত তখন সেই আনন্দের তালে তালে নাচিতে থাকে। মধ্যে মধ্যে আনন্দাতিশয্যে তিনি গভীর চিন্তামগ্নের মত স্তব্ধ হইয়া বহুক্ষণ বসিয়া থাকিতেন, গভীর বেদনার মতই অধিক সুখ যেন বক্ষে বহিতে পারা যায় না।

এমনই করিয়া জলযাত্রা ফুরাইয়া আসিল। একদিন শেষ বেলায় প্রকাণ্ড মাস্তুলওয়ালা কত জাহাজ ষ্টীমার নৌকা ও তীরের পিপীলিকা শ্রেণীবৎ ব্যতিব্যস্ত লোকজন সমেত একটা অচিন্ত্যপূর্ব্ব নূতন দৃশ্য চোখে পড়িয়া মুগ্ধা গৌরীকে যেন স্তম্ভিত করিয়া দিল। জানালার নিকটেই দ্বিতীয় বেত্রাসনে অর্দ্ধ শয়ান নন্দকিশোর নীরবে তাহার মুখ পানে চাহিয়া আছেন, সে বিস্মিত দৃষ্টি ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল "ওখানে কি হয়েচে বাবা?"

এই প্রথম সে তাঁহাকে 'বাবা' বলিয়া ডাকিল, পিতা সে আনন্দে সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিলেন. তাঁহার জীবন সার্থক ও বাঁচিয়া থাকা একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হইল, ভবিষ্যৎ অতীতের সহিত তুলনায় অকস্মাৎ স্বর্ণমণ্ডিত হইয়া দেখা দিল। কহিলেন 'ওই কল্‌কাতা 'ও—ই খানে আমরা থাকব?"

গৌরীর দুইনেত্র বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল, সে আর কিছুই বলিল না। দুই ধারের উজ্জ্বল দীপমালা অকস্মাৎ গৌরীর চোক ধাঁধিয়া দিল, সুন্দর অশ্বযানে পিতার পাশে বসিয়া সে নীরব নিস্পন্দভাবে রাস্তার দিকে চাহিয়া রহিল। সারি সারি দোকানে, কত বিচিত্র বর্ণের সমাবেশ। অশন, বসন, ক্রীড়নক, পুস্তক কত আবশ্যকীয় অনাবশ্যকীয় রাশি রাশি পরিচিত অপরিচিত দ্রব্য সম্ভার একসঙ্গে জমা করা। গাড়ি ঘোড়া লোকজন অস্বাভাবিক রূপসম্পন্ন নূতন ধরণের স্ত্রী-পুরুষ, শিশু বালক প্রকাণ্ড প্রশস্ত খোলা গাড়ী চড়িয়া সদর্পে নিমেষে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। গগনস্পর্শী অট্টালিকা সকল একটার পর একটা এমনি করিয়া যেন একটা

বিরাট প্রাচীরের শ্রেণীর মত কোন সীমাহীন পথের দুটি ধারকে ঘেরিয়া আছে। ইহার মধ্যে একবার পড়িলে বুঝি আর কখনও নিজেকে খুঁজিয়া বাহিরে লইয়া যাওয়া যায় না যখন বহুপথ বহুদৃশ্য অতিক্রম করিয়া গাড়ীখানা একটা উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটা বৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখে থামিল, তখন সে পিতার সহিত তেমনই নিস্পন্দভাবে নামিয়া আসিল, কোথা আসিল কি বৃত্তান্ত কিছুই জিজ্ঞাসা করিল না সমস্ত কলিকাতা যেন যাদুকরের যাদুটির মত তাহার মনকে স্পর্শ করিয়া রহিল। দ্বারবান ভৃত্যবর্গ সকলেই সসম্ভ্রমে দুজনকে নমস্কার করিতে লাগিল। সম্মুখের ফুল গাছের টবসজ্জিত সোপান শ্রেণী অতিক্রম করিয়া নন্দকিশোর একটা প্রকাণ্ড হল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন, দ্বারের নিকট গৌরী দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে, হাত ধরিয়া সস্নেহে কহিলেন "এসো মা।" সে নড়িল না। "এসো মা, এই তোমার বাড়ী।" গৌরী আড়ষ্ট হইয়া পিতার মুখের দিকে চাহিল "এখানে রাজা থাকেন না?"

নন্দকিশোর মৃদু হাসিলেন "না, তোমার গরীব বাবা থাকেন।"

সে ধীরে ধীরে বক্ষরোধকারী নিশ্বাসটা ছাড়িয়া দিল, "কিন্তু পায়ে কাদাধূলো বিছানা নষ্ট হয়ে যাবে যে।"

"যে ঘরের বুকে তোদের পায়ের চিহ্ন পড়েনি, তার মত অভাগা কি আর আছে, কোন দ্বিধা করোনা, এ সবই তো তোমার।"

বিস্ময়ের উল্লাসে গৌরী প্রায় হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। এই সব তাহার! বড়মামীর বকুনি বাঁচাইয়া পাড়ায় পাড়ায় বেড়ান ও গৃহে ফিরিয়া ভর্ৎসনালাভ যাহার নিত্য পাওনা ছিল—সেই-সে-ই আজ এই বাড়ীর মালিক! এর চেয়ে আশ্চর্য্য কাণ্ড আর জগতে কিছু ঘটিতে পারে না!

প্রভাতে যাদুকরী নগরী আর এক মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দিল। অশ্ববাহন ট্রামের প্রকাণ্ডবপু অদূরে দেখা যাইতেই গৌরী নিশ্বাসরোধ করিয়া ঝুঁকিয়া পড়িল, কত রকম শব্দ, কতপ্রকার গাড়ী কতই মানুষ! রাস্তায় ফেরিওয়ালা কত সুরে বেসুরে 'চাই মটর ভাজা' 'ভালো ভালো জরির সাড়ি, 'সরপুরিয়া' জামাই ভুলান "লেডিক্যানী!" হাঁকিতেছিল। জানালা ছাড়িয়া গৌরী নড়িতে পারিতেছিল না, যেমন সে সরিয়া আসিবে মনে করে অমনি একটা না একটা আশ্চর্য্য-দর্শন কোন একটা কিছু ঘটিয়া বসে, সে বদ্ধদৃষ্টি বদ্ধপদে দাঁড়াইয়া থাকে। নন্দকিশোর আড়াল হইতে দেখিয়া অনেক সময় পা টিপিয়া ফিরিয়া যান। যে সময়টা অবসর করিয়া লইয়া তিনি তাহাকে জানালা হইতে সরাইয়া আনিতেন সেই অবকাশে সে এই বাড়ীর অদ্ভুত রহস্য সকল উদ্‌ঘাটন করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িত। "পাখা আলো, জলের কল, আহ্বান ঘণ্টা, ঔষধের আলমারি, পুস্তকের সেল্‌ফ হইতে ছোটখাট খুঁটনাটি শত বস্তুই তাহার অপরিচিত। কোথায় সেই পল্লিগ্রামের আচারপরায়ণ ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ঘরকন্না, আর কোথা এই কলিকাতাবাসী বিখ্যাত ডাক্তারের সুসজ্জিত ভবন! সবই তাহার নিকট নূতন ও আশ্চর্য্য, যেটা দেখে

তাহাতেই বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া থাকে, কোন সময় মুগ্ধস্বরে বলিয়া উঠে কি চমৎকার! নন্দকিশোরের সকল আয়োজন এতদিনের পর সার্থক মনে হইতে থাকে। কিন্তু এমনই করিয়া নূতনত্বের বিস্ময় খুব বেশিদিন তাহার নিঃসঙ্গ জীবনের শূন্যতা দূরে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিল না। একদিন সে সন্ধ্যায় ছাদে উঠিয়া দীপান্বিতার উৎসব রজনীর আলোকমালামণ্ডিতা নগরীর দৃশ্য হইতে চোখ ফিরাইয়া যখন কি একটা বিষয় জানিবার চেষ্টায় পিতাকে খুঁজিতে নীচে নামিয়া গেল দেখিল তিনি বাড়ী নাই। কৌতূহল বোধ করা তাহার স্বভাব নয়, আশু উত্তর পাওয়ার সম্ভাবনা না দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইল. সেদিন নন্দকিশোরবাবুর বাড়ী ফিরিতে অনেক বিলম্ব হইয়াছিল, তিনি যখন ফিরিয়া আসিলেন সে তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। গ্যাসের আলোকে সে মুখ অতৃপ্তনেত্রে দেখিতে দেখিতে কতবারই পিতৃহৃদয় সেই ক্ষুদ্র জুঁই ফুলটির মত ছোট্ট মুখখানি বক্ষে টানিয়া লইয়া চুম্বন করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু পাছে সে জাগিয়া উঠে সেই ভয়ে তাহাকে স্পর্শ করিতেও সাহসী হইলেন না। মায়ের কাছে তাঁহার নবজাত শিশুটি যেমন অসহায় যতটুকু ক্ষুদ্র তাঁহার চোখে তাঁহার এই সর্ব্বস্বধনটুকুও তেমনই শিশুবৎ প্রতীয়মান হইত। পরদিন গৌরী দাসীর হাত হইতে ঝাঁটা টানিয়া মার্ব্বেলমণ্ডিত দালান ঝাঁট দিতে আরম্ভ করিল, দাসী নিবারণ করিলে গ্রাহ্য করিল না। বলিল "আমার খুসী আমি ঝাঁট দোব, তুমি অন্য কাজ করোগে না।" "এমন আশ্চর্য্যি মেয়ে কক্ষণো দেখিনি বাবা-যা ধরবে তাই।" দাসী রাগ করিয়া বাবুকে খবর দিতে চলিয়া গেল, ক্ষণপরে নন্দকিশোর আসিয়া শশব্যস্তে কহিলেন "একি হচ্চে মা?"

গৌরী কোমরে কাপড় জড়াইয়া একমনে কাজ করিয়া যাইতেছিল, কামাই না দিয়া উত্তর করিল "কেন সেখানে তো করতুম।" পিতা আসিয়া হাত ধরিলেন "তাহোক, ওসব ঝিয়েরা করবে। ঝাঁটা ফেলে দাও চলে এসো।"

গৌরী এবার সম্মার্জ্জনী ত্যাগ করিয়া ভ্রু কুঞ্চিত করিল "তবে আমায় কেন নিয়ে এলে, আমি কি করে থাকবো একলাটি দিনরাত্তির?"

সত্য, একথা সে বলিতে পারে! তাঁহার সারাজীবনটা নিঃসঙ্গ কাটিয়াছে তাই বলিয়া এই পল্লীবালিকা সে দুর্ব্বিসহ জীবনের অংশ কেমন করিয়া বহন করিবে!

ঈষৎ আহত, ঈষৎ লজ্জিতভাবে কহিলেন "একা তোমার বড্ড কষ্ট হচ্চে, আচ্ছা আমি তোমার একজন সঙ্গীর চেষ্টা করচি।"

গৌরী সত্রাসে মুখ তুলিল "সত্যদাতাতো কল্‌কাতায় থাকে!"

"সে কে?" "সত্যদাদা, গো গাঙ্গুলী বাড়ীর সত্যদাদা, ভুলে গ্যাছ কতদিনতো বলেচি!" নন্দকিশোর এই দাদাটির সংবাদ অনেকবারই পাইয়াছেন বড় একটা মনোযোগ করেন নাই, তাই প্রথমটা স্মরণ ছিল না, সামলাইয়া লইয়া কহিলেন "সে এখানে আসবে কেন?" গৌরী আগ্রহাতিশয্যে পিতার হাতটা জোরের সঙ্গে চাপিয়া ধরিয়া সবেগে তাহা আন্দোলিত করিতে করিতে

কহিয়া উঠিল "আসবে না আবার, খুব আসবে, খুব আসবে।"

অপরাহ্নে সেদিন নন্দকিশোর কোনমতে সময় করিয়া তাহাকে ইডেন উদ্যানে বেড়াইয়া আনিলেন। সেই মনোরম দৃশ্যাবলী পরীশিশুবৎ ইংরেজ বালকবালিকাগণের স্বাধীন বিচরণ, নূতন নূতন বিবিধবস্তু তাহার মনকে মোহিত করিয়া ফেলিল। দুচারটি স্বদেশীয় বালকবালিকা তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া কাছে কাছে ঘুরিল, তাহাদের বেশভূষা চলন বলন সবই যেন স্বতন্ত্র। সে ঈষৎ সঙ্কোচ বোধ করিল, মন চাহিলেও তাই তাহাদের সহিত আলাপ করিতে পারিল না।

ফিরিবার সময় তাহার পিতা গাড়িতে বলিলেন "তোমার একজন জ্যেঠাইমা হন, তাঁর কাছে তোমায় নিয়ে যাচ্চি তিনি মধ্যে মধ্যে তোমার কাছে এসে থাকতে পারবেন। "সত্যদাদা ?" নন্দকিশোর কি করিয়া ইহাকে এ আবেদনের অলৌকিক প্রদর্শন করিবেন ভাবিয়া না পাইয়া কেবল গম্ভীরমুখে কহিলেন "আচ্ছা চলো দেখি"। যে গৃহে গৌরীকে তিনি লইয়া আসিলেন সে গৃহও তাঁহার নিজগৃহবৎ সমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছিল। গৌরী দেখিল মস্তকার্দ্ধে টাক সমন্বিত তামাকপোড়া রঞ্জিতাধরা বৃদ্ধাগৃহিণীর পরিবর্ত্তে সম্পূর্ণ অপরিচিতা বেশভূষাসজ্জিতা এক হাস্যমুখী প্রৌঢ়া আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন "এসো!" দু চারিপদ অগ্রসর না হইতেই তিনি প্রথমেই তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিয়া উঠিলেন "মাগো কি বিশ্রী করে চুলবাঁধা! দাসীরা দিয়েছে বুঝি, তুমি নিজে পারোনা ? না ? পাড়াগাঁর মেয়েরা অনেক বয়স অবধি নিজের গায়ের যত্ন করতেও শেখে না, আমাদের কল্‌কাতায় নবছরের মেয়েটিও নিজে নিজে চুল বান্‌তে শেখে। এ কাপড় পরাতো ঠিক হয়নি, জামার নীচে দিয়ে কি সাড়ি পরে ;"

নন্দকিশোর এই ভ্রাতৃজায়ার হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়া রোগী দেখিতে চলিয়া গেলেন, বলিয়া গেলেন ফিরিবার সময় লইয়া যাইবেন।

এখানকার সঙ্গ গৌরীর পক্ষে বিশেষ লোভনীয় হইল না। জ্যেঠাইমার একটি বিশেষ বন্ধু এখনি আসিয়া পড়িবেন, ইতিমধ্যে এই পাড়াগেঁয়ে মেয়েটির সংশোধন আবশ্যক। দাসীকে চিরুণি আনিতে আদেশ দিয়া তাহার চুল খুলিতে বসিলেন, সে একবার আপত্তি করিয়া নিরুপায়ে ক্ষুব্ধচিত্তে মাথাটা ছাড়িয়া দিল, মনে মনে বলিল "বেশ ছিলুম সেখানে। বাবা আমায় কেন আন্‌লেন!"

দামিনী ঝি কেশবন্ধনের পর সাবান যোগে মুখহাত ধোয়াইয়া দিলে কতকগুলা মৃদু গন্ধ, তীব্র গন্ধ লাল, সাদা হরিদ্র বর্ণের তরল পদার্থ দ্বারা জ্যেঠাইমা দেবর কন্যার প্রসাধন সম্পন্ন করিয়া পছন্দমত ফ্যাসানে সাড়ি পরাইয়া কহিলেন "দেখতো কেমন দেখালো! দিব্যি মুখখানি, গড়নটা একটু কাঠ কাঠ আছে, গায়ে তো মাংস নেই ও দুদিনে সেরে যাবে, এসো একটু জলটল খেয়ে মেয়েদের সঙ্গে গল্প করগে।"

হাত ধরিয়া ভোজনস্থানে লইয়া যাইতে যাইতে কহিলেন "এই বয়সে হাত এমন শক্ত

গ্যাছে কেন গা? খুব কাজ করতে বুঝি?" গৌরী সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল। "তাই জন্যে এমন ঝান্ খেয়ে গিয়েছে, আহা মা নেই বলেই তো এত কষ্ট!" আহারে বসিয়াও সে দু একবার জেঠাইমার নিকট অনুযোগ প্রাপ্ত হইল,"মেয়ে মানুষ এত তাড়াতাড়ি খাওয়া কি, জলের গ্লাসটা নামাবার সময় সাবধান হবে, হাত থেকে পড়ে গ্যাল দেখদেখি, যদি পাশে অন্য লোকের পাত থাকত!" আহারান্তে বাড়ীর মেয়েদের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সকলেই মিতভাষিণী, হাস্যে বাক্যে পদবিন্যাসে কৌতুক ঝরিয়া পড়িতেছে, তাহার প্রাণের ভিতরে একটা অবক্তব্য ব্যাকুলতা ব্যক্ত হইয়া পড়িতে চাহিল! হায় তাহার চাকদা!

বাড়ীর মেজ মেয়েটি একটু প্রগল্ভা, সে এই নূতন আলাপীর সহিত একটু আলাপ জমাইবার চেষ্টা করিল। কথায় কথায় সে জিজ্ঞাসা করিল "সেখানে তোমার কে বন্ধু ছিলেন?" "বন্ধু কেউ না"।

কারুর সঙ্গে খেলতে টেলতে না?"

গৌরী ঢোক গিলিয়া বলিল "খেলতুম বই কি, চুণি, নালু, কালী, আর সব চেয়ে বেশি সত্য দাদার সঙ্গে খেলতুম।"

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল "সবাই পুরুষ মানুষ?"

"উঁহুঃ, কালী শুধু মেয়ে, সে তেমন দৌড়তে পারতো না, কেবল চোর হতো। সত্য দাদা কখন চোর হত না, মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে হোত,—সে-ও আমাকে রাগাবে বলে—"

"তুমিও দৌড়দৌড়ি খেলতে!"

"হ্যাঁতো, তোমরা খেল না?"

মেজ মেয়েট ঘাড় নাড়িল, সকলেই একটু মুখ টিপিয়া হাসিল। একজন কহিল "সত্য দাদা কে?" গৌরী এবার প্রীতিপ্রফুল্ল হাস্যের সহিত উত্তর করিল "সে আমার বন্ধু"। তাহার নূতন বন্ধু কহিল "সে কি ভাই! মেয়ে মানুষের বুঝি আবার ব্যাটা ছেলে বন্ধু হয়।" এই আশ্চর্য্য যুক্তি শুনিয়া হাস্য সম্বরণ গৌরীর পক্ষে অসম্ভব হইল, সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল—"কেন হবে না ভাই, সত্যি সত্যি সে আমার বন্ধু!"

জাপানে নববর্ষ

জাপানে উৎসব অনেক। তার মধ্যে যেটি নববর্ষকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে সেইটিই সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্র ও রমণীয়।

বৎসরের প্রথম দিন উৎসব-আনন্দে অতিবাহিত করবার প্রথা সকল দেশেই অতি প্রাচীন কাল থেকে চলে আসচে। বিভিন্ন দেশে এই উৎসব সম্পন্ন করবার জন্যে যে সব জিনিসের প্রয়োজন সে গুলির মধ্যেও কতক পরিমাণে সাদৃশ্য আছে। প্রাচীন রোমীয়েরা নববর্ষের দিন বাড়ীর দ্বারে একটি সবুজ বৃক্ষ স্থাপন করত। এই প্রথার উৎপত্তি সম্বন্ধে শোনা যায় যে, নববর্ষের দিন প্রজারা রাজভক্তি ও শুভ ইচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ রাজাকে নানারকম উপহার দিতেন।

রাজা যখন ঘোষণা করলেন যে অতঃপর এরূপ উপহার আর গ্রহণ করবেন না, তখন থেকে রোমীয় জনসাধারণ রাজার দীর্ঘজীবন কামনা করে বাড়ীর দ্বারে সবুজ গাছ রোপন করতে আরম্ভ করলে। রোমীয়দের নিকট হতেই বোধ হয় য়ুরোপীয়েরা বড়দিনের উৎসবে চিরহরিৎ বৃক্ষপত্রে বাটী সজ্জিত করা শিক্ষা করেচে।

প্রাচীন রোমীয়দের মত জাপানের নববর্ষও, কিছুকাল পূর্ব্বে, ফেব্রুয়ারী মাসের গোড়ায় আরম্ভ হ'ত। এবং সেই সময়ই শীতের অবসান ও বসন্তের আরম্ভ বলে ধরা হ'ত। তখন বাহিরে পথঘাটমাঠ বরফে সাদা হয়ে থাকলেও তারা গ্রাহ্য করত না, বসন্ত এসেচে ব'লে তুলাভরা পোশাক ছেড়ে ফেলে হাল্কা পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে বেরিয়ে পড়ত। বাহ্য প্রকৃতি হিমজর্জ্জর ম্লান বিষণ্ণ হ'লেই বা, তাদের অন্তরের মাঝে যে বসন্ত—সে তার মলয় বাতাস, ফুলের সুবাস, পাখীর গান ও নবীন তৃণবল্লরী নিয়ে হাজির!

বিশ্বমানবের সঙ্গে যোগ রাখবার জন্যে, ব্যবসায় বাণিজ্যের সুবিধার জন্যে ১৮৭৩ সাল থেকে ১লা জানুয়ারিই জাপানী নববর্ষের আরম্ভ ব'লে বিবেচিত হয়ে আসচে।

বৎসরের শেষ কয়দিন দেনা-পাওনা চুকিয়ে নববর্ষের উৎসবের আয়োজন করতে কেটে যায়। অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাড়ীর প্রধান ফটকের দুইধারে সরলবাঁশের সহিত দেবদারু শাখা অতি পরিপাটিরূপে স্থাপিত হয়। অবস্থা যাদের হীন তারা ফটকের কাছে অন্তত দুইগাছা পত্রসম্বলিত বাঁশের কঞ্চি স্থাপন করে। ফটকের একটি থাম থেকে অন্য থাম পর্য্যন্ত একগাছি খড়ের দড়ি বিলম্বিত, তার মাঝে একটি বড় চিংড়ি বা কমলালেবু বাঁধা। খড়ের দড়িটি ধর্ম্মের নিদর্শন, কমলালেবু কমলার বর ও চিংড়িমাছ নববর্ষের শুভইচ্ছার নিদর্শন—তুমি দীর্ঘায়ু হও, যতদিন না তোমার পৃষ্ঠ চিংড়ির পৃষ্ঠদেশের মত বঙ্কিম হয়ে যায় ততদিন বেঁচে থাক!

পথের উভয় পার্শ্বে দ্বারে দ্বারে চিরহরিৎ বাঁশ ও দেবদারুশাখা বাতাসে হিল্লোলিত হয়ে উঠচে, বাড়ীর সামনে উৎসববেশে সজ্জিত রমণীর দল নববর্ষের খেলায় মত্ত, বন্ধুবান্ধব আসচে যাচ্চে, অভিবাদন শুভইচ্ছা জ্ঞাপন চলচে, তরুণীরা বিশেষ কোনো কারণ না থাকলেও হাসচে, বাড়ীর মধ্যেকার সুখাদ্যের গন্ধে ছেলেদের রসনায় জল আসচে, কাষ্ঠ-পাদুকার খট্‌খট্ ও মানুষটানা গাড়ীর চাকার শব্দে চতুর্দ্দিক মুখরিত, কোথাও বা সামিসেন বাজিয়ে নর্ত্তকী গান গাইচে - এই হ'ল নববর্ষ উৎসবের একটি ছোট্ট ছবি। এ সময়ে সহরে পথ চলতে চলতে মনে হয় যেন কার সুসজ্জিত বাড়ীর প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে চলেচি।

উৎসব সাত দিন চলে, তবে প্রথম তিন দিনই উল্লেখযোগ্য। যারা দূরে থাকে তারা বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনকে কার্ড পাঠায়। প্রত্যেক বৎসরের একটি একটি বিশেষ চিহ্ন থাকে যেমন কুক্কুট, শূকর ইত্যাদি। শূকরবর্ষে কার্ডের উপর বরাহমূর্ত্তি অঙ্কিত থাকে। নিকটে যারা থাকে তারা পদব্রজে বা মানুষ-টানা গাড়িতে বন্ধুবান্ধবের বাড়ী গিয়ে শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপন ক'রে আসে। উপহার দেওয়ারও রীতি আছে। সাধারণত ডিম, ফল, কেক

প্রভৃতি মুখরোচক পদার্থই দেওয়া হয়। নববর্ষের সময় সকলেই অভ্যাগতকে এক-প্রকার সুবাসিত মিষ্ট মদ্য প্রদান করে। তিনটি ছোট ছোট চ্যাপ্টা কাঠের বাটি উপরি উপরি সাজান, উপরের বাটি হতে আরম্ভ ক'রে প্রত্যেক বাটিতে তিনবার ক'রে পান করা নিয়ম। একজন পান ক'রে পার্শ্ববর্ত্তী লোকের হাতে বাটিটি তুলে দিয়ে মদ ঢেলে ত্থান, তিনি পান ক'রে আবার তাঁর পাশের লোকটিকে ত্থান, এই প্রকার। নববর্ষের সময় একই দিনে অনেক বাড়ীতে যেতে হলে কিঞ্চিত 'মাত্রাধিক্য' হওয়া বিচিত্র নয়।

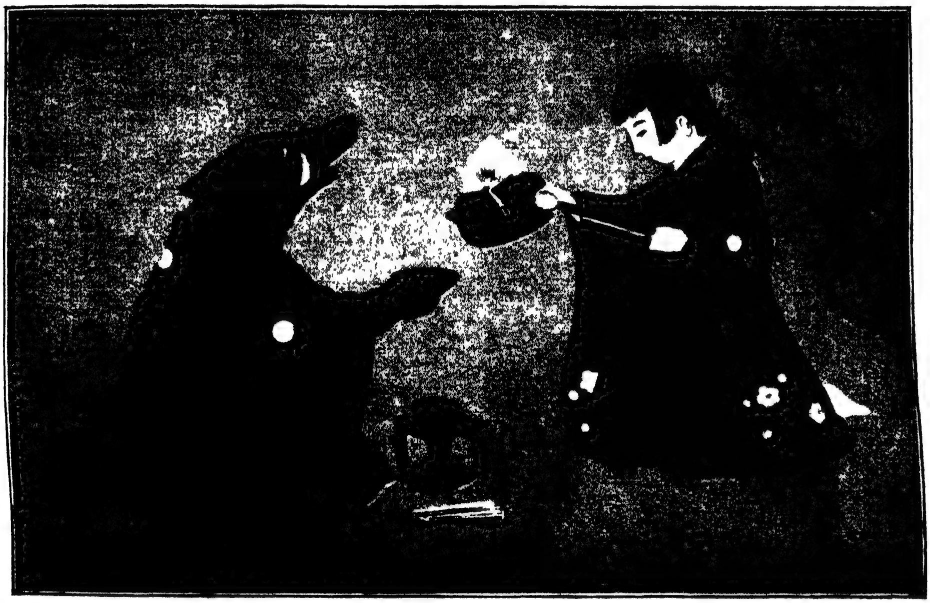

নববর্ষের অভিনন্দন কার্ড

আহার্য্যের মধ্যে 'মোচি' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একপ্রকার চটচটে চাউল থেকে তৈরি করা হয়। চাউলের গুঁড়া মাদার মত মাখা হয়, অনেকক্ষণ মাখার পর রবারের মত হয়ে যায়। তখন ছোট ছোট রুটি বা লুচির 'নেচি'র মত ক'রে বিভক্ত করা হয় ও আগুনের উপর সেঁকে নেওয়া হয়। পরিশেষে সেগুলি স্যুপের মধ্যে সিদ্ধ করা হয়, খেতে অনেকটা আমাদের 'সিদ্ধপুলি'র মত। পূর্ব্বপুরুষদের উদ্দেশে যে সব মন্দির স্থাপিত নববর্ষের সময় তথায় তাদের আত্মার প্রীতির জন্যে 'মোচি' নিবেদন ক'রে দেওয়া হয়।

নববর্ষের আর একটি আহার্য্যের নাম "নানাকুসা"। 'নানা' অর্থে সাত এবং 'কুসা' অর্থে ঘাস। সাতরকম ঘাস বা শাক। ভাতের সঙ্গে সাত রকম শাক মিশিয়ে এই আহার্য্য তৈরি হয়। ৭ই জানুয়ারি এটি খাবার রীতি। আমাদেরও শ্যামাপূজার পূর্ব্বদিন 'চৌদ্দশাক' খাবার রীতি আছে।

বর্ষারম্ভের দিন জাপান-সম্রাট রাজকীয় মন্দিরে স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালের যাবতীয় দেবতার উদ্দেশে পূজা করেন।

পূর্ব্বদিন জাপানীরা ঘরদ্বার ঝাঁটপাট দিয়ে পরিষ্কার করে! নববর্ষের দিন ঘর ঝাঁট দেবার নিয়ম নেই, পাছে ভাগ্যদেবতা সম্মার্জ্জনী দর্শনে ভীত হয়ে বাড়ী ছেড়ে পলায়ন করেন!

পূর্ব্বদিন মধ্যরাত্রে মন্দিরে মন্দিরে একশ আটবার ঘণ্টা বাজিয়ে নববর্ষের আগমন সংবাদ ঘোষণা করা হয়।

এ সব ব্যাপার ত সর্ব্বত্রই ঘ'টে থাকে, এ ছাড়া বিশেষ বিশেষ স্থানের বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান আছে। জাপানের ভূতপূর্ব্ব রাজধানী কিওতো সহরে গিওন্ মন্দির একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। নববর্ষের প্রারম্ভ-কালে অর্থাৎ ৩১ ডিসেম্বর মধ্যরাত্রে পুরোহিত পাল্কী চ'ড়ে মন্দিরে এসে উপস্থিত হন। তাঁর আগে আগে মশালধারীরা পথ দেখিয়ে যায়। মন্দিরে উপস্থিত হয়ে একটি বড় ঘরে তিনি কিছুকাল প্রার্থনা করেন। ঘরের উভয় পার্শ্বে বারান্দায় ছয়খানি ক'রে বারো খানি কাষ্ঠখণ্ড রাখা হয়। কাষ্ঠখণ্ড গুলি বৎসরের বারো মাসের নিদর্শন স্বরূপ। প্রার্থনার পরে এগুলিতে অগ্নি সংযোগ করা হয়। ধূম যদি পূর্ব্বদিকে উড়ে যায় তবে বুঝতে হবে পূর্ব্বদিককার স্থানগুলিতে সে বৎসর ধান্য জন্মিবে না; ধূম যদি পশ্চিমে হেলে তবে পশ্চিম দেশ-সমূহ অজন্মা। জ্বলন্ত কাঠগুলি তারপর মন্দিরপ্রাঙ্গণে বিলম্বিত প্রকাণ্ড লৌহকটাহে রেখে মস্ত এক আগুন তৈরি করা হয়। অতঃপর পুরোহিত মন্দিরমধ্যস্থ কূপ হতে স্বহস্তে জল তুলে সেই আগুনের উপর অন্ন পাক করেন, পরদিন প্রাতে উহা দেবতাকে নিবেদন করা হয়।

এই আগুনে 'নিনাওয়া' নামক রজ্জু প্রজ্জ্বলিত ক'রে ও উহা নির্ব্বাপিত না হতে দিয়ে বাটী প্রত্যাবর্ত্তন ক'রে ঐ আগুনে চুল্লি ধরিয়ে যে নববর্ষের প্রভাতে অন্ন পাক ক'রে খায় তার নাকি সে বৎসর সুখ সমৃদ্ধির অবধি থাকে না!

সে রাত্রে পথিপার্শ্বে শত শত দোকানে এই রজ্জু বিক্রীত হয়। উহা দৈর্ঘ্যে প্রায় এক গজ, ও আধ ইঞ্চি মোটা। শত শত লোক এক এক গাছি রজ্জু নিয়ে পাহাড়ের উপর হাজির হয়। পুরোহিত এক এক বারে দশ বারো গাছি রজ্জু নিয়ে মন্ত্র আউড়ে কটাহে এক প্রান্ত প্রজ্জ্বলিত ক'রে সকলের হাতে হাতে দ্যান। সহস্র সহস্র লোক যখন রজ্জু প্রজ্জ্বলিত রাখবার জন্য সেগুলি ঘোরাতে ঘোরাতে বাড়ী ফেরে তখন এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখা যায়। মন্দিরে ঘণ্টা ও ঢক্কানিনাদ, পূজার্থীর হাততালি ও সমবেত জনগণের চীৎকার এক বিপুল কোলাহলের সৃষ্টি করে ও সহস্র সহস্র ঘূর্ণ্যমান জ্বলন্ত রজ্জুর আলোকে নিশীথআকাশ রাঙা হয়ে ওঠে।

ওসাকা সহরের নিকটে এবিসু মন্দির। এ মন্দিরে পাঁচজন দেবতা বাস করেন। তন্মধ্যে যিনি প্রধান তিনি না কি কানে একটু কম শোনেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও, তাঁর মন্দিরে যারা পূজা করে তাদের তিনি অশেষপ্রকারে সুখী করেন।

১০ই জানুয়ারি এখানে একটি উৎসব হয়। ঐ দিন ওসাকার ব্যবসায়ীগণ হাতে কাঠের মুগুর নিয়ে মন্দিরে যান ও বধির দেবতার মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্যে দেওয়ালে মুগুরের ঘা দিয়ে উচ্চকণ্ঠে বলেন—আমি আপনাকে পূজো করতে এসেচি।

১৫ই জানুয়ারি "দোনো"-উৎসব। উৎসবটি আর কিছু নয়—নববর্ষে বাড়ীর ফটক যে সব দ্রব্যে সজ্জিত হয়, দেবদারু-শাখা, বংশখণ্ড, খড়ের দড়ি প্রভৃতি একস্থানে জমা ক'রে পোড়ানো এবং সেই আগুনের উপর চাল ও লাল মটর এক সঙ্গে সিদ্ধ করা হয়। এরূপ করলে দেশে ব্যাধি বিস্তার লাভ করতে পায় না, জাপানীরা তাই বিশ্বাস করে।

একবার আমরা দুই বাঙালী বন্ধু এক জাপানী বন্ধুর সহিত নববর্ষের সময় আতামি নামক স্থানে বেড়াতে গিয়েছিলুম। শীতকালে অনেকে সেখানে বেড়াতে যান কারণ স্থানটি কিওতোর মত ঠাণ্ডা নয়, প্রাকৃতিক দৃশ্যও মনোরম, পাহাড় ও সমুদ্র দুইই আছে। আর আছে উষ্ণ প্রস্রবণ। দিনে তিনবার একটা স্থান থেকে প্রভূত বাষ্পের সহিত ঈষদুষ্ণ জল নির্গত হয় ও সেই জল বাঁশের নলে হোটেলগুলির স্নানের ঘরের চৌবাচ্চায় নেওয়া হয়। এই স্থানটি তোকিও থেকে কয়েক ঘণ্টার রাস্তা, পথের শেষাংশ খেলাঘরের গাড়ীর মত ছোট একখানা রেলগাড়ীতে বস্তার মত গাদাগাদি ক'রে পার হতে হয়। তাই নিজের দেহটি সামলাতে সামলাতে পথের সৌন্দর্য্য উপভোগ করবার অভিরুচি বা অবসর থাকে না।

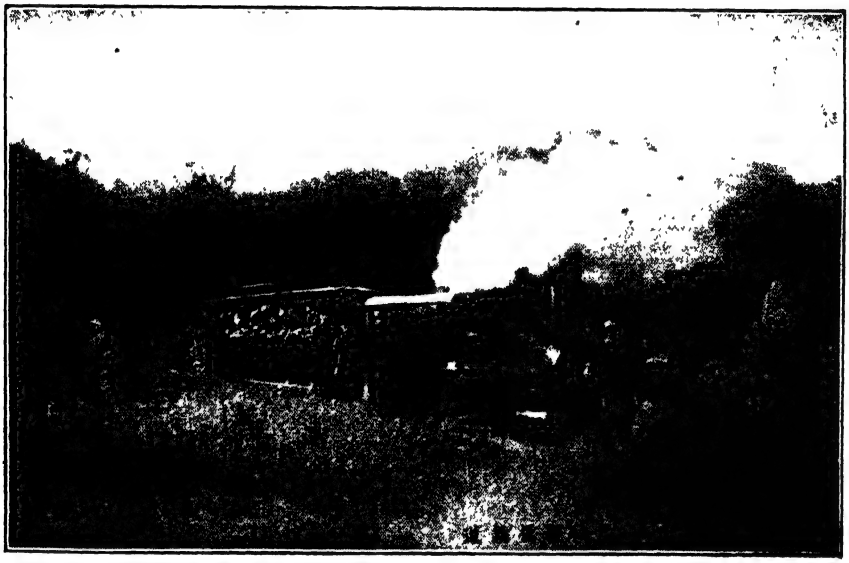

আতামির রেলগাড়ী

বিকালবেলায় সেখানে পৌঁছলুম। নিকটেই হোটেল। সেখানে গিয়ে বেশ পরিবর্ত্তন

ক'রে হোটেলের বারান্দায় বেরিয়ে দেখি বাগানে কয়েকটি তরুণী 'হানে' বা Battle-door and Shuttlecock খেলায় মত্ত। বাগানটি ছোটখাট পরিপাটি নিখুঁত, জাপানী বাগান যেমন হয়ে থাকে। দিনান্তের ছায়াপাতের মধ্যে তরুণীসমাগম উদ্যানটিকে আরো মনোরম করে তুলেছিল।

খেলাটা বোধ হয় অনেকেই জানেন। দুজনে খেলে, এক একখানি ছোট কাঠের ব্যাট নিয়ে একটা হাল্কা পালকবসানো বল শূন্যে পেটাপিটি করাই হল খেলা। যার দিকে বল মাটিতে প'ড়ে যায় তারই হার।

আমার বাঙালী বন্ধুটি একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ ক'রে নিয়ে বল্লেন তিনি খেলায় যোগ দিতে চান। তারা তৎক্ষণাৎ সম্মত। বন্ধু দেশে থাকতে ব্যাডমিণ্টন্ খেলতেন তাই এ খেলাটাও তাঁর কাছে নতুন ঠেক্‌ল না। খেলা জ'মে উঠল, হোটেলের অন্যান্য আগন্তুক রমণীরাও অনেকে এসে খেলায় যোগ দিলেন, অনেকে খেলা দেখতে লাগলেন। রীতিমত সুন্দরীর মেলা!

কথা কইতে পারলে ও নিতান্ত কুণো প্রকৃতির না হলে রমণীদের সঙ্গে সে দেশে সহজেই আলাপ হয়ে যায়।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায়, যাঁদের সঙ্গে আলাপ হ'ল সকলকে আমাদের ঘরে নিমন্ত্রণ করা গেল। সান্ধ্য আহারের পর আমাদের ঘরে একটি ছোট খাট সভা ব'সে গেল। হোটেলের পরিচারিকারাও এসে যোগদান করলে। পরিচারিকারা আমাদের আনন্দসভায় যোগদান করলে শুনে চমকে উঠবেন না, ভাল জাপানী হোটেল বা অবস্থাপন্ন জাপানী বাড়ীর পরিচারিকারা আকৃতিপ্রকৃতি বেশভূষা ও শিক্ষাসহবতে কোনো ক্রমেই হেয় নয় বরং সমাদরের যোগ্য।

ব্যাটলডোর এবং শাট্‌লকক্ খেলা

চা কমলালেবু কেক প্রভৃতি মধ্য স্থলে রেখে আমরা সকলে মেঝের উপর আসন পিঁড়ি হয়ে মণ্ডলাকারে বসলুম। খেলা আরম্ভ হল। সকলে সামনে দুই হাত মাদুরের ওপর রেখে

বসল। একজন বলতে লাগলো—পাখী উড়লো, কাক উড়লো, চিল উড়লো ইত্যাদি ও সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলতে লাগলো। তার সঙ্গে আমরাও হাত তুলতে লাগলুম। যাদের ওড়বার ক্ষমতা আছে এমন নামের বেলাই হাত তুলতে হবে, ওড়বার যাদের ক্ষমতা নেই সে সব জিনিস উড়লো বললেও হাত মাদুরের উপরে ঠিক রাখতে হবে। অসাবধানতাবশত হাত তুললেই হার হবে ও শাস্তিস্বরূপ তার মুখে তুলি দিয়ে এক পোঁচ সাদা রং লাগিয়ে দেওয়া হবে। 'পাখী উড়লো' 'চিল উড়লো' শুনতে শুনতে নিঃশঙ্কচিত্তে হাত ওঠাচ্চি এমন সময় হয়ত ব'লে বসলো

মানজাই নাচ

'শিলনোড়া উড়লো' বা 'চটি জুতো উড়লো', তখন কি আর সামলানো যায় হাত যে উঠে পড়েচে!

তারপর আর একটা খেলা হল, একজন বলতে লাগলো 'বড় লণ্ঠন' 'ছোট লণ্ঠন'। যখন 'বড় লণ্ঠন' বলবে তখন সকলকে ছোট জিনিস বোঝাবার মত হাত দুখানি কাছাকাছি করতে হবে ও যখন 'ছোট লণ্ঠন' বলবে তখন তার বিপরীত বড় জিনিস দেখাবার মত হাত করতে হবে। তা না করলেই মুখে শ্বেত রং লেপন ও সমবেত সকলের হো হো হাস্য।

শেষের খেলাটাই জমেছিল ভাল। একজন মুখ নীচু করে গোঁ গোঁ শব্দ করতে থাকে। শব্দটা যতক্ষণ হয় ততক্ষণ একটা কমলালেবু হস্ত হতে হস্তান্তরে ঘুরতে থাকে। একজন হাতে পাবামাত্র সেটি পার্শ্ববর্ত্তী লোকের হাতে চালিয়ে দ্যায়। হঠাৎ গোঁ গোঁ শব্দ থেমে যায় তখন লেবুটি যার হাতে সেই 'চোর' হয়। আমার পাশেই এক

সুন্দরী বসেছিলেন. তাঁর সুন্দর নিটোল গণ্ডে এক পোঁচ সাদা রং লাগাবার লোভ সম্বরণ করতে না পেরে দু তিনবার 'চোর' হয়ে গোঁ গোঁ কর্ত্তে কর্ত্তে আড় চোখে দেখছিলুম, লেবু যেই সুন্দরীর হাতে আসে অমনি থেমে যাই। বারকতক এমনি ক'রে শেষকালে ধরা পড়ে গেলুম। সুন্দরী তখন অসাধ্য সাধন করলেন, আমা হেন লোকের মুখ প্রায় সাদা করে তুললেন!

অনেক রাত্রে খেলা ভাঙলে আমরা পরস্পর 'শুভরাত্রি' জ্ঞাপন ক'রে গরম জলের চৌবাচ্চায় ডুব দিয়ে মুখের রং তুলতে লেগে গেলুম।

সে রাত্রের পর অনেক দিন কেটে গেছে। জীবনের খাতায় অনেক নতুন দুঃখসুখের কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে। মানসপটে অনেক স্মৃতি অস্পষ্ট, কতক বা একেবারেই মুছে গেছে; কিন্তু সুদূর দেশের সেই একটি নববর্ষ-সন্ধ্যার মধুর স্মৃতি এখনো ভুলতে পারি নি।

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমার বোম্বাই প্রবাস

(৪)

সর্ব্বিসে প্রবেশ

আমার হিন্দুস্থানী ও গুজরাটী ভাষায় পরীক্ষা শেষ হইলে আমি আহ্মদাবাদে সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর রূপে নিযুক্ত হইয়া আমার প্রথম কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম। Sir Bartle Frere তখন বোম্বায়ের গবর্ণর ছিলেন। তিনি বিনয় সৌজন্য গুণে, ভদ্র ব্যবহার ও মিষ্টালাপে সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিতেন। আমার প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহ ছিল। যাহাতে আমার সেই প্রথম কর্ম্মভূমির পথ পরিষ্কৃত ও সুগম হয় সর্ব্বথোভাবে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। প্রথম দুই এক বৎসর কলেক্টরি কর্ম্মে আমার ডিষ্ট্রীক্টের নানাস্থান পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতে হইত—পরে যথা সময়ে ঐ প্রদেশের আসিষ্টণ্ট্ জজের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলাম। জজীয়তী কর্ম্মের সুবিধা এই যে কলেক্টরি কাজে গ্রামস্থ রায়তের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ ও রেবেন্যু কর্ম্মচারীদের কার্য্যের তত্বাবধান করিতে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ব্যাড়াইবার প্রয়োজন হয়, জজের সেরূপ করিতে হয় না। যাঁহারা গার্হস্থ্য জীবনের শান্তি ও আরাম ভালবাসেন, তাঁহারা এই কারণে রেবেন্যু ছাড়িয়া জুড়িস্যাল ক্ষেত্র বাছিয়া লন। আর যাঁদের চলা ফেরা, শিকার করিয়া ব্যাড়ানো এই সবে আমোদ তাঁহারা অনেক অর্থের প্রলোভন ভিন্ন কলেক্টর-মাজিষ্ট্রেটের কাজ ছাড়িতে চাহেন না। আমার এই জজীয়তী সর্ব্বিস সম্বন্ধে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। আমি যখন ধূলিয়ায় আসিষ্টণ্ট্ জজ হইয়া কর্ম্ম করি, তখন সেখানকার মাজিষ্ট্রেট প্রিচার্ড্ সাহেব আমার কোর্টে চারিজন আসামীর বিরুদ্ধে মিথ্যাসাক্ষ্যের মকদ্দমা আনিয়া উপস্থিত করেন। সেই মকদ্দমায় তিনি

নিজে ফরিয়াদী, নিজেই সাক্ষী, তাঁহার একতরফা সাক্ষ্য সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নহে এই বলিয়া আসামীদিগকে নিরপরাধ সাব্যস্ত করিয়া খালাস দিয়াছিলাম। এই বিচারে প্রিচার্ড সাহেব অসন্তুষ্ট হইয়া গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আমার রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল

রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ

আনিয়া আমাকে স্থানান্তরিত করিবার আদেশ জারি করিলেন। ভাগ্যে হাইকোর্ট আমার পক্ষ লইয়া আমার রায় বাহাল করিলেন, তাই আমাকে আর বিশেষ কিছু শাস্তি ভোগ করিতে হইল না, কেবল ঐস্থান হইতে স্থানান্তরিত হওয়াই আমার শাস্তি,

সেও আবার অনেক লেখালেখির পর অপেক্ষাকৃত ভাল স্থানেই হইল। খানদেশ হইতে পুণা, আমার শাপে বর হইল। আমার বিদায় উপলক্ষে সেখানকার লোকেরা আমাকে এক মানপত্র, সহজ ভাষায় address দেয়—ইহাতে কর্তৃপক্ষেরা আরো চটিয়া উঠিলেন। গোদের উপর আবার বিস্ফোটক! গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ভিন্ন কেন এইরূপ অ্যাড্রেস লওয়া হইল—অমনি তার কৈফিয়ৎ তলব। সেই অবধি গবর্ণমেণ্টের অনুমতি না লইয়া কোন সরকারী কর্ম্মচারী অ্যাড্রেস গ্রহণ করিতে পারিবে না, এই কড়াক্কড় নিয়ম জারী হইল। আমার সমুদয় সর্ব্বিসের মধ্যে আমার উপরিওয়ালাদের সঙ্গে এই যা একটু গোলযোগ বাধিয়াছিল, তা ভিন্ন আর বিশেষ কিছু মতান্তর ঘটে নাই। আমার প্রতি গবর্ণমেণ্টের ব্যবহারে আমার বিশেষ কিছু দোষ ধরিবার নাই। পুণায় বদলী হইয়া অবধি জজীয়তী কার্য্যে আমার উত্তরোত্তর উন্নতি হইতে লাগিল। মাঝে মহারাজা হোলকর ও ব্রিটশ গবর্ণমেণ্টের মধ্যে গোচারণের অধিকার লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয় তাহাতে আমাকে উভয়ের মধ্যস্থ হইয়া বিচার করিতে হয়—এইটি ছাড়া উত্তরে সিন্ধুদেশ হইতে দক্ষিণে কর্ণাটক পর্য্যন্ত বোম্বাই প্রেসিডেন্সির ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে জজের কর্ম্মেই আমার সর্ব্বিসের সমুদায় কাল অতিবাহিত হয়। পুণার জজের হাতে সেখানকার সর্দ্দারদের সম্বন্ধে একটু Politic l কাজ আছে—তিনি দক্ষিণ সর্দ্দারের Politictal agent, আমিও এই কাজে দুই বৎসর জজের সহকারী ছিলাম। এই উপরি কাজ অতি সামান্য, সর্দ্দারদের খোঁজ খবর নেওয়া আর বৎসর অন্তর একবার দরবারের আয়োজন করা, এই বৈ নয়। এইরূপে ৩০ বৎসরেরও উপর জুডিস্যাল খাতায় নিরবচ্ছিন্ন কার্য্য করিয়া অবশেষে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করি।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে বোম্বাই সহরের কথা অনেক বলা হইয়াছে, সে কথাগুলি ভূমিকা মাত্র। যতদিন মানকজীদের সঙ্গে বোম্বায়ে ছিলাম ততদিন আমার হাতে কোন কাজ কর্ম্ম ছিল না—আমার একমাত্র কাজ ভাষাশিক্ষা। পরে ভাষার পরীক্ষা দিয়া আমার নিয়মিত কর্ম্মে নিযুক্ত হইলাম।

তখন হইতে আমার রীতিমত সর্ব্বিস আরম্ভ। আমি বোম্বাই প্রেসিডেন্সির যে যে স্থানে কর্ম্ম করিয়াছি এই স্থলে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া ও সেই সঙ্গে আমার আত্মকাহিনী যাহা কিছু মনে পড়ে তাহা যোগ করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবের অবতারণা করা যাইতেছে।

ফর্লো

আমার সর্ব্বিসের মধ্যে দুইবার ফর্লোর ছুটী পাওয়া যায়। প্রথমবার সপরিবারে ইংলণ্ডে যাত্রা করি। দ্বিতীয়বার ১৮৯৩ সালে এদেশেই অবকাশ কাল যাপন করি। দ্বিতীয় বার ইংলণ্ডে গিয়া দেখি সে যেন এক নূতন দেশ, দুএকজন ছাড়া আমার পূর্ব্ব পরিচিত বাল্যবন্ধু কে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, লোকদের সঙ্গে নূতন করিয়া আলাপ পরিচয় করিতে হইল। বৈলাতিক মোহ আর আমাকে আচ্ছন্ন করে না,

ইংলণ্ড আর "হোম" বলিয়া বোধ হইল না। আমরা ইংলণ্ডে গিয়া লণ্ডন সহরে প্রথমে কিছুকাল বাস করি, পরে Brighton Torquay ও ফ্রান্সের প্যারী নিস্ প্রভৃতি নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া ছুটির সময়টা কাটাইয়া দিলাম।

সিমলার পাহাড়

পরের বার যে ফর্লো পাই তাহাতে সিমলা প্রয়াণ। রাজপুতানা লাইন দিয়া বোম্বাই ছাড়িয়া আগ্রায় আমাদের দলবলের সহিত মিলিত হইলাম। পথে আবু ও জয়পুর দেখিয়া লইলাম। আবু পাহাড় অতি সুন্দর রমণীয় স্থান, পাহাড়ের ক্রোড়ে একটি সরোবর শোভা পাইতেছে। দৃশ্য মনোরম, বায়ু স্বচ্ছ স্বাস্থ্যকর। দেলওয়ারা নামে সুবিখ্যাত জৈনমন্দির সেখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য জিনিস। মন্দিরগুলি শ্বেতপাষাণ নির্ম্মিত—জৈন নির্ম্মাণকৌশলের উৎকৃষ্ট নমুনা। দুর্ভাগ্যক্রমে তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি সকল বিধর্ম্মীদের

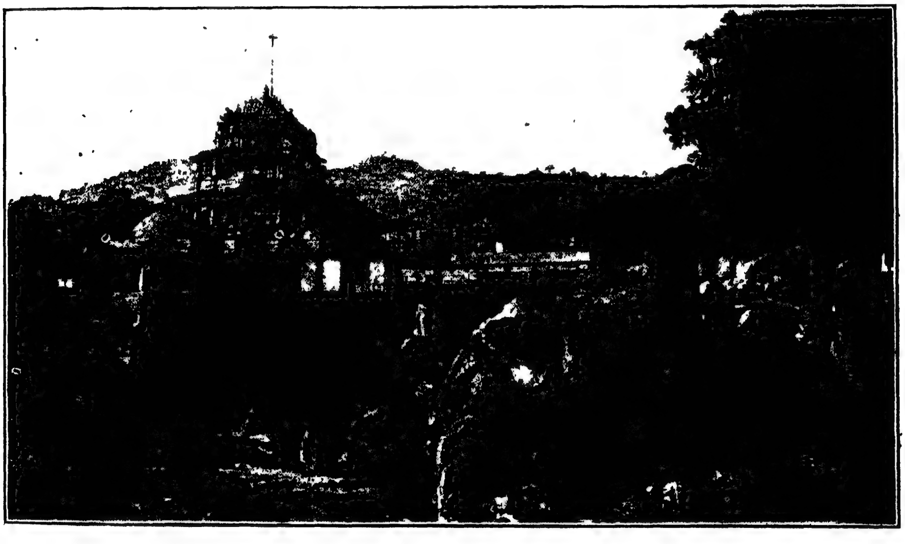

জৈন মন্দির—আবু

হস্তে পড়িয়া ছিন্ননাসা শ্রীভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে। মন্দিরের একস্থানে এক অদ্ভুত নিলাম চলিতেছিল। নিলামে পৌরোহিত্যের অধিকার মারওয়াড়ী ধরণে ক্রয় বিক্রয় হইতেছে। নিলামে যার ডাক সবচেয়ে বেশী দেবার্চ্চনায় তার সর্ব্বোচ্চ অধিকার—পুরোহিতের প্রাপ্য দানসামগ্রী তাহারই।

জয়পুর

জয়পুর রাজপুতানার রাজধানীমধ্যে নব্যধরণে গঠিত। ইহার চারিদিকে পাহাড় শ্রেণী, পথ ঘাট প্রশস্ত, গোলাপী রঙের বাড়িঘরগুলি সূর্য্যকিরণে সুনীল আকাশতলে ঝক ঝক করিতেছে। বিপনী নানাবিধ সৌখীন দ্রব্যভারে সুসজ্জিত। জয়পুরে

হরিমোহন সেনের আমল হইতে বাঙালীদের আধিপত্য অনেক দিন চলিয়া আসিতেছে। দেওয়ান কান্তিবাবু আমাদের অশেষ যত্ন করিয়া তাঁহার নবনির্ম্মিত গৃহ পরিদর্শনে লইয়া গেলেন। নগরে একটি সুন্দর উদ্যান আছে, তার মাঝখানে একটি যাদুঘর, তাহার ভিতর নানা কলকৌশলময় দেশী বিলাতী সামগ্রী সংগৃহীত। উদ্যানের উত্তর সীমায় ব্যাঘ্রাদি জন্তুর একটি পশুশালা আছে।

তাজমহল

জয়পুর হইতে আগ্রা। বলা বাহুল্য যে তাজ দর্শন না করিয়া আগ্রা ছাড়ি নাই। সৌন্দর্য্যের আকর হৃদয়ানন্দকর পৃথিবীর তাজ। পৃথিবীর মধ্যে অন্য কোন রাণীর ভাগ্যে এরূপ মৃত্যুঞ্জয়ী স্মৃতিস্মম্ভ রচিত হয় নাই। ইহার অপূর্ব্ব রূপমাধুরীতে হৃদয় মন আচ্ছন্ন হইয়া যায়।

সিমলা

১৮৯৩ এপ্রিল মাসে সিমলা গিয়া পৌঁছান যায়; ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত সেখানে আমাদের অধিবাস। সেখানকার গ্রীষ্ম শরৎ বর্ষা শীত সকল ঋতুই আমাদের উপর দিয়া একে একে চলিয়া গেল। এক এক ঋতুতে এক এক রকম ফুলের বাহার। কর্পূরতলার কুমাররাণীসাহেবের আতিথ্য সংকারে আমাদের প্রবাস যাপন সুখের হইল। শেষ দিকে তাঁহাদের বাড়ীতে অতিথি হইয়া এক সপ্তাহ কাটানো গেল। সিমলা পর্ব্বত যাহা দেখিলাম তাহা আমার কল্পনার হিমালয় নহে। কল্পনার সিমলা ও বাস্তবিক সিমলায় অনেক তফাৎ। দার্জিলিং হইতে তবুও দূর হইতে তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতশ্রেণী দৃষ্টি গোচর হয় সিমলায় তাহাও হয় না। সিমলার দৃশ্য অন্যরূপ। সেই দেবতাত্মা হিমালয় যাহা—

পূর্ব্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যাইব মানদণ্ডঃ

পূর্ব্ব পশ্চিম সাগর-ধৌত পৃথিবীর মানদণ্ড রূপে দণ্ডায়মান, এই স্বর্গীয় ভাব পার্থিব ধূলির আড়ালে ঢাকা পড়িয়াছে। বাড়ীঘর দুয়ার—মানুষের কারিগরিতে তাহার দেবত্ব ডুবিয়া গিয়াছে। সিমলা বড়লাটের আরাম নিকেতন। বড়লাট আর জঙ্গী ও পঞ্জাবী দুই ছোট লাট একত্র হইয়া ঐ স্বাস্থ্য নিবাসের যথা সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়াছেন। 'জাকো' যক্ষপতির বাসগৃহ বলিয়া মনে হইল না। সেখানে একজন সন্ন্যাসী এক দল বানর সৈন্যের সেনাপতি হইয়া বাস করিতেছেন। সিমলায় একজন ফিরিঙ্গি সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া হিন্দু যোগীর ন্যায় জীবন যাপনে ব্রতী হইয়াছেন।

নাসিক

নাসিক দাক্ষিণাত্যের বারাণসী, গোদাবরীতীরে অবস্থিত। ইহাও একটি বহুযাত্রী সমাকীর্ণ ঐ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। রাম সীতার বনবাস সম্বন্ধে রামায়ণে যে সকল ঘটনা বর্ণিত আছে ইহা তাহার রঙ্গভূমি। নদীর এ পারে পঞ্চবটী, পরপারে ত্রিম্বক তীর্থ। পঞ্চবটী দণ্ডকারণ্যের সেই প্রদেশ রামচন্দ্র সীতাদেবীর সঙ্গে বনবাসে গিয়া যাহার আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং যাহা সীতা অযোধ্যা

হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া দ্বিতীয়বার দর্শন করেন। এই দ্বিতীয় বনবাসের কথা লইয়া ভবভূতির "উত্তর চরিত" নাটক বিরচিত। পঞ্চবটীতে সীতারামের বনবাসের স্মৃতিচিহ্ন সকল রক্ষিত হইয়াছে—রামকুণ্ড যেখানে রামচন্দ্র স্নান করিতেন, সীতাগুম্ফ যেখান হইতে রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ হয়, যেখানে সূর্পনখা লক্ষ্মণের মন ভুলাইতে গিয়া নাককাণ হারাইয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হয়, পাণ্ডারা এই সকল মনঃকল্পিত স্থান দেখাইয়া যাত্রীদের কৌতূহল উদ্দীপন করে। কেহ কেহ বলে, সূর্পনখার নাসিকা ছেদের প্রবাদ হইতে 'নাসিক' নামের ব্যুৎপত্তি। এই কি সত্যই সেই রামায়ণের পঞ্চবটী? ইহা নিঃসন্দেহ স্থির করা যায় না। পাণ্ডারা নিজেদের লাভ হিসাবে যাহা বলে তাহা বেদবাক্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না; কিন্তু তাদের কথায় সন্দেহ যাই থাক্ এটা ত নিশ্চয় যে কবিকীর্ত্তিত পুরাণো গোদাবরী এখনো যেমন তেমনিই রহিয়াছে। সেই নদী তাহার প্রাচীন স্মৃতি লইয়া এখনো পর্য্যন্ত সমানভাবে প্রবাহিত হইতেছে, তাহার সঙ্গগুণে নাসিকের যে পদগৌরব তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে?

নাসিকে একটি মুসলমান যুবকের সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়, তাহার নাম আবদুল হক। লোকটা খুব মিশুক, চতুর ও উদ্যমশীল, নিজগুণে নিজের ভাগ্যলক্ষ্মীকে দাসীরূপে বশ করিয়া লয়। আমাদের সঙ্গে তিনি ভাই বোন পাতাইয়াছিলেন—আমি তাঁর ভাইসাহেব, আমার স্ত্রী ভানসাহেব। আমাদের বাড়ী সর্ব্বদাই যাওয়া আসা করিতেন ও আপনার জীবনের সমস্ত ভাবি সঙ্কল্প লইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেন। সে সময়ে তিনি পুলিশের এক সামান্য কর্ম্মচারী ছিলেন, পরে হাইদ্রাবাদে গিয়া নিজামের চাকরী গ্রহণ করেন। সেখানে তাঁহার উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্র পাইলেন। ক্রমে নিজ উদ্যোগ ও পরিশ্রমে উচ্চপদে আরোহণ করিলেন ও যিনি সামান্য আবদুল হক নামে পরিচিত ছিলেন তিনি সর্দ্দার দিলার-উদ্দৌলা উচ্চ হইতে উচ্চতর পদবী উপার্জ্জন করিলেন। হাইদ্রাবাদে তিনি নিজামের ষ্টেট রেলওয়েতে নিযুক্ত হইয়া সেই সংক্রান্ত কার্য্যে ইংলণ্ডে গিয়া বিলক্ষণ খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করেন। বোম্বায়ে তিনি বিস্তর বিষয় সম্পত্তি করিলেন এবং সেখানকার এক নামাঙ্কিত বড় হোটেল (Watson's Hotel) ক্রয় করিয়া তাহার অর্দ্ধস্বামী হন। প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াও তিনি তাঁহার গরীব ভাইবোনকে ভোলেন নাই। আমরা যখনি বোম্বায়ে যাইতাম, নিজ হোটেলে আমাদের আতিথ্য করিতেন, আমাদের খাইখরচার বিল পাঠাইতেন না। ভান সাহেবের খাতিরে আমরা তাঁর হোটেলে গিয়া দিব্য আরামে কাল কাটাইতাম। অনেক বৎসর হইল, তাঁর মৃত্যু হইয়াছে। মহম্মদী আইন অনুসারে আমরা তাঁর বিষয়ের অংশীদার। তাঁহার মৃত্যুর পর আমার এক বন্ধু আমাকে রঙ্গ করিয়া বলেন "আমি ভেবেছিলাম মৃত্যুর সময় ভাইসাহেব তাঁর উইলে তোমাদের স্মরণ করবেন, কৈ তা ত কিছু করলেন না?" করেন নাই সত্য, আমরাও তাঁর বিষয়ের অংশ দাবী করিয়া কোর্টে গিয়া মকর্দ্দমা করি নাই।

লেনা

লেনার গুহামন্দির সহর হইতে তিন ক্রোশ দূরস্থিত একটি বৌদ্ধ মন্দির। ভিতরে অনেকগুলি প্রস্তরখোদিত বৌদ্ধ-বিহার ও চৈত্য দেখা যায়। ইহার কোন কোন অংশের নির্ম্মাণকাল খৃষ্টাব্দ ১৫০, কতক বা আরো প্রাচীনতর বলিয়া অনুমিত হয়। মন্দিরগুলি এখনো একপ্রকার অক্ষত রহিয়াছে এবং গুহার অভ্যন্তরস্থ মূর্ত্তিগুলির অবস্থাও নিতান্ত মন্দ নহে।

পশ্চিম ভারতে গৃহনির্ম্মাণ কৌশলের দৃষ্টান্তস্বরূপ অনেকানেক গুহামন্দির ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দেখা যায়। ইহাদের কতক হিন্দু, কতক বা বৌদ্ধ-মন্দির। ইহাদের মধ্যে এলিফান্টা গুহামন্দির বিশেষ দ্রষ্টব্য।

এলিফান্টা

যিনি বোম্বায়ে ব্যাড়াইতে আসিয়াছেন তিনি যেন এলিফান্টা না দেখিয়া বাড়ী না ফেরেন। এই এলিফান্টা দ্বীপে যে সমস্ত গুহামন্দির আছে তাহা পাহাড় খুদিয়া নির্ম্মিত।

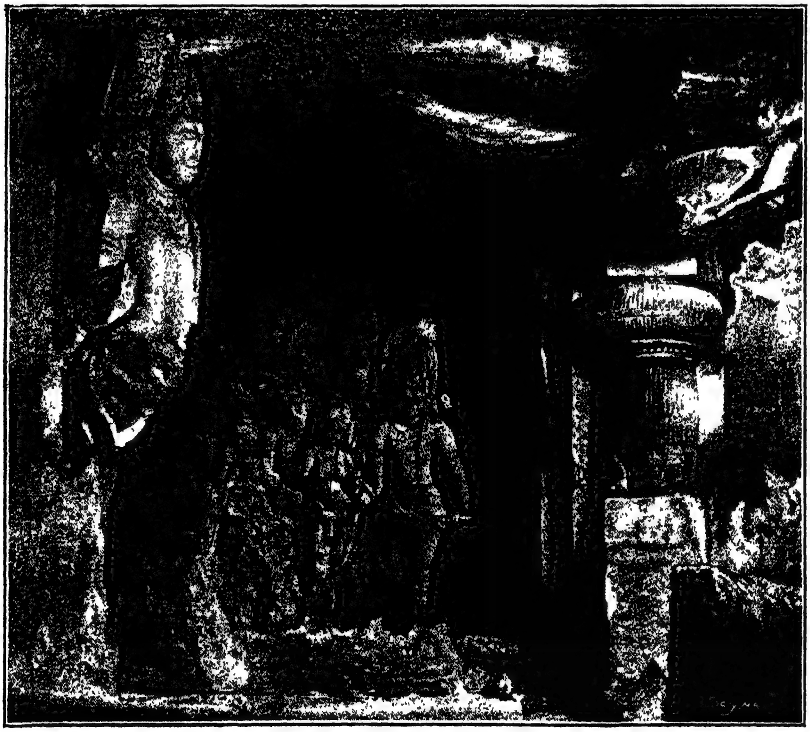

এলিফান্টা গুহা

আপলো বন্দর হইতে ষ্টীমারে করিয়া এই দ্বীপে এক ঘণ্টায় যাওয়া যায়, বন্দর বোটে করিয়া গেলে আর একটু বেশী সময় লাগে। যাত্রীদের সুবিধার জন্য বড় বড় পাথর ফেলিয়া সমুদ্রতীর হইতে গুহামুখ পর্য্যন্ত এক সোপানপথ প্রস্তুত, কিন্তু ভাটার সময়

নৌকা কাছে ঘেঁসিতে পারে না, তীর হইতে অনেক দূরে রাখিতে হয়। নামিবার স্থানে পূর্ব্বকালে একটি হস্তীর বিশাল পাষাণমূর্ত্তি ছিল, তাহা হইতে পোর্ত্তুগীজ লোকেরা এই দ্বীপের নামকরণ করিয়াছে। দ্বীপে এইক্ষণে এই হস্তীমূর্ত্তির চিহ্নমাত্র নাই, তাহার ভগ্নাবশিষ্ট পিণ্ড বোম্বায়ের ভিক্টোরিয়া উদ্যানে রক্ষিত হইয়াছে। গুহার প্রবেশদ্বারটি বেশ বড়, ও সারি সারি চারি স্তম্ভের মধ্য দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। এই সকল স্তম্ভ প্রকাণ্ড প্রস্তরময় ছাদভার বহন করিতেছে। স্তম্ভের সংখ্যা ছোট বড় মিলিয়া ৪০, তাহার কয়েকটি ভগ্নদশাপন্ন। মন্দিরের প্রবেশদ্বার হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রায় ১৩০ ফীট দীর্ঘ ও পূর্ব্বদ্বার হইতে পশ্চিম দ্বার পর্য্যন্ত ততটা প্রস্থ।

এই মন্দির এইক্ষণে নিত্যনিয়মিত পূজার কার্য্যে ব্যবহৃত হয় না, তথাপি কোন কোন শৈব উৎসবে তথায় হিন্দুযাত্রীর সমাগম হয় ও শিবরাত্রি উপলক্ষে এক হিন্দু মেলা জমে। এলিফাণ্টা যে শৈবমন্দির এই মেলার প্রচলনই তাহার প্রমাণ কিন্তু তাহার আরো সুস্পষ্ট প্রমাণ মন্দিরের অভ্যন্তরেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার অধিকাংশ মূর্ত্তিই শৈবমূর্ত্তি। উত্তর দিক হইতে প্রবেশ করিয়া সম্মুখে ব্রহ্মাবিষ্ণু-মহেশ্বরের ত্রিমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মার বামে বিষ্ণু দক্ষিণহস্তে প্রস্ফুটিত পদ্ম ধরিয়া আছেন; দক্ষিণে মহাদেব— তাঁহার হাস্যদৃষ্টি করস্থিত ফণিকণার উপর নিপতিত! নরকপাল ও বিল্বপত্র তাঁহার শিরোভূষণ।

ত্রিমূর্ত্তির দক্ষিণে অর্দ্ধ নারীশ্বর। বামার্দ্ধ গৌরী ও দক্ষিণার্দ্ধ মহাদেবের মূর্ত্তি। মহাদেবের চারি হস্তের এক হস্ত নন্দী শৃঙ্গোপরি স্থাপিত। এই মূর্ত্তির দক্ষিণে হংসবাহন চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা ও বামে গরুড়বাহন বিষ্ণু। উপরিভাগে ও পশ্চাতে অন্যান্য দেবদেবর্ষিগণ বিরাজ করিতেছেন। ইন্দ্রদেব ঐরাবতপৃষ্ঠে আসীন।

ত্রিমূর্ত্তির বামে হরপার্ব্বতীর বিশাল মূর্ত্তিদ্বয়। হরশিব হইতে গঙ্গাযমুনা সরস্বতী নিস্যন্দিত। শিবের দক্ষিণে তাঁহার অন্যান্য অনুচরগণ। পার্ব্বতী শিবের দিকে ঝুঁকিয়া এক পিশাচীর উপর বামহস্তে ভর দিয়া আছেন, তদুপরি গরুড়াসন বিষ্ণু। সর্ব্বোপরি ছয়টি মূর্ত্তি, তাহার দুইটি নারী অন্যগুলি নরমূর্ত্তি।

ত্রিমূর্ত্তির আরো একটু বামস্থিত পশ্চিম প্রকোষ্ঠে হরপার্ব্বতীর বিবাহসভা। একজন পুরোহিত লজ্জাশীলা বধূকে আগু বাড়াইয়া দিতেছেন।

অপর দিকের প্রকোষ্ঠে গণেশের জন্ম-অভিনয়। হরপার্ব্বতী কৈলাসপর্ব্বতে একাসনে উপবিষ্ট—আকাশ হইতে দেবগণ তাঁহাদের উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতেছেন। পার্ব্বতীর পশ্চাতে একটি ধাত্রী শিশু কোলে করিয়া আছে।

দক্ষিণ হইতে উত্তরমুখে ফিরিয়া অন্য এক প্রকোষ্ঠে দেখিবে রাবণ কৈলাসপর্ব্বত সরাইয়া লঙ্কায় লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। এদিকে পর্ব্বত কম্পমান দেখিয়া পার্ব্বতী ভয়ে জড়সড়। মহাদেব তাঁহার পদাঙ্গুলি দ্বারা রাবণের শিরোপরি পর্ব্বত এমন জোরে চাপিয়া ধরিলেন যে তাহার তলে দশানন

দশসহস্র বৎসর চাপা পড়িয়া থাকেন, অবশেষে ব্রহ্মার পুত্র পুলস্ত্য আসিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করেন।

ইহা হইতে পশ্চিম দিকের প্রকোষ্ঠে দক্ষযজ্ঞ বৃত্তান্ত খোদিত দেখা যায়। অষ্টভুজ কপালমাল রুদ্রমূর্ত্তি বীরভদ্র দক্ষবধে নিযুক্ত— তাঁহার উপরিস্থিত একলিঙ্গের চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট দেবগণ হত্যাকাণ্ড সভয়ে দর্শন করিতেছেন।

আরো কতক পা চলিয়া গেলে প্রবেশ-দ্বারের কাছাকাছি মহাদেবের অষ্টভুজ ভৈরবমূর্ত্তি ও যোগাসনস্থিত মহাযোগী এই মূর্ত্তিদ্বয় দৃষ্ট হইবে।

এই সকল দেবমূর্ত্তি কল্পনাযানে আমাদিগকে দেবসভায় লইয়া যায়। কোথাও দ্বারপালগণ পিশাচসঙ্গে যষ্টিহস্তে দণ্ডায়মান, কোথাও হরপার্ব্বতীর বিবাহোৎসব, কোথাও কৈলাসে তাহাদের ঘরকন্না, কোথাও মহাদেব ভূতগণসাথে তাণ্ডবনৃত্যে উন্মত্ত, কোথাও তিনি কপালধারী রুদ্রমূর্ত্তি, কোথাও ধ্যানমগ্ন মহাযোগী। কোন স্থানে দেখিবে কমলাসন ব্রহ্মা, কোথাও শঙ্খচক্রধারী বিষ্ণু, কোথাও ঐরাবতবাহন ইন্দ্রদেব, গণেশ ঠাকুর, কামদেব, তিলকধারী জটায়ু, কৈলাসতলে রাবণ, কোথাও গঙ্গা লক্ষ্মী সরস্বতী মূর্ত্তিমতী। দুঃখের বিষয় যে খোদিত মূর্ত্তি সকল বিকলাঙ্গ, ভাঙ্গাচোরা অবস্থায় পড়িয়া আছে। ইহাদিগকে পূর্ব্বকালে অনেক উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছে। এক ত কালের দুর্ব্বার হস্ত, তাহার উপর মুসলমান ও খৃষ্টানের অত্যাচার। এই মন্দির তাহার পূর্ণযৌবনে যে কি সুন্দর ছিল তাহার চিত্র কল্পনাতেই রহিয়া যায়।

অজন্তা

এতদ্ভিন্ন কার্লী কাহ্নেরী সালসেট প্রভৃতি গুহামন্দির আরো অনেকগুলি আছে তন্মধ্যে অজন্তা ও ইলোরা এই দুইটি সবিশেষ বর্ণনীয়। এই দুইটি ক্ষেত্রই নিজাম রাজ্যের অন্তর্ভূত। অজন্তার মন্দির পশ্চিম ঘাটের এক পাহাড়ে খোদিত, খানদেশে থাকিতে একবার ইহা দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। পাহাড়ের গা দিয়া একটি ঝরণা পড়িতেছে, ৩০ ফীট উচ্চ হইতে পড়িয়া নীচে কতকগুলি জলকুণ্ড সৃজন করিয়াছে, এই নিম্নভূমি একটি সুন্দর বনভোজনের স্থান। গুহার পথে ঝরণাটি অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। গুহাগুলি একটী নিভৃত প্রদেশে অবস্থিত, পাহাড়ের গায়ে ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় খোদিত। দূর হইতে সেগুলি সারি সারি ছোট ছোট পায়রার খোপের মত দেখায়। গুহাগুলি দুই শ্রেণীর, বিহার ও চৈত্য। চৈত্য ভিক্ষুদের ভজন পূজনের স্থান, বিহার তাহাদের বাসগৃহ। খানিকদূর গিয়া সারি সারি বিহারের বারাণ্ডার থাম আর গোল গোল চৈত্য গুহার খিলানের আকৃতি চোখে পড়ে। এই পার্ব্বত্য আশ্রমটী অতি মনোহর নির্জ্জন স্থান, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের তপস্যার উপযুক্ত স্থান বটে।

গুহাচিত্রেতেই অজন্তার বিশেষত্ব। তাহার সকল গুহাই যে চিত্রিত তাহা নহে। সব শুদ্ধ প্রায় ২৮টা গুহা আছে তাহার ৭।৮টির গায়ে ছবি আঁকা দেখা যায়। প্রথম নম্বর গুহা হইতে বুদ্ধদেবের বাল্য-কাহিনী আরম্ভ করিয়া ২৬ নম্বর গুহায় তাঁহার পরিনির্ব্বাণের

চিত্র দেওয়া আছে। এবং প্রসঙ্গ ক্রমে জাতকাদি গল্পের ছবি আছে। অজন্তার স্থানে স্থানে তখনকার প্রচলিত উপকথা ও চিত্রাবলীর অনেকগুলি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

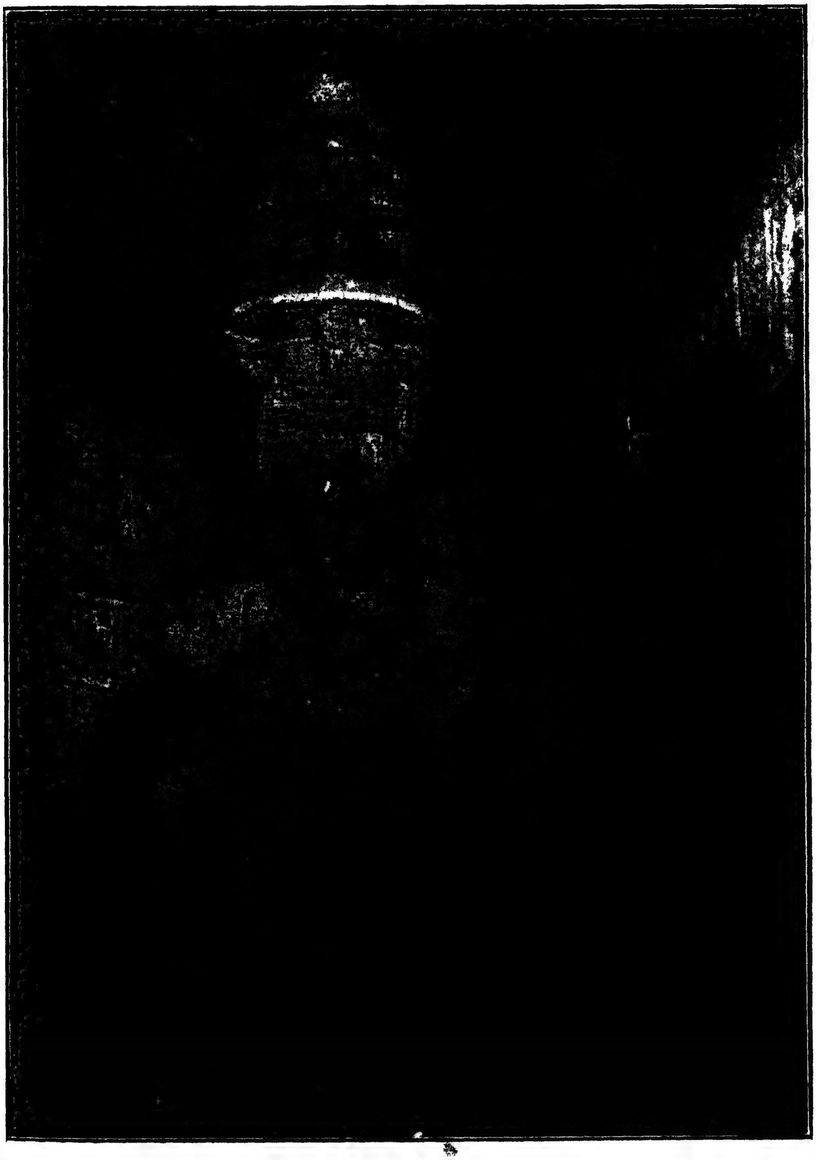

১৯নং গুহার ভিতরের স্তূপ ও বুদ্ধমূর্ত্তি

অবশিষ্ট গুলি চিত্রকরেরা যতদূর সাধ্য সংস্করণ. চেষ্টা করিতেছেন এবং আবশ্যক মত প্রতিলিপি তুলিয়া লইতেছেন। আমাদের একটি আত্মীয়, অসিতকুমার হালদার, আর্ট স্কুলের ছাত্র,

অজন্তার শিল্প দর্শনে গিয়াছিলেন। তিনি বলেন "অজন্তার বেশীর ভাগ ছবি একেবারে লুপ্ত ও নষ্ট হয়ে গেলেও এখনো তাকে অক্ষয় ভাণ্ডার বলা চলে। যে সব ছবি এখনো বর্ত্তমান আছে আমরা যদি কেউ আজীবন ধবে সেগুলির প্রতিলিপি করি, তবে এ

অজন্তা গুহার একটি নারী চিত্র

জীবনে সেগুলি শেষ করে উঠতে পারি কি না সন্দেহ।" মোগল চিত্রের তুলনায় এই সকল চিত্রের কথায় তিনি বলিতেছেন "মোগল ছবি সাধারণতঃ ছোটই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। সূক্ষ্মত্ব হিসাবে সে সকল চিত্র অতুলনীয় কিন্তু প্রশান্ত ভাবপূর্ণ বড় বড় চিত্র দেখতে গেলে অজন্তাকেই প্রাধান্য দিতে হয়।"

Mrs. Herringham নামে একটি চিত্র-শিল্পী মহিলা অজন্তার চিত্রোদ্ধার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। সেই সকল চিত্রের শিল্প-নৈপুণ্যের প্রশংসা তাঁহার মুখে আর ধরে না। অসিত কুমারকে তিনি বলিতেন "আমাদের দেশে এত প্রাচীন কালের আঁকা এ রকম নিখুঁত ছবি থাকলে আমাদের নিজেদের জীবনের চেয়েও তাদের বেশী যত্ন করতুম। বড় দুঃখের বিষয় যে তোমরা এমন অমূল্য বস্তুর আদর জান না।" এই বিদুষী মহিলার কার্য্য শেষ হইলে এই সকল অপূর্ব্ব গুহাচিত্রের অনেক তথ্য জানা যাইবে, আশা করা যায়।

এই সকল প্রাচীন চিত্র যেমন অজন্তার গৌরব, তাহার খোদিত মূর্ত্তিগুলিও তেমনি প্রশংসনীয়। ভিন্ন ভিন্ন গুহা বুদ্ধদেবের ভিন্ন ভিন্ন ভাবের মূর্ত্তিতে অলঙ্কৃত। যৌবনে তথাগত, মাতৃক্রোড়ে শিশু, ষড়রিপু প্রলোভনে বিজয়ী ধ্যানীবুদ্ধ, পরিনির্ব্বাণশায়ী বুদ্ধ—বুদ্ধদেবের এই ছোট বড় নানান্ মূর্ত্তি শিল্প কৌশলে অদ্বিতীয়। বুদ্ধমূর্ত্তি ভিন্ন অনেকানেক নরনারী ও হস্তী মূর্ত্তি এবং ভিক্ষুদের শয্যাগৃহ প্রভৃতি খোদিত জিনিষ আছে সকলি চমৎকার। অসিতকুমার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে খোদিত চিত্রের গঠন ও সজ্জার সহিত লিখিত চিত্রের গঠনাদির বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে।

এই সমস্ত বৌদ্ধ মন্দিরের নির্ম্মাণকাল ৮০০ বৎসর ব্যাপী—অশোকের রাজত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া বৌদ্ধ যুগের শেষভাগ পর্য্যন্ত ধরা যাইতে পারে। শেষ ভাগে বৌদ্ধধর্ম্ম যেমন ব্রাহ্মণ্যের দিকে ঝুঁকিয়াছে, মন্দির নির্ম্মাণেও সেই মিলনের চেষ্টা লক্ষিত হয়।

কারওয়ার

কারওয়ার কর্ণাটকের প্রধান নগর। আমি বোম্বায়ে যে যে স্থানে কর্ম্ম করিয়াছি, তন্মধ্যে কারওয়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য হিসাবে সর্ব্বাগ্রগণ্য, ইহা সমুদ্রতীরবর্ত্তী একটি সুন্দর বন্দর, গিরি নদী উপবনে সুশোভিত। প্রশস্ত বালুতটের প্রান্তে বড় বড় ঝাউ গাছের অরণ্য, এই অরণ্যের এক সীমায় কালানদী নামে একটি ক্ষুদ্র নদী তাহার দুই গিরিবন্ধুর উপকূল রেখার মাঝখান দিয়া সমুদ্রে আসিয়া মিলিয়াছে। জজের বাঙ্গলা ব্রহ্মদেশ হইতে আনীত বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড দিয়া নির্ম্মিত। সমুদ্র-তীরে তাহার ভিত্তিভূমি, এত কাছে যে বর্ষার সময় সমুদ্রের ঢেউ বাঙ্গলার সীমানায় আসিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে থাকে। সমুদ্রের অবিশ্রান্ত গর্জ্জন প্রথমে অসহ্য বোধ হয়, ক্রমে অভ্যাস-বশতঃ তাহার কঠোরতা মন্দীভূত হইয়া যায়। সমুদ্রের দৃশ্য সকল সময়েই মনোরম আর সমুদ্র স্নানে বড়ই আরাম। সমুদ্রে সাঁতার দিবার আরাম, এমন অন্য কোথাও ভোগ করা যায় না। বন্দরের এই শৃঙ্খলবদ্ধ সমুদ্র পুরীর সমুদ্র অপেক্ষা অনেক শান্ত, সাঁতার দিয়া অনেক দূর যাওয়া যায়। বাঙ্গলার ক্রোশভর দূরে গুঢেলী নামে একটি ছোট্ট পাহাড় আছে, উপরে একটি ক্ষুদ্র কুটীর, সেখানে গিয়া আমাদের অনেক সময় বন ভোজন হইত। সমুদ্রের নানা জাতীয় সুস্বাদু মৎস্য আমাদের ভোগে আসিত; মৎস্যজীবির ভাগ্যে এমন স্থান সহজে মেলে না। বন্দরে আঞ্জদ্বীপ নামে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ দেখা যায়, পোর্ত্তুগীস নাবিকগণ ইউরোপ হইতে ভারতে

আসিয়া যেখানে প্রথম পদার্পণ করে সে এই দ্বীপ। কালানদীতে অনেক সময় আমরা নৌকা করিয়া বেড়াইতাম তাহার পরপারে হাইদার আলির গিরিদুর্গ একটি দেখিবার স্থান। কানাড়া জেলায় আরো কত কত দর্শনীয় জিনিস আছে তন্মধ্যে গেরসপ্পা জলপ্রপাত ভুবনবিখ্যাত। তীর্থস্থানের মধ্যে গোকর্ণ তীর্থ উল্লেখ যোগ্য, যাহা রঘুবংশে 'গোকর্ণ নিকেতমীশ্বরং' বলিয়া বর্ণিত—আমরা কারওয়ারে থাকিতে সেই তীর্থে গিয়া মহাদেবের মন্দির দর্শন করিলাম।

নারেল পুণম

বোম্বাই, কারওয়ার এই সকল সমুদ্র তীরের জায়গায় একটা পরব হয় যা অন্যত্রে নাই—তার নাম "নারেল পুণম," শ্রাবণী পূর্ণিমা তার সময়। এই সময় বর্ষা ঋতুর অবসান বলিয়া ধার্য্য। এই সময় হইতে নাবিকদের জন্য (দিশি নাবিক, পি এণ্ড ও কোম্পানির জন্য নয়) সমুদ্র পথ উন্মুক্ত, শুভযাত্রা উদ্দেশে ফলফুল নারিকেল উপহার দিয়া সমুদ্রের আরাধনা করিতে হয়। হিন্দুগণ ছোট বড় সকলে সাজসজ্জা করিয়া নারিকেল ও পুষ্পহস্তে সমুদ্রাভিমুখে বাহির হয়। লোকেরা ঝাঁকে ঝাঁকে সাগর অর্চ্চনায় সম্মিলিত—পুরোহিতের মন্ত্রপূত চাউল দুধ নারিকেল প্রভৃতি সামগ্রী সকল সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয়। তাহার সকলি যে বরুণদেবের ভোগে আইসে তাহা নয়। নারিকেল নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র একদল কুলী তাহা সাঁতার দিয়া ধরিতে যায় ও কাড়াকাড়ি করিয়া যে পারে বরুণের ধন লুট করিয়া আনে। সমুদ্র তাহাতে বিরক্তি প্রকাশ করেন না, বরং উদার হস্তে তাহা কাঙ্গালীদের বিতরণ করেন। বোম্বায়ে এই উৎসবে লোকের বিশেষ উৎসাহ। ময়দানে মেলা বসিয়া যায়। কোথাও খ্যালনা বিক্রী, কোথাও মিষ্টান্নের দোকান বসিয়াছে, কোথাও বা একদল পালওয়ানের মল্লযুদ্ধ চলিতেছে ও মধ্যে মধ্যে জেতার প্রতি দর্শকমণ্ডলীর করতালি সাবাসধ্বনি উত্থিত হইতেছে। কোথাও একদল নর্ত্তকী নৃত্য করিতেছে। কাঙ্গালীরা ভিক্ষা আদায়ের জন্য কতপ্রকার ফন্দী করিয়া ব্যাড়াইতেছে। ওদিকে একজন গণকঠাকুর হাত দেখিয়া শুভাশুভ গণিয়া দিতেছেন, তাঁহার ভাবভঙ্গী দেখিলে বোধ হয় যেন সত্যই তাঁহাতে দৈবশক্তি মূর্ত্তিমতী। অন্যত্রে নাগর দোলায় বালকেরা ঘূরপাক দিতেছে। নানা দিক হইতে লোকজনের যাতায়াত, সকলেই দুদণ্ডের জন্য আমোদ আহ্লাদে যোগ দিতে তৎপর।

কানাড়ায় চন্দন বৃক্ষ জন্মে, সেখানকার চন্দন কাঠের উপর নক্সাকাটা বাক্স টেবিল পরদা প্রভৃতি অনেক জিনিস তয়ের হয়। তাহাদের কারুকার্য্য প্রশংসনীয়। অনেকানেক কারিগর এই কাজ করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করে। কারওয়ারের কথায় কর্ণাটী নর্ত্তকীদের লোভনীয় নৃত্যগীতের উল্লেখ না করিলে এ প্রসঙ্গ অঙ্গহীন হইয়া পড়ে কিন্তু প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে তাহার সবিস্তার বিবরণ হইতে বিরত হইলাম। একটি কথা মনে হইতেছে বলি, আমরা কারওয়ারে একবার একটি নর্ত্তকীর মুখে জয়দেবের কাব্যগীত শুনিয়াছিলাম। গান অতি চমৎকার, আর তেমন শুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ বাঙ্গালা দেশের বড় বড় পণ্ডিতের

মুখেও শুনা যায় না। সংস্কৃত নাটকে স্ত্রীলোকদের প্রাকৃত ভাষায় কথা কহিবার রীতি আছে কিন্তু সংস্কৃত যে তাহাদের মুখে কত ভাল শুনায় তাহা বুঝিতে পারিলাম। কর্ণাট সম্বন্ধীয় আরো অনেক বলিবার আছে—নূতন জিনিস নূতন নূতন লোক কিন্তু সে সব অনেক কালের কথা, লিখিবার মত তেমন স্পষ্ট মনে হইতেছে না। জায়গাটার কেবল এক দোষ যে যাতায়াতের অসুবিধা। সপ্তাহে সপ্তাহে একটা মেলষ্টীমার আমাদের ডাক বহন করিয়া আনিত; কিছুকাল পরে তার আসা বন্ধ হইল, তখন বর্ষাকালে কারওয়ার যেন বন্দীশালার মত বোধ হইত। কিন্তু

একোহি দোষো গুণ সন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ!
বহুগুণে একটি দোষ জানা নাহি যায়,
চাঁদের কলঙ্ক যথা কিরণে লুকায়।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চা প্রসঙ্গ

বহুদিন অবধি এদেশে চায়ের আবাদ চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু সম্প্রতি এই ব্যবসায় যেরূপ লাভ জনক দাঁড়াইয়াছে এবং জন সাধারণের যেরূপ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে তাহাতে বোধ হয় চা সম্বন্ধে এখন কিছু আলোচনা করিলে তাহা নিতান্ত অসাময়িক এবং অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

আসামের সর্ব্বত্র ও বঙ্গদেশের কয়েকটি জেলায়—প্রধানত দারজিলিং ও জলপাইগুড়ীতে যথেষ্ট চা উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সকল স্থানে লক্ষ লক্ষ বিঘা জমীতে চা আবাদ হইতেছে এবং চা ব্যবসায়ের দ্বারা এই সকল স্থানের যেরূপ উন্নতি এবং পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে তাহা বাস্তবিক স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। যে সকল স্থান স্মরণাতীত কাল হইতে বন্য শ্বাপদসঙ্কুল অনুৎপাদিকা বন্ধুর ভূমিরূপে লোকলোচনের অন্তরালে অবস্থিত ছিল সেই সকল স্থানে অরণ্যাণী এখন বিরলপাদপ ও হিংস্র জন্তু শূন্য হইয়া পরম রমণীয় চা বাগানে পরিণত হইয়াছে এবং জনকোলাহলমুখরিত হইয়া কোটি কোটি মুদ্রার সংস্থান করিতেছে।

জলপাইগুড়ী জেলার একডুয়ার প্রদেশেই প্রায় দুই শতের অধিক বাগান রহিয়াছে; তন্মধ্যে প্রায় ৩০টি বাগান দেশীয় লোকের দ্বারা যৌথকারবারে চালিত। এই ৩০টি বাগানের মোট ভূমির পরিমাণ ৩০,০০০ একর। ডুয়ার প্রদেশস্থ সমস্ত বাগানের ভূমির পরিমাণ প্রায় ২,৪৬,০৬৩ একর। তন্মধ্যে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ৯০,৮৫৭ একরে চা আবাদ হইয়াছে ও অবশিষ্ট ১,৫৫,২০৪ একর ব্যবসায়ীদের অধীনে আছে; ঐ অবশিষ্ট অংশ ক্রমে আবাদ হইবে। গত বৎসর ৮৩,৪২১ একর জমী হইতে "পাতিতোলা" হইয়াছে। মোট উৎপন্ন চায়ের পরিমাণ ৪৮,৮২০,৬৩৭ পাউণ্ড, অর্থাৎ প্রতি একরে গড়ে ৫১৪ পাউণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে। গত বৎসর যেরূপ বাজার দর গিয়াছে তাহাতে ঐ মূল্য প্রায় ২,১৩,৫৯,০২৭ টাকা। এই সকল বাগানে গড়ে দৈনিক ৭৫,৩১৫ কুলি কাজ করিয়াছে; ইহার মধ্যে ৫৬,৩৯৩ স্থায়ী ও অবশিষ্ট অস্থায়ী কুলি।

জলপাইগুড়ীর দেশীয় সমিতি চালিত চাবাগানসমূহের বিশেষত্ব।—জলপাইগুড়ীতে দেশীয় চালিত চা-বাগান সকলের সংখ্যা ইউরোপীয় বাগান অপেক্ষা অত্যন্ত কম হইলেও, লাভের হার দেশীয় বাগানে অত্যন্ত বেশী। দেশীয় বাগান ইউরোপীয় বাগান অপেক্ষা পাঁচগুণ, সাতগুণ, এমন কি দশগুণ অধিক লাভও দিয়া থাকে। সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে কয়েকটি দেশীয় চা বাগানের নাম ও লাভের শতকরা বার্ষিক হার প্রদর্শিত

হইল, তাহা হইতে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে ব্যবসায়ের ইতিহাসে চা কিরূপ যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে :—

যে বৎসর শতকরা যত টাকা লাভ দিয়াছে

১৯০৬	'০৭	'০৮	'০৯	'১০
গুর্জ্জন ঝোরা বাগিচা				
৮০	১২৫	১১০	১৫০	১১০
চা মুর্চি বাগিচা				
১০০	১২০	৫০	১২০	১৫০
বর্ণারপুর (আসাম)				
৪০	৬০	৩২	৪৮	৪৮

জলপাইগুড়ীর প্রত্যেক বাগিচাই আশাতীত লাভ দিয়া আসিতেছে। উপরিউক্ত প্রথম দুইটি বাগানের প্রতি ৫০৲ টাকার এক এক অংশ আজ কাল ৯০০।১০০০ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। এতদ্ব্যতীত রামঝোরা প্রভৃতি কয়েকটি নূতন বাগান যাহা ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে খোলা হইয়াছে এবং যাহা এখনও লাভ দিতে আরম্ভ করে নাই, তাহার ৫০৲ টাকার অংশের বর্ত্তমান বাজার দর ৩০০।৩৫০ টাকা।

আসামই ভারতীয় চা ব্যবসায়ের আদি লাট। আবার চায়ের উপযোগী সর্ব্বোৎকৃষ্ট জমী শ্রীহট্টস্থ করিমগঞ্জেই অধিক; সুতরাং শ্রীহট্ট সম্বন্ধেও ২।১টি কথা বলা সঙ্গত। এই জেলাতে প্রায় ৮০, ০০০ একর জমিতে চা আবাদ হইতেছে; এতদ্ব্যতীত ব্যবসায়ীদের হস্তগত অনাবাদি জমীর পরিমাণও অল্প নহে। বিগত ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ঐ ৮০,০০০ একর জমিতে প্রায় ৩,৮৭, ৯২, ৯৫১ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইয়াছিল। প্রচলিত বাজার দর অনুসারে ঐ চা-র মূল্য প্রায় ১, ৫০, ০০,০০০ টাকা। তন্মধ্যে দেশীয় চালিত বাগানে প্রায় ১৫, ০০, ০০০ পাউণ্ড জন্মিয়াছিল। উহার মূল্যও ৪, ৫০, ০০০ টাকার ন্যূন নহে। ঐ জেলায় বিশেষত করিমগঞ্জ মহকুমায়—চায়ের উপযোগী যথেষ্ট জমী রহিয়াছে। বিশেষজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন সমগ্র আসাম ও বঙ্গদেশ মধ্যে করিমগঞ্জস্থ ভূমির ন্যায় উৎপাদিকা শক্তি অন্য কোন ভূমিরই নাই।

চায়ের দ্বারা দারজিলিংএর যে কি প্রকার উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহা নিম্ন লিখিত বিবরণ হইতে বেশ প্রণিধান করা যাইবে। যদিও বহু পূর্ব্ব অবধিই ঐ জেলায় চা আবাদ হইয়া আসিতেছিল, তথাপি প্রকৃত প্রস্তাবে ইংরাজী ১৮৭৪-০৫ সাল হইতে তথায় রীতিমত চাষ আরম্ভ হয় এবং ১৮৭৬-৭৭ খ্রীষ্টাব্দে মোট ১৩টি মাত্র বাগান খোলা হয়। ঐ সমস্ত বাগানের ভূমি পরিমাণ মাত্র ৮১৪ একর ছিল; কিন্তু বর্ত্তমানে কার্য্যক্ষেত্র এরূপ বর্দ্ধিতায়ন হইয়াছে যে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে এক মাত্র রঁাচি জেলা হইতেই ৮০, ০০০ কুলি বাগানে কাজ করিবার জন্য আনয়ন করা হইয়াছিল। আদমসুমারিতে প্রকাশ যে বিগত ১৭।১৫ বৎসরে দারজিলিংএর লোকসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। চা-বাগান সমূহে কুলির আমদানিই ইহার এক মাত্র কারণ। অধুনা ৩৬৮ বর্গ মাইল ভূমি ব্যাপিয়া বাগান খোলা হইয়াছে ১২৭ বর্গ মাইলে রীতিমত চা উৎপন্ন হইতেছে।

জলপাইগুড়ীস্থ জনসাধারণের মনের উপর চার প্রভাব।—এই ক্ষুদ্র সহরের অধিবাসীবর্গের মনের উপর চা যে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা যিনি অন্তত কিছু দিনের জন্যও এখানে বাস করিয়া গিয়াছেন তিনিই বুঝিতে পারিয়াছেন। এখানে চায়ের কথা ভিন্ন অন্য কথা নাই বলিলেই হয়। এমন লোক অতি অল্প যাঁহারা সমস্ত দিনে অন্তত এক বারও চা প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন না কিম্বা শোনেন না। উকীল মোক্তারগণ বারলাইব্রেরিতে গিয়া চায়ের গল্প করিতেছেন, স্বল্পবিত্ত মসিজীবি কেরাণীগণের আফিসে গিয়া চায়ের গল্প করা তাঁহাদের জীবনের একটি নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম।

রমণীগণ তাঁহাদের মধ্যাহ্ন অবসর চায়ের গল্পে কাটাইতেছেন ও কাহার স্বামীর কোন্ বাগানের কত অংশ আছে তাহা প্রকাশ করিবার গর্ব্ব অনুভব করিতেছেন। বালক পুত্র বিধবা মাতার চায়ের অংশ তাহার নিজ নামে লেখাইয়া লইবার জন্য ব্যস্ত। দুবেলা মাকে তাগিদ দিতেছে। মোট কথা, আবালবৃদ্ধবনিতা—

ধনী, নির্ধন, ব্যবসায়ী, উকিল, মোক্তার, হাকিম, কেরাণী • পেয়াদা, দোকানদার কেহই চায়ের প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। এমন কি, অন্যান্য স্থানে বর নির্ব্বাচনে, বরের বাড়ী ঘর দোর আছে কি না, জমি জারাত আছে কি না ইত্যাদি বিষয় খোঁজ করিয়া থাকে; কিন্তু এখানকার লোকের অবস্থার মাপ কাঠি চা-বাগানের অংশ। অমুকের চা বাগানের কতটা অংশ আছে জানিতে পারিলেই আর অন্য খোঁজের দরকার হয় না, তাহার অবস্থার সচ্ছলতা প্রতিপাদিত হইয়া যায় ও তাহার সহিত মেয়ের বিবাহের আর কোন বাধা থাকে না।

চা বাগানের অংশ লইবার জন্য মারামারি কাড়াকাড়ি আরও আমোদজনক। কোন একটি বাগান খোলা হইতেছে খবর পাইবামাত্র দলে দলে লোক সেই ভাবী অধ্যক্ষের বাড়ীতে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করে এবং অংশের জন্য সহস্র সহস্র আবেদন পত্র পড়িতে থাকে। এইরূপে অল্প দিনের মধ্যেই সেই বাগানের মোট অংশসংখ্যার পাঁচগুণ, সাতগুণ আবেদন ভাবী অধ্যক্ষের হস্তগত হয়। লোকে টাকা লইয়া অধ্যক্ষের খোসামোদ করিতে থাকে এবং ভিন্ন স্থান হইতেও রাশি রাশি অর্থ ডাকযোগে আসিতে থাকে। এইরূপে ভাবী অধ্যক্ষের এমনি দশা হয় যে তিনি সকলকেই অংশ দিতে সমর্থ হন না, এবং এই অসামর্থ্য হেতু অনেক মনোমালিন্য ইত্যাদি ঘটিয়া থাকে। অনেক সময় সহরের মাতব্বর লোকদিগের মধ্যেও অংশ লইয়া বিশেষ গোলযোগ বাধিতে দেখা যায়। বস্তুত এখানে চা বাগান খুলিতে টাকার অভাব মোটেই হয় না।

কিন্তু আসামের অবস্থা ঠিক ইহার বিপরীত। সেখানে চা বাগানের অংশ বিক্রয় করিবার জন্য এজেণ্ট নিযুক্ত করিতে হয়। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে হয়। এবং অর্থ সংগ্রহ করিতে অপেক্ষাকৃত অধিক সময় লাগে। আসামে অংশ ক্রয়করণ-সমর্থ লোকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প ও সেখানকার বাগান সমূহের মূলধন সাধারণতঃ এখানকার কোম্পানি সকলের মূলধন অপেক্ষা বেশী; আমাদের বোধ হয় সেই কারণেই আসামের ব্যবসায়ীদের এই অসুবিধাটুকু ভোগ করিতে হয়। যাহা হোক, জলপাইগুড়ীতে চা-র উপযোগী ভূমি প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। কাজেই এখানকার ব্যবসায়ীগণ আসামে গিয়া বাগান খুলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আসামক্ষেত্রে চায়ের উপযোগী যেরূপ বিস্তীর্ণ ভূমি রহিয়াছে ও সেখানকার রাজস্ব আদি যেরূপ সুবিধাজনক, তাহাতে বোধ হয়, ঈশ্বর কৃপায়, সেখানেও চা ব্যবসায়ে ব্যবসায়ীগণ জলপাইগুড়ীর ন্যায় সফলতা লাভ করিয়া যুগান্তর উপস্থিত করিতে পারিবেন।

চা-দ্বারা জলপাইগুড়ীর উন্নতি।—

চায়ের কল্যাণে সমগ্র দুয়ার প্রদেশ যেন একটি বিস্তীর্ণ কারখানায় পরিণত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই বাগানের প্রকাণ্ড চিম্‌নি সকল অনবরত ধূম উদ্গীরণ করিয়া সগর্ব্বে তাহাদের কার্য্যশীলতার পরিচয় দিতেছে। ইউরোপীয়গণের রমণীয় বাঙ্গ্‌লা সকল কখন বা পর্ব্বত গাত্রে কখন বা সমতল ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান থাকিয়া চিত্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। বাগানের লাল রাস্তা দিয়া গাড়ী ঘোড়া ছুটিতেছে ও ট্রলি লাইনের উপর দিয়া "পাতি" পূর্ণ ট্রলি সকল সশব্দে দৌড়াইতেছে। বিদ্যুতালোক প্রভৃতি কিছুরই অভাব নাই; অর্থাৎ সমৃদ্ধির লক্ষণ সমূহ সমস্তই প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। বেঙ্গল দুয়ার রেলপথ শুদ্ধ এই চা বাগান সমূহের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত। অর্দ্ধচন্দ্রাকার রেলপথ, বাগান সকলের দ্বারে দ্বারে উহার সেবা বিতরণ করিয়া বেড়াইতেছে। সর্ব্বত্রই ডাকঘর এবং টেলিগ্রাফ-আফিস স্থাপিত হওয়ায় সংবাদ প্রেরণের কিম্বা গ্রহণের অসুবিধা বিদূরিত হইয়াছে। এ প্রদেশের অন্যান্য জেলা অপেক্ষা জলপাইগুড়ীতে ডাকঘর ও টেলিগ্রাফ অফিসের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। এই প্রদেশ লোকপূর্ণ করিবার জন্য সরকারবাহাদুর পূর্ব্বে অনেক চেষ্টা করিয়াছেন ও বিশেষ বিশেষ আইন প্রণয়ণের দ্বারা উপনিবেশিক আকর্ষণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন; কিন্তু এ সমস্ত উপায় তেমন ফলদায়ক হইতে পারে নাই। প্রবল পরাক্রান্ত সরকার বাহাদুর যাহা করিয়া উঠিতে পারেন নাই, চা-ব্যবসায় উহার যাদুদণ্ড বুলাইয়া সে কার্য্য

অনায়াসে সাধন করিয়াছে; বিগত দশ বৎসরে আলিপুর দুয়ার প্রদেশের লোক সংখ্যা দ্বিগুণ বাড়িয়াছে।

এই ব্যবসায় উপলক্ষে প্রায় ৩০০ শত ইউরোপীয় দুয়ারে বাস করিতেছেন, এবং তাঁহাদের আমোদ আহ্লাদের জন্য কোথায় বা ঘোড়দৌড়, কোথায় বা পোলো, রাগ্‌বি, হকি প্রভৃতির বন্দোবস্ত দুয়ার প্রদেশ সজীব করিয়া রাখিয়াছে; চাকরী ব্যবসায়ী অসংখ্য বাঙ্গালী বাবু, ডাক্তার ইত্যাদিও তাঁহাদের উদরান্নের সংস্থান করিতেছেন; আর সহস্র সহস্র কুলি প্রত্যেক বৎসর ভিন্ন জেলা হইতে আমদানি হইতেছে, কতক কার্য্যান্তে ফিরিয়া যাইতেছে কতক তথায় বসবাস করিতেছে।

এই চা-করদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত "ক্লাব" গৃহই জলপাইগুড়ীর শ্রেষ্ঠ অট্টালিকা। ইহার সংস্থান সংরক্ষণের জন্য বহু অর্থ ব্যয় হইয়া গিয়াছে ও হইতেছে। এতদ্ব্যতীত দেশীয় বাগান সকলের সম্পাদকের কার্য্যালয় প্রায়শ জলপাইগুড়ী সহরে স্থাপিত। এই সমস্ত আফিসেই বাগান সকলের কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। বাগান চালাইবার জন্য সময় সময় অর্থের অভাব হয় ও সে অর্থ ঋণ করিয়া চালাইতে হয়: ঋণ গ্রহণ করিতে যাহাতে অসুবিধা না হয় সেই জন্য এ সহরে ৪টি বড় বড় ব্যাঙ্ক খোলা হইয়াছে। এই সকল ব্যাঙ্ক বেশ চলিতেছে এবং আশানুরূপ লাভ দিতেছে। বস্তুত জলপাইগুড়ী ক্ষুদ্র সহর হইলেও ইহা একটি সুন্দর বাণিজ্য কেন্দ্র।

যে চা সভ্য জগতের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে, যাহার জন্য বহু গবেষণা, পরীক্ষা, অর্থ ব্যয় প্রভৃতি হইয়া গিয়াছে, তাহার প্রাথমিক ইতিহাস, ক্রমোন্নতি, প্রসার, চাষ ও প্রস্তুত প্রণালী প্রভৃতি একবার আলোচনা করা যাউক।

প্রাথমিক ইতিহাস *।—বহু প্রাচীন চীন অভিধানে কিয়া (kia) এবং কু-টু (k'u-tu) শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। (k'u) শব্দের অর্থ তিক্ত ও টু (tu) শব্দ, বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইলেও, উহার বিশেষ অর্থ চা। চীন শব্দ চা (ch'a) অপেক্ষা কৃত আধুনিক, এবং উহা খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দীর মধ্যে কোন সময়ে টু শব্দ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। অনেকে অনুমান করেন যে যদিও চা শব্দ চীনের অতি প্রাচীন গ্রন্থেও স্থান পাইয়াছে, তথাপি উহা ৭ম কিম্বা ৮ম শতাব্দীর বহুপূর্ব্বে হইতে চীন দেশে সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ করে নাই। চা-র প্রচলন চীনদেশে বহু পুরাতন হইলেও, বোধহয়, চীনবাসীরা পূর্ব্বে উহা পানীয়রূপে ব্যবহার করিত না। ৪র্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে সম্রাটের শ্বশুর ওয়াং মেং প্রথমত চা পানীয়রূপে ব্যবহার করিতে প্রয়াস পান। কিন্তু ঐ পানীয় অত্যন্ত তিক্ত হইত বলিয়া তাঁহার বন্ধুগণের অধিকাংশই অসুস্থতার ভাণ করত উহা পান করিতেন না। চা-পু (ch'a-pu) নামক চা সম্বন্ধীয় চীনগ্রন্থ ১০ম হইতে ১৩শ শতাব্দীর মধ্যে কোন সময় প্রকাশিত হয়; সেই গ্রন্থে উল্লেখিত আছে যে একজন পুরোহিত সম্রাট ওয়েন্‌টিকে (৫৮৯ ৬০৫ খ্রীঃ অঃ) শিরঃপীড়া নিবারণের জন্য চা পাতা সিদ্ধ করিয়া ঔষধরূপে ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। ধর্ম্ম নামক কোন ভারতীয় রাজপুত্র জাপানে চায়ের গাছ প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন, জাপানের জনশ্রুতি হইতে এইরূপ জানা যায়। যাহা হৌক, চীন জাপান প্রভৃতি দেশের লোক বহু পূর্ব্বে হইতে চা গাছের পরিচয় পাইলেও, চা পান যে ঐ দুই দেশেরও অপেক্ষাকৃত আধুনিক অভ্যাস, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। চীনে উহা ৮ম শতাব্দী হইতে রীতিমত বাণিজ্য দ্রব্যে পরিণত হয় ও ঐ সময় ট্যাং বংশের রাজত্বকালে চার উপর প্রথম রাজকর স্থাপিত হয়। কিন্তু জাপানে ১৩শ শতাব্দীর পূর্ব্বে উহার রীতিমত আবাদ আরম্ভ হয় নাই। ঐ দুই দেশ ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য অংশে চা-পান রীতি অত্যন্ত আধুনিক; যেহেতু, সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন, হিব্রু, পারসিক, আরবিক প্রভৃতি ভাষার প্রামাণিক গ্রন্থে চা গাছের, অথবা প্রস্তুতীকৃত চার কোন নাম পাওয়া যায় না।

T'h ch'a, spe, thsh প্রভৃতি চীন শব্দ এবং tsja cha ts-cha প্রভৃতি জাপ শব্দ প্রস্তুতীকৃত

* Sir George Watt's Commercial Products of India.

চায়ের সঙ্গে বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে এবং ঐ সকল শব্দ te, tay, the, cha, chai, chia প্রভৃতিরূপ পরিগ্রহ করিয়া ইউরোপের এবং এসিয়ার অধিকাংশ ভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে। কিন্তু অনেক স্থলে প্রথম আমলের উচ্চারণ ও বর্ত্তমান উচ্চারণে প্রভেদ লক্ষিত হইতেছে; যেমন, tea শব্দ; ইংরাজী ভাষায় আদৌ উহা te, tayএর ন্যায় উচ্চারিত হইত এবং সেই কারণেই কবিবর পোপ obey শব্দের সহিত উহার মিল দিয়াছেন, কিন্তু তার কিছুদিন পরই একজন ইংরাজ কবি উহার মিল করিয়াছেন MrsP-র সহিত। বোধ হয় সেই সময় হইতেই টে, টি উচ্চারিত হইয়া আসিতেছে। বাঙ্গালা ভাষা chia, ch'a chai, ইত্যাদি পরিত্যাগ করিয়া cha শব্দই গ্রহণ করিয়াছে।

যাহা হৌক, চীন ও জাপানে চাপান প্রথা বহু পূর্ব্ব অবধি চলিয়া আসিলেও, ভারতে বোধহয় উহার প্রচলন ১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্ব্বে আরম্ভ হয় নাই। চীন জাপান দেশে চাপানের বিষয় বহু ভ্রমণকারী বহুগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহারা চীনামাটির পাত্রে চা পান করিত এবং ঐ সমস্ত সরঞ্জাম বন্ধুবান্ধবদের দেখাইয়া গর্ব্ব অনুভব করিত, ইত্যাদি বিষয় বিভিন্ন সময়ের ভ্রমণকারীদিগের গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু ভারতে চা পানের উল্লেখ Albert de Mandelsloর গ্রন্থে প্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় ঐ সময়েই ওলন্দাজগণ এই অভ্যাস ইউরোপে লইয়া যায় ও বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন দেশে ছড়াইয়া পড়ে। লর্ড আরলিংটন ইংলণ্ডে উহার প্রথম প্রবর্ত্তক। সে সময় লণ্ডন সহরে এক এক পাউণ্ড চা ১০০।১৫০ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইত। ১৬৮৯ অব্দে বিলাতে আমদানি চায়ের উপর প্রতি পাউণ্ডে পাঁচ শিলিং হিসাবে কর দিতে হইত। তখন চীনা চা মান্দ্রাজ ও সুরাট হইয়া বিলাতে আমদানি হইত। তখনও আসামে বন্য চা আবিষ্কৃত হয় নাই সুতরাং চীন হইতে চায়ের চারা এদেশে আনয়ন করা হয় এবং পরীক্ষা করিবার জন্য মালাবার উপকূলের কোন স্থানে উহার আবাদ করা হয়। বোধহয়, ইহাই ভারতে প্রথম চায়ের আবাদ।

চীন হইতে আনীত চারা এদেশে সুফল প্রসব করিতে পারে নাই। বরং ঐ বিদেশী আমদানী এদেশে চায়ের চাষকে অনেকদিন পর্য্যন্ত বাধা প্রদান করিয়াছে। যদি প্রথম অবস্থাতেই আসামজাত চা লইয়া কাজ আরম্ভ করা যাইত, তাহা হইলে এই ব্যবসা আরও বহুবর্ষ পূর্ব্বে সমৃদ্ধিযুক্ত হইতে পারিত। কিন্তু প্রথম ব্যবসায়ীগণ বিদেশী চায়ের মোহে ভুলিয়া, আসাম-চা আবিষ্কৃত হওয়া সত্ত্বেও, বিদেশী চায়ের আবাদ আরম্ভ করেন, এবং সেজন্য পরে তাঁহাদিগকে বিশেষ অনুশোচনা করিতে হয়; যেহেতু এই ভ্রমের জন্য তাঁহাদের বহু অর্থ, বহু শ্রম ও সময় বৃথা নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

আসামের অরণ্যে স্বচ্ছন্দ বনজাত চা-গাছের আবিষ্কার ভারতীয়চায়ের ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। সেইদিন হইতেই চা-ব্যবসায়ীদের অদৃষ্টে শুভ সূর্য্যের প্রথম রশ্মিপাত আরম্ভ হইয়াছে এবং সেই স্বর্ণকিরণমণ্ডিত ললাট আজ সমস্ত জগতে বিস্ময়চমক আনয়ন করিয়াছে।

প্রথমত চীন হইতে সর্ব্বস্থানে চা প্রেরিত হইত। কিন্তু তথায় গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায়, ভারতে চা উৎপন্ন করিবার প্রয়োজন বিবেচিত হয় এবং ভারত গবর্ণমেট ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে এই কার্য্য করিবার জন্য উৎসাহিত করেন। ১৭৮৮ অব্দে বিশেষজ্ঞগণ ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে জ্ঞাপন করেন যে বিহার, রংপুর এবং কুচবিহার চা আবাদের উপযুক্ত স্থান। এসময় মেজর ব্রুস আসামে চা গাছ আবিষ্কার করেন। তারপর লর্ড বেণ্টিঙ্কের আমলে এক সমিতি গঠিত হয় ও চায়ের আবাদ শিক্ষা করিবার জন্য চীনে লোক প্রেরিত হয়। এই সময়ে জেন্‌কিন্‌স্ সাহেব আসামে পুনরায় চা গাছ আবিষ্কার করেন; কিন্তু ঐ গাছ লইয়া সমিতির সভ্যগণের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়। প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ বলিতে থাকেন উহা টি নহে, ক্যামেলিয়া নামক একপ্রকার গাছ। যাহা হৌক, কিছুদিন পরে স্থির হয় যে ঐ গাছই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। তখন প্রশ্ন উঠিল উহা কোথায় আবাদ করা যায়। আবার দুই মত;

কেহ বলিলেন হিমালয়ে, কেহ বলিলেন আসামই উপযুক্ত স্থান। অবশেষে স্থির হইল যে ঐ দুই স্থানেই চাষকার্য্য পরীক্ষিত হইবে। সেই সঙ্গে গবর্ণমেণ্ট ইহাও প্রকাশ করিলেন যে বাগান যখন সরকারের সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া চলিতে পারিবে তখনই উহা ব্যক্তি বিশেষের কিম্বা কোম্পানি বিশেষের হস্তে অর্পিত হইবে। তারপর আবাদ চলিতে লাগিল, এবং আসামের বাগান অবিলম্বে সরকারের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া উঠিল; কিন্তু হিমালয়স্থিত বাগান বহু বর্ষ পর্য্যন্ত সরকারী সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। আসামজাত চা ১৮৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম বিলাতে প্রেরিত হয়। সেই সময় হইতে দ্রুত উন্নতি আরম্ভ হইয়াছে।

প্রথম সরকারী বাগান।—শিবসাগর জেলায় জয়পুর নামক স্থানে প্রথম সরকারী বাগান খোলা হয় ও ১৮৪০ অব্দে এই বাগান আসাম কোম্পানির নিকট বিক্রয় করা হয়। ঐ আসাম কোম্পানিই ভারতীয় কোম্পানি সমূহের মধ্যে বৃহত্তম। প্রথম অবস্থায় প্রায় ১৫ বৎসর যাবৎ এই কোম্পানি বিশেষ লাভবান হইতে পারে নাই। পরে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহার উন্নতি আরম্ভ হয়। উহার উন্নতি সাধারণের এরূপ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল যে "রাতারাতি বড় মানুষ" হইবার প্রয়াসে বহু ব্যক্তি বাগান খুলিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময়ে শ্রীহট্টে এবং কাছাড়ে চা গাছ আবিষ্কৃত হয় এবং অল্প দিনের মধ্যেই এত বহুসংখ্যক বাগান খোলা হয় যে সমগ্র

চা বাগান

উত্তর আসাম প্রকাণ্ড একটি চা বাগানে পরিণত হয়। প্রায় এই সময়েই দারজিলিংএ চায়ের চাষ আরম্ভ হয় এবং তাহার অব্যবহিত পরেই তাহা চাটগাঁ, ছোট-নাগপুর ও দুয়ারে ছড়াইয়া পড়ে। ১৮৬৫ হইতে ১৮৬৭ পর্য্যন্ত প্রায় ২ বৎসর চায়ের অবস্থা বড় মন্দা পড়িয়াছিল। ব্যবসায়ীদের মধ্যে সাধুতা এবং অভিজ্ঞতার অভাবই ইহার কারণ। ঐ সমস্ত অনিষ্টমূলক কারণ তিরোহিত হইবার পর চা ব্যবসায় এরূপ দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে এখন সমস্ত ভারতে প্রায় ছয় লক্ষ একর জমিতে চা উৎপন্ন হইতেছে ও এতদ্ব্যতীত লক্ষ লক্ষ একর জমী ব্যবসায়ীদের হস্তে আছে। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে মাত্র ৪৪৮ পাউণ্ড চা ভারত হইতে বিলাতে রপ্তানি হইয়াছিল; কিন্তু এখন প্রতি বৎসর প্রায় ত্রিশ কোটি পাউণ্ড চা ভারত হইতে বিলাতে যাইতেছে, অর্থাৎ প্রত্যেক ভারতবাসী গড়ে ১ পাউণ্ড চা তথায় পাঠাইতেছে। ঐ পরিমাণ চায়ের মূল্য প্রায় ১৫ কোটি টাকা।

চার আবাদ।—অন্যান্য আবাদে ফলই চরম

লক্ষ্য, কিন্তু পাতাই চায়ের ফসল। প্রচুর পরিমাণ পাতা উৎপন্ন করিতে পারিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইল। কিন্তু সেই পাতা কচি হওয়া চাই। বুড়ো পাতায় চা হয় না; অতএব যাহাতে যথেষ্ট পরিমাণ কচি পাতা অনবরত গজাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা এবং কচি অবস্থাতেই ঐ সকল পাতা তুলিয়া লওয়া একান্ত আবশ্যক। পাতা কোন্ অবস্থায় কি প্রণালীতে উঠাইতে হয় তাহা না জানায় প্রথমত চা তেমন লাভজনক হইতে পারে নাই; কালসহকারে অভিজ্ঞতালাভের সঙ্গে সঙ্গে সে সকল অসুবিধা দূর হইয়াছে।

স্থান ও আবহাওয়া।—চা আবাদের স্থান নির্ব্বাচন লইয়া প্রথমত মতদ্বৈধ চলিয়াছিল। কেহ বলিলেন, উত্তর পশ্চিম হিমালয়ের নাতিশীতোষ্ণ স্থানই উপযুক্ত, কেহ বলিলেন, আসামে স্বচ্ছন্দ বনজাত চা রহিয়াছে অতএব আসামই চা আবাদের পক্ষে অনুকূল, আবার কেহ কেহ নীলগিরির পরিবর্ত্তনবিহীন আবহাওয়াই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মনে করিয়াছিলেন। ফলে দেখা যাইতেছে যে উপরিউক্ত প্রত্যেক স্থানেই চা উৎপাদনের অনুকূল অবস্থাসকল বর্ত্তমান। কিন্তু আবার ইহাও দেখা যাইতেছে যে উত্তর আসাম ও কাছাড়ই আদর্শ চা ক্ষেত্র। দারজিলিং কুমায়ুন, নীলগিরি ও কাংগ্রা উপত্যকা প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত শীতল পার্ব্বত্য স্থানসমূহের বাগানও বেশ সুফলপ্রসূ হইয়াছে, কিন্তু এই সকল স্থানের উৎপন্ন "পাতি"র পরিমাণ উত্তর আসাম ও ডুয়ার অপেক্ষা অনেক কম। অপর পক্ষে আবার ঐ সমস্ত পার্ব্বত্য জেলার চা, শেষোক্ত স্থান সমূহের চা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং উহার মূল্যও অনেক বেশী। নিম্ন আসামের অপেক্ষাকৃত শুষ্ক ও গরম স্থান সমূহেও—যথা শ্রীহট্ট প্রভৃতিতে সন্তোষজনক ফল লাভ হইতেছে। মোটের উপর গ্রীষ্মপ্রধান স্থান অপেক্ষা ঈষৎ শীতল (sub tropical) স্থান চায়ের পক্ষে উৎকৃষ্ট। বায়ুমণ্ডল আর্দ্র হওয়াও বিশেষ আবশ্যক। তাপের দৈনিক পরিবর্ত্তনও "পাতি" গজানর পক্ষে বিশেষ অনুকূল। এই পরিবর্ত্তন তাপ যন্ত্রের ৭৫ ডিগ্রী হইতে ৮৫ ডিগ্রী হইলেই বেশ ভাল হয়। যদ্যপি তাপ ৮৫ ডিগ্রির অনেক উপরে উঠে এবং বায়ুমণ্ডল অনার্দ্র হয়, তাহা হইলে চা উৎপন্নের পক্ষে অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। উপর আসামের তাপ, সাধারণত বর্ষা কালে, ৯৫০ হইতে ৯৮০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে। তাপ যখন ৭০০ ডিগ্রির অনেক কম হয়, তখন একবার "পাতি" তুলিবার পর পুনরায় "পাতি" গজাইতে অনেক অধিক সময় লাগে; কিন্তু "পাতি" তোলা তখনও একেবারে বন্ধ হয় না। যখন তাপ একেবারে কমিয়া প্রায় জল জমিবার অবস্থায় দাঁড়ায়, তখন কতক দিনের জন্য ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র এই "পাতি" তোলা হয়। সাধারণ তুষার পাতে "পাতি" কালো হইয়া যায়। কিন্তু অত্যধিক তুষারপাত হইলে কচি পাতার বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। বারিপাত অধিক না হইলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না, কিন্তু অল্প কয়েক দিন পর পর বৃষ্টি হওয়া বিশেষ আবশ্যক। অল্পদিন পর পর বৃষ্টি হইয়া সমস্ত বৎসরে ষাট ইঞ্চি জল হইলেই চলিতে পারে। ভারতীয় বাগান সমূহে সাধারণত প্রায় ১০০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে, অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক বারিপাত হইতেও দেখা যায়। যতদূর সম্ভব সমস্ত বৎসরই বৃষ্টি হওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয়। কেন না, যে কোন ঋতুতেই অনেক দিন পর্য্যন্ত বৃষ্টি না হওয়া চায়ের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর। চাটগাঁ ও ছোট নাগপুরের চাক্ষেত্রসকল এই একমাত্র কারণেই অপেক্ষাকৃত স্বল্পলাভজনক।

ভূমির সংস্থান এবং মৃত্তিকা—মৃত্তিকার অবস্থা এবং ক্ষেত্রের অনুকূল অবস্থানও, আবহাওয়া ইত্যাদির ন্যায় বিশেষ প্রয়োজনীয়। প্রথম যুগের ব্যবসায়ীগণের মনে এই ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়াছিল যে পার্ব্বত্য উচ্চ ঢালু জমীই চায়ের পক্ষে উৎকৃষ্ট। কিন্তু পরবর্ত্তী অভিজ্ঞতার ফলে দেখা গিয়াছে যে পার্ব্বত্য ক্ষেত্রের বিশেষ সুবিধা কিছুই নাই। ঢালু ক্ষেত্র অপেক্ষা বরং সমতল ক্ষেত্রই ভাল, বিশেষত ঢালু ক্ষেত্র দক্ষিণ কিম্বা দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখী হইলে তাহা সর্ব্বদা পরিহার্য্য। আজ কাল সকলেরই অভিমত যে

সমতল জমীই চা ক্ষেত্রের পক্ষে অধিকতর উপযোগী। জমী সম্বন্ধে দুইটি বিষয় বিশেষ প্রয়োজনীয়। প্রথমত জমী এরূপ হওয়া আবশ্যক যে তাহাতে জল দাঁড়াইতে না পারে; দ্বিতীয়তঃ, চায়ের শিকড় যেন উহাতে সহজে প্রবেশ করিতে পারে। যে জমী শক্ত এবং যাহাতে জল দাঁড়ান কিছুতেই নিবারণ করা যায় না তাহা চায়ের পক্ষে বিশেষ অনুপযোগী। জমী শক্ত হইলে তাহাতে চারা জন্মে না, এবং সামান্য যাহা কিছু জন্মে তাহাতেও নানারূপ পীড়া দেখা দিয়া থাকে। যে জমীতে জল দাঁড়ায় তাহাতে চারা মরিয়া যায়। কিন্তু জল নিকাশের ভালরূপ বন্দবস্ত করিতে পারিলে প্রায় সকল জমীতেই চা উৎপন্ন হইতে পারে ইহা অনায়াসে বলা যায়। যে জমীতে জান্তব এবং উদ্ভিদসার যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান, তাহা যদি বালুকাবিমিশ্র কর্দ্দমযুক্ত হয়, তবে তাহা চায়ের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট জমী বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। উহা কর্দ্দমাক্ত, সচ্ছিদ্র এবং নরম হইলেও প্রথম শ্রেণীর জমী বলিয়া ধরা যায়। দাক্ষিণাত্যের এবং ডুয়ারের জমী প্রায়শ এইরূপ। যে মৃত্তিকা শক্ত কর্দ্দমময়,—তাহা যে কোন রঙ্গের হৌক না—কেন,—যাহাতে বৃষ্টির জল প্রবেশ করিতে পারে না ও যাহা রৌদ্রে শুষ্ক হইয়া তাল পাকাইয়া ওঠে এবং শক্ত হইয়া যায়, তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য। আবার যে জমী ঢিলে ও যাহার উপরিভাগ কঙ্করযুক্ত, তাহাতেও সর্ব্বদা বৃষ্টি না হইলে চারা বাড়িতে পারে না এবং "পাতিও" খুব সামান্য হইয়া থাকে। মোটের উপর যে জমী বিস্তীর্ণ, আর্দ্র, সচ্ছিদ্র এবং যাহা হইতে বৎসরের সকল ঋতুতেই সুন্দররূপে জল নিকাশ হইয়া থাকে ও যাহাতে গাছের খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান, সেই সমস্ত ক্ষেত্রেই আশানুরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে।

চায়ের জন্য অত্যন্ত উর্ব্বর ক্ষেত্রের প্রয়োজন। এবং যে জমী কখনও আবাদ হয় নাই ও যাহা অরণ্যরূপে কিম্বা ঘাসাচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়া থাকে, তাহাই চায়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। এতদ্ব্যতীত দাক্ষিণাত্যে এবং সিংহলে, পূর্ব্বে যে জমীতে কাফির চাষ হইত, তাহাও চাক্ষেত্ররূপে ব্যবহৃত হইতেছে। যে জমীতে পূর্ব্বে তুলা কিম্বা ইক্ষুর চাষ হইত, পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, সে সমস্ত জমী চায়ের নিতান্ত অনুপযোগী। যে সকল স্থানে বাড়ী ছিল, সে সকল স্থানের মৃত্তিকা যথেষ্ট পরিমাণে উর্ব্বর হইলেও উহাতে ভাল রূপ চা উৎপন্ন হইতে প্রায়ই দেখা যায় না। বোধ হয়, মাটী জমাট বাঁধিয়া শক্ত হইয়া যাওয়াই ইহার প্রধান কারণ। মৃত্তিকায় জান্তব পদার্থ ও নাইট্রোজেনের তারতম্যানুসারে চা গাছের সতেজ বর্দ্ধনের বিশেষ তারতম্য ঘটিয়া থাকে। যে মৃত্তিকায় উদ্ভিজ্জ পদার্থের পরিমাণ বেশী তাহাতে প্রচুর পরিমাণ চা উৎপন্ন হয়, কিন্তু ঐ চা মৃদু, জলীয় এবং সুতার-শূন্য হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, যে জমিতে ঐ সকল পদার্থের ভাগ অল্প তাহাতে ফসল ত কম হয়ই অধিকন্তু অল্প দিনের মধ্যেই চারাগুলি ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়ে ও শুকাইয়া যায়। দারজিলিংএর চা অত্যন্ত সুতারযুক্ত। এই সুতারের হেতু অনুসন্ধান করিতে গিয়া ভিন্ন প্রকার বহু জটিল মতের অবতারণা হইয়া গিয়াছে। অনেকে অনুমান করেন, ফস্ফরিক এসিড এবং পটাশই ইহার কারণ। অন্যান্য হেতু যাহাই হৌক, ইহা প্রায় নিঃসংশয়ে স্থির হইয়াছে যে মৃত্তিকার ধাতব খাদ্যের প্রাচুর্য্যের সহিত এই সুতারের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ বিদ্যমান।

ভারতীয় চায়ের জমীর রাসায়নিক গঠন।—নিম্ন লিখিত পদার্থগুলি ভারতীয় চায়ের মৃত্তিকার প্রধান উপাদানঃ—জান্তব পদার্থ ইত্যাদি, অক্সাইড অব আইরন, এলিউমিনা, চূণ, ম্যাগনেসিয়া, পটাশ, সোডা, ফস্ফরিক এসিড, সিলিকেট, ও নাইট্রোজেন। মাটীতে কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণ চূণ থাকিলে আর রক্ষা নাই। সেরূপ চূণযুক্ত ক্ষেত্রে চা উৎপন্নের আশা দুরাশা মাত্র। ভারতীয় চাক্ষেত্র সমূহে চূণের ভাগ গড়ে শতকরা ·২ ভাগ মাত্র।

বপন রোপণাদি।—চা গাছ বীজ হইতে জন্মিয়া থাকে। ডালের দ্বারা কিম্বা অন্য কোন উপায়ে গাছ উৎপাদনের চেষ্টা তেমন ফলবতী হয় নাই

অন্যান্য উপায় অপেক্ষা, বীজ হইতে গাছ শীঘ্র জন্মে এবং বংশ বৃদ্ধিও খুব দ্রুত হইয়া থাকে। বীজ সংগ্রহের জন্য কতকগুলি গাছ, এমন কি অনেক সময় কতকগুলি বিশেষ বাগান স্বতন্ত্র রক্ষিত হয়।

বীজ।—বীজের জন্য যে সকল গাছ রাখা হয় সে গুলির মাথা ছাটা হয় না। সহজ ভাবে বাড়িতে দেওয়া হইয়া থাকে। এই সকল গাছ ২০।২৫ হাত পর্য্যন্ত বাড়ে। কিন্তু চীনা গাছ ৭।৮ হাতের বেশী উচ্চ হয় না। ভাদ্র আশ্বিন মাস হইতে ঐ সকল গাছে ফুল হইতে আরম্ভ হয় ও ফল পরিপক্ক হইতে প্রায় এক বৎসর সময় লাগে। ফাল্গুন চৈত্র মাসে আর একবার ফুল হয়, কিন্তু উহার পরিমাণ খুব অল্প হইয়া থাকে। যাহা হৌক, কার্ত্তিক মাসে বীজ সংগ্রহ করিতে হয়। সংগৃহীত হইবার পর অধিক দিন থাকিলে বীজ খারাপ হইয়া যায়, সুতরাং সংগ্রহের পর যত সত্বর সম্ভব বপন করা বিধেয়।

বীজ বপন ক্ষেত্র (Nursery)।—একখণ্ড উৎকৃষ্ট জমী বাছিয়া লইয়া তাহাতে বীজ বপন করিতে হয়। এই স্থানে বেশ ভালরূপ জল সেচন করা আবশ্যক। জমী "তৈয়ারীর" প্রতিও বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত। পূর্ব্বে চা আবাদ হইয়াছে এরূপ জমী, বপনক্ষেত্ররূপে ব্যবহার করিতে হইলে, উহাতে যথেষ্ট পরিমাণ গোময় সার দেওয়া কর্ত্তব্য। আবহাওয়া ও স্থান গরম এবং শুষ্ক হইলে, বপনের অনতিবিলম্বে ঐ ক্ষেত্র ঘাসখড় ইত্যাদি দ্বারা ঢাকিয়া দিতে হয় ও জলের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া থাকে। আধ মণ বীজে সাধারণত প্রায় ১০,০০০ চারা জন্মিয়া থাকে এবং উহা দ্বারা প্রায় ৭।৮ বিঘা জমিতে রোপণ কার্য্য চলিতে পারে। চারাগুলি গজাইবা মাত্রই ছায়ার জন্য মাচা বাঁধিয়া দিতে হয়। তারপর মাঝে মাঝে নিড়াইয়া দিতে হয়, ও আবহাওয়া শুষ্ক হইলে, সন্ধ্যাবেলা জল সেচনের প্রয়োজন হইয়া থাকে। ছমাস ও এক বৎসরের, এই দুই প্রকারের চারা রোপণ করিতে দেখা যায়। অগ্রহায়ণ পৌষ মাসের চারা, ছমাস পরে জ্যেষ্ঠ আষাঢ়ে, অথবা এক বৎসর পর, পরবর্ত্তী অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে রোপণ করা যাইতে পারে।

ক্ষেত্র প্রস্তুতীকরণ।—সুফল লাভ করিতে হইলে ক্ষেত্র প্রস্তুত করার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। বন কাটিয়া ক্ষেত্র প্রস্তুত করার প্রয়োজন হইলে, সেই ক্ষেত্রের সমস্ত বৃক্ষ কাটিয়া ফেলিতে হয় ও কর্ত্তিত বৃক্ষের মৃত্তিকানিম্নস্থ কাণ্ড ও মূল সকল যতদূর সম্ভব তুলিয়া ফেলিতে হয়, যেহেতু, ঐ কাণ্ড সকল চায়ের শিকড়ের অনিষ্ট করিয়া থাকে। ক্ষেত্র দীর্ঘ ঘাসাচ্ছাদিত হইলে ঘাসের মূল সকলও উত্তমরূপে তুলিয়া ফেলা আবশ্যক এবং জমী পর্ব্বত-পার্শ্বস্থ হইলে, আবাদের পূর্ব্বে উহাতে আলি বাঁধিয়া দেওয়া প্রয়োজন। জমীতে পাথর থাকিলে, সমস্ত পাথর একত্র জড়ো করিয়া আলি বাঁধার কার্য্যে লাগান সুবিধাজনক।

রোপণ।—ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলে, পূর্ব্বকথিত বপন স্থান হইতে চারা তুলিয়া লওয়া হয় ও সার বন্দী করিয়া সমব্যবধানে রোপণ করা হইয়া থাকে। ব্যবধান সর্ব্বত্র সমান হয় না, উহা গাছের প্রকার ভেদে, মাটির গুণানুসারে এবং রোপণের প্রণালী ভেদে বিভিন্ন হইয়া থাকে। তবে সাধারণত বলা যাইতে পারে যে ঐ ব্যবধান কোন দিকেই চার ফুট অপেক্ষা ঘন ও পাঁচ ফুট অপেক্ষা অধিক দূরবর্ত্তী হওয়া উচিত নহে। চতুর্ভুজাকার, ও ত্রিভুজাকার এই দুই প্রকার পংক্তিতে চারা সকল রোপিত হইতে দেখা যায়। পংক্তি সকল পরস্পর সমকোণ হইলে, ও এক একটি চারা চার ফুট অন্তর রোপণ করিলে, এক একর জমীতে ২৭২২টি ও ঐ ব্যবধান পাঁচ ফুট হইতে ১৭৪০টি চারা রোপণ করা চলে। কিন্তু বর্ত্তমানে কয়েক বৎসর অবধি ৬০ ডিগ্রি কোণ-বিশিষ্ট ত্রিভুজাকারের রোপণ প্রণালীই চলিতেছে। এইরূপে রোপণ করিলে, চতুর্ভুজ রোপণ অপেক্ষা চারা সকলের পরস্পর ব্যবধানও বেশী হয়, আবার গাছের সংখ্যাও প্রায় সমান দাঁড়ায়; সুতরাং ত্রিভুজাকার রোপণই প্রশস্ত। রোপণ প্রণালী স্থির হইলে, প্রায় এক ফুট গভীর ও দশ ইঞ্চি চওড়া গর্ত্ত করিয়া চারাগুলি রোপিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে ছ'মাসের ও এক বৎসরের, এই দুই প্রকার চারা রোপণ করা হয়। আজকাল ব্যবসায়ীদের ঝোঁক ছ'মাসের চারার উপরই বেশী। ছ'মাসের চারাগুলি ৪ হইতে ৮ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বাড়িয়া থাকে। চারাগুলি জন্মক্ষেত্র হইতে তুলিবার সময় ৬ হইতে ৮ ইঞ্চি পরিমাণ মাটির ডেলা তাহাদের মূলের সহিত সংলগ্ন রাখিতে হয়। মূলশিকড় অনেক সময় অস্বাভাবিকরূপে বাড়িয়া থাকে, আবার কখনও বা বাঁকিয়া যায়। এরূপ অবস্থায়, চারা রোপণের পূর্ব্বে লম্বা অথবা বক্র শিকড় কাটিয়া ছোট করিয়া অথবা সোজা করিয়া দিতে হয়। রোপণের পরেই যদি বেশ বৃষ্টি হইয়া যায়, তবে আর জল সেচনের প্রয়োজন হয় না; কিন্তু যাহাতে চারার চারিদিকে আগাছা জঙ্গলাদি না জন্মায় ও মাটির উপরিভাগ যাহাতে বেশ আল্‌গা থাকে, তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। কিন্তু এক বৎসরের চারা রোপণ করিতে হইলে, রোপণ কার্য্য অগ্রহায়ণ কি পৌষ মাসে সম্পন্ন করিতে হয়; সে সময় কদাচিৎ বৃষ্টি হইয়া থাকে, সুতরাং জল সেচনের বিশেষ বন্দবস্ত করিতে হয়।

রোপণকার্য্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় বিশেষরূপে মনে রাখা আবশ্যক:—

(ক) মূলশিকড় উত্তমরূপে ছাঁটিয়া দেওয়া উচিত, এবং উহা যেন বাঁকিয়া কিম্বা জড়াইয়া না থাকে।

(খ) বেশী উঁচু কিম্বা নীচু করিয়া চারা লাগান ভাল নহে। যদি বেশী উঁচু হয়, তাহা হইলে বৃষ্টিতে কতকগুলি শিকড় বাহির হইয়া পড়ে; আবার বেশী নীচু হইলে চারার কাণ্ড মাটিতে ঢাকা পড়ে ও তাহাতে চারার অনিষ্ট হইয়া থাকে। জন্মক্ষেত্রে চারার যে অংশ মাটির নীচে ছিল, রোপণের সময়ও ঠিক সেই অংশই প্রোথিত করিতে হয়।

(গ) ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম শিকড়গুলি মূলশিকড়ের সঙ্গে জড়াইয়া না থাকিয়া যেন বেশ বিস্তৃতভাবে পড়ে। চারা গর্ত্তে ফেলিবার পর গর্ত্তের এক তৃতীয়াংশ মাটিদ্বারা পূর্ণ করিয়া আস্তে আস্তে হস্তদ্বারা ঠাসিয়া দিতে হয়। তারপর অন্য এক তৃতীয়াংশ বেশ একটু জোরে পিটাইয়া পূর্ণ করিতে হয় ও শেষ এক তৃতীয় মাটির দ্বারা পূর্ণ করা হয় তাহা যেন অত্যন্ত আল্‌গা থাকে, তাহাতে কোন প্রকার বল প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন নাই।

পয়ঃ প্রণালী।—সমতল অথবা প্রায় সমতল জমীতে পয়ঃপ্রণালী অন্তত তিন ফুট গভীর হওয়া আবশ্যক। যেন উহার মাথার উপর দিয়া জল না গড়াইয়া, ঠিক প্রণালীর মধ্য দিয়াই প্রবাহিত হইতে পারে। প্রণালী সকলের পরস্পর ব্যবধান অবস্থাভেদে ৩০ ফুট হইতে ৬০ ফুট হইলেই চলিতে পারে। ঢালু জমীতে প্রণালীর মধ্য দিয়া জল বেশ গড়াইয়া যায়, সুতরাং ক্ষেত্রের মাটি, সার ইত্যাদি ধুইয়া যাইতে পারে না।

কোদলান। মাটির উপরিভাগ আল্‌গা রাখিতে ও আগাছা ইত্যাদি নষ্ট করিতে কোদালের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়া থাকে। গাছ যখন ছোট থাকে, তখন মাটির উপরকার তিন ইঞ্চি মাঝে মাঝেই আল্‌গা করিয়া দিতে হয়, এবং চারাগুলির বয়স দুই বৎসর হইবার পর, ৮ ইঞ্চি গভীর করিয়া কোদালি দিতে হয়। প্রত্যেক বৎসর শুষ্ক ঋতু আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে এই কার্য্য করা উচিত। ইহাতে পরবর্ত্তী অনাবৃষ্টির সময় মাটির নিম্নস্তর আর্দ্র থাকে, সুতরাং মাটি বেশ নরম থাকে। বৎসরে ৫।৬ বার কোদালি দিলেই চলিতে পারে এবং ঐ কার্য্য দেড় মাস অন্তর এক এক বার হওয়া উচিত।

সার। আবাদের কয়েক বৎসর পরে সারের প্রয়োজন হয়। নাইট্রোজেনযুক্ত সারই উৎকৃষ্ট। জান্তবসার দ্বারা এই উদ্দেশ্য উৎকৃষ্টরূপে সাধিত হয়। কিন্তু যোগাড় করিতে পারিলে গোময় সারের তুল্য আর কোন সারই নহে। গোময় সার প্রতি একরে ২০ টন দিলেই চলিতে পারে। আর অন্য যে সকল জন্তুকে আস্তাবলে বাঁধিয়া যত্ন করিয়া খাওয়ান হয়, তাহাদের সার প্রায় ৭।৮ টন হইলেই চলে। গোময়াদির সঙ্গে কাঠের ছাই, খড় কুটো

আবর্জ্জনা ইত্যাদি মিশাইয়া সার ঘরে রাখিয়া দেওয়া হয় ও কিছুদিন পরে তাহা সাররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বৎসরের প্রথমে কোদালি দিবার পূর্ব্বে ক্ষেত্রে সার দিতে হয়। গোময়াদি যোগাড় করিতে না পারিলে রেড়ীর খইল ইত্যাদির দ্বারা কাজ চালাইতে হয়। খইল সার ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিতে হয় ও প্রতি একরে প্রায় অর্দ্ধ টন দেওয়া যাইতে পারে। দক্ষিণ ভারতে উদ্ভিদ সারও ব্যবহৃত হইতেছে। ফোসিওলাস মাঙ্গো (Phoseolus Mungo) নামক একপ্রকার উদ্ভিদের বীজ এপ্রিল অথবা মে মাসে প্রতি একরে ৪০ পাউণ্ড হিসাবে ছিটাইয়া দেওয়া হয় ও চারা গজাইলে ৬ কিম্বা ৮ সপ্তাহ পর কোদলাইয়া উহাদিগকে মাটির সহিত মিশাইয়া দেওয়া হয়। তাহাতে বেশ সারের কাজ করে। আরও কয়েক প্রকার উদ্ভিদ এইরূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

ছাঁটা (Pruninig)।—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, চা গাছ না ছাঁটিয়া বাড়িতে দিলে ২০।২৫ হাত বাড়িয়া থাকে। কিন্তু বাগানের গাছগুলিকে এরূপ বাড়িতে দেওয়া হয় না। ছাঁটিয়া দিলে গাছগুলি ছত্রাকার হইয়া ওঠে সুতরাং কচি পাতার পরিমাণও অধিক হইয়া থাকে। যে সকল চারা জন্মক্ষেত্রে এক বৎসর থাকিবার পর রোপিত হইয়াছে, সেগুলি রোপণের ২১ মাস পরেই ছাঁটিয়া দিতে হয় ও যেগুলি ছ'মাস থাকিবার পর রোপিত হয়, সেগুলিতে রোপণের ৫।৬ মাস পরে কাঁচি চালাইতে হয়। ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাস ছাঁটার উপযুক্ত সময়। প্রথমবার চারার ৬।৭ ইঞ্চি মাত্র রাখিয়া ছাঁটিয়া দিতে হয়, তারপর, জন্মক্ষেত্রে চারাগুলি যখন প্রথম অঙ্কুরিত হইয়াছিল, সেই সময় হইতে তিন বৎসর ধরিয়া, আর একবার ছাঁটিয়া দেওয়া আবশ্যক। এবারে চারার ষোল কি আঠার ইঞ্চি রাখিয়া ছাঁটিয়া দিতে হয়। ইহার পর প্রত্যেক বৎসরই ছাঁটা প্রয়োজন, ও পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে যেস্থানে ছাঁটা হইয়াছিল, ক্রমে তাহার ২।১ ইঞ্চি উপরে যাইতে হয়। কিন্তু যদি উৎপন্নের পরিমাণ কমিয়া যায়, তাহা হইলে পুনরায় বেশী নীচে ছাঁটা হইয়া থাকে; কিন্তু দশ বৎসরের পূর্ব্বে "অধিক ছাঁটার" কোন প্রয়োজন হয় না। "অধিক ছাঁটার" পরও ভাল ফসল না হইলে, একেবারে মাটি সমান করিয়া ছাঁটিয়া দিতে দেখা যায়।

পাতি তোলা। (Plucking)।—

ছাঁটার ২।৩ মাস পরে নূতন ফেকড়ি বাহির হইয়া সেগুলি ৮।৯ ইঞ্চি লম্বা হইলে, পাতিতোলা আরম্ভ হয়। পাতা টানিয়া না ছিঁড়িয়া বুড়ো আঙ্গুল ও তর্জ্জনীর সাহায্যে ভাঙ্গিয়া তুলিতে হয়। গাছের মাথার উপরে সমান উচ্চে অবস্থিত পাতাগুলিই তোলা হইয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত নিম্নে অবস্থিত পাতাগুলি সংগ্রহ করা নিষেধ। প্রথমবার "পাতি টিপিবার" প্রায় তিন মাস পরে পুনরায় "পাতি পিটিবার" সময় আসে ও তখন পুনরায় সংগ্রহ কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রত্যেক ফেকড়ি হইতে যে সকল পাতা সংগৃহীত হয় তাহার মধ্যে মাত্র ৩।৪টি পাতায় চা তৈয়ারি হইয়া থাকে। যাহা হৌক, রোপণের পর দ্বিতীয় বৎসরে সামান্য মাত্র পাতি পাওয়া যায়, তৃতীয় বৎসরে প্রতি একরে প্রায় দেড় শত পাউণ্ড উৎপন্ন হইয়া থাকে; এইরূপে ষষ্ঠ বৎসরে পূর্ণ ফসল পাওয়া যায়। তখন প্রতি একরে ৪০০ হইতে ১০০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত পাতি উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। অবশ্য সচরাচর ৭০০।৮০০ পাউণ্ডই উত্তম উৎপন্নরূপে গণ্য হইয়া থাকে।

চায়ের আপদ ও প্রতিকার।—চায়ের বিঘ্ন যথেষ্ট; তন্মধ্যে নিম্নে প্রধান কয়েকটির সামান্য বিবরণ ও প্রতিকার প্রদত্ত হইল :—

(ক) চা-র সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রথম শত্রু এক প্রকার লাল মাকড়শা। গ্রীষ্মকালে ইহারা চা-র পাতার রস শোষণ করিতে থাকে; ফলে পাতা বাড়িতে পারে না এবং গাছের প্রভূত অনিষ্ট সাধিত হইয়া থাকে।

চারার উপর জল ছিটাইয়া, গন্ধকের গুঁড়া প্রক্ষেপ করিলে ইহার প্রতিকার হয়।

(খ) এক প্রকার মশক চা-র অত্যন্ত অনিষ্ট করে। ইহাদের দৌরাত্ম্যে পাতা শুকাইয়া যায় ও ফসলের যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হয়।

কাঁচি চালানর পর কেরোসিন প্রক্ষেপই ইহার এক মাত্র ঔষধ।

(গ) এক প্রকার সবুজ পতঙ্গ।

বিশেষ প্রতিকার এখনও অনাবিষ্কৃত।

(ঘ) বিভিন্ন প্রকারের প্রজাপতি

ইহাদিগকে ধরিবার জন্য কুলি বালকবালিকাগণ নিযুক্ত হইয়া থাকে। অন্য কোন প্রতিবিধান উদ্ভাবিত হয় নাই।

(ঙ) গাছের গায়ে এক প্রকার হল্‌দে হল্‌দে দাগ পড়ে।

দুর্ব্বল চারাগুলিই এই পীড়ায় আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। সুতরাং সার ইত্যাদির দ্বারা গাছের তেজ বৃদ্ধি করিতে পারিলে ইহার প্রভাব লুপ্ত হয়। তাহাতেও ফল না হইলে বোরডো মিক্‌শ্চার (Bordeaux mixture) ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

চা প্রস্তুত প্রণালী।—পূর্ব্বে চা প্রস্তুত কার্য্য হস্ত দ্বারা সাধিত হইত; কিন্তু ঐ প্রণালীতে বিশেষ অসুবিধা অনুভূত হওয়ায় নানাপ্রকার যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং এখন প্রায় প্রত্যেক প্রক্রিয়াই বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে সম্পাদিত হইতেছে। বাজারে বহু প্রকারের চা বিক্রয় হয়। প্রস্তুতপ্রণালীর প্রকারভেদেই এই শ্রেণী বিভাগ হইয়া থাকে। ভারতে কৃষ্ণ চা-ই (Black tea) সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রস্তুত হইয়া থাকে; কিন্তু কৃষ্ণ চা-র মূল্য অল্প বলিয়া, কয়েক বৎসর অবধি সবুজ চা ও (Green tea) প্রস্তুত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত উলং (Oolong) নামক এক প্রকার চা প্রস্তুতের চেষ্টা চলিতেছে। ব্রিক চা (Brick tea), "লেটপেট্" প্রভৃতি আরও কয়েক প্রকার চা প্রস্তুত হইতেছে, কিন্তু কৃষ্ণ চা র তুলনায় ইহার পরিমাণ অতি সামান্য।

যাহা হৌক পাতি সংগৃহীত হইবামাত্র তাহা কলগৃহে (Factory) আনীত হইয়া থাকে ও পাতাগুলি যতদূর সম্ভব পাতলা করিয়া শীতল গৃহে ছড়াইয়া দেওয়া হয়। অধিক সময় এরূপ ভাবে ছড়ান থাকিলে চা খারাপ হইবার সম্ভাবনা। ৮০ ডিগ্রি তাপে ২০ ঘণ্টা কাল এইরূপভাবে রাখিলেই চলে। তদপেক্ষা অধিক সময় ছড়াইয়া রাখা অনুচিত। এই সময়ের মধ্যে পাতাগুলি বেশ মুসড়িয়া যায় (wither) তখন পেষণকার্য্য (rolling) চলিয়া থাকে। পেষণকার্য্যের উদ্দেশ্য, পাতা হইতে কতক রস বাহির করা ও সেই রস বায়ু সংস্পর্শে আনিয়া পাতাতে শুকাইয়া দেওয়া। পেষণ কার্য্য যত মৃদু ভাবে হয় ততই ভাল। পেষণের দ্বারা পাতা হইতে যে রস বাহির হয় তাহা অপেক্ষাকৃত কচি ও সাদা পাতার কুড়িগুলিতে সংপৃক্ত হইয়া সে গুলিকে স্বর্ণ বর্ণে অনুরঞ্জিত করে। কিন্তু পেষণ কার্য্যে অধিক বল প্রয়োগ করিলে, কাল রংএর রস বাহির হইয়া চা-র রং খারাপ করিয়া দেয় এবং তাহাতে চা নিকৃষ্ট হইয়া থাকে। পেষণ কার্য্য সাধারণত প্রায় ১৫ মিনিট হইতে এক ঘণ্টায় শেষ হয়; তখন চালুনি সাহায্যে ছোট পাতাগুলি পৃথক করিয়া লওয়া হয় ও অপেক্ষাকৃত মোটা পাতাগুলি পুনরায় পেষিত হইয়া থাকে। পাতা হইতে যে রস বাহির হয় বায়ু সংস্পর্শে তাহাতে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন (fermentation) ঘটিয়া থাকে; তখন পাতা গুলি এক অথবা দুই ইঞ্চি পুরু করিয়া, আর্দ্র, শীতল, অন্ধকারময় গৃহে ছড়াইয়া রাখা হয়। এই গৃহ বিশেষরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া আবশ্যক। রসের পরিবর্ত্তন কার্য্য দুই হইতে ছয় ঘণ্টা পর্য্যন্ত চলিতে দেওয়া হয়। তারপর পাতা শুষ্ক করার পালা, ও ইহাই চা প্রস্তুতের শেষ কার্য্য। কতক্ষণ পর্য্যন্ত fermentation চলিতে দেওয়া উচিত, তাহা কেবল পাতার রং দেখিয়া ও গন্ধ দ্বারা নির্ণয় করিতে হয়, কাজেই এ কার্য্য বিশেষ অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ। শুষ্ককরণ কার্য্য অতি সত্বর সম্পন্ন করা আবশ্যক, এবং সেই জন্যই ঐ কার্য্য অন্য কোন উপায়ে না করিয়া অগ্নির সাহায্যে সম্পন্ন করিতে হয়। প্রথমত ২২০ হইতে ২৪০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত তাপ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, এবং যখন পাতাগুলি প্রায় বারো আনা শুকাইয়া ওঠে, তখন ১৮০ হইতে ২০০ ডিগ্রি তাপ প্রয়োগ করা হয়। এই কার্য্য দক্ষতার সহিত সত্বর সম্পন্ন করিতে না পারিলে চা অনেকাংশে নিকৃষ্ট হইয়া পড়ে।

চা-র প্রাথমিক এবং আধুনিক ইতিহাস, চাষ ও

প্রস্তুত প্রণালী মোটামুটি এইরূপ। এখন আর সামান্য দুই একটী কথা বলিয়া পাঠক পাঠিকাগণের নিকট হইতে বিদায় লইব। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সমগ্র ভারতে প্রায় ছয় লক্ষ একর জমীতে আজকাল চা-আবাদ চলিতেছে। কিন্তু ঐ জমীর শতকরা ৬৪.৪ ভাগ আসামে ও ২৫.৭ ভাগ বঙ্গদেশে, আর অবশিষ্ট, প্রায় দশ ভাগের এক ভাগ মাত্র, ভারতের অন্যান্য প্রদেশে। দিনদিনই আবাদি জমীর পরিমাণ বাড়িতেছে ;—আরও আনন্দের বিষয় এই যে জমী বৃদ্ধির তুলনায় উৎপন্ন চা-র অনুপাত ক্রমেই অসাধারণ রূপে বর্দ্ধিত হইতেছে। ১৮৮৫ অব্দের পর হইতে জমী বাড়িয়াছে প্রায় শতকরা ৮৬, কিন্তু উৎপন্নের পরিমাণ বাড়িয়াছে প্রায় শতকরা ২০০। ইহা হইতে বুঝা যায় যে বর্ত্তমান সময়ে চা-র চাষ ও প্রস্তুত প্রণালী কত উন্নত হইয়াছে। এখন ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ৪১০, সুরমা উপত্যকায় ৫০৮, দুয়ারে ৪৮০, ও দারজিলিংএ ২৬৮ পাউণ্ড চা গড়ে প্রতি একরে প্রতি বৎসর উৎপন্ন হইতেছে। চা ব্যবসায়ে আজ কাল প্রায় ২৫ কোটী টাকা খাটিতেছে।

উপসংহারে নিবেদন এই যে, আসাম ও বঙ্গদেশের অনেক স্থানে এখনও চা-র উপযোগী জমী রহিয়াছে। ধনশালী ব্যক্তিগণের উচিত সেই সমস্ত স্থানে চা বাগান খুলিয়া ধনাগমের উপায় করা। বঙ্গদেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা জলপাইগুড়ীই চা-আবাদের উপযুক্ত স্থান ; কিন্তু জলপাইগুড়ীর জমী প্রায় নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছে। আসামে কিন্তু এখনও লক্ষ লক্ষ একর জমী পড়িয়া রহিয়াছে। অর্থের অভাবে সে স্থানের অধিবাসীগণ কাজ করিতে পারিতেছেন না। বাঙ্গালীগণ কোম্পানী করিয়া আসামবাসীদের সঙ্গে কার্য্য করিলে ভাল হয়।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ নাগ

দুপুরে ও নিশীথে

গগন থেকে থর-বিথরে
পদ্মদলের মতই ঝরে
হাঁসের শ্রেণী নদীর চরে
দ্বিপ্রহরে ;
শুন্‌ছি যে গান আকাশভরা
দিক্ হ'তে দিক্ উদাস-করা,
আতুর যেন কাঁদছে ধরা
আর্ত্তস্বরে ;—
হাঁসের ডাকে ডাক্‌ছি কা'কে ?
ওরে, আমার পরাণটাকে
এমনি করেই ভুলিয়ে রাখে
হৃদয় চোরে !
ধরা তবু দেয় না গো হায়,
সকল হরে'
আকুল করে' !

আমি আপ্‌না-হারা হ'য়েই আছি
তাঁহার তরে,
ধ'র্‌ব তাঁরে কখন, গো সেই
আশার ভরে !
জোনাক-জ্বলা ঝোপের ফাঁকে
তাই ভোলা মন খুঁজছে তাঁকে ;
নিঝুম নিশায় ডাহুক্-ডাকে
নয়ন ঝরে।
ধরা কখন্ পড়্‌বে নিঠুর,—
সেই বেদনায় হৃদয় বিধুর ;
মান্‌তে না চায় বারণ কিছুর,
কেবল মরে—
মুহুর্ম্মুহু আছাড় খেয়েই
এ পিঞ্জরে
আশার ভরে !

শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী।

বৈজ্ঞানিক জীবনী

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সুশ্রুত

সে বহু শতাব্দীর কথা যখন ভারতে স্বাধীন চিন্তার স্রোত অপ্রতিহত ভাবে বহিয়া যাইতেছিল, যখন আপ্তবাক্যের উপর আস্থা স্থাপন করিবার ব্যবস্থা থাকিলেও প্রত্যক্ষের অমর্য্যাদা কখনই হইত না, যখন অনুষ্ঠানের দুর্ভেদ্য কারাগারের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্দীর ন্যায় নিশ্চলভাবে মৃতবৎ অবস্থান করিত না—সেই হিন্দুর স্বাধীন চিন্তার যুগে মহর্ষি সুশ্রুত প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। যে যুগে অস্ত্রচিকিৎসা নরসুন্দরের নিজস্ব সম্পত্তি হইবার কল্পনাও অসম্ভব ছিল, যে যুগে মৃতশরীর স্পর্শ ও শবব্যবচ্ছেদ একটা গুরুতর পাপের কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত না, যে যুগে প্রবচন অপেক্ষা বাস্তবের সমাদর অধিক ছিল, সেই যুগে ধন্বন্তরিশিষ্য সুশ্রুত আবির্ভূত হইয়াছিলেন। হায়! মহর্ষি বড় আশা করিয়া লিখিয়া গিয়াছিলেন "কুশলেনাভিপন্নং তদ্ বহুধাভিপ্ররোহতি"— তাঁহার সে আশা ফলবতী হয় নাই। ভারতের অদৃষ্ট দেবতার বৈগুণ্যে তিনি যে বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছিলেন তাহা অঙ্কুরিত না হইয়াই অকালে শুকাইয়া গিয়াছে। প্রায় দ্বিসহস্র বৎসর পরে যখন হিন্দুসন্তান আবার মৃত শরীর ব্যবচ্ছেদের জন্য অগ্রধাবণ করাতে ইংরাজের বিজয়দুর্গ হইতে মহানন্দসূচক তোপধ্বনি হইয়াছিল, এবং তজ্জন্য সেই ভাগ্যবান যুবক স্বর্গভ্রষ্ট দেবতা ভ্রমে পূজিত হইয়াছিল—জানি না হিন্দুর চিন্তাশক্তির অধোগতির এই জলন্ত উদাহরণ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলে মহর্ষি সুশ্রুতের হৃদয় ক্ষোভে ও অপমানে ফাটিয়া যাইত কি না।

শারীরবিদ্যার উৎপত্তি

সুশ্রুত সংহিতায় যে উন্নত শারীরবিদ্যা ও অস্ত্রচিকিৎসার পরিচয় পাই তাহার উৎপত্তি বৈদিক সাহিত্যে। যেমন অথর্ব্ববেদ কায়চিকিৎসার আদিগ্রন্থ, সেইরূপ সামবেদ অস্ত্রচিকিৎসার উৎপত্তিস্থল। বৈদিক কালে বিবিধ পশুযাগযজ্ঞে নিহত পশুর বিবিধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে অর্পণ করা হইত। "নিহত পশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শাম নামক ছুরিকা দ্বারা কাটিয়া পৃথক করা হইত। যে ব্যক্তি এই কর্ম্ম করিত তাহার নাম শমিতা। যজ্ঞভূমির সংলগ্ন যে স্থানে এই কর্ম্ম নিষ্পাদিত হইত সেই স্থানের নাম শামিত্র দেশ। সেই খানেই অগ্নি জ্বালিয়া পশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পাক করা হইত। যে অগ্নিতে পাক হইত, তাহার নাম শামিত্র অগ্নি।" (১) এইরূপে

(১) শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখিত "শরীর বিজ্ঞান পরিভাষা" প্রবন্ধ—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সপ্তদশ ভাগ, চতুর্থ সংখ্যা, ১৩১৮,২০৫। এই প্রবন্ধে রামেন্দ্র বাবু ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, মাধ্যন্দিন বাজসনেয়ি সংহিতা, কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র ও আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র হইতে পশুযজ্ঞে নিহত পশুর বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বৈদিক পরিভাষা সংকলন করিয়াছেন।

পশুর বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জ্ঞান হইতে পরবর্ত্তীকালের শারীরবিদ্যার উৎপত্তি সম্ভব হইয়াছে। বেদের ব্রাহ্মণগ্রন্থ ও শ্রৌতসূত্র রচনাকালে এই সকল যজ্ঞের যেমন বিস্তৃতি সাধিত হইয়াছে, নিহত পশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিভাগ আরও সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া আসিয়াছে। বেদোক্ত পশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জ্ঞান হইতে আয়ুর্ব্বেদীয় অঙ্গবিনিশ্চয় বিদ্যার উৎপত্তি হইয়াছে এবং বেদোক্ত অনেক পরিভাষিক শব্দ আয়ুর্ব্বেদে গৃহীত হইয়াছে।

সুশ্রুতের আবির্ভাবকাল

সুশ্রুত স্বর্গবৈদ্য ধন্বন্তরির অবতার কাশীরাজ দিবোদাসের দ্বাদশ শিষ্যের অন্যতম। সুশ্রুত, উপধেনব, বৈতরণ, ওরভ্র, পৌষ্কলাবত, করবীর্য্য, গোপুররক্ষিত, নিমি, কাঙ্কায়ন, গার্গ্য ও গালব—এই দ্বাদশ জন কাশীরাজের শিষ্য ছিলেন। ইঁহাদের অনেকেই নিজ নিজ নামে ভিন্ন ভিন্ন শল্যতন্ত্র লিখিয়া গিয়াছিলেন। সেগুলি এখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কেবল সুশ্রুত সংহিতাই প্রচলিত আছে। কিন্তু এককালে যে এই সকল শল্যতন্ত্র প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ বিদ্যমান আছে। টীকাকার শিবদাস চক্রদত্তসংগ্রহের টীকায় গোপুররক্ষিত ও বৈতরণ কর্ত্তৃক লিখিত শল্যতন্ত্র হইতে পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। সুশ্রুতের টীকাকার চক্রপাণি সুশ্রুতসংহিতার টীকায় পৌষ্কলাবততন্ত্র হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। চক্রপাণি একাদশ খ্রীষ্টাব্দের আয়ুর্ব্বেদকার, শিবদাস তাঁহারও পরে, এতএব দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও এই সকল তন্ত্র প্রচলিত ছিল।

সুশ্রুতের আবির্ভাব কাল সঠিক নির্ণীত হয় নাই। "সুশ্রুতেন প্রোক্তং সৌশ্রুতং" এই বার্ত্তিকসূত্র অনুযায়ী সুশ্রুত খ্রীষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত ছিলেন বলিয়া জানা যায়। নবাবিষ্কৃত বাউয়ার পাণ্ডুলিপি পাঠে জানা যায় যে চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সুশ্রুত অতি প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদকার বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। আধুনিক সুশ্রুত-সংহিতা দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দে বৌদ্ধ নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক প্রতিসংস্কৃত প্রাচীন সুশ্রুতসংহিতা। টীকাকার ডল্লনাচার্য্যের মতে নাগার্জ্জুন সুশ্রুতসংহিতার উত্তরতন্ত্রের রচয়িতা। সুশ্রুতের পর কয়েক শতাব্দী শল্যবিদ্যা সজীব ছিল। বাগভটের (তৃতীয় শতাব্দীর) সময় শল্যবিদ্যা যে বিদ্যমান ছিল তাহা তাঁহার অষ্টাঙ্গ পাঠে বেশ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। কিন্তু বাগভটের পর হইতে ক্রমশঃ অঙ্গবিনিশ্চয়বিদ্যা ও শল্যবিদ্যার অবনতি ঘটিতে থাকে। ইহার কারণ প্রধানতঃ দুইটি বলিয়া মনে হয়ঃ—

প্রথম। বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তৃতির সহিত ভারতে স্বাধীন চিন্তার উন্নতি বহুলপরিমাণে সাধিত হইলেও "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" এই নৈতিক বাক্য শবব্যবচ্ছেদের বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেই জন্য কায়চিকিৎসা বিশেষতঃ তান্ত্রিকচিকিৎসা পদ্ধতির বহুল উন্নতি সাধিত হইলে বৌদ্ধযুগে অস্ত্রচিকিৎসা বড়ই অনাদৃত হইতে চলিয়াছিল।

দ্বিতীয়। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণই অন্য অন্য বিদ্যার ন্যায় চিকিৎসাবিদ্যার পঠনপাঠন করিতেন। মনুর অনুশাসন হইতে আরম্ভ করিয়া শবদেহ স্পর্শ ক্রমশঃ একটা পাপের কার্য্যে পরিণত হইয়া আসিতেছিল, তাহার

জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাও দৃষ্ট হইয়া থাকে। শবদেহ স্পর্শ ও ব্যবচ্ছেদ ব্যতিরেকে অঙ্গবিনিশ্চয় ও অস্ত্রচিকিৎসাবিদ্যা কখনই সজীব থাকিতে পারে না। সেইজন্য এই "শুচি" শাসনের পরিণাম এই হইয়াছে যে ক্রমশঃ ভারতের উন্নত অস্ত্রচিকিৎসাবিদ্যা নিম্নশ্রেণীর অনভিজ্ঞ ব্যক্তির নিজস্ব সম্পত্তি হইয়া উঠিয়াছে। সত্যই মহাত্মা এলিফিনষ্টোন সাহেব এখনকার স্বদেশীয় অস্ত্রচিকিৎসার অবনতি দেখিয়া লিখিয়া গিয়াছেন "bleeding has been left to the barber, bone-setting to the herdsman and the application of blisters to every man."

সুশ্রুতোক্ত শারীরবিদ্যা

সুশ্রুতোক্ত অঙ্গবিনিশ্চয়বিদ্যার সম্যক পরিচয় একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে প্রদান করা অসম্ভব। সুশ্রুতের শারীরস্থান পাঠ করিলে স্বতই মনে হয় যে বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সূক্ষ্ম বিবরণগুলি প্রত্যক্ষ দর্শন ভিন্ন একেবারে অসম্ভব ছিল। সুশ্রুত সপ্ত ত্বক (skin, epidermis), সপ্ত কলা (cellular tissues and fascia of the body) সপ্ত আশয় (organs বা receptacles), অন্ত্র (intestines) নয়টি দ্বার, ষোলটি কণ্ডরা (রজ্জুবৎ শিরা) বারটি জাল (membranes), ছয়টি কূর্চ্চ, চারটি রজ্জু (tendons), সাতটি সেবনী (sutures), তিন শত অস্থি (bones), দুই শত দশটি অস্থিসন্ধি (bonejoints), নয় শত স্নায়ু (nerves), পাঁচ শত পেশী (muscles), সাত শত শিরা ও এক শত সাত মর্ম্মস্থানের (vital parts) সূক্ষ্ম বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তিনি এই সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিবরণ দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, শরীরের কোন স্থানে কয়টি স্নায়ু, অস্থি, শিরা প্রভৃতি আছে তাহাও সঠিক নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনশত অস্থির বিবরণ দেখুন—

প্রত্যেক পদাঙ্গুলিতে তিনটি করিয়া	১৫টি
পা বা গোড়ালিতে	১০টি
জঙ্ঘায়	১টি
জানুতে	২টি
উরুদেশে	১টি
এইরূপ অপর পায়ে	৩০টি
দুই হাতে ৩০ করিয়া	৬০টি
কটিদেশে	১টি
মলদ্বারে	১টি
যোনিদেশে	১টি
দুই নিতম্বে	২টি
দুই পার্শ্বে ৩৬টি করিয়া	৭২টি
পৃষ্ঠে	৩০টি
বক্ষে	৮টি
বৃত্তাকার অক্ষক নামক	২টি
গ্রীবাদেশে	২টি
কণ্ঠদেশে	৯টি
দুই হনুতে	৪টি
দন্ত সর্ব্বসমেত	৩২টি
নাসিকায়	৩টি
তালুতে	১টি
কর্ণ গণ্ড ও শঙ্খদেশে ২টি করিয়া	৬টি
মস্তকে	৬টি
সর্ব্বসমেত	৩০০ অস্থি

১৬২৮ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম হার্ভে দেহের মধ্যে রক্তের গতি (circulation of the blood) আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু

হার্ভের বহুশতাব্দীর পূর্ব্বে সুশ্রুত যে রক্তের গতি সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন—এ সংবাদ ইউরোপের বৈজ্ঞানিকগণের কর্ণে ভাল করিয়া প্রবেশ করে নাই। রক্তের গতি সম্বন্ধে সুশ্রুত লিখিয়া গিয়াছেন যে "১৭৪টি রক্তবাহিনী শিরার দ্বারা রক্ত সমগ্র দেহে চলাচল করিতেছে। এই সকল শিরা যকৃৎ ও প্লীহা হইতে উদ্গত হইয়া সমগ্র শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। শোণিত প্রকৃতিস্থ অবস্থায় যতক্ষণ স্বীয় শিরামধ্যে বিচরণ করে (circulates) ততক্ষণ ধাতুসমুদায়ের পূরণ, বর্ণের উজ্জ্বলতা, স্পর্শজ্ঞানের তীক্ষ্ণতা এবং অন্যান্য নানাপ্রকার গুণ উৎপন্ন হয়। কিন্তু সেই রক্ত দূষিত হইলে, রক্তজন্য নানাপ্রকার পীড়া জন্মে। রক্তের গতির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকারী বলিয়া হার্ভের নাম গৌরবান্বিত হইতে পারে, কিন্তু রক্তের গতির আবিষ্কার প্রথমে ভারতে হইয়াছিল এ গৌরব ভারতবাসী নিঃসন্দেহে করিতে পারেন।

ভারতীয় অস্ত্রচিকিৎসার প্রাধান্য

দুই এক পৃষ্ঠার মধ্যে সুশ্রুতোক্ত অস্ত্রচিকিৎসার সম্যক বিবরণ প্রদান করা সম্ভব নহে, তবে সুশ্রুতের সময় অস্ত্রচিকিৎসা কিরূপ উন্নত ছিল তাহার আভাষ মাত্র পাঠককে প্রদান করাই লেখকের উদ্দেশ্য। রামায়ণ ও মহাভারতে দেখিতে পাই যে উপযুক্ত অস্ত্রচিকিৎসকগণ সেনাসমভিব্যাহারে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছেন। রাবণের সহিত যুদ্ধে রামের সৈন্যবর্গের অস্ত্রচিকিৎসকরূপে সুষেণ রামের সহিত লঙ্কায় গিয়াছিলেন। মহাভারতের উদ্‌যোগ পর্ব্বে দেখিতে পাই যুধিষ্ঠির ও ধৃতরাষ্ট্র উভয়েই অস্ত্রচিকিৎসক ও অস্ত্রচিকিৎসার উপযুক্ত বন্ধনী (bandage), ঔষধাদি সংগ্রহ করিতেছেন। পঞ্চপাণ্ডবের অন্যতম নকুল অস্ত্রচিকিৎসাবিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। গো, অশ্ব, হস্তী প্রভৃতির অস্ত্রচিকিৎসা প্রাচীন ভারতে অজ্ঞাত ছিল না যে সকল ইউরোপীয় পণ্ডিত সংস্কৃতভাষা ও ভারতের চিকিৎসাবিজ্ঞানের আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই প্রায় একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে অস্ত্রচিকিৎসাবিজ্ঞানে ভারত অনেক বিষয়ে ইউরোপের শিক্ষাগুরু। ওয়েবার লিখিয়া গিয়াছেন "ইউরোপের আধুনিক অস্ত্রচিকিৎসকগণ হিন্দুদের নিকট হইতে একস্থান হইতে চর্ম্ম লইয়া অন্যস্থানে চর্ম্ম সংযোগ করিবার উপায়, যথা কর্ত্তিত নাসিকা জোড়া দেওয়া, (rhinoplasty) শিক্ষা করিয়াছেন।" প্রসিদ্ধ জার্ম্মান ডাক্তার হির্সবার্গ (Dr. Hirschberg) ওয়েবার সাহেবের পূর্ব্বোক্ত বাক্যের সমর্থন করিয়াছেন এবং আরও বলিয়াছেন যে "চক্ষের ছানিতোলা প্রক্রিয়া ইউরোপ ভারতবাসীর নিকট শিখিয়াছে, এবং প্রাচীন গ্রীক, মিশরবাসী বা অন্য কোন জাতি উহা জ্ঞাত ছিলেন না।" আধুনিক অস্ত্রচিকিৎসকগণ অসাধ্যসাধন করিতেছেন, কিন্তু অধুনা যে সকল অস্ত্রচিকিৎসা অতি কঠিন বলিয়া স্বীকৃত হয় (major operation) তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি যথা ছানিতোলা, অঙ্গছেদন (amputation), উদর বিদারণ (abdominal section), প্রাচীন ভারতে অবিদিত ছিল না। আধুনিক পাশ্চাত্য অস্ত্রবিজ্ঞানের অদ্ভুত উন্নতি দেখিয়া সকলেরই

চমৎকৃত হইবার কথা, কিন্তু সেই সঙ্গে প্রাচীন ভারতের উন্নত অস্ত্রচিকিৎসার গৌরবের যে আমরা উত্তরাধিকারী তাহা যেন কদাচ ভুলিয়া না যাই।

সুশ্রুতোক্ত অস্ত্রচিকিৎসা

(১) শিক্ষা

সুশ্রুত অস্ত্রচিকিৎসা আট ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) ছেদ্যক্রিয়া (কোন অঙ্গ-ছেদন করা, (২) ভেদ্যক্রিয়া (কোন স্থান ভেদ করা), (৩) লেখ্যক্রিয়া (কোন স্থানের চর্ম্ম উত্তোলন করা), (৪) বেধ্যক্রিয়া (দূষিত রক্তাদি বাহির করিয়া দিবার জন্য শিরাদি ভেদ করা), (৫) এষ্যক্রিয়া (নালীঘা, বাঘী প্রভৃতি রোগে ক্ষতাদির পরিমাণ অন্বেষণ করা), (৬) আহার্য্যক্রিয়া (অশ্মরী প্রভৃতি রোগোদ্ভূত দ্রব্যাদি বাহির করা), (৭) বিস্রাব্যক্রিয়া (স্রাব উৎপাদন করা), ও (৮) সীবন (সেলাই করা)। চিকিৎসককে অস্ত্র-ক্রিয়াদি কর্ম্মে পারদর্শিতা লাভ করিতে হইলে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেই চলিবে না, অস্ত্রাদির দ্বারা প্রকৃতরূপে ছেদনাদি অস্ত্রক্রিয়া বহুদিবস ধরিয়া অভ্যাস করিতে হইবে। কিরূপ কৌতূহলদ্দীপক উপায়ে গুরু শিষ্যকে বিবিধ অস্ত্রক্রিয়া শিক্ষা দিতেন, তাহার অভ্যাস নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

১। ছেদ্যক্রিয়া (incision)—কুমড়া, লাউ প্রভৃতি দ্রব্যকে ছেদন করিয়া অঙ্গচ্ছেদনাদির প্রণালী শিক্ষা করিতে হইবে।

২। ভেদ্যক্রিয়া (puncturing)—চামড়ার থলি, মৃত পশুর প্রস্রাবের থলি বা চামড়ার থলির মধ্যে জল ও কর্দ্দম পুরিয়া তাহা ভেদ করিয়া ভেদ্যক্রিয়া শিক্ষা করিতে হইবে।

৩। লেখ্যক্রিয়া (scratching)—মৃত পশুর লোম-যুক্ত চর্ম্ম আঁচড়াইয়া শিক্ষা করিবে।

৪। এষ্যক্রিয়া (probing)—ঘুণধরা বাঁশ বা কাষ্ঠ, অথবা শুষ্ক লাউর মুখে অস্ত্র প্রবেশ করাইয়া এষ্যক্রিয়া শিক্ষা করিবে।

৫। আহার্য্য (extraction)—কাঁঠাল প্রভৃতি ফলের মজ্জা এবং মৃত পশুর দন্তে যন্ত্র প্রবেশ করাইয়া এই ক্রিয়া শিক্ষা করিবে।

৬। বিস্রাব্যক্রিয়া (evacuating flinds)—মোমের দ্বারা পূর্ণ একখানি সিমুলকাষ্ঠে যন্ত্র প্রবেশ করাইয়া রক্তপূঁজাদি স্রাব করিবার প্রণালী শিক্ষা করিবে।

৭। সীব্যক্রিয়া (sewing)—বস্ত্র বা নরম চর্ম্ম সূচীদ্বারা সেলাই করিয়া সীব্যক্রিয়া শিক্ষা করিতে হইবে।

৮। বেধ্যক্রিয়া (boring)—মৃত পশুর শিরা বা পদ্মের ডাঁটা বিঁধিয়া বেধ্যক্রিয়া শিক্ষণীয়।

৯। বন্ধনকার্য্য (bandage)—বস্ত্রাদির দ্বারা নির্ম্মিত পুরুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বন্ধন করিয়া বন্ধনকার্য্য শিক্ষা করিবে। কোমল মাংসপেশী বা পদ্মের ডাঁটা বন্ধন করিয়া সন্ধিবন্ধন শিক্ষা করিবে।

১০। ক্ষার ও অগ্নিকার্য্য (Cautery by caustics and fire)—মৃত পশুর কোমল মাংসখণ্ডের উপর ক্ষার ও অগ্নি প্রয়োগ করিয়া শিক্ষা করিতে হইবে।

১১। বস্তিকার্য্য (catheterisation)—জলপূর্ণ কলসীর প্রান্তভাগ ছিদ্র করিয়া তাহার স্রোতে এবং লাউর মুখদেশে বা সেইরূপ অপর দ্রব্যে পিচকারী প্রয়োগ করিয়া বস্তিক্রিয়া শিক্ষণীয়।

এইরূপে অস্ত্রক্রিয়া সম্যকরূপে শিক্ষা করিবার পর চিকিৎসাকার্য্যে অভ্যাস ও দক্ষতালাভ করিলে চিকিৎসক চিকিৎসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন। অস্ত্র প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে চিকিৎসক তৎকর্ম্মোপযোগী যন্ত্র, অস্ত্র, তুলা, বস্ত্রখণ্ড, সূত্র, পাখা, শীতল ও উষ্ণজল প্রভৃতি দ্রব্য ও উপযুক্ত সবল পরিচারক সংগ্রহ

করিবেন। মূঢ়গর্ভ, উদর, অর্শঃ, অশ্মরী, ভগন্দর ও মুখরোগে অস্ত্র করিতে হইলে রোগীর আহারের পূর্ব্বে অস্ত্র ক্রিয়া সম্পাদন করিতে হইবে। চিকিৎসক বিশেষ সতর্কতার সহিত অস্ত্র প্রয়োগ করিবেন, যেন সূক্ষ্ম শিরা ও স্নায়ু কাটিয়া না যায়। অস্ত্র করিবার পর

যন্ত্রের চিত্র

১। বস্তী যন্ত্র।

২। অর্শো যন্ত্র।

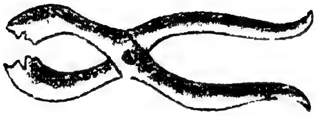

৩। সিংহমুখ যন্ত্র।

৪। ভৃঙ্গমুখ যন্ত্র।

৫। নাড়ী যন্ত্র

৬। শলাকা যন্ত্র।

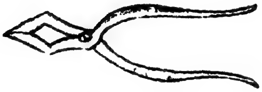

৭। শনিগ্রহ সন্দংশ যন্ত্র

৮। অনিগ্রহ সন্দংশ যন্ত্র।

৯। শঙ্কু যন্ত্র।

১০। মুষ্টিশঙ্কু যন্ত্র।

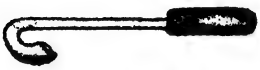

১১। গর্ভশঙ্কু যন্ত্র।

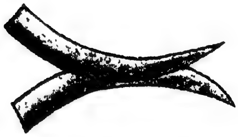

১২। যোন্যাবেক্ষণ যন্ত্র।

অঙ্গুলির দ্বারা পূয়বক্ত বাহির করিয়া দিয়া নিমপাতাদি কষায় দ্রব্যের জলে বেশ করিয়া ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া দিবেন। পরে তিল বাটা, মধু ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া পলিতা বা বস্ত্রখণ্ড মাখাইয়া ক্ষতমধ্যে পুরিয়া দিবেন ও তদুপরে মসিনার পুলটিশাদি দিয়া তিন চারি পর্দ্দা কাপড়ের দ্বারা শক্ত করিয়া বাঁধিয়া তিন দিবস অতিবাহিত হইলে ক্ষতের বন্ধন খুলিয়া পুনরায় নিমপাতাদির কষায়জলে ধৌত করিয়া ঔষধাদি দিয়া পুনরায় বাঁধিয়া দিবেন। এইরূপ যতদিবস ক্ষত বেশ শুকাইয়া না যায় ততদিবস ধৌত করিয়া ঔষধ ও মলম লাগাইয়া দিবেন।

(২) যন্ত্র

অস্ত্র প্রয়োগ কল্পে সুশ্রুত ১২৫ প্রকার অস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। সেগুলি আবার দুই ভাগে বিভক্ত—যন্ত্র ও শস্ত্র। যন্ত্র সর্ব্বসমেত ১০১টি, ও শস্ত্র ২৪ প্রকার। যন্ত্রের মধ্যে হস্তই প্রধানতম যন্ত্র, কারণ হস্ত ভিন্ন কোন যন্ত্রই প্রয়োগ করা যায় না। যন্ত্রগুলি আবার ছয় ভাগে বিভক্ত—(১) স্বস্তিক যন্ত্র (চব্বিশ প্রকার), (২) সন্দংশ যন্ত্র (দুই প্রকার), (৩) তাল যন্ত্র (দুই প্রকার), (৪) নাড়ীযন্ত্র (বিংশতি প্রকার), (৫) শলাকাযন্ত্র (আটাইশ প্রকার) ও (৬) উপযন্ত্র (পঁচিশ প্রকার)। এই সকল যন্ত্র লৌহ বা স্বর্ণাদি পাঁচটি ধাতুর দ্বারা নির্ম্মিত হইত। আবশ্যকমত অন্যপ্রকার যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থাও সুশ্রুত দিয়া গিয়াছেন।

১। স্বস্তিকযন্ত্র—অষ্টাদশ অঙ্গুলী দীর্ঘ এবং দুই খণ্ড লৌহ একটি খিল দ্বারা আবদ্ধ। সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ প্রভৃতি দশ প্রকার পশুর ও কাক, চিল, শকুনি প্রভৃতি চতুর্দ্দশ প্রকার পক্ষীর সর্ব্ব সমেত চব্বিশ প্রকার জন্তুর মুখের সাদৃশ্যে চব্বিশ প্রকার স্বস্তিকযন্ত্র নির্ম্মিত হইত। হাড়ের মধ্যে বাণ বা কোন প্রকার শল্য বিদ্ধ হইলে উহা বাহির করিবার জন্য স্বস্তিকযন্ত্রই ব্যবহৃত হইত।

২। সন্দংশ যন্ত্র—ষোল অঙ্গুলি দীর্ঘ। এক প্রকার সন্দংশ যন্ত্র কর্ম্মকারের সাঁড়াশীর মত ও অপরটি ক্ষৌরকারের সন্নার মত। চর্ম্ম, মাংস, শিরা ও স্নায়ু হইতে ক্ষুদ্র শল্য বা কণ্টক বাহির করিবার জন্য সন্দংশ যন্ত্র ব্যবহৃত হইত।

৩। তাল যন্ত্র—বার অঙ্গুলি দীর্ঘ। কর্ণ নাসিকাদির ভিতর হইতে মলাদি বাহির করিবার জন্য ব্যবহৃত হইত।

৪। নাড়ীযন্ত্র—নানা আকারে নির্ম্মিত ও নানা কার্য্যে ব্যবহৃত হইত। অর্শোযন্ত্র, অঙ্গুলিত্রাণ যন্ত্র প্রভৃতি নাড়ীযন্ত্রের রূপান্তর।

৫। শলাকাযন্ত্র—আটাইস প্রকার—শলাকাযন্ত্র বিভিন্ন কার্য্যে ব্যবহৃত হইত বলিয়া নানা আকারে নির্ম্মিত হইত।

এই সকল যন্ত্রের মধ্যে কয়েকটির চিত্র উপরে প্রদত্ত হইল।

(৩) শস্ত্র বা অস্ত্র

সুশ্রুত শস্ত্র বা অস্ত্র বিংশতিপ্রকার বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন—(১) মণ্ডলাগ্র, (২) করপত্র, (৩) বৃদ্ধি, (৪) নখশস্ত্র, (৫) মুদ্রিকা, (৬) উৎপলপত্র, (৭) অর্দ্ধধার, (৮) সূচী, (৯) কুশপত্র, (১০) আটীমুখ, (১১) শারীরমুখ, (১২) অন্তর্মুখ, (১৩) ত্রিকূটক, (১৪) কুঠারিকা, (১৫) ব্রীহিমুখ, (১৬) আরা, (১৭) বেতসপত্রক, (১৮) বড়িশা (১৯) দন্তশঙ্কু, (২০) এষণী।

এই সকল অস্ত্র ছেদ্যক্রিয়া, ভেদ্যক্রিয়া, এষণক্রিয়া, সীবন প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত অষ্টপ্রকার অস্ত্রপ্রয়োগক্রিয়ায় প্রয়োজনানুসারে ব্যবহৃত হইত। এই সকল অস্ত্র উৎকৃষ্ট লৌহের দ্বারা নির্ম্মিত, তীক্ষ্ণধারবিশিষ্ট, উত্তম রূপে ধরিবার

উপায় বিশিষ্ট ও দন্তবিহীন হওয়া আবশ্যক। অস্ত্র সকলের ধার যন্ত্রভেদে মসূরকলায়ের ন্যায় স্থূল হইতে অর্দ্ধাঙ্গুল প্রমাণ সূক্ষ্ম হওয়া আবশ্যক। অস্ত্রের ধার সমান রাখিবার জন্য অস্ত্র শিমুলকাষ্ঠের খাপে রক্ষিত হইত। এবং অস্ত্রে শান দিবার জন্য মাষকলাইয়ের রংবিশিষ্ট প্রস্তর ব্যবহৃত হইত। কয়েক প্রকার অস্ত্রের চিত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শস্ত্রের চিত্র

১। কর্তরিকা শস্ত্র।

২। মণ্ডলাগ্র শস্ত্র।

৩। কুশপত্র শস্ত্র।

৪। শরারিমুখ শস্ত্র।

৫। সূচি শস্ত্র।

৬। ঐশানী শস্ত্র।

৭। অন্তর্মুখ শস্ত্র।

৮। নখ শস্ত্র।

৯। করপত্র শস্ত্র।

১০। বৃদ্ধিপত্র শস্ত্র।

কিরূপ দুরুহ অস্ত্রচিকিৎসার উপদেশ সুশ্রুত দিয়া গিয়াছেন, দৃষ্টান্তস্থলে আমরা গর্ভস্থিত মৃতসন্তান ছেদন করিয়া বাহির করিবার প্রক্রিয়া এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া

দিলাম। "গর্ভস্থ মৃতসন্তান হস্ত সাহায্যে বাহির করিতে না পারিলে অস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া বাহির করিতে হইবে। কিন্তু সন্তান যদি জীবিত থাকে, তাহা হইলে কদাচ অস্ত্র প্রয়োগ করিতে নাই, কারণ তাহাতে গর্ভিণী ও সন্তান উভয়েরই মৃত্যু হইয়া থাকে। গর্ভস্থ মৃতসন্তান বাহির করিতে হইলে, গর্ভিণীকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক মণ্ডলাগ্র বা অঙ্গুলি শস্ত্র দ্বারা প্রথমতঃ গর্ভের মস্তক বিদীর্ণ করিবে, এবং শঙ্কু (আকর্ষণী) অস্ত্রের দ্বারা খণ্ড খণ্ড খর্পরগুলি বাহির করিয়া, পরে বক্ষঃ ও কক্ষদেশ ধরিয়া নিষ্কাসিত করিবে। যদি মস্তক বিদীর্ণ করিতে না পারা যায় তাহা হইলে অক্ষিপুট বা গণ্ডদেশ ধরিয়া বাহির করিতে হয়। গর্ভস্থ সন্তানের স্কন্ধদেশ অপত্যপথে আবদ্ধ হইলে, সেই স্কন্ধসংলগ্ন বাহু ছেদন করিতে হয়। গর্ভস্থ বালকের উদর, দৃতি অর্থাৎ ভিস্তীর ন্যায় বায়ু পূর্ণ থাকিলে, তাহা চিরিয়া অন্ত্রসমূহ আগে বাহির করিবে। ইহাতে গর্ভস্থ দেহ শিথিল হইয়া পড়ে, সুতরাং তখন অনায়াসেই বাহির করিতে পারা যায়। জঘনদেশ দ্বারা অপত্যপথ অবরুদ্ধ হইলে, জঘনদেশের অস্থিখণ্ডসকল ছেদন করিয়া নিষ্কাসিত করিবে। ...... মৃতগর্ভ ছেদন করিয়া বাহির করিতে হইলে, মণ্ডলাগ্র নামক অস্ত্রই প্রয়োগ করা উচিত; উহাতে তীক্ষ্ণাগ্র বৃদ্ধিপত্র অস্ত্র প্রয়োগ করিতে নাই; করিলে গর্ভিণীকে আঘাত লাগিতে পারে।" হায়! অধুনা আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায়ীগণের নিকট গর্ভস্থ মৃতসন্তানের ছেদনের কল্পনাও আকাশকুসুমরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে, এমন কি তাঁহারা মণ্ডলাগ্র বা অন্য প্রকার অস্ত্র কখনও স্বচক্ষে দেখেন নাই! এমনি দিন কি আসিবে না যখন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় আবার উন্নত অস্ত্রচিকিৎসা স্বকীয় উচ্চ আসন গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে?

(৪) বন্ধন

সুশ্রুতে অনেকপ্রকার বন্ধনের (Bandage) উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পতন বা কোনপ্রকার আঘাতের দ্বারা দেহের অস্থিসমূহ ভগ্ন হইলে বা অস্ত্রপ্রয়োগের পর আহত বা ক্ষতস্থানে স্থানবিশেষে বিবিধ প্রকার বন্ধনের প্রয়োগ ছিল। বন্ধনপ্রণালী চতুর্দ্দশ প্রকার—(১) কোশ, (২) দাম, (৩) স্বস্তিক, (৪) তনুবেল্লিত, (৫) ছতোলী,

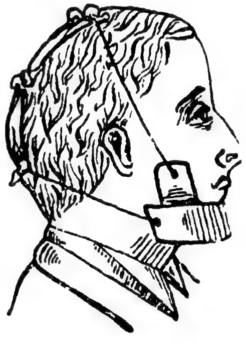

গোকর্ণা বন্ধন

পঞ্চাঙ্গী বন্ধন

(৬) মণ্ডল, (৭) স্থগিকা, (৮) যজক, (৯) খট্টা (১০) চীন, (১১) বিবন্ধ, (১২) বিতান, (১৩) গোফণা ও (১৪) পঞ্চাঙ্গী। এই প্রবন্ধে তিন প্রকার বন্ধনের চিত্র প্রদত্ত

স্বস্তিক বন্ধন

হইল। বন্ধনকার্য্যে সূতার কাপড়, মেষ-লোমনির্ম্মিত বস্ত্র, রেশমী কাপড়, চর্ম্ম, বংশাদির চটা, সূতা, লৌহ, কাষ্ঠফলক প্রভৃতি বিবিধ উপকরণ ব্যবহৃত হইত। যে প্রকার বন্ধন শরীরের স্থানবিশেষে সুনিবিষ্ট হয় সেই স্থানে সেই প্রকার বন্ধন প্রযোজ্য। স্থান-বিশেষে বন্ধন তিন প্রকার—গাঢ়বন্ধন, সমবন্ধন ও শিথিলবন্ধন। যে বন্ধন বেশ শক্ত অথচ যাহাতে বেদনা বোধ হয় না তাহা গাঢ়বন্ধন; যে বন্ধন ভিতরে ফাঁপা তাহা শিথিলবন্ধন ও যাহা খুব শক্তও নহে, শিথিলও নহে তাহাই সমবন্ধন।

ক্ষার

রাসায়নিকের পক্ষেও সুশ্রুত পরম আদরের সামগ্রী। সুশ্রুতের মৃদু, মধ্যম ও তীক্ষ্ণ ক্ষার প্রস্তুতপ্রণালী রসায়নের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চরক ও সুশ্রুত উভয়েই সর্জ্জীকাক্ষার (Carbonate of Soda) এবং যবক্ষার (Carbonate of Potash) দুইটি পৃথক পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ইউরোপে এই দুইটি ক্ষার বহুদিবস পর্য্যন্ত একই পদার্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছিল।

সুশ্রুত ক্ষারকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—মৃদু (mild), মধ্য (caustic) ও তীক্ষ্ণ। সুশ্রুত তীক্ষ্ণক্ষার বলিয়া যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা ভিন্নপ্রকারের ক্ষার পদার্থ নহে, তাহা মৃদুক্ষারে দন্তী, দ্রবন্তী প্রভৃতি কয়েকটি দ্রব্য মিশ্রিত আছে। আমরা মধ্য ক্ষারকেই তীক্ষ্ণক্ষার অর্থাৎ caustic alkali বলিয়া ধরিয়া লইলাম, কারণ "মধ্য" শব্দ ঠিক (caustic) শব্দের দ্যোতক নহে।

তীক্ষ্ণধার—তীক্ষ্ণক্ষার প্রস্তুত প্রণালী আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত। ঘণ্টাপারুল, কুটজ প্রভৃতি বৃক্ষের ক্ষারাত্মক ভস্ম জলে গুলিয়া ছাঁকিয়া লইতে হইবে। পরে ভস্মশর্করা, ঝিনুক, শঙ্খনাভি অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া যে চূণ (caustic lime) পাওয়া যায় তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া চুল্লীতে পাক করিবে। মৃদুক্ষার ও চূণ একত্র জ্বাল দিয়া এখনও তীক্ষ্ণক্ষার প্রস্তুত হইয়া থাকে। তীক্ষ্ণক্ষার লৌহকলসীর মধ্যে মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবার ব্যবস্থাও আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত। তীক্ষ্ণক্ষার হীনবীর্য্য (carbonated) হইয়া যাইলে পুনরায় চূণের সহিত জ্বাল দিবার ব্যবস্থা আছে।

সুশ্রুত ক্ষারের গুণ সঠিক ভাবেই দিয়াছেন —ঈষৎ শ্বেতবর্ণ ও পিচ্ছিল।

তেজপ্রশমন। (neutralisation) —অম্লরসের (acids) দ্বারা তীক্ষ্ণ ক্ষারের যে তেজপ্রশমন হয়, তাহাও সুশ্রুতের সময়ে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সুশ্রুত ইহার কারণ বলিয়াছেন যে ক্ষার দ্রব্যে লবণরস আছে, সেইজন্য অম্লরসের সহিত লবণ রস সংযুক্ত হওয়াতে মাধুর্য্যগুণ প্রাপ্ত হইয়া তীক্ষ্ণতাবিহীন হইয়া থাকে। আধুনিক রসায়ন সপ্রমাণ করিয়াছে যে অম্ল ও ক্ষার সংযুক্ত হইয়া এক-প্রকার নূতন পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাকে লবণ (Salt) বলে। এই লবণজাতীয় পদার্থে অম্ল বা ক্ষারের গুণ না থাকাতে অম্ল ও ক্ষার সংযোগে তীক্ষ্ণতা দূরীভূত হয়।

কায়চিকিৎসা

সুশ্রুতে অস্ত্রচিকিৎসা ছাড়া কায়চিকিৎসারও অনেক উপদেশ আছে। চরক পাঁচ শত ভেষজের উল্লেখ করিয়াছেন। সুশ্রুত সাঁইত্রিশ গণে প্রায় ৭৬০টি ভেষজের গুণবর্ণনা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন বিবিধ লবণ, ছয় ধাতু ও বিবিধ খনিজ পদার্থ ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

হে ঋষি! শুনিয়াছি তুমি সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলে। কিন্তু তুমি এ মরজগতে চিরকালই অমর হইয়া রহিয়াছ—তোমার রচিত সংহিতা চিরকালই তোমায় অমর করিয়া রাখিবে। তুমি যে অসামান্য অস্ত্রচিকিৎসার উপদেশ জগৎকে দিয়া গিয়াছিলে, আমরা ভারতবাসী হইয়াও তাহার সম্যক সমাদর করিতে পারি নাই, তোমার উপদিষ্ট অস্ত্রশস্ত্র স্বচক্ষে কখন দেখিতেও পাইলাম না। আশীর্ব্বাদ কর—ভারতের অতীত গৌরবের, অতীত জ্ঞান-গরিমার, অতীত স্বাধীনচিন্তার নিদর্শনস্বরূপ তোমার সংহিতার গৌরব করিবার অধিকার যেন আমরা কখনও বিস্মৃত না হই।

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী।

বাস্তুভিটা

(গল্প)

গঙ্গার ধারে পল্লীর ক্রোড়ে একখানি বাড়ী খুঁজিতেছিলাম। ছুটির দিনে কলিকাতার কর্ম্ম-কোলাহলের হাত এড়াইয়া, যেখানে গিয়া দুই দণ্ড হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিতে পারি, এমন একখানি পরিচ্ছন্ন, খোলা, ঝর্‌ঝরে বাড়ী।

দালাল আসিয়া খপর দিল, নিকটেই বালিতে একখানি বাড়ী আছে,—বিক্রয়ের জন্য— ঠিক আমি যেমনটি চাই!

পথের উপর এক-তলা বাড়ী, পাশে বাগান,—রাংচিত্রের বেড়ায় ঘেরা। সম্মুখে জীর্ণ দ্বারের গায় একখানা কাগজ আঁটা, তাহাতে লেখা আছে, "বাটী বিক্রয়। ভিতরে সন্ধান করুন।" জলে ভিজিয়া, রৌদ্রে শুকাইয়া, অক্ষরগুলা অদৃশ্য হইবার উপক্রম করিয়াছে! দ্বারের সম্মুখে নোড় ও নিমের দুইটা জীর্ণ গাছ। কালকাসুন্দার ঝোপেরও

অসদ্ভাব নাই! বাড়ীখানি নিতান্তই পোড়ো!

না। ভিতরে ঐ যে কে কাশে! জীবনের চিহ্ন ত তবে লুপ্ত নহে! দ্বারের ফাটল দিয়া আমি ভিতর-পানে চাহিলাম। সম্মুখেই উঠান। উঠানে আগাছার মধ্যে দুই চারিটা কৃষ্ণকলি ও করবীর গাছ মাথা তুলিয়া রহিয়াছে। রোয়াকে শ্যাওলা জমিয়াছে—ঠিক যেন কে সূক্ষ্ম সবুজ ভেলভেট দিয়া রোয়াকের গাটুকু মুড়িয়া দিয়াছে। একটা ভাঙ্গা জানালার মধ্য দিয়া ধূম বাহির হইতেছিল—সে যেন দৈন্যপীড়িত ক্লিষ্ট জীবনেরই ঈষৎ ধূম্র-কৃষ্ণ আভাষ!

বাগানে আম-কাঁঠালের গাছ, শীর্ণ দেহে দাঁড়াইয়া—প্রকাণ্ড মাকড়সার জালে, তাহাদের মাথাগুলা ঘিরিয়া রাখিয়াছে!

দ্বারের কড়া নাড়িলাম। এক উড়িয়া ব্রাহ্মণ আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল, কহিল, "কি চাই?" আমি কহিলাম, "কেহ আছে কি?" সে বলিল, "কর্ত্তাবাবু বাগানে আছেন। আসিবেন কি?"

ভিতরে প্রবেশ করিলাম। নির্জ্জন পুরী। গা যেন ছম ছম করিয়া উঠিল। দুই চারিটা পায়রা ঝটপট করিয়া ছাদের দিকে উড়িয়া গেল।

বাড়ীর পিছনেই বাগান। বাগানের মধ্যে একটা জায়গায় খানিকটা মাটি কোপাইয়া এক বৃদ্ধ নিবিষ্ট চিত্তে কিসের বীজ বুনিতেছিল। হাত পাঁচ সাত দূরে বাগানের ঠিক নীচ দিয়াই গঙ্গা বহিয়া চলিয়াছে। শুভ্র জলের স্রোত, হাসির রেখার মতই তাহা স্নিগ্ধ, নির্ম্মল

পদশব্দে বৃদ্ধ ফিরিয়া চাহিল, কহিল, "আপনারা কি চান?"

আমি কহিলাম, "এই বাড়ীটা কি বিক্রয় হইবে?"

একটা ঢোক গিলিয়া বৃদ্ধ কহিল, "হাঁ!" বলিয়াই তাহার স্বর কেমন রুদ্ধ হইয়া গেল। সেটুকু আমি লক্ষ্য করিলাম; কহিলাম, "তাই একবার দেখিতে আসিয়াছি।"

বৃদ্ধ ঘাড় নাড়িল,—অত্যন্ত মৃদু স্বরে কহিল, "এ বাড়ী আপনাদের পোষাইবে না। তা ছাড়া ইহারা বড় বেশী দাম চায়। একে ত পুরানো ভাঙ্গা বাড়ী,—কি-ই বা আছে! ইট-কাঠগুলা অবধি গুঁড়া হইয়া গিয়াছে। কেন, মিথ্যা খরচ করিয়া কিনিবেন? অন্যত্র ভাল বাড়ীর সন্ধান করুন; বিস্তর মিলিতে পারে।"

কথাটা শেষ করিয়াই বৃদ্ধ আপনার মনে কি বকিতে বকিতে সরিয়া গেল। আমি বিস্মিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। ব্যাপার কি?

২

মোড়ে একখানা মুদির দোকান ছিল। তথা হইতে যে তথ্য সংগ্রহ করিলাম, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এইরূপ,—বৃদ্ধের দুই পুত্র; দুই জনেই কৃতী,—কলিকাতায় বিবাহ করিয়া সেইখানেই বাড়ী কিনিয়া তাহারা বাস করিতে চাহে। আপাততঃ ভাড়া বাড়ীতে থাকে। বধূ দুইটি সহুরে মেয়ে, কাজেই পাড়াগাঁয় থাকিতে চাহে না—তাই পুত্রদ্বয়কেও দেশের মায়া ত্যাগ করিতে হইয়াছে। বৃদ্ধ তাহাতে রাজী হয় না,—হাজার হৌক, সাত পুরুষের বাস্তভিটার মায়া ত্যাগ করা-

ত সহজ নহে। এখানেই তাহার জগদ্ধাত্রী-সমা গৃহিণীকে বৃদ্ধ গঙ্গা দিয়াছে, এই গৃহেই তাহার এক পুত্র, তিন কন্যার মৃত্যু হইয়াছে—আবার এই গৃহেই তাহার পিতৃ-পিতামহ কত সমারোহে একদিন দোল-দুর্গোৎসব করিয়া গিয়াছেন,—কত কাঙ্গাল অতিথি পাত পাতিয়া পূর্ণ পরিতৃপ্তিতে উদর পূর্ত্তি করিয়া দুই হাত তুলিয়া জয় গান গাহিয়া গিয়াছে। সুখ-দুঃখের অজস্র স্মৃতিতে মণ্ডিত, ধূপধূনার পুণ্য গন্ধে সুরভিত, এই গৃহ, সপ্ত পুরুষের লীলাস্বর্গ—ইহার মায়া বৃদ্ধ ত্যাগ করিতে পাবে না। কুলাঙ্গার পুত্র দুইটা দালাল লাগাইয়া বিক্রয়ের জন্য বিস্তর চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু বাপের সহিত কিছুতেই আঁটিয়া উঠিতে পারে না। বাপ এ ভিটা ছাড়িয়া কোথাও নড়িবে না! ছেলেরা দেখা করে না, খোঁজ লয় না, তবু না! এমনই তাহার ধনুর্ভঙ্গ পণ! এতই তাহার বাস্তুভিটার প্রতি মায়া! যে লোক কিনিতে আসে, তাহাকেই বৃদ্ধ নানা ভাংচি দিয়া সরাইয়া দেয়! ছেলেরা বোধ হয় এতটা সংবাদ রাখে না! রাখিলে সহজে বৃদ্ধকে নিষ্কৃতি দিত না।

এই বিচিত্র কাহিনী শুনিয়া, দুই ছিলিম তামাকু পুড়াইয়া, সেদিনকার মত উঠিলাম। আশাভঙ্গে এতটুকু ক্ষোভ হইল না। বৃদ্ধের প্রতি কেমন-একটা অনুরাগ জন্মিল। গৃহে ফিরিবার জন্য যখন কলিকাতা-মুখী ষ্টীমারে চড়িলাম, তখন সন্ধ্যার ম্লানিমা ঘনাইয়া আসিয়াছিল। সেই ম্লানিমার মধ্যে, বৃদ্ধের হৃদয়ের এই অপূর্ব্ব ভাব-রহস্যটুকু দীপ্ত ছটার মতই আমার অন্তরে জ্বলজ্বল করিয়া উঠিল।

৩

ইহার প্রায় এক বৎসর পরে এক বন্ধুর কন্যার বিবাহোপলক্ষে পাত্র আশীর্ব্বাদ করিতে আর একবার বালি গিয়াছিলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বে গঙ্গার তীর ধরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে সেই মুদির দোকানের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মুদি তখন দোকানে ছিল না।

দোকানের সম্মুখে পথের উপর বসিয়া মুদির স্ত্রী ফুলুরী ভাজিতেছিল। পথের ধূলি উড়িয়া আসিয়া ফুলুরীর দেহ ভূষিত করিতেছিল; কিন্তু মুদিনীর সে দিকে লক্ষ্যও ছিল না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মুদি কোথায়?"

মুখ না তুলিয়াই মুদিনী কহিল, "গঞ্জে গিয়াছে।"

একটা ছোকরা আসিয়া টুল পাতিয়া দিল। আমি বসিলাম; ছোকরাকে কহিলাম, "এক ছিলিম তামাক সাজ দেখি।"

নিবিষ্ট চিত্তে তামাকু টানিতেছিলাম। তামাকুর ধূমের সহিত অজস্র চিন্তার জাল মাথার মধ্যে জোট পাকাইতেছিল। মুদিনীর খোলা সমানে চলিয়াছিল। এমন সময় বাজরা মাথায় মুদি দোকানে ফিরিল; আমাকে দেখিয়া প্রণাম করিয়া কহিল, "খপর ভাল? তা এদিকে আগমন—"

আমি কহিলাম, "এখানে একটি পাত্র দেখিতে আসিয়াছিলাম। তা তোমাদের সে বাড়ীর খপর কি?"

"কোন্ বাড়ী?"

"ঐ, যে বাড়ী বিক্রয় হইবার কথা ছিল। বাড়ীখানি আমার বড় পছন্দমত—যদি পাওয়া যায়——"

"সে বাড়ী বিক্রয় হইয়া গিয়াছে।"

আমি কৌতূহলী হইয়া উঠিলাম, কহিলাম, "বিক্রয় হইয়া গিয়াছে? কি রকম? তবে সে বুড়া—"

মুদি কহিল, "বুড়ার দুঃখের কথা আর কি বলিব, বাবু? কলিকাতার এত কাছে, গঙ্গার ধারে বাড়ী—উহা কি পড়িয়া থাকে? তাহার জন্য খরিদদার আসিয়া নিত্যই ফিরিয়া যাইত। ছেলেরা খবর পাইয়া একদিন সস্ত্রীক আসিয়া উপস্থিত। বুড়া বলে, আম-কাঁঠা'লের সময়টা কাটিয়া যাক্, তখন বিক্রয় করিয়ো—হাতের গাছ—তাহার ফলটা মুখে দিব না? এমনই করিয়া তিন চারি মাস কাটিয়া গেল। ছেলেরা বলিল, আমরা আপনার কাছে থাকিতে পারি না, এই বৃদ্ধ বয়সে আপনার সেবা-শুশ্রূষা হয় না! কাজ কর্ম্মের ঝঞ্ঝাটে এখানে আসিবার সুবিধাও ঘটে না, ইহাতে লোকে যে আমাদেরই নিন্দা করে। আমাদের সঙ্গে আপনিও কলিকাতায় থাকিবেন, চলুন! তাহাতেও বুড়ার মন গলিল না। তাহার শুধু সেই এক কথা, পিতৃ-পুরুষের ভিটা ছাড়া যায় না। যেখানে জন্ম লইয়াছি, আজন্ম যেখানে কাটিয়া গেল, মৃত্যুটা যদি সেইখানেই ঘটে, তাহার চেয়ে ভাগ্যের কথা আর কি আছে? বুড়ার চোখ ছলছল করিয়া উঠিত। নিজের হাতে কোপাইয়া, কত শাক সব্জীর গাছ বুনিয়াছে, উঠানের আগাছা সাফ করিয়াছে—ব্রাহ্মণ বা দেবতা কাহারও খাতির বুড়া ইদানীং রক্ষা করে নাই—সমস্ত প্রাণ এই বাস্তু-ভিটাটির উপর ঢালিয়া দিয়াছিল—ছেলের অধিক মায়া, নাতির অধিক স্নেহ, দেবতার অধিক শ্রদ্ধা! বাস্তুভিটাটি বুড়ার কাছে তাহার ইষ্টদেবতারও অধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।"

আমি কহিলাম, "তার পর?"

মুদি কহিল, "কিন্তু সবই বৃথা হইল। ছেলেরা একদিন জোর করিয়া বাপকে নৌকায় তুলিয়া কলিকাতায় লইয়া গেল। তখন সবে ভোর হইয়াছে। বুড়ার সে কান্নার সুরে এখানে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ঘাটে গিয়া দেখি, নৌকা তর্ তর্ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, বৃদ্ধকে ধরিয়া ছেলেরা নৌকায় বসিয়া, আর দুই হাত তুলিয়া বুড়ার সে কি আছাড়ি পিছাড়ি! আঃ, বাড়ীর উপর এমন মায়া, বাবু, আমার ত মাথার চুল পাকিয়া গেল, এমনটি কখনও দেখি নাই!"

"তার পর বাড়ীর কি হইল?"

"তার এক সপ্তাহ পরেই বাড়ীখানা বিক্রয় হইয়া গেল। কলিকাতার কে-এক উকিলবাবু বাড়ীখানা কিনিয়াছেন—মেরামত করাইয়া বাড়ীর যে সজ্জা বাহির করিয়াছেন, যেন ছবি-খানি! তিনি ওখানে বাগানবাড়ী করিয়াছেন, আর কি!"

আমি উঠিলাম। সেই পোড়ো বাড়ীর দিকে চলিলাম। এ কি! এ যে মোটেই চেনা যায় না! কাঙ্গালিনীকে কে যেন রাজার রাণী সাজাইয়া তুলিয়াছে! সে ভাঙ্গা দ্বার-জানালা, সে জীর্ণ, বালি-খসা, লোনা-ধরা দেওয়াল কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। সে রাঙচিত্রের বেড়ার স্থানে তারের রেলিঙ খাড়া হইয়াছে,—তাহার পশ্চাতে বিচিত্র ক্রোটনের সারি। আলাদিনের প্রদীপ ঘষিয়া কে যেন এই বনের মধ্যে কোথা হইতে, এক মায়াপুরী উপড়াইয়া আনিয়া রাখিয়াছে! কোথায়

গিয়াছে, সম্মুখের সে নোড়-নিমের শুষ্ক গাছ, কোথায় বা সে কালকাসুন্দার ঘন ঝোপ!

আকাশে তখন চাঁদ উঠিয়াছিল—তৃতীয়ার ক্ষীণ চাঁদ। তাহারই অস্পষ্ট আলোকরশ্মি নিম্নে মর্ত্ত্য-তলে ঝরিয়া পড়িয়াছিল! সেই অস্পষ্ট আলোকে আমি দেখিলাম, সম্মুখে জীর্ণ দ্বারের জায়গায় প্রকাণ্ড গেট বসিয়াছে! গেটের পথে লাল কাঁকর ফেলা হইয়াছে। সেই পথের দুই ধারে হাস্নুহানা ও বেল-জুইয়ের অসংখ্য গাছ। তাহাতে অজস্র ফুল ফুটিয়া গন্ধে চারিধার মাতাইয়া তুলিয়াছে। আমি কেমন বিহ্বল হইয়া পড়িলাম। বাহ্য চেতনা যেন লুপ্ত হইয়া গেল।

সহসা সাড় হইল। ভাল করিয়া গৃহের পানে আর একবার চাহিয়া দেখিলাম। অদূরে কক্ষে তখন আলো জ্বালা হইয়াছে! খোলা জানালার মধ্য দিয়া পশ্চাতে মুক্ত প্রান্তরের আভাষ পাওয়া যাইতেছিল! গঙ্গাবক্ষও অস্পষ্ট চোখে পড়ে। চাঁদের আলো পড়ায় গঙ্গার মৃদু তরঙ্গে যেন রূপালি বিদ্যুৎ খেলিতেছিল! ক্রমে ভিতরে পিয়ানো-ক্লারিয়োনেটেও সুর উঠিল—সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যশীল নূপুরের মিষ্ট মধুর ঝঙ্কার ও নারী কণ্ঠের সঙ্গীত ধারা ঝরিয়া পড়িল!

আমার প্রাণে একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগিল। একটু সরিয়া আসিয়া একটা ইষ্টক-স্তূপের উপর আমি বসিয়া পড়িলাম! সেখানেও সেই নূপুর-গীত-বাদ্যের মিশ্র নিক্কণ ভাসিয়া আসিতেছিল! সে সুরে যেন উগ্র বিষ উগারিয়া উঠিতেছিল।

কক্ষস্থ বাতির ঝাড়ের আলোক-রশ্মি গাছের ফাঁক দিয়া পথে দুই-চারি টুকরা বিক্ষুবিত হইয়া পড়িয়াছিল, আমার মনে হইল, সে যেন প্রলয় দাহেরই বহ্নিশিখা! মাথা দপ্ দপ্ করিয়া উঠিল! এই সে বুড়ার বাস্তুভিটা,—বুড়ার বুক-ফাটা অশ্রু আজও তথায় সঞ্চিত রহিয়াছে! উৎসব-ব্যসনের হর্ষ-ব্যথা যথায় শত চরণ-চিহ্ন পাত করিয়া গিয়াছে, সপ্ত পুরুষের হৃদয় হইতে যথায় স্নেহ, মায়া, দয়া, প্রেম ও আতিথেয়তার সহস্র সুবর্ণ ধারা ঝরিয়া মরিয়াছে, আজও যাহার স্মৃতি একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই,—এই সেই বাগান, সেই উঠান, সেই ঘর! আজ তথায় বিলাস-লীলার দিব্য অভিনয় জমিয়া উঠিয়াছে! সেই সুখ দুঃখের স্মৃতির উপর লালসা আজ তাহার চপল চরণে বিকট নৃত্য লাগাইয়া দিয়াছে!

আমার চেতনা যেন লুপ্ত হইল। সহসা তখনই মানস-নয়নের সম্মুখে কলিকাতার অন্ধকার গলির মধ্যকার একটা স্যাঁৎসেঁতে বাড়ীর শোচনীয় দৃশ্য নিমেষে যেন জাগিয়া উঠিল। যেন স্পষ্ট দেখিলাম, সেই গৃহে ছোট একটি টুলে এই পোড়ো বাড়ীর অধিকারী, সেই বেচারা বৃদ্ধ যেন দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া আছে—নীরব বেদনায় তাহার বুক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, চোখের জলে শীর্ণ হাত দুইটি ভিজিয়া উঠিয়াছে!

দাঁড়াইয়া আকাশের পানে চাহিলাম। মাথার উপর বিরাট নীল স্তব্ধ আকাশ। সেই আকাশে বসিয়া নক্ষত্রগুলা নীরবে শুধু অজস্র অশ্রুধারা বর্ষণ করিতেছিল।

সহসা পার্শ্বে সজিনা গাছের ডাল হইতে একটা পাখী ফুকারিয়া গাহিয়া উঠিল, "চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল!"

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

নববর্ষে

ঐ বাজে মঙ্গল আরতি, যাত্রী যত উল্লাসে মগন,
"দীর্ঘ পথ অবসান এবে, দেখা যায় তীর্থ নিকেতন !"
আশার উচ্ছ্বাসে আকুলিয়া, সচকিতে চারিদিকে চাই—
কোথায় গো দেবতা নূতন, তোমার ত দেখা নাহি পাই !
চোখে পড়ে নীল নভস্তল, রবি শশী গ্রহতারাগণ,
তরুলতা সমুদ্র অচল, সেই সবই চির পুরাতন !
বিরাট এ পুরাতন মাঝে, শুনিয়াছি তুমি আদিভূপ !
বিশ্বব্যাপী মূরতি তোমার—অতুল সুন্দর মহারূপ !
কেন তবে করিছ ছলনা, প্রকাশ হে প্রচ্ছন্ন মহিমা,
পুণ্যমঙ্গল-নবালোকে ভরি দাও স্বর্গমর্ত্ত্যসীমা।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

কালিদাসের নাটক

(চয়ন)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কালিদাস তিনটি নাটক রচনা করেন :—শকুন্তলা, বিক্রমোর্ব্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র।

অবশ্য, মালবিকাই কবির প্রথম রচনা; কেননা, প্রস্তাবনায় সূত্রধার, প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারদিগকে উপেক্ষা করিয়া, অজ্ঞাতনামা এক গ্রন্থকারের নাটক অভিনয় করিতে কেন উদ্যত হইয়াছেন তাহার হেতু সমর্থন করিয়াছেন। পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত এই নাটকখানি উজ্জয়িনী নগরে বসন্তোৎসব-উপলক্ষে অভিনীত হয়। ইহার আখ্যানবস্তু, রাজান্তঃপুরের গুপ্ত প্রেমলীলা। ইহার পাত্রগণ নাট্যশাস্ত্রের উপদেশানুরূপ। ইহার নায়ক, উদারপ্রকৃতি আমোদপ্রিয় রাজা, কিন্তু রাজ্যশাসন অপেক্ষা প্রেমের ব্যাপার লইয়াই ইনি অধিক ব্যাপৃত। ইহার সহকারী, বিদূষক গৌতম ব্রাহ্মণ, প্রিয়ভাষী ও প্রভুভক্ত, কিন্তু অসংযত-বাক্ ও ভীরু; কঞ্চুকী মদ্‌গল্য, আদব-কায়দা-দুরস্ত ও পরিণামদর্শী; নাট্যাচার্য্য-দ্বয়—গণদাস ও হরদত্ত, সঙ্গীতকলানুরাগী ও রাজানুগ্রহ-লাভাকাঙ্ক্ষায় ঈর্ষ্যান্বিত; এবং বামন "সাবস";—ইহারাই অন্তঃপুরস্থ পুরুষবর্গ। মন্ত্রি বাহতক বহিঃ-রাষ্ট্রনীতির পরিচালক।

নায়িকা, রাজকুমারী মালবিকা—একজন মুগ্ধারমণী; তাঁহার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী—মহিষী ধারিণী। ধারিণী—রাজার প্রতি একান্ত অনুরক্ত; রাজা অন্যাসক্ত বলিয়া ধারিণীর বিষম কষ্ট; কিন্তু ধারিণী উদার-

প্রকৃতি এবং অপমানেও গর্ব্বিতা; রাণী ইরাবতী উদ্ধতপ্রকৃতি ও কোপনস্বভাব, এমন কি, কোপের আবেগে তিনি প্রহার করিতেও কুণ্ঠিত নহেন। বৌদ্ধ-পরিব্রাজিকা কৌশিকী, নানাপ্রকার কষ্ট পাইয়া সংসারত্যাগী হইয়াছেন; উচ্চতর উপদেশ ও আখ্যানাদির দ্বারা তিনি পরিত্যক্তা ধারিণীকে সান্ত্বনা দেন ও তাঁহার চিত্তবিনোদন করেন। পরিব্রাজিকার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সকল অবস্থাতেই ধারিণীকে সাহায্য করে। তিনি যেমন নর্ত্তকীর গুণাগুণ বিচার করিতে সমর্থ, তেমনি সর্প দংশনের ঔষধনির্দ্দেশ করিতেও সুদক্ষ। রমণীদিগের মধ্যে একমাত্র তিনিই সংস্কৃত ভাষায় বাক্যালাপ করেন। প্রতীহারী জয়সেনা সকল সময়েই রাজার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। পরিচারিকাদিগের স্বভাবচরিত্রে স্ব স্ব ঠাকুরাণীর স্বভাবচরিত্র প্রতিফলিত।

ইতিহাস হইতে কবি তাঁহার নায়ক নির্ব্বাচন করিয়াছেন। অগ্নিমিত্র শুঙ্গ রাজবংশের প্রথম রাজা। তিনি খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে মৌর্য্য-সিংহাসন অধিকার করেন। এই নাটকে, অগ্নিমিত্রের পিতা পুষ্পমিত্রের এবং তাঁহার পুত্র বসুমিত্রের উল্লেখ আছে। বিদর্ভের সহিত যুদ্ধ ও যবনদিগের পরাজয় —ইহাও বোধ হয় ঐতিহ্য হইতে গৃহীত; অবশিষ্ট ভাগ কবির কল্পনা, কিন্তু এই কল্পনার জন্যও তাঁহাকে সমধিক প্রয়াস পাইতে হয় নাই। ভাষ-প্রণীত স্বপ্নবাসবদত্তার ন্যায় পূর্ব্ববর্ত্তী নাটককারদিগের গ্রন্থে এইরূপ রচনার আদর্শ প্রদত্ত হইয়াছে। অন্তঃপুরের গুপ্ত-প্রেম-ঘটিত এই ধরণের নাটক পূর্ব্ব হইতেই একপ্রকার "গড়া-পেটা" হইয়া রহিয়াছে। কোন এক রাজার ভাবী পত্নীরূপে নির্দ্দিষ্ট কোন এক রাজকুমারীর দৈবদুর্ঘটনা উপস্থিত হওয়ায় সেই সঙ্কল্পিত বিবাহ যেন চিরতরে ভাঙ্গিয়া গেল এইরূপ মনে হইল। পরে, যে রাজার সহিত ঐ রাজকুমারীর পরিণয় হইবার কথা ঐ রাজকুমারী ঘটনাক্রমে সেই রাজার মহিষীর পরিচারিকা হইল। রাজকুমারীকে কেহ চিনিতে পারিল না। রাজা তাহার রূপলাবণ্যে ও উচ্চকুলসুলভ শিষ্টব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাহার প্রতি আসক্ত হইলেন। কোন সংকেতস্থানে নায়কনায়িকার দেখা সাক্ষাৎ হইল। বিদূষকের নির্ব্বুদ্ধিতায়, মহিষী, উভয়ের প্রথম মিলনে বাধা দিতে সমর্থ হইলেন। মহিষী যারপরনাই কুপিতা হইলেন। রাজা তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু রাজা আবার একটা অপরাধে ধরা পড়িলেন। দৈবযোগে মহিষীর মনোভাবের পরিবর্ত্তন হইল! তাঁহার ক্রোধের উপশম হইল; তিনি নিজ হস্তে স্বীয় সপত্নীকে রাজার হস্তে সমর্পণ করিলেন। অনেক স্থলেই, রাজারা এইরূপ বিবাহ করিয়া, কোন ভবিষ্যদ্বাণীর বলে, চক্রবর্ত্তিত্ব লাভ করিয়া থাকেন। ইহাই মালবিকার, রত্নাবলীর, প্রিয়দর্শিকার, কর্পূরমঞ্জরীর, কর্ণসুন্দরী প্রভৃতির মোটামুটি নক্সা।

যে সকল ঘটনার দ্বারা নায়ক নায়িকার সাক্ষাৎকার ঘটে, মহিষী সংকেতস্থলে আসিয়া পড়েন, তাঁর কোপ প্রশমিত হয়,—সেই সকল ঘটনার মধ্যেই যাহা কিছু বৈচিত্র্য। তাছাড়া, প্রধান জিনিস উহা নহে। নায়ক নায়িকার মনের অবস্থা মনোজ্ঞ শ্লোকে চিত্রিত করা

এবং এই চিত্রের সহিত কতকগুলি নিসর্গবর্ণনা মিশ্রিত করা—ইহাই আসল জিনিস।

রাজা মালবিকার চিত্র দেখিয়া, আসল লোকটিকে দেখিতে ইচ্ছুক হইলেন। মহিষী তাহাকে লুকাইয়া রাখিতে সচেষ্ট হইলেন। মালবিকা নৃত্য শিক্ষা করিতেছিল, নৃত্যবিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছে, নাট্যাচার্য্য এইরূপ ঘোষণা করিলেন। অন্তঃপুরের নাট্যাচার্য্য-দ্বয়ের মধ্যে বিদূষক ঝগড়া বাধাইয়া দিলেন। উহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, ইহা বিচার করিবার জন্য উভয়েই রাজার শরণাপন্ন হইলেন। রাজা অগ্নিমিত্র, পরিব্রাজিকার উপর বিচারের ভার দিলেন। পরিব্রাজিকা, উভয় নাট্যাচার্য্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিষ্যের নৃত্য দেখাইবার জন্য আদেশ করিলেন। গণদাস মালবিকাকে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। মালবিকার নৃত্যগীত ও অভিনয়ে সকলেই আত্মহারা হইল। রাজা তাহার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইলেন। মধ্যাহ্নে নৃত্য থামিল। এই সময়ে, কবির কতকগুলি স্বভাববর্ণনাত্মক শ্লোক রচনার অবসর হইল। তৃতীয় অঙ্কের দৃশ্য—প্রমোদ-বন। এই উপলক্ষে, একটু নূতনভাবে উদ্যান ও বসন্ত বর্ণনা করা কবির পক্ষে সহজসাধ্য। এ অবসর তিনি ছাড়েন নাই।

ধারিণীর কোন কার্য্যোপলক্ষে, ধারিণীর আদেশে, সখী বকুলাবলিকাকে সঙ্গে লইয়া মালবিকা প্রমোদবনে প্রবেশ করিয়াছেন। বিদূষকের সহিত রাজা বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত থাকিয়া মুগ্ধ নয়নে মালবিকাকে দেখিতেছেন। ওদিকে পরিচারিকার সহিত রাণী ইরাবতী রাজার গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। রাজার মনের আবেগ আর সম্বরণ করিতে না পারিয়া, বৃক্ষান্তরাল হইতে বাহির হইয়া, মালবিকাকে আলিঙ্গন করিলেন। এই সময়ে রাণী ইরাবতীও আসিয়া পড়িলেন। তিনি বিষম কুপিত হইয়া রাজাকে স্বীয় রশনার দ্বারা প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন এবং রাজাকে এইরূপ অবমানিত করিয়া প্রস্থান করিলেন। পরে মালবিকাকে কারারুদ্ধ করিলেন। রাজা স্বীয় প্রণয়িনীকে পুনর্ব্বার দর্শন করিবার মানসে বিদূষকের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। গৌতম সর্পদষ্ট হইয়াছে বলিয়া ভাণ করিল, আরোগ্য লাভের জন্য রাণীর অঙ্গুরীটি চাহিল; এবং সেই অঙ্গুরী লইয়া মালবিকাকে কারাগার হইতে উদ্ধার করিল। নায়কনায়িকার আবার সাক্ষাৎকার ঘটিল; এবারও রাজা, ইরাবতীর নিকট ধরা পড়িলেন। রাজা নিরুপায় হইলেন। কিন্তু ঠিক এই সময়ে রাজকুমারী বসুলক্ষ্মী একটা বানরের ভয়ে মূর্চ্ছিত হওয়ায়, তাঁহার চৈতন্য সম্পাদনের জন্য রাজা আহূত হইলেন। পঞ্চম অঙ্কে, জয়ের সংবাদ লইয়া একজন দূত বিদর্ভ হইতে আগমন করিল। তাহার সঙ্গে একদল বন্দী। সেই দেশের দুই জন সঙ্গীতনিপুণা পরিচারিকা মহিষীর সম্মুখে আনীত হইল। উহারা পরিব্রাজিকা কৌশিকীকে চিনিতে পারিল। এবং তাহাদের যে রাজকুমারী মৃত বলিয়া এযাবৎ তাহাদের বিশ্বাস ছিল, সেই রাজকুমারী মালবিকাকে তাহারা পুনঃপ্রাপ্ত হইল। রাজার পিতা পুষ্পমিত্রেরও একজন দূত এই সময়ে সুসংবাদ লইয়া আসিল। ধারিণীর পুত্র রাজকুমার বসুমিত্র যুদ্ধে কিরূপ জয়লাভ করিয়াছেন, ঐ দূত তাহার বর্ণনা করিতে লাগিল। মহিষী আনন্দের নিদর্শন-স্বরূপ

মালবিকাকে রাণী উপাধি প্রদান করিলেন। ইরাবতী ক্ষমা প্রার্থনা করিল। সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল।

যিনি সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যকে য়ুরোপের সমক্ষে প্রকাশিত করেন সেই প্রবীণ সাহিত্য-বিচারক Wilson, পাণ্ডুলিপি ও কিংবদন্তি—এই দুয়ের সমবেত সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে, এই নাটকখানির প্রামাণিকতা অস্বীকার করিয়াছেন দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। এই প্রতিবাদের মূলে অনুভূতিমূলক যুক্তি ছাড়া তাঁহার আর কোন যুক্তি নাই। তিনি বলেন, "ইহা যে শকুন্তলা ও বিক্রমোর্ব্বশীর গ্রন্থকারের রচনা ইহা কোন ক্রমেই স্বীকার করিতে পারা যায় না। ইহার আখ্যানে না-আছে কল্পনা, ইহার পদ্যরচনায় না-আছে স্বরমাধুর্য্য।" নিকৃষ্টতার প্রথম কারণটি সহজেই নির্দ্দেশ করা যায়—ইহা তাঁহার প্রথম রচনা। দ্বিতীয় কারণটি ত ভারতীয় কাব্যবিচারকদিগের নজরে পড়ে নাই; এইরূপ দোষ থাকিলে, তাঁহাদের দৃষ্টি এড়াইত না। এই সকল ত্রুটি ধরিতে তাঁহারা বিশেষরূপে পটু। কিন্তু Wilson এর নিকটেও এই দুটি দোষ প্রামাণিকতা খণ্ডনের পক্ষে যথেষ্ট নয়, কেননা, একটু পরেই তিনি আবার বলিতেছেন,—"ইহা প্রাচীন কবি কালিদাসের রচনা বলিয়া অনুমান করিবার কিছু হেতু থাকিতে পারে; কিন্তু উহাতে যেরূপ রীতিনীতি বর্ণিত হইয়াছে, উহা ভারত-সমাজের অধঃপতন সময়ের রীতিনীতি বলিয়া বোধ হয় এবং উহা দশম কিম্বা একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বিশ্বাস করা প্রায় অসম্ভব।" আমরা এই নাটকের যে বিশ্লেষণ দিয়াছি,—তাহাতেই এই যুক্তি ঐতিহাসিক বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও এই যুক্তির অসারতা সহজেই পরিলক্ষিত হইবে। মালবিকার রীতিনীতির সহিত বাস্তবতার কোন সম্পর্ক নাই। সমস্ত খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত কালিদাসের পূর্ব্বেই নিয়মবদ্ধ হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত তিন নাটকের মধ্যে, লিখনরীতি, ভাব, চিন্তা প্রভৃতি সম্বন্ধে যে একটা সমতা আছে এবং ঐ তিন নাটকের মধ্যে যে একটা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সম্বন্ধ আছে, তাহা Weber ও শঙ্কর পণ্ডিত প্রদর্শন করিয়াছেন; অতএব ও-সম্বন্ধে তর্কের মুখ এক প্রকার বন্ধ হইয়াছে বলিলেও হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কতকাল

ঊর্দ্ধে মহাব্যোম ওই অসীম-প্রসার!
সীমাহীনা, সুবিপুলা মেদিনী অধসে!
তাহার উপরে অদ্রি গগন পরশে!
বক্ষে প্রধাবিত সিন্ধু অতল, অপার!
এ অসীম মাঝে রবে কতকাল নর
সঙ্কীর্ণ আমিত্ব অন্ধগুহার ভিতর!!

শ্রীবিভূতিভূষণ মজুমদার।

সৌধ-রহস্য

(চয়ন— ধারাবাহিক উপন্যাস)

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমার নাম, জন ফদারজিল ওয়েষ্ট। আমি সেণ্ট আণ্ড্রু বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের ছাত্র। নিম্নলিখিত কয়েকখানি পত্রে আমি যে ঘটনা প্রকাশ করিতেছি, তাহা সরল সত্যের অভিব্যক্তি মাত্র। সাহিত্য জগতে যশোলাভের দুরাশা আমার কোন দিনই ছিল না, আজও নাই। বর্ণনার মাধুর্য্যে বা ঘটনা-সমাবেশের চাতুর্য্যে বর্ণনীয় বিষয়টিকে লোক চক্ষে সমধিক চিত্তাকর্ষক বা রমণীয় করিয়া তুলিবারও বিন্দুমাত্র প্রয়াস পাই নাই। এই ঘটনার বিষয় যাঁহারা একটুও অবগত আছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, যে কোথাও আমি এতটুকু সত্যের অপলাপ করিয়া কল্পনার তুলি বুলাই নাই। সম্ভবতঃ সাহিত্য-জগতের সহিত ইহাই আমার প্রথম ও শেষ পরিচয়। অন্ততঃ এখনও পর্য্যন্ত ত আমার মনের ভাব এইরূপ।

প্রথমে ভাবিয়াছিলাম প্রমাণ-প্রয়োগ সমেত যেমন যাহা ঘটিয়া ছিল তেমনি ভাবেই সব প্রকাশ করিব। কিন্তু আমার শুভার্থী বন্ধু-বান্ধবগণের পরামর্শে সে মত পরিবর্ত্তন করিতে হইল। আমার নিকট যে সমস্ত কাগজ-পত্র আছে, সেগুলি সম্পূর্ণ প্রকাশ করিলে জেনারল হিমারষ্টণের সম্বন্ধে সকল কথাই সাধারণ্যে প্রকাশ হইয়া পড়ে, সুতরাং নানা কারণে তাহা আমি সঙ্গত বলিয়া মনে করি না। এই ভূমিকার সহিত আমার নিজেরও কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। নামটা প্রথমেই বলা হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে অবশিষ্টটুকু বলিতেছি।

আমার পিতা জন হাণ্টার ওয়েষ্ট সংস্কৃত এবং অন্যান্য প্রাচ্য ভাষায় একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত ছিলেন। এখনও পর্য্যন্ত তাঁহার নাম আমাদের দেশের বিদ্বৎ-সমাজে গৌরবের সহিত উচ্চারিত হইয়া থাকে। হাফেজ ও ফেরিদোদ্দিন আতরের তর্জ্জমায় তাঁহার নামে সাহিত্য জগতে বিজয় দুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছিল। মক্কেলের দল, মকদ্দমা বুঝাইবার জন্য যখন তাঁহাকে খুঁজিতে আসিত, তিনি তখন প্রধান প্রধান লাইব্রেরি কিম্বা কোন সাহিত্যসেবী বন্ধুর গৃহে খৃষ্টজন্মের ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বে মনু কি আইন-কানুন করিয়া গিয়াছিলেন তাহারই গভীর তথ্য-আবিষ্কারে তন্ময় হইয়া থাকিতেন। কাজেই বিশুদ্ধ জ্ঞানের আলোকে তাঁহার অন্তর-দেশ যতই উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে ছিল, আর্থিক অবস্থা ও গৃহের সচ্ছলতা ঠিক সেই পরিমাণেই শোচনীয় হইতেছিল।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন সংস্কৃত অধ্যাপকের কোন পদ ছিল না। কাজেই বাবারও তখন ফরদুসি, ওমরখৈয়ম, কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতির কবিতা ছাড়া আর কোন মুল্যবান বহিও ভাণ্ডারে মজুত ছিল না।

নিকটতম আত্মীয়ের মতই দারিদ্র্য

তাহার নিবিড় বন্ধনে যখন আমাদিগকে বাঁধিয়া ফেলিতেছিল সে সময় আমার বৈমাত্রেয় খুল্লতাত উইলিয়ম ফ্যারিমটস্ যদি আমাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য না করিতেন, তাহা হইলে আমাদের দিন কাটানো দায় হইয়া উঠিত। উইগটাউন-সায়ারে কাকার কিছু সম্পত্তি আছে। জমিদারী খুব বৃহৎ হইলেও জমীর আয় নিতান্তই অল্প। কারণ তাঁহার জমিদারীটা অত্যন্ত অনুর্ব্বর প্রদেশে অবস্থিত। তেমন শস্যহীন ভূমি সমস্ত স্কট্‌ল্যাণ্ডের মধ্যে আর দ্বিতীয় আছে কি না সন্দেহ!

কাকা অবিবাহিত। নিজেও তিনি মিতব্যয়ী, কাজেই জমীর খাজনা-পত্র যাহা কিছু পাওয়া যাইত, খরচ-বাদেও তাহা হইতে তাঁহার কিছু কিছু সঞ্চয় হইত। এই জমিদারী ভিন্ন পিতৃব্যের একটি ঘোড়ার ব্যবসায়ও ছিল। আমাদের যখন সময় ভাল ছিল, কাকা তখন মধ্যে মধ্যে সংবাদ লইতেন। কিন্তু অবস্থা-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার স্নেহেরও হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল। তাহার পর আমাদের অবস্থা যখন অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িল, ঠিক সেই সময় একদিন সহসা ভগবানের করুণার মতই অপ্রত্যাশিত রূপে আমরা তাঁহার এক পত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছিলেন যে তিনি দেশ-ভ্রমণে যাইতেছেন; তাঁহার সম্পত্তি তত্ত্বাবধানের জন্য বাবাকে তাঁহার বাটীতে গিয়া থাকিতে হইবে, অবশ্য সেজন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিকের যে ব্যবস্থা হইবে, সে কথা বলাই বাহুল্য।

আমার মা নাই। সংসারে বাবা ও আমি ছাড়া তৃতীয় প্রাণী ছিল, আমার ছোট বোন। কাকার নিমন্ত্রণ অত্যন্ত আনন্দের সহিতই আমরা গ্রহণ করিলাম। আমাদের সামান্য দ্রব্যাদি ও বাবার বহু যত্নের পুস্তকগুলি বাঁধিয়া-ছাঁদিয়া যথাসময়ে আমরা নূতন স্থানে নূতন সংসার পাতিবার আশায় উৎসাহপূর্ণ চিত্তে যাত্রা করিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কাকার বাড়ীখানি ঠিক "জমিদার বাড়ী"র মত যথেষ্ট প্রকাণ্ড নহে। তবে আমাদের সহরের আলোক ও বায়ু-হীন ক্ষুদ্র বাস-গৃহের তুলনায় যে পরম রমণীয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাড়ীখানি যদিও একটু নীচু জমীর উপর অবস্থিত, তবুও তেমন স্যাঁতানে নয়! লাল টালির ছাদ দেওয়া, ভিতরে অনেকগুলি ঘর, সম্মুখে বিস্তৃত বারাণ্ডা, বাড়ীর তিন পাশে মাঝারি রকম ফুলের বাগান। বাগানে গাছ-পালা খুব বেশী নাই কারণ সমুদ্রের লোণা বাতাসে সকল প্রকার পুষ্পবৃক্ষ জন্মিতে, অথবা জন্মিলেও দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারে না। যে দুই চারিটি জন্মায় ও কোন মতে বাঁচিয়া যায়, সেগুলিও তেমন সতেজ হইয়া উঠে না। রুগ্ন দেহের মতই কেমন একটা সকরুণ শ্রী তাহাদিগকে ঘিরিয়া থাকে।

পশ্চাতে দূর সীমায় একখানি গ্রাম। খুব বেশী হইলেও এই গ্রামে দশ বারো ঘরের অধিক বাসিন্দা নাই। তাহারা প্রায় সকলেই গরীব,—ব্যবসায় বৃত্তিতে অধিকাংশই ধীবর। পশ্চিমে পীত বর্ণের সমুদ্র-বেলা, তাহার অনতি-দূরে আইরিস্ সমুদ্র। এতদ্ভিন্ন চারিদিকেই শস্যহীন অনুর্ব্বর উষর জলাভূমি একেবারে সীমাহীন দিগন্ত রেখায় মিলাইয়া গিয়াছে।

উইগ্‌টাউনের তীরটি একান্তই নির্জ্জন, নিরানন্দময়। আমাদের বাটী হইতে বাহির হইলে, কোন খানে মনুষ্য বাসের চিহ্ন অবধি দেখা যায় না। কেবল কিছু দূরে উচ্চ জমীর উপর অধিষ্ঠিত ক্রুমবার হল নামক সৌধের প্রাচীন অত্যুচ্চ চূড়াটি শুধু দেখা যায়। দূর হইতে দেখিলেই মনে হয়, একটা প্রকাণ্ড গোরের উপর যেন একটা স্মৃতিস্তম্ভ খাড়া রহিয়াছে। আমাদের গৃহ হইতে এই নূতন ধরণের বাড়ীটির ব্যবধান মাইল-খানেকের অধিক হইবে না। গ্লাশগোর এক অপূর্ব্ব রুচিসম্পন্ন ধনী ব্যক্তি ইহা নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন।

আমরা যখন কাকার বাড়ীতে বাস করিবার জন্য আসিলাম, সে বাড়ীটি তখন সম্পূর্ণ খালি পড়িয়াছিল। কতকগুলা বাদুড়, পেঁচা ও পারাবতে বাড়ীটাকে যেন পুরুষানুক্রমে ভোগ দখল করিয়া আসিতেছে। বাড়ীর শ্রী দেখিলে মনে হয়, তাহারা সহজে তাহাদের দখলীস্বত্ব ছাড়িতে নারাজ। শেওলা-ঢাকা ময়লা দেওয়ালগুলা তাহাকে অধিকতর বীভৎস করিয়া তুলিয়াছিল। এই পরিত্যক্ত পুরীটি কিন্তু স্থানীয় ধীবরদের পক্ষে একটি প্রয়োজনের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সমুদ্রে মাছ ধরিয়া ফিরিবার পথে ক্রুম্‌বার হলের উচ্চ চূড়াটি দ্বারা তাহারা দিক ঠিক করিয়া লইত।

আমাদের ভাগ্য-দেবতা এই নিরানন্দ নির্জ্জন দুর্গম প্রদেশে আমাদের তিনটি প্রাণীকে তাঁহার অলঙ্ঘ্য তর্জ্জনী-হেলনে আহ্বান করিয়া আনিলেন। নির্জ্জনতাটুকু অবশ্য আমাদের মন্দ লাগিত না, বরং সহরের গোলমালের বাহিরে জন-সঙ্গহীন এই শান্ত, তপোবন তুল্য স্থানে আসিয়া আমরা পরিপূর্ণ শান্তি উপভোগ করিতেছিলাম। ইহা ছাড়া কম পয়সায় 'বড় মানুষী চাল' বজায় রাখিবার যে নিদারুণ লাঞ্ছনা, তাহাও এখানে ভোগ করিতে হইত না। ইহা যে একটা অল্প লাভ নয়, তাহা বোধ হয় আমাদের মত অবস্থাপন্ন ভুক্ত-ভোগীর দল মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিবেন।

কাকার একখানি গাড়ী আর ছোট দুটি কালো ঘোড়া ছিল। আমরা পিতা-পুত্রে প্রত্যহ গাড়ী চড়িয়া কাকার জমিদারীর কার্য্য পরিদর্শন করিয়া আসিতাম। আর আনন্দ-প্রতিমা এস্থার তাহার স্নেহপূর্ণ মনটি দিয়া, হাসি-মুখের আলো জ্বালাইয়া আমাদের ক্ষুদ্র সংসারের সুখ ও স্বচ্ছন্দতা রক্ষা করিত। আমাদের নিরানন্দ বিদেশ-বাস সুখময় করিতেই যেন সে আমাদের নির্জ্জন গৃহখানি তাহার সুমধুর কলহাস্যে মুখরিত রাখিত। এমনি অনাবিল শান্তি-সুখে আমাদের দিনগুলি জল-স্রোতের মত অবাধে কাটিয়া যাইতেছিল। এমন সময় একদিন গ্রীষ্মরাত্রে এমন একটা ঘটনা ঘটিল, যাহাতে আমাদের একটানা জীবনস্রোত সহসা ভিন্ন পথে বাঁকিয়া পড়িল। সেই কথাই এখন বলিতে বসিয়াছি।

প্রতি সন্ধ্যায় যখন চাঁদ উঠিত; নক্ষত্র-বধূরা ঘোমটা খুলিয়া আকাশে নীল আসন বিছাইয়া বসিয়া যাইত; সমুদ্রের কালো জলে চাঁদের ছায়া হাজার বাতি জ্বালাইয়া ধরিত; এবং বেলা-ভূমে হীরকোজ্জ্বল বালুকা-চূর্ণ ছড়াইয়া পড়িত; নীল আকাশে চঞ্চল মেঘ-মালার কোল ঘেঁসিয়া পাখীর দল ঝাঁক বাঁধিয়া উড়িয়া নীড়ে ফিরিত; সেই সময় ছিপ-

গাছটি হাতে লইয়া কাকার ছোট বোট খানিতে চড়িয়া আমি সমুদ্রে মাছ ধরিতে বাহির হইতাম। ছিপে কখনো দুই-একটা মাছ পড়িতও, কিন্তু সত্যের অনুরোধে স্বীকার করি, সেটা প্রায় ঘটিত না।

যে দিনের কথা বলিতেছি, সে দিন সন্ধ্যায় এস্‌থারও আমার সহিত নৌকাভ্রমণে বাহির হইয়া ছিল। বাবার চোখ্‌ এড়াইয়া যে নূতন নভেলখানা সে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল, একান্ত মনে সেইখানা লইয়াই সে নৌকার এক কোণে বসিয়া গিয়াছিল। আমি জলে ছিপ ফেলিয়া ফাৎনার দিকে বদ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়াছিলাম। মেঘের স্তর ভেদ করিয়া অপরাহ্নের সূর্য্য-কিরণ দূরে তখন বড় বড় বৃক্ষ চূড়ায় কনক-রশ্মি ঢালিয়া দিয়াছে, তীরে যতদূর দৃষ্টি চলে, শুধুই রজত-ধবল ধূ ধূ বালুকার রাশি; সূর্য্যালোকে সিকতা শয্যা চক্‌চক্‌ করিতেছিল। একখানা খণ্ড মেঘ অস্তগামী সূর্য্যের লাল আলো মাখিয়া সমুদ্রের একাংশ লাল রঙে রাঙ্গাইয়া তুলিয়াছে। সমুদ্র যেন লাল আলোর ঢেউ তুলিয়া নাচিতেছিল। সে দৃশ্য-সৌন্দর্য্য চোখেই শুধু দেখিবার, লেখনীর সাহায্যে তাহা বুঝানো যায় না। বিশেষত আমি কবি বা ভাবুক নহি হইলে কতকটা হয়ত বুঝাইতে পারিতাম।

ছিপ রাখিয়া নৌকার উপর দাঁড়াইয়া আমি সমুদ্রের সেই মহামহিম ভাব দেখিয়া আত্মবিস্মৃত হইলাম; বাহ্যজ্ঞান-শূন্যের মত চাহিয়া রহিলাম।

ক্রমে সন্ধ্যা চারিদিকে আঁধার যবনিকা বিছাইবার উপক্রম করিল। নাতি-শীতোষ্ণ বায়ু শীতল হইয়া আসিল, এমন সময় এস্‌থার সহসা আমার কোটের প্রান্তটা ত্রস্তে আকর্ষণ করিয়া কহিয়া উঠিল, "দাদা, দেখেচ কি, ক্রুমবার হলের চূড়ায় একটা আলো জ্বলচে!"

স্বপ্ন-জগৎ হইতে জাগিয়া চকিত দৃষ্টিতে ক্রুমবারের দিকে চাহিলাম। দেখিলাম, সত্যই ত! সেই উচ্চ চূড়ায় একটা আলো জ্বলিতেছিল! সে আলোক সঞ্চরমান। কখন উপরে, কখনও নীচে, কখনও আবার জানালার ধারে ধারে ঘুরিয়া ফিরিতে ছিল। গতি দেখিয়া বেশ মনে হয় যে আলোক-ধারী ক্রুমবার হলের টাওয়ারে উঠিয়াছিল, এখন নামিয়া যাইতেছে।

বিস্ময়ের সহিত আমি কহিলাম, "তাই ত! এমন সময় কে ওখানে যেতে পারে? বোধ করি, গ্রামের লোক কেউ দেখ্‌তে এসেছিল, এখন নেমে যাচ্চে।" কিন্তু আমার এ উক্তি এস্‌থারের মনঃপূত হইল না। সে মাথা নাড়িল, "না, তা নয়—গ্রামে এমন কেউ সাহসী লোক নেই যে, এ সময় ক্রুমবার হলের ফটক পর্য্যন্তও যেতে পারে। কারণ ওটাকে সবাই ভূতের বাড়ীই নাম দিয়েচে! তা ছাড়া এ বাড়ীর চাবি শুনেছি উইগটাউনেই থাকে না?"

কথা গুলার যাথার্থ্য ভাবিয়া দেখিলাম। বাড়ীর দরজা-জানালাগুলা এমনি মজবুত, আর ভারী, যে ভাঙ্গিয়া কেহ ভিতরে প্রবেশ করিবে এমন সাধ্য নাই। তবে এক, কেহ সহর হইতে চাবি আনাইয়া বাড়ী দেখিতেছে? মনে কৌতূহল হইল। দেখিতে হইবে—ব্যাপারটা কি?

এস্‌থারকে গৃহে পৌছাইয়া জেমিসন্‌ নামে

এক রণতরীর অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ নাবিককে সঙ্গে লইয়া ক্রম্‌বার হলের দিকে চলিলাম। রণতরীর সাহসী নাবিকের মৃত আত্মাকে ভয় করিবার পক্ষে কোনই অন্তরায় ছিল না; কিন্তু সে আমার উদ্দেশ্য শুনিয়াই ধীরে ধীরে পিছু হঠিতে সুরু করিল; বলিল, "ও জায়গাটার মশায় ভারী বদনাম আছে, রাতে ভিতে ওখানে কোন মানুষ যেতে পাবে না। এ গ্রামে এমন কোন সাহসী লোক নেই যে সন্ধ্যের পর ঐ ভুতুড়ে বাড়ীর ফটক পার হয়! তা মশায়, আপনি যদি হাজার টাকাও দাও, তবুও কেউ ওখানে যেতে রাজি হবে না।"

"কিন্তু তবু তোমাদের ভিতরই এমন কেউ একজন আছে যে রাত্রে ওখানে যেতে ভয় পায়নি!" বলিয়াই আমি ক্রম্‌বার হলের আলোর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলাম। যে আলোটা পূর্ব্বে আমরা হলের চূড়ায় দেখিয়াছিলাম, এখন তাহা নীচে নামিয়া ইতস্তত সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছিল, এবং উহার অদূরে আর একটা ক্ষীণরশ্মি আলোকবিন্দু থাকিয়া-থাকিয়া মৃদু নড়িতেছিল। দেখিয়া মনে হইল, দুইজন লোক দুইটা আলো হাতে লইয়া বাড়ীটার আগাগোড়া যেন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ফিরিতেছে।

জেমিসন্ সেইখানেই অচলবদ্ধ জলস্রোতের মত সহসা স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া পড়িল। আমি অনুসরণ করিতে বলিবামাত্র সবেগে তীব্র কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, "না মশাই কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে ঘর করি, শেষকালে ভূতের হাতে কি প্রাণটা দেব? যে এসেচে সে এসেচে—সে খবর নেবার আমার সখ্ নেই। আমরা গরীব লোক খেটে খাই—. মানুষকে ডরাই না। তা'বলে ভূতের সঙ্গে তামাসা? ওরে বাস্‌রে।"

বৃদ্ধের কম্পিত হস্তে হাত রাখিয়া আমি হাসিয়া বলিলাম, "আচ্ছা, ভূতেরা কি গাড়ী চড়ে আসে? ঐ যে ফটকের সাম্‌নে দুটো আলোর গোলা দেখা যাচ্ছে, ওটা ত গাড়ীর আলো!"

একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া জেমিসন্ উত্তর দিল, "সত্যি তবে—আচ্ছা চলুন, আরও একটু এগিয়ে না হয় দেখা যাক্, এমন সময় গাড়ী চড়ে এল কে! আমরা মশায়, মুরুখ্যু লোক, আমাদের কি অত বুদ্ধি আছে—না বোধ আছে?"

অন্ধকার ক্রমে চারিদিকে ঘন হইয়া নামিতেছিল। আমরা কোনরূপে হুঁচুট বাঁচাইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ফটকের সম্মুখেই একখানা টমটম দাঁড়াইয়াছিল, তাহার ঘোড়াটা রাস্তায় চরিয়া ঘাস খাইতেছিল। জেমিসন্ উৎসাহব্যঞ্জক স্বরে বলিয়া উঠিল, "ঠিক্ হয়েচে! এ গাড়ী যে আমি চিনি। মিষ্টার ম্যাকলীনের গাড়ী এ। আর বাড়ীর চাবিও যে তার কাছে থাকে।"

"তা হলে ত বেশ সুবিধাই হয়েছে। এই সুযোগে আমরাও কেন তাঁর সঙ্গে আলাপ করে নিই না? ঐ বুঝি তিনি আসছেন?"

আমার কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা বৃহৎ ভারী দরজা বন্ধ হইবার শব্দ শুনা গেল। এবং পরক্ষণেই দেখা গেল, দুইজন লোক একজন খুব বেঁটে ও মোটা, আর একজন ঠিক তাহার বিপরীত, অর্থাৎ

অত্যন্ত কৃশ ও দীর্ঘাকার,—আমাদের দিকেই অগ্রসর হইয়া আসিতেছেন। তাঁহারা এমন মনোযোগ দিয়া কথা কহিতে কহিতে আসিতেছিলেন যে সেখানে আমাদের উপস্থিতির বিষয় মোটেই জানিতে পারেন নাই। তাঁহারা ফটকের নিকটবর্ত্তী হইলে আমি একটু অগ্রসর হইয়া বেঁটে ভদ্রলোকটিকে বলিলাম, "শুভ সন্ধ্যা, মিষ্টার ম্যাকলীন।" ম্যাকলীনের সহিত ইতিপূর্ব্বে আরো দুই একবার আমার সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল।

আমার কথা শুনিয়া ম্যাকলীনের সঙ্গীটি অকস্মাৎ অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। হাঁফাইতে হাঁফাইতে রুদ্ধ স্বরে তিনি বলিলেন, "একি ম্যাক্লীন্? এ সব কি? কিন্তু তোমার প্রতিজ্ঞা—আঁ্যা?—এ সবের মানে কি?"

তাঁহাকে আশ্বস্ত করিবার ভাবে ম্যাকলীন অত্যন্ত সংযত কোমল স্বরে উত্তর দিল, "ভয় করবেন না জেনারেল। ইনি মিঃ জিল ওয়েষ্ট—ওয়েষ্টসায়ারে এঁরা থাকেন, কিন্তু এখন এই অসময়ে অন্ধকারে এঁর আস্‌বার তাৎপর্য্য ত আমিও কিছু বুঝ্‌তে পারচি না। যাই হোক, আপনারা যখন প্রতিবাসী হতে চল্লেন, তখন পরস্পরের মধ্যে আলাপ করিয়ে দেওয়া আমার উচিত। মিঃ ওয়েষ্ট, ইনি জেনারেল হিথারষ্টন ক্লুম্‌বার হল ভাড়া নিলেন!"

দীর্ঘাকার কৃশ লোকটির করমর্দ্দনের অভিপ্রায়ে আমি তাঁহার দিকে হাত বাড়াইয়া দিলে অত্যন্ত অনিচ্ছুকভাবে, সঙ্কুচিত হইয়াই তিনি যেন আমার হস্ত গ্রহণ করিলেন। লোকটির এই অকারণ ভয় দেখিয়া আমি আপনা হইতেই বলিলাম, "ক্লুম্‌বার হলে হঠাৎ আলো দেখে আমি একটু কৌতূহলী হয়ে দেখ্‌তে এসেছিলাম। যাই হোক, আমার সৌভাগ্যক্রমে তাতে শুভ ফলই ফলে গেল। জেনারেলের সঙ্গে আলাপ হওয়ায় আমি কৃতার্থ হলেম।" আমি যখন কথা কহিতেছিলাম, তখন বেশ বুঝিতেছিলাম, ক্লুম্‌বার হলের নূতন স্বামীটি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই অন্ধকারের মধ্যেও আমায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া লইতেছেন।

আমার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তিনি গাড়ীর আলোটা এমনভাবে ঘুরাইয়া ধরিলেন যে, লণ্ঠনের কাচাবরণ ভেদ করিয়া সমস্ত আলোটুকু আমার মুখের উপর আসিয়া পড়িল। সহসা পূর্ব্বের মতই কম্পিত ভীতিজড়িত স্বরে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কিন্তু, কি আশ্চর্য্য ম্যাকলীন, মানুষটার রং কি ময়লা—হা ভগবান্! ও তাহলে কখনই ইংরাজ নয়!" তার পর আমার মুখের উপর আলো সমভাবে রাখিয়া কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশায় কি ইংরাজ?"

লোকটার অভদ্রতা দেখিয়া আমার মুখে যে উত্তর আসিল, তাহার আতঙ্কযুক্ত বিপন্ন মুখচ্ছবি ও অহেতুকী ভয় দেখিয়া আমার সে উচ্ছ্বসিত মন-ভাব সহজেই দমন করিলাম। অত্যন্ত উদাসীনভাবে উত্তর দিলাম, "না মশায়, আমি একজন স্কচ্। স্কট্‌ল্যাণ্ডে আমার জন্ম—আর সেখানেই আমার বাস।"

এই কথায় একটু যেন আশ্বস্ত হইয়া তিনি বলিলেন, "ওঃ! স্কটল্যাণ্ড ইংলণ্ড আজ-

কালকার দিনে সবই এক হয়ে গ্যাছে। আমায় মাপ করো, মিঃ ওয়েষ্ট, আমি বড়ই দুর্ব্বলচিত্ত অদ্ভুত রকমের দুর্ব্বলচিত্ত। এস ম্যাকলীন্, আধ ঘণ্টার মধ্যে আমাদের উইগটাউনে আবার ফিরে যেতে হবে। আসি মশায়—”

তাঁহারা গাড়ীতে উঠিলেন। চলন্ত গাড়ীর আলো সেই রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে যেন স্বর্ণরশ্মি ছড়াইয়া দিয়া গেল। অনেকক্ষণ স্থিরভাবে সেইদিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়া আমার সঙ্গীকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “আমাদের নতুন প্রতিবাসীটিকে দেখ্‌লে জেমিসন্‌?”

“সত্যি কথা বল্‌তে কি—লোকটা মিথ্যেবাদী নয়—সে ঠিকই বলেছে, অদ্ভুত রকমের দুর্ব্বল চিত্ত সে। কিম্বা এও হতে পারে যে তার ভিতরে কিছু গোল আছে!”

“কিন্তু আমার বিশ্বাস অন্য রূপ,—আমার মনে হয়, তার লিবারে কোনরকম গোল আছে! দেখ্‌লে না, তাকে দেখেই মনে হচ্ছিল,—সে যেন ভারী দুর্ব্বল? শরীরটাকে বয়ে বেড়ানোও যেন ক্ষমতায় কুলোচ্ছে না? কিন্তু বাতাসটা ভারী ঠাণ্ডা হয়ে উঠ্‌ল—আমাদের এখন বাড়ী ফেরাই কর্ত্তব্য।”

জেমিসন্‌কে বিদায় দিয়া জলা পার হইয়া আমাদের সেই সুদৃশ্য শান্তি-নিকেতনের উদ্দেশে দ্রুত পদে আমি অগ্রসর হইলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীইন্দিরা দেবী।

হিন্দোলা

আমরা থাকি সহরের বাহিরে, ঠাণ্ডি সড়কে। সহরের সঙ্গে আর এ অঞ্চলের সঙ্গে যেন দেশান্তরের প্রভেদ। কলিকাতার বড়বাজারের দুর্ভেদ্য অন্তরঙ্গ প্রদেশ, যেখানে দিনে দুপুরেও আমরা যাইতে ভয় পাই, যাহা গুণ্ডার আবাস, চোর জালিয়াতের নিকেতন বলিয়াই আমাদের ধারণা—লাহোরের সুবৃহৎ সহরাংশ বড়বাজারের সেই মর্ম্মস্থানের একটা বিকট অন্তহীন প্রতিমূর্ত্তি। এই সংখ্যাহীন অলিগলির গোলকধাঁদার মধ্যে আছে একএকটা বড় বড় প্রকাণ্ড পুরাতন হাবেলী অর্থাৎ ধনীদের প্রাসাদ, মধ্যবিত্তের সংখ্যাহীন কষ্টগম্য গৃহ, এবং মানবজাতির সর্ব্ববিধ প্রয়োজনপ্রবল দোকান ও হাট। দোকানে রসনারোচক ফুলুড়ি পাপড়, দইবড়া, এমন কি ভাজা মাছ, ভাজা মাংস, ভাজা ডিম পর্য্যন্ত এবং সময়ে সময়ে ও স্থানে স্থানে সহনাতীত বর্ণনাতীত দুর্গন্ধ ও দুর্দৃশ্য মক্ষিকাকুল।

যখন সহরের শেষ সীমান্ত ছাড়াইয়া ইংরেজ পল্লীতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, যখন সৌধের পর সৌধাবলীর অবচ্ছেদে স্বল্পমাত্র আকাশের পরিবর্ত্তে অখণ্ড, অনন্তবিস্তৃত নভস্তলের সুনির্ম্মল ক্রোড়ে আবার নিশ্বাস গ্রহণ করা যায়, তখন হঠাৎ সন্দেহ হয় কোথায় গিয়াছিলাম—কোথা হইতে আসিলাম, সে কি এই একই লাহোর নামবাচ্য? যেন কত দূর—কত দূরের

কথা সে! সেখানকার জীবনের স্পন্দন এস্থানকে স্পর্শ করে না। সহরের প্রায় সমস্ত পুরুষাংশ সন্ধ্যাবেলায় বায়ু সেবনার্থ এখানে নির্গত হইয়া আসে, স্বল্পাংশ স্ত্রীও চাদর জড়াইয়া গাড়ীতে বা পাদচারে দেখা দিয়া থাকে—কিন্তু এখানকার কোন স্থায়ী ছাপ—না তাহারা সহরে লইয়া যায়—না সহরের কিছু এখানে রাখিয়া যায়। সহর ও বাহিরের ভেদ চিরবর্ত্তমান থাকে।

আমরা বাহিরের লোক, বাহিরের খোলা হাওয়া, আরাম ও আয়েসের পাশে জড়িত—তবু সহরে এমন একটা কিছু আছে—যার আকর্ষণ অনিবার্য্য। সে মানবলীলা, সৃষ্টিলহরী, জন্মমৃত্যু সুখদুঃখ হাসিকান্নার ফের। মানবসমাজ মাত্রের অন্তর্নিহিত সাম্যের মধ্যে দেশভেদে কালভেদে যে রহস্য, যে বৈচিত্র্য যে নূতনত্ব আছে তাহারই মোহ বাহিরের লোককে সহরের দুর্গন্ধ ও কলুষিত হাওয়ার মধ্যেও টানিয়া লইয়া যায়।

এমন একটা মোহের টানে এই লোকালয়ের অগণিত নরনারী কোন্ ঢেউয়ে কখন কি ভাবে তরঙ্গায়িত হয় তাহা উপলব্ধ করিবার লোভে একদিন তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ঢেউয়ের তালে তালে উঠিবার পড়িবার সখে তাহাদের সঙ্গ লইলাম।

দুইটি পরিচিতা সম্ভ্রান্তবংশীয়া বিধবা ব্রাহ্মণী মা ও মেয়ে পূর্ব্বদিন আমার কাছে গাড়ী চাহিয়াছিলেন—"ঠাকুরদ্বারায় যাইবেন সেখানে কিছু আছে।"

আমি বলিলাম, 'আচ্ছা—আমিও তোমাদের সঙ্গে যাইব।' তাঁহারা ত মহা খুসী। বর্ষীয়সী আমার সঙ্গে শ্বাশুড়ী সম্পর্ক পাতাইয়াছেন। আমার স্বামী তাঁহার 'পুত্তর্'। তাঁহার নাম মুখে লইতেই বৃদ্ধা গৌরবে ও স্নেহে গলিয়া যান। এ হেন পুত্রের বধূ যখন নিজে হইতে শ্বাশুড়ীর সঙ্গে ঠাকুরদ্বারায় যাইতে চাহিল শ্বাশুড়ী ও ননদ ত আহ্লাদে আটখানা হইলেন।

গলিমহল্লার সব প্রতিবেশিনীদের নিকট খবর পৌঁছিয়া গেল—"কাল আমার পুত্রবধূ আসিয়া আমাদের মন্দিরে লইয়া যাইবে!"

পরদিন অপরাহ্ন পাঁচটার সময় তাহাদের বাড়ী গেলাম। কন্যা বাড়ীর বাহিরে রোয়াকে বসিয়া আছেন—মাতা অন্দরে পাককার্য্য সারিতেছেন। যে সময় বাবুরা বাহিরে যান সেই সময় পঞ্জাবের গলি গলিতে বহির্বাটীর রোয়াক পুররমণীদের সেব্য হয়। গায়ে গায়ে ঘেঁসা প্রত্যেক বাড়ীর রোয়াকে পুরস্ত্রীগণ সমাসীন, কেহ বসিয়া চরকা কাটিতেছেন, কেহ সূতোর নুটি করিতেছেন, কেহ কুর্ত্তা সেলাই করিতেছেন, কেহ শুধুই প্রতিবেশিনীর সঙ্গে বাক্যালাপ করিতেছেন। গ্রীষ্মকালে রাত্রি সমাগমে ইঁহারা ছাদের আশ্রয় লইবেন শীতকালে ঘরের ভিতরে যাইবেন। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত ছাদে চড়ার বা ভিতরে যাইবার সময় না হইবে রোয়াকে কাটাইবেন। আশপাশের বাড়ীর পুরুষদের আনাগোনায় কোন স্ত্রী বিব্রতা হন না—গলির মধ্যে গরু বাছুর মহিষের আনাগোনার মত পুরুষের আনাগোনাও ভ্রূক্ষেপেরই যোগ্য নহে।

কন্যা আমার জন্য রঙিন সূতার রঙ্গিন পায়ার নীচু চৌকি একখানি বাহির করিয়া আনিলেন। বলিলেন দীপজ্বালার সময়

না হইলে মন্দিরে যাইয়া লাভ নাই। সুতরাং আমাকেও রোয়াকে বসাইয়া প্রতিবেশীদের সঙ্গে গল্প করাইতে লাগিলেন। এই রোয়াকই তাহাদের ড্রইংরুম—অতিকষ্টে দুখানি ছোট চৌকির স্থান সেখানে হয়। কিন্তু আমার আগমন সংবাদে রাজ্যের ছোট ছোট মেয়ের সমাগম হইল, আর অন্ততঃ চার পাঁচ-জন সেই রোয়াকের উপর গুটি মারিয়া বসিবার চেষ্টায় আমাদের চৌকি দুখানিকে আসন্ন পতনশঙ্কান্বিত করিয়া তুলিল। গৃহস্বামিনী তাহাদের বকিয়া ঝকিয়া রোয়াকের নীচে বা সিঁড়ির ধাপে নামাইয়া দিলেন। সূর্য্যাস্তের পর আমরা মূলচাঁদের ঠাকুর দ্বারার অভিমুখে নির্গত হইলাম। আজ সেখানে জন্মাষ্টমীর হিন্দোলা। সমস্ত শ্রাবণ মাস ঝুলনের উৎসবে দেশ আনন্দিত থাকে। শ্রাবণমাসের প্রতি শনি ও রবিবারে কুমারী ও সধবারা সুন্দর সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া নদীর ধারে বা কোন বাগানে আমোদপ্রমোদ করিতে যায়। আমোদ আর কিছু না, দোলনায় দোলা ও ঝুলনের গান গাওয়া। এই সময় ঘরে ঘরেও দোলনা টাঙ্গায়, যে কেহ আগন্তুক আসে একবার দোলনায় বসিয়া দোল খায়।

জন্মাষ্টমীর দিন সব চেয়ে বেশী ধূম। যে বার জন্মাষ্টমী ভাদ্রমাসে পড়ে সেবার ঝুলনের আমোদ ভাদ্র পর্য্যন্ত চলিতে থাকে।

জন্মাষ্টমীতে মন্দিরে মন্দিরে সমারোহের প্রতিদ্বন্দিতা চলে। এখানকার দুটী মন্দিরে সব চেয়ে বেশী ভিড় হয়, আনারকলির বংশীধারীলালের মন্দিরে, আর রেলের ধারে মূলচাঁদের ঠাকুরদ্বারায়। আমার সঙ্গিনীরা আনারকলির মন্দিরে যাইতে অনিচ্ছুক—কেননা মন্দিরপতি তাঁহাদের জ্ঞাতিগোত্র, তাঁহাদের সঙ্গে মকর্দ্দমা চলিতেছে, তাহাদের সামনে পড়িতে চান না, সুতরাং আমরা সহরের বাহিরে মূলচাঁদের ঠাকুরদ্বারায় চলিলাম। পথে সুন্দর বীথীর দুই পার্শ্বে গোধূলির সময় রমণীর সারি পদব্রজে উক্ত ঠাকুরদ্বারার অভিমুখে চলিয়াছে। বাঙ্গলা দেশে এরকম দৃশ্য একেবারেই দুর্লভ। হয়ত পল্লীগ্রামে দেখা যাইতে পারে কিন্তু আমরা সহরে লোক সহরের রীতিনীতিরই সাক্ষ্য দিতে পারি। ভদ্রলোকের সুসজ্জিতা কন্যা ও বধূগণকে রাজপথে সঞ্চরণ করিতে দেখা আমাদের পক্ষে একেবারে আকাশকুসুম সন্দর্শনের তুল্য। হিন্দু ভারতবর্ষে যেখানে মুসলমানী প্রভাব বা অত্যাচার মাত্রাতীত হইয়াছে সেইখানেই রমণীদের পরদার মাত্রাও বাড়িয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই অত্যধিক মুসলমান নিপীড়িত দেশ হইয়াও পঞ্জাবের প্রাচীন আর্য্যগণের সাক্ষাৎ উত্তরপুরুষ স্ত্রী-জাতির অনবরোধ বিষয়ে আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু মজা এই, ঠিক যেমনটি চলিয়া আসিয়াছে তেমনিই চলিতে পারে রঙ বদলাইলেই বিপদ। খোলামুখে পদব্রজে যাইতে এখানে লজ্জা নাই, কিম্বা ঠিকা এক্কা বা টমটমে চড়িয়া (যাহাকে এখানে ব্যাম্বু কার্ট বলে) অপরিচিত অন্য ভাড়াটের সঙ্গে 'শেয়ারের' গাড়ীতে একত্র যাইতেও হানি নাই—কিন্তু ঘরের খোলা ল্যাণ্ডো ফিটনে চড়িয়া গেলেই যত গোল। আমার সঙ্গিনীরা আমার সঙ্গে খোলা ল্যাণ্ডোয় বসিয়া স্বগলির পথিক নারীগণের সঙ্গে চোখে চোখি হইতেই লজ্জায় সঙ্কুচিতা হইতে লাগিলেন।

ঠাকুরদ্বারার দ্বারে পৌঁছিতেই দ্বার-রক্ষকেরা আমাদের অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেলেন। লালা মূলচাঁদ লাহোরের একজন প্রসিদ্ধ সওদাগর, তাঁহার আজিকার কার্য্যের সহায়তায় লাহোরের ছোট বড় অনেকগুলি হিন্দু সওদাগর উপস্থিত। তাঁহারাই কর্ম্মকর্ত্তা। শুনিলাম কাল এত ভিড় হইয়াছিল যে একটি ছেলে লোকের পায়ের তলায় পড়িয়া আহত হইয়াছিল, তাই আজিকার প্রবেশ ও নির্গমের বন্দোবস্ত অপেক্ষাকৃত ভাল করা হইয়াছে। কাল নাকি স্ত্রীপুরুষের যাতায়াতের একই রাস্তা ছিল—আজ স্বতন্ত্র বন্দবস্ত। আমি কিন্তু বিশেষ কোন স্বাতন্ত্র্য দেখিলাম না। মন্দির ঢুকিতেই সামনে প্রশস্ত অঙ্গন, তার বাম পাশে ঢাকা বারান্দা। মেয়েরা সেই পাশ দিয়া ঠাকুরদালানে যাইতেছে, পুরুষেরা অঙ্গনের উপর দিয়াই যাইতেছে—এইমাত্র প্রভেদ। বারান্দায় পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে খানিকটা অঙ্গন মাড়াইতেই হয়। অঙ্গন গ্যাসের আলোকে ঝকমক করিতেছে, সেখানে পুরুষের প্রাচুর্য্যও যথেষ্ট কিন্তু মেয়েরা কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিতেছে না, অনায়াসে পুরুষের ভিড় ঠেলিয়া ঠাকুর দর্শন করিতে যাইতেছে।

বোধ হয় অপ্রত্যাশিত বলিয়া আমার মন্দিরাগমনের সম্বাদ কার্য্যকর্ত্তাগণের মধ্যে বিদ্যুদ্বেগে প্রচারিত হইল—আর সকলেই আমাকে সভার মধ্যে অত্যুজ্জ্বল স্থানে বসিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমি কিন্তু তাঁহাদের নিরাশ করিয়া বারান্দার অন্ধকারে দুইটা থামের কাছে বসাই পছন্দ করিলাম। একজন পাখাওয়ালা বিশেষ করিয়া আমাকে বীজন করিতে নিযুক্ত হইল। নানা পরিচিতা ও অপরিচিতা রমণীরা আমাকে ঘিরিয়া বসিলেন। কেহ আত্ম পরিচয় দিলেন—'আমি অমুকের মেয়ে' কেহ বলিলেন "আমি অমুক স্থানের রায়সাহেবের পুত্রবধূ", কেহ বলিলেন, আমায় দিল্লীতে দেখিয়াছেন, কেহ বলিলেন, মীরটের স্ত্রীসমাজের উৎসবে আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হইয়াছিল, কেহ বলিলেন অম্বালায় আমার গান শুনিয়াছেন, কেহ বলিলেন, মূলতানে আমার লেকচার শুনিয়াছেন ইত্যাদি।

প্রাঙ্গণে ফরাসের উপর আগন্তুক পুরুষদের অভ্যর্থনা করিয়া বসান হইতেছে। একজন রাগী রাগ আলাপ করিতেছে—কিন্তু কার সাধ্য যে কিছু শুনে। একে ত মেয়েদের ও শিশুদের কলরব পরস্পরকে ডাক হাঁক—"নী সরস্বতীয়ে—" "নী লীলো—" "বে সুন্দরা" "ভাই মুন্তেনু পাণি পিলা"—"কুড়িনু ফাড়্" ইত্যাদি;—তার উপর ব্যাণ্ডের বাদ্যি।

পাশ্চাত্য সভ্যতা বিজয়ে নির্গত হইয়া আর কোথাও এত সস্তায় কিস্তিমাৎ করে নাই যেমন এই ব্যাণ্ডের বাদ্যিতে। ইংরেজের ব্যাণ্ডের সঙ্গীতকলাও বিজ্ঞানের সাহচর্য্যে—প্রতিভা ও পরিশ্রম সমন্বয়ে কত পুরুষের সাধনার ফল। আমরা বিনা পরিশ্রমে বিনা প্রতিভার উদ্বোধনে, বিনা বিজ্ঞানের অনুশীলনে টপ করিয়া এই পাকা ফলটি যেখানে সেখানে মুখে পূরিয়া দিই। ফলে কলা চর্চ্চা হয় না, কলা ভক্ষণ হয় বটে। যখন তখন, যেখানে সেখানে ব্যাণ্ডের বাজনা বাজানর মত বাঁদরামি আর কিছু নাই। কোথায় ঠাকুরদ্বারায় শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা;

কোথায় গোপীজনমোহনের বাঁশীর স্বর আর কোথায় ব্যাণ্ডের বাদ্যি। একে ব্যাণ্ড তায় বেসুরা, তায় একেবারে দুহাত মাত্র তফাতে! একটা খুব গোলমাল হৈ চৈয়ের সমারোহ তাণ্ডব ভাবে চলিতে লাগিল—কিন্তু এই শত লক্ষ ভক্তের পূজায় মন্দিরে না পাইলাম ভক্তির গাম্ভীর্য্য না শোভনতা।

আমাদের বাড়ীর ১১ই মাঘের উৎসব মনে পড়িল। কতকটা মিল ও অনেকটা তফাৎ। সেই রকম দরাজ উঠানের সামনে দালান—কিন্তু আমাদের উঠান প্রায় এর তিন গুণ আর তাহার সাজসজ্জাতেও বিশিষ্টতা আছে। কিন্তু আসল তফাৎ সেখানে সমাগত-গণের নিঃশব্দতায় এবং উপাসক ও গায়কগণের বেদমন্ত্রঘোষ ও সঙ্গীতে একটা অনির্ব্বচনীয় গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্য রস সঞ্চারে।

আমাদের উপাসনার দালান, এখানকার ঠাকুরঘর। ঠাকুরঘরে কৃষ্ণরাধার মূর্ত্তি বহু অলঙ্কারে ও পুষ্পহারে ভূষিত। আশেপাশে অন্যান্য মূর্ত্তি। ভিড় ঠেলিয়া মারামারি করিয়া সকল মূর্ত্তি দর্শনের উচ্চাভিলাষ পোষণ করিতে পারিলাম না। দূর হইতে প্রধান মূর্ত্তি দুইটি উঁকি মারিয়া দেখিয়াই ক্ষান্ত দিলাম। আমার সঙ্গীরা ভিতরে যাইয়া ভেট দিয়া আসিলেন। একজন পুরোহিত ভিড় ঠেলিয়া আমার নিকট আসিয়া হাত পাতিল, নিরাশ করিলাম না।

আমি ঠাকুর দেখিয়া চুপটি করিয়া পূর্ব্ব-কথিত স্থানে আসিয়া বসিয়া রহিলাম। আলাপাভিলাষী রমণীদের বাক্যালাপের অবসরে সম্মুখে বিস্তৃত সমারোহের নীরটুকু ত্যাগ করিয়া ক্ষীরটুকু গ্রহণে মনন করিলাম। প্রথমতঃ এই সুসজ্জিত, আলোকদীপ্ত অঙ্গন আমাকে কলিকাতার স্বজন ও স্বগৃহ স্মরণ করাইয়া দিল—সেই স্মৃতিরসে কিছু ক্ষণ সিক্ত রহিলাম। তার পরে পুরাতন ও নূতনের বৈলক্ষণ্য যখন পরিস্ফুট হইতে লাগিল তখন নূতনের বৈচিত্র্যরসে অভিভূত হইলাম।

বারান্দা ভরিয়া গিয়াছে। এখানে নবাগতা রমণীরা একেবারে সিধা অঙ্গন দিয়াই ঠাকুরঘরে চলিয়া আসিতেছেন। লজ্জা নাই, সঙ্কোচ নাই, দ্বিধা নাই; ন্যাকামি নাই, হাব ভাব নাই। নিতান্ত সরল সহজভাবে রূপসার তরঙ্গ বহিয়া আসিতেছে। কোন নববধূ ঝিকমিকে ওড়নায় ঝলসান গ্যাস-ল্যাম্পের সহস্র রশ্মি প্রতিফলিত করিয়া চলিয়া আসিতেছে—কোন বিধবা রমণী মলিন অঙ্গাবরণের একটা মস্ত ছিদ্র পর্য্যন্ত ঢাকিতে চেষ্টা করে নাই, সহজ ভাবেই চলিয়া আসিয়াছে—কেহ তরুণী, কেহ বৃদ্ধা, কেহ সুভূষিতা, কেহ অত্যল্পভূষণা—কিন্তু সকলেই সুন্দর। কুৎসিৎ মুখ দৈবাৎ একটা আধটা—বাকী সবই সৌন্দর্য্যে, সুষমায়, লাবণ্যে ভরা। কিন্তু সুন্দরী বঙ্গললনার মত আনতা লতার শ্রী নহে—তেজোদীপ্তা খড়্গা-ধারিণী সিংহবাহিনীর প্রতিমূর্ত্তি যেন।

এ মন্দিরে ঝুলন দেখিতে আসিয়াছিলাম কিন্তু ঠাকুরের সুমধুর হিন্দোলের স্থলে দেখিলাম ঠাকুরাণীদের মধুময় রূপের হিল্লোল। হিন্দু সমাজে পুরুষদের মধ্যে মেয়েদের এমন অবাধ গতিবিধি কল্পনার অতীত ছিল, নিজের চোখ না দেখিয়া, শুধু শুনিলে বিশ্বাস করিতাম না। যদি কোন য়ুরোপীয় পর্য্যটক এই দৃশ্য দেখিয়া বর্ণনা করিত ত ভাবিতাম

বোধ হয় কতকটা স্বকল্পনাপ্রসূত, অতিরঞ্জিত। কিন্তু আজ যখন সুন্দরী রমণীর প্রবাহ সম্মুখ দিয়া বায়োস্কোপের চলৎচিত্রের ন্যায় চলিয়া যাইতে লাগিল—তখন মুগ্ধচিত্ত হইয়া গেলাম।

বেশ ভূষাই বা কি! ঠিক থিয়েটারের সাজের মত। ঘাগড়া কুর্ত্তা ওড়নায় জড়ি জড়াও, গোটা কিনারি, সল্মা চুমকি—একেবারে ঝক্‌মক ঝক্‌মক করিতেছে। কত নভেলের, কত নাটকের কত নবন্যাসের সরঞ্জাম এখানে পুঞ্জীভূত। এত খোলাখুলির মধ্যে, এত ছাড়াছাড়ির মধ্যে নানা অঘটন যে ঘটিয়া থাকে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সে সব ঘটনাকে কুৎসার পঙ্কিলতা হইতে উদ্ধার করিয়া মানবিকতার পবিত্র রঙে রাঙাইয়া তুলিবার জন্য পঞ্চনদ কোন বঙ্কিমের প্রতীক্ষা করিতেছে। কিন্তু যে হতভাগ্য দেশে মাতৃভাষার চর্চ্চা নাই, সে দেশে বঙ্কিমের সম্ভাবনা কোথায়? নানাভাবের লহরীতে তরঙ্গায়িত হইয়া উৎসবভঙ্গের অনেক পূর্ব্বেই সঙ্গিনীগণকে ডাকিয়া সকলের নিকট বিদায় লইয়া আমরা বাড়ী ফিরিলাম।

শ্রীসরলা দেবী।

মানবের ভবিষ্যৎ

(চয়ন)

আজ কাল আর জীব-জগতে ক্রমবিকাশের সম্বন্ধে দ্বিমত নাই। সুতরাং মানব যে আদিতে কোন নিম্ন জীব হইতে উদ্ভূত হইয়াছে তাহা আর বুঝাইতে হইবে না। কিন্তু জীব-জগৎ কি মনুষ্যে তাহার চরম সীমায় আসিয়া পঁহুছিয়াছে; না মানব হইতে উন্নত কোন জীব পরে আসিবে? এ প্রশ্নের উত্তর এ পর্য্যন্ত কেহ দিতে পারেন নাই।

এ সম্বন্ধে একজন জর্ম্মান বৈজ্ঞানিকের একটি সুন্দর প্রবন্ধের সার সঙ্কলন নিম্নে প্রদত্ত হইল।

* * *

কোথা হইতে সেই শক্তি আসিল যাহা মানবকে নিম্ন প্রাণী হইতে উদ্ভূত করিয়াছে? কেন জীব-জগতের কোন অংশ সেই শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইল, আর অন্য অংশে তাহা কোন কার্য্য করিল না? এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় নাই। মানবের দেহের সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি হইতে লক্ষ বৎসর লাগিয়াছিল, কিন্তু তাহার তুলনায় মনের পরিণতি অল্পদিনে হইয়াছে।

মানবের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কোন অজ্ঞাত শক্তি, কোন নিম্ন শ্রেণীর জীবে প্রকাশ পাইয়া তাহাকে ‘মানুষ করিয়া’ তবে ক্ষান্ত হইয়াছে।

সেই জীবের এক অংশ প্রথমে শম্বুকে পরিণত হইল, শম্বুক রহিয়া গেল, কিন্তু সেই শক্তি কতক শম্বুককে মৎস্যে পরিণত করিল, মৎস্য রহিয়া গেল, সেই শক্তি কোন মৎস্যকে সরীসৃপে পরিণত করিল, সরীসৃপ রহিয়া গেল, সেই শক্তি তাহা হইতে পশু

উৎপন্ন করিল, এইরূপে সেই শক্তির চরম প্রকাশ মানবের আবির্ভাবে।

মানবের জন্ম কত যুগ যুগান্তরের ভিতর দিয়া আসিয়াছে, তাহার মধ্যে কত প্রলয় হইয়া গিয়াছে, কত জীব, কত প্রাণী, কত জাতি লোপ পাইয়াছে। মানবের জীবন সূত্র সেই সব প্রলয়ের মধ্যে কোথাও ছিন্ন হয় নাই। কিন্তু মানবই কি ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি? অথবা কোন শ্রেষ্ঠতর জীব সেই প্রলয়ে লোপ পাইয়াছে যাহা হইতে মানব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর প্রাণী জন্মিতে পারিত? অথবা মানব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শেষ জীব নহে, মানব হইতে আরও কোন শ্রেষ্ঠতর জীব জন্মিবে?

এই সব প্রশ্নের উত্তর কোথায়? দেহ হিসাবে মানব সম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়, তাহার পক্ষ আর উঠিবে না, পদ আর সংখ্যায় বাড়িবে না, বাহু আর বিস্তৃত হইবে না, বুঝি মস্তিষ্কও আর উন্নত হইবে না। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আতিশয্যের আর সম্ভাবনা নাই। এবার তাহার বিকাশ হইবে, মনে ও জ্ঞানে। প্রকৃতির উপর আরো সে আধিপত্য করিবে। পূর্ব্বে তাহার শক্তির অপব্যয় ছিল এখন সে শক্তি রক্ষায় মনোযোগী হইবে,—স্বাস্থ্যের সদ্ব্যবহার শিখিবে, রোগ তাড়াইবে। জ্ঞানের দ্বারা সে আয়ু অনেক বর্দ্ধিত করিবে। কিন্তু তাহার কোমল বৃত্তি কমিবে। পূর্ব্বের মত সে ভক্তি করিতে পারিবে না। সে আর অন্ধভাবে কিছু বিশ্বাস করিতে চাহিবে না।

তাহার পাশব বৃত্তি কমিতেছে। রক্তপাতে কষ্ট দিতে সে নিবৃত্ত হইবে। ধর্ম্মবিশ্বাসের যুগই প্রকৃতপক্ষে রক্তপাতের যুগ গিয়াছে। ক্রমশ তাহার দেবত্বে বিশ্বাস কমিবে ও মানুষের প্রতি অনুরাগ বাড়িবে। মানবের সৌন্দর্য্য-বোধ বুঝি কমিতেছে ললিতকলা ক্রমে বিদায় লইবে। কিন্তু ন্যায় অন্যায় বিচার বাড়িবে। বিজ্ঞান যদিও ধর্ম্মবিশ্বাস কমাইবে কিন্তু পরের কষ্টে হৃদয় দ্রব করিবে। আর স্বর্গের দিকে সে চাহিবে না, মর্ত্ত্যই তাহার সর্ব্বস্ব হইবে। পরজন্মের ভাবনা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া ইহজন্মের জন্য অধিক সাধনা করিবে। দেব দানব তাহার হৃদয়ে স্থান পাইবে না, পুত্র কন্যা তাহাদের স্থল অধিকার করিবে।

দয়ার পূর্ব্বে গর্ব্ব ছিল, সভ্যতার পূর্ব্বে বীরত্ব ছিল। পরিচ্ছন্ন হইবার পূর্ব্বে লোকে রং মাখিত, আতিথ্য সংকারের পূর্ব্বে সে অতিথি বলি দিত। গৃহস্থাপনের পূর্ব্বে মন্দির নির্ম্মিত হইত।

আমরা এই সব বৃত্তি হারাইতেছি, কিন্তু বিশ্বপ্রেম শিখিতেছি। পরে কি এই ধরা প্রেম রাজ্য হইবে?

শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু।

বাল্মীকির মৃত্যু

(Leconte de Lisle)

অমর কবি বাল্মীকি সে বৃদ্ধ আজি,—
ভাতিছে চোখে জগৎ—মায়া-হরিণ সাজি’ !
বর্ষ শত অতিক্রমি’ ক্লান্ত ঋষি,—
শ্যেনের মত চাহে সে যেতে আকাশে মিশি’ ;
পক্ষ মেলি’ অজানা কোন্ নীড়ের পানে
উড়িতে চাহে ; নীলের তৃষা জেগেছে প্রাণে।
জগৎ-জালে জড়ায়ে মনে শান্তি নাহি,
রেশম-গুটি কাটিতে মুহু জপিছে ‘ত্রাহি’।
তাই সে ‘বীর-চরিত গাথা’-গায়ক মুনি
মৌন ধ্যানে কাটায় দিবা স্বপন বুনি’।
নির্ব্বাণেরি শান্ত নীরে ডুবাতে হিয়া—
কামনা সাথে শোচনা যত বিসর্জ্জিয়া—
রয়েছে মহাঘুমের লাগি’ প্রতীক্ষাতে,—
দৈব মণি ‘বিস্মরণী’ যাহাতে ভাতে।

পূর্ণ হ’য়ে আসিছে কাল, পূর্ণ ব্রত,
একদা ঋষি বুকের বলে বীরের মত—
চলিলা মহাযাত্রা করি’ নগ্ন পায়ে
রক্ত রেখা রাখিয়া গিরি-বর্ত্ম-গায়ে।
বিমান-বায়ু বিঁধিতে চাহে মৃত্যুবাণে,—
বৃদ্ধ ঋষি চলেছে তবু লক্ষ্য পানে।
হেলে না বুড়া টলে না চলে অবাধ গতি,—
তুষারে হিমবন্ত সাজে ভীম মূরতি,—
তবুও চলে দণ্ডভরে ঊর্দ্ধদেশে,
পুণ্য-পূত মূরতি শোভে শুভ্রকেশে।
চড়িয়া চূড়ে, জনম-শোধ দেখিল চেয়ে,—
নগরী, নগ, কানন, নদী চলেছে ধেয়ে—
মন্দ্রভাষী সাগর পানে,—যেথায় ঊষা
রচে গো নিতি কমল-বীথী কনক-ভূষা।

অবাক !...মূক মানব শুধু চাহিয়া থাকে ;
বিভাত-বিভা গগন ছাপি’ ভুবন ঢাকে,—
স্পন্দিয়া সে সাঁতারি’ আসে সহজে ধীরে
বুলায়ে নির্মাল্য যেন নিখিল শিরে ;
কুকুরে চুমি’ ঠাকুরে চুমে পুলক মনে —
পাখীরে নীড়ে, হাতীরে ঘন বাঁশের বনে ;
আশিসে হিমবন্ত সাথে ক্ষুদ্র কীটে,
বুদ্ব দিয়া ফোয়ারা ওঠে ধরণী-পিঠে।
শূদ্র, দ্বিজ, ভিখারী, রাজা ভেদ না মানে,
তুনিয়া খুসী করে গো শুধু আশিস্‌দানে !
অসীম অফুরন্ত চির জীবন-ধারা
আভাসে কাছে আসে গো টুটি’ আঁধার-কারা
ধাতার গূঢ় সৃজনী ধ্যানে নিহিত রহি’
অনাদি জ্যোতি উছসি’ নিতি ভরে গো মহী।

সেই জ্যোতিতে মগন আজি বাল্মীকি সে।
হঠাৎ কি এ ! তপের ধুনী মলিন কিসে ?
হায়, অতীত দিনের স্মৃতি ! কেমন ক’রে
তোদের পুনর্জ্জন্ম হ’ল ? বল্ তা মোরে।
জাগে রে গাথা গরিমা-গাঁথা ছটায় ঘিরে
সৌম্য দশরথাত্মজে মৈথিলীরে।
ধরিয়া বুকে বীরের ছবি ঋষির স্মৃতি,—
বহিয়া কোটি-কল্প-কথা সৃজন-রীতি,—
হে রামায়ণ ! আবার কেন মন মোহিতে
জাগিছ তব জন্মদাতা মুনির চিতে ?
মোক্ষকামী কবি সে চাহে ব্যাকুল চোখে
গানের পাখা মেলিয়া যেতে অমর-লোকে,—
পরাণ-মন-পাবন সুরে ভরিয়া দিশি
অমৃত পূত আত্মা মাঝে রবে সে মিশি’।

প্রৌঢ় রবি ঊর্দ্ধদেশে নীরবে দহে,
বাষ্পরসে নিয়ত শোষে কী আগ্রহে।
বরণ, গান, গন্ধ টানে নিজের পানে,—
মর্ত্ত্য-জন-নিশাস-বায়ে,—সিন্ধুতানে ;

তন্দ্রা আসে আকাশ জুড়ি', মৌন সবই,
বিশ্ব যেন মূরছি' পড়ে মৃতের ছবি!
আচম্বিতে বাতাসে বুনি' জরির বুটি
নবোদ্গত পক্ষভরে শূন্যে উঠি'
পিপীলী আসে পিল্‌পিলিয়ে সংখ্যাতীত
ধেয়ানী মুনি বাল্মীকিরে করি' আবৃত;
আবার আসে, আবার আসে, কেবলি আসে,—
গাছের গুঁড়ি ফুঁড়িয়া উড়ি' শূন্যে ভাসে।
বল্মীকেতে লুপ্ত পুন! বাল্মীকি সে,
ধেয়ান-গূঢ় মরণ মাঝে গিয়েছে মিশে।

দংশে ঘন পিপীলী,—দেহে দংশে মুহু,
আত্মা তাহা জানে না, মুখ না বলে 'উহু'।
নৃত্য করে পুত্তিকারা পক্ষভরে
ঘুরিয়া পুনঃ উড়িয়া বসে মুরৎ 'পরে;
উছলি' যেন পিছলি' পড়ে সাগর-ফেণা,
মরণ-হত মুনিরে আর না যায় চেনা!
দংশে নীল ওষ্ঠাধরে চেতন-হারা,
দংশে জানু, দংশে হনু হস্তে পারা;
দংশি' চলে মাংসলোভী নয়ন ফুঁড়ি',—
সুড়ঙ্গেতে সদলে,—মহাশঙ্খ জুড়ি'!
আসীন হিমবন্ত-চূড়ে অমরকবি
অভ্রভেদী বেদীর 'পরে দেবচ্ছবি।
পুলক-গাথা মূর্ত্তি ধরে সে কঙ্কালে,—
মর্ত্ত্যলোকে মৃত্যুহারা ছন্দে তালে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

বরপণ

(প্রতিবাদ.)

বরপণের বহু প্রতিবাদ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ভারতীতে সমস্ত গুলির স্থান হওয়া অসম্ভব। তাহার প্রয়োজনও দেখি না। প্রবন্ধ গুলির অধিকাংশ যুক্তি প্রায় একই প্রকার—তাই আমরা সেই ভূরি ভূরি প্রতিবাদের মধ্য হইতে বাছিয়া পুরুষের লিখিত একটি প্রতিবাদ এ সংখ্যায় প্রকাশ করিলাম। মহিলালিখিত একটি প্রতিবাদ আগামী জ্যৈষ্ঠের ভারতীতে প্রকাশের ইচ্ছা রহিল।

ভাঃ সম্পাদিকা।

ফাল্গুনের ভারতীতে শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন মহাশয় বরপণ গ্রহণ সমর্থন করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার যুক্তির সারবত্তা কতটুকু তাহা সামাজিক মহোদয়গণ বিচার করিবেন।

ভাল তার্কিক যিনি, আমার মনে হয়, তিনি অতি সহজেই তর্কের দ্বারা বুঝাইয়া দিতে পারিবেন, যে ডাকাতি দ্বারা "জাতীয় মঙ্গল" সাধিত হয়, এবং যে ধনরাশি একই স্থানে রাশীকৃত হইয়া ছিল, তাহা সাধারণের মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া, সাধারণের অবস্থার উন্নতি সাধন করে!

ইংলণ্ডে আভিজাত্য হিসাবে যাহারা সমাজের শীর্ষস্থানীয়, তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের সম্বন্ধে খোঁজ লইলে দেখা যাইবে, যে, প্রায় স্থলেই দস্যুতা দ্বারা ধনবৃদ্ধি করিয়া বর্ত্তমান আভিজাত্য ও সম্পদের পত্তনী হইয়াছিল। বাঙ্গালা দেশের অনেক বনিয়াদি জমীদারবংশ কি ভাবে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে, বিশেষজ্ঞের নিকট তাহা অবিদিত নাই।

ধনবৃদ্ধি করাই যদি মূলমন্ত্র হয়, অনেক উপায়ে ধনবৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

বরপণ গ্রহণ দ্বারা অবস্থার উন্নতি সাধিত

হইয়াছে, এ প্রকার উদাহরণ ক্বচিৎ দেখা যায়! কন্যার পিতার নিকট হইতে বরের পিতা পেষণ করিয়া যে টাকা গুলি গ্রহণ করেন, তাহা কি ভাবে ব্যয়িত হইয়া থাকে, সে সংবাদ এই অপব্যয়প্লাবিত বাঙ্গালা দেশে বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই।

ছেলের বিবাহে পণ গ্রহণ করিয়া সেই পণের প্রায়াংশই কি বাজি পুড়াইয়া, ব্যাণ্ড বাজাইয়া, ছাইভস্ম করিয়া অপব্যয়িত হয় না? একথা কি বরপণগ্রহীতা অস্বীকার করিতে পারিবেন।

বিবাহান্তে যে দিন টাকাকড়ির হিসাব করা হয়, সে দিন দেখা যায়, কন্যার পিতার নিকট হইতে যে টাকাগুলি পেষণ করিয়া লওয়া হইয়াছিল, ছিপি খোলা শিশিস্থ কর্পূরের মত, তাহার প্রায়াংশই ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে। পণ গ্রহণ করিলেই, কতকগুলি অনাবশ্যক আড়ম্বর বাধ্য হইয়া করিতে হয়। স্কুলের চাঁদা, বারোয়ারীর চাঁদা, দেবালয়ে প্রণামী, ফুটবল, ক্রিকেট প্রভৃতি ক্লাবের চাঁদা এবং সহস্র প্রকারের খুঁটিনাটি খরচ কুলাইতেই গৃহীত পণ নিঃশেষিত হইয়া যায়। যিনিই কিছু আদায় করিতে আসেন, তাঁহারই দৃষ্টি থাকে সেই বরপণের তহবিলের দিকে। "মহাশয়, এতগুলি টাকা পাইলেন, আমাদের সামান্য প্রাপ্যটা দিতে কেন ইতস্ততঃ কবিতেছেন। "এতগুলি টাকা" পাইয়াছেন একথা অস্বীকার করিবার 'যো' নাই—আর প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, পণগ্রহীতার মানসিক বল কম হইয়া দাঁড়ায়। তিনি সাহস করিয়া বলিতে পারেন না যে "বাপুরে, আমার অবস্থার উন্নতির জন্য আমি এতগুলা টাকা লইয়াছি, তাহাতে তোমাদের কি? আমি কিছু দিব না! সরিয়া পড়!" পুরোহিত, বাজনদার ঝাড়দার, ধোপা নাপিত, "দাই ধরণী" পাটনী, চাকর, ক্লাবের "ক্যাপ্তান্" স্কুলের মাষ্টার প্রভৃতি সকলের মুখেই এক কথা—এতগুলি টাকা পাইলেন ইত্যাদি"—আর "নজর" তাহাদের সেই বরপণ তহবিলটীর দিকে! পণে প্রাপ্ত টাকার হিসাবেই তাহারা তাহাদেব পাওনাটার হিসাব করে। আশানুরূপ না পাইলেই বলিয়া যায় "ব্যাটা কি "চশঙ্কর" রে!—যেন বাবার ঘরের টাকা দিতেছেন!" কথাটা এমন ভাবেই বলিয়া যায় যে বরকর্ত্তার শ্রবণযুগল লাল হইয়া উঠে—এবং কর্ণকুহর একেবারে তৃপ্ত হইয়া যায়! যাঁহারা ছেলের বিবাহ দিয়া "বিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার" মারিয়া আরও ধন বৃদ্ধি করিতে চাহেন আমি তাঁহাদের কথা বলিবার স্পর্দ্ধা রাখি না!

আমি বাঙ্গালার মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন ভদ্র লোকদিগের কথাই বলিব। বরপণ দিতে যাইয়া অনেক কন্যাকর্ত্তা সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন, একথাটা আজি বাঙ্গালা দেশের কাছে একটী কঠোর সত্য। কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করিলেই গৃহে একটা নিরানন্দের ভাব ফুটিয়া উঠে! এই নিরানন্দের ভাবটী নারীজাতির প্রতি অসম্মান বা অশ্রদ্ধার ভাব হইতে জাত নহে! ইহাব প্রকৃত কারণ এই সর্ব্বনাশকর "বরপণ", একথা আর অস্বীকার করিবাব উপায় নাই। ইংরাজ আইনের কঠোর অনুশাসন ব্যর্থ করা সম্ভব থাকিলে, হয় ত রাজপুতানার ন্যায় বাঙ্গালা দেশেও সূতিকাগৃহে "কন্যাহত্যাপ্রথা" প্রচলিত হইয়া

উঠিত। জীবনকে যাঁহারা বিলাসরঙ্গের মধ্য দিয়াই দেখিয়া থাকেন, তাঁহারা "বরপণের" অপকারিতা উপলব্ধি না করিতেও পারেন, কিন্তু বয়ঃস্থা কন্যার বিবাহের উপযুক্ত বরপণ সংগ্রহের অভাব কোনস্থলে পুত্রবধূর মৃত্যুর কারণ হইয়া পড়িয়াছে, এপ্রকার ঘটনাও যে খুঁজিলে পাওয়া যায় না, এমন নহে। পুনর্ব্বার পুত্রের বিবাহ দিয়া প্রাপ্ত পণ হইতেই কন্যার জন্য বরপণ সংগ্রহ করাই যদি এরূপ ভয়ঙ্কর ঘটনার মূল কারণ হয় তবে সেজন্য আসলে দায়ী কে? এই শোচনীয় সমাজবিধ্বংসী বরপণ প্রথাই কি নহে? বাহিরে দেশটা কতখানি বিস্তৃত এবং তথায় কত শিক্ষিত, অর্দ্ধ শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনগণ লইয়া সমাজ সংগঠিত, সহরের সংস্কারকগণ সে খোঁজ রাখেন কি?

বিবাহের অন্যান্য ব্যয়ের মধ্যে আর একটা ব্যয় আসিয়া পড়ে—সেটা হইতেছে "ভোজের ব্যয়"। প্রাপ্ত টাকাগুলি বরকর্ত্তার "গায়ের রক্ত জল করা টাকা নহে", এটা অতি সত্য কথা! কাজেই উপার্জ্জিত টাকা অপেক্ষা, এই পণস্বরূপ প্রাপ্ত টাকায় বোধ হয় স্বভাবতঃই মায়া একটু কম থাকে। আর আজকালকার একটা "ভোজে" ব্যয়ও হয় যথেষ্ট— সুতরাং বিবাহান্তে প্রাপ্ত টাকাটার হিসাব করিতে গেলে দেখা যায়, হয় ত আরও কিছু "ফাজিল" কর্জ্জ দাঁড়াইয়াছে! অথবা যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা "ধনবৃদ্ধির" বিশেষ সহায়ক নহে।

তারপর পণপ্রথার আর একটা বিষম অপকারিতা আছে। ধরুন্ কোনও গৃহস্থের আর্থিক অবস্থা বিশেষ স্বচ্ছল নহে। কিন্তু তাঁহার দু'একটি ছেলে আছে। যে সংসার তিনি মিতব্যয়িতার সহিত চালাইয়া নিতে পারিতেন, ভবিষ্যতে ছেলের বিবাহ দিয়া টাকা পাইবার ভরসা আছে বলিয়া, তিনি ছেলে দেখাইয়া টাকা কর্জ্জ করা সুরু করিলেন। সকলেই জানেন, যাঁহার একবার ধারকর্জ্জ করা অভ্যাস দাঁড়াইয়া যায়, তিনি সে অভ্যাস আর সহজে ত্যাগ করিতে পারেন না। এদিকে ধারকর্জ্জের মাত্রা যখন নিত্যই বাড়িয়া চলিল কোনও "বে-অকুফ্" কন্যার পিতাকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিয়া কিছু টাকা পাওয়া গেল! বিবাহের অপব্যয় গুলি করা চাই-ই—তারপর কর্জ্জ শোধ! প্রকৃত পক্ষে কর্জ্জ শোধ হইল না, বা আংশিক ভাবে হইল! এই প্রকারে অনেক ভদ্রলোক অমিতব্যয়ী হইয়া পড়িতেছেন একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বর্ত্তমান লেখক সম্ভ্রান্ত-গ্রামবাসী, এবং তাঁহার একগ্রাম হইতেই এপ্রকার অন্যূন একশত উদাহরণ দিতে সক্ষম। নিশ্চয়ই এটা "জাতীয় মঙ্গলের বিষয়" নহে।

সেন মহাশয় লিখিতেছেন "এখন দেশ মধ্যে সভ্যতার বিস্তারে (!) জীবন যাত্রার উচ্চতর আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে" ইত্যাদি।

জীবন যাত্রার উচ্চতর আদর্শ সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ থাকিতে পারে। পাশ্চাত্য শিক্ষার মন্দটুকু আমরা বড় সহজে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছি— এবং বিলাসলালসার মধ্য দিয়াই জীবনকে টানিয়া লইয়া যাইতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিতেছি! শান্ত, সরল তৃপ্ত জীবন অতিবাহিত করার মধ্যে আর আমরা মাধুর্য্য পাই না। গার্হস্থ্যাশ্রমের মধ্যে যে তপোবনো-

চিত নিষ্ঠা, সারল্য, শ্রদ্ধা, তৃপ্তি, ঐকান্তিকতা দৃষ্ট হইত, আজি আর তাহা আমাদিগকে মুগ্ধ করিতে পারে না। আর লেখকের মতে "শিক্ষিত সমাজ পাশ্চাত্য আদর্শে অনুপ্রাণিত বলিয়া তাঁহার মনে বিবাহিত জীবন যাত্রার যে আদর্শ আছে তদনুরূপ অর্থ নাই বলিয়া তিনি বিবাহ করিতে প্রস্তুত নহেন।"

জিজ্ঞাসা করি, পণ তো অনেক বরকর্ত্তাই গ্রহণ করিয়া আসিতেছে—'জীবন যাত্রার উচ্চ আদর্শ (!) দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া' কয়জনে গ্রহণ করিতেছেন?

পাঠক মনে রাখিবেন মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকদিগের কথাই বলিতেছি। বাঙ্গালার অধিকাংশ পরিবারই মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন—এবং আর্থিক চিন্তায় কাতর।

"লেখক বলিতেছেন, শিক্ষিত পুরুষ এরূপ ইচ্ছা করেন না যে তাঁহার স্ত্রী দাস দাসীর (!) মত খাটিয়া কষ্ট পায়!"

শিক্ষিত পুরুষ নিজে কি করিতেছেন? সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের মধ্যে রমণীর সাহায্যকে এমন করিয়া অস্বীকার করিলে চলিবে কেন! অধিকাংশ শিক্ষিত পুরুষই তো সাহেবের 'বুটাস্বাদগ্রাহী, চাকর বা দাস! পুরুষ নিজের দাসত্ব ঘুচাইয়া তার পর পত্নীর দাসীত্ব ঘুচাইবেন! স্বামী পুত্র শ্বশুর শ্বাশুড়ি প্রভৃতি পরিজনের অন্ন ব্যঞ্জনের বন্দোবস্ত করিয়া স্বহস্তে তাঁহাদিগকে পরিবেষণ করার মধ্যে 'দাসীত্ব' কোথায়, তাহা আমরা হীন বুদ্ধিতে বুঝিতে পারি না! পল্লীসমাজের দিকে চক্ষু রাখিয়া বোধ হয় প্রত্যেক সমস্যার বিচার করা শ্রেয়ঃ। পল্লীসমাজে যেখানে ধন বল এক প্রকার নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না,—সেই দীন, রিক্ত, পরিত্যক্ত, কাঙ্গাল পল্লীসমাজে 'জন বলের' আবশ্যকতা অত্যন্ত বেশী। সেখানে পরস্পর পরস্পরের জন্য না খাটিলে চলে না! ধনশালী সহর বন্দর লইয়াই কিছু সমগ্র বাঙ্গালা দেশটা নহে, এ কথা আমরা উৎসাহে ভুলিয়া যাইব না।

আর একটা যুক্তির 'বহর' দেখিয়া আমরা স্তব্ধ হইয়া গিয়াছি! 'বরপণ' লেখক বলিতেছেন বরের পিতা ধনশালী হইয়াও বর পণ লাভের দ্বারা আরও ধনলাভের আকাঙ্ক্ষা করিলে যদি দোষ হয়, তাহা হইলে যে সকল ধনকুবের ধন বৃদ্ধির জন্য এখনও বাণিজ্য ব্যবসায় করিতেছেন তাঁহারা ত বড়ই পাপী!

বটে! বলিহারি যুক্তি! এ যুক্তি তো ফুৎকারে উড়ানো চলেই না!

তার পর লেখক বলিতেছেন—যাহারা উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে নির্দ্ধারিত বরপণ গ্রহণপ্রথারও বিরোধী, তাঁহারা যেন যাহাতে দেশ হইতে সুশিক্ষা ও নারীর প্রতি সম্মান দূর করিয়া দেওয়া যায় এমন আন্দোলন করেন। একেবারে মথি লিখিত সুসমাচার!

তবে কি সেন মহাশয় বলিতে চাহেন যে সুশিক্ষার বিস্তার ও নারীর প্রতি সম্মানের ভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বরপণও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে? নারীর প্রতি সম্মানের ভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে বলিয়াই কি পণের জন্য আমরা নারীর পিতার "বুকে হাটু দিয়া' জিহ্বা টানিয়া বাহির করিব? বর্ত্তমান যুগের নীতি শাস্ত্রের ও

'শিক্ষাবিজ্ঞানের' ভূমিকায় কি এমন কথাই লেখে ?

যে নারীকে আমরা সম্মান করিয়া সহধর্ম্মিণীরূপে গ্রহণ করিতেছি, তাহাকে মিলনের প্রথম দিনেই কি দৃশ্য দেখাইলাম ? তাহার পিতা বেচারা তাহার সম্মানের মূল্য প্রদান করিতেই চক্ষে সরিষাফুল দেখিতেছেন !

'বরপণ' প্রবন্ধ লেখকের কন্যার সহিত 'পনের বৎসর পূর্ব্বে যে ভদ্রলোকের পুত্রের বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছিল—সে সম্বন্ধটা একেবারে বিনা পণে সাব্যস্ত হইতেছিল কেন ? বরের পিতার কি নারীর প্রতি সম্মানজ্ঞান ছিল না, যে তিনি বিনা পণে পুত্রের বিবাহ স্থির করিতে গিয়াছিলেন ? পরে যদি বরের পিতা আপনার ভুল বুঝিতে পারিয়া "ধন বৃদ্ধির জন্য ও পুত্রের বিবাহিত জীবনের আদর্শ (!) অক্ষত রাখিবার ব্যয় সঙ্কুলনের জন্য" নগদ টাকা, ও বধূরূপী—'হীরকখণ্ড'কে স্বর্ণারূঢ় করিবার জন্য অলঙ্কারাদি চাহিয়াই থাকেন, আমার তো মনে হয় ভাবী বৈবাহিক মহাশয়ের সুশিক্ষা ও নারীর প্রতি সম্মানজ্ঞানের চরম বিকাশ দেখিয়া সেনমহাশয়ের একেবারে চমৎকৃত হইয়া যাওয়াই উচিত ছিল !

"কন্যা হীরক সদৃশ—হীরকখণ্ডকে মাজিয়া ঘষিয়া স্বর্ণারূঢ় করাইয়া তাহার চতুর্দ্দিকে পদ্মরাগ ও অন্যান্য মণি সাজাইয়া দিলেই হীরক দান শোভা পায়।" মনে পড়িতেছে, কবির সেই গানটি "তোমার মেয়ে তোমার জামাই"—বরকর্ত্তার কাছে এ যুক্তিটী বড় মধুর—বড় লোভনীয় ! কন্যাকে সালঙ্কারা করিয়া সম্প্রদান করিলে একথাটা কতকটা খাটিতে পারে—কিন্তু বরকর্ত্তার হাতবাক্সটী টাকা দিয়া সাজাইয়া দিলে 'কন্যা স্বর্ণারূঢ়া' হইবেন কি ?

দুষ্ট লোকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, সেন মহাশয়ের একটী কন্যার ত পনের বৎসর পূর্ব্বে বিবাহ হইয়া গিয়াছে—বর্ত্তমানে 'স্বর্ণারূঢ় হীরকখণ্ড' আনিবার উপযুক্ত কয়টী শ্রীমান্ তাঁহার ঘরে "আইবুড়" করিয়া রাখিয়াছেন ?

তারপর "ভাবুকতা ছাড়িয়া দিয়া" সেন মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহা আরও হৃদয়গ্রাহী ! আমরা তাহা একটু তুলিয়া দিব, নতুবা রসভঙ্গ হইতে পারে ! "দেবদত্ত বিবাহ করা জীবনের 'কর্ত্তব্য' মনে করেন না এবং স্বচ্ছন্দে থাকিতে চাহেন। কিন্তু কন্যার পিতা যজ্ঞদত্ত কন্যার বিবাহ দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য মনে করেন—কন্যা তাঁহার পক্ষে অতি কষ্টদায়ক গুরুভার বস্তু ! তিনি যাহা কষ্টদায়ক গুরুভার মনে করেন তাহা স্বীয় স্কন্ধ হইতে নামাইয়া দেবদত্তের স্কন্ধে আরোপ করিতে চাহেন। এরূপস্থলে যজ্ঞদত্ত টাকা দিতে বাধ্য কিনা তাহা সকলেই বলুন··· গাঁঠরি অপেক্ষা অনন্তগুণ ভারী বস্তু চিরকাল আর একজনকে দিয়া বিনামূল্যে বহাইবেন এরূপ ইচ্ছা করা কোনও ক্রমেই সঙ্গত নহে।"...একেবারে অকাট্য যুক্তি !

'কন্যা কষ্টদায়ক গুরুভার বস্তু' হইতেছে কাহার দোষে ? বরপণগ্রহীতার দোষে নয় কি ? যাহাকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করিবার স্পর্দ্ধা রাখ—তাহাকে 'বহন' (!) করিবার খরচটা পর্য্যন্ত আদায় করিয়া লইতে চাও তাহার পিতার নিকট হইতে ?

"ইউরোপ হইতে শিক্ষালাভ করিয়া যে সকল যুবক দেশে ফিরিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা বিবাহে অধিক পণ চাহেন বলিয়া তাঁহাদের বড় নিন্দা শুনিতে পাওয়া যায় ;" লেখকের মতে "ইহাতে নিন্দার বিষয় কিছুই নাই। তাঁহারা নারীজাতিকে সমুচিত সম্মান করিতে শিখিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের শিক্ষিতজীবনের জন্য অধিক টাকার প্রয়োজন। —অতএব কন্যার পিতাকেই কৃতার্থ করিতে হইবে।" ধিক্ এই শিক্ষাভিমান ও 'সম্মান জ্ঞানকে'! "নারীজাতিকে সমুচিত সম্মান করিতে শিখিয়াছেন' তাহার প্রমাণ কি 'কষিয়া' বরপণ গ্রহণ করার মধ্যেই লুক্কায়িত ছিল! টাকার পরিমাণের তারতম্যে কি নারীদিগের প্রতি সম্মান জ্ঞানের তারতম্য হইবে? যে দ্রব্য আমরা খুব মূল্যবান জ্ঞান করি, তাহাও আমরা ঘরের কড়ি খরচ করিয়াই ক্রয় করিয়া থাকি! লেখকের মতানুযায়ী যদি কেবল পণের দ্বারাই 'সম্মানজ্ঞানের' পরিমাপ স্থির করিতে হয় তাহা হইলে বরং তিনি 'কন্যাপণ'কেই সমর্থন করিতে পারেন। ধরুন, একজনের একটী মূল্যবান 'রত্ন' আছে—আপনি 'জহুরী', সেই রত্নের মূল্য ও সম্মান বুঝেন, আপনি কি আশা করিতে পারেন যে রত্নাধিকারী আপনাকে সেই রত্নটী বিনামূল্যে দিবেন, কেবল বিনামূল্যে নহে—অধিকন্তু তাহা 'স্বর্ণারূঢ়' করাইয়া অর্থাৎ রত্নরক্ষার উপযুক্ত কতকগুলি অর্থের সহিত আপনাকে প্রদান করিবেন? এ আশা করা তো সঙ্গত নহে!

নারীকে পুরুষ সম্মানের চক্ষে দেখিবে কেন? প্রাকৃতিক আকর্ষণ তো আছেই, তাহা ছাড়া নারী এমন কতকগুলি কমনীয় গুণের অধিকারিণী, যাহা পুরুষকে পরিতৃপ্ত করে। যে নারীতে এই গুণগুলি যত অধিক বিকশিত হইবে, পুরুষ তাহাকে তত অধিক শ্রদ্ধা করিবে, সম্মান করিবে।

'বরপণ' গ্রহণের মধ্য দিয়া সম্মানজ্ঞানের পরিচয় না দিয়া, বাস্তবিক গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রদান করিলেই, নারীজাতি অধিকতর সম্মানিত হইবেন! বরপণ নারীর পক্ষে অপমান! আজিকার অধিকতর শিক্ষিতা নারীসমাজ যদি সংকল্প করেন যে তাঁহারা এই নারীজাতির প্রতি অপমানকারী বরপণ-গ্রহীতার পাণিগ্রহণ করিবেন না, তবেই শিক্ষিতাভিমানী যুবক সম্প্রদায় সম্ভবতঃ বরপণকে ঘৃণা করিতে শিক্ষা করিবেন। হিন্দুসমাজে নারীর এতটা স্বাধীনতা নাই, সুতরাং এই সঙ্কল্পানুযায়ী কার্য্য করা হিন্দুসমাজে নারীর পক্ষে প্রথমেই সুবিধা না হইলেও, তাঁহাদের অভিভাবকগণের এইরূপ করা কর্ত্তব্য।

শিক্ষিত যুবক বিবাহের পূর্ব্বে এত টাকা, এত অলঙ্কার না হইলে বিবাহ করিব না, এপ্রকার সঙ্কল্প না করিয়া, যদি প্রতিজ্ঞা করেন যে এই প্রকার গুণসম্পন্না কন্যা না হইলে বিবাহ করিব না, তাহা হইলে বাস্তবিকই গুণগ্রাহিতা ও সম্মানজ্ঞানের পরিচয় প্রদান করা হয় না কি? 'স্বদেশী'র দিনে বিবাহার্থী যুবকগণের মধ্যে এইপ্রকার আদর্শগ্রহণের একটা ভাব উঠিয়াছিল! অনেক যুবক প্রতিজ্ঞা করিতেন, যে মেয়ে সূতা না কাটিতে পারিবে, গৃহস্থালীর নানাকর্ম্মে নিপুণা না হইবে তাহাকে বিবাহ

করিবেন না। আদর্শানুযায়ী গুণসম্পন্না ক’নে চাহিতে গেলেই পণগ্রহণের স্রোত ‘মন্দা’ পড়িয়া আসিবেই।

নারীজাতির গুণগুলিকেই যদি বিবাহার্থী পণ বলিয়া মনে করেন, তবেই বিবাহ সার্থক হয়, শিক্ষা সার্থক হয়, সম্মানজ্ঞান পরিতৃপ্ত হয়!

“কন্যা হীরকখণ্ডস্বরূপ”—কন্যাকর্ত্তা যদি এই অমূল্য ‘হীরকখণ্ড’কে নানা গুণসম্পদারূঢ় করিয়া গুণগ্রাহী জামাতার করে অর্পণ করিতে পারেন—‘হীরকখণ্ড’ বাস্তবিকই ‘স্বর্ণারূঢ়’ হইল! বাঙ্গালার যুবকগণ নারীর গুণরাশিকে সম্মান করিতে শিক্ষা করুন। বরপণের চাপ দিয়া ভাবী অর্দ্ধাঙ্গিনীর পিতা বেচারাকে ‘কাহিল’ করিলে নারীজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হয় না।

যে কন্যাকর্ত্তা ‘আহ্লাদসহকারে, স্বেচ্ছায়’ বরকে টাকা দিতে চাহেন, তিনি স্বচ্ছন্দে তাঁহার কন্যাজামাতাকে যাহা ইচ্ছা প্রদান করিতে পারেন। কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহাতে আপত্তি করিবেন না!

‘সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য’ কেবল টাকার দিকেই যাহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে, তাঁহারা অনেকস্থলেই ঠকিয়া থাকেন। টাকার জোরে অনেক কন্যার পিতা ‘অচল’ কন্যা চালাইয়া দিয়াছেন এপ্রকার উদাহরণ বিরল নহে। যেদেশে পূর্ব্বানুরাগ প্রথা প্রচলিত নাই অথচ অর্থলিপ্সা আছে, সেখানে এপ্রকার ঠকিলে কাহাকেও মুখ ফুটিয়া বলিবারও ‘যো’ থাকে না! এপ্রকার স্থলে বিবাহান্তে দেখা যায়, টাকাও অপব্যয়িত হইয়া গিয়াছে, এবং আনীত ‘রত্নটী’ টাকার উজ্জ্বলতা শূন্য হইয়া অত্যন্ত বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে।

পাশ্চাত্যশিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেশে রুচির আদর্শ অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ‘কন্যার বিবাহের বয়স বাড়িয়াছে’—বরপণ তাহার অন্যতম দূর কারণ হইতে পারে; কিন্তু এই বয়োবৃদ্ধির প্রধান কারণ আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষা ও আদর্শকেই মনে করি।

যুগধর্ম্ম শিক্ষানুসারী। পাশ্চাত্য সমাজকে অনুকরণ করিয়া চলিবার জন্য আজিকার ভারত উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং তাহার প্রতি কার্য্য ও প্রতি অনুষ্ঠানের পশ্চাতেই পাশ্চাত্য ভাব ও ধারণা আদর্শরূপে পরিগৃহীত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই পাশ্চাত্য শিক্ষাই “প্রত্যেক জাতির মধ্যে যে বহুসংখ্যক শ্রেণীবিভাগ রহিয়াছে—সেই শ্রেণীবিভাগের বলবত্তা” কমাইয়া দিতেছে, এবং কৌলীন্য প্রথাকে দুর্ব্বল করিয়া তুলিতেছে। ‘বরপণ দ্বারাই এই সকল সংস্কার সাধিত হইতেছে’ ইহা শুনিলে সেই বহুপুরাতন প্রবাদবাক্যটী মনে হয়—“ঝড়ে বক পড়ে, ফকিরের কেরামৎ বাড়ে।”

বৈদেশিক রাজশক্তি আমাদিগের সমাজগত পার্থক্যকে স্মরণ রাখিয়া তাহার শাসনপ্রণালী সুপ্রতিষ্ঠিত করে নাই। রাজদ্বারে বিভিন্ন শ্রেণী ও জাতির জন্য একই শাসন, একই শৃঙ্খল রক্ষিত হইয়াছে। এক শাসন, এক আইন, এক অধিকারসমূহ সমগ্র ভারতীয়গণকে একই রাজনৈতিকক্ষেত্রের উপর আনিয়া উপস্থিত করিতেছে, সেখানে তাহাদের স্বার্থ অভিন্ন, সুতরাং পরস্পর বিরোধী জাতিসমূহের মধ্যে সামাজিক একীকরণ না হইলেও মিলন অসম্ভব হইবে না।

মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে পতিত ভারতের পতিত জাতিসমূহও একদিন এই রাজনৈতিক মিলনক্ষেত্রের মধ্যে তাহাদিগের স্থান নির্ব্বাচিত করিয়া লইতে পারিবে।

জাতিভেদ ঘুচাইবার পক্ষে বরপণের কোনও কার্য্যকারিতা আছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই। এতদ্‌পক্ষে 'বেলষ্টীমার' প্রচলনকেও বরপণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আসন দিতে প্রস্তুত আছি!

কৌলীন্য প্রথাও বরপণের জন্য উঠিতেছে না—পূর্ব্বোক্ত পাশ্চাত্য শিক্ষাই কৌলীন্য-প্রথাকে শিথিল করিয়া দিতেছে।

"অনেকস্থলে কুলীন অকুলীনকে টাকা দিয়া কন্যা সম্প্রদান করিতেছেনও বটে, কিন্তু তাহা কচিৎ।

কিন্তু সেনমহাশয় একটা ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছেন কি? হিসাব করিলে দেখা যাইবে কুলীন সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বরপণের জন্যই একটা প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সমান ঘরেই যথেষ্ট "বরপণ" পাওয়া যায় বলিয়া কুলীনগণ এখন আর বড় একটা 'অকুলক্রিয়া' করিতে চাহেন না।

বর্ত্তমান লেখক বৈদ্য সমাজের মধ্যে একটী শ্রেষ্ঠ কুলীন স্থানের অধিবাসী। গত দশ বার বৎসরের মধ্যে লেখকের গ্রামে যতগুলি বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তাহার পনের আনাই বোধ হয় 'সমান ঘরে"। কুলীনগণ পরস্পরের জন্য বাধ্য হইয়া কন্যার বিবাহ মধ্যে মধ্যে অকুলীনের সহিত দিতেছেন বটে, কিন্তু তাহা ক্রমেই বিরল হইয়া আসিতেছে। অকুলীন-দিগের সহিত কাজ করায় টাকা কিছু বেশী মিলে বটে, কিন্তু সামাজিক নিয়মানুযায়ী কতকগুলি ব্যয় বাহুল্যও করিতে হয়, এজন্য কুলীন সম্প্রদায়ের মধ্যে এখন আর কেহ বড় একটা অকুলে ক্রিয়া করিতে চাহেন না। এইরূপে কুলীন ও অকুলীন বৈদ্যগণ ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছেন! সেন মহাশয় যদি অস্বীকার করিতে চাহেন, বর্ত্তমান লেখক স্বীয় গ্রামের দশ বার বৎসরের হিসাব দিতে প্রস্তুত আছেন। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ কায়স্থ সম্প্রদায়ের মধ্যে এই প্রতিক্রিয়া আসিয়াছে কিনা বলিতে পারি না, তবে মনে হয়, না আসিয়া থাকিলেও শীঘ্রই আসিবে।

"বরপণ দ্বারা বিবাহে, শ্রাদ্ধে, দোলে দুর্গোৎসবে আবও নানাকার্য্যে অপব্যয়ের পরিমাণ কমিয়া যাইতেছে!" সেন মহাশয়ের একথা আমরা গ্রহণ করিতে পারিলাম না। পূর্ব্বের তুলনায় ব্যয় ও অপব্যয় প্রত্যেক কার্য্যেই অন্ততঃ পাঁচগুণ বাড়িয়া গিয়াছে, একথা বলিতে আমরা একটুও দ্বিধা করি না। যাঁহারা ব্যয় করিয়া থাকেন, আমার আশা আছে, তাঁহারাই এ কথার সমর্থন করিবেন।

বিবাহে ব্যয়সংক্ষেপ করিবার জন্য অনেক সভাসমিতিও হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে সামান্য তৈলের প্রদীপ জ্বালাইয়া মহোৎসবও সমাধা হইতে পারিত। এখন "আসিটীলাইন্" দীপমালা প্রজ্জ্বলিত না করিয়া ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামের 'হরির লুট দেওয়া' ও "সত্য নারায়ণের সিন্নি" দেওয়াও অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে! নিশ্চয়ই এ গুলি ব্যয় সংক্ষেপের চিহ্ন নহে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত।

আমেরিকার চিঠির কয়েকটি অংশ

(১)

সিকাগো, ২৬এ ফেব্রুয়ারী।

বস্তুত বাইরে যখন সমস্তই অনুকূল হয় তখনই নিজেকে সত্য রাখা শক্ত হয়ে উঠে—কারণ, সত্যের তখন কোনো পরীক্ষা হয় না—তখন মনে হয় সত্যকে না হলেও যেন চলে, আসবাব থাকলেই যথেষ্ট; এই জন্যই ধনীর পক্ষে স্বর্গরাজ্যের অধিকার দুর্লভ। টাকার প্রতি আমাদের যে অন্ধ বিশ্বাস কোনোমতেই আমাদের ছাড়তে চায় না তার জাল আমি ছিন্ন করে ফেলে নির্ভয় নিশ্চিন্ত হয়ে বস্‌তে চাই—"চাইনে কিছু"র দেশে পরমানন্দ মনে বাসা বাঁধতে চাই। এ দেশের লোকে মনের এই ভাবটাকে fatalism বলে অবজ্ঞা করে। কিন্তু এ fatalism নয়। যারা জীবনকে নিয়ে জুয়ো খেলে fatalism তাদেরই ধর্ম্ম—তারাই অদৃষ্টকে স্পর্শ করবার জন্য অন্ধকারে ঢেলা মারে—এ দেশে তাদের অভাব নেই। কিন্তু আমি ত অদৃষ্টকে হাৎড়ে খুঁজে বের্ করতে

রবীন্দ্রনাথ সম্প্রতি তাঁহার আমেরিকা প্রবাসকালে সেখানকার কোন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ছাত্রগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া একটি প্রীতিভোজ প্রদান করেন। এই ছবি সেদিনের সম্মিলনচিত্র।

বি, সি, রায়, কে বসু, হরিচাঁদ, বি দাস, এস্ রায়, জে শর্ম্মা, বি; এন, চ্যাটার্জি, রবীন্দ্রনাথ, পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী, পুত্র রথীন্দ্রনাথ।

চাইনে—যে পূর্ণতা আমাকে ঘিরে আছেন ভরে আছেন তাঁকেই আমি উপলব্ধি করতে চাই—বাইরের অভাবেই যে তাঁকে বেশী করে পাওয়া যায়—রাণীর সাজসজ্জা যতই দামী হোক্ স্বামীর ঘরে গিয়ে সে সমস্ত খুলে ফেল্‌তে হয়—অন্যত্র যেমনি হোক্ কিন্তু স্বামীর কাছে এই সাজ খুলে ফেলা ত দারিদ্র্য নয়। আমাদের আশ্রমে সেই স্বামীর সঙ্গেই আমাদের কারবার—এইজন্যে সেখানে দারিদ্র্যে আমাদের লজ্জা নেই—আমরা রিক্ত একেবারে রিক্ত হয়েও পূর্ণ হব। আমাদের লজ্জা নেই, ভয় নেই, কিছু নেই—তোমরা নিরুদ্বিগ্ন হও, আনন্দিত হও এই আমি দেখতে চাই—অন্ধভাবে নয়—সমস্ত জেনে শুনে বুঝে পড়ে—চক্ষু মেলে, দুই হাত আকাশে তুলে, বক্ষ প্রসারিত করে। অভাব জিনিষটা পিছনে থাকবার জিনিষ কিন্তু আমরা যখন তাকে সামনের দিকে ধরে তাকাই তখন তার কোনো মানে বুঝতেই পারিনে, সমস্তই ফাঁকা দেখ্‌তে থাকি—এ ঠিক যেন ছবির পিছন দিকটাকে সামনে করে দেয়ালের উপর টাঙিয়ে রাখা। কেবল দেখি ফ্যাঁকা ক্যানভাস—চিত্রকরের উপর বিশ্বাস একেবারে চলে যায় এবং নিজে যে এই ফাঁকা কেমন করে ভর্ত্তি করব তা ভেবে পাইনে—তখন আর কোনো উপায় দেখিনে এর উপরে পর্দ্দা ফেলে কোনমতে এই শ্রীহীনতা ঢাক্‌তে চাই—সেও যে শূন্যকে দিয়ে শূন্য ঢাকা—যতই পর্দ্দা বাড়াই না কেন সে শূন্যতা ত কোনোমতেই যাবার নয়—কিন্তু একবার কেবল ছবির দিকটাকে পাল্‌টে ধরলেই সমস্ত ধাঁদা এক মুহূর্ত্তে ঘুচে যায়। ছোট ছেলে অন্ধকারটাকে সত্য পদার্থ বলে গ্রহণ করে বলেই তাকে ভূতের ভয় দিয়ে ভরিয়ে তোলে—আমরাও অভাবটাকে তেমনি করেই নিয়েছি, তাকে এমন ভয় দিয়ে ভরিয়েছি যে, সে ভয় বাইরের দিক থেকে ঘোচানো অত্যন্ত শক্ত,—সে ভয় বস্তুত নেই এ কথা জানলেও মন সান্ত্বনা মানে না, এবং বাইরের দিক থেকে সে ভয় ঘোচাতে চেষ্টা করি—কিন্তু ঘুচবে কেন? অন্ধকারের সীমা কোথায়? তাকে ভেঙেচুরে ধুয়েমুছে ফেল্‌ব কোন্‌খানে? অথচ ভাবের দিকে কতই সহজ—একটুমাত্র ছোট আলোর শিখা। অভাবের মধ্যে দাঁড়িয়ে যখন দেখি তখন সমস্ত ডালপালাসমেত একটা বটগাছকে এমন প্রকাণ্ড যাদু বলে বোধ হয় কিন্তু ভাবের দিকে একটি মাত্র ছোট বীজ। এইটেই বিধাতার কৌতুক হাস্য—তিনি অভাবটাকেই প্রকাণ্ড দৈত্যদানবের মত গড়েন, কিন্তু কার হাতে তার পরাভব ঘটান? ভীমসেনকে দিয়ে নয়—ছোট শিশু তার তৃণ নিয়েই তাকে জয় করে। তাঁর না-সরোবর অতলস্পর্শ, তার কূল দেখা যায় না, তার জল মৃত্যুর মত কালো—কিন্তু তাঁর হাঁ-পদ্মটি এরই ভিতর থেকে মাথা তুলে জেগে ওঠে। সে ত প্রকাণ্ড ব্যাপার নয়, সে ত পর্ব্বত পাহাড় নয়; সে একটি ফুল, সে আপনার ছোটর মধ্যেই সব চেয়ে বড়—তার কোনো হাঁকডাক নেই, সে হাসিমুখেই সমস্ত জয় করেছে—সে বার বার মুদে যায়, ঝ'রে পড়ে কিন্তু আবার ফুটে ওঠে, তার অমরতা-মৃত্যু হীন অমরতা নয়, সে মৃত্যুর ভিতর দিয়েই অমর, তার পূর্ণতা অভাবের ভিতর দিয়েই পূর্ণতা—সে যে প্রবল সে ত বল দিয়ে নয়, বলকে

বিসর্জ্জন দিয়েই প্রবল। পৃথিবীতে এই অভাবের দিকেই যারা চোখ মেলে আছে তারা অহরহ ভয়েতে চিন্তাতে জর্জ্জর হয়ে রয়েছে, তারা বিষয়ের বস্তা বয়ে বয়ে এনে এই মায়া-গর্ত্ত ভরাবার জন্যে ইহজীবন গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়ে খেটে মরচে—পৃথিবীতে ভাবের দিকে যাঁদের চোখ পড়েছে তাঁরাই মানুষকে চির সম্পদ চির সান্ত্বনার পথ দেখিয়েছেন—তাঁরা দুঃখকে তাড়িয়ে দিয়ে যে দুঃখ থেকে মানুষকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন, তা নয়—তাঁরা দুঃখকে মৃত্যুকে গ্রহণ করেই মৃত্যুঞ্জয় হয়েছেন। তাঁরা ছবির উল্টো পিঠটাকে মেরে খেদিয়ে দেন নাই ছবি শুদ্ধ তাকে সম্পদরূপে গ্রহণ করেছেন। তাঁরাই মানুষকে অসঙ্কোচে অসাধ্য সাধন করবার উপদেশ দেন তাঁরাই বলেন বিশ্বাসের জোরে পর্ব্বত টলানো যায়—তাঁরা সত্যকে স্পষ্ট করে দেখতে পেয়েছেন—তারা কলসীর বাইরের তলায় জল খুঁজে খুঁজে বেড়ান না—তাঁরা নিশ্চয় জেনেছেন কলসীর ভিতরটা জলে ভরা। যারা তাঁদের সে কথা বিশ্বাস করে না, তারা কলসীর নীচেকার বিড়ে নিংড়ে জল বের করবার চেষ্টা করছে—সেইটেকেই তারা সহজ প্রণালী মনে করে-কেন না বিড়েটাকে চোখে দেখতে পাওয়া যায়, কলসীর ভিতরটা যে ঢাকা।

(২)

সিকাগো, ৩রা মার্চ্চ।

আমাদের বিদ্যালয়ের এই একটি বিশেষত্ব আছে যে, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে অখণ্ডযোগে আমরা ছেলেদের মানুষ করতে চাই—কতকগুলি বিশেষ শক্তির উগ্র বিকাশ নয় কিন্তু চারিদিকের সঙ্গে চিত্তের মিলনের দ্বারা প্রকৃতির পূর্ণতা সাধন আমাদের উদ্দেশ্য। এটা যে কত বড় জিনিষ তা এদেশে এসে আমরা আরো স্পষ্ট করে বুঝতে পারি। এখানে মানুষের শক্তির মূর্ত্তি যে পরিমাণে দেখি পূর্ণতার মূর্ত্তি সে পরিমাণে দেখতে পাইনে। আমাদের দেশে মানুষের যেমন একটা সামাজিক জাতিভেদ আছে—এদের দেশে তেমনি মানুষের চিত্তবৃত্তির একটা জাতিভেদ দেখতে পাই। মানুষের শক্তি নিজ নিজ অধিকারের মধ্যে অতিশয় মাত্রায় স্বপ্রধান হয়ে উঠেছে—প্রত্যেকে আপনার সীমার মধ্যে যোগ্যতা লাভ করবার জন্যে উদ্যোগী, সীমা অতিক্রম করে যোগলাভ করার কোনো সাধনা নেই। এ রকম জাতিভেদের উপযোগিতা কিছু দিনের জন্যে ভাল। যেমন কোনো কোনো সব্জির বীজ প্রথমটা টবে পুঁতে ভাল করে আজ্জিয়ে নিতে হয়, তার পরে তাকে ক্ষেতের মধ্যে রোপণ করা কর্ত্তব্য—এও সেই রকম। শক্তিকে তার টবে পুঁতে একটু তাড়াতাড়ি বাড়িয়ে তোলার কৃষিপ্রণালীকে নিন্দা করতে পারিনে, যদি তার পরে যথা সময়ে তাকে উদার ক্ষেত্রে রোপণ করা যায়। কিন্তু মানুষের মুস্কিল এই দেখি নিজের সফলতার চেয়ে নিজের অভ্যাসকে সে বেশি ভাল বাসতে শেখে—এই জন্যে টবের সামগ্রীকে ক্ষেতে পোঁতবার সময় প্রত্যেকবারে মহা দাঙ্গা হাঙ্গামা বেধে যায়। মানুষের শক্তির যতদূর বাড় হবার তা হয়েছে, এখন সময় এসেছে যখন যোগের জন্যে সাধনা করতে হবে। আমাদের বিদ্যালয়ে আমরা কি সেই

যুগসাধনার প্রবর্ত্তন করতে পারব না? মনুষ্যত্বকে বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত করে তার আদর্শ কি আমরা পৃথিবীর সামনে ধরবো না? এদেশে তার অভাব এরা অনুভব করতে আরম্ভ করেছে—সেই অভাব মোচন করবার জন্যে এরা হাৎড়ে বেড়াচ্ছে—এদের শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে উদারতা আনবার জন্যে এদের দৃষ্টি পড়েছে, কিন্তু এদের দোষ হচ্চে এই যে, এরা প্রণালী জিনিষটাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করে—যা কিছু আবশ্যক সমস্তকে এরা কলে তৈরি করে নিতে চায়—সেটি হবার জো নেই। মানুষের চিত্তের গভীর কেন্দ্রস্থলে সহজ জীবনের যে অমৃত উৎস আছে এরা তাকে এখনো আমল দিতে জানে না—এইজন্যে এদের চেষ্টা কেবলি বিপুল এবং আসবাব কেবলি স্তূপাকার হয়ে উঠ্‌চে। এরা লাভকে সহজ করবার জন্যে প্রণালীকে কেবলি কঠিন করে তুলচে। তাতে একদিকে মানুষের শক্তির চর্চ্চা খুবই প্রবল হচ্চে সন্দেহ নেই এবং সে জিনিষটাকে অবজ্ঞা করতে চাইনে—কিন্তু মানুষের শক্তি আছে অথচ উপলব্ধি নেই এও যেমন আর ডালপালায় গাছ খুব বেড়ে উঠ্‌চে—অথচ তার ফল নেই এও তেমনি। মানুষকে তার সফলতার সুরটি ধরিয়ে দেবার সময় এসেছে। আমাদের শান্তিনিকেতনের পাখী-দের কণ্ঠে সেই সুরটি কি ভোরের আলোতে ফুটে উঠবে না? সেটি সৌন্দর্য্যের সুর, সেটি আনন্দের সঙ্গীত, সেটি আকাশের ও আলোকের অনির্ব্বচনীয়তার স্তবগান, সেটি বিরাট প্রাণসমুদ্রের লহরীলীলার কলস্বর—সে কারখানাঘরের শৃঙ্গধ্বনি নয়। সুতরাং ছোট হয়েও সে বড়, কোমল্ হয়েও সে প্রবল—সে কেবলমাত্র চোখ মেলা কেবল মাত্র জাগরণ, সে কুস্তি নয়, মারামারি নয়, সে চেতনার প্রসন্নতা। জীবনের ভিতর দিয়ে তোমরা ফুলের মত সেই জিনিষটি ফুটিয়ে তোলো—কেননা সবই যখন তৈরি হয়ে সারা হয়ে যাবে—মন্দিরের চূড়া যখন মেঘ ভেদ করে উঠবে, তখন সেই বিনা মূল্যের ফুলের অভাবেই মানুষের দেবতার পূজা হতে পারবে না, মানুষের সব আয়োজন ব্যর্থ হয়ে যাবে। সেই একশো এক পূজার পদ্ম যখন সংগ্রহ হবে, পূজা যখন সমাধা হবে তখনি সংসার-সংগ্রামে মানুষ জয়লাভ করতে পারবে—কেবল অস্ত্রশস্ত্রের জোরে জয় হবে না এই কথা নিশ্চয় জেনে পৃথিবীর সমস্ত কলরবের মাঝখানে আমাদের কাজ আমরা যেন নিঃশব্দে করে যেতে পারি

(৩)

আর্ব্বনা, ইলিনয় ১০ মার্চ্চ।

এখানে বিদ্যালয় সম্বন্ধে লোকদের মনে ঔৎসুক্য জন্মাচ্চে। অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, সকলেই এর বিবরণ বিশেষভাবে জানতে চেয়েছেন। কাল Atlantic monthlyর Editorএর কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছি—তিনি লিখ্‌চেন—"I want to ask you whether it would not be possible for you at your leisure to write for us a general description of your school, but more especially of the philosophy of Education which underlies it. To the Atlantic's Oudience a discussion of this

kind would be exceedingly interesting." এই পত্রিকা এদেশে সব চেয়ে প্রতিষ্ঠাশালী, সুতরাং এখানে যদি আমাদের বিদ্যালয় সম্বন্ধে আলোচনা হয় তা হলে সেটা শিক্ষিতমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। সেটার দ্বারা আর্থিক লাভের সম্ভাবনা কিছু হবে কি না হবে সে কথা নিশ্চয় জানিনে কিন্তু তার চেয়ে একটা বড় লাভের কথা আছে: আমাদের কাজের ক্ষেত্রকে পৃথিবীর দৃষ্টির সামনে মেলে ধরতে পারলে আপনিই তার সমস্ত কুয়াশা কেটে যেতে থাকে। আমাদের বিদ্যালয়কে যদি দেশে কালে সঙ্কীর্ণ করে জানি তাহলে আমাদের শক্তি ম্লান হয়ে থাকে আমাদের নৈবেদ্যের পরিমাণ কমে যায়। কি উপায়ে ছেলেদের পূর্ণভাবে মানুষ করে তোলা যেতে পারে এই ভাবনা আজ সমস্ত সভ্যজগতে জেগে উঠেছে- নানা জায়গায় নানা রকম পরীক্ষা হচ্ছে—সমস্ত পৃথিবীর সেই ভাবনা যে আমাদের আশ্রমের বিদ্যালয়ের মধ্যে ভাবিত হচ্চে এবং সমস্ত পৃথিবীর সভায় এর হিসাব আমাদের দাখিল করতে হবে এই কথা মনে রাখতে পারলে চেষ্টার দীনতা ঘুচে যাবে। তা হলেই এ জিনিষটাকে আমরা একটা এণ্ট্রেন্স স্কুল মাত্র করে তুলতে লজ্জা পাব। পৃথিবীতে এণ্ট্রেন্স স্কুলের অভাব অতি অল্প—মানুষের শক্তির প্রতি সে অভাবের দাবীও অত্যন্ত ক্ষীণ। কিন্তু ছেলেরা আশ্রম জননীর কোলের উপর শুয়ে বিশ্ব-জীবনের বিগলিত অমৃত স্তন্য ধারা পান করে পূর্ণভাবে মানুষ হয়ে উঠবে এ অভাব সমস্ত পৃথিবীর অভাব—আমাদের সমস্ত জীবন দিতে না পারলে এ অভাব মোচনের আমরা আয়োজন করতে পারবো না। কিন্তু কোণের মধ্যে বসে বসে কাজ করতে করতে এ কথা আমরা কেবলি ভুলে ভুলে যাই—আমাদের সাধনার প্রকৃত লক্ষ্য ধূলায় আবৃত হয়ে যায় এবং আমাদের শক্তি ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে। সেই জন্যে আমাদের সেই প্রান্তর-প্রান্তে বিদ্যালয়কে বিশ্বদৃষ্টির সামনে তুলে ধরতে পারলে আমরা নিজেকে নিজে সত্য-ভাবে দেখতে পাব—সেই দেখতে পাওয়াই আমাদের সকল ধনের চেয়ে বড় ধন। সকলের কাছে এই আমাদের প্রকাশ আমাদের গর্ব্বের বিষয় নয়, আমাদের লজ্জার বিষয়ও হতে পারে। কেবল মাত্র সত্যকে স্পষ্ট রূপে দেখতে পাবার উপায় মাত্র বলে একে গণ্য করতে হবে—সত্যের দ্বারা সমস্ত জগতের সঙ্গে আমাদের যোগের পথ উদ্ঘাটন করতে হবে—ইস্কুল মাষ্টারি করে সে কাজ হবে না। আমাদের প্রত্যেককে সাধক হতে হবে, তপস্বী হতে হবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সমালোচনা

এই বৎসর হইতে আমরা উৎকৃষ্ট গ্রন্থেরই বিশদ ভাবে সমালোচনা করিব। ভারতী সম্পাদিকা।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবক। শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র সঙ্কলিত। প্রথম হইতে একাদশ খণ্ড। নব্যভারত প্রেসে মুদ্রিত। প্রতি খণ্ডের মূল্য চারি আনা। বীরভুম, শিউড়ি, রতন লাইব্রেরীতে সঙ্কলয়িতার নিকট প্রাপ্তব্য। এই গ্রন্থে 'বঙ্গভাষার পরলোকগত যাবতীয় সাহিত্য-সেবকগণের বর্ণানুক্রমিক চরিতাভিধান'

খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইয়াছে। আরও নয়খণ্ড প্রকাশিত হইলে গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ হইবে। ইহা দশের কাজ, একের নহে। এ গ্রন্থের সংস্করণ যখন এক মাসের মধ্যে ফুরায় না, তখন বেশ বুঝিতেছি, দশের এদিকে আগ্রহই মেটে নাই। ইহা অত্যন্ত লজ্জার কথা। নিজের দেশ ও নিজের সাহিত্যের সহিত পরিচিত হইবার জন্য আমাদিগের এতটুকু আয়াস বা অনুরাগ নাই, এ কলঙ্কের কথা কিছুতেই চাপা দেওয়া যায় না। কিন্তু সহস্র বাধা-বিপত্তি, স্বদেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বীতরাগ প্রভৃতি সত্ত্বেও শিবরতন বাবু একাই এই বিপুল গ্রন্থ রচনায় অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায় ও নিপুণ পর্য্যালোচনা-শক্তির পরিচয় আমরা এ গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে প্রচুরভাবেই পাইয়াছি। যে সকল সাহিত্যসেবীর নাম কখনও শ্রুতিগোচর হয় নাই, তাঁহাদিগেরও পরিচয় যতদূর সম্ভব উদ্ধার ও আবিষ্কার করিয়া এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে, হইতেছে। গ্রন্থখানিতে কোথাও আত্মমত খাড়া করিবার বা কল্পনার স্বচ্ছন্দ লীলাভিনয়ের এতটুকু প্রয়াস নাই। দুই-চারিজন লেখকের নাম আমাদিগের জ্ঞাতমতে বাদ পড়িয়াছে। পড়িবার আশঙ্কাও আছে। সঙ্কলয়িতা তজ্জন্য পাঠকবর্গ ও সাধারণের সহায়তা প্রার্থনা করিয়াছেন—এ ত্রুটি সহজেই সারিয়া লওয়া যাইবে। সারিয়া লইলে চরিতাভিধানখানি যে পরিপূর্ণতা লাভ করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইলে বঙ্গভাষার সম্পদ বৃদ্ধি হইবে—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস গৌরবান্বিত হইবে। সঙ্কলয়িতাকে শুধু মুখের কথায় ধন্যবাদ দিলেই, বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য শেষ হইবে না। সঙ্কলয়িতা বিজ্ঞাপনে' লিখিয়াছেন, "এইরূপ গ্রন্থে যতদূর সম্ভব অধুনা-খ্যাতনামা সাহিত্য-সেবকগণের প্রতিমূর্ত্তি প্রাচীন গ্রন্থকারগণের হস্তলিপির আদর্শ, তাঁহাদের বাসস্থান প্রভৃতির ছবি সংগৃহীত হওয়া একান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে হয়। আমি দুর্ব্বল ও দরিদ্র; সাধারণের উৎসাহ ও সহায়তা পাইলেই এই বহু ব্যয় সাধ্য ও দুরূহ কার্য্যেও আংশিক কৃতকার্য্য হইতে পারি।" একাদশ খণ্ড প্রকাশে বীরভূমির কয়েক-জন জমিদার ও হেতমপুরের রাজকুমার শ্রীযুক্ত মহিমা-নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি যথেষ্ট আর্থিক সাহায্য করিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্য তজ্জন্য তাঁহাদিগের নিকট ঋণী।

শুক্তি। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীকালিচরণ ত্রিবেদী, পুরুলিয়া। কলিকাতা, ইউনিভার্সিটি প্রিন্টিং এণ্ড পাব্লিশিং কোম্পানির প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এখানি কবিতা-গ্রন্থ। শতাধিক খণ্ড কবিতা ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অনেকগুলি কবিতাই ভাব-সম্পদে উজ্জ্বল কিন্তু সর্ব্বস্থলে ছন্দের বেশ একটি মোহন স্বাভাবিক প্রবাহ দেখিতে পাওয়া যায় না। সাধনায় তাঁহার সুন্দর ভাবগুলি সুন্দর ছন্দে গ্রথিত হইয়া অধিকতর মনোহারী হইবে—ইহা আমাদের বিশ্বাস।

আদর্শ মহিলা। প্রথম খণ্ড। শ্রীযুক্ত নয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ। মূল্য এক টাকা চারি আনা। এই বৃহৎ গ্রন্থখানিতে সীতা সাবিত্রী, দময়ন্তী, শৈব্যা ও চিন্তা—এই কয়টি প্রখ্যাত সতী-চরিত্র আলোচিত হইয়াছে। কাহিনীগুলি মূল সংস্কৃত হইতে গৃহীত। গ্রন্থখানির ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর, ছবিগুলিও মন্দ নহে।

শিখের কথা। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি, এ প্রণীত। প্রকাশক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, ক্ষীরতলা হাওড়া। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য বার আনা। পড়িয়া নিরাশ হইলাম। এখানি নাটক। নাটকীয় পাত্রপাত্রী নিতান্তই আচম্কা সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয় ও তাহাদিগের উক্তি-প্রত্যুক্তিও হেঁয়ালির আবরণে কতকটা ঢাকা থাকে। তাহাদিগের বক্তব্য ও কর্ত্তব্য স্পষ্ট বুঝা যায় না। গ্রন্থের ছাপা-কাগজ ভাল।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও৩১, সানি পার্ক বালিগঞ্জ হইতে, শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

৩৭শ বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০ [২য় সংখ্যা

ভারতী

নবজীবন

১। তুলসীদাস

তরুণ কবি তুলসীদাস। কবির সৌন্দর্য্য-পিপাসা গণ্ডী ছাড়িয়া নিখিল ছাড়িয়া ছাপিয়া উঠিতে চায়! সে কখনই ক্ষুদ্রের মধ্যে আপনাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না।

সৌন্দর্য্যের স্ফূর্ত্তি সাধনায়। অন্তরের জাগ্রৎ ব্যাকুল ইচ্ছার তাড়নায় কবি সে পথে দ্রুত চালিত।

তরুণ জীবনের ক্ষুধিত কুঞ্জে আসিয়া দাঁড়াইলেন সুন্দরী স্নেহশীলা প্রীতিময়ী এক নারী—তুলসীর নবীন জীবনের সঙ্গিনী প্রিয়তমা পত্নী। সকল অর্ঘ্য কবি তাঁহারই চরণে নিবেদন করিল।

ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্রত্ব নিখিলের সাথে যুক্ত হইয়াই বড় হইয়া উঠে। যদি না উঠে, তবে তা'তে আর সুখ কোথায়, আনন্দ কোথায়! তুলসী সে স্পর্শমণির স্পর্শ ত পায় নাই—কি করিয়াই বা পাইবে সে সাধনা এখনও ত তাহার হয় নাই!

বিচ্ছেদের ব্যথা—সে যে কত মনোরম, বাসনার আবেশ সে কথা বুঝিতেই দেয় না। সে কেবল ব্যথাটাকে বড় করিয়া দেখে। পত্নীর মুহূর্ত্ত বিচ্ছেদেও দারুণ বেদনা। এক একটি মুহূর্ত্ত তুলসীর কাছে অনন্ত দুঃখ বেলার এক একটি উপলখণ্ড। সে উপলখণ্ড যে পরশপাথর, তরুণ তুলসী কি করিয়া বুঝিবে?

গৃহে আসিয়া যখন দেখিল, পত্নী পিতৃ-ভবনে চলিয়া গেছেন; তুলসী অধীর হইয়া উঠিল, নিখিল সংসার শূন্য দেখিল।

"মা, মা, সে কোথায় গেল?"

"দু'দিন বইত নয়, তুমি উতলা হইও না।"

"না মা, এখনি আমি যাব, খাবার তুলিয়া রাখ। আমি চলিলাম।"

সমস্ত পথ তুলসী হাওয়ার মত উড়িয়া চলিল। কত ভয় কত আশঙ্কা, কত বেদনা—

"যদি না দেখিতে পাই"।

তুলসী ঝড়ের বেগে ছুটিল। পথে শুক্‌না তৃণগাছিও যেন পাহাড় হইয়া তাকে ঠেকাইয়া রাখিতে চায়।

দুরু দুরু বুক, ছল ছল নয়ন তুলসী প্রিয়তমার একেবারে বক্ষের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

"আমি আসিয়াছি।"

"এত ব্যাকুলতা, এত বেদনা বহিয়া, প্রিয়তম, তুমি আমারই কাছে আসিয়াছ! হায়! আমি কত ক্ষুদ্র

আমার মধ্যে এর প্রতিদান কোথায়? আমার এ সৌন্দর্য্য, আমার এ হৃদয়, হরি, হরি, কতটুকু, কত ক্ষুদ্র! প্রিয়তম, তুমি যদি সেই সুন্দরের সুন্দর, মহানের মহান্—তাঁহার কাছে এমনি ব্যাকুল হইয়া দাঁড়াইতে, তবে আর এমন বিমুখ হইতে না। সে যে অনন্ত অমৃত-নিকেতন আমার মধ্যে সে অমৃত কোথায়? এ যে বিন্দুমাত্র, আমি কি দিব? এত ব্যাকুলতা, এত পিয়াসা সে যে সেই অমৃত সাগরের তরেই সাজে পরিতৃপ্তি কেবল তাহাতেই।"

স্তিমিত তুলসী ক্ষণকাল আপনাকে ভুলিয়া গেল। জীবনের গতি ফিরিল। তুলসী মহানের জন্য প্রিয়তমের জন্য বাহির হইয়া পড়িলেন। ভক্তের জীবন এমনি করিয়া ফিরিয়া গিয়াছিল, ভক্ত এমনি করিয়া নবজীবন লাভ করিয়াছিলেন।

২। হাফেজ *

সূর্য্য ডুবিয়া গিয়াছে। গোধূলির আকাশে সন্ধ্যা তারাটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। সমস্ত পৃথিবীর উপর একখানি কাল যবনিকা আস্তে আস্তে আসিয়া নীরবে দাঁড়াইল। নীড়ে পাখীরা ফিরিয়া আসিয়াছে। ধেনুরা গোঠে ফিরিতেছে। বাটে রাখালের শ্রমক্লান্ত কণ্ঠ সন্ধ্যার রাগিণী গাহিয়া উঠিল। গৃহবধূ কুটীরে কুটীরে সান্ধ্যদীপ জ্বালিয়াছেন।

এমনই এক সন্ধ্যায় হাফেজ সমাধি মন্দিরে প্রদীপহস্তে আস্তে আস্তে চলিয়াছেন। এই কাজ করিয়া হাফেজের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। সমস্ত অন্ধকারের মধ্যে তাঁহার হাতের দীপশিখাটি ধ্রুবতারার মত তাঁহাকে কোন এক স্তব্ধ শান্ত মন্দিরের পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছে।

ধীরে সোপান পার হইয়া হাফেজ মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দীপ যথাস্থানে স্থাপিত হইল। দেখিলেন,

শুভ্রশ্মশ্রু, শুভ্রবসন, পবিত্রতার মূর্ত্তি দুইজন আরেফ্ † মুদ্রিতনেত্র, ধ্যানস্থ। কি এক পবিত্র অপূর্ব্ব আভায় তাঁহাদের মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত। কি এক স্বর্গীয় গদ্গদ্ ভাব তাঁহাদের মুখমণ্ডল হইতে বিকীরিত হইয়া সমস্ত মন্দিরকে পুলকিত করিয়া তুলিয়াছে। হাফেজের হৃদয়মন একটা অপরিচিত অনির্ব্বচনীয় ভাবের আবেশে ভরিয়া গেল। মণির জ্যোতির মত স্নিগ্ধ, উজ্জ্বল, সৌন্দর্য্যধারা, একটা আনন্দের ফোয়ারায় ছুটিয়া গিয়া তাঁহার সমস্ত অস্তিত্বটাকে সিক্ত করিয়া দিল। হাফেজ সকল ভুলিয়া এই নবাগত ভাবের আবেশে ভোর হইয়া আরেফ্দের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া চক্ষু মুদিয়া ধ্যান মগ্ন হইলেন। এক অজানা অনাগত তাঁহাকে আপনার দুইটি শুভ্রবাহুতে বাঁধিয়া কোন্ এক নূতন রাজ্যে আনন্দ রাজ্যে লইয়া গেল, হাফেজ বুঝিলেন, দেখিলেন, চিনিলেন। চিনিলেন এই তাঁহার প্রকৃত জীবন, প্রকৃত ঘর—প্রকৃত রাজা।

"গুরুশিক্ষাদাতা গুরুর দাসত্ব স্পর্শমণি সদৃশ। আমি তাঁহার আশ্রিত হইয়াই এই উচ্চপদ লাভ করিলাম।" ‡

নূতন জীবনের নূতন রাগিণী ইনি গাহিয়া উঠিলেন। আপনার ঘর চিনিলেন, প্রিয়তমের জন্য পাগল হইলেন। পাগল হাফেজ সে ঘরে আপনাকে আহ্বান করিলেন।

* জনশ্রুতিকে আশ্রয় করিয়া একথা লিখিত।

† আরেফ্—যোগী।

‡ একটি গজলের প্রথমাংশের অনুবাদ।

"ঘরের বাহিরে ফুলের বাগান,
নীরস সে ফুলরাশি,
তাহার মাঝারে ব্যর্থ খুঁজিছ,
প্রেমের মধুর হাসি।

বিলাপ করগো, ওগো বুল্‌বুল্‌
বিলাপের এ যে ঠাঁই,
ফিরে এস তুমি আপনার ঘরে
বাহিরে সে জন নাই। *

শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত।

গিলগিটদিগের আমোদপ্রমোদ

তালিনো ও নিছালো উৎসব

বৌদ্ধরাজা শ্রীবাদতের শাসনকালে স্কারড়ুর রা (রাজা) আঙ্গুরের—খিস্‌রো, জামসেদ, এবং সামসের নামক তিন পুত্র একদা গিলগিটের চারি মাইল পূর্ব্বে গিলগিট ও হুনজা নদীর সঙ্গম স্থলে—"দানিওর" গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হন। মুসলমানদিগের মধ্যে তাহারাই সর্ব্বপ্রথম স্কারড়ু হইতে যাত্রা করিয়া হুনজা ও 'নগর' অধিকার করেন এবং গিলগিট অধিকার করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। তাহাদের আগমন ও গিলগিট অধিকার সম্বন্ধে স্থানীয় অধিবাসীগণ একটা কৌতূহলপূর্ণ গল্প বলিয়া থাকে। তাহারা বলে যে এই রাজপুত্রগণ পরী-বংশজাত। পরীরা খুব একটা উচ্চ পর্ব্বতে বাস করিত। সেখান হইতে রাজপুত্রগণ পক্ষের সাহায্যে উড়িয়া "দানিওরে" আসেন। একদিন তাহাদের বিশ্রামস্থান হইতে দুই মাইল দূরবর্ত্তী "দানিওর খো" পর্ব্বতে একটী বন্য গাভী দেখিয়া খিস্‌রো ও জামসেদ ছোট ভাই সাম্‌সেরকে তাহার তীর দ্বারা গাভীটীকে বিদ্ধ করিতে বলিলেন। বড় ভাই দুইটীর সম্মান রক্ষা করিবার জন্য ছোট ভাই প্রথমত শর নিক্ষেপ করিতে স্বীকৃত হইল না—কিন্তু অবশেষে তাহাদের আদেশ ও অনুরোধে তীর সংযোগ করিয়া অতি কৌশলের সহিত গাভীটীর বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া ফেলিল। দানিওরের অধিবাসীগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া গাভীটিকে আনিবার জন্য সেই পর্ব্বতে গেল এবং দেখিল যে বক্ষঃস্থলে তীর বিদ্ধ হইয়া গাভীটী অর্দ্ধ মৃতাবস্থায় পড়িয়া আছে। তাহারা গাভীটীকে আনিয়া রাজপুত্রদের নিকটে রাখিল। রাজপুত্রগণ গরুটীর যকৃৎ বাহির করিয়া তৎক্ষণাৎ ভাজিতে আদেশ করিলেন। যকৃৎ ভাজিয়া আনিলে পর বড় দুই ভাই ছোট ভাইটীকে সেই খাদ্য গ্রহণ করিতে বলিলেন। ছোট ভাই কিছুতেই একা খাইতে স্বীকৃত হইলেন না। বড় দুই ভাই বলিলেন—"সামসের! তোমার শর নিক্ষেপের কৌশল দেখিয়া আমরা বড়ই সুখী হইয়াছি। তোমাকে একাই ইহা খাইতে হইবে।"

ছোট ভাই আর কি করিবেন তিনি একাই সেই যকৃৎভাজা খাইতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু দুই এক টুক্‌রা খাইবামাত্রই তাহার বড় দুই ভাই অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

* একটি গজলের শেষ অংশের ভাব লইয়া।

আর তাহাদিগকে দেখা গেল না। সামসের তখন ভাইদের অনুসরণের প্রয়াস করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইলেন। সেই ভাজা মাংস খাইয়াছিলেন বলিয়া তিনি মাটী হইতে একটুকুও উড়িতে পারিলেন না। প্রাণপ্রিয় ভাইদের জন্য কতই কান্নাকাটি করিলেন কিন্তু তাহাতে কোনই ফল হইল না। সুতরাং বাধ্য হইয়া সারাজীবন তাঁহাকে গিলগিটেই কাটাইতে হইল, গিলগিটবাসীগণ তাঁহার এই অলৌকিক কার্য্য দেখিয়া এবং তাঁহাকে পরীবংশসম্ভূত বলিয়া নিজেদের অপেক্ষা উচ্চ জ্ঞানে সম্মানের চক্ষে দেখিতে লাগিল।

কয়েকমাস পরে একদিন তিনি গ্রামের সকলকে বলিলেন—"একটা প্রকাণ্ড মার্কহোর পশু হাপুকোর পর্ব্বতে এদিকওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—আমি তাহাকে এস্থান হইতেই দেখিতে পাইতেছি এবং এখনই তীর নিক্ষেপ করিয়া সেটাকে বধ করিব।"

এই কথা শুনিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। চার মাইল দূরে হাপুকোর পর্ব্বত। সেখানে মার্কহোর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—রাজপুত্র কিপ্রকারে এতদূর হইতে তাহা জানিতে পারিলেন!

রাজপুত্র ধনুকে শর সন্ধান করিয়া অতিশয় বলের সহিত তীর নিক্ষেপ করিলেন এবং চীৎকার করিয়া বলিলেন মার্কহোর মরিয়াছে। গ্রামবাসীগণের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তাহারা সকলেই তখন সামসেরকে বহন করিয়া সেই পর্ব্বতে লইয়া চলিল, নাপুর নদী পার হইয়া সেই পর্ব্বতে গিয়া দেখিল যে সত্যই মার্কহোর প্রাণ হারাইয়া পড়িয়া আছে এবং রাজপুত্র যে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া শরত্যাগ করিয়াছিলেন ঠিক সেইস্থানে তীরটীও লাগিয়া আছে। রাজপুত্রের এই অলৌকিক কার্য্যে সকলেই বিস্মিত হইল এবং তাঁহাকে প্রশংসা করিতে লাগিল। এদিকে অসহ্য গ্রীষ্ম—সূর্য্যদেব প্রচণ্ড অগ্নিবর্ষণ করিতেছেন—বিশ্রামলাভার্থ সকলেই তখন একটী ছায়াবহুল নির্ঝরের ধারে ঘুমাইয়া পড়িল।

শ্রীবাদতরাজার কন্যা "মিইও-খাইশোনি" গ্রীষ্মকালে সেই ঝরণার ধারে বাস করিতেন, রাজকন্যার দাসী ঝরণাতে জল লইতে আসিয়া দেখে অনেক অপরিচিত লোক ঝরণার ধারে দিব্য আরামে শুইয়া ঘুমাইতেছে। এই সংবাদে রাজকন্যা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ লোকগুলিকে বন্দী করিয়া আনিতে হুকুম দিলেন। দাসীরাও তৎক্ষণাৎ রাজকন্যার হুকুম তামিল করিল।

সামসেরের যৌবনসুলভ কমনীয় রূপ দেখিয়া রাজকুমারী আপনহারা হইলেন। রাগ কোথায় চলিয়া গেল—স্বীয় ব্যবহারের জন্য অনুতাপ করিয়া অতি বিনয়ের সহিত রাজপুত্রকে আসনে বসাইয়া কুশলবার্ত্তা এবং আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজপুত্রের মিষ্ট কথায়—মার্জ্জিত ব্যবহারে রাজকন্যা মুগ্ধ হইলেন, আনন্দের বেগ সাম্‌লাইতে না পারিয়া বলিলেন—

স্বরগের তুমি—তুমি স্বরগের—
মরতের তুমি নহগো
তোমা সম নাহি ভুবনে

সামসের রাজকন্যার নিকট বিদায় চাহিলেন। কিন্তু রাজকন্যার মন ছাড়িতে চাহে না—মুখে কহিলেন—

আজিকার নিশি রহ বধূ হেথা
প্রভাতে যেও চলিয়া।

কি করেন—রাজপুত্র রাজকন্যার অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না। রজনীর অর্দ্ধেক কাটিয়া গেল। দুজনার গল্প আর ফুরায় না, রাজকন্যা রাজপুত্রের বীরত্বের কাহিনী শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন, লজ্জা ভাঙ্গিয়া সামসেরকে মুখ ফুটিয়া বলিলেন—"আমি তোমারি—আমাকে ছাড়িয়া যাইওনা।"

রাজপুত্র কত বুঝাইলেন—বলিলেন—আমি অজ্ঞাতকুলশীল, তোমার উপযুক্ত নই; তোমার পিতা শুনিলে শঙ্কট হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু চিত্ত হারাইলে কি আর সে সকল কথা মনে থাকে। রাজকন্যা সে কথা কানে তুলিলেন না—কাঁদিয়া রাজপুত্রের পায়ে পড়িলেন। রাজপুত্রের হৃদয় গলিয়া গেল, শ্রীবাদতের হস্তে লাঞ্ছিত হইবার চিন্তা আর মনে স্থান পাইল না। অশ্রু ফেলিয়া রাজকন্যাকে হাত ধরিয়া তুলিলেন, রাজকুমারীর বেদনা আপন হৃদয়ে অনুভব করিলেন। সকল দুঃখ দূর হইল, রাজকুমারীর মুখে হাসি দেখা দিল।

রাজকন্যা দাসীদিগকে ডাকিয়া সাবধান করিয়া দিলেন। বলিলেন—"যে আমার এই মিলনবার্ত্তা পিতার নিকট জানাইবে তাহাকে সেই দিনই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করিতে হইবে সুতরাং খুব সাবধান যেন একথা রাষ্ট্র না হয়।"

সেই রাত্রেই অতি গোপনে তাহাদের বিবাহ হইয়া গেল। মিলনের রাতে রাজপুত্র—রাজকন্যার নাম রাখিলেন—সাকিনা। আবার কেহ বলে রাজকুমারীর নাম হইয়াছিল "নুরবক্ত।"

পরদিন প্রাতঃকালে রাজপুত্র তাহার সঙ্গীদিগকে তাহাদের গ্রামে ফিরিয়া যাইতে অনুমতি দিলেন, কিন্তু বারম্বার বলিয়া দিলেন—"সাবধান, আমাদের মিলনবার্ত্তা প্রকাশ করিও না।'

সামসের এক্ষণে গিলগিটের রাজা হইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। আপন প্রণয়িণীকে তাহার পিতা শ্রীবাদতের প্রাণসংহারের নিমিত্ত উৎসাহিত করিতে লাগিলেন এবং গিলগিটবাসীগণকে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। সামসেরের রূপমুগ্ধ রাজকন্যা অজ্ঞাতকুলশীল প্রিয়তম পতির কুমন্ত্রণায় কর্ত্তব্যজ্ঞান হারাইলেন এবং স্বামীর উপদেশ মত পিতার প্রাণসংহারে প্রস্তুত হইলেন।

শ্রীবাদত রাক্ষসের বংশধর ছিল—সুতরাং তীর ও তরবারির আক্রমণ তাহাকে কিছুই করিতে পারিত না। তাহার শরীর ও আত্মা কি কি উপাদানে গঠিত তাহাও কেহ জানিত না, সুতরাং সামসের শ্রীবাদতের জীবনের গুপ্তরহস্য উদ্ঘাটন করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন, স্বীয় অভিলাষ পূর্ণ ও প্রণয়িণীর চিত্ত পরীক্ষা করিবার জন্য সাকিনাকে কহিলেন—"এ বৎসরে গাছের পাতা ঝরিয়া পুনরায় তাহার নব কিসলয় উদ্গত না হইতেই তুমি আর তোমার পিতাকে দেখিতে পাইবে না।"

নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই সে বৎসর গাছের পাতা ঝরিয়া গেল। সাকিনা পিতার মৃত্যু সন্নিকট জানিয়া অশ্রুমোচন করিতে করিতে পাহাড় হইতে নীচে নামিয়া আসিলেন কিন্তু

পিত্রালয়ে গিয়া দেখিলেন যে পিতার কোন প্রকার অমঙ্গল হয় নাই। রাজকন্যা পিতার নিকট গিয়া বলিলেন যে কয়েক দিন হইল, পাহাড়ের উপর একজন ফকির এই দৈববাণী করিয়াছেন যে এবৎসরে গাছের পাতা পড়িতে না পড়িতেই আমি তোমাকে হারাইব। পিতঃ আমি তোমার হতভাগিনী কন্যা, নানাপ্রকার দুশ্চিন্তায় তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে ফকিরের কথা মিথ্যা হইয়াছে।

শ্রীবাদত কহিলেন—তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমার জীবন লইতে পারে এমন কেহই পৃথিবীতে জন্মে নাই। আমার জীবনের গূঢ় রহস্য না জানিতে পারিলে মানুষের সাধ্য নাই যে আমার কেশাগ্র স্পর্শ করে।

রাজকন্যা ছাড়িলেন না—তিনি বলিলেন —"তাহা বটে, কিন্তু তবু আমার মন মানে না। তুমি মরিয়া গেলে আমি কি প্রকারে বাঁচিব! কে আমায় আর তোমার মত আদর করিয়া ডাকিবে! আমার নিকট তোমার জীবনের গুপ্ত রহস্য বলিতে বাধা কি! যখন দেখিব যে তোমার বিরুদ্ধে কেহ ষড়যন্ত্র করিতেছে, অমনি ত সাবধান হইতে পারিব। বল পিতঃ বল তোমার প্রাণ কিসের মধ্যে!"

শ্রীবাদত সকল শুনিলেন—কন্যাকে নানা কথায় ভুলাইতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু সাকিনা ভুলিবার মেয়ে নয়, বারম্বার আবদার করিতে লাগিলেন। পিতা আর কি করেন— স্নেহ বাৎসল্যে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন—"আমার জীবন "ঘি"এর মধ্যে। সেই ঘৃত খুব বেশী উত্তাপ ভিন্ন গলিবার নয়। যখন দেখিবে যে এই দুর্গের চারিদিকে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে তখনই জানিবে যে শ্রীবাদতের মৃত্যু নিশ্চয়। সেদিন আর তোমার পিতাকে কেহ রাখিতে পারিবে না।

কিন্তু হায়! শ্রীবাদত তাঁহার কন্যার চাতুরী বুঝিতে পারিলেন না, সাকিনা তাহার জীবনের কাল হইয়া তাহার নিকট হইতে জীবনের গুপ্তরহস্য জানিবার জন্য গিয়াছিল —স্নেহমুগ্ধ পিতা তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

পিতার জীবনের সকল রহস্য জ্ঞাত হইয়া কন্যা কিছু দিন পিতার নিকটেই বাস করিলেন, তারপর সুযোগ ক্রমে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া পর্ব্বতে আসিয়া দেখিলেন, সামসের তাহার আগমন প্রতীক্ষায় উৎসুক চিত্তে কালযাপন করিতেছেন।

রাজকন্যা রাজপুত্রের নিকট সকল বিষয় ব্যক্ত করিলেন, আনন্দে তাঁহার প্রাণ নাচিয়া উঠিল। সমস্ত ষড়যন্ত্র অনতিবিলম্বে সমাধা করিবার জন্য সামসের সমস্ত শক্তির প্রয়োগ করিলেন। আর কাল বিলম্ব না করিয়া তিনি দানিওরে সংবাদ পাঠাইলেন, সংবাদ পাইবামাত্র তাহার অনুচরগণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সামসের পরী-বংশসম্ভূত এই বিশ্বাসে তাহারা রাজপুত্রকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিত।

এদিকে শ্রীবাদত মানুষের মাংস খাইত তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেই জন্য গ্রাম-বাসীগণ সকলেই তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত, কিন্তু রাজার বিরুদ্ধে কথা বলে এমন সাহস কাহারও ছিল না। সুতরাং এই সুযোগে শ্রীবাদতকে শিক্ষা দিতে সকলেই উৎসাহিত হইল, তাহা না হইলে যে তাহাদের ছোট

ছোট শিশু গুলি একে একে শ্রীবাদতের ভোগেই লাগিয়া যায়।

সকলেই শ্রীবাদতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগদান করিল। সামসের সাকিনাকে পিতার নিকট যাইয়া তাহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে উপদেশ দিল। রাত্রি তিনটার সময় সকলে কাঠ ও চর্ব্বি সংগ্রহ করিয়া শ্রীবাদতের দুর্গাভিমুখে ধাবিত হইল।

বর্ত্তমান পলো (Pologround) খেলিবার স্থান হইতে প্রায় ২০০ শত গজ দূরে শ্রীবাদত দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, শত্রুগণ দুর্গের নিকটবর্ত্তী হইতে না হইতেই শ্রীবাদতের প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিল, অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিয়া তিনি কন্যাকে—কোন বিপদের আশঙ্কা আছে কিনা—দেখিবার জন্য দুর্গের বাহিরে পাঠাইয়া দিলেন।

সাকিনা পূর্ব্ব হইতেই সকল জ্ঞাত ছিলেন। সুতরাং -কোনই আশঙ্কা নাই--বলিয়া পিতাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। শত্রুগণ যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, শ্রীবাদতের প্রাণেও ততই অশান্তি ও যাতনা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া শ্রীবাদত দুর্গের বাহিরে ছুটিয়া আসিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার চক্ষু স্থির হইয়া গেল। কিন্তু তখন আর প্রতিকারের উপায় ছিল না। প্রিয়তমা কন্যার ঘৃণিত ব্যবহার তাহার বুকে শেলসম বাজিতে লাগিল। শত্রুগণ দুর্গের চতুর্দ্দিকে কাষ্ঠ সাজাইয়া অগ্নি সংযোগ করিতেছিল। শ্রীবাদত উন্মত্তবৎ বাতাসে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। উড়িতে উড়িতে "ইস্‌কোমান" উপত্যকায় তুষারাবৃত "যাসপুর" নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। (এই গ্রামটী গিলগিট হইতে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত। এক্ষণে ইহা জনশূন্য।) সেই স্থানে প্রচুর পরিমাণে আঙ্গুর ফল উৎপন্ন হইত এবং গ্রামবাসীগণ সেই ফলে মদ্য প্রস্তুত করিত। তৃষার্ত্ত শ্রীবাদত জল চাহিলে পর একজন এক পেয়ালা মদ আনিয়া দিল। তদ্দর্শনে শ্রীবাদত অসন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন—"আমি মদ চাহি না—আমি শীতল জল চাই।" কিন্তু কেহই তাহাকে জল আনিয়া দিতে পারিল না। ক্রুদ্ধ শ্রীবাদত এই অভিশাপ দিলেন যে গ্রামে আজ হইতে আর যেন আঙ্গুর উৎপন্ন না হয়।

পর বৎসর তুষারমিশ্রিত শীতলজলে গ্রাম ডুবিয়া গেল এবং জমীর উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইল। যাস্‌পুর হইতে শ্রীবাদত "চতুর-খাস" নামক স্থানে বরফের নদীগর্ভে লুকাইয়া রহিলেন। গিলগিলটবাসীরা বলে যে, আজও পর্য্যন্ত নাকি শ্রীবাদত সেই নদীগর্ভেই বাস করিতেছেন। তাহাদের দৃঢ়বিশ্বাস যে, আবার কোনদিন আসিয়া তিনি দ্বিগুণ অত্যাচারের সহিত গিলগিট শাসন করিবেন।

গিলগিট হইতে শ্রীবাদত যে দিন পলায়ন করেন সেই দিনটী স্মরণ রাখিবার জন্য প্রতি বৎসর সেই দিনে উৎসব হয়। উৎসবের রাত্রে কেহই ঘুমায় না—সকলেরই ভয় যে শ্রীবাদত পুনরায় আসিয়া গিলগিটে রাজত্ব করিবে। তাহার আত্মা ভূত হইয়া কখন কাহার স্কন্ধে ভর করে এই ভয়ে তাহারা সে রাত্রে গ্রামের চতুর্দ্দিকে বড় বড় অগ্নিকুণ্ড জ্বালাইয়া রাখে এবং কুণ্ডটী ঘেরিয়া অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে নৃত্য করে। এই প্রকার নৃত্যগীতে বিনিদ্র রজনী কাটিয়া যায়।

ইহাকে "তালিনো" উৎসব বলে। কুলচিন বংশের কেহই এই উৎসবে যোগদান করে না—কারণ তাহারা সকলেই পূর্ব্বাপর শ্রীবাদতের অনুগ্রহে প্রতিপালিত এবং তাহার কর্ম্মচারী ছিল, ঐ জন্য তাহারা উৎসবে যোগদান না করিয়া প্রভুভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে। একমাত্র এই বংশের লোক ব্যতীত আর কেহই শ্রীবাদতের শুভাকাঙ্ক্ষী গিলগিটে নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় যে তাহারা সমস্ত গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াও আজও পর্য্যন্ত কোনপ্রকার ক্ষতিগ্রস্ত না হইয়া গিলগিটে বাস করিতেছে।

উৎসবের পরদিন প্রত্যেক বাড়ীতে পাঁচটী ছাগবলি হয়। এই বৎসর যে তাহারা নিষ্ঠুর শ্রীবাদতের পুনরাগমন হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে এই আনন্দজ্ঞাপন উদ্দেশ্যেই এই ছাগহত্যা হইয়া থাকে। মাংস তাহারা রৌদ্রতাপে শুষ্ক করিয়া রাখে এবং ক্রমে ক্রমে তাহার সদ্ব্যবহার করে। তাহারা বলে যে এই শুষ্ক মাংস এক বৎসর রাখিলেও নষ্ট হইবার নহে। ইহাকে "নিচালো" উৎসব কহে।

পর্ব্বতগাত্রে বৌদ্ধমান

'বটুথ্‌নালার' প্রবেশপথের পার্শ্বে নৌকাবাহীদিগের কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর দৃষ্ট হয়। এই স্থান হইতে প্রায় ১ মাইল দূরে সিন্ধুনদীর তীরে একখানি প্রকাণ্ড প্রস্তর আছে। প্রস্তরগাত্রে ৩।৪ হাত দীর্ঘ একটী বৌদ্ধমান (Man) অর্থাৎ বৌদ্ধমূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। ছবিটী অস্পষ্টভাবে খোদিত হইলেও তাহার উপর এমন সুন্দর সাদা রঙ দেওয়া আছে যে শত শত বৎসরের রৌদ্রবৃষ্টির প্রভাবেও বর্ণের ঔজ্জ্বল্য বিনষ্ট হয় নাই, এবং বহুদূর হইতে পর্ব্বতগাত্রে শ্বেতবর্ণের এই বৌদ্ধমান সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়। এই প্রকারের ছবি সেই পর্ব্বতপৃষ্ঠে আরও অনেক দেখা যায় কিন্তু সেগুলি এইটীর ন্যায় বৃহৎ নহে। এই স্থান হইতে নিম্নে প্রায় ২।৩ মাইল দূরে নদীতীরে বিভিন্ন আকৃতির প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর যথেষ্ট আছে—পাথরগুলির পৃষ্ঠে কোনটীতে ছাগলের মূর্ত্তি, কোনটীতে বা হরিণ, কুঠার, মার্কহোর পশুর মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। এই প্রকার খোদিত মূর্ত্তি বাগরাট উপত্যকার 'সানিকর' ও কুলচি গ্রামের সন্নিকটস্থ পর্ব্বতগাত্রেও দেখা যায়।

বারমাস পরগণার "ডামুটের" নিকটবর্ত্তী "সাই" উপত্যকার পর্ব্বতপৃষ্ঠে বুদ্ধদেবের দুইটী প্রতিকৃতি আছে,—একটী খোদিত ধ্যানমগ্ন বুদ্ধদেব, অপরটী বর্ণ সম্পাতে তুলিকা দ্বারা অঙ্কিত, শিষ্যবৃন্দ পরিবেষ্টিত সেই মহাপুরুষেরই ছবি।

চিলাসের সন্নিকটে নদীতীরে একস্থানে ইহাপেক্ষাও একটী বৃহৎ পর্ব্বত গাত্রে অসংখ্য সুন্দর সুন্দর প্রতিকৃতি এবং ২।৩টী মন্দিরে ছবিসহ মানুষ, ঘোড়া, গরু, ছাগল প্রভৃতির মূর্ত্তি নিপুণভাবে খোদিত রহিয়াছে। পর্ব্বতগাত্রে স্থানে স্থানে পুরাতন অক্ষরে লিখিত ফলকও আছে। এরূপ প্রস্তরফলক নদীতীরে আরও অনেক দেখা যায়।

এই সকল শিলালিপি ও খোদিত মূর্ত্তি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে চিলাসের এই অংশে এক সময় বৌদ্ধগণ বসবাস করিত। চিলাসবাসীগণের ধারণা যে এই সকল

প্রতিকৃতি জিন, বা পরীগণ অঙ্কিত করিয়াছেন।* তাহারা বলে যে পূর্ব্বকালে চিলাসে প্রায়ই পরীগণ স্বর্গ হইতে আসিতেন এবং তাঁহারাই এই সকল প্রতিমূর্ত্তি পর্ব্বত-গাত্রে খোদিত করিয়াছেন। পূর্ব্বে সকলেই নাকি সেই পরীদিগকে দেখিতে পাইত কিন্তু এখন একজন প্রধান মোল্লা (ফকীর) তাহার মন্ত্রবলে পরীদিগকে দেখিতে পায় মাত্র—আর কেহই দেখিতে পায় না।

আবার বাগবাট উপত্যকাবাসীগণ বলে যে—"সিনোবাজ্‌নো" উৎসবের রাত্রিতে পরীগণ এই সকল প্রতিমূর্ত্তি খোদিত করিয়াছিলেন—এবং আজও পর্য্যন্ত এই উৎসবের রাত্রে পরীরা এক পাহাড়ের ছবি মুছিয়া দিয়া অন্য পাহাড়ের পৃষ্ঠে ছবি খুদিয়া রাখেন। তাহাদের বিশ্বাস যে এরূপ ছবি অঙ্কন করা মনুষ্যের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব।

রাস্থ-আই-যুদাইনি

বাগরট উপত্যকায় বুলচি গ্রামের ডোমদিগের নিকট আজও পর্য্যন্ত একটী ঢাক্ আছে। ঢাকটীর পরিধি ৩ ফুট এবং ব্যাস ১ ফুট হইবে। ইহাকে "রাস্থ-আই-যুদাইনি" বলে। এক সময় নাকি এই ঢাকটী বহুমূল্য আবরণে শোভিত হইয়া গিলগিটের উজির রাস্থর গৃহের শোভাবর্দ্ধন করিত। কল্পিত আছে যে কাহারও বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে হইলে রাস্থ ঢাকটী আনিয়া সম্মুখে স্থাপন করিতেন এবং ঢাকটি বিনা আঘাতে আপনা হইতেই বাজিয়া উঠিলে শুভলক্ষণ মনে করিয়া রাস্থ যুদ্ধযাত্রা করিতেন; ঢাকটি না বাজিলে অশুভ মনে করিয়া যুদ্ধোদ্যম স্থগিত রাখিতেন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।

স্বর্গ-সুখ

স্বর্গ সুখ নিয়ে নাথ কি করিব আমি,
ক্ষুদ্র প্রাণে সবারি কি অত সুখ সয়!
দীনহীনা সে সুকৃতি কোথা পাবে, স্বামি!
বহু তপস্যার নিধি, মোর প্রাপ্য নয়।
সাধনা কামনা মোর শুধু নাথ তুমি,
তুমি ছাড়া কিছু আমি চাহিনাক আর।
রহ তুমি স্নিগ্ধ করি মন-মরু ভূমি
চির আকাঙ্ক্ষিত নাথ তুমিই আমার!
লভুক সে স্বর্গসুখ বাঞ্ছিত যাহার,
আমি শুধু হবো সুখী লভিলে তোমায়।
সাধনা কামনা নাথ যা কিছু আমার,
মিশাইয়ে আছে তব চরণের ছায়!!

শ্রী বেলা দেবী।

* A similar belief is held by the Malays (Mahammadan's) of Lower Siam and Pahang regarding the "Orang Parai" (Peris) and certain clay tablets of Buddhistic origin found in Caves. See "Steffen, Man, 1902. No.1125, Ed."

চীনের শিল্প

চীনদেশে ভাস্কর্য্যসম্পন্ন বিশেষ কোন পুরাতন কীর্ত্তি না থাকিলেও ইহা যে এক দিন শিল্পকলায় যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল তাহার নিদর্শন অধুনা কারুকার্য্যে খচিত চীনের দ্রব্য সামগ্রী দেখিলে সহজেই প্রতীয়মান হয়। এত বড় বিশাল সাম্রাজ্যে সুদৃশ্য হর্ম্ম্যরাজি সুশোভিত স্থান অতি অল্পই দেখা যায়। চীনসম্রাটগণ কীর্ত্তিস্থাপনের সমধিক প্রয়াসী ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কারণ বৌদ্ধমন্দির ব্যতীত পুরাকালের অপর কোন মন্দির বা স্মৃতিসৌধ বা তাহার ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয় না। অতএব বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গেই যে ভারতীয় শিল্প চীনদেশে শনৈঃ শনৈঃ প্রবেশ লাভ করিয়াছিল এরূপ মনে করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। চীনদের গৃহের ছাত ঢালু। আমাদের দেশের খড়ের চালের মত পূর্ব্বে আদিম চীনেরা তাম্বুতে বাস করিত। সেই ধারণা হইতেই ঘরের ছাত ঢালু করিবার প্রথা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। বরফ পতনের জন্যও ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়। চীনেরা সকলেই অল্প বিস্তর পরিমাণে শিল্পী এবং চিত্রাঙ্কনে সিদ্ধহস্ত। ধনীগৃহের মহিলাদিগকে ললিতকলা রীতিমত শিক্ষা করিতে হয়। পট্টবস্ত্রের উপর সূক্ষ্ম কারুকার্য্য, রেশমের সুন্দর সুন্দর ফুল তৈয়ারি, চিত্রাঙ্কন এই সকল তাহাদের প্রিয় এবং অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্য মধ্যে পরিগণিত। চীনবাসীদের চিত্রকলায় বিলক্ষণ অনুরাগ দেখা যায়। সকলেই যেন স্বভাবচিত্রকর। চীনের লিপিরচনা চিত্রাঙ্কনের অপর পরিণতি। তাহাদের লিখিবার সরঞ্জামের মধ্যে লেখনী নাই। অঙ্কনের তুলিকাদ্বারা সে কার্য্য সম্পন্ন হয়; লিখিবার কালীও চিত্রাঙ্কনের কালীদ্বারা সম্পাদিত হয়। ঐ কালীগুলি দেখিতে ক্ষুদ্র এক খণ্ড পিষ্টকের মত, তাহার উপর স্বর্ণাক্ষরে লেখা, উহাকে চীনে কালী বলে। ভারতবর্ষে চিত্রাঙ্কনের নিমিত্ত ঐ কালী প্রচুর পরিমাণে আমদানী হইয়া থাকে। চীনে কৃষকেরা এমন সুন্দর শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বীজবপন করে যে হরিদ্বর্ণ শস্পদ্বারা ভূমিভাগ আচ্ছাদিত হইলে অতীব নয়নানন্দদায়ক হয়! সবগুলি যেন কেয়ারী করা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। অপর তৃণগুল্মাদি ক্ষেত্রমধ্যে আদৌ স্থান পায় না। চীনে মালী এমন সুন্দর ও সুদৃশ্যভাবে উদ্যান বৃক্ষগুলিকে ছাঁটিয়া কাটিয়া প্রস্তুত করে যে সেগুলি এক একখানি চিত্রবৎ প্রতীয়মান হয়। কোন বৃক্ষ একটি মানুষের মত, কোনটি বা একটি জানোয়ারের প্রতিকৃতি, কোনটি বা পক্ষীর আকৃতি, আবার কোনটি বা একটি প্রজাপতি! চীনের পুষ্পোদ্যানগুলি দেখিতে এমন সুন্দর এমন মনোহর যে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলে কিয়ৎকালের জন্য সকল চিন্তা, সকল উদ্বেগ, সমুদায় অশান্তি তিরোহিত হয়, মনোপ্রাণ উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। চীনেদের গৃহের আসবাব পত্রগুলি এমন সুন্দর কারুকার্য্যসম্পন্ন সে সবগুলিই নয়নমনোহর; এমন সুন্দরভাবে সজ্জিত যেন শিল্পী নিজহস্তে সেগুলিকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

গৃহের দেওয়াল মনোরম রঙিন কাগজ দ্বারা মণ্ডিত, তাহাতে কত প্রকারের লতাপাতা, পশুপক্ষী ফলমূল অঙ্কিত, তাহার ইয়ত্তা নাই। গৃহ যেন একখানি ছবি। গৃহের কার্ণিশ প্রভৃতি সুচারু ভাস্কর কার্য্যে সুশোভিত; সেগুলি আবার নানারঙে সুরঞ্জিত। সমস্ত বস্তুই সুন্দররূপে চিত্রিত। তাহারা যেন স্বভাব কবি ও শিল্পী। কবিতা চীনেদের অত্যন্ত প্রিয়। শিল্পের ত কথাই নাই, শিল্পই তাহাদের জীবন অথবা তাহাদের জীবন শিল্পময়। চীনের পুষ্পাধার যেমন সুদৃশ্য তেমনি মনোহর, যে দেখিবে সেই মোহিত হইবে। পোর্সিলেন বা চীনা মাটির বাসনগুলি অতীব সুন্দর। বাসনগুলি কাচের মত অনেকটা স্বচ্ছ, উজ্জ্বল ও চক্‌চকে। উপরি ভাগ নানাপ্রকারে চিত্রিত। চীনে 'কৌলিং' নামে এক প্রকার সাদামাটি পাওয়া যায় ইহাদ্বারা চীনাবাসন প্রস্তুত হয়। এই মাটি 'উচ্চচূড়' নামে চীনের এক পাহাড়ে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়! ঐ মাটির সঙ্গে আর এক প্রকার সাদাপাথর চূর্ণ করিয়া মিশাইতে হয়। এই পাথরের চূর্ণ ও কাদামাটি মিশাইয়া ছাঁচে ঢালিয়া নানা আকারের বাসন তৈয়ার হইয়া থাকে। একবার পোড়াইয়া ঠাণ্ডা হইলে তাহাতে চিত্র অঙ্কিত করে, পরে তদুপরি এক প্রকার আরক দিয়া আবার পোড়াইলে উত্তম বাসন তৈয়ার হয়। উপরি ভাগ কাচের মত মসৃণ হয়। চীনদেশের প্রাচীন কালের বাসনগুলি দুষ্প্রাপ্য ও বহুমূল্য। চীনে খেলনাতেও শিল্প চাতুর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ঘুড়িগুলি সুন্দর সুন্দর পক্ষী প্রজাপতি, মানুষ, সর্প, কচ্ছপ ইত্যাদির আকারে প্রস্তুত হইয়া থাকে। বাঁশ এবং বেতে সুন্দর সুন্দর চেয়ার, টেবিল, বাক্স এবং গৃহের অন্যান্য আসবাব পত্র তৈয়ারী হয়। কাগজ, কাচ ও অভ্রের লণ্ঠনগুলি এমন সুন্দর কারুকার্য্যযুক্ত, এরূপ সুদৃশ্য চিত্রশোভিত যে মন বিমোহিত হইয়া যায়। ঐগুলি চীনেলণ্ঠন নামে খ্যাত। চীনেদের মত পরিশ্রমী শিল্পী আসিয়াখণ্ডের কুত্রাপি দেখা যায় না।

শ্রীআশুতোষ রায়।

মিলন

যা' কিছু ভুবনে নিরখি সকলি
মিলনের কথা প্রকাশে—
কুসুম গন্ধ মিশিছে সমীরে
পবন মিশিছে আকাশে।

তটিনী ছুটিয়া লুটিছে সাগরে
ভক্তি হরির চরণে,
আলোক ফুটিয়া মিশিছে আঁধারে
জীবন মিশিছে মরণে।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

মক্কায় তীর্থযাত্রী

আরবদেশে মক্কা একটী সুপ্রসিদ্ধ সহর। বিশেষতঃ মুসলমানদিগের নিকট যে ইহা এক মহা পবিত্র স্থান তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। হিন্দুদিগের নিকট কাশী, গয়া প্রভৃতি যেমন তীর্থস্থান—মক্কাও সেইরূপ মুসলমানদিগের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ তীর্থ। জীবনের মধ্যে অন্তত একটী বারও এই তীর্থ দর্শন মুসলমানের নিকট সকল পাপ হইতে মুক্তির এবং স্বর্গ লাভের প্রধান সোপান। এই জন্যই বহু দূর দেশ হইতেও যাত্রীগণ এখানে সমবেত হইয়া থাকেন। পথে মৃত্যু বরং শ্রেয় তথাপি মক্কা যাওয়া চাই, কারণ সে মৃত্যুও স্বর্গ দ্বারের সন্নিকটে পৌছাইয়া দেয়। সাধারণতঃ দরিদ্র মুসলমানগণেরই এ বিষয়ে সমধিক উৎসাহ দেখিতে পাওয়া যায়। যাত্রাকালে তাহারা প্রত্যাবর্ত্তনের আশা প্রায়ই রাখে না।

জেড্ডা আরবসমুদ্রের একটী বন্দর। যাত্রীগণ প্রথমতঃ এই স্থানে আসিয়া মিলিত হয়। এই স্থান হইতে পরে সকলে একযোগে, উৎসব স্থলে যাত্রা করে। এখানকার উৎসবের নাম 'হাজ'। যে সকল যাত্রী উৎসবের দুই চারি দিবস পরে আসিয়া উপস্থিত হন তাঁহারা আগামী বৎসরের 'হাজে'র জন্য সম্পূর্ণ একটী বৎসর এই স্থানে অপেক্ষা করিয়া থাকেন।

এই সকল তীর্থযাত্রীগণের মধ্যে বিভিন্ন প্রকৃতির লোক দেখিতে পাওয়া যায়। কতকগুলি সম্পূর্ণ নিরীহ আবার কতগুলি নিষ্ঠুর অত্যাচারী। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই ভারতবর্ষ, পারস্য, মালয় প্রদেশ, আরব প্রদেশ, তুরস্ক প্রদেশ, ঈজিপ্ট, রুষ সাম্রাজ্য, টিউনিস্, ত্রিপলী, মরক্কো, য়্যালজিরীয়া প্রভৃতি প্রদেশ হইতে সমাগত। প্রায় সকল প্রদেশের যাত্রীগণই আত্মরক্ষার জন্য নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আসে কিন্তু নিরীহ ভারতবর্ষীয় মুসলমানগণই সম্পূর্ণ নিরস্ত্র, কারণ আইনঅনুসারে তাহারা সম্পূর্ণ উপায়হীন।

জেড্ডা হইতেই যাত্রীগণের কষ্টের প্রারম্ভ। প্রথমতঃ ষ্টীমার হইতে নামিবার সময় বোটবাহীগণ অসম্ভব ভাড়া চাহিয়া থাকে—উপায় নাই দিতেই হইবে, তাহারা আবার অনেক সময়ে সুবিধা পাইলে লুণ্ঠনাদি করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। ইহাদের হস্ত হইতে রক্ষা পাইলেও আবার মহাজন, বেদৌন (অনেকটা আমাদের দেশের পাণ্ডাদিগের ন্যায়) প্রভৃতিও আছে। এই বেদৌনগণ উষ্ট্র, গর্দ্দভ প্রভৃতি সহযোগে যাত্রীগণকে মক্কায় লইয়া যায়।

'হাজ' আরম্ভ হইবার এক সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতে প্রায় দ্বিসহস্র উষ্ট্র জেড্ডা হইতে মক্কা পর্য্যন্ত প্রত্যহ যাতায়াত করে। প্রায় সন্ধ্যার প্রারম্ভেই যাত্রা আরম্ভ হইয়া থাকে। এবং রজনীর অন্ধকারে উক্ত বেদৌনগণ নিরীহ যাত্রীগণকে আক্রমণ করিয়া যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লয়—প্রয়োজন হইলে প্রাণবধ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। পাঠকগণের মধ্যে অনেকেরই হয় ত মনে হইতে পারে এমন প্রসিদ্ধ স্থানে রেলওয়ের বন্দবস্ত নাই কেন?

এ কথার উত্তর—আরবগণ এ সকল বিষয়ের সম্পূর্ণ বিপক্ষে। এক সময়ে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে এ বিষয়ে একবার চেষ্টা করাও হইয়াছিল কিন্তু কোন ফল হয় নাই—উপরন্তু কয়েকজন বিদেশীর প্রাণ নষ্ট হইয়াছিল। এখানকার বেদৌনগণই ইহার প্রধান প্রতিবন্ধক।

কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে ধর্ম্মযাজকগণ যে দিন চন্দ্রোদয় প্রত্যক্ষ করিবেন সেই দিন হইতেই 'হাজে'র আরম্ভ। এই জন্য কোন কোন বৎসর 'হাজ' এপ্রিল মাসেও হইয়া থাকে কোন কোন বৎসর মার্চ্চ মাসেও হইয়া থাকে।

মক্কার হারামের মস্‌জিদ এবং কাব্বা প্রাসাদ প্রসিদ্ধ। প্রায় সমুদয় মুসলমান প্রার্থনাকালে এই প্রাসাদের দিকে সম্মুখীন হইয়া প্রার্থনা করিয়া থাকেন। প্রাসাদটী কষ্টি প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং মাঝে মাঝে স্বর্ণের কারুকার্য্য খচিত। ইহার বিস্তৃত প্রাঙ্গণে এক খানি কার্পেট পাতা। প্রতি বৎসরই একখানি করিয়া নূতন কার্পেট ঈজিপ্ট হইতে আনীত হয় এবং মেলাশেষে এই খানি বহু সহস্র খণ্ডে বিভক্ত করিয়া যাত্রীগণের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেওয়া বিধি। 'হাজে'র পূর্ব্বে যাত্রীগণকে একখানি শুভ্র বস্ত্র খণ্ড পরিধান পূর্ব্বক মস্তক মুণ্ডন করিতে হয়। পাদুকা ব্যবহারেরও নিয়ম নাই।

মক্কা সহরটী বেশ মনোরম। জেড্ডা হইতে প্রায় পঞ্চাশ (৫০) মাইল ব্যবধান। অনেকগুলি বৃহৎ অট্টালিকাও আছে। কিন্তু এখানকার স্বাস্থ্য তত ভাল নহে। জল কষ্টই ইহার প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়। বিশেষতঃ এই মেলার সময় নানা প্রকার রোগেরও সূত্রপাত হইয়া থাকে।

'হাজে'র প্রথম দিবস মস্‌জিদ এবং কাব্বা

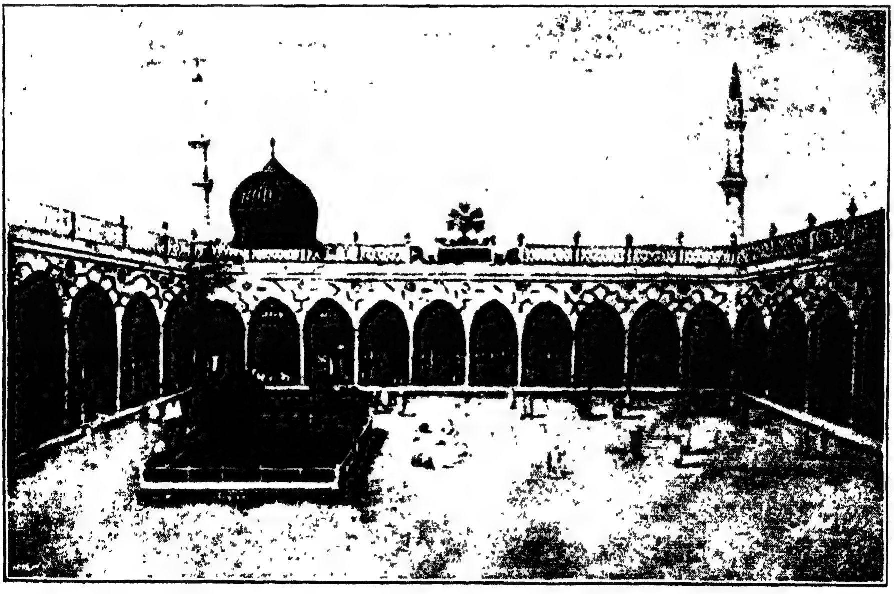

মহম্মদের কবর—মদিনা

প্রাসাদ দর্শন ও ভগবানের প্রার্থনায় অতিবাহিত হইয়া থাকে। তৎপরে যাত্রিগণ হজর-এল-ইসাত দর্শন ও স্পর্শ দ্বারা পবিত্র হন। পরে পুনরায় মস্‌জিদে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পবিত্র জল স্পর্শ করিয়া আহারাদি করিয়া থাকেন। সে দিনের রজনীও প্রার্থনায় অতিবাহিত হয়। পর দিবস সমুদয় যাত্রিগণ একযোগে মুনা উপতাকা অভিমুখে যাত্রা করেন। আরাফত (Arafat) পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া ইহারা দেবতার উদ্দেশে মেষ বা ছাগ হত্যা করিয়া এই স্থান হইতে মুনা উপত্যকায় আসিয়া উপস্থিত হন। এখানে এক বৃহৎ ভোজের আয়োজন হইয়া থাকে। এই ভোজের নাম—কোর্বাণ বৈরাম। এখানে একটী গৃহ আছে। তাহারা বলে এটি সয়তানের আবাস। প্রত্যেক যাত্রী কতকগুলি নুড়ি পাথর প্রভৃতি 'সয়তানের গৃহে নিক্ষেপ করিতে থাকেন,—উদ্দেশ্য সয়তানকে ভয় দেখান—এমন ভোজের মাঝখানে সে যেন আসিয়া সকল পণ্ড না করে। এই স্থানেই উৎসবের শেষ। ইহার পর যাত্রিগণ জেড্ডায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যে যার গৃহাভিমুখে গমন করেন।

মক্কার সন্নিকটেই মেদিনা সহর। মেদিনায় মহম্মদের সমাধিক্ষেত্র আছে অনেক যাত্রী এই সমাধিক্ষেত্র দেখিতে যান। আমরা এস্থলে ইহার একখানি চিত্র প্রদান করিলাম।

শ্রীগুরুদাস আদক।

বাগ্‌দত্তা

(২৭)

কলিকাতায় সত্যকে লইয়া থাকিবার জন্য মনীশ যে বাসাবাড়ীটা ভাড়া করিয়াছিল তাহার নীচের তলার ঘর কয়টা দিনে পাড়ার দরিদ্র বালকগণের পাঠশালা ও রাত্রে নৈশ বিদ্যালয় রূপে ব্যবহৃত হইত। পাঠ্য পুস্তক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রথম ভাগ বর্ণপরিচয় এবং সংস্কৃত নীতিশ্লোক হইতে সরল বঙ্গানুবাদ—হস্তলিখিত একখানি চটি বই। এ শিক্ষালয়ে বালির কাগজ ও খাকের কলমের সর্ব্বদা প্রয়োজন। একখানি ছুরি হাতে মনীশ হাসিমুখে মুখভাঙ্গা কলম কাটিয়া ছাত্রদলকে যোগান দিতেছে, লেখার ঘটায় ক্ষণেক্ষণে লেখনী সমরক্ষেত্রে ব্যবহৃত তরবারিবৎ বিগতশীর্ষ হইয়া পুনশ্চ তাহার হস্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। পাঠকলরব পাশের কামারের দোকানে লোহা পেটানর শব্দ ছাড়াইয়া উঠিয়া পাড়ার লোককে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিত, কিন্তু এই অশুদ্ধ অস্পষ্টউচ্চারিত শব্দলহরী শিক্ষক মনীশের চিত্তে বিশুদ্ধ আনন্দরসের সঞ্চার করিত। দেশের শ্রমজীবীদলই দেশের আশা,—কৃষিকার্য্যে, শিল্পোৎপাদনে, বৈজ্ঞানিক আলোচনায় এ সমস্ত বিষয়ে তাহাদের উন্নতিতেই দেশের উন্নতি; ইহাই মনীশের ধারণা।—মনীশ যেখানেই থাকুক, একথা সে ভুলিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু দেশকে যতই সে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল তাহার অন্তরের মধ্যে ততই একটা গভীর বেদনা জমিয়া উঠিতেছিল,

একটা যন্ত্রণার নিশ্বাস থাকিয়া থাকিয়া কেবলই চলিতেছিল "হায়, হায় এ কি হইয়াছে! আরও কি হইবে?"

কিন্তু তাই বলিয়াই কি মনীশ পৃথিবীর অপর কোন ছোট বড় চিন্তা বা কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছিল? কিছু না। জগতের বড় বড় মনীষীরা বিশ্বরহস্যের দ্বারোদ্‌ঘাটন কার্য্যে যে মস্তিষ্ক চালনা করেন ক্ষুদ্র শিশুর চিত্ত-হর ক্রীড়া কৌশল আবিষ্কারেও সে মস্তক বাধা প্রাপ্ত হয় না। মনীশ চিন্তা ও কল্পনায় অনেক বড় বিষয়ে চিত্ত নিযুক্ত রাখিলেও সেখানে আর কিছুর প্রবেশাধিকার না ছিল এমন নয়। স্বদেশ প্রেম, স্বজাতি প্রীতি, স্বধর্ম্মে শ্রদ্ধা, আত্মীয় জনের প্রতি প্রত্যাকর্ষণ প্রভৃতি কর্ত্তব্যে দৃঢ়তার সহিত মানব চরিত্রে আর একটা যে মানবীয় ভাবের স্ফুরণ স্বাভাবিক মনীশের মধ্যে সেই শক্তিটাও ক্রমে জাগরিত হইয়া উঠিয়াছিল। জগতের যাবতীয় প্রাণী জড় চেতন সমুদয়ের উপরেই সে যখন একটা প্রীতি একটা প্রেম অনুভব করিতেছিল তখন তাহাদের মাঝখানে যে নিতান্তই তাহার আপন—"জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া যাহার জীবন তাহার সহিত সংযুক্ত"—সেই কমলাকে বাদ দিলেই বা চলিবে কেন? দেশকে, কাকাকে সার্ব্বভৌম মহাশয়কে সে তাহার জীবনের আদর্শ করিয়াছিল, কিন্তু কমলা ও সত্য তাহার জীবনের কেন্দ্র। দিবসে কর্ম্মের কলরোলে যদি বা সে বিস্মৃতির মধ্যে ডুবিয়া থাকে কিন্তু রজনীর বিশ্রামমুহূর্ত্তে জলন্ত চিতা-বহ্নির লোহিত আলোকে সৈকতশয়ানা কমলার সকরুণ মুখচ্ছবি তাহার জাগরিত নেত্রে এবং সুপ্ত চিত্তে অকস্মাৎ ভাসিয়া উঠিতে কোন বাধা পাইত না।

আবার এক দিনের কথা! সেই অস্তগামী তপনের সম্মোহন গোধূলি আলোকে স্নাত কুমারীমূর্ত্তি! মনীশের সারাপ্রাণ পুলকে শিহরিয়া উঠে, সেই কমলা, সেই সন্ধ্যাতারকা আজ তাহার জীবনের ধ্রুবতারা—সে তাহার।

মনীশ কবি নয়, তাহার আশাস্বপ্নে মরক্কোমণ্ডিত খাতার পৃষ্ঠা পূর্ণ হয় না, তাই তাহার সবটুকু ভাব তাহারই শান্তহৃদয়ের নিভৃত নিরালয়ে গোপনে অথচ তাহাদের পরিপূর্ণ সৌভাগ্যেরবে নীরবে মধ্য রজনীর সুগন্ধ কুসুমের মত বিকশিত হইয়া থাকে। একটু অবকাশ পাইলেই সে একা বসিয়া নিজেই তাহার গন্ধাঘ্রাণ করে, চয়ন করিয়া মালা গাঁথে, তোড়া বাঁধে, এ গোপন আনন্দে তাহার অংশীদার কেহই ছিল না, তাহার ভবিষ্যৎ, তাহার আশা, তাহার কল্পনা সোনার জলের অক্ষরে ছাপাইয়া সে যেন তাহার বুক সেল্‌ফে চাবিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল; অপরের হস্তস্পর্শে সে খাতার নূতন মলাট মলিন করিতে দেয় নাই।

মনীশ কল্পনা করিত একটা গ্রহের চারিদিকে যেমন কয়েকটা উপগ্রহ অনবরত ঘুরিয়া বেড়ায় তেমনি তাহার খুড়া ও খুড়িমাকে আশ্রয় করিয়া প্রতি সুখে দুঃখে লাভে লোকসানে বিশ্রামে উদ্দীপনায় কর্ম্মে অবসরে সে ও কমলা নিজেদের উৎসর্গ করিয়া রাখিবে এবং দিবস ও রজনীর মাঝখানে মধুর সন্ধ্যার ন্যায় তাহাদের মাঝখানে তাহার লক্ষ্মণ ভাইটি চির প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। এ সুখ বাধা-হীন বিপ্লববিরোধবিহীন এবং বিচ্ছেদশূন্য,

এ জীবন নিশার স্বপন নয়, সত্য, উদ্দেশ্যপূর্ণ এবং সফল।

মনীশ এখানে একজন সহকর্ম্মী ও সঙ্গী পাইয়াছিল সেই ছেলেটির নাম ইন্দুভূষণ। ইন্দু গরীবের ছেলে কষ্টেস্ষ্টে একটি মেসের একতালা ঘরে বাসা লইয়া পড়িতেছে; বয়সে মনীশের অপেক্ষা কিছু ছোট হইলেও দুজনে অল্প দিনের মধ্যেই বেশ একটু বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। সকালে নিজের পড়া শুনা থাকে, রাত্রে নৈশ-শিক্ষায় ইন্দুভূষণ মনীশের সহকারী হয়। এক একটা ছুটির দিনে সে আসিয়া মনীশকে তাহার গৃহকোটর হইতে টানিয়া বাহির করিত, সত্য এই একমাত্র কারণেই শুধু ইন্দুদা'র উপর অসাধারণ সন্তুষ্ট ছিল।

একদিন শিবপুর বটানিকেল গার্ডেনে ছেলেদের চড়িভাতি উপলক্ষে ইন্দুর মারফতে মনীশের পুরাতন সহাধ্যায়ীর দল হইতে নিমন্ত্রণ আসিল।

স্বভাবের অনুকরণে মানবহস্ত গঠিত সুবৃহৎ উদ্যান তখন প্রসন্ন সূর্য্যকিরণে অতুল শ্রী ধারণ করিয়াছে। ডেলি-পেসেঞ্জারির হাত এড়াইয়া পাখীগুলা কুঞ্জে কুঞ্জে আনন্দ কলরবে ঘুরিতেছিল, তালকুঞ্জের শান্তিভঙ্গ করিয়া একসঙ্গে কতকগুলি তরুণ কণ্ঠের তরলহাস্য নিশ্চিন্ত কাননদেবতাকে চকিত করিয়া তুলিল এবং সেই শব্দে কমলদাম কাঁপাইয়া সন্তরণশীল রাজহংস দুইটি ত্রস্তে গভীর জলে পলাইয়া গেল।

শ্যামল শষ্পাসনে বসিয়া পড়িয়া দুচারিটী বন্ধুতে একটি অজানিত গাছের পরিচয় লইয়া তুমুল তর্ক পাকাইয়া তুলিল, একটি দল রন্ধনের জন্য সহস্র শাখা প্রসারিত প্রসিদ্ধ বটবৃক্ষতলে সমভিব্যাহারী ভৃত্য ও দ্রব্যসামগ্রী লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল এবং ইহাদের মধ্যে ভাবপ্রিয় বন্ধু কয়টি মিলিয়া না তর্কে না কর্ম্মে যোগ দিয়া কেহ নির্জ্জন প্রকৃতির অতুলনীয় শোভা সম্পদ উপভোগ করিতে লাগিলেন কেহ গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতে লাগিলেন—

"মলয় বাতে সু প্রভাতে তারেই পড়ে মনে
সে যে মিশে আছে ফুলের বাসে
জেগে আছে পাখির গানে!"

নলিনাক্ষ নীরব মনীশকে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি শচীর "ক্ষণিকের দেখা" পেয়েছ?" "আমি, না আমি তো পাইনি, ছাপা শেষ হয়ে গ্যাছে না কি?"

"সে কি তুমি জানো না! কাগজে কাগজে সমালোচনা বেরিয়েছে দেখ নি?" চমৎকার বই হয়েচে, কবি ত আমাদের কবি!"

মনীশ ঈষৎ লজ্জিত হইয়া কহিল "আমি কোন মাসিক নিইনে তাই দেখিনি।

"মাসিক নাওনা! মাসিকপত্রগুলো পড়া ভাল অনেক বিষয় জানা শোনা যায়, নিও দুএকখানা। মোর্দ্দা বাজে কাগজগুলো নিয়ে বসো না, বেছে গ্রাহক হয়ো। যাক্,—এখন শচী যে তোমায় বই পাঠালে না এর মানে কি? চিঠি পত্র লেখে তো?" এবার নৈহাটী ষ্টেশনে বিদায়ের পর শচীকান্ত তাহাকে একখানাও পত্র লেখে নাই, মনীশ ক্রমান্বয়ে তাহাকে তিনখানা পত্র লিখিয়া এখন পর্য্যন্ত উত্তর প্রতীক্ষা করিতেছে। সে বন্ধুর ব্যবহারে একটু আঘাত পাইয়াছিল, কিন্তু এভাব প্রকাশ না করিয়া কথাটা

ঘুরাইয়া লইল "বইখানা বেশ ভাল হয়েচে, না?"

"চমৎকার!"

দেখিতে দেখিতে আরও দুএকটি দল আসিয়া সংযুক্ত হইল। অমল লৌহবেঞ্চ অধিকার করিয়া বেহালা বাজাইয়া গান ধরিল।

বেহালাবাদকের সঙ্গীত মাধুর্য্যভাবে কম্পিত বিকম্পিত হইয়া উঠিল, মনীশ তন্ময়-চিত্তে শুনিতে শুনিতে মুখ নত করিয়া জলের উপর রাজহংসের ক্রীড়া দেখিতে লাগিল। বেহালাটার তালে তালে পুলকের এক টানা স্রোত তাহার হৃদয় তটের উপরে মৃদু মৃদু আঘাত করিয়া ব্রীড়াবনতমুখী নববধূর মত তাহাকে রাঙ্গাইয়া তুলিতে লাগিল, তাহার মানসনেত্রে তখন অপরাহ্ণের স্বর্ণবেণুমণ্ডিত নম্রমুখী তরুণীর মধুর মূর্ত্তি সলিলোত্থিতা কমলার মত অতর্কিতে ফুটিয়া উঠিতেছিল। ভাগ্যে আজ বন্ধু শচীকান্ত এখানে উপস্থিত নাই, সে এখনই হয়ত তাহাকে ধরিয়া ফেলিত!

* * *

সেদিনের হাস্যামোদঅবসানে সুখ-স্বপ্নাভিভূত শিশুর মত মৃদু হাসি অধরে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিতেই সত্য কহিল, "এই যে একটা চিঠি এসেছে দেখছি, তোমার চিঠি বাবার লেখা,—দেখতো আমাদের বড়দিনের ছুটীতে যেতে বলেছেন কি না?" মনীশ খামটা ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে হাসিয়া ফেলিল "তোর কেবল বাড়ী যাবার ভাবনা, তবু তো দলের সেরা সঙ্গীটি সেখানে নেই।" দলের সেরাটি হইতেছেন গৌরী, তাহার আকস্মিক প্রস্থানে সত্য বিশেষ খুসী হয় নাই, বরং ইহা যে তাহার পক্ষে নিতান্ত অবিবেচনার কার্য্য হইয়াছে এই যুক্তির উপরে সে তাহার প্রতি মনের মধ্যে দুর্জ্জয় একটা অভিমান পোষণ করিয়া রাখিয়াছিল। ভ্রূভঙ্গে তাই তাহার প্রতি তাচ্ছিল্য দেখাইয়া কহিল, "ওঃ, সে না থাকলেই বা, আমার তো তাতে ভারি বয়েই গ্যাল! বৌদি তো আছে।"

মনীশ চিঠিখানার ভাঁজ খুলিয়া সস্নেহনেত্রে ভাইএর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া স্নিগ্ধমধুর হাসিটুকু হাসিল "এখানে আমিওতো আছি, আমার চেয়ে বুঝি তোর—সে সে একজন বেশি হলো?"

"ওকি দাদা! বৌদি বুঝি যে সে?" সত্যর স্বর তিরস্কারপূর্ণ। দাদা যেন এই গঞ্জনাটুকুই শুনিতে চাহিতেছিলেন, তৃপ্তচিত্তে সকৌতুকে হাসিয়া তিনি পত্রপাঠে মন দিলেন।

এ কি সংবাদ! কাকা লিখিয়াছেন "ছুটী হইলেই দুজনে চলিয়া আসিও! ভ্রাতৃবিয়োগে তোমার খুড়িমা একেই অত্যন্ত কাতর, তাহার উপরে সম্পূর্ণ একা,—বিশেষতঃ কমলার জন্য তিনি অতিশয় ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছেন এসময় তোমাদের কাছে পাইলে আমরা একটু শান্তি পাই।—"

"কমলার জন্য ব্যাকুল! সম্পূর্ণ একা!" কি অর্থ ইহার,—অর্থ কি? অপঠিত অংশে হয়ত এ ঘোর সমস্যার পূরণ হইতে পারে, কিন্তু পড়িতে যে আর সাহস হয় না, কমলা কি তবে ঋষিশাপ-ভ্রষ্টা কমলার মত অতল সমুদ্রের তলদেশে অকস্মাৎ লুকাইয়াছে! সে কি নাই!

(২৮)

শচীকান্ত যখন রত্নপুকুরে ফিরিয়া আসিল গিরিজাসুন্দরী ও কল্যাণী উভয়েই অবাক হইয়া তাহার পানে চাহিয়া থাকিলেন। কয়লার চুল্লী হইতে সদ্য উঠিয়া আসিলে মানুষের যেমন ঝল্‌সান চেহারা হওয়া সম্ভব তাহাকে ঠিক তেমনই দেখাইতেছিল তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তরে সে গম্ভীর মুখে কহিল "অসুখ করেছিল"।

মাসি কহিলেন "মরে যাইরে, শরীরটা একেবারে কিছু না! একটু অনিয়ম হলেই রাংয়ের মত গলে যায়! যেন ডাইনে চুষে খেয়েছে!" বিস্তর আপত্তি সত্বেও গ্রামের কবিরাজ আসিয়া শিরঃপীড়ার জন্য "ভৃঙ্গরাজ" তৈল ব্যবস্থা করিয়া গেল, "পোষ্টাই" হইবে বলিয়া গৃহিণী দুমোড়া "রসসিন্দূর মকরধ্বজ" কাঁচা দুগ্ধের সহিত প্রাতে সন্ধ্যায় সহস্তে মাড়িয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। শচীকান্ত বিশেষ জোর আপত্তি তুলিল না, অকস্মাৎ একটা ভয়ানক আঘাত লাগিলে মানুষ অনেক সময় যেন কি এক প্রকার উদ্ভ্রান্ত হইয়া যায় সে যেন সেইরূপ বিহ্বলপ্রায় হইয়া গিয়াছিল। এ আকস্মিক আঘাত স্বপ্নেরও অগোচর।

গিরিজাসুন্দরী কয়দিন ছেলের অসুখ লইয়া ব্যস্ত রহিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন রোগ সারিলেও তাহার মুখের উপর একটা আরোগ্যবিহীন ক্লান্তির ঘনছায়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পাট্টা লইয়া বিস্তৃতই হইতে থাকিল তখন হঠাৎ একদিন খপ্ করিয়া তাঁহার মনে পড়িয়া গেল যে এ অসুখটার মূল শরীরের মধ্যে হয়ত না-ও থাকিতে পারে। এক দিন সুযোগ মত তাহার হতাশার কালিমাব্যাপ্ত ললাটে হস্ত বুলাইয়া গভীর স্নেহের সহিত কহিলেন "এমন হয়ে যাচ্চিস্ কেন বল্‌তো শচী? কি ভাবিস্? মনে একটু সুখ নেই কেন?"

মানুষের মন যখন দুর্ব্বল থাকে তখন সে নূতন আর কোন সুখ দুঃখ বা সহানুভূতির ভর সহিতে সক্ষম হয় না, মাসিমার আদরে তাই অকস্মাৎ তাহার ব্যথিতচিত্ত আলোড়িত হইয়া উঠিয়া দুই চোখের কোলে জল দেখা দিল, দৃষ্টি নত করিয়া গাঢ় স্বরে সে কহিল "কি ভাববো মাসিমা?"

"তাইত বলচি তোর ভাবনা কি? আমি যতদিন আছি তুই নিশ্চিন্ত থাক্ আমার যা কিছু আছে ২ভাগ করে দেবো।" শচীকান্ত গভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। এ আশ্বাস আজ আর তাহার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নয়, সাংসারিক লাভ লোকসান আজ তাহার নিকট অত্যন্ত তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে।

আর একদিন অসময়ে গিরিজা তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন "ছোট বউএর বাপ ব'লে পাঠিয়েছেন যে পাত্রটি বসীর জন্য ঠিক করেছিলেন সেটি বে-হাত হয়ে গ্যাছে। তোর সঙ্গে বিয়ে হয় তাঁর ইচ্ছা, কি বলিস্?" শচীকান্ত কোন কথা বলিল না, সে কি বলিবে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না, যে আশা জন্মের মত ফুরাইয়াছে তাহারই স্মৃতি বক্ষে জড়াইয়া কাঁদা ভাল, কিম্বা হাহাকার রুদ্ধ করিয়া নবীন জীবন গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করা উচিত? একজন তাহার করতলাগত এবং অপরজন অতল জলতলে স্খলিত। কিন্তু মন তথাপি সেই প্রার্থিত

তুল্লর্ভেরই জন্য ব্যাকুল! আর বাসন্তী বালিকার নির্ম্মল জীবনকে বিষদিগ্ধ করিবার কোন অধিকার তাহাব আছে? তাহাকে নীরব দেখিয়া গিরিজা প্রসন্নমুখে গিয়া কন্যাকে কহিলেন "তোরই কথা সত্যি রে। বসীকে বিয়ে করতে শচীর অমত নেই।"

শচীকান্ত মাসিমার মনের কথা বুঝিতে পারিল না, সে গভীর চিন্তায় আপনাকে নিমগ্ন করিয়া রাখিয়াছিল। তেমনই অর্থহীন, আশাহীন, নিরানন্দ চিন্তাস্রোতে ভাসিতে লাগিল অকুলের তীরে পারের যাত্রীর মত হতাশ্বাসে তাহার প্রাণটা ক্রমাগত লুটাইয়া পড়িতেছিল, কেবলই মর্ম্মভেদী স্বরে বলিতে ছিল, তাহাকে আর না দেখিতাম সে সহ্য হইত এ অসহ্য, অসহ্য! আজ এই দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এ কি বজ্রাঘাত! সেদিন সেই তরুণী তাহার এই অলস চিত্তবীণার তারে তারে যে ঝঙ্কার তুলিয়াছিল আজও তাহার ললিত সুর স্তব্ধ হয় নাই! প্রাণ সেই যে একদিন অকস্মাৎ পূর্ণ হইবার জন্য তাহার সমুদয় আশা তৃষ্ণাকে জাগাইয়া তুলিয়াছিল আজও সে তৃষ্ণা তেমনি প্রবল, কবি কুঞ্জে সঙ্গীতের সুরে, পুষ্পবাসে, পত্রমর্ম্মরে, এবং জীবন নিকুঞ্জে একমাত্র সুখ শান্তিরূপে সে যে সদা জাগিয়া আছে। কিন্তু মৃত্যু আসন্ন হইলে হাত পায়ের তলাগুলা যেমন প্রথম ঠাণ্ডা হইয়া আসে, কিন্তু শরীরের মধ্য ভাগটাতে তখনও নাড়ীর সঞ্চারে প্রাণের স্পন্দন বুঝিতে পারা যায়, এই সুগভীর হতাশার মধ্যেও তেমনি বিন্দুমাত্র সংশয়পূর্ণ আশা শচীকান্তের বক্ষকে ঘনঘন স্পন্দিত করিতেছিল। মনীশ সহর্ষ লজ্জায় অস্ফুটকণ্ঠে যাহাকে তাহার বাগ্‌দত্তা বধূ বলিয়া উল্লেখ করিল বহু পূর্ব্বেই যে শচীকান্তের সহিত তাহার বাক্‌দান হইয়া গিয়াছে একথা তাহারা কেহ জানে না, তাহার ধর্ম্মভীরু পিতা নিশ্চয় এ খবর পাইলে কমলাকে মনীশের পরিবর্ত্তে শচীকান্তের ভাবীবধূরূপেই অঙ্গীকার করিবেন। এই আশার উপরে নির্ভর করিয়া সে বারম্বার দ্বিধা সরাইয়া অবশেষে সাহস সঞ্চয় পূর্ব্বক তাঁহাকে একখানা পত্র লিখিল।

প্রণাম শতকোটি নিবেদন—

বহুদিবস আপনার সংবাদাদি প্রাপ্ত না হইয়া বিশেষ চিন্তিত আছি, এখানের সমস্ত মঙ্গল। আপনার নিকট একটি বিশেষ নিবেদন আছে; এই পত্রখানি পাঠ করিলে নিশ্চয়ই আপনার স্মরণ হইবে যে, তিন বৎসর পূর্ব্বে ইহা আপনি শিবুকাকার মারফৎ আমায় প্রদান করিয়াছিলেন। যে অনাথা বালিকা শিবুকাকার বাড়ীতে আশ্রিতারূপে অবস্থিতি করিতেছে তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং এক মাত্র অভিভাবক নিখিলনাথ বাবু তাহার সহিত আমার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়া আপনার আদেশ আনিতে আমাকে অনুরোধ করেন, আপনার আদেশ পাইলে তিনি ঐ কন্যাকে অন্য পাত্রে সম্প্রদান করিবেন না আমার সহিত তাঁহার এইরূপ কথাবার্ত্তা হয়। আপনার লিখিত আদেশ লইয়া ফিরিয়া দেখিলাম আকস্মিক বসন্ত রোগে নিখিলনাথ মারা গিয়াছেন—কমলা ও তাহার পিতামহী কোথায় গিয়াছেন কেহই জানে না।

সে পর্য্যন্ত বহুস্থানে তাহাদের সন্ধান করিয়াছি সন্ধান পাই নাই। শাস্ত্রানুসারে

প্রাপ্তবয়স্কা বাগ্‌দত্তা কন্যা পরিণীতা রূপেই গণ্য হয়, যাহাকে মনীশের বাক্‌দত্তা বলা হইতেছে সে পূর্ব্ব হইতেই উৎসর্গিতা, আশা করি আপনি এ বিষয়ে অনুধাবন করিয়া যথোচিত মীমাংসা করিবেন। মনীশ আমার আবাল্যবন্ধু কিন্তু ধর্ম্ম তাহাপেক্ষাও বড়। আমার কোটি কোটি প্রণাম গ্রহণ করুন।

বশম্বদ শচী।

পত্রখানা সহস্তে রেজিষ্ট্রী করিয়া আসিয়া সে কথঞ্চিৎ শান্ত হইল, মন যখন নানা ছুতায় খুঁৎ খুঁৎ করিয়া উঠে সে তাহাকে ধমক দিয়া বলে এতই কি ভয়! লোকে বলে তিনি ন্যায়বান, ন্যায় বিচার করিবেন না? মনীশ হয় ত দুঃখিত হইবে, কিন্তু সেই মনীশ সেই নারীদ্বেষী শঙ্করাচার্য্য, তাহার ইহাতে সুখ দুঃখ কি? হয় ত এ বোঝা নামাইতে পাইলে সে তাহাকে আশীর্ব্বাদই করিবে।

গিরিজা ও কল্যাণী দেখিল এতদিন পরে শচীকান্তের মুখের ক্লিষ্টভাবটা যেন অনেকখানি কমিয়া গিয়াছে। উভয়েই প্রসন্নচিত্তে ভাবিল, খেয়াল বাস্তবের নিকট চির পরাস্ত হইয়া থাকে, বাসন্তীকে প্রত্যাখ্যান করিয়া শচীকান্ত গভীর অনুশোচনা ভোগ করিতেছিল, এতদিনে তাহা দূর হইল।

সেদিন চন্দ্রগ্রহণ। গোযানপূর্ণ ভোজ্যাদি নদীতীরে চালান দিয়া গৃহিণী বাড়ীর প্রাচীনা আত্মীয়ার সঙ্গে ছপ্পর ঘেরা দ্বিতীয় যানে স্নান দানাদি ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য যাত্রাকালে কল্যাণীকে ডাকিয়া আদেশ দিলেন "ওরে তোরা এই বেলা খেয়ে দেয়ে নে না, কখন গ্রহণ লেগে যাবে খাওয়া হবে না শেষে।" শচীকান্ত নিজের ইজিচেয়ারে হেলিয়া পড়িয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছিল, কল্যাণী গিয়া ডাকিল "ছোড়্‌দা।"

"কিরে?" "খাবে এসো গ্রহণ লাগবে কোন সময়।" শচী মুখ তুলিল "লাগবে লাগবেই তারজন্য এখনি খেতে গেলাম কেন।" কল্যাণী বিস্মিত স্বরে কহিয়া উঠিল "ওমা গ্রহণের সময় বুঝি খেতে আছে! গ্রহণী রোগ হয় যে!" "কারু হতে দেখেছিস্?" কল্যাণী রাগ করিয়া বলিল "কেউ খায় যে হবে! খেলে তবেনা হতো, এসো এসো গ্রহণ পাওয়া খাবারে পাপ স্পর্শ করবে। সব ফেলা যাবে আবার"। শচীকান্ত আজ কয়দিন পরে একটু লঘুচিত্ত হইয়াছে, স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকের লোভ ছাড়িতে পারিল না, হাসিয়া কহিল "পাপ লাগবে! আকাশের চাঁদে লাগবে গ্রহণ আর মর্ত্ত্যবাসী বেচারা আমাদের খাবার গুলিতে লাগবে পাপ, কোন অপরাধে?"

কল্যাণী এ প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া মুখ চূণ করিয়া বলিল "কি জানি ভাই সবাই এই কথা বলে তো, রাহু চাঁদকে খেয়ে ফেলে কিনা, সেই জন্যে"।

"খেয়ে ফেলে না তোর মুণ্ডু করে, পৃথিবীর ছায়া চাঁদে পড়লেই চন্দ্রগ্রহণ হয়।" এই সময় গিরিজাসুন্দরী তাঁহাদের বিলম্ব দেখিয়া ডাকিতে আসিতেছিলেন, শচীকান্তের কথাগুলা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল, অবিশ্বাসে মৃদু হাসিয়া কহিয়া উঠিলেন "তোদের যত গাঁজাখুরি কথা, চিরকাল ধরে রাহু চাঁদকে গিলে ফেলে শুনে এলুম, চোখে দেখে এলুম—এখন হলো "পৃথিবীর ছায়া চাঁদে পড়ে"! অবাক্ করলি! যা

যা এখন খেতে যা, দেরি হয়ে যাচ্ছে আমি চল্লুম।"

আহারে বসিয়া কল্যাণী বলিল "গ্রহণের সাতদিন কেটে গেলে পাকা দেখা করে এই বার বিয়ের দিন ঠিক হবে। ২৮শে অগ্রাণেই আমার ইচ্ছে বিয়েটা হয়ে যায়, সে বেশ হবে এদিকে পৌষমাস পড়ে যাবে আমাকেও আর শীঘ্র যেতে হবে না।"

শচীকান্ত যেন আকাশ হইতে পড়িল "কার বিয়ে?"

"কিছু যেন জাননা? তোমার।"

"আমার বিয়ে?" কার সঙ্গে বিয়ে, সে কি?" শচীকান্ত হস্তস্থিত অন্নগ্রাস পাত্রে নামাইয়া রাখিল। কল্যাণী ঈষৎ রাগ করিয়া বলিল "কি যে বলো। কার সঙ্গে? বাসন্তীর সঙ্গে। তোমার বিয়ের মত আছে মাকে বলনি?"

"আমি! না, কোনদিন না, কে বল্লে আমি বলেছি?"

কল্যাণী ভ্রাতার উত্তেজনাপূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া বিস্ময়ের সহিত ধীরে ধীরে উত্তর করিল "তবে বোধ হয় মার বুঝবার ভুল, বাসন্তীকে বিয়ে করবে না তা হলে?"

শচীকান্ত পরিত্যক্ত আহার্য্য পুনঃগ্রহণ করিয়া কহিল "না কোন মতে না, অসম্ভব।" ক্ষুণ্ণা কল্যাণী কিছু না বলিয়া যথাকার্য্য সম্পন্ন করণের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইল। শচীকান্ত একটু ভাবিয়া পুনশ্চ কহিল "কেন জানিস? আমি তার সন্ধান পেয়েছি।" সাগ্রহে মুখ তুলিয়া কল্যাণী কহিয়া উঠিল "সত্যি!"

কিন্তু এ আনন্দ স্থায়ী হইল না, যথা সময়ে কাশীধাম হইতে পত্র আসিল; তাহাতে অন্যান্য কথাবার্ত্তার সহিত এইরূপ লিখিত ছিল—

"তোমার বুঝিবার ভুল! কমলা লোকতঃ ধর্ম্মতঃ মনীশেরই বাকদত্তা বধূ। নিখিলনাথ তোমায় যথাশাস্ত্র বাক্‌দান করেন নাই, অতএব বন্ধুপত্নী বোধে তাহার সহিত স্নেহ-সম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক চিত্ত হইতে ভিন্ন ভাব বিদূরিত করিতে চেষ্টা করিবে। মনীশ তোমায় চিন্তার বিষয় জানিতে পারিলে ক্ষুব্ধ হওয়া সম্ভব, সে তোমার প্রকৃত বন্ধু। বন্ধুর সুখে ঈর্ষা করিও না, শাস্ত্রে আছে "ব্রহ্মহা মুচ্যতে লোকে মিত্রদ্রোহী ন মুচ্যতে।"

হায় শাস্ত্র! হায় নীতি! হৃদয় লইয়া কোথাও বিচার নাই? পাষাণস্তূপবৎ দুর্ল্লঙ্ঘ্য শাস্ত্রবিধি সর্ব্বস্থানেই মানুষের সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়া আছে! যাহাকে সে শয়নে স্বপ্নে এই দীর্ঘ দিন ধরিয়া ধ্যান করিয়া আসিল, মরণ মুহূর্ত্তে কে তাহাকে কাহার হাতে সঁপিয়া গিয়াছে সেই জন্য তাহার সে কেহই নয়? কি নিষ্ঠুর বিধান!

(২৯)

যেদিন গৌরী চাকদা ত্যাগ করিয়া কলিকাতা যাত্রা করিল সেদিন দ্বিপ্রহরে সে যখন কমলার কাছে বিদায় লইতে গিয়া নির্ব্বাক বিষাদে দাঁড়াইল তখন কমলা সত্যসত্যই তাহার বিচ্ছেদের চিন্তায় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছিল। এই মেয়েটি ভিন্ন তাহার এখানে সঙ্গিনী বলিতে কেহ ছিল না, সে যখন হাসিবার চেষ্টা করিয়া সজলনেত্রে কহিল "তোমার কিন্তু আহ্লাদ হচ্ছে—না গৌরী?" তখন বারুদস্তূপে অগ্নিসংযোগ

করিলে তাহা অকস্মাৎ যেমন জ্বলিয়া যায় তেমনই করিয়া তাহারও চিত্তাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, অজস্রধারে অশ্রুবর্ষণ করিয়া সে কহিল "মোটে না, একটুও না, সত্যদার সঙ্গে একবার দেখাও হলোনা, আর বোধহয় হবে না।"

গৌরী চলিয়া গেলে কমলা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া খিড়কি দ্বারের নিকট হইতে সরিয়া আসিল। ভ্রাতৃশোকাতুরা করুণাময়ী পাশের ঘরে মাদুরের উপর শয়ন করিয়া শৈশবের স্মৃতি স্মরণে নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছিলেন, কমলা তাঁহাকে নিদ্রিতাবোধে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গৃহান্তরে প্রবেশ করিল। আজ মধ্যাহ্নে চারিদিক মধ্যরজনীর মত নিস্তব্ধ, সে ভিজাচুলের রাশি এলাইয়া দিয়া সূচিকার্য্য লইয়া সেলাই করিতে বসিল। কিন্তু আজ তেমন ভাল লাগিতেছিল না, বহুক্ষণ চেষ্টার পর একটি ছোট ফুল সমাপ্ত করিয়া সূঁচসুতা কাপড় জড় করিয়া যথাস্থানে রাখিয়া আসিল। আজকাল এবাড়ীর ছোটখাট কাজগুলি আপনা হইতে তাহারই হস্তে আসিয়া পড়িয়াছিল, ঘরটা গুছাইয়া বিছানাটা ঝাড়িয়া পুনশ্চ সে সেই আমবাগানের দিকের জানালার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল, গৌরী গা ধুইতে আসিয়া এই জানালাটার নীচে হইতে তাহার সহিত কথা কহিত। সহসা তাহার বক্ষ উদ্বেলিত করিয়া একটি নিশ্বাস পতিত হইল। গৌরী বাপ পেলে সব পেলে,. আমার দাদা যদি এম্‌নি কোনদেশে থাকতেন!"

সে রৌদ্রতপ্ত আকাশের দিকে চাহিল "আমার কেউ নেই, এতবড় দুর্ভাগ্য নিয়ে মানুষ জন্মায়!"

কমলার বুকখানা একটা অতর্কিত বিষাদের ভারে ভারী হইয়া উঠিল, স্নিগ্ধ কালো চোখের দৃষ্টি অশ্রুবাষ্পে ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল, পরাশ্রিত পরপ্রত্যাশী জীবন, সংসারের সে একটা ভারমাত্র।

কিন্তু জলে আর্দ্র জলছবির অস্পষ্টতা ভেদ করিয়া যেমন তাহার মধ্য হইতে সমুজ্জ্বল বর্ণ সকল বাহির হইতে থাকে, তেমনই তাহার অশ্রুকম্পিত দুই নেত্রের দৃষ্টি রুদ্ধ করিবামাত্র পরক্ষণেই মনের মধ্যের তৃতীয় নেত্রে মনীশের তরুণমূর্ত্তি সুস্পষ্ট রেখায় ফুটিয়া উঠিল। কে বলে সে দুর্ভাগিনী! এই স্নেহ, এই সান্ত্বনা একি তাহার পক্ষে বিধাতার অল্প দান! দূরগত মনীশের উদ্দেশে সে তাহার কুমারী-চিত্তের সমস্ত ভক্তিভার নিবেদন করিয়া দিয়া প্রসন্ন প্রীতচিত্তে করুণাময়ীর নিকট উঠিয়া গেল।

করুণাময়ী পায়ের উপর কোমলহস্তের স্পর্শ অনুভব করিয়া চাহিয়া দেখিলেন, "গৌরী চলে গেল? আহা বাছা আমার সত্যদা' সত্যদা' করে খুন!"

"ওদের দুজনে বিয়ে হলে বেশ হতোনা মা? তাই দিন না!"

ক্ষীণ হাস্যের সহিত করুণাময়ী উত্তর করিলেন "তাকি হয় পাগলি, ওরা যে বারেন্দ্র।"

কমলা রাঢ়ীবারেন্দ্রের প্রভেদ বিশেষ বুঝিল না। সে কহিল "ওঁরাওতো ব্রাহ্মণ!"

"ব্রাহ্মণ হলেই কি হয়? ব্রাহ্মণেও কত ভেদ আছে, রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক, তার মধ্যে আবার কুলীন, বংশজ, শ্রোত্রীয়, মেল, ওসব ঢের দেখতে হয়। এখন লোকে তবু

অনেকটা কম দেখে, এই যে তোমার মামারাই দেখ না বংশজ, তোমার মাকে ওঁরা দানে দিয়েছিলেন তাই তোমাকে কুলীন ঘরে নিতে পারা গেল, যদি বেচাকেনার ঘরেই দিতেন"--কথাটা এইখানে উল্টাইয়া কহিলেন "আমাদের বিয়ের সময় দেখেছি কুলটাই আগে দেখা হত, কুলীনের ছেলের অনেকগুলো বিয়েওতো এই করে দাঁড়িয়ে গেছল, সবাই কুলীনে মেয়ে দিতে চাইত, তা মেয়ের তাতে যেমনই দশা হোক্।"

কমলা কিছু বলিল না ঈষৎ নিশ্বাস ফেলিল। যাহার যেখানে ব্যথা তাহার সেইখানেই সব সময় আঘাত লাগে, করুণাময়ীর অসাবধান কথাটায় তাহার বক্ষবেদনায় একটু চাড় পড়িল, ইঁহারা তাহাকে কোথা হইতে তুলিয়া লইতেছেন! সে প্রতিবেশী পাঁচজনের মুখে শুনিয়াছিল কুলীনসন্তান মনীশ সুন্দরী পাত্রীর সহিত অনেকমুদ্রা উপার্জ্জন করিতে সক্ষম।

কমলাকে বহুক্ষণ অবধি নীরব দেখিয়া করুণাময়ী মাথা তুলিয়া তাহার দিকে চাহিলেন, তাহার স্থির বিষণ্ণতা সহসা তাঁহাকে ব্যথিত করিল, উঠিয়া বসিয়া তাড়াতাড়ি তাহার মাথায় হাত দিয়া কহিয়া উঠিলেন, "কদিন ভাল করে দেখতে শুনতে পারিনি মুখখানি যেন শুখিয়ে গেছে, চিরুণিখান নিয়ে আয় বাছা, মাথাটা বেঁধে দিই। ভাগ্যে তোকে কুড়িয়ে পেয়েছিলুম কমল, ছেলেরা তো ঘরে থাকে না, এই দুঃখকষ্ট তোকে দেখে আমার অনেকখানি নিবারণ হয়।"

পুলকিতচিত্তে কমলা আদেশপালনের জন্য উঠিয়া গেল। সে যে ইঁহাদের কোনকাজে লাগিতেছে ইহা শুনিলেও তাহার কুণ্ঠা কমিয়া আসে।

পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া কমলা তাহার অভ্যাসানুযায়ী স্নান সমাপনান্তে ভিজাচুলের প্রান্তে গ্রন্থি বাঁধিয়া হলুদরঙের চেলির সাড়িখানি পরিয়া গৃহদেবতার পূজার আয়োজনে নিযুক্ত হইল। পল্লীগ্রামে প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ নিয়ম, কিন্তু কমলা তাহার দুই বৎসরের অভ্যাসে তাহাদের সকলকেই পরাস্ত করিয়াছিল, সে যখন সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত করিয়া চন্দনপিঁড়ি পাড়িয়াছে এমন সময় করুণাময়ী স্নান সারিয়া ভাণ্ডার-ঘরের রোয়াকে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন "কমল!" চন্দনলিপ্তহস্তে কমলা দ্বারের বাহির হইয়াছে সহসা সে শুনিতে পাইল শিবনারায়ণ বহির্বাটির দিক হইতে আসিয়া ডাকিলেন "শুনে যাও।" গৃহিণী মাথার কাপড় একটু বর্দ্ধিত করিয়া সরিয়া আসিলেন, কমলা আর অগ্রসর না হইয়া পূর্ব্বস্থানেই দাঁড়াইয়া রহিল, শিবনারায়ণের সাক্ষাতে অপ্রয়োজনে বাহির হইতে সে একটু সঙ্কোচ অনুভব করে, শ্বশুর হইবেন তো। শিবনারায়ণ ঈষৎ উত্তেজিত ভাবে কহিলেন "কি করা যায় বল দেখি? করালীচরণ বড়ই ফ্যাসাদ বাধিয়েছে। সে এই ভোরে এসে উপস্থিত—বলে কমলাকে এখনি নিয়ে যাব,—না দাও তো পুলিষ এনে মেয়ে আদায় করবো।"

করুণাময়ী অকস্মাৎ বিস্ময়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন "বল কি?"

অন্তরালে আর একজন বিদ্যুদাঘাত প্রাপ্ত হইল। শিবনারায়ণ চিন্তিত মুখে কেশবিরল

মস্তকে অঙ্গুলী চালনা করিয়া কহিলেন, "আর বল কি? অতি ভয়ানক লোক! ত্রিবেণীতে সেদিন প্রথম যখন তাকে আমি কমলার কথা বলেছিলুম তখন সে কি রকম তাচ্ছিল্য দেখালে! কিন্তু তার পর যখন আমি তাকে কন্যা সম্প্রদানের ভার নিতে অনুরোধ করি এবং তার কোন প্রকার খরচ পত্র হবে না, শুধু সার্ব্বভৌম মহাশয়ের বাড়ী থেকে সম্প্রদানটা করে যাবে এই কথা বুঝিয়ে দিই তখনই ও কি মতলব এঁটেছিল! একথায় বলে উঠল 'কিন্তু জানেন তো আমাদের ঘরে মেয়ের বিয়ের আমরা কিছু প্রণামী পাই তা সেটা অবশ্য বিবেচনা করেছেন?' তার মানে উনি মেয়েটির অভিভাবকত্ব নিয়ে তাকে আমার কাছে বেচতে চান! স্পর্দ্ধা দেখ! আমার ভারি রাগ হয়ে গেল; বলে ফেল্লুম 'প্রণামী মনীশ তার মামাশ্বশুরকে যেমন পারবে দু দশ টাকা দেবে বই কি, কিন্তু মশায় আপনি যে প্রকার প্রণামীর প্রস্তাব করলেন কুলীন সন্তান এতে অপমানিত জ্ঞান করে'। তোমার সেই বিপদ আপদের মধ্যে আর এ সব কথা বলিনি। কথায় কথায় বেশ একটু বচসা হয়ে গেল। উনি বল্লেন 'তবে আমি এ বিবাহে পায়ের ধূলোও দেব না'। আমিও এতে উত্তর করি "আমরা তাতে বিন্দুমাত্র ক্ষতি বোধ করব না, ভক্তিনাথ কন্যা সম্প্রদান কর্‌বেন, আপনাকে একবার জানান আমার কর্ত্তব্য ছিল, চুকেছে।" কিন্তু এখন দেখছি আমাদের এ কর্ত্তব্যটা নিতান্ত অপাত্রেই পালন করতে যাওয়া হয়েছিল। আজ হঠাৎ মতলব এঁটে এসে সে উপস্থিত,—বলে আইন মতে আমার ভাগিনেয়ী আমার অধীন আমি তাকে এখনি নিয়ে যাব। সে পরের বাড়ী পড়ে থাকে এতে আমার অপমান হয়।"

"এত যদি তোর সম্মান জ্ঞান—এত দিন ঘুমুচ্ছিলি না মরেছিলি।"

"এখন উপায়?" করুণাময়ীর গলা বুজিয়া গিয়াছিল।

"উপায় ভগবানের দয়া, করালীচরণের সুমতি।"

শিবনারায়ণের হৃদয়ে সহানুভূতি-করুণার কিছুই অভাব ছিল না কিন্তু ইহার সহিত তাঁহার মধ্যে আরও একটা জিনিষ ছিল তাহা বিচারকের ন্যায় কঠোরতা। অত্যাচারীর প্রতি স্বাভাবিক ঘৃণায় তাঁহাকে সহজেই বিচলিত করিয়া তুলিত এবং এরূপ স্থলে তাহা ঘৃণা ক্রোধের মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক আত্ম প্রকাশ করিতেও সঙ্কোচ বোধ করিত না। এ তেজ অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, ইহা প্রকৃত ব্রহ্মতেজ—ভীরু অপরাধী ইহা কোন মতেই সহ্য করিতে পারে না। যাহার প্রকৃতিতে যাহা নাই সে সেই বস্তু সহিতে অক্ষম, তাই জগতে এত ভেদ সংসারে এত দলাদলি! সে দিন কালীচরণের নির্লজ্জ ব্যবহারে ক্ষুব্ধ শিবনারায়ণ ঘৃণার সহিত যখন তাহাকে প্রত্যাখান করেন তখন তাহার মধ্যে যে কতখানি তীব্রবিষ লোভের আকারে লুপ্ত রহিয়াছে তাহা তিনি ধারণাও করিতে পারেন নাই। নিজের মেয়েটিকে চল্লিশ বৎসর বয়সের একটি বাজার সরকারের হস্তে দিয়া সে চারি শত টাকামাত্র পাইয়াছে, শিবনারায়ণের মত লোকের কাছে সে সহস্রাধিক মুদ্রা আদায় না করিয়া কখনও ছাড়িতে পারে? গঞ্জিকা সেবনের আড্ডায় উপদেশকের অভাব নাই.

পুরলক্ষ্মী

মতলব ঠিক করিয়া আইন আদালত বুঝিয়া সে আজ এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

শিবনারায়ণের প্রথমকার পণ এখন অবস্থ বুঝিয়া আপনই শিথিল হইয়া আসিয়াছিল তথাপি যখন করুণাময়ী প্রস্তাব করিলেন "না হয় ও যা চায় তাই ওকে দিয়ে চুকিয়ে ফেল, কি আর হবে?"

তখনও তিনি সহসা এই বিগর্হিত উপায় অবলম্বনে স্বীকার পাইতে পারিতেছিলেন না, "কিছুতে না, ছোট লোকটকে প্রশ্রয় দিয়ে আমি মেয়ে বিক্রির সাহায্য করবো, বলো কি?" প্রথমটা উত্তেজিত কণ্ঠে এইরূপ বলিয়াই সহসা কমলার কথা স্মরণ করিয়া স্বর নামাইয়া লইলেন। "দেখা যাক্, ভক্তির সঙ্গে পরামর্শ করি, সকল অপমানই স্বীকার করতে হবে দেখচি।" বলিতে বলিতে চিন্তাযুক্তভাবে বাহিরের দিকে অগ্রসর হইলেন। কমলা সব কথাই শুনিতে পাইয়াছিল। সমস্ত পৃথিবী তাহার চক্ষের সম্মুখে সেই মুহূর্ত্তে ঘুরিয়া উঠিয়াছে, স্খলিত পদে সে দ্বারের কবাটে মস্তক রক্ষা করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল সেই একটা সম্ভাবনার কথায় তাহার সর্ব্ব শরীরে কাঁটা দিয়া উঠিয়াছিল—একি তাহার কাম্য ফল? কাল সে পরের সুখে ঈর্ষা করিয়া নিজেকে যে পরাশ্রিতা বোধ করিয়াছিল, আত্মীয় খুঁজিয়াছিল, তাই কি এখানকার আশ্রয় তাহার ফুরাইল? কিন্তু তুমি তো জানো অন্তর্য্যামি! তুমি তো সবারই প্রাণের লেখা গোপনে পাঠ করিতেছ, সে লেখার অক্ষর পড়িতে তোমার তো ভ্রম হওয়া সম্ভব নয়! সামান্য মুহূর্ত্তের সেই পাপ—তাহারই এত বড় কঠোর দণ্ড বিধান তুমি কি করিতে পার? সেই জ্বলন্ত চিতালোকে মনীশের মোহন মূর্ত্তি মুগ্ধা কমলার মানস পটে উজ্জ্বল আভায় ফুটিয়া উঠিল, সে নিজেকে সে মূর্ত্তির পদপ্রান্তে সঁপিয়া দিয়া অবরুদ্ধ-বাক্ হইয়া মনে মনে বলিল "আমি তোমার পায়ে স্থান চাই, কিছুই আর চাই না।"

করুণাময়ী নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতেই এবার সে আপনাকে সম্বরণ করিতে পারিল না, তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল, করুণাময়ী নিজে কাঁদিতেছিলেন, তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া নীরবে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

জাতি-বিরোধ

আমেরিকায় নিউইয়র্কের রচেষ্টার নগরে উদার ধর্ম্মমতবাদীদিগের কন্‌গ্রেসে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পঠিত প্রবন্ধের—শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী কৃত অনুবাদ।

জাতি-বিরোধের সমস্যা ইতিহাসে চিরদিনই বর্ত্তমান, প্রত্যেক মহা সভ্যতার মূল ভিত্তি। প্রাকৃতিক জগতে পঞ্চভূতের সংঘর্ষের ন্যায় ইহা জটিল সংমিশ্রন এবং উন্নতির ক্রমবিকাশের কারণ। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন আদর্শে পরিবর্দ্ধিত মানবজীবনের আঘাতে যে আদিম গতিবেগ জন্মলাভ করে তাহাই বিচিত্র মানবসমাজে পরিণত হয়।

প্রত্যেক সভ্যতাই বহুতরের জটিল সমাবেশ, বর্ব্বরতাই কেবলমাত্র আড়ম্বরবিহীন, পথপ্রান্তরচারী এবং অবিকৃত।

বিভিন্নতা মানিয়া লইতে হয় বলিয়াই তাহার হাত এড়াইবার উপায় নাই দেখিয়াই, এই বিচিত্র শক্তিসমূহের মধ্য হইতে মানব এক কেন্দ্রীভূত বন্ধন আবিষ্কার করিতে বাধ্য হয়। ইহাই যথার্থ সত্যের অনুসন্ধান, বহুর মধ্যে একের, ব্যক্তিগত জীবনের মধ্য দিয়া চিরন্তন এবং সনাতনের অন্বেষণ।

আরম্ভে এই চেষ্টার আকার স্বভাবতই সহজ এবং অপরিণত। এক সমাজবাসীদিগের সাধারণ ভক্তির নিদর্শন কোনও দৃশ্যবস্তু ভিন্ন আর কিছুই নয়—এই মূর্ত্তি অধিকাংশ সময়ই ভয়ানক এবং কুৎসিত। মানুষ যখন বহির্বস্তুর উপর জীবনআদর্শ নির্ভর করিতে দেয় তখন তাহা যতদূর সম্ভব সুস্পষ্ট এবং প্রচণ্ড হওয়া আবশ্যক। আদিম মানববুদ্ধি ভয়ের সম্মুখে সর্ব্বদা স্বতই অবনত।

কিন্তু সমাজ যেমন ক্রমশঃ যুদ্ধ বিগ্রহের কিম্বা অন্য উপায়ের দ্বারা বিস্তৃতি লাভ করে, যখন বিভিন্ন আদর্শের সংমিশ্রন ঘটে তখন একের পরিবর্ত্তে বহুদেবতার প্রতিষ্ঠা হয়। সে অবস্থায় পূর্ব্বতন চিহ্নমূর্ত্তি সকলের প্রতিপত্তি হ্রাস হইয়া যায় এবং তাহাদের স্থান এমন সকল ভাবপ্রধান প্রতিমার দ্বারা অধিকৃত হয়, যাহা সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ নয় যাহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সহিত যোগযুক্ত।

এইরূপে সমস্যা জটিল হইতে জটিলতর, ক্রমশঃ অধিকতর বিস্তৃত এবং গভীরতর হইয়া পড়ে এবং মানবের স্থায়ীত্ব-বুদ্ধি তাহার স্থাপনার জন্য দৃঢ়তর এবং সুস্পষ্ট বোধগম্য ক্ষেত্রের অনুসন্ধান করিতে থাকে। ইহাই ইতিহাসের উদ্দেশ্য—বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া ক্রমশঃ অভিবর্দ্ধিত বিশাল জীবন প্রসারের প্রবল প্রেরণায় বাধ্য হইয়া মানবের সত্য অন্বেষণ; এক সময় গিয়াছে যখন পরস্পরের সহিত পরিচয়ের পথ নিতান্ত সীমাবদ্ধ থাকায় বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মানবজাতি আপনাদিগের মধ্যেই আপনাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল তখন তাহাদের সামাজিক বিধি বিধান সকল বিশেষরূপে স্থানীয় ছিল। জাতীয়তা সাতিশয় সঙ্কীর্ণ, এবং বিদেশীর প্রতি আক্রোশ অত্যন্ত প্রবল ছিল। সদাসর্ব্বদা মেলামেশার অভাবে ভিন্ন দেশবাসী-দিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার সম্যক, তাহা শিক্ষা করিবার উপায় ছিল না। তাহাদিগের সহিত সংঘর্ষমাত্রেই প্রচণ্ড বিরোধের আশ্রয়গ্রহণ ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না। সুবিবেচিত কোন কাজই হইত না—হয় বিদেশীকে সম্পূর্ণ ধ্বংস কিম্বা তাহাকে আপনজাতির মধ্যে একান্ত অভিন্নভাবে মিলিত করিয়া লওয়া হইত। মানুষ এখনও এই জাতীয় এবং জাতিগত আত্মম্ভরিতার শিক্ষা অতিক্রম করিতে পারে নাই। তাহারা এখনও বহু যুগান্তের সেই বিদেশী বিরোধবুদ্ধি এবং তাঁহাদের প্রতি অবিশ্বাসের ভাব কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই—ইহা আরণ্য জীবের আদিম সংস্কারের ন্যায় দৃঢ়। আপন সমাজগণ্ডীর বাহিরে সামান্য কোনরূপ বিরক্তির কারণ হইবামাত্র এই গুপ্ত ভীষণ ভাব মুহূর্ত্তের মধ্যে ব্যক্ত হইয়া পড়ে। ভিন্ন জাতীয়কে বিচার করিবার মত কিম্বা তাহাদিগের সহিত

শোভন ব্যবহার করিবার মত পক্ষপাতশূন্য মনোভাব এখনও অর্জ্জন করিতে পারে নাই। যাহারা দূরে পড়িয়া আছে তাহাদিগকে ভালমত দেখিতে হইলে মনের দূরবীক্ষণ যন্ত্র যেভাবে ঠিক্ করিয়া লইতে হয় সে শিক্ষা এখনও হয় নাই। আপনাদিগের ধর্ম্ম এবং দর্শনের শ্রেষ্ঠতা ও মৌলিকতা প্রমাণ করিতে সকলেই ব্যগ্র, এবং সত্য যে সত্যরূপেই বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পরিচ্ছদে আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে সেকথা স্বীকার করিতে একান্ত অনিচ্ছুক। আন্তরিক ঐক্যের কথা সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়া বাহিরের অনৈক্যের কথাই তাঁহারা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতে ভালবাসেন।

এই মনোভাব গৃহসীমায় আবদ্ধ বহিঃ-সংস্পর্শহীন সঙ্কীর্ণ শিক্ষার ফল, ইহাদ্বারা আমরা বিশ্বে প্রজাসম্মানের অযোগ্য হই। কিন্তু এমন মনোভাব লইয়া অধিক দিন সংসার চলে না, বিজ্ঞান এবং বাণিজ্যের প্রসার দ্বারা ভিন্ন জাতীর মানবমণ্ডলী ক্রমশ সন্নিকট হইতেছে, তাহাদিগকে জীবনইতিহাসের প্রধানতম সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে সেই সমস্যা জাতিগত বিরোধ ভাব।

অভিজ্ঞতার দ্বারা, মানবইতিহাসের বিস্তারের মধ্যদিয়া মীমাংসিত হইবার জন্য এই সমস্যা প্রতীক্ষা করিয়া আছে। ইহা কেবলমাত্র বুদ্ধি বিচার কিম্বা অনুভূতির বস্তু নয়। ইহার পূর্ব্বেও ধর্ম্মপ্রাণ প্রচারকগণ মানবের সমানসম্মান পদবী সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন—দর্শন ও সাহিত্য ত জাতিগত পুরাণ কথা এবং অভ্যাসের সীমা অতিক্রম করিয়া এই সত্যের উদার অস্তিত্ব প্রকাশ করিতে ত্রুটি করে নাই। কিন্তু এই জাতি-বিরোধ সমস্যা এমন দুরূহ জটিলতার সহিত আমাদের সম্মুখে আর কখনো প্রত্যক্ষ হয় নাই ইহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আমরা আর কখনো বসবাস করি নাই। বিশ্বমানবসমাজ এতদিন শিশু বালিকার পুতুলখেলার মত এই বিশ্ব মৈত্রীর ভাবটি লইয়া খেলা করিয়াছে মাত্র। মানবহৃদয়নিহিত সত্য অনুভূতির আভাষ দিয়াছে মাত্র, কিন্তু ইহাকে জীবন্ত করিয়া তুলিতে সক্ষম হয় নাই। খেলার সময় আর নাই—ভাবে যাহা অপরিণত অবস্থায় ছিল, আজ তাহা জীবনের অসংখ্য অনন্ত দায়ীত্ব বহন করিয়া সুব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

সকল প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে ভারতবর্ষীয় সভ্যতা বহুকাল এই জাতিসমস্যা সুগভীররূপে পরীক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছে এবং যুগযুগান্তর ধরিয়া জাতীয় বিভিন্নতার দুরূহ জটিলতাজাল ভেদ করিয়া তাহাকে সরল করিয়া আনিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা চলিতেছে। ভাগ্যবশতঃ ইউরোপকে এই জাতি বিরোধের বেগ তেমন সহ্য করিতে হয় নাই, কেন না তাহার প্রতিবাসীগণ প্রায়শঃই এক বংশসম্ভূত, যদিও জাতি শত্রুতার হাত এড়াইতে পারে নাই তবু আকার ও বর্ণগত বৈসাদৃশ্যের জন্য যে বিরূপ মনোভাবের স্বতঃই সৃষ্টি হয়, তাহাকে সে সহজ বিপত্তি ভোগ করিতে হয় নাই। ইংলণ্ডে নর্ম্মাণ ও স্যাক্সনদিগের সম্মিলন সাধন হইতে অধিক কাল লাগে নাই। কেবল বর্ণ ও আকৃতি গত সৌসাদৃশ্য কেন বলি, ভাবের ও জীবনের আদর্শেও পাশ্চাত্য বিভিন্ন জাতির এমন ঐক্য

আছে যে, তাহারা সকলে একত্রে মিলিয়াই যেন তাহাদের সভ্যতা গড়িয়া তুলিতেছে।

ভারতবর্ষে কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবই দেখা গিয়াছে। গৌরবর্ণ আর্য্যগণ যখন প্রথম এ দেশে পদার্পণ করেন তখন হইতেই তাঁহাদিগকে কৃষ্ণবর্ণ হীনবুদ্ধি আদিম বর্ব্বর জাতির সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। ইহার পরে দ্রাবিড়দিগের বিভিন্ন সভ্যতা, ধর্ম্ম,পূজা প্রণালী ও সামাজিক আচার ব্যবহার অসভ্য জাতির নিরঙ্কুশ বর্ব্বরতা অপেক্ষা একীকরণের পথে অধিকতর অন্তরায় হইয়াছিল।

শীতপ্রধান দেশের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জীবন যাত্রা তেমন কঠিন ও আয়াসসাধ্য নয়। জীবন রক্ষার জন্য বহুল আয়োজনের প্রয়োজন নাই:—প্রকৃতি মুক্তহস্ত, অন্নসত্র অবারিত, কাজেই বিরূপ পক্ষের শত্রুতা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। তাই কিছু কালব্যাপী ভীষণ যুদ্ধ বিগ্রহের পর ভিন্ন বর্ণ ভিন্ন-ধর্ম্ম বিভিন্ন আকার বিভিন্ন-মনা জাতি সকল ভারতবর্ষে নির্ব্বিরোধে বসবাস করিয়া আসিয়াছে। তবে মানুষ তো আর জড় পদার্থ নয়, জীবন্ত প্রাণবন্ত তাই এই ভিন্ন শক্তি সমূহের ঐকান্তিক নৈকট্য এখানে একাল পর্য্যন্ত কেবলি সমস্যার সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। এ অবস্থার যতই অসুবিধা থাকুক না তবুও ইহা ছিল বলিয়াই ভারতবর্ষীয়দিগের মন বৈচিত্র্যের মধ্যে কেবলি ঐক্য অন্বেষণ করিয়াছে। মূর্ত্তি, প্রতিমা, নিদর্শন আচার অনুষ্ঠান যতই বিভিন্ন হইকনা কেন এই সকল যে, একমাত্র একের পরিকল্পনা, যিনি অদ্বিতীয় তুলনা রহিত তাঁহাকে যথার্থ ধারণা করিতে হইলে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক অণু পরমাণুর, প্রতি প্রাণশক্তি মধ্যে তাঁহার অখণ্ড ঐক্য সুস্পষ্ট অনুভব করিতেই হইবে।

ভিন্নতা যখন বড়ই পীড়াদায়ক মানুষ তখন তাহাকেই চরম মীমাংসা বলিয়া মানিয়া লইতে চায় না—তাই কখনো রক্ত প্রবাহে তাহা লুপ্ত, বলের দ্বারা তাহাতে এক প্রকার অগভীর বাহিরের সাম্য বিস্তার কিম্বা বহু সাধনায় অন্তরের সুগভীর ঐক্য আবিষ্কার করিয়া লয়—কেন না তাহার মন জানে তাহাই একমাত্র পরম সত্য।

ভারতবর্ষ চির দিন শেষ চেষ্টাই করিয়া আসিয়াছে—যুগযুগান্তের রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনে আন্দোলিত বিক্ষিপ্ত হইয়া গ্রীস এবং রোম যখন তাহার প্রাণশক্তি পরিশ্রান্ত এবং ক্ষীণ করিয়া ফেলিয়াছিল তখনও ভারতবর্ষ আপন আধ্যাত্মিক জীবন বল, আত্মার আত্মসম্মান ভ্রষ্ট হয় নাই। বরং নূতন শক্তি যোগে, নবীন জটিলতার তাড়নায়, পৃথিবীর সকল শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মই ভারতবর্ষের বক্ষভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। বিপুল অসামঞ্জস্য মধ্যে সাম্য বিধান করিবার নিয়ত চেষ্টা বর্ত্তমান থাকায় কালে কালে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ আদর্শের প্রসার এবং সঙ্কোচ ঘটিয়াছে। বিরোধ-আঘাত এবং প্রলয়ের হাত বাঁচাইবার জন্যই সর্ব্বশেষে জাতিভেদ প্রথার দৃঢ় কঠোর প্রাচীর নির্ম্মিত হয়।

কিন্তু এমন পরিবর্জ্জন কিম্বা অস্বীকারের ভাব বহুকাল স্থায়ী হইতে পারে না, যন্ত্রের দ্বারা মানবসমাজের জীবন্ত মানব প্রাণ নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব নহে। ঘটনাচক্রে যদি সকল মানব একত্র সম্মিলিত হয় যাহাদের জাতীয় ইতিহাস ভিন্ন, বংশের আদর্শ এক নয় তবে

যতকাল পর্য্যন্ত তাহারা মিলনের এক উদার ভিত্তি আবিষ্কার করিতে না পারে যতদিন তাহাদের বন্ধনের মূলে প্রেমের রস সঞ্চার অনুভব করিতে না পারে ততদিন শান্তি লাভ করিতে পারে না। আমি নিশ্চয় জানি ভারতবর্ষে আজিও সেই আধ্যাত্মিক আদর্শ এখনও বর্ত্তমান—তাহার অস্তিত্ব সুপ্ত প্রায় সন্দেহ নাই, তবুও এই আদর্শ বাহ্য বিভিন্নতা সহ্য করিয়াও অন্তরের ঐক্যের পরিচয় লইতে জানে। আমি একান্তভাবে অনুভব করিতেছি বহু প্রাচীন জ্ঞান ও প্রেমে নির্ম্মিত সেই সোনার চাবি ভারতবর্ষের অধিকারেই আছে একদিন তাহারি সাহায্যে বহু যুগান্তের অবরুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত হইবে, আনন্দের অবারিত প্রাঙ্গণে বিচ্ছিন্ন দূরান্তরবাসী মানবভ্রাতাগণ সম্মিলিত হইয়া প্রীতির মহোৎসবে যোগদান করিবেন।

সে কোন সুদূর যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় প্রত্যেক মহাপ্রাণ ইহারি জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। বুদ্ধ অমিতাভ যে মহা বিশ্বপ্রেমের অনুশাসন প্রচার করিয়াছিলেন তাহার মূলমন্ত্র তাঁহার পূর্ব্বতন যুগের ধারণা, বিচিত্র চিহ্ন সকল, বিবিধ অনুষ্ঠান ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য দূরীকৃত করিয়া সকলের অন্তর নিহিত একান্ত ঐক্যের আবিষ্কার চেষ্টা।

মুসলমান শক্তির আগমনের সঙ্গে সঙ্গে দেশে কেবল নূতন রাজনৈতিক অস্তিত্বের অবতারণা হইল না, নূতন ধর্ম্ম চিন্তা নূতন সামাজিক অনুষ্ঠানের প্রবল আঘাতে দেশবাসীকে একান্ত কাতর ও চঞ্চল করিয়া তুলিল। তবুও ইহার বলে হিন্দুদিগের মধ্যে কোন বিরোধী ধর্ম্মোন্মত্ততার সৃষ্টি হয় নাই বরং এই সময়ে যে সকল ধর্ম্মপ্রচারক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সকলেই পুরাতনের সহিত নূতনের সাম্য স্থাপনের চেষ্টা করেন। বহুযুগের সঞ্চিত জ্ঞান ও উদারপ্রাণতার জন্যই এমন চেষ্টা সম্ভব হইয়াছিল। প্রত্যেক নব ধর্ম্মই জাতিভেদ, ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিভিন্নতা ভুলিয়া প্রত্যেক কৃত্রিম বাধা অপসারিত করিয়া দেশবাসীকে ঈশ্বরের প্রেমে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হইবার জন্য বারম্বার আহ্বান করিয়াছিল। ভারতবর্ষ আবার যখন ইংরাজ আগমনের ফলে খৃষ্টীয় সভ্যতার নিকটবর্ত্তী হইল তখনও এই ঐক্য-চেষ্টা দেখা দিয়াছিল। প্রাচ্য প্রতীচ্যের মধ্যে আধ্যাত্মিক মিলনসাধন করাই ব্রাহ্মসমাজজীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য এবং গতিবেগ। এই সম্মিলন উপনিষদের উদার আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উপরই প্রতিষ্ঠিত, জাতিভেদের প্রত্যেক কৃত্রিম বাধা দূর করিয়া আবার ঈশ্বরের নামে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে সম্বদ্ধ হইবার আহ্বান আসিয়াছে। পৃথিবীর আর কোনও দেশে ভারতবর্ষের মত এমন বহুবিধ জাতি এমন সম্পূর্ণ বিভিন্ন নিয়ম অনুষ্ঠানের সমাবেশ আর দেখা যায় না। কাজেই তাহার পক্ষে জাতীয় ঐক্যে সকল সমস্যার মীমাংসা করিয়া লওয়া সহজ কিম্বা সম্ভব হয় নাই। জাতীয়ত্বের দোহাই দিয়া এতগুলি বিরোধী ভাবকে শান্ত ও সম্মিলিত করিবার শক্তি তাহার নাই, মানবের শ্রেষ্ঠতম শক্তি ধর্ম্মবলের সাহায্যে, ঈশ্বরের চরণে প্রণতি করিয়াই তাহাকে এ কার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে!

ভারতবর্ষে বহুকাল ধরিয়া সমাজে জাতিভেদের কঠোর নির্ব্বাসন প্রথার বিরুদ্ধে মানবের আধ্যাত্মিক বুদ্ধির সাম্য প্রচার করিয়া আসিয়াছে। অন্যান্য দেশের মত এখানেও

যখন সামাজিক নিয়ম জাতি-গর্ব্বিতের পক্ষ গ্রহণ করিয়াছে তেমনি মহৎ-প্রাণ সকল শ্রেষ্ঠতর বুদ্ধি এবং গভীরতর জ্ঞানের সহায়ে চিরদিনই মানব ভ্রাতার সমান ন্যায্য অধিকার এবং প্রেমের দাবী প্রচার করিয়া আসিয়াছেন, একদিকে যেমন বিভিন্ন জাতির একত্র পান-ভোজনের নিষেধ প্রচারিত হইয়াছে অন্য-দিকে তেমনি ঋষিদিগের পুণ্য কণ্ঠ যুগযুগান্তর ধরিয়া আদেশ করিয়া আসিয়াছেন, আপনাকে সম্যক্ জানিতে হইলে, সকলের মধ্যে আপনাকে আবিষ্কার করিতে পারিলেই তাহা সম্ভব হইবে। এই আধ্যাত্মিক শক্তি ক্রমে প্রবল প্রেরণার আগ্রহে সকল বাধা অপসারিত করিয়া জয়ী হইবে, ইহাই সমাজের প্রত্যেক অঙ্গকে এমন ভাবে গঠিত করিয়া তুলিবে যে আজ যাহা বাধা স্বরূপ তাহাই একদিন সাক্ষাৎ সহায় হইবে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ মাত্র নাই।

ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের এই দৃষ্টান্ত আপনাদের সম্মুখীন করিবার আমার উদ্দেশ্য এই যে, সমস্যা যেমনই হউক না কেন তাহা যতক্ষণ জীবন্ত জাজ্বল্যরূপে আমাদের নিকট প্রকাশ না হয় ততদিন তাহা পূরণ হওয়া সম্ভব নয়। বর্ত্তমান যুগে এই জাতি-বিরোধসমস্যা সেই জীবনের আবেগে অনুপ্রাণিত! দেশের দ্বারা ইতিহাসের দ্বারা বিচ্ছিন্ন, বিভিন্ন বিবিধ জাতি, যাহাদের চিন্তার গতি এক নয়, যাহাদের প্রকাশের উপায় স্বতন্ত্র ঘটনা চক্রে ঘনিষ্ঠভাবে একত্রে বসবাস করিতে বাধ্য হইতেছে। প্রত্যেক মানবের নিকট বিশ্বমানবের অস্তিত্ব আজ যে বিশালতা ধারণ করিয়াছে পূর্ব্বে তাহা কেহ কখনো স্বপ্নেও ধারণ করিতে পারিত না। তবে আমরা যে এখনও এই অভিনব অবস্থার জন্য প্রস্তুত নহি প্রতিদিনই নানা দুঃখজনক ব্যাপারে তাহা অভিব্যক্ত হইতেছে। জাতিগত অহমিকা দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে! প্রতীচ্যবাসীগণ সগর্ব্বে পৃথিবীর অন্য সকল জাতিকে, নির্ব্বাসিত করিবার জন্য উৎসুক। দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য তাহাদের আক্রমণ করিতে ব্যগ্র, কিন্তু আপনাদিগের গৃহদ্বারে অপরের প্রবেশ-অধিকার রোধ করিবার জন্য নিয়ত বর্ব্বর এবং নিষ্ঠুরভাবে সচেষ্ট। এমন কি বিশ্ববিখ্যাত কাব্যকারগণও দয়াধর্ম্মের সাধনা তুচ্ছ ও হীন বলিয়া উপেক্ষা করিয়া পাশববলের মহিমা প্রচার করিতে ব্যস্ত। যুগান্তের জড়তা হইতে জাগরিত জাতিগণ যখন সাহসে নির্ভর করিয়া, উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার জন্য দণ্ডায়মান তখন তাহাদের গতিপথে বাধার সৃষ্টি করিয়া পাশ্চাত্যগণ আপনাদিগের স্বার্থ সাধন করিতেই উৎসাহযুক্ত। পুরাতনের ধ্বংস এবং নূতনের জন্মকালে বিশৃঙ্খলার সুযোগে আপন আপন ক্ষুদ্র লাভের চেষ্টায় প্রমত্ত! যদিও বাধা বহু এবং সুকঠিন তবুও দ্বিধাহীনচিত্তে বলিব সমস্যা-পূরণের সময় সমুপস্থিত। সভ্য জগত আজ যে এই জাতি-বিরোধ সমস্যার দ্বারা আক্রান্ত তাহা সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। মানব যে মানবের হৃদয়ে সহানুভূতির ক্ষেত্রে নূতন জন্মলাভ করিয়াছে ইহাই বর্ত্তমানযুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরব।

আজিও তাহার বিশ্রামের জন্য সুকোমল শৈশবশয্যা রচিত হয় নাই, দারিদ্র্যের পীড়নেই

তাহার তরুণ বাল্য বাধাপ্রাপ্ত—ঐশ্বর্য্য ও পদগর্ব্বিতের দ্বারা উপেক্ষিত হইয়া পথপ্রান্তে আবর্জ্জনার মধ্যে তাহার জীবন অতিবাহিত হইতেছে। কিন্তু তাহার গৌরবের দিন, তাহার শুভ অভিষেকের কাল সুদূর নয়। এই উপেক্ষিত রাজতনয় তাঁহার কবি তাঁহার প্রচারক এবং দীন উপাসকবর্গের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছেন তাঁহাদের আসিতে আর বড় বিলম্ব নাই। যখন বিশ্বমানবের কাতর আহ্বান বারম্বার ধ্বনিত হইবে তখন মানবের শ্রেষ্ঠপ্রকৃতি কখনই বধির হইয়া থাকিতে পারিবে না। ক্ষমতার উন্মাদ-তাণ্ডবে মত্ত হইয়া জাতীয় গর্ব্বের অন্ধপ্ররোচনায় যে প্রলাপই ধ্বনিত হউক না কেন, তবুও সহসা একদিন চমকিত হইয়া বুঝিতেই হইবে, আপনার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মবুদ্ধি ধ্বংস করার মত ভয়ানক আত্মহত্যা আর কিছুই নাই। যখন বিধিবদ্ধ জাতীয় স্বার্থ, বিজাতি-বিরোধ, বাণিজ্যলোভের হীনতা, তাহাদের নগ্ন কদর্য্যতা অবারিত করিয়া দিবে তখনি মানব বুঝিতে পারিবে বাণিজ্য-বিস্তারে রাজনৈতিক দৃঢ়তায়, সামাজিক কোন যন্ত্রবৎ সংস্কারের দ্বারা মুক্তির পথ উন্মুক্ত হয় না! জীবনের গভীরতর সৌন্দর্য্য বিকাশে, প্রেমে, আত্মার স্বাধীনতায় ঈশ্বর সম্বন্ধে জাগ্রৎ অনুভূতিলাভের দ্বারাই সেই পরম সৌভাগ্যলাভ হয়।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

সূর্য্যের তাপ

সূর্য্য হইতে যে তাপ চতুর্দ্দিকে বাহির হইতেছে তাহার অতি অল্পমাত্রই আমাদের পৃথিবীতে আসিয়া পৌঁছায় ও তাহারই জোরে আমাদের পৃথিবীর সমস্ত কার্য্য চলিতেছে। উহারই জোরে আমি আজ বসিয়া লিখিতেছি, আপনি আফিস যাইতেছেন, সমুদ্রে জাহাজ চলিতেছে ও আমার সামনে ঐ গাছের উপর বসিয়া পাখী ডাকিতেছে। ইহারই জন্য কলিকাতায়—

"বনেদি বাবুর বাড়ী টোটাবাতী জ্বলে
গ্যাস লাইটে ফাইন আলো আধুনী মহলে"

অবশ্য আজকাল গ্যাস লাইটের পরিবর্ত্তে বৈদ্যুতিক আলো হইয়াছে, তাহাও ঐ তাপ টুকুর জোরে। কথাটা কতকটা হেঁয়ালীর মত শুনায়। কিন্তু তা হইলেও খুব সত্য। মনে করুন ঐ বৈদ্যুতিক আলো, উহার ঐ যে আলোরূপ শক্তিটুকু আসিতেছে কোথা হইতে? কেন! এঞ্জিন ঘরে ডায়নামো (Dynomo) ঘুরিতেছে, সেইখানে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে। বেশ, ডায়নামো ঘুরাইতেছে কে? ষ্টীম এঞ্জিন। ষ্টীম এঞ্জিন চলিতেছে কিসের জোরে? বাষ্পের জোরে। জল হইতে বাষ্প কিরূপে হইতেছে? কেন কয়লা পোড়াইয়া তাহা হইতে যে তাপ উৎপন্ন হইতেছে তাহা দ্বারা। বেশ, তা হইলে ফলে দাঁড়াইল, কয়লার জোরেই আমার বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিতেছে। কয়লার মধ্যে যে দাহিকা শক্তি প্রচ্ছন্ন ভাবে ছিল সেইটাকে আমি নানা উপায়ে পরিবর্ত্তন করিয়া বৈদ্যুতিক শক্তি করিয়া কাজে লাগাইতেছি—শক্তির

ক্ষয় নাই। কিন্তু পণ্ডিতেরা বলেন যে, কয়লার ঐ যে দাহিকা শক্তি উহা সূর্য্য হইতে প্রাপ্ত। কয়লা কাঠেরই রূপান্তর মাত্র। অনেক পূর্ব্বে পৃথিবীর বড় বড় অরণ্য কোনও রূপে মাটি চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। মাটি চাপা পড়িবার পর কাঠগুলা ঐরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। গাছগাছড়া, তরু বৃক্ষ, অরণ্য যাহাই বলুন সূর্য্যালোক ভিন্ন কিছুই জন্মিতে পারে না। গাছের পাতায় ক্লোরোফিল (Chlorophyll) বলিয়া একটা জিনিষ সূর্য্যালোকের সাহায্যে চতুর্দ্দিকের অঙ্গারাম্ল বায়ু হইতে অঙ্গারকে ভিন্ন করিয়া গাছের খোরাক যোগায়। সূর্য্যালোক না থাকিলে একা ক্লোরোফিল কিছু করিতে পারে না। সুতরাং সূর্য্য না থাকিলে উদ্ভিদ বৃদ্ধি পাইত না।

এ হেন যে সূর্য্য যাহার তাপ হইতে আমরা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছি, তাহার তাপের ভাণ্ডার যে অ-ফুরন্ত তাহা মনে করিবার কোনও কারণ নাই। সূর্য্য অপব্যয়ী সন্তানের মত অনবরত নিজের তাপ চতুর্দ্দিকে বিলাইয়া দিতেছে অথচ দৃশ্যতঃ তাহার তাপের কোন হ্রাস হইতেছে না—ইহা একটা সমস্যা বটে। একটা বড় লোহার গোলা ও একটা ছোট লোহার গোলা, দুইটাকে যদি সমান উত্তপ্ত করা যায় তা হইলে বড় গোলকটা ঠাণ্ডা হইবার পূর্ব্বেই ছোটটা ঠাণ্ডা হইয়া পড়িবে। গোলকটা যত বড় হইবে তাহার ঠাণ্ডা হইতে তত দেরী লাগিবে। গ্রহগণের উৎপত্তি সূর্য্য হইতে, সূর্য্য গ্রহগণ অপেক্ষা অনেক বড়, সুতরাং এরূপ হওয়া সম্ভব যে গ্রহগণ শীতল হইয়া পড়িয়াছে অথচ সূর্য্যটা এতদপেক্ষা অনেক বৃহৎ বলিয়া এত আস্তে আস্তে শীতল হইতেছে যে আমরা তাহার কোনও সন্ধান পাইতেছি না। কিন্তু সন্ধান পাইতেছি না দুই এক বৎসরের মধ্যে! সূর্য্যের মত অত বড় বস্তুটাও যদি অনবরত তাপ বিকিরণ করিতে থাকে তা হইলে ৫০ বৎসর কি ১০০ বৎসরে যতটা শীতল হইবে তাহা মানবের চক্ষু এড়াইতে পারিবে না ও তাহার প্রভাব পৃথিবীতে লক্ষিত হইবে।

তবে এরূপ হইতে পারে যে সূর্য্যেতে এমন কোনও ইন্ধন আছে যাহা অনবরত পুড়িতেছে বলিয়া তাপ হইতেছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে সমস্ত সূর্য্যটার কলেবর যদি কয়লার হয় এবং সেই কয়লা যদি শুদ্ধ অক্সিজেনে জ্বলিতে থাকে তা হইলে সূর্য্য ৬০০০ বৎসর তাপ প্রদান করিতে পারে। কিন্তু চারি সহস্র পূর্ব্বে মিসরের পিরামিড প্রস্তুতকারকেরা এখনকার চেয়ে সূর্য্যের নিকট হইতে যে বেশী তাপ পাইত তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বাহির হইতে সূর্য্যের তাপ পাওয়ার আর একটি উপায় আছে। সেটি উল্কাপাত। আকাশে একঝাঁক ছোট বড় দু'দশ সের হইতে দু'দশ মন পর্য্যন্ত নানা আকারের জড়পিণ্ড সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই ঝাঁকটা অতি প্রকাণ্ড। পৃথিবী প্রতি বৎসরেই এই ঝাঁকের মধ্যে একবার করিয়া প্রবেশ করে। সে সময়ে আমরা পৃথিবীতে তারাখসা ব্যাপার দেখি। এই উল্কাগুলা পৃথিবীর আকর্ষণে আবদ্ধ হইয়া প্রচণ্ডবেগে পৃথিবীর দিকে ছুটিয়া আসে ও সেই সময়ে বায়ুস্তরের সহিত ঘর্ষণে উত্তপ্ত

হইয়া জ্বলিয়া উঠে। পৃথিবীতে যেরূপ হয় সূর্য্যেও সেইরূপ অনবরত উল্কাপাত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, সূর্য্যের বায়ুস্তরের সহিত ঘর্ষণে এই উল্কাগুলা এত উত্তপ্ত হয় যে সেই উত্তাপই সূর্য্যের জীবনী শক্তি। সূক্ষ্ম গণিতের হিসাবে বলা যাইতে পারে যে সূর্য্যে সম্বৎসরে কি পরিণাম উল্কাপাত হইলে তাহার তাপ অক্ষুণ্ণ থাকে। মনে করুন্ আমাদের চাঁদকে (ইহার ব্যাস ২০০০ মাইল) গুঁড়া করিয়া, সেই চন্দ্রচূর্ণ দ্বারা অসংখ্য উল্কাপিণ্ড প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই উল্কাগুলাকে যদি এক সঙ্গে সূর্য্যের পৃষ্ঠে পড়িতে দেওয়া যায় তাহা হইলে ইহারা সূর্য্যকে এক বৎসরের তাপ যোগাইতে পারে। আমাদের পৃথিবীচূর্ণ দ্বারা ১০০ বৎসরের কাজ চলিবে। বৃহস্পতি যদি এইরূপে গুঁড়া হইয়া সূর্য্যের ঘাড়ে পড়ে তা হইলে এত তাপ উৎপন্ন হইবে যে তাহাতে সমস্ত সৌরজগৎ পুড়িয়া যাইবে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সমস্ত সৌরজগতের গ্রহগুলা ঐরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া সূর্য্যে পড়িলে, ৪৫০০ বৎসর সূর্য্যের আজকালকার ন্যায় তাপ যোগাইবার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকে।

যাহা হউক এরূপে সূর্য্যের তাপ যোগান সম্ভব নহে কারণ তাহা হইলে এই উল্কা-গুলিতে সূর্য্যের ওজন এত বাড়িয় যাইবে যে, তাহার টানাটানিতে সূর্য্যের নিকটতম গ্রহ বুধের গতি বিপর্য্যয় হইবার সম্ভাবনা খুব বেশী। সেরূপ ধরণের গতিবিপর্য্যয়ের কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

আধুনিক গণিত সূর্য্যের তাপের ভাণ্ডার অক্ষুণ্ণ হইবার আর একটা কারণ দেখায়। একটা টেলিস্কোপ লইয়া আকাশের দিকে দেখিলে দেখা যায় যে, আকাশের খানিক খানিক স্থান জুড়িয়া বিশাল বাষ্পরাশি রহিয়াছে! এই বাষ্পরাশি ধীরে ধীরে চারিদিকে তাপ বিকিরণ করিতেছে ও সঙ্কুচিত হইতেছে। কিন্তু তাপ বিকিরণ করিতেছে বলিয়াই যে শীতল হইবে, ইহার উত্তাপ কমিয়া যাইবে, তাহা নহে। কমিবে ত নাই বরং সময়ে সময়ে ইহার উত্তাপ বৃদ্ধি পায়। কথাটা হেঁয়ালীর মত শুনাইল, কিন্তু হেঁয়ালী হইলেও ইহা সত্য। গণিত ইহার স্বপক্ষেই সাক্ষ্য দেয়—যে এরূপ বাষ্পরাশি তাপ বিকিরণ করিতে থাকিলে ইহার উত্তাপ বাড়িতে থাকিবে।

এই আশ্চর্য্য ব্যাপারটা কিরূপে হয় তাহা একটু আলোচনা করা যাউক। গণিতের সাহায্য ভিন্ন এ সমস্ত বিষয় বোঝান যদিও কঠিন, তথাপি চেষ্টা করা যাউক। প্রথমতঃ জড়ের স্বধর্ম্ম মাধ্যাকর্ষণ ঐ বাষ্প গোলকের উপরিভাগের কিয়দংশ বাষ্পটুকুকে গোলকের কেন্দ্রের দিকে টানিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও যখন ঐ বাষ্পটুকু তাহার স্থানচ্যুত হইতেছে না তখন বুঝিতে হইবে যে আর একটা কোনও শক্তি মাধ্যাকর্ষণের বিরুদ্ধে কাজ করিয়া বাষ্পটুকুকে তাহার স্বস্থানে রাখিয়াছে। এই শক্তিটি হইতেছে বাষ্পের সম্প্রসারণী শক্তি বা Expansibility। বাষ্পের তাপের দরুণ ইহার অণুগুলা ছুটাছুটি করিতেছে পরস্পরের সহিত ধাক্কা খাইতেছে ও লাফাইয়া আসিতেছে। যদি মাধ্যাকর্ষণ কিম্বা বাষ্পকে ধরিয়া রাখিবার কোনও পাত্র না থাকে তা হইলে বাষ্পের অণুগুলি ছুটাছুটি

করিতে করিতে সমস্ত বিশ্বময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে। যদি বাষ্পে বেশী তাপ প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে অণুগুলির ছুটাছুটি আরও বাড়িয়া যায়—কাজে কাজেই ইহার সম্প্রসারণী শক্তি বা ফুলিয়া উঠিবার চেষ্টা আরও বাড়িয়া যায় এবং বাষ্পটুকুর আয়তন বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে শৈত্য প্রয়োগ করিলে অণুগুলার ছুটাছুটি কমিবে ও আয়তনও কমিয়া যাইবে। বেশ, তাহা হইলে দাঁড়াইল এই—খানিকটা বাষ্পের মধ্যে দুইটা শক্তি কাজ করিতেছে—একটা জড়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম মাধ্যাকর্ষণ, আর একটা অত্যধিক তাপের ফল, বাষ্পের স্বধর্ম্ম সম্প্রসারণী শক্তি। মাধ্যাকর্ষণ—না থাকিলে বাষ্পটা বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িত আর সম্প্রসারণী শক্তি না থাকিলে মাধ্যাকর্ষণের জন্য অণুগুলা পরস্পরের ঘাড়ে গিয়া পড়িত এবং বাষ্পটা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কঠিন আকার ধারণ করিত। দুইটা শক্তি মিলিয়া আপোষে নিযুক্ত হইয়া বাষ্পটাকে একটা মাঝামাঝি রকম আয়তন প্রদান করিয়াছে।

এখন যদি বাষ্পটা তাপ বিকিরণ করিতে থাকে তা হইলে তাহার তাপরূপ খানিকটা শক্তি চলিয়া যাইবে। বাষ্পটা সঙ্কুচিত হইবে, বাষ্পের অণুগুলা কাছাকাছি আসিবে, ঠোকাঠুকি বৃদ্ধি পাইবে—অণুগুলা মাধ্যাকর্ষণ ঠেলিয়া যে পরস্পর হইতে কতকটা দূরে ছিল তাহাদের সেই প্রচ্ছন্ন শক্তি তাপরূপে প্রকাশ পাইবে। সুতরাং বাষ্পটা গরম হইয়া উঠিবে। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট বুঝা যাইবে। মনে করুন দুইটা ছোট, গরম ধাতু-গোলক আছে। গোলক দুটার মধ্যে তাপরূপ একটা শক্তি আছে। আবার মনে করুন ঐ গরম গোলকদুটা একটা রবারের সূতা দিয়া বেশ টান ভাবে পরস্পরের সহিত বাঁধা আছে। এখানে গোলকদুইটার দুই রকম শক্তি আছে। একটা তাপ আর একটা—রবারে সূতা দিয়া টান ভাবে বাঁধার দরুণ তাহাদের অবস্থা। এই ভাবে থাকিলে গোলক দুইটা ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে, কিন্তু ঠাণ্ডা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি গোলকদুটাকে ছাড়িয়া দেওয়া যায় তা হইলে দুইটা পরস্পরের দিকে ছুটিয়া আসিয়া ঠোকাঠুকি করিয়া গরম হইয়া উঠিবে। সূতার টান যদি বেশী থাকে তা হইলে, চাই কি যেটুকু তাপ বিকিরিত হইয়াছিল সেটুকু যোগাইয়া পূর্ব্বের চাইতে উত্তপ্ত হইয়া উঠিতে পারে। তা হইলে দেখা যাইতেছে যে গোলকদুইটা যদিও তাপ বিকিরণ করিতেছে তথাপি পরস্পরের কাছে আসার দরুণ গরম হইয়া উঠিতেছে।

বাষ্পের বেলাও ঠিক এইরূপ হয়। বাষ্পের অণুগুলার মধ্যে রবারের সূতার বদলে মাধ্যাকর্ষণ আছে। সূতা বাঁধা গোলকদুইটাকে টানিয়া পৃথক করিবার সময় কতকটা শক্তি ব্যয় করিতে হইয়াছিল। সেটা গোলকেই বলুন, আর সূতাতেই বলুন, এক জায়গায় সঞ্চিত ছিল। ছাড়িয়া দিবামাত্র সেই শক্তিটুকু তাপরূপে প্রকাশ পাইল। এখানেও বাষ্পের অণুগুলাকে মাধ্যাকর্ষণ ঠেলিয়া পৃথক করিবার জন্য যে শক্তি—কত যুগযুগান্তর পূর্ব্বে ব্যয়িত হইয়াছিল, এবং কিরূপে হইয়াছিল কেহ জানে না—সেই শক্তি উহার মধ্যে সঞ্চিত ছিল।

সঙ্কুচিত হইবামাত্র অর্থাৎ অণুগুলির পরস্পরের দূরত্ব কমিবামাত্র সেই শক্তিটা তাপরূপে প্রকাশ পাইল। সুতরাং বাষ্পের শক্তিভাণ্ডারের একটা দিক হইতে তাপ বিকিরিত হইতেছে বটে কিন্তু আর একটা দিক তাপ যোগাইতেছে। ফলে বাষ্পগোলকটা শীতল না হইয়া অনবরত গরম হইতে থাকে।

অবশ্য তা বলিয়া এরূপ হইবে না যে ঐ বাষ্পের গোলকটা চিরকাল ধরিয়া তাপ-বিকিরণ করিবে, সঙ্কুচিত হইবে ও উত্তপ্ত হইতে থাকিবে। উপরে যে নিয়মের কথা বলা হইল, তাহা কেবল বাষ্পের বা গ্যাসের পক্ষেই খাটে। বাষ্পটা সঙ্কুচিত হইতে হইতে তরল বা কঠিন আকার প্রাপ্ত হইলে আর ঐ নিয়ম খাটিবে না। তখন যেমন তাপ বিকিরণ করিবে সেইরূপ সঙ্গে সঙ্গেই শীতল হইতে থাকিবে।

আমাদের সূর্য্য যে এখনও সম্পূর্ণ বাষ্পের আকারে আছে এরূপ বলা যায় না। সম্ভবতঃ বাষ্প ও তরল এই দুইএর মাঝামাঝি অবস্থায় আসিয়াছে। কিন্তু এটা ঠিক যে এখনও সঙ্কুচিত হইতেছে ও সেই সঙ্গে সঙ্গে অল্প অল্প গরম হইতেছে। তাপ বিকিরণ করিয়া শীতল হওয়া ও সঙ্কোচনের জন্য উত্তপ্ত হওয়া এই দুইটাতে মিলিয়া ইহার উষ্ণতা সমান রাখিয়াছে। গণিতের হিসাবে বলা যাইতে পারে যে সূর্য্যের আয়তন বৎসরে কতটুকু কমিলে এমন উত্তাপ হইবে যে তাহাতে তাহার সম্বৎসরের তাপের ব্যয় পোষাইয়া যাইবে। সূর্য্যের আয়তনের তুলনায় এই হ্রাস এত অল্প এবং সূক্ষ্ম জ্যোতিষিক পর্য্যবেক্ষণ প্রচলিত হইবার পর সূর্য্যের আয়তন এত অল্প কমিয়াছে যে তাহা না ধরা পড়াই সম্ভব। আজকাল সূর্য্যের ব্যাস ৮৬০,০০০ মাইল। হিসাবে দাঁড়ায় যে, বৎসরে এই ব্যাস যদি ৫০০ ফুট করিয়া কমে তাহইলে তাপের সামঞ্জস্য রক্ষা হয়। অবশ্য তা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় সূর্য্যের ব্যাস ইহার পূর্ব্বে আরও বড় ছিল। উক্ত হিসাবে ১০০ বৎসর পূর্ব্বে সূর্য্যের ব্যাস ১০ মাইল, সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ১০০ মাইল, দশসহস্র বৎসর পূর্ব্বে এখনকার অপেক্ষা ১০০০ মাইল বড় ছিল। এখনও সূর্য্যের আকার এত বড় যে আজ যদি সূর্য্যের ব্যাস ১০০০০ মাইল কমিয়া যায় তা হইলে খালি চ'খে এই পরিবর্ত্তনের কিছুই ধরা পড়ে না। অবশ্য যন্ত্রের সাহায্যে ইহা অপেক্ষা অনেক অল্প পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারা যায়।

সূর্য্যের আয়তনবৃদ্ধি যে এইখানেই শেষ হইয়াছে তাহা মনে করিবার কোনও কারণ নাই। লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে সূর্য্যের আয়তন এখনকার অপেক্ষা ১০০০০ মাইল বড় ছিল। কোটি বৎসর পূর্ব্বে আরও বড় ছিল। তার পূর্ব্বে আরও বড়, তার পূর্ব্বে আরও বড়, তার পূর্ব্বে আরও। দূর অতীতের দিকে যতই দৃষ্টি ফিরাই ততই দেখিতে পাই যে এইরূপে সৃষ্টির আদিতে, সৌরজগতের প্রারম্ভে, সূর্য্য আমাদের সমস্ত সৌরজগতের স্থান ছাড়িয়া একটা বিশাল বাষ্পরাশিরূপে বিরাজ করিতেছে। লাপ্লাসের মতে জগৎ উৎপত্তি এইরূপে বাষ্পরাশি বা নীহারিকা হইতেই হইয়াছে।

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র।

আমার বোম্বাই প্রবাস

(৫)

সিন্ধুদেশ

ভূগোল।—কর্ণাটক আমার কর্ম্মক্ষেত্রের দক্ষিণসীমা, উত্তরসীমা সিন্ধুদেশ। সিন্ধুদেশ (গ্রীকদের সিন্দমানা) প্রাচীনকাল হইতে তিন ভাগে বিভক্ত; দক্ষিণ, উত্তর ও মধ্যসিন্ধু। লার অথবা দক্ষিণসিন্ধু, হাইদ্রাবাদের দক্ষিণদিকে বিস্তৃত। করাচী ও টাট্টা এই অঞ্চলের দুই প্রধান সহর।

করাচী বন্দর।—পূর্ব্বকালে করাচী মক্রাণ প্রদেশের অন্তর্ভূত ছিল। ঐ বন্দর খেলাত সর্দ্দারের নিকট হইতে তালপুর আমীরেরা রাজ্যসাৎ করেন ও এক্ষণে ইহা ইংরাজ সিন্ধুরাজ্যের রাজধানী। সাগর সান্নিধ্য, উত্তম আবহাওয়া, ও বাণিজ্য ব্যবসার সৌকর্য্যবশতঃ করাচীর উত্তরোত্তর উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে। ইহার উত্তর ও দক্ষিণ যেখানে মিষ্ট জল পাওয়া যায় সেখানে কতকগুলি শাকসব্জী ফলের বাগান দৃষ্ট হয় নতুবা এ অঞ্চল সাধারণতঃ লবণাক্ত মরুভূমি। করাচীর ৩ ক্রোশ উত্তরে মগর (কুম্ভীর) পীর নামক এক উপত্যকা আছে তাহা দর্শনীয়। ঐ স্থানে কুঞ্জবনপরিবৃত একটি মন্দির ও মন্দিরের কাছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপসমন্বিত এক উষ্ণ জলাশয়, তাহাতে কুম্ভকর্ণ নিদ্রায় মগ্ন বড় বড় কুম্ভীর ইতস্ততঃ পড়িয়া আছে। খর্জ্জুরবননিঃসৃত গন্ধকাক্ত উষ্ণ প্রস্রবণ হইতে ঐ জলাশয়ের উৎপত্তি ও উহাতে স্নান মহোপকারী বলিয়া গণিত। আমি ঐ জলে স্নান করিলাম, এমন গরম যে অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে পারিলাম না। মগরপীর এখানকার তীর্থের মধ্যে গণ্য। কাহারো কোন বাসনা পূর্ণ করিতে হইলে সে মগরপীরে ছাগাদি উপহার দিয়া কুম্ভীররাজের পরিতোষ সাধন করে।

হিঙ্গুলাজ

এ অঞ্চলে অপর একটি তীর্থস্থান হিঙ্গুলাজ, ইহা হিন্দুতীর্থ। করাচীর পশ্চিম সোনমিয়ানী বন্দরের অনতিদূরে এই তীর্থ অবস্থিত। হিঙ্গুলা কালীর নাম বিশেষ। হালা পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়া ইহার রাস্তা গিয়াছে ও অঘোর নদ পার হইয়া যাইতে হয়। এই প্রদেশ রাম কাহিনীতে পূর্ণ। নদীর ক্রোড়ে কতকগুলি তরল কর্দ্দমকুণ্ড আছে তাহা 'রামকুণ্ড' বলিয়া বিদিত। প্রবাদ এই যে রামচন্দ্র হিঙ্গুলাজ তীর্থযাত্রায় বাহির হন। প্রথমে তিনি সসৈন্যে গমনোদ্যোগ করাতে পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া আসেন, পরে সন্ন্যাসীবেশে তথায় প্রবেশলাভ করেন। ভারতের উত্তর সীমায় হিঙ্গুলাজ ও দক্ষিণে রামেশ্বর—এই তীর্থদ্বয় প্রহরীর ন্যায় দুই দিক্ আগুলিয়া

দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। দ্বারকা তীর্থ হইতে আরম্ভ করিয়া হিঙ্গুলাজ, হিঙ্গুলাজ হইতে লাহোরের জ্বালামুখী, জ্বালামুখীর পর কুরুক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্র হইতে হরিদ্বার, হরিদ্বার হইতে গয়া কাশী, পরে মহানদী (জগন্নাথক্ষেত্র) গোদাবরী (নাসিক পঞ্চবটী) প্রভৃতি দর্শনপূর্ব্বক সেতুবন্ধ রামেশ্বর পৌঁছিতে পারিলে ভারতের তীর্থমণ্ডল একপ্রকার প্রদক্ষিণ করা হইল।

পুরাকালে আলোর সিন্ধুদেশের রাজধানী ছিল কিন্তু গ্রীক্‌গ্রন্থে ঐরূপ কোন নাম পাওয়া যায় না। "মূষিকানুস্‌" নামক এক রাজার সমৃদ্ধিশালী রাজ্যের বর্ণনা আছে, সম্ভবতঃ আলোর তাঁহার রাজধানী।

ব্রাহ্মণাবাদ

আর একটি প্রাচীন সহরের নাম ব্রাহ্মণাবাদ। কনিংহাম সাহেব ইহা "মূষিক" রাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া অনুমান করেন। এককালে ইহা সধন সজন হিন্দুনগর বলিয়া প্রখ্যাত ছিল। ইহার অভ্যন্তরে বিরাজিত ১৪০০ বুরুজের এক প্রকাণ্ড দুর্গের চিহ্নসকল অদ্যাপি বিদ্যমান। এই স্থান গ্রীক্‌ ইতিহাসে হর্ম্মতেলিয়া (ব্রাহ্মণস্থল) বলিয়া অভিহিত। এখানে সেকন্দরের একজন সৈনিক বিষাক্ত তরবারাঘাতে আহত হয়। আরব ইতিহাসেও ব্রাহ্মণাবাদের অনেক কথার উল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রোথিত নগর

হাইদ্রাবাদের কিয়ৎ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে একটি প্রোথিত নগরের ভগ্নস্তূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে। আবিষ্কর্ত্তা বেলাসিস্‌ সাহেব স্থির করেন তাহাই পুরাবৃত্তের চিরপরিচিত ব্রাহ্মণাবাদের ভগ্নাবশেষ। প্রবাদ এই যে এই নগর দুষ্ট রাজা দলুরায়ের পাপাচারে বিধ্বংস হয়। সিন্ধী ইতিহাসে তার বিবরণ এই :—

আলোর রাজধানী বিলুপ্ত হইলে পর দলুরায় ব্রাহ্মণাবাদে আসিয়া বাস করেন। ছোটা আমরাণী নামক তাঁহার এক ভ্রাতা মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তাঁহার বিরাগভাজন হইয়া পড়েন। এই ছোটা সাহেব তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়া মক্কা হইতে একজন মুসলমানী বিবাহ করিয়া আনেন। ফাতিমা সিন্ধুদেশে পদার্পণ করিয়া অবধি দলুরায়ের হস্তে অশেষ অপমান যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। ছোটা এই সকল অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া স্ত্রীকে লইয়া দেশ ছাড়িয়া পালাইলেন। এমন সময় দৈববাণী উঠিল "ব্রাহ্মণপুরী যায় যায়—সাবধান।" তাহা শুনিয়া কেহ কেহ সতর্ক হইল। প্রথম রাত্রে একজন বুড়ী চরকা কাটিতে কাটিতে জাগিয়া চৌকী দিতে লাগিল তাহাতেই নগর রক্ষা পাইল। দ্বিতীয় রাত্রে একজন কলুর সতর্কতায় নগর রক্ষিত হইল। তৃতীয় দিন সুযোগ পাইয়া পুরী একেবারে পাতালে প্রবেশ করিলেন—তাহার একটি মাত্র দুর্গস্তম্ভ চিহ্নস্বরূপ অবশিষ্ট রহিল।

বেলাসিস্‌ সাহেব এই ভগ্নস্তূপ খনন ও বিস্তর অনুসন্ধানের পর স্থির করিয়াছেন যে নগরী ভূকম্পন প্রভৃতি প্রকৃতির কোন প্রবল উৎপাতে সহসা এইরূপ প্রলয়দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। বেলাসিস্‌ সাহেবের খননে

ভূমিকম্পই ব্রাহ্মণাবাদের প্রলয়ের কারণ বলিয়া সপ্রমাণ হয়। তিনি যে সকল নরকঙ্কাল দেখিতে পান তাহা প্রধানতঃ দ্বারমুখে—কতকগুলি ঘরের কোণে;—যেন লোকে বা কেহ প্রাণভয়ে পলায়নোদ্যত—কেহ বা ভয়ে জড়সড় হইয়া এককোণে বসিয়া মরণ প্রতীক্ষা করিতেছে। এই ভগ্নস্তূপে চরখায় উপবিষ্টা একটি স্ত্রীলোকের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে যেন স্ত্রীলোকটি চরখা কাটিতে কাটিতে হঠাৎ চাপা পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত। অগ্ন্যুৎপাতের কোন চিহ্ন নাই।

এই সকল ভগ্নরাশির মধ্যে কত ভাল ভাল খোদিত প্রস্তর, মাটির ও কাচের বাসন, গজদন্ত, পিত্তল ও কাচের আভরণ, রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা, ধান্যের জালা, সতরঞ্চী ও পাশা খেলার সামগ্রী, অশ্ব গো উষ্ট্র কুকুর কুক্কুট মানব-অস্থি সকল আবিষ্কৃত হইয়াছে; অস্থিসকল জীর্ণদশা প্রাপ্ত, অতি প্রাচীন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই সমস্ত দৃষ্টে ব্রাহ্মণাবাদ এককালে ধনধান্যপূর্ণ জনাকীর্ণ বিস্তীর্ণ নগর ছিল তাহা নিঃসন্দেহ প্রমাণ হয়।

এই শ্রীসমৃদ্ধিসম্পন্ন জীবন্ত নগর এক্ষণে কালগর্ভে বিলীন হইয়াছে। ইহার প্রবল দুর্গের একটি মাত্র বুরুজ অবশিষ্ট। নদী তীরে এককালে যে সকল সুরম্য উদ্যান কানন নগরের শোভা সম্পাদন করিত তাহা কণ্টকাবৃত বনজঙ্গলে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। সে স্রোতস্বতী আর নাই; তাহার প্রবাহ অন্যত্রে বিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, চতুর্দ্দিক শুষ্ক নীরস মরুভূমি। (১)

টাট্টা

টাট্টা মুসলমান আমলে দক্ষিণসিন্ধুর প্রধান সহর ছিল। এক সময় সিন্ধুনদী ইহার প্রাচীর দিয়া বহিয়া যাইত ও যে বাণিজ্য এক্ষণে করাচীর ভোগে আসিতেছে সিন্ধু তাহা ইহারই দ্বারে আনিয়া ঢালিয়া দিত। এইক্ষণে নদী প্রায় ৩ মাইল দূরে চলিয়া গিয়াছে। ১৫২২ সালে এই নগর নির্ম্মিত হয় ও ১৭৪২ সালে যখন নাদির সা তথায় পদার্পণ করেন তখন সেখানে ৪০,০০০ ঘর বাড়ী, ৬০০০০ বণিক সৌদাগর ও ২০০০ অপর শিল্পী বাস করে এইরূপ বর্ণনা আছে।

হাইদ্রাবাদ

হাইদ্রাবাদ টাট্টার উত্তরাধিকারী মধ্য-সিন্ধুর রাজধানী। ইহা প্রাচীন হিন্দুনগর নীরণকোটের স্থান অধিকার করিয়া আছে ও ১৭৫৮ অব্দে গোলাম সা কাল্হোরা ইহার পত্তন করেন। হাইদ্রাবাদ তালপুর আমীরদের সাধের আবাস ছিল, নদী হইতে তাহাদের শিকারবনে যাতায়াতের সুবিধা তাহার এক কারণ। দুর্গের মধ্যে তাহাদের যে সমস্ত সুসজ্জিত বাসগৃহ ছিল তাহা এইক্ষণে প্রায় সকলি বিলুপ্ত হইয়াছে, মীর নসীর খাঁর প্রাসাদ মাত্র অবশিষ্ট আছে। নিজ সহরে কতকগুলি মাটীর ঘর বাড়ী, দেখিবার মত

(১) Cunningham's Ancient Geography of India
The Buried City of Brahmanabad by H. M. Birdwood, I, C. S.

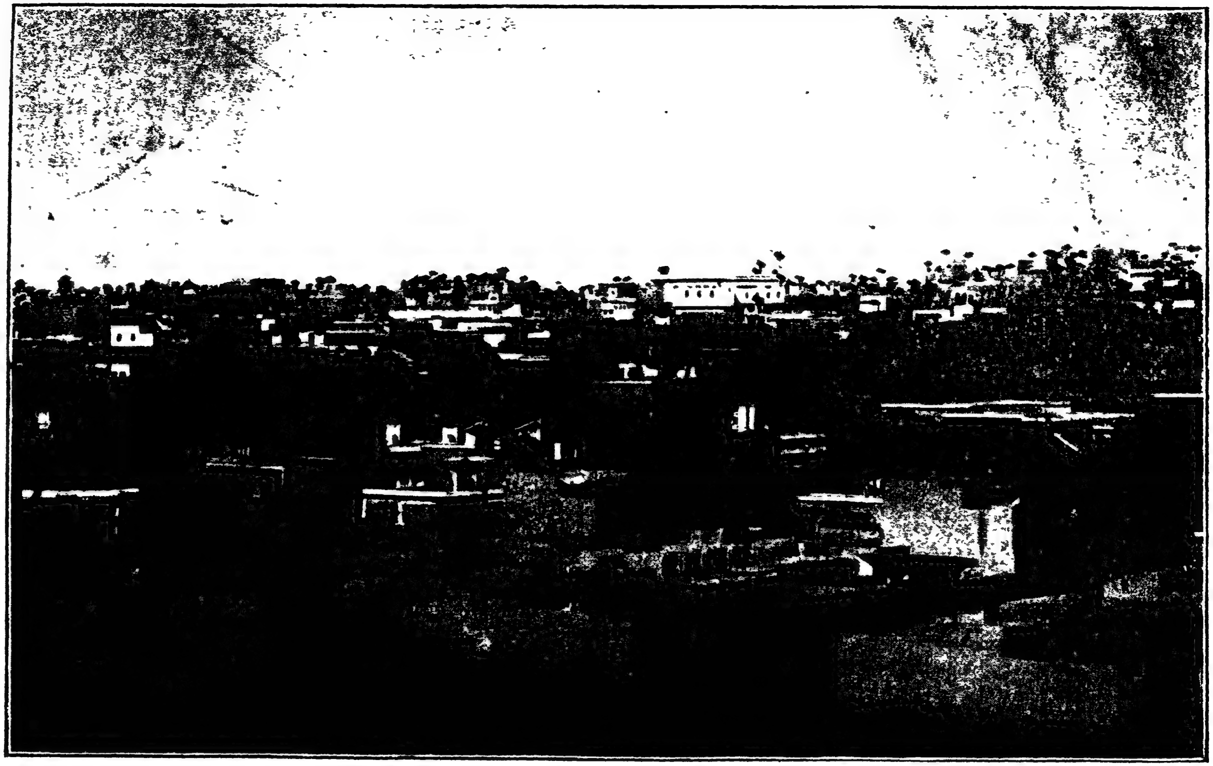

হাইদ্রাবাদ

ইমারত অট্টালিকা কিছুই নাই। দুর্গই ইহার শোভন দৃশ্য, সিন্ধুশাখা ফুলেলী তাহার প্রাচীরের পাশ দিয়া বহিয়া যাইতেছে। সহরের প্রান্তে কাল্হোরা ও তালপুর আমীরদের কতকগুলি সমাধি মন্দির আছে তাহা অতীব মনোহর। নদী সহর হইতে কয়েক মাইল দূর। সিন্ধুতীরে গিধুবন্দর, বন্দর পর্য্যন্ত একসুন্দর প্রশস্ত রাস্তা গিয়াছে তাহাই হাইদ্রাবাদের রাজপথ। এই সহর রেশম ও জরির কাপড়, সূক্ষ্ম মিনার কাজ ও অন্যপ্রকার কারুকার্য্যের জন্য সুবিখ্যাত।

উত্তরসিন্ধু

উত্তর সিন্ধু দক্ষিণভাগ হইতে অনেক তফাৎ। হাইদ্রাবাদের উত্তরে আর সমুদ্র বায়ু সেবন করা যায় না; গ্রীষ্মকালে বায়ু বন্ধ হইয়া ঐ অঞ্চল উত্তাপকুণ্ডে পরিণত হয়। ৮।৯ মাস ব্যাপী গ্রীষ্মকাল—বর্ষা নাই বলিলেই হয়—কখন একটু মেঘ কিম্বা দুচার ফোঁটা বৃষ্টি এইমাত্র। শীতকাল আবার তেমনি ঠাণ্ডা, গ্রীষ্মের যে প্রচণ্ড উত্তাপ সেই ঠাণ্ডায় তার ক্ষতিপূরণ হয়। মাঝে মাঝে মরুদেশের প্রবল বালুময় ঝড় উঠিয়া প্রকৃতিরাজ্য তোলপাড় করিয়া তুলে। সিন্ধু নদী যেখান দিয়া গিয়াছে তাহার আশপাশের ভূমি ফলবতী; নদী হইতে যতদূরে যাওয়া যায় ততই বালুময় মরুভূমি স্বীয় উগ্রমূর্ত্তি প্রকাশ করিতে থাকে।

উত্তর সিন্ধুতে কতকগুলি নব্য ও প্রাচীন প্রখ্যাত সহর আছে। নদীর পশ্চিমে সেওয়ান, আরবদিগের সেউইস্থান। নগরের মধ্যে লালসাবাজ নামক মুসলমান পীরের একটি সুন্দর মসজিদ আছে। লালসাবাজ খোরাসান

আমীরদিগের সমাধি মন্দির

হইতে সমাগত সিন্ধুর একজন লোকমান্য পীর, ১২৭৪ সালে সেওয়ানে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর সমাধিমন্দির মুসলমানের এক প্রধান তীর্থক্ষেত্র, বহুদূর হইতে যাত্রীরা সেখানে আসিয়া মিলিত হয়। অনেক ফকীর লালসার অনুচরবর্গের মধ্যে পরিগণিত। সেওয়ানে একটী পুরাতন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়, তাহা সেকন্দরনির্ম্মিত দুর্গ বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

সেওয়ান ছাড়াইয়া লাড়্খানা—ইহা জলানয় শ্রীসম্পন্ন উর্ব্বরা প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত।

সিন্ধুর পরপারে খয়েরপুর তালপুর রাজ্যের রাজধানী। খয়েরপুরের উত্তরে সক্কর, বক্কর ও রোহ্‌ড়ী মুসলমান আমলের তিন প্রখ্যাত সহর। বক্কর সিন্ধুর ক্রোড়ে এক ক্ষুদ্র দ্বীপ—পূর্ব্বে তাহা দেশের প্রবেশদ্বার বলিয়া গণ্য হইত। এই প্রদেশে মুসলমানদের বিদ্যালয় ও পীরপয়গম্বরদের বসতি ছিল, তাই অনেকানেক গোরমসজিদ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত দেখা যায়। সক্কর এইক্ষণকার ইংরাজ সেনালয়, এক বড় ষ্টেশন।

শিকারপুর

সক্করের উত্তর পশ্চিমে শিকারপুর, ইহা জজ মাজিষ্ট্রেটের প্রধান মহল, আমার সুপরিচিত কর্ম্ম স্থান। এখানকার সোদাগরেরা বাণিজ্য কার্য্যে পরিপক্ক, সমরকন্দ প্রভৃতি দূর দূর দেশে তাহাদের কারবার ও গতিবিধি।

সিন্ধুনদী

সিন্ধুনদীই সিন্ধু দেশের সর্ব্বস্ব। ইহা স্বীয় জন্মভূমি তিব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়া শাখা প্রশাখা বিস্তার পূর্ব্বক প্রধান প্রধান নগরের মধ্য দিয়া উত্তর দক্ষিণ প্রায় ১৭০০ মাইল বহিয়া গিয়া সহস্র ধারে সমুদ্রে আসিয়া মিলিত হইতেছে। ইহা বসুন্ধরার ফলশস্য-প্রসবিনী, চলাচলের মার্গ পরিরক্ষণী, বাণিজ্য সমৃদ্ধি বৃদ্ধিকারিণী অশেষ গুণশালিনী সিন্ধু জননী। উত্তরের বর্ষাবারিধারা প্রবাহে ও হিমাচলের তুষারগলিত যে পূর সঞ্চিত হয় তাহা মার্চ্চ মাস হইতে আরম্ভ, আগষ্টে পূর্ণতা প্রাপ্ত ও সপ্তম্বর হইতে হ্রাসোন্মুখ হয়। এই কয়েক মাসের মধ্যে নদী কোন কোন সময় ভাস্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মহাপূরে ফুলিয়া উঠে ও স্রোতের বেগে বালুচর ভাঙ্গিয়া ভাসাইয়া লইয়া যায়। এই জল-প্লাবন কতকটা বর্ষার অভাব পূরণ করে। সিন্ধুনদী না থাকিলে সমুদায় দেশ লবণাক্ত মরুভূমিতে পরিণত হইত।

সিন্ধুকাহিনী

সিন্ধুদেশের কি দুর্ভাগ্য! ভারতবর্ষের মোহাড়ায় তার অধিষ্ঠান সুতরাং আততায়ী-দের প্রথম পাদক্ষেপ তাহার উপর গিয়াই পড়ে। প্রাচীনকাল হইতে পূর্ব্বাপর তাহার উপর দিয়া কত উৎপাত, কত ধাক্কাই গিয়াছে। প্রথম সেকন্দর বাদসার সিন্ধু আক্রমণ। পারস্যাধিপতি দরায়ুসকে ধনপ্রাণে বিনাশ করিয়া সেকন্দরসা সৈন্যসামন্ত সমভি-ব্যাহারে আফগানিস্থানের মধ্য দিয়া হিন্দুকুট পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন ও খাইবরের দুর্গমপথ অতিক্রম পূর্ব্বক ভারতাভিমুখে যাত্রা করিলেন, অবশেষে তাঁহার রণমত্ত সৈন্যগণ সিন্ধুতীরস্থিত আটকে আসিয়া উত্তীর্ণ হইল। আটকের আটক না মানিয়া মাসিডনবীর সিন্ধুপার হইয়া

সেওয়ান দুর্গ

পঞ্জাবে প্রবেশ করিলেন। পঞ্জাবে তক্ষশীলের প্ররোচনায় বীরশ্রেষ্ঠ পুরুরাজের সহিত তাঁহার যে যুদ্ধ হয় তাহা প্রসিদ্ধই আছে, এ স্থলে বর্ণনা করিবার আবশ্যকতা নাই। আশ্চর্য্য এই যে, যে রণক্ষেত্রে গ্রীক ও হিন্দু এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী বীরদলের সম্মিলন হইয়াছিল সেই স্থলেই দুই সহস্র বৎসরান্তে ইংরাজ ও শিখেদের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটন হয়। দুবারই পঞ্জাবীদের পরাজয় কিন্তু সে পরাজয়ে শত্রুরাও তাহাদের বীরত্বের প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে নাই। বন্দীকৃত পুরুরাজের সঙ্গে রাজার মত ব্যবহার করিয়া সেকন্দর তাঁহার সিংহাসন প্রত্যর্পণ করেন। বিজয়ী গ্রীকরাজ জয়স্থলে নগরদ্বয় পত্তন করিয়া চেনাব ও রাবী নদী পার হইলেন। এই সময়ে মগধরাজের বিপুল কীর্ত্তি তাঁহার কর্ণগোচর হইল। ৬লক্ষ পদাতিক ও সহস্র সহস্র অশ্বগজারোহী সেনা যে রাজার সৈন্যবল তাহার রাজধানী পাটলিপুত্রে জয়স্তম্ভ নিখাত করেন এই তাঁহার ইচ্ছা। তাঁহার লোভের অন্ত নাই কিন্তু বিধাতা বাম হইয়া দাঁড়াইলেন। প্রাংশুলভ্য ফলে উদ্বাহু বামনের ন্যায় তাঁর দশা হইল। বেয়াস (বিপাশা) নদী পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া তাঁহার শ্রান্ত ক্লান্ত সৈন্যদল কিছুতেই আর অগ্রসর হইতে চায় না। সম্রাট তাহাদের বশ করিতে কত চেষ্টা করিলেন, তাঁহার সকল সাধ্য সাধনা নিষ্ফল,—ভর্ৎসনা গঞ্জনা কাকুতি মিনতি কিছুতেই কিছু হইল না, সুতরাং এখানে রণে ভঙ্গ দিয়া তাঁহাকে অগত্যা ফিরিতে হইল।

পুরুরাজের হস্তে সপ্তরাজ্য সমর্পণ করিয়া সেকন্দর তাঁর সৈন্যসামন্ত লইয়া ঝীলমে ফিরিয়া আসিলেন। তথায় রণতরী সজ্জিত হইল। অনন্তর তিনি সৈন্যদের দুইদলে বিভক্ত করিলেন সেনাপতির অধীনে একদল পৃথক্ পাঠাইলেন আর আপনি একদল সৈন্যসহ পঞ্জাবের নদী বাহিয়া সিন্ধুনদী দিয়া সমুদ্রাভিমুখে চলিলেন। এই যাত্রার কতিপয় মাস সিন্ধুদেশ সেকন্দরের বীরদর্পে কম্পিত ও রাজ্যে তুমুল বিপ্লব সমুত্থিত হয়। সিন্ধুপ্রবেশপূর্ব্বে মালীদের যুদ্ধে হারাইয়া মুলতান অধিকার করেন এবং আরো দক্ষিণে পঞ্চনদীর সঙ্গমে এক নগর পত্তন করিয়া যান।

সেকন্দর বাদসাহের সিন্ধু আক্রমণ কথা কোন হিন্দুলেখ্যে নাই—যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহা গ্রীক্ ভাষায় লিখিত। গ্রীক্‌রাজ যে যে স্থানে যুদ্ধে জয়লাভ করেন সেখানে নগর দুর্গ প্রভৃতি কীর্ত্তিস্তম্ভ সকল স্থাপন করিয়া যান, গ্রীক্ ইতিহাসের এইরূপ বর্ণনা। কিন্তু এক্ষণে এদেশে সেই কীর্ত্তিকলাপের কোন নামগন্ধ নাই—কোথাও যদি তাহার চিহ্ন থাকে তাহা কেবলি অনুমান ও কল্পনা।

সেকন্দর বাদসার পর মুসলমানদের সিন্ধুআক্রমণ পালা। সেকন্দর চলিয়া যাইবার পর সিন্ধুদেশ অনেককাল পর্য্যন্ত হিন্দুরাজাদের অধীন ছিল। মুসলমান ইতিহাস লেখকেরা বলেন রাজপুতবংশীয় পঞ্চরাহী সিন্ধুদেশে ১৪০ বৎসর রাজত্ব করেন। আলোর তাঁহাদের রাজধানী ও তাঁহাদের রাজত্বকালে প্রজাসকল সুখস্বচ্ছন্দে দিনপাত করিত। খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীতে রাহী সাহসীর মৃত্যু হয়। তাঁহার কোন পুত্র-

সন্ততি ছিল না। রাজ্ঞীর এক ব্রাহ্মণ উপপতি ছিল। তাহার নাম কচ্ছ। কথিত আছে যে ন্যায্য অধিকারীদিগকে সবংশে ধ্বংস করিয়া রাণী স্বীয় প্রণয়ী কচ্ছের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করেন। অবশিষ্ট রাজপুত বলীদিগকে ছলে বলে কৌশলে পরাজয় করিয়া কচ্ছরভা অন্যায়লব্ধ সিংহাসনে সুস্থির হইয়া বসিলেন। এই কচ্ছ রাজা ৪০ বৎসর রাজত্ব করেন। তাহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ডাহীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হন।

ডাহীরের রাজত্বকালে সিন্ধুদেশ ধর্ম্মান্ধ যবনদল কর্ত্তৃক পরিপ্লুত হয়। আরবেরা প্রাচীনকাল হইতে বাণিজ্য করিতে আসিত। তাহাদের একটি জাহাজ দেওয়াল বন্দরে (২) ধৃত হওয়াতে রাজা ডাহীরের নিকট তাহা প্রত্যর্পণের জন্য আবেদন করা হয়। রাজা সে আবেদন অগ্রাহ্য করেন। এই সামান্য কারণে যুদ্ধের সূত্রপাত।

মহম্মদ কাসিম

৭১১ খৃষ্টাব্দে কালিফ ওয়ালিদের রাজত্বকালে মহম্মদ কাশিম (২০ বৎসরের বালক মাত্র) একদল সৈন্য লইয়া দেওয়াল বন্দরে উপনীত হন। বন্দরের প্রান্তবর্ত্তী প্রস্তরপ্রাচীরবেষ্টিত একটি বিখ্যাত হিন্দু দেবালয় ছিল, অন্তরে ব্রাহ্মণ বসতি ও রাজপুত সৈন্যকর্ত্তৃক সুরক্ষিত। মন্দিরের একটি স্তম্ভের উপর এক নিশান উড়িতেছিল। কাশিম তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া এক বাণে তাহা ধরাশায়ী করিলেন। পতাকা পতনের সঙ্গে সঙ্গে সৈনিকদের মনে এমনি ভয়ের সঞ্চার হইল যে তাহাদেরও যবনহস্তে পতনের আর বিলম্ব রহিল না। মন্দির অধিকার করিয়া ব্রাহ্মণদের বলপূর্ব্বক মুসলমান করা, কাশিমের এই প্রথম কাজ। তাহাদের অসম্মতি দেখিয়া কাশিম এমনি ক্রুদ্ধ হইলেন যে বয়স্ক পুরুষদের সমূলে নিপাত, বালক ও স্ত্রীলোকদের দাসত্ব শৃঙ্খলে বন্ধনের আদেশ জারী হইল।

মন্দির পতনের পর বন্দর শীঘ্রই যবনদের হস্তগত হইল ও তদনন্তর কাশিম নিরণকোট (হাইদ্রাবাদ) দেওয়াল প্রভৃতি প্রধান প্রধান স্থান অধিকার করিয়া লইলেন।

অনন্তর ডাহিরের রাজধানী আলোরের নিকট এক মহা যুদ্ধ হয়। রাজা স্বয়ং ৫০ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহার রাজধানী সংরক্ষণার্থে অগ্রসর হইলেন। কাশিম পারস্য হইতে নবাগত ২০০০ দুই হাজার অশ্বারোহী ও পূর্ব্বকার অবশিষ্ট বল লইয়া হিন্দুসেনার আক্রমণ প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। রাজা যে গজপৃষ্ঠে আরূঢ় ছিলেন দৈবঘটনায় এক অগ্নিগোলা তাহার উপর পড়িয়া হুলস্থূল বাধাইয়া দিল, অবাধ্য হস্তী রাজাকে লইয়া রণভূমি হইতে পলায়ন করিল। এই ঘটনায় যুদ্ধের পরিণাম সূচিত হইল। রাজা ও আরব সৈন্যগণ ক্ষতবিক্ষত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইলেন।

বীরাঙ্গনা রাজমহিষী

এই যুদ্ধে রাজ্ঞীর অসাধারণ সাহস ও বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। বিক্ষিপ্ত

(২) Burton's Sindh.

সেনাদল একত্রিত করিয়া সেই বীরাঙ্গনা ব্রাহ্মণাবাদ রক্ষার একবার শেষ চেষ্টা দেখেন, যতক্ষণ পারিলেন শত্রু আক্রমণ প্রতিরোধ করিলেন, পরিশেষে অন্নাভাবে তাঁহার সৈন্যদের প্রাণরক্ষা দুর্ঘট হইয়া উঠিল। পরে তাহারা রাজপুত বীরোচিত 'জোহর'ব্রতে ব্রতী হইয়া স্ত্রীপুত্রদিগকে জ্বলন্ত চিতানলে আহুতি প্রদান করিল—পুরুষেরা নগরদ্বার খুলিয়া তরবারহস্তে অরিদলে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। ইহার পর ডাহিরের রাজ্য মুসলমানদের পদতলন্যস্ত হইল। মুলতানে যবনপতাকা উড্ডীন হইল।

ক্রমে হিন্দু ও আরবদের মধ্যে একটা বোঝাপড়ার সূত্রপাত হইল। হিন্দুশ্রেষ্ঠীরা যবনকে কর দিতে স্বীকৃত হইলেন কিন্তু এই সম্বন্ধে এক প্রশ্ন উত্থাপিত হইল। এই যে হিন্দু দেবালয়সকল অধিকৃত ও নষ্ট হইয়াছে, ব্রাহ্মণদের দেবত্র ব্রহ্মত্র ভূমি সম্পত্তি কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে, করদ রাজ্যে কি এই সকল নষ্টাধিকার প্রত্যপণ করা যাইতে পারে? তাহা হইলে কি পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দেওয়া হয় না? কাশিমের মনে এবিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে তিনি তাঁহার প্রভু সন্নিধানে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান। সেখান হইতে হিন্দুদের প্রীতিজনক উত্তর পাওয়া গেল। তাহা এই যে, যে সকল হিন্দু করদানে প্রতিশ্রুত তাহারা করদ রাজ্যের প্রজার ন্যায় সমস্ত অধিকার পাইবার যোগ্য, তাহারা দেবালয় পুনঃস্থাপন করিয়া পূজার্চ্চনা করুক তাহাতে কোন আপত্তি নাই, অপহৃত ভূমিসম্পত্তি ব্রাহ্মণদিগকে প্রত্যর্পণ করা হউক—হিন্দুরাজার আমলে তাহাদের যাহা ন্যায্য পাওনা তাহা হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করা বিধেয় নহে।

এ পর্য্যন্ত কাশিমের ভাগ্য সুপ্রসন্ন। তিনি জয়লাভে স্ফীত হইয়া হিন্দুস্থান আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় হঠাৎ তাঁহার মাথায় বজ্রপাত হইল। ডাহিরের পরাজয় ও পতনের পর তাঁহার পরমাসুন্দরী কন্যাদ্বয় যবনদের হস্তে পতিত হয়। কাশিম রাজকুমারীদিগকে দামাস্কাসের কালিফের নিকট উপহারস্বরূপ প্রেরণ করেন। কালিফের সম্মুখে আনীত হইলে জ্যেষ্ঠা যিনি তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে নিবেদন করিলেন "আমি মহারাজের যোগ্য নই—কাশিম আমাকে বিদায় করিবার পূর্ব্বে আমার প্রতি ব্যভিচার করিয়াছে।" কালিফ রাজকুমারীর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া ক্রোধানলে জ্বলিয়া উঠিলেন। রাগের মাথায় আদেশ দিয়া পাঠাইলেন "কাশিমকে কাঁচা চর্ম্মথলিতে পুরিয়া মুখ সেলাই করিয়া এখনি আমার সম্মুখে হাজির কর।" কালিফের আদেশ সম্পন্ন হইলে পর রাজকুমারীকে ডাকিয়া আনিয়া কাশিমের মৃতদেহ দেখাইলেন। রাজকুমারী আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিলেন "মহারাজ! কাশিম বাস্তবিক নিরপরাধ—আমার পিতৃহত্যা ও কুলকলঙ্কের এই প্রতিশোধ!"

কাশিমের সিন্ধু আক্রমণ হইতে ইংরাজ রাজ্য সংস্থাপন পর্য্যন্ত সিন্ধু দেশে অনেক রাষ্ট্রবিপ্লব, অনেকানেক রাজবংশের উত্থান পতন হইয়াছে। অষ্টম শতাব্দী হইতে এ পর্য্যন্ত যত শতাব্দী গত হইয়াছে প্রায় ততগুলি রাজবংশ সিন্ধুরাজ্যে অবতীর্ণ। ৬৭১ খৃষ্টাব্দের

পর ঐ দেশ মুলতান ও মনসুরা এই দুই মুসলমান রাজ্যে বিভক্ত হয়। মুলতান উত্তর হইতে আলোর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মনসুরা সিন্ধু বিজয়ের অনতিকাল পরে ব্রাহ্মণাবাদের নাম ধাম অধিকার করিয়া সমুত্থিত হয়, আলোর হইতে দক্ষিণ সাগর পর্য্যন্ত তাহার সীমা। কালিফপ্রতিনিধিগণ প্রায় ৩০০ বৎসর সিন্ধুদেশ শাসন করেন, তদনন্তর যবনাধিপত্য ক্ষণকালের জন্য অস্তমিত হইয়া যায়। তৎপরিবর্ত্তে সুমরা ও সুম্মারাজপুত্‌গণ কয়েক শত বৎসর উত্তরোত্তর রাজ্য করেন, তন্মধ্যে সুম্মাবংশীয় রাজগণ অনেকে মুসলমান ধর্ম্মাক্রান্ত। সম্রাট আকবরের সময় সিন্ধুদেশ মোগল রাজ্যভুক্ত হয়। ১৭৪০ অব্দে পারস্যরাজ নাদির সা হিন্দুস্থান আক্রমণানন্তর সিন্ধুনদীর পশ্চিমে কতক প্রদেশ দিল্লীশ্বরের প্রসাদে আত্মসাৎ করেন। ইহার কতিপয় বৎসর পরে পাণিপত-যুদ্ধবিজেতা আহমদ খাঁ দুরাণী সিন্ধুদেশে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করেন। তাঁহার সময় হইতে কতককাল আফগান আমীরদের নাম সিন্ধু ইতিহাসে মিশ্রিত দেখা যায়। এইরূপ রাষ্ট্রবিপ্লবের মধ্যে ব্রিটিষ ধূমকেতু অকস্মাৎ উদয় হইয়া সকলি উলট্ পালট্ করিয়া দিল।

ইংরাজ শাসন আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে যে দুই রাজবংশ সিংহাসন অধিকার করেন তাহা কল্হোরা ও তালপুর। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কল্হোরা রাজবংশের পত্তন ও প্রায় অশীতি বৎসর ঐ বংশের রাজত্বকাল। ১৭৮০ কিম্বা তার দুই এক বৎসর পরে তালপুরবংশীয় বলোচ আমীরগণ কল্হোরাদিগকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া সিংহাসনে আরূঢ় হন। ইংরাজদের দেশাধিকার কালে এই আমীরদের আধিপত্য ছিল। তালপুর বংশের মূলপুরুষ ফতে আলি খাঁ, তিনি বংশের গৌরববর্দ্ধন ও কলহবিদ্রোহ নিবারণ আশয়ে স্বীয় ভ্রাতৃগণসহ একত্রে রাজ্যশাসনের সূত্রপাত করেন, তাঁহারা চার ভাইয়ে মিলিয়া একমতে এক চিত্তে এমনি সুশৃঙ্খলাপূর্ব্বক রাজকার্য্য করিতেন যে 'চার ইয়ার' বলিয়া তাঁহাদের নাম রাষ্ট্র। ক্রমে তালপুর বংশের স্বতন্ত্র তিন শাখার সৃষ্টি হইল—হাইদ্রাবাদ, মীরপুর, খয়েরপুর তিন আমীরের তিন রাজ্য-বিভাগ।

আসিয়ার শান্তি

আফগান যুদ্ধাবসানের পর লর্ড এলেনবরা সিমলা হইতে আজ্ঞাপত্র প্রচার করিলেন যে, ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রকৃতিনির্দ্দিষ্ট রাজ্যসীমায় সন্তুষ্ট থাকিয়া এইক্ষণ অবধি শান্তিস্থাপন ও রাজ্যরক্ষণে একান্ত যত্নবান্ হইবেন। এই অভিপ্রায়ে "আসিয়ার শান্তি" চিহ্নিত এক মেডাল বাহির হইল। কিন্তু ফলে ইহার বিপরীত ঘটনা ঘটিল। ইহার ছয় মাসের মধ্যেই সিন্ধুদেশ ব্রিটিষ রাজ্যভুক্ত বলিয়া দ্বিতীয় ঘোষণাপত্র জারী হইল। পূর্ব্বোল্লিখিত প্রকারে সিন্ধুদেশ তখন তিন রাজ্যে বিভক্ত, উত্তর দক্ষিণ ও মধ্যসিন্ধু; প্রত্যেক রাজ্যের এক এক জন আমীর অধিস্বামী।

১৮৩৯ সালে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট ও আমীরদের মধ্যে এক সন্ধিবন্ধন হয়। এই সন্ধিসূত্রে ইংরাজেরা সিন্ধুদেশে প্রবেশ লাভ করেন। এই সন্ধি যদিও আমীরদের মনঃপূত হয় নাই কিন্তু কি করেন, দায়ে পড়িয়া ব্রিটিষ যূপে গ্রীবা অবনত করিতে হইল। আফগান যুদ্ধের ৩

বৎসর আমীরদের আচরণে দোষ ধরিবার কিছুই ছিল না। দেশের মধ্য হইতে ব্রিটিষ সৈন্য চলাচলের পথ উন্মুক্ত রাখা—জাহাজে খোরাক যোগান কিছুতেই তাঁহাদের কোন ত্রুটি হয় নাই। General Nott কাবুল প্রয়াণ কালে সিন্ধু হইতে তিন সহস্র উটের সাহায্য লাভ করেন। ইহা সত্ত্বেও কোন কোন আমীর ইংরাজদের পরাজয় দেখিয়া দাঁত দেখাইতে সাহস করিয়াছিলেন। এই ছুতা ধরিয়া তখনকার এজেণ্ট Major Outram আমীরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিয়া সন্ধিপত্রের পরিবর্ত্তন প্রার্থনা করেন। গবর্ণর জেনারাল আদেশ করিলেন যদি কোন আমীর ব্রিটিষরাজ্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া থাকে তাহার যথোচিত শাস্তি দেওয়া হউক।

Sir Charles Napier

৯ই সেপ্টেম্বর ১৮৮২এ সর চার্লস্ নেপিয়ার সর্ব্বেসর্ব্বা হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতারূপে সিন্ধুদেশে প্রেরিত হন। রাজদ্রোহ অভিযোগবিচারের ভার তাঁহার হস্তে ও তাঁহার প্রতি আদেশ এই যে, দোষের স্পষ্ট প্রমাণ ব্যতীত আমীরদের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করা হয়। সে যাহা হউক, তিনি বিচারে তাহাদিগকে দোষী সাব্যস্ত করিলেন ও বলিলেন ১৮৩৯এর সন্ধি অনুসারে কার্য্য করা হয় নাই। আমীরগণ সন্ধিভঙ্গ অপরাধে অপরাধী।

পূর্ব্বকার সন্ধিপত্রের পরিবর্ত্তে এক নূতন সন্ধিলেখ্য প্রস্তুত হইবার কথা। মেজর আউটরাম্ তাহার এক নমুনা তৈয়ার করিয়া লার্ড্ এলেন্‌বরার কাছে পাঠান। তাহা গবর্ণর জেনেরলের নিকট হইতে ১২ই নবেম্বরে নেপিয়রের হস্তে ফিরিয়া আসে। এই সন্ধি স্বাক্ষর করাইবার অভিপ্রায়ে বিটিষ সেনাপতি আমীরদিগকে খয়েরপুরে মিলিত হইতে আদেশ করেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঐ আদেশ মতে উপস্থিত না হওয়াতে হাইদ্রাবাদ সমিতির স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল।

ইতিমধ্যে সেনাপতি এক কাণ্ড করিয়া বসিলেন। যখন নূতন সন্ধিপত্রের নমুনা গবর্ণর জেনেরালের নিকট হইতে নেপিয়রের হস্তে আইসে, তখন আউট্রাম দেখিতে পাইলেন তাহা ঠিক হয় নাই—তাহার কতক গুলি কঠোর অনুশাসন সংশোধন করা আবশ্যক নতুবা বেচারা আমীরদের উপর ভয়ানক অত্যাচার করা হয়। সেনাপতি এই নমুনা আপনার কাছে প্রায় দেড় মাস কাল রাখিয়া দেন ও পরিশেষে যখন ভ্রম সংশোধনের অনুজ্ঞা আইসে তখন যতদূর অনিষ্ট হইবার হইয়া গিয়াছে, তাহার আর কোন ফল হইল না। সন্ধিপত্রে আমীরদের নিকট হইতে যে সকল ভূমিসম্পত্তি কাড়িয়া লইবার কথা ছিল, সন্ধি স্বাক্ষরিত হইবার পূর্ব্বেই সে সমস্ত কবলীকৃত হইল—আর বিলম্ব সহিল না। ওদিকে যে বলোচ সর্দ্দারগণ ঐ ভূমিসম্পত্তির অধিকারী, তাহাদের মধ্যে অন্নাভাবে হাহাকার পড়িয়া গেল।

এই সকল দুর্ঘটনার মূল আমীরদের গৃহবিচ্ছেদ। আমীরদের রাইস তখন ৮৫ বৎসরের বৃদ্ধ মীর রোস্তম। রাজা প্রজা সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করিত। তাঁহার কনিষ্ঠ আলি মোরাদ ইংরাজদের আগমনে নিজের কাজ গোছাইবার অবসর পাইলেন ও স্বার্থসাধন মানসে ব্রিটিস সেনাপতির তোষা-

মোদ আরম্ভ করিলেন। সেনাপতিকে রোস্তমের উপর চটাইবার মতলবে দাদার নামে নানা মিথ্যা অভিযোগ করিতে লাগিলেন। আলি মোরাদের প্রবোচনায় সেনাপতি মীর রোস্তমকে এক কটুকাটব্যপূর্ণ পত্র প্রেরণ করেন। ইত্যবসরে আলি তাঁহার ভ্রাতার স্বাক্ষরিত এক পত্র সেনাপতিকে দেখান, তাহাতে জানানো হয় যেন রোস্তম স্বেচ্ছায় তাঁহার পাগড়ী ফেলিয়া দিয়া তাঁহার দেশদুর্গ সৈন্যসামন্ত সকলি সেনাপতির হস্তে সমর্পণ করিতে উদ্যত। নেপিয়র বলিয়া পাঠাইলেন, মীর রোস্তমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অবশেষে যথাকর্ত্তব্য বিধান করিবেন। এইরূপ হইলে আলি মোরাদের সব জুয়াচ্চুরি ধরা পড়ে,—এই সাক্ষাৎকার নিবারণ উদ্দেশে তিনি মধ্যরাত্রে তাঁহার ভ্রাতাকে উঠাইয়া বলিলেন "এই বেলা পালাও নহিলে জেনেরাল সাহেব সকালে তোমাকে গ্রেফতার করিতে আসিবেন।" বৃদ্ধ মীর শশব্যস্ত হইয়া অরণ্যে পলায়ন করেন। অমনি নেপিয়র ঘোষণা করিয়া দিলেন যে মীর রোস্তম ব্রিটিসরাজের অপমান করিয়াছেন। আলি মোরাদকে তাঁহার পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইল মীর রোস্তমের সমূহ বিপদ উপস্থিত। তিনি সেনাপতির নিকট আপন মন্ত্রীকে দিয়া বলিয়া পাঠান যে, আলি মোরাদ তাঁহাকে ভুল বুঝাইয়া পত্র স্বাক্ষর করিয়া লন—তাঁহারই প্ররোচনায় তিনি পলায়ন করিয়াছেন। নেপিয়র ইহার এক তীব্র ভর্ৎসনাপূর্ণ উত্তর প্রেরণ করেন এবং অরণ্যে গিয়াও ব্রিটিষ হস্ত এড়াইবার উপায় নাই ইহা জানাইয়া দিবার জন্য একদল সৈন্যকে পলাতক মীরের পশ্চাৎ ইমামগড়ের কেল্লার উপর হল্লা করিতে পাঠান। ইমাম গড়ের কেল্লা নেপিয়রের মতে সিন্ধুর Gib ralter তাহা দখল করিতে পারিলে ব্রিটিষ গৌরবের সীমা থাকিবে না, এই ভাবিয়া তিনি দুর্গ আক্রমণ করিয়া বারুদে উড়াইয়া দিয়া ফিরিয়া আসেন। এই অসম সাহসিক কার্য্যের জন্য Duke of Wellington পর্য্যন্ত তাঁহার যুদ্ধকৌশল প্রশংসা করিয়াছেন কিন্তু রণকৌশল যাহাই থাকুক এই কার্য্যে তাঁহার ন্যায়পরতা প্রকাশ পায় না, কেননা মীর মহম্মদ যিনি দুর্গের অধিপতি তিনি যখন ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের প্রতি কোন অপরাধ করেন নাই তখন তাঁহার উপর এ অত্যাচার আমাদের সহজ বুদ্ধিতে ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। পলায়নে যদি মীর রোস্তমের দোষ হইয়া থাকে তাহা হইলে তাঁর রাজ্য-ত্যাগ কি সে দোষের যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত নহে ?

যাহা হউক, মীর রোস্তমকে রাজ্যচ্যুত ও আমীরদের ভূমিসম্পত্তি হস্তগত করিয়া ব্রিটিষ সেনাপতি আমীরদিগকে প্রথমে খয়েরপুর, পরে হাইদ্রাবাদে মিলিত হইতে আদেশ করিলেন।

হাইদ্রাবাদ সমিতি

হাইদ্রাবাদ সমিতিতে আমীরগণ সম্মিলিত। তাঁহারা আপনাদিগকে নিরপরাধ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন—যে সকল পত্রে তাঁহাদের দোষ সপ্রমাণ বলিয়া ধার্য্য হয় তাহা দেখিতে চাহিলেন। ১২ই ফেব্রুয়ারি তাঁহারা নূতন সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিলেন কিন্তু মেজর আউটরামকে স্পষ্ট বলিলেন যে, ব্রিটিষদের আচরণে, বিশেষত

মিয়ানির যুদ্ধ রণক্ষেত্রের স্মৃতিচিহ্ন

মীরদের প্রতি তাহাদের অত্যাচারে, বলোচ সৈন্য ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে; তাহারা হঠাৎ যদি কোন বিদ্রোহাচরণ করে তজ্জন্য তাঁহারা দায়ী নন। এই অবসরে সেনাপতি নেপিয়র স্বীয় সৈন্য সামন্ত লইয়া অগ্রসর হইতেছেন তাহাতে আরো গোল বাধিবার উপক্রম হইল। সন্ধি স্বাক্ষরের পর আউটরাম যখন কেল্লা হইতে বাহির হয়েন তখন লোকেরা তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া ব্রিটিষদের উপর ধিক্কার ও গালিবর্ষণ আরম্ভ করিল। আমীরেরা অনেক কষ্টে মেজরকে বাটী পৌঁছিয়া না দিলে তাঁহার প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হইত। ইহার তিনদিন পরে একদল বলোচ সৈন্য রেসিডেন্সি আক্রমণ করে—মেজর অসামান্য সাহস ও পরাক্রমের সহিত প্রবল শত্রু বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করত নদীতে সেনা-রক্ষিত ষ্টিমারে উঠিয়া নিস্তার পান।

মিয়ানির যুদ্ধ

এখন যুদ্ধের সমূহ কারণ উপস্থিত—ইস্পার কি উস্পার যুদ্ধে যাহা হয় স্থির হইবে। নেপিয়র রাজধানীর দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়াছেন দেখিয়া বলোচ সৈন্য দলে বলে আসিতে আরম্ভ করিল। ১৭ই ফেব্রুয়ারি তাহারা মেয়ানি ক্ষেত্র অধিকার করিয়া দাঁড়াইল—তাহাদের সংখ্যা ২০,০০০। নেপিয়র ২৭০০ সেনা লইয়া তাহাদের সম্মুখীন হইলেন। বলোচেরা বীরোচিত বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল কিন্তু ইউরোপীয়দের শিক্ষিত বল ও মারাত্মক শস্ত্রের বিরুদ্ধে তাহাদের বলবিক্রম কতক্ষণ চলিবে? কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পরীক্ষা শেষ হইল—বলোচেরা তাহাদের তাম্বু অস্ত্রশস্ত্র ব্রিটিষদের হস্তে ফেলিয়া সরিয়া পড়িল। চার্লস্ নেপিয়র সৈন্যদের জয়ধ্বনির মধ্য দিয়া হাইদ্রাবাদ-দুর্গে প্রবেশ পূর্ব্বক আমীরদের রাজকোষ লুণ্ঠন করিয়া সৈন্যদের মধ্যে পারিতোষিক বিতরণ করিলেন। ইহার পর ডব্বায় আর এক যুদ্ধ হয়—স্বাধীনতা রক্ষার সেই শেষ চেষ্টাও ব্যর্থ হইল। আমীরেরা বন্দীকৃত ও নির্ব্বাসিত হইয়া কষ্টস্রষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলেন—সিন্ধুদেশ ব্রিটিষ রাজ্যের লোহিত রেখাপাতের অন্তর্ভূত হইল। (৩)

এই ত ইংরাজদের সিন্ধুবিজয় কাহিনী। স্পষ্ট দেখা যায় যে সর চার্লস নেপিয়র পূর্ব্ব হইতেই দেশ দখল করিবার আশয়ে কার্য্যারম্ভ করেন—আমীরদের সঙ্গে তাঁহার যে বিবাদ তাহা মেষদলের সহিত ব্যাঘ্রের বিবাদের অনুরূপ। তাঁহার নিজ হস্তাক্ষর হইতেই তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় অবগত হওয়া যায়। তিনি স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন—

"আমীরদের দমন করিবার জন্য আমরা কেবল একটা ছুতো চাই। যে রাজ্য দুর্ব্বল সে শীঘ্রই হউক, বিলম্বেই হউক বলবানের গ্রাসে পতিত হইবেই হইবে, তাহার উপায়ান্তর নাই।"

তাঁহার নীতিশাস্ত্রে সৎকার্য্যসিদ্ধির নিমিত্তে অসৎ উপায় যোজনা দোষের নহে। কথিত আছে যে সিন্ধুবিজয়ের পর তিনি দেশে তারযোগে দ্ব্যর্থভাবে সংবাদ পাঠান "I have Sind" (Sinned) এই তিনটি বাক্যে সিন্ধুবিজয়-কাহিনী অভিব্যক্ত।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

(৩) Marshman's History of India.

শারীর স্বাস্থ্য-বিধান

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(১৩)

সংক্রামক রোগ নিবারণের ব্যবস্থা

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়মাবলী যথারীতি প্রতিপালন করিলেও কোন সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাবের সময়ে আমরা অনেক সময়ে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হই না। সংক্রামক ব্যাধির বিস্তার যে সকল কারণে ঘটিয়া থাকে, তৎসম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানের অভাবই আমাদিগের এই অসহায়তা ও দুরবস্থার প্রধান কারণ, সুতরাং লোক-সমাজে যাহাতে এই সকল অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের জ্ঞানের প্রসার ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা প্রত্যেক চিকিৎসকেরই কর্ত্তব্য।

আমরা দেখিতে পাই যে পরিবারের মধ্যে একজনের কোনরূপ সংক্রামক রোগ উপস্থিত হইলে একটার পর আর একটা করিয়া বাটীর সমস্ত লোককেই ক্রমে ক্রমে ঐ রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। ক্রমে পল্লীর মধ্যে ঐ রোগ ছড়াইয়া পড়ে এবং অনেক সময়ে উহা মহামারীর আকার ধারণ করিয়া অসংখ্য লোকের অকাল মৃত্যুর কারণ হয়। কতকগুলি বিষয়ে সাবধান হইলে এই সকল রোগের আক্রমণ হইতে আমরা আত্ম-রক্ষা করিতে এবং আমাদিগের পরিবারের মধ্যেও উহাদিগের পরিব্যাপ্তি কতকাংশে নিবারণ করিতে সমর্থ হই। প্রত্যেক গৃহস্থ এইরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিলে পল্লীর মধ্যেও এই রোগের বিস্তৃতি লাভের সম্ভাবনা থাকে না, সুতরাং এইরূপ কার্য্য দ্বারা শুদ্ধ যে নিজের মঙ্গল সাধিত হয়, তাহা নহে, প্রতিবেশী সমাজকেও নানারূপ অসুবিধা, ক্লেশ ও বিপদের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারা যায়। যে সকল উপায় অবলম্বন করিলে এইরূপ বিপদের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারা যায়, তাহাই এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে আলোচিত হইবে।

প্রথমতঃ সংক্রামক রোগ কাহাকে বলে ও কি রূপে উহার উৎপত্তি হয়, তাহাই আমাদের ভালরূপে জানা উচিত। রোগের প্রকৃত কারণ জানা না থাকিলে উহার নিবারণের চেষ্টা করা বৃথা হইয়া থাকে এবং এই জন্য আমরা অনেক সময়ে অর্থনাশ, অসুবিধা ও মনঃকষ্ট ভোগ করিয়া থাকি।

কতকগুলি চক্ষুর অগোচর বিশেষ বিশেষ নিম্নশ্রেণীর জীব বা উদ্ভিদ্ জাতীয় পদার্থ আমাদিগের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিলে বিভিন্ন প্রকার সংক্রামক রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অনুবীক্ষণ সাহায্যে ইহাদের আকৃতি নিরূপিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কতক-গুলি স্পর্শ দ্বারা, অপরগুলি স্পর্শ ব্যতীত অন্য উপায়ে, রোগীর শরীর হইতে সুস্থ ব্যক্তির শরীরে সংক্রামিত হইয়া থাকে। চুলকনা, খোসপাঁচড়া, দাদ, হাম, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগ সমূহ রোগীর বা রোগীর ব্যবহৃত বস্ত্র ও শয্যাদির স্পর্শ দ্বারা,

অথবা বায়ু দ্বারা পরিবাহিত হইয়া, এক ব্যক্তি হইতে অপর ব্যক্তিতে সংক্রামিত হয়। যক্ষ্মা রোগের বীজ রোগীর পরিত্যক্ত শ্লেষ্মার মধ্যে বিদ্যমান থাকে; উহা শুষ্ক হইলে পর উহার সুক্ষ্মাংশ ধূলির সহিত মিশ্রিত হইয়া বায়ুদ্বারা একস্থান হইতে অন্যস্থানে পরিবাহিত হয় এবং নিশ্বাসের সহিত আমাদের শরীরে প্রবেশ করতঃ যক্ষ্মারোগ উৎপাদন করে। কলেরা, টাইফয়েড্ ফিভার্ প্রভৃতি সংক্রামক রোগের বীজ মনুষ্যের শরীর হইতে বমন বা মলের সহিত পরিত্যক্ত হইয়া যদি পানীয় জল বা খাদ্যদ্রব্যের সহিত কোনরূপে মিশ্রিত হয় এবং উক্ত জল বা খাদ্য কোন প্রকারে আমাদের উদরস্থ হয়, তাহা হইলে আমরা ঐ সকল সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকি। ডিপ্‌থিরিয়া রোগের বীজ বায়ুর দ্বারা পরিবাহিত হইয়া রোগীর গলদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে, পরে সংখ্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া এবং এক প্রকার বিষাক্ত রস নিঃসরণ করিয়া স্বল্পকালের মধ্যে সাংঘাতিক রোগ উৎপাদন করে। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি কতিপয় রোগের বীজ (এক প্রকার কীটাণু) স্পর্শ দ্বারা অথবা বায়ু, পানীয় জল বা দূষিত খাদ্য দ্বারা একের শরীর হইতে অন্য শরীরে সংক্রামিত হয় না। ইহাদিগের বীজ কোনরূপে সুস্থ ব্যক্তির রক্তের সহিত মিশ্রিত হওয়ার প্রয়োজন, তাহা না হইলে উহাদিগের পরিব্যাপ্তি অসম্ভব। ম্যালেরিয়া রোগের বীজ রোগীর রক্তের মধ্যে অবস্থিতি করে। এক জাতীয় মশকী দংশন কালে রোগীর শরীর হইতে শোষিত রক্তের সহিত উহা উঠাইয়া লয়। পরে উক্ত কীটাণু ঐ মশকীর দেহাভ্যন্তরে পুষ্টিলাভ করে এবং ঐ মশকী যখন সুস্থ ব্যক্তিকে দংশন করে, তখন তাহার শরীরে ঐ বীজ প্রবেশ করাইয়া দেয়। এইরূপে ইয়োলো ফিভার্ (Yellow fever), ফাইলেরিয়েসিস্ (Filariasis), কাল-নিদ্রা (Sleeping sickness) প্রভৃতি কতিপয় বিশেষ বিশেষ রোগ বিভিন্ন জাতীয় মশক, মক্ষিকা বা পোকার দংশন দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্লেগ্ রোগ ইন্দুরের দেহে অবস্থিত। এক প্রকার পোকার (Rat flea) দংশন দ্বারা মনুষ্যের শরীরে সংক্রামিত হয়। সম্প্রতি গবেষণা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে আসামের সংঘাতিক কালাজ্বর (Kala-azar) ছারপোকা দ্বারা রোগীর শরীর হইতে সুস্থ ব্যক্তির শরীরে আশ্রয় লাভ করিতে পারে। জলাতঙ্ক রোগের (Hydrophobia) বীজ ক্ষিপ্ত কুকুরের লালার (Saliva) মধ্যে বিদ্যমান থাকে। যখন ঐ কুকুর মনুষ্য বা অপর প্রাণীকে দংশন করে, তখন উক্ত রোগের বীজ লালার সহিত তাহার ক্ষতস্থানের রক্তের সহিত একেবারে মিশ্রিত হইয়া যায়।

বহুশ্রমসাধ্য গবেষণার দ্বারা কলেরা, টাইফয়েড্ ফিভার্, যক্ষ্মা, প্লেগ্, ডিপ্‌থিরিয়া প্রভৃতি অনেকানেক সংক্রামক রোগের বীজের আকৃতি ও প্রকৃতি নির্ণীত হইয়াছে। এই সকলগুলি নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিজ্জাতীয়। ইহারা চক্ষুর অগোচর, অণুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীত ইহারা দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহাদিগের একটী বিশেষ ধর্ম্ম এই যে, মনুষ্য দেহে প্রবেশ করিবার পর অনুকূল অবস্থা পাইলে ইহাদিগের এক একটী অতি অল্প সময়ের মধ্যে অসংখ্য উদ্ভিদাণুতে পরিণত হয় এবং সেই সময়ে এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ (Toxin)

উৎপাদন করে। ইহাই রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া রোগের লক্ষণ প্রকাশ করে। হাম, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগের বীজ কিরূপ, তাহা এ পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। ঐ সকল রোগে যখন "ছাল" উঠিতে আরম্ভ হয়, সেই ছালের মধ্যে ঐ সকল রোগের বীজ নিহিত থাকে এবং বায়ু, বস্ত্র বা শয্যাদির সাহায্যে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হইয়া রোগ বিস্তৃতির সহায়তা করে।

এস্থলে বক্তব্য এই যে রোগের বীজ শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিলেই যে উক্তরোগ উৎপন্ন হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। যে কোন রোগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য একটী স্বাভাবিক শক্তি আমাদের শরীরের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে; নানা কারণে এই শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যথোচিত পুষ্টিকর আহারের অভাবে, অত্যধিক পরিশ্রম বা অন্যান্য নানাবিধ শারীরিক অত্যাচারের ফলে অথবা স্বাস্থ্য-রক্ষার প্রতিকূল অবস্থায় থাকিলে এই শক্তি যথোচিত পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হয়; এরূপ অবস্থায় কোন রোগের বীজ শরীরে প্রবেশ করিলে উহা অবাধে বিষ-ক্রিয়া প্রদর্শন করে। এই জন্য আমরা দেখিতে পাই যে কোন সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় যাহারা নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করে অথবা যাহারা যথেষ্ট পরিমাণ পুষ্টিকর আহার সংগ্রহ করিতে সক্ষম হয় না, তাহারাই অধিক সংখ্যায় উক্ত ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাবলী যথারীতি পালন করিলে এই শক্তির বৃদ্ধি সাধিত হয়, সুতরাং রোগ-বিস্তৃতির মধ্যে বাস করিয়াও লোকে অনেক সময়ে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়। পুনশ্চ বসন্ত প্রভৃতি এমন কতকগুলি সংক্রামক রোগ আছে, যাহা একবার হইলে আর পুনরায় হইতে দেখা যায় না। যে কোন সংক্রামক রোগ একবার হইলে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য রোগমুক্ত ব্যক্তির পুনরায় ঐ ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। তবে কলেরা, টাইফয়েড ফিভার্, প্লেগ প্রভৃতি রোগে এই রক্ষণশীল অবস্থা অধিক দিন স্থায়ী হয় না।

উপরোক্ত তত্ত্ব অনুসরণ করিয়া কতকগুলি সংক্রামক রোগের বীজ আমাদের পরীক্ষাগারে অথবা অন্য জীবের শরীরে প্রবেশ করিবার পর বিশেষ ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া "টিকা" (Vaccine) রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এতদ্বারা ঐ সকল রোগের ভবিষ্যৎ আক্রমণ হইতে স্বল্প বা দীর্ঘকালের জন্য অব্যাহতি লাভ করিতে পারা যায়। বসন্ত রোগের "টিকার" রক্ষণশীল শক্তি অধিকাংশ স্থলেই আজীবন বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায়; এইজন্য যাহাদের একবার বসন্ত হয়, তাহাদিগকে পুনরায় ঐ রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা যায় না। প্লেগ, টাইফয়েড ফিভার্, কলেরা প্রভৃতি সাংঘাতিক রোগের পরিব্যাপ্তি নিবারণ করিবার জন্য এইরূপ "টিকার" ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সকল রোগে "টিকার" রক্ষণশীল শক্তি অধিক দিন বিদ্যমান না থাকিলেও যে সময়ে উহারা মহামারীরূপে আবির্ভূত হয়, তখন "টিকা" লইলে উহাদিগের আক্রমণ হইতে সাময়িক নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারা যায়। (ক্রমশঃ)

শ্রীচুণীলাল বসু।

কালিদাসের নাটক

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শকুন্তলা

শকুন্তলার বিষয়টি ভারতের পৌরাণিক কাহিনীর অন্তর্ভূত এবং মহাভারত হইতে গৃহীত। রাজা দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার প্রেমলীলা এই মহাকাব্যের আরম্ভেই বর্ণিত হইয়াছে, এবং বলিতে গেলে এই প্রেম-কাহিনীর মূল মহাভারতেই নিহিত। এই প্রেম-মিলন হইতেই ভরতের জন্ম। ব্যাসবর্ণিত মহা-সংগ্রামের যাঁহারা প্রধান নায়ক, ভরত তাঁহাদেরই পূর্ব্বপুরুষ। নাটকের উপযোগী করিবার জন্য এই পরম্পরাগত প্রাচীন কাহিনীটিকে কালিদাস যেরূপভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহা হইতেই আমরা তাঁহার নাটকীয় রচনাপ্রণালীর ধরণটা চট্ করিয়া ধরিতে পারি। মহাভারতের বর্ণিত কাহিনীটি এইখানে সংক্ষেপে বলা যাক্। রাজা দুষ্মন্ত মৃগয়ায় বাহির হইয়াছেন। তিনি মালিনী নদীর তীরে কণ্বমুনির আশ্রমে উপনীত হইয়া তপোবনে একাকী প্রবেশ করিলেন। তাঁহার আগমনবার্ত্তা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণাপূর্ব্বক তপোবনবাসীদিগকে আহ্বান করা হইল। একটি নবযুবতী আসিয়া আতিথ্যসৎকারে প্রবৃত্ত হইল। তাহার রূপলাবণ্যে রাজা মুগ্ধ হইয়া তাহার জন্মপরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কণ্বমুনির মুখে সে যাহা শুনিয়া-ছিল, রাজার নিকট তাহাই বলিল। বিশ্বামিত্রঋষির সহিত কিরূপে মেনকা অপ্সরার মিলন ঘটিয়াছিল, তাহারই পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করিল। রাজা তাহার পাণিগ্রহণে অভিলাষী হইলেন। সে লজ্জাবশতঃ তাহাতে বাধা দিল। দুষ্মন্ত তাহাকে বুঝাইলেন, তিনি যে বিবাহের প্রস্তাব করিতেছেন তাহা বৈধ বিবাহ। যুবতী শুধু এই সর্ত্তে সম্মত হইল যে, তাহাদের মিলন হইতে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে, সে তাঁহার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইবে। রাজা শপথ গ্রহণ করিলেন, এবং স্বীয় ভোগলালসা চরিতার্থ করিয়া নিজ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। যাইবার সময় শুধু এই কথা বলিয়া গেলেন, তাঁহার নববধূকে ঘটা করিয়া আনিবার জন্য রাজধানী হইতে লোকজন পাঠাইবেন। ইত্যবসরে কণ্বমুনি তীর্থভ্রমণ করিয়া তপোবনে প্রত্যাগত হইলেন। যাহা কিছু ঘটিয়াছে, সমস্তই তিনি ধ্যানযোগে জানিতে পারিলেন, এবং যে শিশু জন্মগ্রহণ করিবে সে বড়ই সৌভাগ্যবান হইবে এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া তিনি শকুন্তলাকে অভিনন্দন করিলেন। শকুন্তলার একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। শিশুটি ক্রমে বড় হইয়া উঠিল, তাহার যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবার বয়স পর্য্যন্ত হইল, তথাপি তাহাকে আনিবার জন্য রাজা লোক পাঠাইলেন না। তখন কণ্ব তাপসরক্ষক সঙ্গে দিয়া, মাতার সহিত পুত্রকে দুষ্মন্তের সমীপে পাঠাইলেন। তাপস-রক্ষকেরা উহাদিগকে প্রাসাদ-দ্বারে ছাড়িয়া আসিল। শকুন্তলা রাজার সম্মুখে আনীত

হইলেন, রাজা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। এমন কি, বিশ্বামিত্র ও মেনকাকে পর্য্যন্ত অবমাননা করিলেন। শকুন্তলা এই বিপদে ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া শুধু পূর্ব্ব-জন্মের কর্ম্মফলজনিত স্বকীয় অদৃষ্টকেই ধিক্কার দিতে লাগিল। হঠাৎ এই সময়ে ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার জন্য একটা আকাশবাণী হইল! তখন দুষ্মন্ত, তাহার পুত্রের সুজাতত্ব সম্বন্ধে এই আকাশবাণীর সাক্ষ্যে বিশ্বাস করিয়া, যুবককে ও যুবকের জননীকে যথাযোগ্য পদমর্য্যাদা প্রদান করিলেন।

এই কাহিনীটির যে একটি নাটকীয় উপযোগিতা আছে তাহা কালিদাসের পূর্ব্বেও অনেক কবি হয়ত লক্ষ্য করিয়াছিলেন। মহাভারতে এই কাহিনীর বর্ণনায় যে সকল উক্তি আছে সেই সকল উক্তি, শকুন্তলা, দুষ্মন্ত, কণ্ব প্রভৃতি কতকগুলি পাত্রের মুখে বসাইয়া দিলেই যথেষ্ট হয়, আর বড় কিছু করিতে হয় না। এই উৎকৃষ্ট নাট্যরচনাটির পূর্ব্বে আর যে সকল রচনা হইয়াছিল তাহার কিছুই এখন বিদ্যমান নাই; কিন্তু একটি তামুল-নাটকে উহার একটি সঠিক প্রতিরূপ আমরা পাইয়াছি। নাটকটির রচনা-কাল অনিশ্চিত। সম্ভবতঃ আধুনিকও হইতে পারে, উহার স্থানিক লক্ষণ স্পষ্টই উপলব্ধি হয়। এই শকুন্তলার গ্রন্থকার—রাজনল্লুরের রামচন্দ্র; তিনি কালিদাসের আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া দাবী করেন, কিন্তু সে দাবী কোন কাজের নহে। স্পষ্টই দেখা যায়, সরল পৌরাণিক কাহিনীটির তিনি অবিকল নকল করিয়াছেন। নাটকের আরম্ভেই অনেকগুলি দেবদেবীকে আবাহন করা হইয়াছে; তাহার পর, গণেশ আসিয়া বাধা বিঘ্ন দূর করিয়া দিলেন; একজন গায়ক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল। তারপর বিশ্বামিত্রের প্রবেশ; সূত্রধর অবস্থাটা শ্রোতৃমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দিলেন। শিষ্যদিগকে সঙ্গে লইয়া মুনিবর, তাঁহার কঠোর তপশ্চর্য্যার উপযোগী একটি আশ্রমের সন্ধান করিতে লাগিলেন। অতঃপর সূত্রধর, ইন্দ্র ও তাঁহার সভার কথা শ্রোতৃমণ্ডলীকে জানাইয়া দিল। দেবতারা গ্রীষ্মের প্রখর তাপে কষ্ট পাইতে-ছিলেন। বিশ্বামিত্রের কঠোর তপস্যাই তাহার হেতু। ইন্দ্র পরামর্শের জন্য দেবতাদিগকে সভায় আহ্বান করিলেন। বৃহস্পতি প্রস্তাব করিলেন, মুনিবরকে প্রলোভিত করিবার জন্য একজন অপ্সরাকে তাঁহার নিকট পাঠান হউক। অপ্সরা রম্ভাকে অনুরোধ করা হইল, কিন্তু রম্ভা ভয়ে একটা ওজর করিয়া কাটাইয়া দিল। মেনকা স্বীকৃত হইল। সূত্রধর সকলকে জানাইয়া দিল, এখন পৃথিবীতে নাটকীয় কার্য্য সম্পাদিত হইবে।

মেনকা বিশ্বামিত্রের সমীপে আগমন করিল। ঋষি নারী-গন্ধে প্রমত্ত হইয়া অনুনয় বিনয় সহকারে অপ্সরাকে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অপ্সরা প্রথমে একটু উপেক্ষার ভাণ করিয়া, পরে তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিল। ঋষি প্রলোভনের বশীভূত হইলেন, কিন্তু একটু পরেই চৈতন্যোদয় হইলে, ইন্দ্রকে অভিসম্পাৎ করিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

সূত্রধর উপস্থিত অবস্থাটা বুঝাইয়া দিল। শকুন্তলা জন্মগ্রহণ করিল। শকুন্তলার জননী শকুন্তলাকে বনে পরিত্যাগ করিল। কণ্ব

শিষ্যকে নীতিশাস্ত্রের উপদেশ দিতে দিতে প্রবেশ করিলেন। তিনি শিশুর ক্রন্দন শুনিতে পাইয়া অনুসন্ধান করিবার জন্য শিষ্যকে পাঠাইলেন। তাপস-যুবক শকুন্ত-বেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র কন্যাকে দেখিতে পাইল। কণ্ব তাহাকে কুড়াইয়া আনিয়া, তাহার নাম দিলেন—শকুন্তলা। সূত্রধর কর্ত্তৃক আর একটি কালব্যবধান বিজ্ঞাপিত হইল:—শকুন্তলা বিবাহ-যোগ্য বয়স প্রাপ্ত হইয়াছে। সদানন্দ ঋষি তাঁহার অনুষ্ঠিত একটি যজ্ঞে উপস্থিত হইবার জন্য কণ্বকে অনুরোধ করিলেন। শকুন্তলাকে আশ্রমে রাখিয়া কণ্ব প্রস্থান করিলেন। সখীর সহিত একাকী থাকিয়া শকুন্তলা পুষ্পচয়নে প্রবৃত্ত হইল। সূত্রধর কর্ত্তৃক দুষ্মন্তের প্রবেশ বিজ্ঞাপিত হইল। রাজা অনুচর ও অমাত্য-দিগের সহিত সবৈভবে রাজসভায় উপবিষ্ট। মৃগেরা ক্ষেতের শস্য নষ্ট করিতেছে বলিয়া প্রজারা রাজার নিকট অভিযোগ করিল। শ্রমজীবিরা ঐ একই সুরে কান্নাকাটি আরম্ভ করিয়া দিল। রাজা শিকারীদিগকে ডাকাইয়া আনিলেন। মৃগয়ার গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে উহারা রাজার নিকটে আসিল।

এই সময়ে রঙ্গভূমি হঠাৎ তপোবনে পরিণত হইল।

একটি মৃগকে অনুসরণ করিতে করিতে রাজা পথ হারাইয়াছেন। সরোবরের তীরে একটি কুঞ্জকানন তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। উহাই তিনি একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং হঠাৎ শকুন্তলাকে দেখিতে পাইয়া তাহার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইলেন। রাজা শকুন্তলার নিকটে গেলেন। শকুন্তলাও তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার মহিমাকীর্ত্তন করিতে লাগিল। শকুন্তলা তাঁহার রাণী হইবে, শকুন্তলার পুত্র তাঁহার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইবে এইরূপ আশ্বাস দিয়া রাজা তাহার পাণিগ্রহণের প্রার্থী হইলেন। শকুন্তলা স্বীকৃত হইল। পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধ হইবার জন্য উভয়ে লতাকুঞ্জের মধ্যে প্রস্থান করিলেন। আবার তাঁহারা পুনঃপ্রবেশ করিলেন। দুষ্মন্ত শকুন্তলার নিকট বিদায় লইলেন এবং পরদিন তাহাকে রাজধানীতে ঘটা করিয়া আনিবার জন্য লোক লস্কর পাঠাইবেন এইরূপ অঙ্গীকার করিলেন। রাজা তপোবন হইতে দূরে চলিয়া গেলেন এবং রাজধানীতে উপনীত হইলেন।

আবার দুই বৎসরের কাল-ব্যবধান সূত্রধর কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত হইল। একজন শিষ্যের রক্ষণাধীনে, ভরতকে লইয়া দুষ্মন্তের প্রাসাদে যাইবার জন্য কণ্ব শকুন্তলাকে আদেশ করিলেন। তিনজনে যাত্রা করিলেন। শিশু ভরত পথশ্রান্ত হইয়া পড়িল। অবশেষে তাঁহারা হস্তিনাপুরে উপনীত হইলেন।

সূত্রধর কর্ত্তৃক মগধরাজের আগমনবার্ত্তা বিজ্ঞাপিত হইল। মগধরাজ দুষ্মন্তকে অভি-নন্দন করিতে আসিয়াছেন। পরে কেকয়-রাজার আগমন সূচিত হইল। নৃপতিদ্বয় প্রবেশ করিয়া দুষ্মন্তকে অভিবাদন করিলেন। এই সময়ে ভরতকে লইয়া শকুন্তলাও রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং রাজাকে পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইয়া দিল। রাজা শকুন্তলাকে উপহাস করিলেন। শকুন্তলা ক্রোধে আত্মহারা হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল। মন্ত্রিগণ রাজার আচরণে অনুমোদন করিলেন এবং উঁহাদিগকে বিদূরিত করিবার জন্য প্রতিহারীকে আদেশ

করিলেন। অবমানিতা পত্নী আকাশবাণীকে আহ্বান করিল। আকাশবাণী আবির্ভূত হইয়া প্রকৃত কথা প্রকাশ করিল। রাজা ভরতকে আলিঙ্গন করিলেন, আদর করিলেন, গুরুগম্ভীরভাবে সর্ব্বসমক্ষে তাহাকে পুত্র বলিয়া স্বীকার করিলেন। উপস্থিত নৃপতিগণ ও অমাত্যবর্গ উহাদিগকে অভিনন্দন করিলেন। মহাভারতের বর্ণিত কাহিনীর ঐকান্তিক অনুসরণ ইহা অপেক্ষা আর কিছুই হইতে পারে না। সমস্ত আখ্যানটি নাট্যে পরিণত হইয়াছে। কবি, সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আপনাকে সংযত করিবার চেষ্টা করেন নাই, অথবা আপন ইচ্ছামত দৃশ্য পরিবর্ত্তন করেন নাই। নাট্যকার্য্যের প্রণালীতে বালকোচিত সরলতা প্রকাশ পায়। নাটকীয় কালব্যবধান, ঘটনাস্থান, বিবিধপাত্রের অবস্থা সূত্রধরের দ্বারা জানাইয়া দিয়া কবি নাট্যশাস্ত্রকে একটু অব্যাহতি দিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিরহে

১

লাল টকটকে
ব্যথার শোণিত লেখা,
ছিটায়ে পরাণে
চলে গেছে হৃদি সখা ;

২

দূর ব্যবধান
সুদূর প্রবাস পারে,
কঠিন নিয়তি
টেনে নিয়ে গেছে তারে,

৩

সেথা সে গুমরি
চাপিছে মরম ব্যথা,
এখানে ফুকারি
কাঁদিছে বেদনাহতা।

শ্রীপ্রতিভাকুমারী দেবী

মিলনে

১

রয়েছি বসিয়া
প্রাণে লয়ে প্রীতিডোর,
আসিবে আজিকে
হৃদয়ে হৃদয়চোর ;

২

প্রাণে এঁকে দেবে
মিলনের আলপনা,
চমকি উঠিব
সে পরশে আনমনা ;

৩

বিরহে তাহার
পেয়েছিল যাহা লয়,
মিলনে সেটুকু
হইবে নিখিলময়।

শ্রীপ্রতিভাকুমারী দেবী

রাজহংসের আবাসভূমি

ইংলণ্ডের এবট্‌সবারী গ্রাম একটি ছোটখাট পৃথিবী বিশেষ। এমন বিচিত্র, সুন্দর ও প্রাচীন গ্রাম ইংলণ্ডের আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। ইহার চতুর্দ্দিকে জনমানবশূন্য তৃণশ্যামল পতিতভূমি সকল বিস্তীর্ণ; সবুজ পর্ব্বতশ্রেণী কত যুগ যুগান্তরের রহস্যময় কাহিনী লুক্কায়িত রাখিয়া ইহাকে বেষ্টনপূর্ব্বক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এবট্‌স্‌বারী একটি অতি পুরাতন সুরম্য স্থান। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রস্তরনির্ম্মিত কুটীরসমূহ গ্রামের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। গ্রাম্য মঠের জন্য এই স্থানটী প্রাচীনকাল হইতেই প্রসিদ্ধ। ইহার ভূতপূর্ব্ব মালিকগণ মঠধারী ছিলেন; এবং তাহা হইতেই এই গ্রামের নামোৎপত্তি। এখানকার জলবায়ু এত মৃদু যে, জলপাই বৃক্ষগুলি অনায়াসে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ফলভারাবনত হইয়া পড়ে; এবং ফেব্রুয়ারী হইতে মে মাস পর্য্যন্ত নেত্রমুগ্ধকর কেমেলিয়া গুল্মে সুন্দর কুসুমকলিকানিচয় উন্মুক্ত বাতাসে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। বিবিধপ্রকার পক্ষীর আবাসস্থল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপলখণ্ডে পরিপূর্ণ চেসিল বীচ নামক সমুদ্র-তট এখানকার একটি দর্শনযোগ্য মনোরম স্থান! এখন এবট্‌স্‌বারী গ্রাম—ইহার প্রাচীন ভগ্নাবশেষ, পুরাতত্ত্ব ও কিম্বদন্তীর জন্য এবং সর্ব্বাপেক্ষা অসংখ্য নয়নবিমোহন রাজহংসের আবাসভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এবট্‌স্‌বারী হইতে পোর্টল্যাণ্ড পর্য্যন্ত দীর্ঘ নয় মাইলব্যাপী এক সরল, সঙ্কীর্ণ, ঈষৎ লবণরসাক্ত জলাভূমি আছে। পূর্ব্বোক্ত চেসিল বীচ প্রাচীরস্বরূপ হইয়া ইহাকে সমুদ্র হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া দিয়াছে। বিগত শরৎকালে গণনা করিয়া দেখা গিয়াছিল যে, এই বিলে সর্ব্বশুদ্ধ ১০৪৩টি রাজহংস বিচরণ করে, তন্মধ্যে ৯২১টি বয়ঃপ্রাপ্ত ও অবশিষ্ট ১২২টি হংসশিশু।

মিঃ গ্রিগরী গিল আজ ৩৩ বৎসর ধরিয়া এই রাজহংসগণের প্রধান রক্ষকস্বরূপ নিযুক্ত আছেন। তিনি একজন সুশ্রী, সবল ও আমোদপ্রিয় ব্যক্তি। হংসদিগের স্বভাব, আচার ব্যবহার প্রভৃতি সম্বন্ধে যথাযথ বর্ণনা করিতে তাঁহার ন্যায় দ্বিতীয় ব্যক্তি আর পৃথিবীতে আছে কিনা সন্দেহ।

বহুকাল পূর্ব্বে একটি অত্যুন্নত পর্ব্বতের চূড়ায় Saint Catharine-এর সম্মানার্থে এক ক্ষুদ্রায়তন প্রস্তরনির্ম্মিত উপাসনামন্দির স্থাপিত হইয়াছিল। এই দেবালয়টি যেন বজ্রনির্ম্মিত; বিগত চার পাঁচ শত বৎসর যাবৎ কালের করাল আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া আসিতেছে। এই পর্ব্বতের শিখরদেশে আরোহণ করিলে এবট্‌স্‌বারীগ্রামের একটি চমৎকার দৃশ্য নয়নপথে পতিত হয়। বিশেষতঃ মধুর বসন্তের সূর্য্যাস্তের সময় সমস্ত গ্রামটি যেন স্বর্ণরেণুমণ্ডিত বলিয়া ভ্রম হয়। পদতলে তৃণবিশেষে পরিপূর্ণ প্রশান্ত সলিল—খাল বিল ও ক্ষুদ্র দ্বীপ-সমূহ প্রসারিত রহিয়াছে। সেইখানে সহস্রাধিক রাজহংস বাস করে। পশ্চাতে এক সঙ্কীর্ণ সুনীল জলাশয়ে রাজহংসগণ বিচরণ করিতেছে; এই জলাভূমির

অপর পার্শ্বে চেসিল বীচ। এই উপকূলটি পূর্ব্বদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, এবং পক্ষীদিগের আহারস্থল ও ক্রীড়াভূমি হইতে সমুদ্রকে বিভক্ত করিয়া দিয়াছে। পূর্ণিমা রজনীতে, অনন্তবিস্তৃত সুনীলাম্বরে পূর্ণচন্দ্র হাসিতে থাকে, এবং জলাশয়ের নীলজলে রাজহংস বিচরণ করিয়া বেড়ায়। রজতধবল জ্যোৎস্নাধারায় সিক্ত হইয়া হংসগুলি এক অভিনব দিব্য শ্বেত কলেবর ধারণ করে। যথার্থই এ দৃশ্য বড়ই মধুর, বড়ই উজ্জ্বল।

মিঃ গিল নিজ সন্তানের ন্যায় এই রাজহংসদিগকে ভালবাসেন এবং অপর কেহ ইহাদের প্রশংসা করিলে মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিত হন। তিনি ইহাদের প্রত্যেকের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত; এবং ইহারাও তাঁহাকে খুব ভালবাসে। তিনি একদিন তাঁহার এক বন্ধুর নিকট হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন,—"ইহাদের মধ্যে এমন একটিও হংস নাই, যাহাকে ধরিয়া তাহার গলার ভিতর আমি নির্ব্বিঘ্নে আমার জিহ্বা প্রবেশ করাইয়া দিতে না পারি।

সহস্রাধিক রাজহংস বিচরণ করিতেছে

আমি কত শতবার এইরূপ করিয়াছি!" কিন্তু দর্শকগণ ইহাদের বাসা নির্ম্মাণ করিবার সময় তাহার পার্শ্বস্থ তৃণশ্যামল পথের উপর দিয়া গমনাগমন করিলে, ইহারা ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়, ডানা নাড়া দেয় এবং মস্তক পশ্চাতে হেলাইয়া দিয়া সহস্র সর্পের ন্যায় ফোঁস ফোঁস শব্দ করিতে থাকে।

মুক্ত হংসগণ বন্য পক্ষীর ন্যায় স্বাধীন জীবনযাপন করিয়া থাকে। বোধহয় ইহারাও এই আবাসভূমিকে একটি পবিত্র আশ্রম বলিয়া মনে করে; কারণ এতগুলি হংস একস্থানে এত পাশাপাশি বাসা করিয়া থাকা ইহাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। রক্ষক ইহাদের নিকটে যাইয়া শীস দিলে, ইহারা তাহার চতুঃপার্শ্বে সমবেত হয়। তখন ইহাদের ভাবভঙ্গী দেখিলে মনে হয় যেন কোন গোলাঘরের প্রাঙ্গণে পাতিহংসগণ আহারের সময়

রাজহংসের আবাসভূমি

উপস্থিত হইয়াছে! ইহারা সকলেই পালিত হংস, কর্কশশব্দকারী বন্যহংস নহে। গৃহপালিত হংসদিগকে তাহাদের চঞ্চুতে ঝুঁটির ন্যায় কোন পদার্থ ও স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বরের দ্বারা বন্য পক্ষী হইতে প্রভেদ করা হইয়া থাকে। তাহাদের কণ্ঠধ্বনি তুরীনিনাদের ন্যায় সুললিত আর বন্য হংসগণের স্বর কর্কশ হংঘনে। সেইজন্য ইংরাজীতে ইহাদিগকে (whoopers বা whistlers বলে) গত বৎসর বসন্তকালে একটি বন্যহংস এই সুখপালিত রাজহংসদিগের শান্তিময় আবাসস্থল ও স্বাধীন জীবন দেখিয়া এতই আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, সে চিড়িয়াখানা হইতে অতিকষ্টে এইখানে পালাইয়া আসিয়াছিল। রক্ষক তাহাকে ধরিয়া পুনর্ব্বার সেইখানে প্রেরণ করিতে উদ্যত হইল; কিন্তু অবশেষে করুণাপরবশ হইয়া হংসটিকে জলাভূমিতে স্বাধীনভাবে বাস করিতে দিল। অদ্যাবধি সে এখানে কর্কশ শব্দ করিতে করিতে বিচরণ করে, এবং পালিত হংসগণের মধ্য হইতে আপনার জীবনসঙ্গিনী মনোনীত করিয়া লইয়াছে।

আদিকাল হইতে ইহারা রাজহংস বা রাজকীয় পক্ষী (Royal Bird) নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। জনশ্রুতি এইরূপ চলিয়া আসিতেছে। এবং অতি প্রাচীনকালে এইরূপ নিয়ম প্রচলিত ছিল যে, সাধারণ জলাশয়ে যে সকল রাজহংস সন্তরণ করিবে, তাহারা রাজার অধিকারভুক্ত। ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম হেনরির রাজত্বকালে এবট্‌স্‌বারীর মঠ ভাঙ্গিয়া গেলে, তিনি বর্ত্তমান মালিক লর্ড ইল্‌চেস্‌টারের পূর্ব্বপুরুষ

গাইল্‌স্‌ ষ্ট্রাঙ্গওয়েস্‌কে এই হংসপূর্ণ জলাভূমিটি পুরস্কারস্বরূপ দান করিয়াছিলেন। লর্ড ইল্‌চেস্‌টার চতুর্দ্দশ বৎসরের মধ্যে হংসের সংখ্যা প্রচুর বৃদ্ধি করিয়াছেন।

প্রত্যেক ঋতুতে হংসশিশুগুলি চিহ্নিত হয়। এবং মধ্যে মধ্যে অপহৃত বা দলভ্রষ্ট হংস-দিগকে দাবী করিয়া ফিরাইয়া আনিতে রক্ষককে দশ ক্রোশ পথ ভ্রমণ করিতে হয়। একবার একজন এই রাজহংসগণের মধ্যে একটিকে গুলি করিয়া মারায় বিচারালয়ে অভিযুক্ত হইয়াছিল। যদিও সে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া বলিয়াছিল যে, ইহাকে একটি সামুদ্রিক পক্ষীবিশেষ বা গং চিল বোধেই সে হত্যা করে; তথাপি তাহার সম্পূর্ণ দোষ ক্ষালণ হইল না। এবং জরিমানাস্বরূপ তাহাকে এক সভরেন অর্থদণ্ড দিতে হইল। সম্বৎসর ধরিয়া প্রধান রক্ষক ও তাঁহার দুইজন সহকারী এই দীর্ঘ নয় মাইলব্যাপী জলাভূমিটিকে বিশেষ সতর্কতার সহিত রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে।

ইহাদের বাসনির্ম্মাণ ও ডিমপ্রসবের বিষয় মিঃ গিল তাঁহার কোন বন্ধুর নিকট নিম্নলিখিত গল্প করিয়াছেন।

মার্চ্চমাসের মধ্যভাগে হংসগণ জলাভূমির কোন নিভৃত অংশে বাসা নির্ম্মাণ করিবার জন্য সমবেত হয়। একই জোড় প্রতি বৎসর প্রায় একই স্থানে বা তাহার এক গজের মধ্যেই বাসা প্রস্তুত করিতে আসে। নল শর খাগড়া প্রভৃতি তৃণদলের কোন অভাব নাই; জলমধ্যে এই সব প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ পুরুষ হংসগণই এই সব সংগ্রহ করিয়া থাকে, এবং তাহাদের সাহায্যে হংসীগণ তৃণগুলি যথাযথ স্থানে স্থাপন

রাজহংসের বাসা

করে। বাসা প্রস্তুত হইয়া গেলে, ইহারা তাহার চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচীর দিতে আরম্ভ করে। এবং বন্যায় সব ভাসাইয়া লইয়া যাইবে এইরূপ কোন ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলে, ইহারা সমস্ত বাসাটি তুলিয়া লইয়া যায়। হংসী নিজ চঞ্চুর দ্বারা ডিম গুলি উচ্চে উঠাইয়া লইয়া যায়। ইহাদের স্ত্রীপুরুষের মধ্যে প্রবল আকর্ষণ। ইহাদের দাম্পত্য প্রেম প্রসিদ্ধ ও স্থায়ী। একই জোড়া পাখী আজীবন পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত ও প্রেমাসক্ত থাকে।

প্রায় এপ্রিল মাসের প্রথম তারিখ হইতেই ইহারা ডিম প্রসব করিতে আরম্ভ করে। কিম্বা যেদিন বাসা নির্ম্মাণ শেষ হইয়াছে, সেইদিন হইতে আরম্ভ করিয়া এক পক্ষের মধ্যে ইহাদের ডিম পাড়া শেষ হইয়া যায়। সাধারণতঃ ছয়টি করিয়া ডিম্ব প্রত্যেকে প্রসব করে, এবং তন্মধ্যে পাঁচটিকে ফুটাইয়া তোলা হয়। কিন্তু মিঃ গিল তিনবার এক বাসায় ১১টি ডিমও দেখিতে পাইয়াছিলেন। স্ত্রী ও পুরুষ দুইজনে পর্য্যায়ক্রমে ডিম গুলিতে তা দিয়া থাকে। হংসী দিনের মধ্যে একবার আহারের অন্বেষণে বাহির হয়। তখন হংসগণ ডিমের উপর বসিয়া থাকে। নব-প্রসূতা হংসীদিগের মধ্যে কেহ কেহ এক ঘণ্টা, কেহ বা পাঁচ ছয় ঘণ্টাকাল বাহিরে থাকে। এবং কাহারও সন্তানের প্রতি মায়া এত বেশী যে, ডিম ফুটাইবার সময় সে কিছুতেই তাহার অমূল্য ধনসম্পদ ত্যাগ করিয়া যায় না, এবং অবশেষে অনাহারে ক্ষীণ ও রুগ্ন হইয়া অস্থিপঞ্জর সার হইয়া পড়ে। মে মাসের ১৭ই তারিখের কাছাকাছি ডিমগুলি ফুটিতে আরম্ভ হয়। এবং সাধারণ নিয়মানুসারে একই বাসার সমস্ত ডিম একই দিনে ফুটিয়া উঠে। হংসশিশু ডিম হইতে বাহির হইয়া আসিলেই তাহার পায়ের বাহিরকার যুক্তাঙ্গুলিতে একটি খাঁজ কাটিয়া দেওয়া হয়। দ্বিতীয় দিবস শাবক গুলি প্রথম সন্তরণ দিবার জন্য জল ভ্রমণে বাহির হয়। ইহারা ধীরে ধীরে সোজা সাঁতার কাটিয়া যায়। এবং প্রথম প্রথম ইহাদিগকে একটু একটু হেলিতে দুলিতে দেখা যায়। হংসী শাবকদিগকে নিজের পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত বেড়াইয়া লইয়া আসে। কিন্তু ইহারা সহজে ইহাদের কঠোর-প্রকৃতি জনক জননীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিতে চায় না।

অনেক ঈর্ষান্বিত জনক শিশুহংসদিগকে হত্যা করিয়া ফেলে। কিন্তু জননীগণ—ইহাদের যতগুলি-ই শাবক থাকুক না কেন, আরও পাইবার জন্য লালায়িত হয়। সম্ভবপর হইলে ইহারা অপর দম্পতির সন্তানগণকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করে কিম্বা বিদ্বেষ পরবশ হইয়া তাহাদের মস্তক ধরিয়া নাড়া দেয়। কখন কখন জলের নীচে তৃণগুল্মের মধ্যে ছোট হংস-শাবকের মস্তক আবদ্ধ হওয়ায়, জলমগ্ন হইয়া যায়। ইঁদুরে অনেকগুলিকে বধ করে; এবং প্রতি ঋতুতে শৃগালের অত্যাচারেও অনেক গুলি প্রাণত্যাগ করে। ইহাদের যথাসম্ভব রক্ষণের জন্য নিম্নলিখিত কৃত্রিম উপায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কোন আবদ্ধ সীমার ভিতর পাঁচটি বয়ঃপ্রাপ্ত হংসকে রাখা হয়; এবং তাহাদের প্রত্যেকের অধীনে ৩০।৪০টি করিয়া হংসশিশু বাস করে।

সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত ইহারা এই প্রশস্ত জলপূর্ণ খোঁয়াড় বিশেষে অপেক্ষাকৃত নিরাপদে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে। সেপ্টেম্বর মাসে প্রায় ৪০টি হংসশাবককে ভোজের নিমিত্ত হত্যা করা হয়। এবং অবশিষ্ট গুলিকে মুক্ত করিয়া বিক্রয় করা হয়। মধ্যে মধ্যে জলাশয়ের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য নয়ন-রঞ্জক দুই একটি রাজহংস শিশুকে রাখিয়াও দেওয়া হয়। চারমাস বয়স্ক এক জোড়া হংসশিশুর মূল্য এক গিনি, এবং এক বৎসর বয়স্ক জোড়ের মূল্য দুই গিনি।

অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত ইহারা ইহাদের জননী বা পালিতা মাতার সহিত একত্রে বাস করে; তারপর নিজেদের পথ নিজেরা দেখিয়া লয়। এক বৎসর পূর্ণ হইলে ইহারা শৈশবাবস্থা ত্যাগ করিয়া যৌবনে পদার্পণ করে। এবং অষ্টাদশ মাস অতীত হইলে ইহাদের কলেবর সম্পূর্ণ পালক যুক্ত হয় এবং গায়ের রং নির্ম্মল শ্বেতবর্ণ ধারণ করে। ইহার পর হইতে বৎসরে একবার জুন বা আগষ্ট মাসের মধ্যে ইহারা পালক ত্যাগ করিতে আরম্ভ করে। কতকগুলি হংসকে পালক ত্যাগ করিবার সময় অত্যন্ত কষ্টভোগ করিতে হয়; এবং এই যন্ত্রণাদায়ক প্রক্রিয়ার সময় ইহারা উড়িতে পারে না বলিয়া অনায়াসেই শৃগালের করাল কবলে পতিত হয়। রক্ষকগণ লেখনী প্রস্তুত করিবার জন্য পালক গুলি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া দেয়। প্রতি বৎসর তাহারা প্রায় তিন চার হাজার পালক সংগ্রহ করে। প্রত্যেক হংস কলমের উপযোগী ৮টি পালক দান করে; এবং কলমের অনুপযুক্ত পালক গুলি সংগৃহীত হয় না। প্রত্যেক পক্ষ হইতে তিনটি করিয়া বৃহৎ পালকযুক্ত কলম বাহির হয়।

একদিন একজন দূরদেশ হইতে আগত দর্শক রক্ষককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—"আপনি কি কখন বাসা নির্ম্মাণের সময় এই হংসদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছেন?" তাহাতে মিঃ গিল ঈষৎ হাসিয়া বলিয়াছিলেন,—"আমার এই এতদিনের অভিজ্ঞতায় আমি কখন কোন মানুষের হাত বা পা হংস দ্বারা আহত হইতে শুনি নাই।" কিন্তু তিনি একটি গল্প বলিলেন যে পিটম্যান নামক একজন বৃদ্ধ রক্ষকের তিনটি পঞ্জর পশ্চাৎ হইতে অপত্যাশিত আক্রমণের ফলে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। পিটম্যান এবং তাহার পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ দুইশত বৎসর যাবৎ এই হংসগণের রক্ষক স্বরূপ নিযুক্ত ছিলেন। তৎপরে মিঃ গিল কি উপায় অবলম্বন করিয়া হংসের আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে হয় তাহা বুঝাইয়া দিলেন। কেবল একটি বড় পক্ষের অগ্রভাগ ধরিলেই হংসের বলবিক্রম সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়।

শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সৌধ-রহস্য

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আমাদের ছোট গ্রামখানিতে ক্রুমবার হলের অধিবাসীগণকে লইয়া খুবই জল্পনা কল্পনা চলিতেছিল। তাহারা কে? কোথা হইতে আসিয়াছে? এমন নিঃসঙ্গ নির্জ্জন বাস, এরূপ আত্ম-গোপনের অর্থ কি? ইহাই ছিল সাধারণের কৌতূহল-প্রশ্ন। কিন্তু শীঘ্রই বুঝা গেল, যে ক্রুমবার হলের নূতন অধিকারী বড় অল্পদিনের জন্যই এখানে আসিতেছেন না। কারণ উইগটাউন হইতে রাজ-মজুর-মিস্ত্রী প্রভৃতি আসিয়া সকাল হইতে সন্ধ্যা অবধি বিপুল উদ্যমে বাড়ী মেরামতির কাজ চালাইতে লাগিল। বাড়ীটার অস্বাভাবিক দ্রুত পরিবর্ত্তনে জেনারল হিথ ব-ষ্টনের ধনশালিতা সম্বন্ধে খেয়ালি লোক গুলার সন্দেহ ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছিল। কেহ বলিল, তিনি আমেরিকার একজন ক্রোরপতি। কেহ বলিল, আরও কিছু।

বাবা বলিলেন, "লোকটির বোধ হয় পড়াশুনায় খুব অনুরাগ আছে, না হলে বেছে বেছে এমন নির্জ্জন স্থান পছন্দ করবেন কেন? আমার বোধ হয় কোন নূতন বিষয়ে কোন গভীর তত্ত্ব রচনা করবার জন্যই তিনি স্বেচ্ছায় এই বনবাসে আস্‌চেন,—তা যদি হয়, আমি মহানন্দে আমার লাইব্রেরীর সমস্ত বইগুলি তাঁকে পড়্‌তে দেব।"

এস্‌থার ও আমি বাবার মুখের সে গম্ভীর ভাব দেখিয়া কষ্টে উচ্ছ্বসিত হাস্য সম্বরণ করিলাম। লাইব্রেরীর খবর ত আর আমাদের অগোচর নাই। দুই থলি মাত্র বই লইয়া আমাদের লাইব্রেরী! আমি বলিলাম, "আপনার অনুমান সত্য হতে পারে কিন্তু আমি তাঁকে যতটুকু দেখেছি, তাতে তিনি যে বিশেষ সাহিত্যানুরাগী, এমন ত আমার একবারও মনে হয় নি। আমার মনে হয় ডাক্তারের উপদেশে তাঁর নষ্ট স্বাস্থ্য আর দুর্ব্বল চিত্তকে তাজা করে নেবার জন্যই তিনি এই নির্জ্জন শান্তিপূর্ণ স্বাস্থ্যকর স্থানটুকু পছন্দ করে নিয়েছেন। ব্যাধ ভয়ে ভীত হরিণের মত তীক্ষ্ণ সশঙ্ক চোখে তিনি যখন আমার দিকে বারবার চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছিলেন, আপনি যদি তখন তাঁর সে চাহনি দেখ্‌তেন বাবা, তাহলে বুঝ্‌তে পার্‌তেন বেচারার স্বাস্থ্য কতটা খারাপ হয়ে গেছে।"

হাতের সেলাইয়ের উপর হইতে চোখ উঠাইয়া বাবার মুখের পানে চাহিয়া এস্‌থার বলিল, "আমার ভারী জান্‌তে ইচ্ছে কর্‌চে বাবা, তাঁর স্ত্রী পুত্র কেউ আছে কি না? আহা, বেচারাদের বড্ডই ফাঁকা ঠেক্‌বে—সাত মাইলের মধ্যে আমরা ছাড়া ত আর কথা বলবার মত একটি প্রাণী নেই।"

ঈষৎ গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বাবা বলিলেন, "জেনারেল হিথারষ্টন বড় কৃপার পাত্র যে-সে লোক নয় জেনো,—তিনি একজন বিখ্যাত সৈনিক।"

"কি করে জান্‌লেন আপনি বাবা? বলুন না, কি করে জান্‌লেন?" সবিস্ময়ে একসঙ্গে আমরা দুইজনেই এই প্রশ্ন করিলাম।

হাসিতে হাসিতে মাথা নাড়িয়া বাবা বলিলেন, "এই না, তোমরা আমার লাইব্রেরীর ক্ষুদ্রতায় মনে মনে হাস্‌ছিলে—আমি বুঝি তা বুঝিনি?" কথা শেষ করিবার পূর্ব্বেই তিনি চেয়ার ত্যাগ করিয়া উঠিয়া সেল্‌ফের উপর হইতে একখানা লাল রঙের ছোট বাঁধান বই লইয়া আসিলেন। বইখানা ভারতবর্ষীয় সৈনিক বিভাগের তালিকা।

"এই দেখ, এতে তাঁর নাম রয়েচে, জে, বি, হিথারষ্টন, কমাণ্ডার অফ্ দি বাথ্। ইনি আবার একজন "ভি-সি"। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে বঙ্গীয় ৪১নং পদাতিক সৈন্যের কর্ণেল ছিলেন। তার পর দেখ, আর এক জায়গায় তাঁর জীবনের কার্য্যাবলীর উল্লেখ রয়েচে, "গজনী-অবরোধ", "জেলালাবাদ-রক্ষা" "সিপাহী-বিদ্রোহে অযোধ্যাপ্রদেশ শাসন" সরকারী কাগজ-পত্রে পাঁচবার তাঁর নাম তোলা আছে। আমার মনে হয় এমন প্রতিবাসীর জন্য আমাদের গর্ব্ব করা উচিত!"

এস্‌থার তাহার হস্তস্থিত সেলাইটার উপর হইতে চোখ তুলিয়া সৌৎসুক্যে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা বাবা, তাঁর বিয়ে হয়েছিল কি না, ও বইখানাতে কিছু লেখা নেই, বোধ হয়?"

বাবা হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "না মা, যুদ্ধ-বিগ্রহের ঘটনার মধ্যে ও ঘটনাটার কোন উল্লেখ দেখ্‌তে পাচ্ছি না, যদিচ সেটা থাক্‌লে ভালই হত!—তা যাই হোক, খুব সম্ভবত দু একদিনের মধ্যেই তোমরা এই অদ্ভুত প্রয়োজনীয় ব্যাপারটা আবিষ্কার করে ফেল্‌তে পার্‌বে।"

সত্যই আমাদের সন্দেহ শীঘ্র একদিন মিটিয়া গেল। বাড়ী মেরামতির কার্য্য যেদিন শেষ হইয়া গেল, সেইদিনই কোন কার্য্যোপলক্ষ্যে আমায় উইগটাউনে যাইতে হইয়াছিল। সেই সময় মধ্য পথে অতর্কিতভাবে সহসা তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিয়া গেল। একখানা নূতন গাড়ীতে চড়িয়া তাঁহারা ক্লুম্বারের অভিমুখেই যাইতেছিলেন। জেনারেলের পার্শ্বে যিনি বসিয়াছিলেন, তিনি একজন অর্দ্ধবয়স্কা রমণী, তাঁহারই মত শীর্ণ দেহ, চিন্তা-মলিন মুখ। সম্ভবত ইনিই মিসেস্ হিথারষ্টন্! গাড়ীর সম্মুখস্থ আসনে আমার সমবয়সী একটি যুবক ও তাঁহার চেয়ে দুই তিন বৎসরের ছোট একটি সুন্দরী বালিকা। আমি টুপিটা একটু উঁচু করিয়া সম্মান দেখাইয়া গমনোদ্যত হইলে, কি জানি, কি মনে করিয়া, জেনারেল সহসা সহিসকে গাড়ী থামাইতে আদেশ প্রদান করিলেন। আদেশ পালিত হইলে বন্ধুভাবে আমার করমর্দ্দনের জন্য তিনি হস্ত প্রসারণ করিয়া দিলেন। দিনের আলোয় তাঁহার মুখের দিকে ভাল করিয়া একবার চাহিয়া দেখিলাম। যদিও সে মুখে একটা কঠোর কর্কশ ভাব সুপরিস্ফুট, তথাপি তাহার ভিতর হইতে কোমলতার ঈষৎ আভাষ, যেন, খুঁজিলে মিলে। জেনারেল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া বলিলেন, "তারপর মিঃ ওয়েষ্ট, আছ কেমন তুমি? আমি আজ আবার আগার সেদিনকার ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাইচি। বয়স হয়েচে, আর যুদ্ধের কাজেই চিরটা কাল কেটে গেল, সমাজের আদব-কায়দা আমাদের ততটা জানাশোনাও নেই। তা হলেও এটা তোমায় স্বীকার কর্‌তেই হবে

যে, স্বচ্‌ম্যানের পক্ষে তোমার রংটা কিছু বেশী ময়লা।”

আবার সেই অপ্রাসঙ্গিক কথার অবতারণায় একটু বিস্ময় বোধ করিয়া আমি উত্তর দিলাম, “আমাদের শরীরে স্পেনিস্ রক্ত মিশ্রিত থাকায় আমাদের রঙ একটু আলাদা রকম হয়েচে। এ ছাড়া বর্ণের বিভিন্নতার আর কোন কারণ নেই।”

আমার কথার উত্তরস্বরূপ শুধু একটি ছোট ‘ওঃ’ বলিয়াই তিনি আবার কহিলেন, “মিঃ ওয়েষ্ট, ইনি হচ্ছেন আমার স্ত্রী—এইটি আমার ছেলে মরডণ্ট, আর এটি মেয়ে গেব্রিয়েল। সংসারের সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্লান্ত হয়ে আমরা শুধু একটু শান্তির আশায় এখানে এসেচি।” জেনারেলের কথার শেষদিককার সুরে ও ভাষায় এক মুহূর্ত্তে আমার মনের বিরুদ্ধ ভাব কাটিয়া গেল। তাই ঠিক! বেচারা সংসারের সহিত সংগ্রাম করিয়া ক্ষতবিক্ষত হইয়াই সমাজের উপর চটিয়া গিয়াছে। আহা, শান্তিহীন যুদ্ধ-ব্যবসায়ী!

একটু সাগ্রহ সহানুভূতি দেখাইয়া আমি বলিলাম, “তা হলে আপনাকে ঠক্‌তে হবে না। এর চেয়ে ভাল জায়গা কোথাও পাবেন না। প্রকৃতি দেবী এখানে দুহাতে শান্তি ছড়াচ্ছেন!”

“আঃ! তুমিও তা হলে তাই মনে কর? আমারও মনে হয়েছিল, স্থানটি বেশ নির্জ্জন, শান্তিপূর্ণ। তা হলে দেখছি আমি প্রতারিত হই নি! আমার বোধ হয় রাত্রে কেউ যদি পথে বেড়িয়ে বেড়ায়—তা হলে কোন মানুষের সঙ্গে তার দেখা-সাক্ষাৎ হয় না,—না?”

“না, তা হয় না। তার কারণ সন্ধ্যার পর পথে কেউ বেরোয় না এখানে। অর্থাৎ বেরুবার মত লোকও কেউ নেই।”

জেনারেলের মেঘাবৃত মুখের উপর হইতে যেন ভাবনার একখানা গাঢ় কৃষ্ণ মেঘ সরিয়া গিয়া মুখে একটা প্রসন্নতার স্বচ্ছতা ফুটিয়া উঠিল। অপেক্ষাকৃত কোমল সুরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “আচ্ছা, এখানে কি বেদে নাগা ফকির সন্ন্যাসীর কোন উৎপাত আছে? আমার বোধ হয়, নেই—নয়?”

মিসেস হিথারষ্টন গায়ের শীত-নিবারক সীল্-স্কিনটা একটু টানিয়া গায়ে ঢাকা দিয়া ত্বরিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, “আমার ভারী শীত লাগচে—আর মিঃ ওয়েষ্টকেও আমরা অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেচি।” চকিত দৃষ্টিতে একবার পত্নীর মুখের প্রতি চাহিয়া সহসা বিচলিতভাবে জেনারেল বলিয়া উঠিলেন, “সত্যি! কোচম্যান্ গাড়ী হাঁকাও—বিদায় মিঃ ওয়েষ্ট—আপাততঃ তা হলে বিদায়।”

গাড়ী দৃষ্টিপথের বাহির হইয়া গেলে ধীরে ধীরে আমি আমার গন্তব্য পথে চলিতে লাগিলাম। হঠাৎ ম্যাকলীনের সহিত দেখা হইয়া গেল। ম্যাকলীন আমায় পথে দাঁড় করাইয়া খবর দিলেন যে ক্লুমবার হলের নূতন অধিকারী আজ হইতে বাস করিতে সুরু করিলেন। আমি বলিলাম, “রাস্তায় তাঁদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।” কথাটা বলিয়াই আমি ম্যাকলীনের মুখের পানে চাহিলাম। পাঁওরুটীর মত তাহার ফুলা গাল দুইটা মদ্যপানে আরক্ত! মুখে-চোখে আনন্দের একটা উজ্জ্বল দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমার কথায় হাসিমুখে সে ক্ষুদ্র চক্ষু যথাসম্ভব

বিস্ফারিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "শুভ সংবাদ, মিঃ ওয়েষ্ট! তা হলে আপনার প্রতিবাসীকে আপনি চিনে নিয়েচেন—কেমন দেখলেন, বলুন দেখি ?"

বক্র কটাক্ষে ম্যাকলীনের মুখের পানে চাহিয়া উত্তর দিলাম, "মন্দ কি? আমার বোধ হয় লোকটীর স্বাস্থ্য ভাল নয়। এ জায়গাটায় তাঁর লিবারেব action ভাল হবে!"

ম্যাকলীন তাহার হাতের বেতের সরু ছড়ি গাছটি মাটিতে ঠুকিয়া হোঃ হোঃ শব্দে হাসিয়া উঠিল। হাসি থামিলে ক্ষুদ্র মিট মিটে চোখের রহস্যপূর্ণ দৃষ্টি আমার মুখে স্থাপিত রাখিয়া অপেক্ষাকৃত মৃদু স্বরে সে বলিল, "না মিঃ ওয়েষ্ট, তা নয়, এর চেয়ে তিনি যদি উইগটাউনের প্রাচীর-বেষ্টিত কোন অট্টালিকায় বাস করতেন, তা হলেই তাঁর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উচিত ব্যবস্থা হত—তা তিনি নিজের বাড়ীটিকেও অনেকটা সেই ধরণে তৈরি করিয়েছেন।"

বাধা দিয়া বিস্ময়ের সহিত আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কি তা হলে তাঁকে উন্মাদ বল ?"

"তা ছাড়া আর কি, বলুন! সহর ছেড়ে, ভাল ভাল দেশ ছেড়ে, এই একটা অগাপড়া দেশে—ক্লুমবারের মত একটা পোড়ো ভূতুড়ে বাড়ীতে জেলখানার মত পাঁচিল গাঁথিয়ে যে বড়লোক স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য গোপন বাস করতে আসে, তাকে পাগল ছাড়া আর কি নাম দেওয়া যেতে পারে, তা ত আমি জানি না।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "এই মাত্র,—তা বড় লোকদের এ রকম অদ্ভুত খেয়াল হয়, শুনেচি। তাই বলে—"

আমার কথায় বাধা দিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে ম্যাকলীন বলিল, "হাঁ, বড়লোক যদি বল্‌তে হয় তা হলে এই রকম! তাঁদের সঙ্গে কারবার করে সুখও আছে—এই দেখুন না—আজ সকালেই জেনারেল একখানা চেক্ দিয়ে আমায় জিজ্ঞেশ কল্লেন, "কত টাকা ফেলব ?" আমি বল্লেম, "দু'শ পাউণ্ড লিখুন।" অবশ্য তাতে আমার নিজের জন্য যৎকিঞ্চিৎ রেখে ছিলেম, তা জেনারেল চেক্‌খানা লিখে এম্‌নি তাচ্ছল্য করে আমাব দিকে সেটা ফেলে দিলেন যে, একখানা ছেঁড়া দু পয়সার ডাক্-টিকিটও মানুষ ততটা অগ্রাহ্য করে না।"

আমি বলিলাম, "আমার বিশ্বাস ছিল, এ সবের জন্যে বাড়ীওলা আপনাকে মাহিনা দেন ?"

"তা দেবে না কেন! তবে দু পয়সা যদি উপরি আসে, গরীব মানুষ, কাচ্ছা-বাচ্ছা নিয়ে ঘর করি, পেলে ছাড়ি কেন? আমি ত আর জোর করে আদায় করিনি, তিনি ভদ্রলোক, দরাজ হাত। আসুন না, মিঃ ওয়েষ্ট, ঘরের মধ্যে আসুন না, এক গেলাস খেয়ে যাবেন—বেশ ভাল জিনিষ আছে।"

"না, ধন্যবাদ! আমার দরকারী কাজ আছে, তা ছাড়া সকাল বেলা কখনো আমি মদ খাই না, খাওয়াটা ভালও নয়!"

"আমারও মশায়, সব বাঁধা নিয়ম। প্রাতরাশের সময় দু গেলাস, তারপর হজম করবার জন্যে এক কিম্বা দু গ্লাস—দুপুর বেলার আগে আর আমি মদ ছুঁইও না। সে যাই হোক—

বলছিলেম কি ? জেনারেলের কথা—লোকটি পাগল—একেবারে বদ্ধ পাগল। পাগলের লক্ষণ কি, মিঃ ওয়েষ্ট ?”

আমি হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলাম, “কেন, উইগটাউনের বাড়ীওলার লোককে বিনাবাক্যে দুশো পাউণ্ডের চেক্ কেটে দেওয়া !”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি বুঝতে পারচি, আপনি আমায় ঠাট্টা কচ্চেন! আচ্ছা, আপনি বলুন দেখি, যদি কেউ আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে, এ জায়গাটা সব চেয়ে নিকটের বন্দর থেকে ক মাইল তফাতে ? ভারতবর্ষের দিক থেকে কোন জাহাজ এখানে আসে কি না ? রাস্তায় নাগা ফকির বেদে সন্নিসি ঘুরে বেড়ায় কি না ? বাড়ীর এগ্রিমেন্টে বাড়ীওলা ভাড়াটেকে তাঁর ইচ্ছামত উঁচু পাঁচালি তুলে নিতে দেবেন কি না ? এই রকম যদি সব প্রশ্ন হয়, তা হলে আপনি তাকে কি মনে করেন? পাগল বলেন না কি ?” একটু গাম্ভীর্য্য দেখাইয়া উচ্ছ্বসিত হাস্য গোপন করিয়া আমি বলিলাম, “অবশ্য এ রকম হলে তাঁকে অদ্ভুত প্রকৃতির লোক বলেই মনে করতে হয় বই কি !”

“আমার পরামর্শ যদি নিতেন, তা হলে আমাদের বন্ধু সহজেই উঁচু পাঁচালি-ঘেরা বাড়ীও পেতে পারতেন, আর তাতে এক পয়সা খরচা ছিল না।” আমি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “তেমন পছন্দসই বাড়ীটি কোথায় ?”

“কেন, আমাদের উইগটাউনের পাগলা গারদ !”

ম্যাকলীনের উচ্চ হাস্যধ্বনি দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। তাহাই শুনিতে শুনিতে আমি বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। মনের মধ্যে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঐ “পাগলা গারদ” কথাটা বহুক্ষণ ধরিয়াই তোলাপাড়া করিতেছিল। কেবলই মনে হইতেছিল, বাস্তবিকই কি তাই ? সত্যই কি লোকটা পাগল ? এত বড় জেনারেল— !

ক্লুমবার হলের অধিবাসীরা আসা সত্ত্বেও আমাদের একঘেয়ে জীবন-যাত্রায় পরিবর্ত্তনের কোন আভাষ দেখা গেল না। সেই সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আপনাদের নিত্য কার্য্য, অপরাহ্নে সমুদ্রে নৌকায় চড়িয়া বেড়াইতে যাওয়া, এসথারের সহিত একত্রে দিগন্ত-প্রবাহিত নীলাম্বুর সহিত অনন্ত-প্রসারিত নীলাকাশের মিলন-ক্ষেত্রে অপরাহ্নে সূর্য্যাস্তের অননুভূতপূর্ব্ব মহামহিম সৌন্দর্য্য দর্শন করা,—রাত্রে বাবার সহিত আহারান্তে সাহিত্যালোচনা করিয়া নিদ্রা যাওয়া—ইহা ছাড়া অন্য নূতন কার্য্যও আর কিছু ছিল না। আমাদের নূতন প্রতিবাসিরা বাহিরে বেড়ানো বা লোকের সঙ্গে মেলামেশা এ সব কিছুই করিতেন না। এমন কি তাঁহাদের শরীরের ছায়াটি পর্য্যন্ত কোনদিন ফটকের বাহিরে পড়িতে দেখা যায় নাই। মুসলমান মহিলার মতই তাঁহারা স্ত্রী-পুরুষে সকলেই পর্দ্দানশীন্। তাহার পর ম্যাকলীনের সেই পরিহাস-বাক্যকে সত্যে পরিণত করিতে অল্পদিনের মধ্যেই একদিন দেখা গেল, কতক গুলি মিস্ত্রী আসিয়া জেনারেলের বাড়ীর চারিধারের কম্পাউণ্ড ঘিরিয়া কাঠের উচ্চ

দেওয়াল তুলিতে সুরু করিয়াছে। বেড়াটা এত উচ্চ যে, তাহা টপ্‌কাইয়া কেহ ভিতরে প্রবেশ করিবে, এমন সম্ভাবনা রহিল না। বেড়ার মাথায় তীক্ষ্ণ-মুখ লোহার বড় বড় গজাল লাগাইয়া দেওয়া হইল। আমাদের মনে হইল, রণস্থলে থাকিয়া থাকিয়া জেনারেল এই সবগুলায় এমনি অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছেন যে দুর্গ-রক্ষার মত আপনার গৃহ রক্ষা করাও তাঁহার চক্ষে একটা সঙ্গীন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আরও একটু বৈচিত্র্য ছিল, দুর্গ-অবরোধের সম্ভাবনায় যেমন দুর্গ-মধ্যে সৈনিকদের রসদ সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয়, তেমনি ভাবেই তিনি তাঁহার সুদূর ভবিষ্যতের কোন কাল্পনিক বিপদের আশঙ্কায় আহার্য্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতে ছিলেন। একদিন কথা-প্রসঙ্গে সহরের একজন বড় দোকানীর কাছে জানিলাম, প্রায় এক বৎসরের খরচের মত জিনিষ-পত্র তিনি ক্রয় করিয়া লইয়া গিয়াছেন। এরূপ ঘটনায় সাধারণতঃ যেমন ঘটিয়া থাকে—অর্থাৎ সরল ভাষায় বলিতে গেলে তাঁহারা ক্রমশই সাধারণের কৌতূহল দৃষ্টির লক্ষ্য ও আলোচ্য হইয়া উঠিতেছিলেন। সকলেই নিজ বিশ্বাস-অনুযায়ী তাঁহাদের সম্বন্ধে বিচিত্র মত প্রকাশ করিতে লাগিল। তবে অনেকেই বলিত, লোকটা পাগল। তাঁহার পরিবারবর্গও যে তাঁহার অনুরূপ, এ বিষয়ে মত-দ্বৈধ রহিল না। আর যদি নিতান্তই তাহা না হয়, তবে নিশ্চয়ই তাঁহারা কোন ভীষণ অপরাধে অপরাধী। এবং রাজদণ্ড হইতে অব্যাহতি-লাভের আশায় এই সুদূর নির্জ্জন বাসে আত্মগোপন করিবার জন্য স্বেচ্ছায় তাঁহারা কারাদণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন। যদিও এ দুইটী হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নয়, তথাপি তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোন বিশ্বাস-যোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। প্রথম যেদিন জেনারেলের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়, তাঁহাকে শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি-ক্লিষ্ট অদ্ভুত প্রকৃতির মানব বলিয়াই আমার ধারণা হইয়াছিল। কিন্তু দ্বিতীয়বার সাক্ষাতে তাঁহাকে একজন জ্ঞানী ভদ্রলোক বলিয়াই বিশ্বাস জন্মিল। তদ্ভিন্ন স্ত্রী-পুত্র লইয়া তিনি বাস করেন। শুধুই যে নিজের জন্য নির্জ্জন বাস, তাহাও নহে। কোনরূপ অন্যায় কার্য্য করিয়া শাস্তির ভয়ে আত্মগোপন করা—তাহাও সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। কারণ উইগটাউন নির্জ্জন স্থান হইলেও এখানে পুলিশ বা টেলিগ্রাফের অভাব নাই। আর যে পলাতক আসামী আত্মগোপনের ইচ্ছা করে, সে কি আপনার অনন্য সাধারণ কার্য্যাবলী দ্বারা লোক-চক্ষে আপনাকে অধিকতর প্রকাশ করিয়া বেড়াব! নাম গোপন করিয়া সাধারণের সহিত মিলিয়া মিশিয়া কাহাকেও সন্দেহের ছায়াটুকু না দেওয়াই ত তাহার পক্ষে নিরাপদের একমাত্র উপায়।

আমার বোধ হয়, জেনারেলের নিজের কথাই ঠিক! সংসারের সহিত যুদ্ধ করিয়া, সমর-কোলাহল শুনিয়া শুনিয়া শ্রান্ত দেহ, ক্লান্ত মন এখন শান্তি চাহিতেছে, তাই স্বেচ্ছায় এই নির্ব্বাসন-দণ্ড তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। আর কিছু না হউক, লোক-সঙ্গের সম্ভাবনা এখানে খুবই অল্প।

সে যাহা হোক—তাঁহার নির্জ্জন প্রিয়তার সীমা যে কতখানি, তাহা আমরা শীঘ্রই একদিন মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলাম।

সে দিন সকালে চা-পানের পর বাবা আদেশ দিলেন, "জন, তুমি একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে নাও, আর এস এস্থার, তুমি তোমার গোলাপী পোষকটা পর, সেইটেতে তোমায় খুব ভাল দেখায়—আমি মনে কচ্চি, আজ একবার হিথাবষ্টনদের সঙ্গে আলাপ করে আসব।" চায়ের পেয়ালায় অত্যধিক পরিমাণে চিনি ঢালিয়া, লজ্জিত আরক্ত হাস্যোজ্জ্বল মুখ না তুলিয়াই এসথার জিজ্ঞাসা করিল "ক্লুমবার হলে যাবে বাবা ?"

বাবা অকালোচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত উত্তর দিলেন, "যদিও আমি এখানকার জমিদারের কর্ম্মচারী, তবুও জমিদার, কারণ আমি তাঁর ভাই। আমার বিশ্বাস, আমাদের নবাগত প্রতিবাসীদের কোন উপকারে লাগা, তাঁদের খবরাখবর নেওয়া আমার কর্ত্তব্য। সে যাই হোক, তাঁরা এখানে নিজেদের খুবই সঙ্গীহীন মনে কচ্ছেন! কবি ফারদুসি বলেছেন, 'এ জগতে বন্ধুসম রত্ন কিছু নাহি আর! বন্ধু মানবের দেহে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার!' কিন্তু এসথার, তুমি আজ চা-টাকে একেবারে সরবৎ বানিয়ে ছেড়েছ!"

বাবা যখন কোন প্রাচ্য কবির কবিতার কোটেশন দিয়া কথা কহেন, তখন যে ঈপ্সিত কার্য্যে তাঁহার প্রতিজ্ঞা অটল, এ সম্বন্ধে আমাদের ভাইবোনের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। নূতন প্রতিবাসীদের সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহলও বড় অল্প ছিল না। আমরা আনন্দের সহিত বাবার আদেশ শিরোধার্য্য করিলাম।

সেইদিন অপরাহ্নে কাকার ছোট ফিটেনখানিতে চড়িয়া আমরা ক্লুমবার হলের অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

তখন নীল আকাশের গা বহিয়া সারি বাঁধিয়া লঘু মেঘখণ্ডের মত সমুদ্র পক্ষীর দল উড়িয়া চলিয়াছে। সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। শরতের অকাল সন্ধ্যা তখনও ঘনাইয়া আসে নাই। কৃষকেরা সারাদিনের পরিশ্রমের পর গুন-গুন করিয়া গান গাহিতে গাহিতে ঘরে ফিরিতেছিল। দূরে মাঠের ধারে লাল টালির ছাদ দেওয়া তাহাদের ছোট ছোট কুটিরগুলিই এখন তাহাদের একমাত্র আকর্ষণের সামগ্রী। কাহারও বা ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি কলহাস্য তুলিয়া দূর হইতে তাহাদের অভিমুখেই ছুটিয়া আসিতেছিল।

বাবার ইচ্ছা ছিল, আমাদের প্রতিবাসীরা আমাদের দেখিয়া এমন না মনে করেন যে, আমরা তাহাদের প্রতিবাসী হইবার একেবারেই যোগ্য নহি! সেইজন্যই বেশভূষায় আমার বিশেষ অনুরাগ না থাকিলেও সেদিন একটু চেষ্টা করিয়াই যথাসম্ভব পরিচ্ছন্ন হইয়াছিলাম! আর স্বভাব-সুন্দরী এস্থার উজ্জ্বল বস্ত্রে, কাকার দেওয়া সুদৃশ্য মুক্তার মালা ছড়াটি ও তাহার প্রথম বৎসরের জন্মতিথি উপলক্ষে বাবার দেওয়া মুক্তাখচিত ছোট সুবর্ণময় ব্রোচটিতেও তাহার মধুর সৌন্দর্য্যটিকে আরও রমণীয় করিয়া তুলিয়াছিল। আর আমাদের কালো ছোট ছোট ঘোড়াদুটি—এ দুটিও সৌখীন লোকের নিকট অল্প আদরের জিনিষ নয়!

কিন্তু মানবের গর্ব্ব বুঝি ভগবানের

সহ্য হয় না,—আমরা ক্লুমবার হলের ফটকের সম্মুখে আসিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমাদের বিস্ময়ের সীমা মাত্রা ছাড়াইয়া গেল। একখানা প্রকাণ্ড কালো কাঠের সাইন্‌বোর্ডে বড় বড় সাদা রঙের অক্ষরে লেখা আছে,—"জেনারেল এবং মিসেস্ হিথারষ্টন তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবের সংখ্যাবর্দ্ধনে একান্ত অক্ষম।"

স্তম্ভিত হইয়া সেই অভাবনীয় অদ্ভুত অক্ষরগুলার প্রতি বদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম। তাহার পর প্রকৃতিস্থ হইয়া এস্থার ও আমি আমাদের উচ্ছ্বসিত অদম্য হাস্যস্রোত চেষ্টা করিয়াও রোধ করিতে সক্ষম হইলাম না। কিন্তু নিমেষের মধ্যে আমাদিগকে আত্মদমন করিয়া যথাসাধ্য গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিতে হইল। কারণ বাবা তখনই বাড়ীর দিকে গাড়ী ফিরাইলেন। তাঁহার চিরপ্রসন্ন সহাস্য মুখমণ্ডল সহসা গ্রীষ্মের আকাশের মতই যেন গুমট মেঘে সজল গম্ভীর দেখাইতেছিল। দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠে কুঞ্চিত ললাটে পরিষ্কার অক্ষরে যেন লেখা ফুটিল, "নিতান্ত অসভ্য অভদ্র আচরণ।" কোন সাধারণ ঘটনায় কোনদিন তাঁহাকে এতাদৃশ বিচলিত হইতে, বোধ হয়,আর কখনও আমরা পূর্ব্বে দেখি নাই। তাঁহার নিজের আত্ম-সম্মানে আঘাত লাগিয়াছে, ইহাই যে একমাত্র কারণ তাহা নয়—তাঁহার ক্রোধের প্রধান কারণ বোধ হয় সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে স্পষ্টরূপে দেশের জমিদারকে অপমান করা! তিনি নিজে অন্যায় করেন না, তাই পরকৃত এতটুকু অন্যায়ও তিনি সহ্য করিতে পারেন না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পাঠকেরা হয় ত আমায় নিতান্ত নির্লজ্জ মনে করিবেন। কিন্তু বাস্তবিকই সেদিনকার সেই শিশুসুলভ অপমানটা আমি একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলাম। পরদিন বৈকালের দিকে লাইব্রেরী হইতে একখানা নবাবিষ্কৃত আইনের পুস্তক আনিবার জন্য আমি ক্লুমবার হলের সম্মুখের রাস্তা দিয়াই সহরের দিকে যাইতেছিলাম। হঠাৎ পূর্ব্বদিনের হাস্যকর অভিনয়টা মনে পড়িয়া গেল। কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া সাইন্‌বোর্ডটা দেখিতে দেখিতে সকৌতুকে ভাবিতেছিলাম, "এমন অপূর্ব্ব খেয়ালের অর্থ কি?" এমন সময় সহসা দেখিলাম, ফটকের মধ্য দিয়া একটি ক্ষুদ্র সুন্দর মুখ ও একখানি শুভ্র সুগোল ক্ষীণ হস্ত আমাকে নিকটে যাইতে ইঙ্গিত করিতেছে। একটু নিকটে অগ্রসর হইতেই চিনিতে পারিলাম, সে আমাদের অপমানকারী জেনারেল হিথারষ্টনের কন্যা! তেমন মুখের, বিশেষতঃ, হৃদয়ের স্বচ্ছ দর্পণস্বরূপ সেই নীল নির্ম্মল দুইটি মনোহর নেত্রের কোমল দৃষ্টির আবাহন উপেক্ষা করা কোন হৃদয়বান মানবের পক্ষেই সম্ভব নয়। আমি একটু ইতস্ততঃ না করিয়াই তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলাম। বালিকা চকিত ভীত কটাক্ষে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া মৃদু গুঞ্জন স্বরে বলিল, "মিঃ ওয়েষ্ট, কালকের ব্যবহারের জন্য আমাদের ক্ষমা করতে পারবেন কি? কাল আপনারা যখন ফিরে যান—দাদা তখন ফটকের কাছেই ছিলেন,—কিন্তু তিনি আর কি করবেন বলুন—তাঁর ত

কোন হাত নেই। বিশ্বাস করুন, মিঃ ওয়েষ্ট, ঐ অপমানজনক সাইন্‌বোর্ডখানা আপনাদের মনে যত কষ্ট দিয়েছে, তার লক্ষগুণ কষ্ট আমাদের—দাদার আর আমার মনে দিতে বাদ রাখে নি। ঐ সাদা অক্ষরগুলার প্রত্যেকটি কশাঘাতের মতই আমাদের অন্তরে আঘাত করেচে।"

আমি বিস্মিতভাবে বালিকার মুখের প্রতি চাহিলাম। তাহার পর কোমল স্বরে একটু হাসিয়া উত্তর দিলাম, "কুমারী হিথারষ্টন্, এই স্বাধীন দেশে যদি কোন ব্যক্তি অপরকে তাঁর বাড়ীতে আস্‌তে দিতে অনিচ্ছুক হন, তা হলে তা না পারবেন কেন?"

অসহিষ্ণুভাবে বালিকা বলিয়া উঠিল, "ভাব্‌তেও আমরা লজ্জায় মরে যাচ্চি যে আপনার বোন্‌কেও এই লজ্জাকর অপমানের অংশ গ্রহণ কর্‌তে হয়েচে।"

মেয়েটিকে ব্যথিত দেখিয়া ঈষৎ সহানুভূতির সহিত বলিলাম, "এর জন্যে আপনাদের এতটা দুঃখিত হবার কোন প্রয়োজন নেই। হয় ত আপনার বাবার এমন কোন বিশেষ কারণ ছিল, যাতে বাধ্য হয়ে তাঁকে এই রকম ব্যবহার কর্‌তে হয়েচে।"

সুগভীর বিষাদের ছায়া সুন্দরীর ম্লান নেত্রে প্রতিভাত হইল। অত্যন্ত ব্যথিত স্বরে বালিকা উত্তর দিল, "সত্যই তাই! ঈশ্বর জানেন—বাবা কত নিরুপায়। কিন্তু আমার মনে হয় বিপদের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াবার লাঞ্ছনার চেয়ে তার সাম্‌নে দাঁড়ান ঢের ভাল। অবশ্য তিনি আমাদের চেয়ে অনেক বেশী বোঝেন, এ সম্বন্ধে এই,—কে আস্‌চে না?"

বালিকা ভীত নেত্রে বাগানের পথের দিকে চাহিয়া রহিল। "ওঃ দাদা,—তুমি! দেখ দাদা, কালকের ঘটনার জন্য আমি মিঃ ওয়েষ্টের কাছে মাপ চাইছিলেম।"

অত্যন্ত আগ্রহের সহিত আগন্তুক বলিয়া উঠিলেন, "আমি নিজে এসে আপনার কাছে মাপ চাইতে পারায় সত্যই ভারী খুসী হয়েচি। আমি ভেবেছিলাম, আপনার বাড়ীতে গিয়ে আপনাদের তিন জনের কাছেই মাপ চাইব। গেব্রিয়েল, তুমি বাড়ীর ভিতর যাও, এখনি তোমার খোঁজ পড়্‌বে, খাবার সময় হয়ে এল। মিঃ ওয়েষ্ট, আপনি যাবেন না। আপনার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।"

গেব্রিয়েল—বালিকাকে এখন হইতে এই নামেই আমি অভিহিত করিব—আমার দিকে সহাস দৃষ্টিতে চাহিয়া বৃক্ষান্তরাল দিয়া বাড়ীর দিকে চলিয়া গেলে মরডণ্ট গেটের দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল, পরে সন্তর্পণে গেট বন্ধ করিয়া কহিল, "মিঃ ওয়েষ্ট, যদি আপনার কোন আপত্তি না থাকে, আমি আপনার সঙ্গে একটু বেড়াতে ইচ্ছা করি। কোন বাধা আছে কি?"

আমি সানন্দ চিত্তে উত্তর দিলাম "না, কিছু না, মিঃ মরডণ্ট। আমি আনন্দে সহিত আপনার ভ্রমণের সঙ্গী হব।"

মরডণ্ট কহিল, "আমি আপনাকে একটা গোপনীয় কথা জানাব—আমরা এ বাড়ীতে এসে পর্য্যন্ত আজ এই প্রথম গেটের বাইরে পা দিয়েচি।"

"আর আপনার বোন্? তিনি বোধ হয় এখনও সে সুযোগ পাননি!"

"না, সে কখনও বাইরে বেরুতে পায় না, আমিও আজ লুকিয়ে এলেম বৈ ত নয়। বাবা যদি জানতে পারেন, তা হলে যে মোটে খুসী হবেন না, সে কথা বলাই বাহুল্য। তাঁর খেয়াল, আমরা ফটকের বাইরে বেরুব না। কৃপণের স্বর্ণমুদ্রার মত লোকচক্ষুর অগোচরে গোপনে বাস করব। লোকে বলে, তাঁর "খেয়াল", কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। এ রকম করবার বিশেষ কারণও আছে। তবে আমাব বিশ্বাস, তিনি বড় বেশী বাড়াবাড়ি কচ্চেন,—এতটার কোন প্রয়োজন ছিল না।"

এ কথার তাৎপর্য্য কি? আমি বিস্মিত হইলেও আলোচনা ছাড়িয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখানে বোধ করি আপনার খুবই ফাঁকা ফাঁকা লাগে? আপনি মধ্যে মধ্যে আমাদের বাড়ী যাবেন? ঐ—ঐ—যে, আমাদের বাড়ীর ছাদ দেখা যাচ্চে!"

"ভারী খুসী হলেম—আপনার নিমন্ত্রণ নেবার চেষ্টা করব। বাড়ী থেকে বেরুবার এমন সুযোগ পেলে আমি খুসীই হব, তার কারণও আছে। এখানে আমাদের কোচম্যান ইজরেল ষ্টেক, আর বাগানের মালী ছাড়া কথা বলবার লোক ত আর কেউ নেই!"

"আর আপনার ভগ্নী—তাঁর কষ্ট বোধ হয় আপনার চেয়েও বেশী?"

আমার নবীন বন্ধুটি যে নিজের দুঃখকেই এতটা বড় করিয়া দেখিতেছেন, আত্মীয়দের কথা মনেও আনিতেছেন না, ইহা আমার কেমন বিসদৃশ মনে হইতেছিল। অনেকটা তাচ্ছল্য-ভাব দেখাইয়া উদাসীনভাবে মরডণ্ট উত্তর দিল, "হাঁ, গেব্রিয়েলেরও কষ্ট হয় বই কি! তবে আমার বয়সী পুরুষ মানুষের পক্ষে এ রকম বন্দীভাবে থাকা যতটা কষ্টকর, স্ত্রীলোকের পক্ষে অবশ্য ততটা হতে পারে না। মিঃ ওয়েষ্ট, আমার দিকে চেয়ে দেখুন দেখি, আমার বয়স এখন তেইশ পূর্ণ হয়ে গেছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাট মাড়াইনি। সাধারণ জেলে বা ঘেষেড়াদের মতই আমি মূর্খ। কথাটা হয়ত আপনার অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু বাস্তবিকই তাই! ভেবে দেখুন দেখি, আমার অদৃষ্ট এর চেয়ে অনেক বেশী ভাল হওয়া উচিত ছিল না কি?"

আমার উত্তরের আশায় মরডণ্ট আমার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। অস্তগামী সূর্য্যের রক্তিম আভা তাহার মুখের উপর পড়িয়াছিল। তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া আমার মনে হইল, "সত্য! এমন করিয়া শৃঙ্খলিত-পদ খাঁচায়-বন্ধ পাখীর মত জীবন কাটাইবার জন্য—দুর্ল্লভ মানব জীবনের সৃষ্টি হয় নাই। দীর্ঘাকার স্বাস্থ্যপূর্ণ বলিষ্ঠ দেহ, সুন্দর মুখ, যেন "সেমিডরিলো" কিম্বা ভিলাকিউয়ের অঙ্কিত চিত্রেরই মত। তাহার সেই উচ্চ মনোবৃত্তির ছায়া-সন্নিপাতে দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক, সূক্ষ্ম চিত্রিতবৎ ভ্রূযুগ আর সুসম্বদ্ধ দেহের সরল সুন্দর ভাব তাহার মানসিক তেজ ও ক্ষমতাই যেন অভিব্যক্ত করিতেছিল। একটু চিন্তিতভাবে উত্তর দিলাম, "শিক্ষা দু রকম। এক, বাহিরের, আর এক

অন্তরের অভিজ্ঞতার। পুঁথিগত বিদ্যা যদিও আপনার না থাকে, তবু শেষোক্ত শিক্ষা, বোধ হয়, যথেষ্ট আছে। আমার বিশ্বাস চিরদিন আলস্যে বা আমোদ-আহ্লাদে আপনার দিন বৃথা কাটেনি!"

"আমোদ-আহ্লাদে?" বলিয়াই যুবক মাথা হইতে ত্রস্ত হস্তে টুপিটা খুলিয়া ফেলিলে অতিমাত্র বিস্ময়ের সহিত আমি চাহিয়া দেখিলাম, তাঁহার তরঙ্গায়িত কোমল কেশ রাশির অধিকাংশই শুভ্র বর্ণ ধারণ করিয়াছে। আমি চমকিয়া উঠিলাম। কথা খুঁজিয়া পাইলাম না। একটু করুণ বিষাদের ক্ষীণ হাসি হাসিয়া তিনি কহিলেন, "আপনি কি মনে করেন, আমোদ-আহ্লাদে মানুষের অল্প বয়সে কালো চুল সাদা হয়ে যায়?"

কি বলিব, ভাবিয়া পাইলাম না। অথচ কিছু একট বলাও উচিত মনে হইল। অগত্যা যেমন মনে আসিল, সেই মতই বলিলাম, "বোধ হয়, ছেলেবেলায় আপনার কোন রকম কঠিন পীড়া হয়ে থাকবে?"

"পীড়া? না, জীবনে শারীরিক পীড়া আমার বিশেষ কিছু হয় নি।"

"তা হলে বোধ হয় কোন রকম বড় আঘাত পেয়ে থাকবেন! না হয় ত কোন গভীর মানসিক চিন্তাই আপনার চুলগুলিকে সাদা করে তুলেচে। আপনার বয়সী আর দু জনকে আমি জানি, ঐ রকম ঘটনায় তাঁদেরও কালো চুল একেবারে সাদা হয়ে গিয়েচে।"

একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত মরডণ্ট উত্তর দিলেন, "আহা বেচারারা—তাদের জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত।"

কথা কহিতে কহিতে আমরা বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছিলাম। এইখান হইতেই আমাদের বাড়ী ফিরিবার দিকে একটা শাখা পথ বাহির হইয়া গিয়াছে। মরডণ্ট কহিল, "মিঃ ওয়েষ্ট, আপনি হাসচেন? কিন্তু আমি সত্যি বলচি, আপনার নিমন্ত্রণের কথা শুনে গেব্রিয়েলও খুব খুসী হবে। বাবার সেই লজ্জাকর সাইনবোর্ড-ঘটিত ব্যাপারের পর আপনাদের এই অযাচিত অনুগ্রহ,—এ আমরা কখনই ভুলতে পারব না।

সাগ্রহে অভিবাদন করিয়া মরডণ্ট বাড়ীর পথে ফিরিয়া গেল। কিন্তু তখনই দুই চারি হাত দূরে গিয়া আবার সে ফিরিয়া আসিল। তাহাকে ফিরিতে দেখিয়া আমিও দাঁড়াইলাম। মরডণ্ট বলিল, "আমার মনে হল আপনারা হয় ত ক্লুমবার হলের ব্যাপারটাকে একটা জটিল রহস্য বলে মনে করচেন। আর আমরা সত্য সত্যই পাগলা গারদের পাগল কি না, সেইটে পরীক্ষা করতে এসেছিলেম!—অবশ্য সে জন্য আমি আপনাকে অনুযোগ করচি না। এ অবস্থায় সকলেই এমন করে থাকে। বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ না হলে সব কথাই আমি আপনাকে জানাতেম, কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে আপনাকে যদি সব কথা বলি, তাতেও যে আপনি বিশেষ কিছু বুঝতে পারবেন, এমন নয়,—তবে এইটুকু শুধু জেনে রাখুন, যেমন আপনি ও আমি, আমার বাবাও ঠিক তেমনি সম্পূর্ণ সজ্ঞান সুস্থ মানুষ। তাঁর এই রকম গোপন অজ্ঞাতবাসের যথেষ্ট হেতুও আছে! মনে করবেন না, এর ভিতর কোন অসৎ

উদ্দেশ্য লুকানো আছে। এ শুধু আত্মরক্ষার উপায় মাত্র।”

আমি সহসা বলিয়া ফেলিলাম, “তা হলে তিনি কোন বিপদে পড়েচেন ?”

“না, বিপদ-পাতের সম্ভাবনা তাঁর সর্ব্বদাই রয়েচে।”

“তবে কেন, তিনি এখানকার ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আত্মরক্ষার জন্যে সাহায্য চেয়ে একখানা দরখাস্ত করুন না! যে লোকের দ্বারা ওঁর অনিষ্টের সম্ভাবনা, তার নাম জানিয়ে দিলে পুলিস তাকে শান্তি-রক্ষার জন্য সহজেই বাধ্য কর্‌বে।”

বিষাদের ক্ষীণ হাসি হাসিয়া অত্যন্ত দুঃখের স্বরে মরডন্ট উত্তর দিলেন “না বন্ধু, তা হয় না, বাবা যে বিপদকে ভয় কচ্চেন, তা থেকে তাঁকে রক্ষা করা মানব-সাধ্যের অতীত। কিন্তু এ নিশ্চয় যে বিপদটি সত্য, আর তা অদূরবর্ত্তী।”

এ হেঁয়ালির রহস্য-ভেদে অসমর্থ হইয়া অবিশ্বাসের সহিত আমি কহিলাম, “তা হলে আপনি কি বল্‌তে চান, বিপদটা অনৈসর্গিক ?”

“না, তাই বা কি করে বল্‌ব ? কিন্তু আমি বোধ হয়, আমার যা বলা উচিত, তার চেয়ে আপনাকে বেশী বলে ফেলেচি। তবু আমার বিশ্বাস আছে, আমি অপাত্রে বিশ্বাস স্থাপন করিনি। বিদায়, মিঃ ওয়েষ্ট, বিদায়।”

মরডন্ট দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেলেও আমি চুপ করিয়া তাহার গন্তব্য পথের দিকে চাহিয়া রহিলাম। এ প্রহেলিকার অর্থ কি ? একটা বাস্তব বিপদ অদূরবর্ত্তী ? আর সে বিপদ হইতে উদ্ধার করাও মানবের সাধ্যাতীত! অথচ বিপদটি অনৈসর্গিকও নহে,—তবে কি ? ব্যাপারটা ঠিক যেন ধাঁধার মতই ঠেকিতে লাগিল। প্রথম যখন ক্রুমবার হলের নব অধিকারীদের সহিত আলাপ হয়, তখন তাঁহাদিগকে “অদ্ভুত খেয়ালি” বলিয়াই ধারণা হইয়াছিল, কিন্তু আজ আর তাহা মনে হয় না। আমার মনে হইল, তাঁহাদের প্রত্যেক কার্য্যের ভিতর একটা অন্তর্নিহিত গাঢ় সংশয়ের আবরণ বিছানো রহিয়াছে।

কথাটা যতই চিন্তা করিতে লাগিলাম, ততই যেন তাহা অধিকতর দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। তবুও এই কষ্টকর চিন্তাটাকে মন হইতে সরাইয়া ফেলিতেও পারিলাম না। জানি না, কেন সেই নিভৃত, নির্জ্জন, রহস্য প্রাচীরাবৃত ক্রুমবার হলের অধিবাসিদের “আসন্ন বিপদ-সম্ভাবনা” আমায় এতখানি বিচলিত করিয়া তুলিল। সেদিন সন্ধ্যা হইতে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত যতক্ষণ না চিন্তা-হারিণী নিদ্রার আশ্রয় পাইলাম, ঐ একই প্রশ্ন থাকিয়া থাকিয়া মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিতেছিল। আর এই গোপন ব্যাপারের মূল সূত্র কোথায় ? কোথায় ? এই জটিল চিন্তাই ফিরিয়া ফিরিয়া মনের তন্ত্রীতে পাক খাইতে লাগিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।

আইনের প্যাঁচ

(গল্প)

বি, এল পাশ করিয়া আলপাকার নূতন চোগা-চাপকান গায় আঁটিয়া মাথায় শামলা চড়াইবার ব্যবস্থা করিতেছি, এমন সময় এক সতীর্থ সুহৃদ্ আসিয়া আশ্বাস দিলেন, "ওহে, ক্রিমিনালে ঢুকে পড়। কাঁচা পয়সা— সিভিলের মত বিরাট ধৈর্য্য নিয়ে বসে থাকতে হয় না, চট্ করেই পশার জমে যায়।"

সতীর্থ হাসিয়া আরও কহিলেন, এ দুই বৎসর ক্রিমিনালে বাহির হইয়া তাঁহার দিনগুলা নিতান্ত বিফলে কাটে নাই! বিশেষ, যদি ভাল একটি দালাল জুটাইতে পারি ত দুই বৎসরে গাড়ী ঘোড়া করিবারও সামর্থ্য-সম্ভাবনা আছে!

ক্রিমিনালে ঢুকিলাম। বাহিরের ঘর হইতে প্রাচীন তক্তাপোষখানিকে বিদায় দিয়া টেবিল-চেয়ারে স্থান জুড়িলাম। খেলা-ধূলা ও গল্প-গুজবের পাট উঠিল। শেষে অদৃষ্টক্রমে একদিন বরাত খুলিবারও সূচনা দেখা দিল।

সকালে চায়ের পিয়ালা নিঃশেষ করিয়া খপরের কাগজখানা খুলিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় এক অবগুণ্ঠনবতী বালিকার হাত ধরিয়া অর্দ্ধাবগুণ্ঠনা এক প্রৌঢ়া আসিয়া সসম্ভ্রমে কহিল, "আপনি কি ফৌজদারীর উকিল?

খপরের কাগজখানাকে ঠেলিয়া রাখিয়া হেণ্ডারসনের বিরাট-বপু 'ফৌজদারী কার্য্য-বিধির' পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে গম্ভীর-ভাবে কহিলাম, "হুঁ।"

প্রৌঢ়া কহিল, "জজ কাছারির বিশ্বম্ভরবাবু আমায় পাঠিয়ে দিলেন—আমার একটা নালিশ আছে—তিনি বললেন, সেখানে হবে না, ফৌজদারিতে দরখাস্ত দিতে হবে।"

আনন্দে মন নাচিয়া উঠিল! আসিয়াছে! আমার মক্কেল বঁধু অচিরেই আসিয়াছে! জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি তোমার নালিশ?"

"এই মেয়েটি নিয়ে বাবা এক বিপদে পড়েছি—মেয়েটিই সম্বল—বিয়ে দিয়েছি—তা জামাইয়ের সঙ্গে মোটে বনিবনাও নেই—আমি গরীব, অবীরে, কোথা থেকে খাওয়াই? তাই হাকিমের কাছে দরখাস্ত দিয়ে একটা খোরাকির বন্দোবস্ত যদি করে দেন!"

নিঃশব্দে বিনা আড়ম্বরে ৪৮৮ ধারা খুলিয়া ফেলিলাম। তাহার উপর দিয়া চক্ষু বুলাইতে বুলাইতে কহিলাম, "কেন? জামাই নেয় না?"

"সে বাবু অনেক কথা। যখন নালিশ করতেই এসেছি, তখন আপনাকে সব কথা খুলে বলব বই কি! এইখানে সরে আয় মালতী—বস্।"

মেয়েটির নাম বুঝিলাম, মালতী।

তাহার পর প্রৌঢ়া বকিয়া গেল—কেমন করিয়া কত দেবতার দ্বারে হত্যা দিয়া, কত সাধুর পদধুলি শিরে ধরিয়া, কত মন্দিরে মানত করিয়া এই কন্যা হয়! কন্যা হইলে কি হয়, পুত্রের মতই তাহার শত আব্দার অত্যাচার নীরবে মাথায় বহিয়া প্রৌঢ়া মেয়ে মানুষ করিয়াছে। বরাত মন্দ, তাই কর্ত্তা

একদিন ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেল। তখন কাটুনা কাটিয়া লোকের বাড়ী রাঁধিয়া বাড়িয়া ভিক্ষা করিয়া মেয়ের বিবাহ দিয়াছে। জামাইয়ের অর্থও কিছু আছে, তবে কেমন যে তাহার স্বভাব, মেয়েকে মায়ের কাছে পাঠাইতে চাহে না। পেট ভরিয়া মেয়েকে খাইতে দেয় না, উঠিতে বসিতে জামাইয়ের মা-বোনের বাক্য-যন্ত্রণাও কি কম সহিতে হয়! মায়ের এই একটি সন্তান, তাহাকে না দেখিলে মায়ের প্রাণ কেমন করিয়াই বা সুস্থির থাকে? আর মেয়েও এক মা বই আর কিছু জানে না—শত্রুর মুখে ছাই দিয়া তের বৎসরে পা দিলে কি হয়, মাকে ছাড়িয়া সে থাকিতে পারে না। তা উহারা দুইদিনের জন্য, তাহাকে ছাড়িয়া দেয় না! আসিবার জন্য বায়না ধরিলে মারধোর অবধি করে! মেয়ে কান্নাকাটি করে—তাহারা বিরক্ত হয়। একবার অসুখের সময় বেহুঁস মেয়ে রাঁধিতে গিয়া ভাতটা একটু ধরাইয়া ফেলিয়াছিল—তা শাশুড়ী মাগী হাতে গরম ফেন ঢালিয়া দেয়! মেয়ের খুব ব্যামো হয়। মা মেয়েকে একবার দেখিতে গিয়াছিল, মেয়ে মার সঙ্গে চলিয়া আসিবে বলিয়াছিল। মা বুঝাইয়া ছিল, না, তাহা হইবে না। সেই ঘরেই কোনমতে বনাইয়া থাকিতে হইবে! ঐ ঘরই আপনার ঘর!

মেয়ে কিন্তু বুঝিল না। তারপর অসুখ সারিলে কান্নাকাটি ধরে, মার কাছে যাইবে! তাহারা বিরক্ত হইয়া মায়ের কাছে একদিন মালতীকে ফেলিয়া গিয়াছে। মেয়ে সেখানে যাইতে চাহে না—এই বয়সে বাছাকে রাঁধিতে হয়, বাড়িতে হয়, এক ক্রোশ পথ হাঁটিয়া জল আনিতে হয়! দেইজী জ্ঞাতিও দুই-চারিজন আছে, তাহারা দিব্য পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া খায়! কুটাটি নাড়িয়া কেহ কখনও সাহায্য করে না—কিন্তু এ সকলই সহ্য হয়, তবে এই যে পেট ভরিয়া খাইতে দেয় না, উঠিতে বসিতে গালি দেয়, মারধোর করে,—এমন করিলে মায়ের প্রাণ কি করিয়া স্থির থাকে! কাজেই মেয়েকে সে-ও আর পাঠাইবে না। এইটিই তাহার সম্বল! এত বড় পৃথিবীতে আর কে-ই বা তাহার আছে! মেয়েকে নিজের কাছে রাখিবে। কিন্তু সে গরীব, অন্নের সংস্থান নাই—জামাই খোরাকী না দিলে কি করিয়াই বা সে মেয়েকে খাওয়ায়! নিজের যেমন করিয়া হৌক, চলিয়া যাইবে, তাহার জন্য ভাবনা নাই। কিন্তু মেয়ে—

কথাটা সংক্ষেপে রিপোর্টে সারিলাম। এইটুকু বলিতে তাহার কিন্তু অনেকখানি সময় লাগিয়াছিল। বিস্তর অশ্রু, হা-হুতাশে বক্তব্য-টুকুও সে অযথা বাড়াইয়া তুলিয়াছিল।

ঘড়িতে আটটা বাজিয়া গেল। আমি তাহাকে বাধা দিয়া কহিলাম, তোমার মেয়েকে মার-ধোর করে যে, তার কোন চিহ্ন আছে?"

প্রৌঢ়া কহিল, "সরে আয় ত মা, মালতী।" বলিয়া মেয়ের করপুট টানিয়া প্রৌঢ়া আমাকে তাহা দেখাইল। ছোট হাত দুইটিতে কড়া পড়িয়াছে। কড়ার মাঝে মাঝে সাদা দাগ! গরম ফেন ঢালার চিহ্ন! আমি ঈষৎ বিচলিত হইলাম,—কহিলাম,—"এ যে বড্ড পুরোনো দাগ—একে চলবে কি?

মা তখন মেয়েকে জিজ্ঞাসা করিল, "আর

কোথাও দাগ আছে রে?" মেয়ে কোন সাড়া দিল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বহিখানা বন্ধ করিয়া আমি কহিলাম, "মার-ধোর কি কোন অত্যাচারের চিহ্ন না দেখাতে পারলে খোরাকী দিতে সে বাধ্য হবে না ত বাপু। যদি সে বলে, আমার স্ত্রী, আমার কাছে আসুক। হাকিম তখন জিজ্ঞাসা করতে পারে, কেন যাবে না? তখন—"

প্রৌঢ়া বলিল, "কেন, তখন বলবে, আমি মার কাছে থাকব। ওখানে বড় জ্বালা যন্ত্রণা। সে সব সয়ে থাকতে পারি না। আমার বাবা, এই মেয়েটি ছাড়া আর কে আছে, বল—ঐটিই হলগে আমার চোখের তারা! তাদের বৌ গেলে আবার বৌ হতে কতক্ষণ? কিন্তু আমার এ মেয়ে গেলে আর ত তাকে ফিরে পাব না।"

আমি বিরক্ত হইলাম। নাঃ—এখন এ সেণ্টিমেণ্টালিটি থামাই কি করিয়া! আইনের কূট রহস্য ইহাকে বুঝানো অসম্ভব। তথাপি কহিলাম, "আসল কথা কি হচ্ছে জান বাপু, স্ত্রীর উপর স্বামীরই পূরা অধিকার। বাপ-মার কোন অধিকার থাকে না। স্ত্রী স্বামীর ঘর ছেড়ে এলে মাসহরার দাবী করতে পারে না। তবে যদি স্বামী মারধোর করে, কিম্বা হিন্দু হয়ে মুসলমানী বিয়ে ক'রে তাকে নিয়ে এক বাড়ীতে এসে বাস করে, যাতে গিয়ে স্ত্রীর হিন্দুত্বে আঘাত লাগতে পারে, তখন শুধু স্ত্রী স্বামীর ঘর ছেড়ে অন্যত্র থাকতে পারে, আর স্বামীও তখন মাসহারা দিতে বাধ্য হয়!"

প্রৌঢ়া কহিল, "তবে উপায়?"

"এক উপায় হয়, যদি তোমার জামাই মেয়ের গায় হাত তোলে, কিম্বা এমন কোন অত্যাচার করে, যাতে মেয়ের প্রাণের আশঙ্কা জন্মাতে পারে—আর আদালতে সে মারধোরের চিহ্ন কি অত্যাচারের কোন প্রমাণ দেখাতে পার।"

প্রৌঢ়া একবার কন্যার পানে চাহিয়া পরে কহিল, "তা হলে টাটকা মারধোর না হলে—"

বাধা দিয়া আমি কহিলাম, "সে মার-ধোরের আবার সাক্ষী চাই।"

"সাক্ষী! স্বামী আবার স্ত্রীকে পথে নিয়ে গিয়ে কবে মারধোর করে থাকে, বাবা! যদিই বা হাত তোলে ত সে ঘরেই তোলে। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া কি পাড়ার পাঁচ জনের সামনে হয়, না, পাড়ার পাঁচজনেই তা দেখতে ছোটে! তার উপর যারা তাদের পাড়াপড়শী, তারা ওদের দিক না নিয়ে কি আর আমাদের হয়ে বলবে!"

দরখাস্ত লিখিতে বসিলাম। লেখা শেষ হইলে তাহাতে মালতীর ঢেরা সহি লইলাম। প্রৌঢ়াকেই সাক্ষ্য করিলাম, আর প্রমাণ সেই হাতের পোড়া দাগ! অঞ্চল হইতে দুইটি টাকা বাহির করিয়া প্রৌঢ়া আমার হাতে দিল। আমি ঈষৎ অপ্রসন্ন ভাবে কহিলাম, "দু টাকা মোটে!"

প্রৌঢ়া একেবারে আমার পায়ে হাত দিয়া কহিল, "গরিব মানুষ বাবা, পেটে খেতে পাই না, তা আপনার পরিশ্রমের দাম দেব কি? সন্তুষ্ট হয়ে এই নাও বাবা। গরিবকে রাখ, ভগবান তোমায় রাখবেন!"

একটি কথাও আর বলিতে পারিলাম না। টাকা দুইটা যেন তপ্ত লৌহের মতই হাতে বাজিতেছিল। তখন সবে ওকালতিতে হাতে

খড়ি,—এখন হইলে কি করিতাম, জানি না, তবে--কিন্তু সে কথা থাক্! টাকা দুইটা ফিরাইয়া দিলাম, কহিলাম, "তবে এ তুমি রেখে দাও। অমনিই আমি তোমার কাজ করে দেব।"

প্রৌঢ়া বিষণ্ণ চিত্তে অপ্রতিভভাবে কহিল, "রাগ করো না, বাবা।"

আমি ব্যস্ত হইয়া কহিলাম, "না, না, রাগ নয়—তুমি গরিব মানুষ, আমার টাকার পীড়াপীড় কিছু নেই। যদি জেতা যায়, তখন না হয় দু'টাকার সন্দেশ খাইয়ে যেয়ো।"

প্রৌঢ়া কহিল, "সে কথা মন্দ নয় বাবা। আমার মাকেও সেদিন প্রণাম করে যাব।"

"তা হলে তুমি এখন এস। বেলা ঠিক এগারটার সময় আদালতের সামনে থেকো, আমি দরখাস্ত দিয়ে দেব।"

প্রৌঢ়া আবার আমায় প্রণাম করিয়া কন্যার হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

উপরে আসিলে স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ গা, বাইরে ও কার সঙ্গে কথা কচ্ছিলে?"

আমি কহিলাম, "একটা মক্কেল এসেছিল।"

এক মুখ হাসিয়া স্ত্রী কহিলেন, "মক্কেল! ইস্! বরাত তবে খুলল, বল। কি মকদ্দমা?"

আমি আমূল বর্ণনা করিলাম। আরও কহিলাম, মকদ্দমা টেঁকে কি না, সন্দেহ! মার-ধোরের কোন চিহ্ন নাই! স্ত্রী কহিলেন, "আচ্ছা আইন বাপু। গায়ে দাগ না দেখালে বুঝি মারটা সাব্যস্তই হবে না! আবার সে মারধোরেরও সাক্ষী চাই! মুণ্ডুটা ছিঁড়ে তা হলে আদালতে যেতে হবে, দেখছি! এই যে খেতে দেয় না, বাক্য-যন্ত্রণা দেয়, এই কি যথেষ্ট নয়? কি সর্ব্বনাশ!"

একটা রসিকতার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না। "যাও যাও, আমায় আর আইন শেখাতে হবে না—" বলিয়া ডিমের বড়া পুড়িয়া যাইবে, ভয় দেখাইয়া, স্ত্রী রন্ধন-শালার দিকে ছুটিলেন।

২

দরখাস্ত দিলাম। শমন বাহির হইল। দিনও পড়িল। মকর্দ্দমার দিন স্বামী হলপ করিয়া ও চারি-পাঁচজনের সাক্ষ্য-সমর্থনে আদালতকে বুঝাইল যে, আসল কথা, মার কাছে তাহার স্ত্রীকে পাঠাইতে সে একান্ত নারাজ! কন্যা-সম্বন্ধে মাতার অত্যন্ত কুৎসিত অভিপ্রায়ের অপবাদও সে স্বচ্ছন্দে দিয়া গেল। হাকিম সে পোড়া দাগের ততটা মূল্য ধরিলেন না। অপর পক্ষের উকিলও তাঁহাকে গলার জোরে বুঝাইয়া দিলেন, যদি এটা দাহের চিহ্ন বলিয়াই তর্কচ্ছলে ধরিয়া লওয়া যায়, তথাপি এ চিহ্ন অত্যন্ত পুরাতন। দাগ যখন সদ্য ছিল, তখন কেন আদালতে আসা হয় নাই! আমি বুঝাইলাম, বাঙ্গালীর মেয়ের পক্ষে চট্ করিয়া আদালতে আসা নানা কারণে ঘটে না। প্রথমতঃ, স্বামীর পক্ষের কড়া তদারক-পাহারায় সে সুযোগ মিলে না, দ্বিতীয়তঃ অত্যধিক লজ্জা, সঙ্কোচ ইত্যাদি।

হাকিম শুধু স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কেন খোরাকি দিবে না?

দীর্ঘ সেলাম ঠুকিয়া স্বামী কহিল, "হুজুর, স্ত্রীকে আমি ঘরে রাখিতে চাই। উহার

মার কাছে থাকিলে মালতী বিগড়াইয়া যাইতে পারে।"

আইনের কড়া প্যাঁচ,—হাকিমের সাধ্য কি, তাহা খুলিয়া ফেলেন! তিনি রায় দিলেন, যেহেতু বাদিনী স্বামীর কোন অত্যাচার প্রমাণ করিতে পারিল না, অতএব সে স্বামীর ঘরে যাইবে। কারণ স্বামীই তাহার মাতা অপেক্ষা যোগ্যতর অভিভাবক! যদি স্বামী ভবিষ্যতে কোন অত্যাচার করে, তখন সে সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আসিলে খোরাকীর দাবী রক্ষিত হইতে পারে।

প্রৌঢ়ার প্রতি অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিজয়-দৃপ্ত স্বামীর দল মালতীকে লইয়া চলিয়া গেল। তাহার উকিলের গর্জ্জন-আস্ফালনে আদালতের বৃক্ষচ্ছায়া-শীতল প্রাঙ্গণ মুখরিত হইয়া উঠিল। বেচারী প্রৌঢ়ার কাতর ক্রন্দন সে আস্ফালনের মধ্যে কোথায় চাপা পড়িয়া গেল।

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া লাইব্রেরির দিকে চলিলাম। প্রৌঢ়া কাঁদিতে কাঁদিতে শুধু একবার বলিল, "কি হল বাবা? এ কি বিচার হল! গরীবের কি ভগবানও নেই? ও মেয়েকে কি আর আমি ফিরে পাব।"

৩

তিন চারিদিন পরে, একটা আবকারী মকর্দ্দমা পাইয়াছিলাম; লাইব্রেরী ঘরে বসিয়া সঞ্জীব রাওয়ের ডাইজেষ্ট খুলিয়া নির্ঘণ্ট বাহির করিয়া ল-রিপোর্টে নজীরের সন্ধানে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছি,—এমন সময় আমার মুহুরি আসিয়া সংবাদ দিল, বাহিরে একটা স্ত্রীলোক আমায় খুঁজিতেছে! বই ফেলিয়া চট্ করিয়া বাহিরে আসিলাম। আশার উল্লাসে মনটাও ধ্বক্ করিয়া উঠিল।

বাহিরে আসিয়া দেখি, সেই প্রৌঢ়া নারী, মালতীর মা। তাহাকে ঘিরিয়া চারি ধারে নিষ্কর্ম্মার দল কৌতূহলে ভিড় জমাইয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে। প্রৌঢ়ার চোখে জল, মাথায় অবগুণ্ঠন নাই, কেশপাশ মুক্ত, রুক্ষ। আমাকে দেখিয়া সে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, কহিল, "বাবা, এ কি করলে আমার—এ কি বিচার হল!"

আমি স্তম্ভিতভাবে কহিলাম, "কি হয়েছে?"

সে কহিল, "আমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে, বাবা। আমার সর্ব্বস্ব লুঠে নেছে। আমার মালতী আর নেই"

"সে কি? কেন? কি হয়েছিল?"

"আর কি হবে, বাবা? সর্ব্বনেশে বিচারে আমার বাছাকে তারা আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। তার পর কি যে করলে, কি খাওয়ালে—আমার সোনার প্রতিমা ভেসে গেল, বাবা—আমার মা দুর্গার বিসর্জ্জন হয়ে গেল। এই দেখ চিঠি, আজ সকালে এসেছে।"

প্রৌঢ়া একখানি পোষ্টকার্ড আমার হাতে দিল। পড়িলাম। তাহাতে লেখা ছিল, "পরশ্ব শেষ রাত্রে আপনার কন্যার হঠাৎ কলেরা রোগ হয়। ভোর বেলায় তাহার মৃত্যু হইয়াছে।"

আমার মাথার মধ্যে রক্ত চন্‌চন্ করিয়া উঠিল। এ কি—! প্রৌঢ়া কহিল, "কলেরা নয় বাবা, ও সব মিছে কথা। তারা আমার মেয়েকে খুন করে কলেরা বলে রটিয়ে দিয়েছে।

হাকিমের বিচারে সে একেবারে জন্মের মত বিদায় হয়ে গেল—এখন হাকিমকে বলে আমারও একটা ব্যবস্থা করে দাও, বাবা।”

উন্মাদের মত কাঁদিয়া প্রৌঢ়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। চারিধারে উকিল, মুহুরি ও পিয়াদার ভিড় জমিয়া গেল। আমার বুকটা অব্যক্ত বেদনায় টন্‌টন্ করিয়া উঠিল। এমন সময় মক্কেল আসিয়া সংবাদ দিল, বেঞ্চ-ঘরে মকর্দ্দমার ডাক পড়িয়াছে। কাজেই দাঁড়াইতে পারিলাম না। শামলা ও কাগজ-পত্র লইয়া তখনই এজলাসে ছুটিতে হইল। ফিরিয়া আসিয়া প্রৌঢ়াকে আর দেখিতে পাইলাম না। সংবাদ লইয়া জানিলাম, আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে কাঁদিতে কাঁদিতে সে চলিয়া গিয়াছে। কোথায় গিয়াছে, কেহই তাহা বলিতে পারিল না।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

দক্ষিণ মেরু আবিষ্কার কাহিনী

মেরু প্রদেশের রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা প্রায় চারি শত বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে। চারিদিকে চিরতুষারাবৃত এক বিরাট ক্ষেত্র—তথায় জীব জন্তু বৃক্ষলতার চিহ্ন মাত্রও নাই; আছে কেবল বিভীষিকা-ময়ী তুষার ঝটিকা আর অন্তহীন গলিত তুষার স্রোত। এইরূপ এক জনমানবহীন প্রদেশ আবিষ্কারের চেষ্টা কতবার নিষ্ফল প্রয়াসে পরিণত হইয়াছে, কত বার মানুষ এই রহস্যউদ্‌ঘাটন করিতে গিয়া আপনার অমূল্য জীবনকে সেই চিরতুষারের মধ্যে সমাধিস্থ করিয়াছে কিন্তু তবুও চেষ্টার অন্ত হয় নাই। বারবার বিফল চেষ্টার পর এই এতকাল পরে সে দিন কাপ্তেন আমণ্ডসেন আসন্ন মৃত্যু-বিভীষিকাকে তুচ্ছ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে দক্ষিণ মেরু-প্রান্তে মানবপদ চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া আসিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাহার পর, আর একজন বীর-হৃদয় সেই মেরু প্রান্তে ব্রিটিস-পতাকা উড্ডীয়মান করিতে গিয়া আপনার শেষ জীবন সর্ব্বগ্রাসী তুষারের মধ্যে সমাধিস্থ করিয়াছেন। তাঁহার মেরু-প্রদেশ যাত্রা ও মৃত্যু কাহিনী উপন্যাস অপেক্ষাও কৌতূহলোদ্দীপক। সে কাহিনী একদিকে যেমন মহিমাপ্রদীপ্ত অন্য দিকে সেইরূপ অশ্রুসিক্ত। পৃথিবীর ইতিহাসে এত বড় স্বার্থত্যাগ ও সহিষ্ণুতার কথার উল্লেখ আর নাই বলিলেও হয়। এই দুর্ঘটনা ইংলণ্ডের চারিদিকে প্রচারিত হইলে যে সহানুভূতি ও দুঃখের স্রোত বহিয়াছিল তাহা ইংলণ্ডের বিচিত্র ও ঘটনাবহুল ইতিহাসেও সম্পূর্ণ অভিনব।

কাপ্তেন স্কট ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে একবার দক্ষিণ মেরু আবিষ্কারের চেষ্টা করেন কিন্তু সেবার মেরু প্রদেশস্থ “রাজা সপ্তম এডবার্ডের দেশ”টুকু আবিষ্কার করিয়াই তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতেই তাঁহার দক্ষিণ মেরু আবিষ্কারের কৌতূহল আরও উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে, এবং জেদও বাড়িয়া উঠে। সেই জন্য তিনি পুনরায় ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে আবার দক্ষিণ মেরুর উদ্দেশে যাত্রা করেন।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুন তারিখে কাপ্তেন স্কটের জাহাজ “টেরানোভা” (Terra Nova) লণ্ডন ত্যাগ করে এবং ২৯শে নভেম্বরে নিউজিলণ্ডের একান্ত দক্ষিণ দিক্‌বর্ত্তী চামার্স পোতাশ্রয়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই পোতাশ্রয় হইতে ৫৮জন কর্ম্মচারী, ৩৫টী কুকুর, ১৯টী টাটু ঘোড়া, ২টী খরগোস ও ২টী বিড়াল লইয়া স্কট দক্ষিণ মেরুর দিকে যাত্রা করেন। পথে “রস” সমুদ্র ও ক্রাজিয়ার অন্তরীপ পার হইয়া তিনি ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ জানুয়ারীতে ম্যাকমার্ডো-সাউণ্ডে উপস্থিত হন ও এই “সাউণ্ডের” অদূরবর্ত্তী কেপ ইভানসে আপনার শীত-নিবাস স্থাপন করেন। কেপ ইভানসে আসিয়া কাপ্তেন স্কট স্থির করিলেন যে সর্ব্বশুদ্ধ ১৬জন

লোক লইয়া মেরুপ্রান্তে যাত্রা করিতে হইবে এবং যাত্রাপথে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শীত-নিবাস স্থাপন করিয়া যাইতে হইবে। আরও স্থির হইল যে প্রত্যেক অক্ষাংশে উপস্থিত হইয়া তিনি চারিজন করিয়া লোক বিদায় দিবেন এবং সর্ব্বশেষে যে অবশিষ্ট চারিজন লোক থাকিবে কেবল সেই চারিজনকে লইয়াই তিনি মেরুপ্রান্তে উপস্থিত হইবেন।

কাপ্তেন স্কট

ভীষণ ঝটিকা ও অন্যান্য কারণে স্কট ২রা নভেম্বরের পূর্ব্বে কেপ ইভান্‌স ত্যাগ করিতে পারেন নাই। এই স্থান ত্যাগ করিয়া তিনি ১০ই তারিখে Beardmore glacierএ উপস্থিত হন এবং ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারীতে তিনি কেন্দ্র হইতে ৭০ ক্রোশ দূরে গিয়া পড়েন। এইস্থানে তিনি তাঁহার পূর্ব্ব কথামত শেষ চারজনকে বিদায় দিয়া অবশিষ্ট চারজনকে লইয়া মরুপ্রান্তে যাত্রা করিলেন। এই চারি জনের নাম:—ডাক্তার উইল্‌সন, কাপ্তেন ওটস্‌, বাউয়ার্স, এবং ইভান্‌স। তাঁহারা কঠিন তুষারমণ্ডিত একটি বিরাট ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া যাইতে আরম্ভ করিলেন। চারিদিক অন্ধকার—নিস্তব্ধ—কোথাও জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নাই; কেবল মধ্যে মধ্যে তুষার-ঝটিকা উন্মত্তভাবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

ঘণ্টায় ১২ মাইল করিয়া পথ অতিক্রম করিয়া ১৭ই জানুয়ারীতে কাপ্তেন স্কট দক্ষিণ মেরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন এবং এখানে কাপ্তেন আমণ্ডসেন কর্ত্তৃক রক্ষিত একটা ক্ষুদ্র তাঁবু ও অন্যান্য কিছু জিনিষ দেখিতে পাইলেন। এদিকে দিনের পর দিন তাপ কমিয়া আসিতেছিল। কেন্দ্রে আসিয়া দেখা গেল ফারেন হিটের সাধারণ তাপমান যন্ত্রের পারার রেখা শূন্যেরও ২০ ডিক্রি নীচে নামিয়াছে। অত্যন্ত ঝড়ের জন্য প্রথম দিন কেন্দ্রের চতুর্দ্দিক

ডাক্তার উইলসন্

ভীষণ অন্ধকার ছিল; কিন্তু দ্বিতীয় দিন সমস্ত কুয়াসা ভেদ করিয়া সূর্য্য উঠিল। সে এক অপরূপ দৃশ্য! দশ পনেরো হাজার ফুট উচ্চ শ্বেতগিরিসমূহ মেঘমুক্ত আকাশ ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহাদের গা বহিয়া রজতশুভ্র তুষার স্রোত নামিয়া আসিতেছে। আবার কোথাও শুভ্র আলোকসম্পাতে তুষারখণ্ডগুলি মুক্তাবিন্দুর মত ঝলমল করিতেছে। এইস্থানে তিনি ইংলণ্ডের জাতীয় পতাকা "Union Jack" স্থাপন করিয়া তাহার পানে নমস্কার করিলেন। কিন্তু বেশীদিন মেরুপ্রান্তে থাকা একেবারেই অসম্ভব, কারণ প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই তুষার দংষ্ট হইবার সম্ভাবনা। তুষারহত হইলে রক্ত চলাচল বন্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইবার আশঙ্কা খুব বেশী। দেহের কোন স্থান তুষার দংষ্ট হইলে তথায় বারংবার আঘাত করিতে হয়, তবে পুনরায় রক্তের চলাচল আরম্ভ হইয়া থাকে। দুই এক মিনিট হাত খোলা থাকিলেই তুষারাহত হইতে হয়। বিপদের নানাপ্রকার সম্ভাবনা দেখিয়া কাপ্তেন স্কট মেরু-প্রান্ত হইতে ফিরিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথম প্রথম তাঁহারা ঘণ্টায় ১৮ মাইল পথ অতিক্রম করিতে পারিয়াছিলেন। পথিমধ্যে স্কটের সহচর ডাক্তার উইলসন নানাপ্রকার ভৌগলিক ও বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং নানাপ্রকার উদ্ভিজ্জ ও জীবজন্তু সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

চক্রহীন শ্লেজগাড়ীর সাহায্যে কাপ্তেন স্কট ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এদিকে ভীষণ ঝড় আরম্ভ হইয়াছে। এই ঝড় এমন ভয়ানক যে পূর্ব্বাবধি সতর্ক না থাকিলে আরোহীসহ শ্লেজগাড়ী অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই তুষারাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। ইতিমধ্যে স্কটের সহচর ইভান্স বিপদের সহিত ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া ক্রমেই ক্ষীণবল হইয়া পড়িতেছিলেন। চারিদিকের তুষার-ঝটিকা ভেদ করিয়া অগ্রসর হওয়া তাহার পক্ষে ক্রমে অসম্ভব হইয়া পড়িল। পথিমধ্যে তিনি হঠাৎ পিচ্ছিল বরফের উপর পতিত হইয়া অত্যন্ত আহত হইলেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যে "মস্তিষ্ক-স্তম্ভন" রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার মৃতদেহ বরফের মধ্যে পাওয়া গেল। এই আসন্ন বিপদকে উপেক্ষা করিয়াও কাপ্তেন স্কট আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন। এদিকে দিনের পর দিন তাপ কমিয়া আসিতেছিল। চারিদিকে কেবল তুষার-ঝটিকা! ক্রমে তাঁহাদের খাদ্য ও কয়লা কমিয়া আসিতে লাগিল এবং দেখা গেল যে তাঁহারা দিনে নয় মাইলের বেশী মোটেই অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না।

ইতিমধ্যে তাঁহার অন্য সহচর কাপ্তেন ওটস্‌ও রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সেবা করিতে গিয়া ক্রমেই দেরী পড়িয়া যাইতে লাগিল। ওটস্ দেখিলেন, যদি তিনি সমস্ত পথ এইভাবে চলেন তাহা হইলে তাঁহার ত বাঁচিবার আশা নাই-ই, উপরন্তু বাকি লোকগুলিকেও তাঁহার জন্য মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে। তাই তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়া তাঁহার সঙ্গীগণকে রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। রাত্রির অন্ধকার তখন চারিদিক ঘেরিয়া আছে, তুষার ঝটিকার ভীষণ গর্জ্জন আকাশ বিদীর্ণ করিতেছে; এমন সময় মরণোন্মুখ ওটস্ স্কটের নিকট আসিয়া বলিলেন "স্কট, আমায় একটু ছুটি দাও, বাহিরে আমার কাজ আছে, এখনি ফিরিয়া আসিব।" এই বলিয়া ওটস্ সেই অনন্ত তুষার সমুদ্রের মধ্যে ঝাঁপ দিলেন—চিরকালের জন্য অদৃশ্য হইয়া গেলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এতবড় স্বার্থত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আর আছে কিনা জানিনা।*

এই সকল বিপদ মাথায় লইয়া কাপ্তেন স্কট পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলেন। ১৯এ মার্চ্চ

* কাপ্তেন ওটস্ সম্বন্ধে স্কট লিখিতেছেন "He was a brave soul. He slept through the night hoping not to wake, but he woke in the morning. It was blowing a blizzard. Oates said 'I am just going outside and I may be sometime'. He went out into the blizzard and we have not seen him since."

কাপ্তেন ওটস

তারিখে তাঁহার স্থাপিত "ওয়ানটন্ ক্যাম্প" নামক এক শীত-নিবাসের ১১ মাইল দূরে আসিয়া তাহারা উপস্থিত হইলেন এবং একটী ক্ষুদ্র তাঁবু ত আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা তখন ভয়ানক ক্লান্ত—একেবারে চলৎশক্তি রহিত। এদিকেও ঝড়ের বিরাম নাই; আর এক পা অগ্রসর হওয়া তাঁহাদের পক্ষে একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়িল। তখন কাপ্তেন স্কট, ডাক্তার উইলসন, ও বাউয়ার্স নিরুপায়ভাবে তাঁবুর মধ্যে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিলেন। পলে পলে মৃত্যু আসিয়া তাঁহাদিগকে গ্রাস করিতে লাগিল। তাঁবুর উপর ক্রমেই বরফ জমিয়া উঠিতেছিল—সেই বরফই তাঁহাদিগকে শেষে সমাধিস্থ করিয়া ফেলিল।

এদিকে তাঁহাদিকে খুঁজিবার জন্য একটী দল সেই দিকে যাত্রা করিয়া নানাকারণে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইল ইহার পর আবার দ্বিতীয় দল প্রেরিত হয়; তাঁহারা অনেক কষ্টের পর ২০ নভেম্বর তারিখে কাপ্তেন স্কট ও তাঁহার সঙ্গীগণের মৃত দেহ উদ্ধার করিতে সমর্থ হন।

কাপ্তেন স্কটের মৃত দেহ হইতে যে ডায়ারী পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে ২৪এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত তিনি ডায়ারী লিখিয়াছিলেন এবং ২৫এ মার্চ্চ তিনি ইংরাজ জাতির নিকট তাঁহার শেষবাণী লিখিতে নিযুক্ত থাকেন। এবং সকলের বিশ্বাস যে ২৭শে মার্চ্চই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

কাপ্তেন স্কটের মৃত-দেহ উদ্ধারকারীগণ ফিরিয়া আসিবার সময় তাঁহার মৃত্যু স্থানে স্মরণ-চিহ্ন-স্বরূপ নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা লিখিয়া দিয়া আসিয়াছেন :—

"Hereabout died a very gallant gentleman."

কাপ্তেন স্কটের শেষবাণী পড়িতে পড়িতে এক দিকে চক্ষু যেমন অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া আসে অন্য দিকে তেমনি তাঁহাদের সাহস ও সহিষ্ণুতার কথা ভাবিতে ভাবিতে হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। তিনি লিখিতেছেন :—

"আমরা অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি—আর লিখিবার শক্তি নাই, কিন্তু আমার পক্ষ হইতে আমি বলিতেছি যে এই আবিষ্কার-চেষ্টার জন্য আমি মোটেই দুঃখিত নই। ইহা জগতের সম্মুখে প্রমাণ করিয়া দিবে যে ইংরাজ জাতি সকল কষ্ট সহ্য করিতে পারে, বিপদে একজন অন্য জনকে সাহায্য করিতে পারে এবং অতীতের ন্যায় এখনও সহিষ্ণুতার সহিত মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে পারে।

"বাঁচিয়া থাকিলে আমি যে আমার সঙ্গীদের সাহস সহিষ্ণুতা ও দুঃখের কাহিনী বলিতে পারিতাম তাহা নিশ্চয়ই সমস্ত ইংরাজ জাতির অন্তঃকরণকে মথিত করিয়া তুলিত।"

তিনি অবশেষে লিখিতেছেন—

These rough notes and our dead bodies must tell the tale, but surely, surely a great rich country like ours will see that those who are dependent upon us are properly cared for.

(Signed) R. Scott.

25th March, 1912.

সুখের বিষয় কাপ্তেন স্কটের শেষপ্রার্থনা বিফল হইয়া যায় নাই। তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্রই বিলাতের Antarctic Exploration Fund, Daily Chronicle, Daily Telegraph এবং Mansion House Fund প্রভৃতি সমিতি অজস্র অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং সে সমস্ত অর্থ আশ্রয়হীন পরিবারবর্গের ভরণ পোষণের জন্যই ব্যয় করা হইবে।

সেই চিরতুষার প্রদেশে কাপ্তেন স্কট ও তাঁহার সহচরগণের অমূল্য জীবন দীপান্বিতার আলোক মালার মত নিঃশব্দে নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছে। কিন্তু জীবন বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহারা যে সত্যের ও স্বার্থত্যাগের জলন্ত দৃষ্টান্ত বিশ্ববাসীর হৃদয়পটে অঙ্কিত করিয়া গেলেন তাহা তাঁহাদিগকে ও তাঁহাদের জাতিকে চিরদিনের জন্য জগতের সম্মুখে মহিমান্বিত করিয়া রাখিবে।

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার

লেপ্টেনাণ্ট বাউয়ার্স

মায়ের ডাক

(গল্প)

তখনও মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল। আমি তাড়াতাড়ি ছাতিটা খুলিয়া ও কাপড়ের ছোট একটা বাক্স লইয়া জেটির বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। কিন্তু সেই দুর্য্যোগে একখানাও গাড়ী দেখিতে পাইলাম না। কিছু দূরে দুই একখানা রিক্স দাঁড়াইয়াছিল তাহাই একটা ডাকিয়া উঠিয়া বসিলাম। রিক্সওয়ালা গাড়িখানার আগাগোড়া বেশ করিয়া কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দিল; আমি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই গাড়ী লইয়া ছুটিল। আমি যেন কতকটা নিশ্চিন্ত হইলাম।

যদিও প্রথম হইতে ঠিক করিয়া আসিয়া ছিলাম যে এখানে নাবিয়া সেং-চুর মার বাড়ীতেই উঠিব কিন্তু যতবারই সে কথা মনে হইতেছিল মনটা কেমন খারাপ হইয়া যাইতেছিল। এখন আর উপায় নাই; তাহারই নিকট যাইতে হইবে। একে আমি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক; তাহার উপর এই ঘোর দুর্দ্দিন। অপরিচিত দেশে যে অসমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহাতে এই দেশবাসী কোন লোকের সাহায্য বিনা যে কার্য্য-উদ্ধার করিতে পারিব তাহা তো মনে হয় না।

ইহাই আমার জন্মভূমি সত্য। কিন্তু এখন আমার নিকট এই স্থান স্বদেশ হইয়াও বিদেশ। আমার যখন এগার বৎসর বয়স সেই সময় জন্মভূমি ছাড়িয়া বিদেশে নির্ব্বাসিত হই। সে আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের কথা। এখন এদেশ আমি এক রকম ভুলিয়াই গিয়াছি;—এখানে আমার না আছে আত্মীয়, না আছে বন্ধু। কে আমায় সাহায্য করিবে? এখন সেং-চুর মার দেখা পাইলে হয়।

প্রায় দশ দিন হইল সিঙ্গাপুর হইতে জাহাজ ছাড়িয়াছে কিন্তু অত্যন্ত ঝড় বৃষ্টির জন্য ঠিক সময় জাহাজ বন্দরে পৌঁছিতে পারে নাই; সে জন্য যে অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে তাহা পূর্ব্ব হইতেই বুঝিয়া-ছিলাম। কিন্তু সে ভাবনা এখন নিস্ফল। উপস্থিত কিরূপে উদ্ধার পাইব তাহাই ভাবিতেছি।

(২)

অনেক দুঃখ কষ্টের পর লিম-তাই লিকে পাইয়াছিলাম। তখন তাহার বয়স সবে দুই বৎসর। সেং-চু আমার ছেলেবেলাকার খেলার সঙ্গী ছিল, সে তাহার এই শিশুটিকে লইয়া তাহার স্বামীর সহিত নৌকা করিয়া চীন হইতে সিঙ্গাপুর আসিতেছিল। প্রায় সিঙ্গাপুর দ্বীপের কাছাকাছি আসিয়াছে এমন সময় একদল জলদস্যু তাহাদের নৌকা আক্রমণ করে এবং সকলকে নিষ্ঠুর রূপে হত্যা করিয়া যথাসর্ব্বস্ব লইয়া পলায়ন করে। যখন সেই নৌকা আসিয়া সিঙ্গাপুর পৌঁছিল তখন সেং-চু ও তাহার শিশু পুত্র

লিমতাই-লি ভিন্ন কেহ জীবিত ছিল না। সেং-চুরও তখন অন্তিম কাল। সে অতি কষ্টে শিশুটিকে আমার হাতে সমর্পণ করিয়া ভব-যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিল। দেখিলাম, ছেলেটির একটি কাণ কাটা—শুকনো রক্তের দাগ তখনো জমিয়া আছে। আমি "বাছারে!" বলিয়া তাহাকে বুকে তুলিয়া লইবার জন্য হাত বাড়াইতেই সে "মা! মা!" বলিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল। সেই অবধি সে আমার! তাহাকে আর কোল ছাড়া করি নাই। এই বিশ বৎসর কাল, এত দুঃখ দৈন্যের মধ্যেই তাহাকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছি;—বুকের উপর দিয়া এত যে ঝড়-ঝাপটা গিয়াছে সে কেবল তাহার মুখ চাহিয়াই বহন করিতে পারিয়াছি। সেও আমাকে এক দণ্ডের জন্যেও মা ভিন্ন অন্য ভাবে নাই। ছেলের কর্ত্তব্য সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছে। কিন্তু হঠাৎ এ কি! একেবারে নিরুদ্দেশ! না বলিয়া না কহিয়া বাছা আমার গেল কোথায়! এ সংসারে আমি ছাড়া তার কে আছে—কে তাহার মুখ চাহিবে! কিসের জন্য সে আমায় ছাড়িয়া গেল।

(৩)

যেদিন সে প্রথম তাহার অত দিনের মাথার ঝুঁটি কাটিয়া আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল তখনই আমার বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিয়াছিল! সেই অবধি ছেলেটা যেন উন্মত্ত। কোথায় যায়, কি করে কিছু বুঝি না। এক একবার সে মুখ গম্ভীর করিয়া বলিত—"চীনে যাইয়া যুদ্ধ করিব।" আমি বলিতাম—"ক্ষ্যাপা ছেলে! তুই যুদ্ধ করিবি কি!" সে কিছু না বলিয়া লুকাইয়া পড়িত।

কে তাহার মাথায় এ বুদ্ধি দিল! কে আমার এমন সর্ব্বনাশ করিল! যাহার দুটা ছেলে আছে তাহার একটা ছেলে যুদ্ধে যা'ক—কিন্তু যাহার একটি—সে কেন?

চীন তোর কে? তার সহিত তোর কিসের সম্বন্ধ? দুমাসের পরিচয় বই তো নয়!—তাও তোর শৈশবের অজ্ঞান অবস্থায়! আর আমি যে তোর চিরদিনের আপনার। আমার চেয়েও তোর চীন বড় হইল! ধিক তোকে! দেখ দেখি তোরই জন্য তো আমাকে আবার এই চীন মুলুকে আসিতে হইল—প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, এদেশের মাটি আর ইহজন্মে মাড়াইব না!

(৪)

রিক্সাটা খুব দৌড়িয়া আসিতেছিল। হঠাৎ এক স্থানে দাঁড়াইয়া পড়াতে আমি চমকিয়া উঠিলাম। এতক্ষণ আমার চতুর্দ্দিক কাপড় দিয়া ঢাকা ছিল, তাই বাহিরের কিছুই দেখিতে পাই নাই; এখন একটু কাপড় খুলিয়া দেখিলাম একটা মাঠের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।—অগণন সৈন্য পিপিলীকার সারির ন্যায় চলিয়াছে! উৎসাহে, উদ্যমে, চাঞ্চল্যে তাহাদের সকলের মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সমস্ত সৈন্যশ্রেণীর ভিতর দিয়া একটা উন্মত্ততার ঢেউ যেন নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছে। কোথাও কোনো শব্দ নাই—চারিদিক নিস্তব্ধ—কেবল সৈনিকদের তালে তালে পায়ের শব্দে মনে হইতেছে যেন একটা প্রকাণ্ড বজ্র পৃথিবীর বুকের উপর দিয়া গড়াইয়া গড়াইয়া চলিয়াছে—যেখানে গিয়া ঠেকিবে সেখানটাকে একেবারে রসাতলে ডুবাইয়া দিবে।

আমি রিক্স থামাইয়া দেখিতে লাগিলাম। শ্রেণীর পর শ্রেণী চলিয়াছে—যেন তাহার শেষ নাই—মনে হইতেছিল একটা প্রকাণ্ড চলন্ত সমুদ্র যেন কোথা হইতে উঠিয়া আসিয়াছে!

সৈন্য-স্রোতের পানে এক দৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া আমি কেমন নিঝুম হইয়া আসিতেছিলাম। হঠাৎ বুকের রক্তটা চনচন করিয়া উঠিল। ঐ যে! ঐ! তালে তালে পা ফেলিয়া চলিয়াছে! আমি তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম—"তাই-লি! তাই-লি!"

সে একবার ফিরিয়াও তাকাইল না। সগর্ব্বে মাথা উঁচু করিয়া যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিতে লাগিল। নিষ্ঠুর কোথাকার! মায়ের ডাকে সাড়া দিস না! দেখিতে দেখিতে সে অদৃশ্য হইয়া গেল—একটা ঢেউয়ের মুখে আসিয়া আবার ঢেউয়ের মধ্যেই মিলাইয়া গেল।

* * *

কয়দিন অবিশ্রান্ত পাগলের মতো ঘুরিতেছি—কোথায় সেংচুর মা! কোথায় তাই-লি! কে সম্বাদ দিবে! সবাই আমারই মতো উদ্‌ভ্রান্ত;—ছুটাছুটি হাঁকাহাঁকি, মারামারি চতুর্দ্দিকে। কে কার কথা শোনে! দেশটা যেন শ্মশান—দিকে দিকে মৃত দেহ ছড়াইয়া আছে—সহস্র সহস্র নরমুণ্ড গড়াগড়ি যাইতেছে;—শোণিতশিক্ত পথে পা ফেলিতে বুক কাঁপিয়া উঠে। হত্যা! হত্যা! চতুর্দ্দিকে কেবল হত্যা চলিতেছে। মৃত্যুর আর্ত্তনাদে আকাশ ছাপিয়া উঠিয়াছে। মনে হইতেছে যেন প্রলয় উপস্থিত। হায়, কোথায় তাই-লি! কোথায় তাই-লি!

* * *

এই তো রণক্ষেত্র। যুদ্ধের বীভৎস অবসান-স্মৃতি বুকে লইয়া পড়িয়া আছে। অনাথিনীরা পাগলিনীর মতো ঐ তো কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আয়! আমিও তোদের সঙ্গে ছুটি। তাই-লি! তাই-লি!—শব্দ দূরে—আকাশের গায়ে মিলাইয়া গেল। কই কোনো উত্তর তো ফিরিয়া আসিল না।

আমি ছুটিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছিলাম—পায়ে পায়ে মৃতদেহ বাধিয়া বাধিয়া পড়িতেছিল—আমি নাড়িয়া নাড়িয়া দেখিতেছিলাম, কিন্তু কৈ তাই লি!

* * *

গাছের তলায় ঐ যে, ও কে! দেহ রক্তাক্ত; কিন্তু সুন্দর মুখে একটি প্রসন্ন হাসির উজ্জ্বল রেখা ঘুমাইয়া আছে! কোথা হইতে তুই এমন হাসি পাইলি যাহা মৃত্যুও মলিন করিতে পারে নাই। মরণের মূল্য দিয়া এ হাসি তুই কোথা হইতে কিনিয়া আনিলি!

"বাছারে!" বলিয়া আমি তাহার বুকের উপর আছড়াইয়া পড়িলাম। বুকটা যেন ফাটিয়া যাইতেছিল। আর কিছু মনে আসিতেছিল না—মনে আসিতেছিল কেবল সেই বিশ বৎসর পূর্ব্বের শিশু-কণ্ঠের "মা! মা!" ধ্বনি;—আর সেই কোমল দুটি বাহুর দ্বারা আমার কণ্ঠ আলিঙ্গন!

এ কি হইল! চারিদিকে এ কি শুনি! আকাশ বাতাস মাতাইয়া এমন মধুর "মা! মা!" ধ্বনি কেন?

* * *

মূর্চ্ছা-ভঙ্গে উঠিয়া দেখি প্রভাত সূর্য্যের

আলোর হাসিতে পৃথিবী ভরিয়া উঠিয়াছে; দুঃখ শোকের কালিমা গত রজনীর অন্ধকারের মধ্যেই যেন বিলীন হইয়া গেছে—তাই-লির মুখে যে হাসি দেখিয়াছিলাম সেই হাসির স্রোত যেন দিকে দিকে ছুটিয়াছে—আর আমার শোকার্ত্ত মাতৃ-হৃদয়কে সান্ত্বনা দিয়া চতুর্দ্দিকে শব্দ উঠিতেছে "মা! মা!"

বিজন কুমারী

রঙ্গমল্লী*

'রঙ্গমল্লী'—সুকবি সত্যেন্দ্রনাথের নূতন গ্রন্থ। গ্রন্থের নাম-করণে গ্রন্থকার কবি-হৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন। রঙ্গমল্লী, রঙ্গনাথ নটেশের বীণা!

"বাজে নটেশের নৃত্যের তালে
রঙ্গমল্লী বীণা,
তালে সুরে মৃদু পল্লবি' উঠে
রাগিণী বিশ্বলীনা।
জীবন রঙ্গ। শত তরঙ্গ
চির ভঙ্গিমাময়,
স্ফুরি নীহারিকা ফুটায় তারকা
অপরূপ অভিনয়!"

* * *

রঙ্গমল্লী বিদেশী শিল্পী-লেখকগণের কয়েকখানি নাটকের বঙ্গানুবাদ। মৌলিক রচনা না হইলেও বঙ্গবাণীর কাব্য-সভায় এই রচনা উপহার পাঠাইতে কবিকে যথেষ্ট পরিশ্রম ও কৃতিত্বের পরিচয় দিতে হইয়াছে; প্রথমতঃ, বিষয়-নির্ব্বাচনে; দ্বিতীয়তঃ, বিদেশীকে স্বদেশী-করণে, তৃতীয়তঃ সৌন্দর্য্য-সম্পাদনে।

বিষয়-নির্ব্বাচনে কৃতিত্ব সেইখানে, যেখানে কবি সাহিত্যে একটা অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব, সুমধুর বৈচিত্র্যের আমদানি করেন। সত্যেন্দ্রনাথ যে কয়খানি নাটকের অনুবাদ করিয়াছেন—তাহার প্রত্যেকটির বিশেষত্ব ও বৈচিত্র্যই বিশেষভাবে চিত্তাকর্ষণ করে। এবং সেগুলির পাঠ সমাপ্ত করিয়া মনে হয়, যথার্থই "কাব্যামৃতরসাস্বাদ" করিলাম।

বিদেশীকে স্বদেশী-করণ লেখকের শক্তি সাপেক্ষ। বিষয়টিকে শুধু যথেষ্ট আয়ত্ত করিলেই চলে না—সেটিকে কবির হৃদয় এবং স্বদেশের প্রাণ দিয়া দেখিতে হয়। নতুবা বিদেশী সুর—সহজে মনোজ্ঞ হয় না। সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদের বিশেষত্বই তাহাই। তিনি ছেলেদের জন্য কথায় কথায় অর্থ করিয়া 'মানের বই' লেখেন না—তাঁহার অনুবাদে কলের মধ্য দিয়া বাহির হয় না;—তাঁহার হৃদয় হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। নিম্নলিখিত উদ্ধৃত অংশ হইতেই সে পরিচয় পাওয়া যায়:—

"আয়ুষ্মতী"। বল
মোরে, প্রিয়, যেই ক্ষণে মনে মনে মনটি তোমার
ফেলিল স্বীকার করে ভাল সে বেসেছে একজনে,—
সেই ক্ষণ,—সে কি রাত্রি?—সে কি দিন?
আর্য্যধন।
কেমনে বর্ণিব?
দিন সে—কিবা সে রাত্রি; মনে হয়, যেন সেইক্ষণে
অরুণ উদয় হ'ল—সেইক্ষণে শূন্যতার মাঝে
নক্ষত্রেরও হ'ল আবির্ভাব; উজ্জ্বল-জাজ্বল, শুভ্র।
মাতৃ-গর্ভ শয্যা-তলে হল যবে জীবন সঞ্চার
অস্ফুট দু'-আঁখি দিয়ে তোমারেই খুঁজেছি সেদিন;
ভূমিষ্ঠ হইয়া, হায়, কেঁদেছিনু তোমারি লাগিয়া;
তোমারি লাগিয়া বুঝি, বাঁচিবার ছিল প্রয়োজন;
তারপর দিনে দিনে, বাড়িয়াছি, বাসিয়াছি ভাল,
শিয়রে-সোনার-কাঠি গল্পের সে রাজকন্যাটিরে,

* শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৸৹।

আজ যেন মনে হয় রয়েছে সে তোমাতে বিলীন,
তোমারি দু-আঁখি দিয়ে সেই কন্যা দেখিছে আমায়।"

জিনসটি বিদেশী তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহার অনুবাদের মধ্যে যে প্রাণের স্পন্দন বহিতেছে তাহা আমাদের দেশেরই নাড়ির স্পন্দন বলিয়া মনে হইতে কোনো বাধা ঠেকে না।

রঙ্গমল্লীতে কবি চারিটি সুরের আলাপ করিয়াছেন। প্রথমটি ভৈরবীর মত করুণ, অথচ পূত-সংগমের মত পবিত্র; সাগরের মত গম্ভীর। তাহার পরিচয়:—

দুর্জ্জয় শত্রু আসিয়া দেশ আক্রমণ করিযাছে, বিদেশী সৈন্যের মুহুর্মুহু হুঙ্কারে দেশবাসী হতবুদ্ধি, আতঙ্কে জীবন্মৃত। দেশ-রক্ষার্থ সকল প্রবীণ যোদ্ধা পুরঞ্জয়ের দ্বারে উপস্থিত! দেশভক্ত যোদ্ধা দেবমন্দিরে দেবতার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। যাত্রার পূর্ব্বে দেবাদেশ হইল:--

"শোন পুরঞ্জয়।
যুদ্ধে যাত্রা কর যদি, অবশ্য তোমার হবে জয়;
বৈশালীর রক্ষা, বীর! করিবে তোমারি তরবার;—
কিন্তু...যবে জয় লভি ফিরিবে ভবনে আপনার,
তখন প্রথম যারে দেখিবে আপন গৃহদ্বারে,
হোক্ পশু, হোক্ নর, বলি দিতে হবে জেন' তারে।"

রণশেষে, জয়োল্লাসে প্রত্যাগত বীর পুরঞ্জয় দ্বারে আসিয়া, এ কি দেখিলেন! মাতৃহারা, "মায়ের-আভাষে-ভরা," তাঁহার একমাত্র পৃথিবীর বন্ধন, নব-যৌবনা, বাগ্দত্তা কন্যা আয়ুষ্মতী স্মিতমুখে অভিবাদন করিতেছে।

বীরের হৃদয় কাঁপিল, কাঁদিল; বুঝি টলিল। কিন্তু আসন্ন শোকেও বীর-হৃদয় বীরহৃদয়ের মতই অটুট রহিল। বীর ও পিতা, দেবসকাশে কঠিনতম প্রতিশ্রুতি কঠিন হস্তে পালন করিলেন!

এই নাটকের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে, কন্যার জীবন উষায়, সদ্যঃজাগ্রত যৌবন স্বপ্ন-হিল্লোল, বাক্‌দত্ত-প্রণয়ী আর্য্যধনের অতৃপ্ত প্রেমের বেদনাভরা কাতর হৃদয়স্পন্দন, দেশ ও দেবতার অনুরোধে স্বহস্তে একমাত্র-কন্যাহন্তা পিতার উদ্বেল হৃদয়-তরঙ্গের ছবি এমন মনোজ্ঞভাবে, প্রাণস্পর্শী ভাষায় চিত্রিত, যে পড়িতে পড়িতে অশ্রু সংবরণ করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। উচ্চাঙ্গ নাটকোচিত সংযম এই করুণ আখ্যায়িকাটিকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে! কন্যা-হন্তা পিতা, মৃতা কন্যার ছিন্ন শির লইয়া বজ্রনিনাদী কণ্ঠে দীর্ঘ বক্তৃতা করিল না! ছোরা লইয়া রঙ্গমঞ্চে হিংস্র মূর্ত্তিতে কেহ রক্তের হোরি খেলিল না! ইহাতে বঙ্গীয় পাঠক হয়ত বিস্মিত হইবেন।

যাঁহারা নাটকীয় আর্টের পরাকাষ্ঠা দেখিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে রঙ্গমল্লীর "আয়ুষ্মতী" পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

দ্বিতীয় সুরটি মূলতান। করুণ, অথচ ভৈরবীর মতই জমাট নয়, হাল্কা। তাহাতে ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্য অপেক্ষা শ্রীর স্বল্পতাই প্রাণস্পর্শী। ঘাসের সবুজ রঙের মত সহজ ও সরল, চীনদেশের একটি করুণ প্রেম-কাহিনী। দুর্ব্বল নারী-হৃদয়ের সবল প্রেম; শক্তিহীন রাজার অলস অসাড় প্রেম-প্রবণতা বা সৌন্দর্য্যলিপ্সা, স্বার্থ-বুদ্ধি, চক্রী বিশ্বাসঘাতকের দৈব শাস্তি অত্যন্ত সরলভাবে অঙ্কিত হইয়াছে।

চীন নাটকের সহিত, ভারতীয় সংস্কৃত নাটকের একটা ঐক্য দেখা যায়। ইহাতে সংস্কৃত নাটকের অনুরূপ সম্ভ্রান্ত পাত্র, মধ্যে মধ্যে শ্লোকে কথা কহিয়া থাকে। এ বিষয়টী সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণের অনুধাবন যোগ্য।

তৃতীয় সুরটি, শান্তির কেদারার মত গম্ভীর, উদার, ব্যাপক। মানব ও মানবহৃদয়বাসী দেবতার উদ্বোধন; পার্থিব ও অপার্থিবের জাগরণ। এটি সুবিখ্যাত নাট্যকার মেটারলিঙ্কের একখানি নাটকের অনুবাদ। যাঁহারা উক্ত লেখকের রচনা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবগত আছেন, যে মেটারলিঙ্ক্ মানব-হৃদয়ের গভীর ও সূক্ষ্ম বৃত্তি লইয়া নাটকের জমি প্রস্তুত করেন—এবং তাহারি উপর খুব সরু কাজ করিয়া যান—যাহা গভীরতর, সূক্ষ্মতর অনুভূতির উদ্বোধক!

নাটকখানি রূপকের মত। ইহার মূল সূত্রটি না ধরাইয়া দিলে সাধারণ পাঠক ইহার রসটুকু পূর্ণমাত্রায় বোধ হয় উপভোগ করিতে পারিবেন না! অনুবাদ প্রকাশকালে লেখক ভূমিকাচ্ছলে একটু ইঙ্গিত করিলে ভাল হইত। আমাদের মনে হয়, নাটকটি ইউরোপের

(খৃষ্টান জগতের) বর্ত্তমান আধ্যাত্মিক জীবনের পতন-ইতিহাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার পাত্রপাত্রী গুলি কোন্ এক অনাদি কালের অরণ্যগর্ভস্থ মঠের অধিবাসী। মঠাধ্যক্ষ স্থবির; তাঁহার দেহ মৃতবৎ নিশ্চল। সেবক-সেবিকাগুলির কেহ জন্মান্ধ, কেহ দৃষ্টিহারা, কেহ উন্মাদ, কেহ তরুণী, কেহ স্থবির। দৃষ্টিহারা অর্থে—আত্ম-জ্ঞান-মূঢ়। বোধ হয় পোপ-ঘটিত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের চক্ষুরুন্মীলনের জন্য লিখিত এই নাটকের বিশেষত্ব, ইহার suggestiveness.

শেষ সুরটি একেবারে হালকা কাফি-সিন্ধু বলিলে

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ভুল হয় না। হাম্বির-কেদারার ধাক্কা কাটাইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচা যায়! করুণ নয়, গম্ভীর নয়—একেবারে রহস্যচটুল ব্যঙ্গ! ইহাতে হাসি—এবং মুচকি হাসির চেয়ে হো-হো-হাসিই বেশী। কার্লাইল যাহাকে "hearty laugh" বলিয়াছেন, ইহাতে স হাসি পর্য্যাপ্ত! এটি একটী জাপানী ব্যঙ্গ নাট্যের অনুবাদ!

পাঠক ইহার পরিচয় লইবেন। আমাদের বক্তব্য এইটুকু যে, আজ-কালকার "ইস্‌মে পাপ, উস্‌মে পুণ্যের" যুগে সত্যেন্দ্রনাথের ন্যায় প্রতিভাবান কবি যখন এরূপ বিষয় সাহিত্যের অঙ্গীভূত করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই, তখন মনে হয়, আমাদের রহস্য বোধ এবং সাহিত্যের গম্ভীবোধ একেবারে উবিয়া যায় নাই। "শুচিবেয়ে" সাহিত্যিকগণ ইহাকে কি চক্ষে দেখিবেন, তাহা কৌতূহলের বিষয়।

আমরা এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া, যে বিমল আনন্দ লাভ করিয়াছি, আশা করি, বঙ্গীয় কাব্যামোদী মাত্রেই সে আনন্দ হইতে আপনাদিগকে বঞ্চিত রাখিবেন না।

শ্রীগোলোকবিহারী মুখোপাধ্যায়।

জাতীয় কাল-বৈশাখ

বৈশাখ মাত্রই কাল বৈশাখ নহে। প্রতি নব বৎসরই দৃশ্যপটে কাল-বৈশাখের মূর্ত্তি চিত্রিত দেখায় না। কিন্তু যে বর্ষ তাহাকে চৈত্র হইতেই অগ্রদূত করিয়া পাঠায় বা সঙ্গের সাথী করিয়া আনে, তাহাকে নমস্কার করিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়—"রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং"।

কাল-বৈশাখের ঝড়ে বড় বড় মহীরুহই ভূমিসাৎ হয়। আমাদের জাতীয় জীবনে এই বৎসর সেই কাল-বৈশাখের লক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছে। মহাকাল মালী কাঁচা পাকা অনেকগুলি ফল উৎপাটিত করিয়া মহাকাল গর্ভে লীন করিয়া দিয়াছেন। গণিতবিৎ গৌরীশঙ্কর দে, বৈদ্যরত্ন দেবেন্দ্রনাথ সেন, সুচিকিৎসক গণেন্দ্রনাথ মিত্র, অধ্যাপক বিনয়েন্দ্র নাথ সেন এবং—লেখনী অগ্রে লিখিতে হাত সরিতেছে না—দেশসেবক পূজনীয় জানকীনাথ ঘোষাল বঙ্গের জাতীয় জীবনে আর নাই। ভারতীর পাঠকবর্গ বিদিত আছেন এই শেষোক্ত লোকমান্য মহাশয়ের দেহান্তের সঙ্গে ভারতী সম্পাদিকা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর ভাগ্যলিপি বিপর্য্যয়ের কি সম্বন্ধ। ইহার অন্তর্ধানে তিনি আজ ব্যক্তিগত বিয়োগশোকবিধুরা। যাঁহার নেপথ্য সাহায্য, উৎসাহ ও সহানুভূতিতে বলপ্রাপ্ত হইয়া ভারতী সম্পাদিকা তাঁহার লোককর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিতেন তাঁহার অন্তর্ধানে যদি সে কর্ত্তব্যনির্ব্বাহে ক্ষণকালের জন্য তিলমাত্র শিথিলতা পরিলক্ষিত হয় আশা করা যায় তাহা পাঠকগণের মার্জ্জনা যোগ্য হইবে।

২৯শে বৈশাখ, ১৩২০। শ্রীসরলা দেবী।

গণিতবিৎ গৌরীশঙ্কর দে

গত ৪ঠা এপ্রিল স্কটিশ চর্চ্চ কালেজের প্রবীণ অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর দে মহাশয়ের ৭০ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে। ২২ বৎসর বয়সে তিনি এম, এ. পরীক্ষায় উপাধি লাভ করেন, এবং সেই হইতেই গণিত-শাস্ত্রের অধ্যাপনাব্রত গ্রহণ করিয়া মৃত্যুর পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত তাহা পালন

করিয়াছেন। কালেজে অধ্যাপনা ব্যতিরেকে বহু ছাত্র তাঁহার গৃহে আসিয়া পাঠ বুঝাইয়া লইত ও অনেকের বাড়ীতে গিয়াও তিনি তাহাদিগকে পড়াইয়া আসিতেন। অঙ্ক-শাস্ত্রে তিনি যে একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু অঙ্ক শাস্ত্র ব্যতীত ইংরাজী, বাঙ্গলা, সংস্কৃত প্রভৃতির চর্চ্চাতেও তিনি বিশেষ মনোযোগ দিতেন। এমন শৃঙ্খলার সহিত নিয়মমত সমস্ত কার্য্য তিনি নির্ব্বাহ করিতেন যে, কোন নৈমিত্তিক কাজই তাঁহার অননুষ্ঠিত রহিত না। প্রাত্যহিক উপাসনা ও পদব্রজে বহুবাজারের ধর্ম্মসভায় যোগদান, সান্ধ্য-ভ্রমণ প্রভৃতি কোন কাজই কোনোদিন বাদ পড়িত

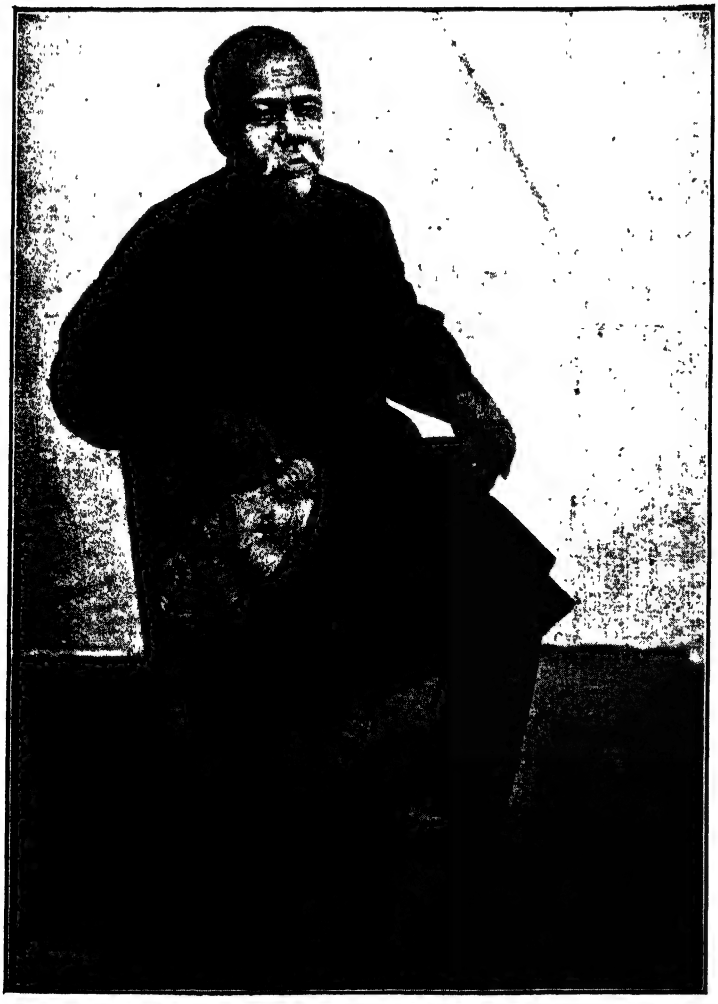

গণিতবিৎ গৌরীশঙ্কর দে

না। এক কথায় তাঁহার জীবনযাত্রার প্রণালীটি যেমন পরিশুদ্ধ তেমনই ব্যবস্থানুযায়ী ছিল।

ধর্ম্মনিষ্ঠা স্মৃতি ও মেধা প্রভৃতি লইয়াই যে গৌরীশঙ্কর সম্পূর্ণ তাহা নহে! তাঁহার হৃদয় ও চরিত্রের আদর্শেই তাঁহার প্রকৃত পরিচয়। ছাত্রদিগের মঙ্গলের জন্য তাঁহার চেষ্টা অসাধারণ ছিল। এই চেষ্টা তাঁহার প্রত্যেক ব্যবহারে ও বাক্যে যেন স্ফূরিত হইত। তিনি এমন সরলভাবে আঁক কসাইতেন যেন ছেলেদের বুঝিতে একটুও কষ্ট না পাইতে হয়। অনাথ ছাত্রদিগকে তিনি পুস্তক ও বেতন প্রভৃতি দ্বারা সাহায্য করিতেন। ইহা ব্যতীত আর্ত্ত ও দুস্থ ব্যক্তি মাত্রেই তাঁহার নিকট হইতে সাহায্য পাইত। কিন্তু এ সংবাদ কেবল দাতা ও গ্রহীতার মধ্যেই আবদ্ধ থাকিত অপরে তাহা ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিত না। মৃত্যুর দিন একটী ঘটনায় সকলে আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। চতুর্দ্দিকের জনমণ্ডলী হইতে শ্মশানপথে রমণী-কণ্ঠের আর্ত্তস্বর শোকের নীরবতার মধ্যে ফুকারিয়া উঠিল—"হায় তুমি চলিলে, গরীব দুঃখীর কি উপায় হইবে বাবা? তুমি যে গরীবের মা বাপ ছিলে, আজ তাহারা কোথায় দাঁড়াইবে।" বলা বাহুল্য গৌরীশঙ্কর গুপ্তভাবে অনেক পরিবারকে সাহায্য করিতেন, উহা তাহাদেরই একজনের রোদন। কতবার গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে উচ্চ বেতনে উচ্চ সম্মানের পদ দিতে চাহিয়াছেন কিন্তু তিনি আপনার স্বাভাবিক বিনয়ের সহিত নির্ব্বিকার চিত্তে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন; বলিয়াছিলেন, যেখানে জীবনের ব্রত আরম্ভ করিয়াছেন সেখানেই তাহা শেষ করিবেন। নির্লোভ, নির্ব্বিকার পুরুষ-পুঙ্গবের রাগদ্বেষহিংসাহীন সত্যনিষ্ঠ চরিত্রের আদর্শে আসিয়া কত যুবকের চরিত্র গঠিত হইয়াছে। তাঁহার সেই প্রশান্ত প্রসন্ন প্রতিভোজ্জ্বল গম্ভীর মুখমণ্ডল যে একবার দেখিয়াছে তাহারই মাথা ভক্তিতে নত হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে আমাদের দেশের ছাত্রসমাজ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। শিক্ষা-মন্দিরে তিনি যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত।

অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন

অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন প্রায় এক বৎসর রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া বিগত ৩রা চৈত্র শনিবার অমরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। গত বৎসর ঠিক এমনই সময় হইতে তিনি দারুণ 'ক্যান্সার' রোগে আক্রান্ত হ'ন এবং সেই ভীষণ রোগই তাঁহার মৃত্যুর কারণ।

বিনয়েন্দ্রনাথের জীবন শুধু পঁয়তাল্লিশ বৎসর মাত্র। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতার অ্যালবার্ট স্কুলে তাঁহার বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত হয়, এবং এই স্থানেই তিনি সর্ব্বপ্রথম মহাত্মা কেশবচন্দ্রের সংস্পর্শে আসিয়া অল্পদিন পরে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে বিনয়েন্দ্রনাথ ইতিহাসে এম্, এ, পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন ও তৎপর বৎসর দর্শনশাস্ত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন এবং বহরমপুর কালেজের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। বহরমপুর

হইতে ভাগলপুর কলেজে ও তথা হইতে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপকের পদে প্রতিষ্ঠিত হন।

কলিকাতাই বিনয়েন্দ্রনাথের কর্ম্মক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থান। সকল সৎকার্য্যেই তাঁহার অপরিসীম উৎসাহ ছিল। ব্রাহ্মসমাজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ, ইউনিভারসিটি ইনিষ্টিটিউট ও সিণ্ডিকেট প্রভৃতির সকল কার্য্যেই তিনি অদম্য কর্ম্মশক্তির পরিচয় দিতেন। বাস্তবিকই তাঁহার ন্যায় অদম্য উৎসাহী, অক্লান্ত পরিশ্রমী কর্ম্মবীর অতি কম দেখা যায়। সমস্ত দিন নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি শ্রান্তদেহে যখন ঘরে ফিরিতেন, তখন তাঁহার সেই চিরপ্রশান্ত হাসিমুখ দেখিলে মনে হইত সমস্ত দিনের মধ্যে তিনি যত কাজ করিয়াছেন তাহা তাঁহাকে আনন্দই দিয়াছে—কাতর করিতে পারে নাই।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বিনয়েন্দ্রনাথ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধিরূপে পৃথিবীর উদার ধর্ম্মমণ্ডলীর অধিবেশনে 'জেনেভায়' গমন করেন। সেখানে তিনি আপনার বক্তৃতা-শক্তিতে ও পাণ্ডিত্যে সকলকে মুগ্ধ করিয়া ইংলণ্ড ও আমেরিকায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারপূর্ব্বক দেশে ফিরিয়া আসেন। তাঁহার পবিত্র সরল চরিত্র ব্রাহ্মসমাজের তিনটী শাখাতেই অল্পবিস্তর কার্য্য করিয়াছে। বিনয়েন্দ্রনাথের ন্যায় কর্ম্মবীর হারাইয়া ব্রাহ্মসমাজের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে।

অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন

দেশের সাধারণের নিকট বিনয়েন্দ্রনাথ তেমন পরিচিত না হইলেও—বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। বড়ই দুঃখের বিষয় যে বিনয়েন্দ্র যখন আপনার ধর্ম্ম ও কর্ম্মদ্বারা সমস্ত বাঙালী সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ঠিক তেমনি সময়েই তিনি ইহসংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার শুভ্র-সুন্দর পবিত্র অনাড়ম্বর জীবনের সংস্পর্শে যিনি একবার আসিয়া

ছেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার বিনয়-নম্র চরিত্র তাঁহার নামকে সার্থক করিয়াছিল।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

ডাক্তার গণেন্দ্রনাথ মিত্র

গণেন্দ্রনাথ কলিকাতার মেডিকেল কলেজ হইতে সম্মানের সহিত এম, ডি উপাধি লাভ করিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৩৪ বৎসর মাত্র বয়স হইয়াছিল। এই অল্প বয়সে চিকিৎসা ব্যবসায়ে তিনি যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অর্থোপার্জ্জনই ইঁহার জীবনের ব্রত ছিল না। দরিদ্র রোগী যন্ত্রণায় কাতর হইয়া যখনই গণেন্দ্রনাথের নিকট সাহায্যকল্পে আসিয়াছে, তখনই সে সাহায্য-লাভ করিয়াছে। তিনি আপনার বসিবার ঘরে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিখ্যাত ছত্র ফ্রেমে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন,—

দরিদ্রান্ ভরকৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্।
ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং নীরুজস্য কিমৌষধৈঃ॥

ইহা হইতেই তাঁহার চিত্তসম্পদের পরিচয় পাওয়া যায়।

গণেন্দ্রনাথ লোকমুখে একটা কথা শুনিয়া মনে অত্যন্ত বেদনা পাইয়াছিলেন। কথাটা এই যে, ডাক্তারে রোগী বাঁচিল কি মরিল তাহাতে বড় বিচলিত হয় না—পয়সাটা পকেটে আসিলেই হইল। তিনি তাঁহার উদার সহৃদয়তার গুণে চিকিৎসা ব্যবসায়ের এ কলঙ্ক দূর করিতে পারিয়াছিলেন।

দুই বৎসর পূর্ব্বে গণেন্দ্রনাথ বেরি-বেরি রোগে আক্রান্ত হন। সম্পূর্ণ নিরাময় হইতে না হইতে কর্ত্তব্যের আহ্বানে বিশ্রাম করিবার অবসর মিলিল না। কলিকাতার অপর শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণ গত জানুয়ারি মাসে তাঁহাকে একরূপ ধরিয়া বাঁধিয়া বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য শিমুলতলায় পাঠাইয়া দেন। সেখানে তাঁহার রোগীর দল চিঠি লিখিতে লাগিল, "আপনি চলিয়া যাওয়ায় আমাদের বড় অসুবিধা হইতেছে। কে দেখে? কে ব্যবস্থা দেয়? আমরা মরিতে বসিয়াছি।" গণেন্দ্রনাথ একজনকে উত্তর দেন, "আমার জীবন তোমাদেরই জন্য। তোমরা ভাবিও না বা ভয় পাইও না। যেমন করিয়া পারি আমি শীঘ্রই কলিকাতায় যাইব।" কাজেও তাই হইল, ফেব্রুয়ারি মাসে গণেন্দ্রনাথ কলিকাতায় ফিরিলেন।

এই সকল নানা কারণেই গণেন্দ্রনাথকে হারাইয়া আজ মনে হয় যে, তাঁহার মৃত্যুতে এক নিপুণ চিকিৎসকের বিরাট বিচক্ষণতাই যে শুধু চলিয়া গিয়াছে তাহা নহে, উদার বিপুল একটি হৃদয়ও ঝরিয়া গিয়াছে। এই দুর্লভ হৃদয়টির শোকেই বাঙ্গালী আজ আত্মহারা। তিনি বলিতেন, ডাক্তারের ব্যবসায় বিশ্বজনীন, পীড়িতের সেবাই জগতে শ্রেষ্ঠধর্ম্ম। তিনি বলিতেন,—

I feel no care of coin;
Well-doing is my wealth:
My mind to me an Empire is
While Grace affordeth health.

তাঁহার তেজস্বিতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, দায়িত্বজ্ঞান ও শ্রমশীলতার সীমা ছিল না। কোনদিন উচ্চ পদ বা সম্মানের জন্য তিনি কাহারও তোষামোদ করিতে ছুটেন নাই। গভর্ণমেণ্ট তাঁহার শক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে

Pathologyর অধ্যাপকপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া- ছিলেন ; তিনিও জীবাণু সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন কিন্তু নিষ্ঠুর কাল নিতান্তই অকালে তাঁহার জীবনসূত্র ছিন্ন করিয়া দিল।

শ্রী.সী

ডাক্তার গণেন্দ্রনাথ মিত্র

কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ সেন

কলিকাতা কলুটোলার প্রসিদ্ধ কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ সেনমহাশয়ের বিয়োগে ভারত-বর্ষের বৈদ্যসমাজ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। নানাদিক হইতে তিনি বৈদ্যশাস্ত্র ও বৈদ্য-সমাজের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। তাঁহার উদ্যোগে এবং অর্থে বাংলায় আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থের প্রচার হইয়াছে। যে সকল গ্রন্থ এতকাল দুর্লভ ছিল তাঁহার যত্নে ও চেষ্টায় সেই সকল গ্রন্থ আয়ুর্ব্বেদপন্থী চিকিৎসক দিগের সহজলভ্য হইয়াছে। এই সকল কার্য্যই দেবেন্দ্রনাথের জীবনের গৌরব। এই সকল কার্য্যের দ্বারা তিনি যে বীজ বপন করিয়া গেলেন হয় ত তাহার দ্বারাই কালে কবিরাজী চিকিৎসার বিশেষ উন্নতি হইবে। আয়ুর্ব্বেদের যাহাতে বহুল প্রচার হয় এবং আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা যাহাতে অতীত গৌরবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত

কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ সেন

হইতে পারে তাহার জন্য দেবেন্দ্রনাথ সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতেন। ইহার জন্য তিনি তাঁহার সাধ্য মত যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহার ফল হয় ত অতিদূর ভবিষ্যতে কিন্তু তজ্জন্য তিনি যে দেশবাসীর আন্তরিক শ্রদ্ধার পাত্র তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীম

জানকীনাথ ঘোষাল *

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঝাঁপতাল।

সংসারের মাঝে, সকলের কাজে,
দেহ প্রাণ মন, করিয়ে অর্পণ
দিয়েছিলে তুমি।

পর আপনার, ছিল না তোমার,
হয়ে একচিত্ত সেবিয়াছ নিত্য
মাতা জন্মভূমি॥

গুণমুগ্ধ তব, বান্ধবেরা সব,
বিদায় সম্মান, করিবারে দান
এসেছে সকলে।

পূজার তরেতে, অর্ঘ্য করেতে,
অনাথ আমরা, আসিয়াছি ত্বরা
নয়নের জলে॥

কে লইবে তাহা শূন্য গৃহ আহা,
তব স্মৃতি বক্ষে, কহে কক্ষে কক্ষে,
নাই কেহ নাই।

অন্তর সে কহে, নহে তাহা নহে,
জানি তুমি আছ, শান্তি লভিয়াছ
অমৃতের ঠাঁই॥

আজ আমরা যাঁহার পবিত্র শ্রাদ্ধবাসরে সমবেত হইয়াছি তিনি আমাদের পিতা। আমরা সন্তান হইয়া এই শোকসভায় পিতার কথা যে বলিতে আসিয়াছি তাহা শুধু সম্পর্কের দাবীতে নহে। তিনি আমাদের পিতা—পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ—সত্য, কিন্তু তিনি শুধু একলা আমাদের ছিলেন না। শুধু নিজের পরিবার প্রতিপালন করিয়া, নিজের সন্তানদের স্নেহ করিয়াই পিতৃদেব জীবন অতিবাহিত করেন নাই। তিনি তাঁহার উদার মনঃপ্রাণ ব্যক্তিগত সম্বন্ধের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখেন নাই—বন্ধুবান্ধব ও মাতৃভূমির সেবায় প্রসারিত করিয়া দিয়াছিলেন। তাই তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিন, যে দিন তাঁহার আত্মজ পুত্র শ্রীমান্ জ্যোৎস্নানাথ বহুদূরে ইংলণ্ড প্রবাসে সেদিন ভক্তবৎসলা বঙ্গজননীর প্রেরিত বহু পুত্রগণের সহায়তায় আত্মীয়গণের হৃদয়ে জ্যোৎস্নানাথের অনিবার্য্য অনুপস্থিতিজনিত সন্তাপের তীব্রতা কতকটা প্রশমিত হইয়াছিল।

নদীয়ার জয়রামপুরের ঘোষালবংশে প্রায় ৭১ বৎসর পূর্ব্বে পিতৃদেবের জন্ম হয়। আমাদের পিতামহ ৺জয়চন্দ্র ঘোষালের দুই পুত্র ছিলেন, তন্মধ্যে পিতামহাশয় কনিষ্ঠ। এই ঘোষালবংশ অসাধারণ বলবীর্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ। তাঁহাদের জয়রামপুরের পৈত্রিক জমিদারী সম্বন্ধে এই প্রসিদ্ধি আছে যে, ঘোষালদিগের কোন পূর্ব্বপুরুষ উগ্র বীর্য্যতার পুরস্কার স্বরূপ কৃষ্ণনগরের রাজার নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। প্রবাদ এই যে—রাজার এলাকায় এক বন্য মহিষ প্রবেশ করিয়া অত্যন্ত উৎপাত আরম্ভ করে, কেহ তাহাকে দমন করিতে না পারায় রাজা ঘোষালদের দুই ভ্রাতাকে ডাকিয়া পাঠান। তাঁহারা রাজাহ্বানের কারণ অবগত হইয়া বলিলেন

* শ্রাদ্ধবাসরে শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী কর্ত্তৃক পঠিত।

এই একটা বুনো মোষের জন্য দুটো লোকের কি দরকার? একজনই যথেষ্ট। এই বলিয়া কোন এক ভ্রাতা একখানা কাঠের মোটা চেলা লইয়া যুদ্ধার্থে যাইলেন। সঙ্গে রাজা, অনুচর, গ্রামবাসী সকলে দর্শকভাবে চলিলেন। মহিষ যেমন আসিয়া আক্রমণ করে, অমনি তিনি শিং ধরিয়া তাহাকে হটাইয়া দেন। এইরূপে খানিক ক্ষণ যুদ্ধের পর একবার এমন জোরে তাহার মুখ মাটীতে গুঁজিয়া ধরিলেন যে তাহার উঠিবার সাধ্য রহিল না। তখন

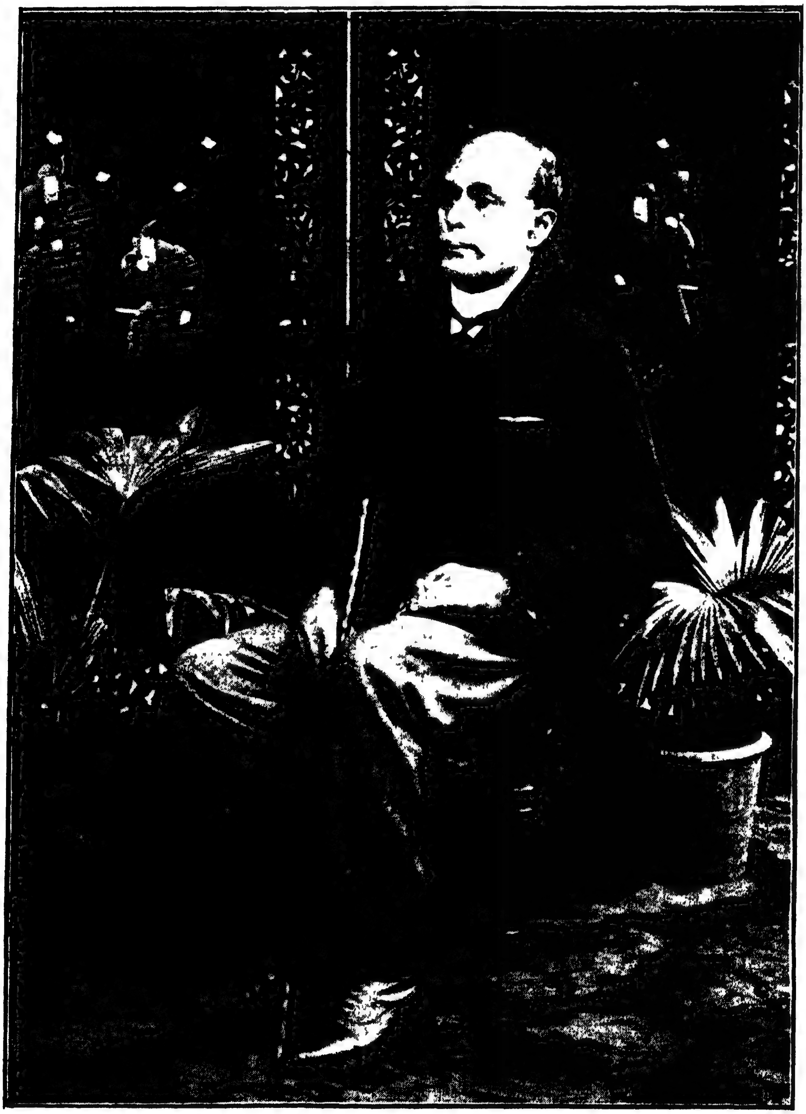

জানকীনাথ ঘোষাল

তাহার মাথা কাটিয়া রাজাকে উপহার দিলেন ও প্রতিদানে এই ব্রহ্মত্র লাভ করিলেন।

কথিত আছে, আমাদের প্রপিতামহ একদিন ঘাটে স্নান করিতে যাইতেছেন এমন সময় সংবাদ পাইলেন যে গ্রামে একটা ব্যাঘ্র প্রবেশ করিয়া অনর্থ করিতেছে। তিনি অমনি ব্যাঘ্রাভিমুখে গমন করিয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া যুদ্ধের পর ব্যাঘ্রকে বধ করিয়া স্কন্ধে লইয়া গৃহে আগমন করেন। কিন্তু ব্যাঘ্রের প্রহারে তাঁহার শরীর এরূপ জর্জ্জরিত হইয়াছিল যে তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

পূর্ব্বে ডাকাতের দৌরাত্ম্য প্রবল ছিল কিন্তু শুনা যায় ঘোষালদের এমনিই ডাক নাম ছিল যে জয়রামপুরে তাহারা আসিতে সাহস করিত না। আর নিকটের গ্রামে ডাকাত পড়িলে যখনই তাঁহারা বিপন্ন পরিবারের সাহায্যার্থে পহুছিতেন ডাকাতেরা সভয়ে প্রস্থান করিত। এখনও দেশে প্রবাদ প্রচলিত আছে যে "ঘোষালদের ভয়ে বাঘে ছাগলে এক ঘাটে জল খায়।"

এই প্রবাদ গুলি অতিরঞ্জিত হইলেও ইহা যে, বংশবিশেষের চরিত্রের গতি নির্দ্দেশ করে তাহা নিঃসন্দেহ। এই বংশে জন্মিয়া পিতার বাল্য-শিক্ষাও বংশানুকূল হইয়াছিল। তাঁহাদের লাঠিখেলা বর্ষাখেলা ঘোড়ায় চড়া প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইত এবং মধ্যে মধ্যে দুই দল হইয়া কৃত্রিম যুদ্ধ চলিত। জ্যেঠামহাশয় ও পিতামহাশয় দুই বিরোধী দলের অধ্যক্ষ হইতেন—তাঁহাদের মধ্যে অসামান্য ভ্রাতৃস্নেহ ছিল কিন্তু যুদ্ধের সময় কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া কথা কহিতেন না।

এই শান্তিপূর্ণ সময়ে ডাকাত বা ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করিবার আবশ্যক না হইলেও পিতৃদেবের এই অসাধারণ বল ও সাহসের পরিচয় অনেক কার্য্যেই পাওয়া যাইত।

পূজ্যপাদ মাতামহ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ চুঁচুড়াতে যখন রোগশয্যায় শয়ান তখন একদিন রাত্রিকালে তাঁহার মশারীতে আগুন লাগে। পিতৃদেব তাঁহাকে একলাই কোলে করিয়া উঠাইয়া নিরাপদ স্থানে লইয়া যান। পিতামহাশয়ের বিবাহের পূর্ব্বে দাদামহাশয় যখন একবার সপরিবারে শিঁথির বাগানে বাস করিতেছিলেন, সেই সময় পিতা একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। সেজ-মাতুলমহাশয় ৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি অত্যন্ত দুরন্ত ঘোড়া ছিল, কেহই তাহাতে চড়িতে সাহস করিত না। কিছুদিন পূর্ব্বে একজন দ্বারবান সেই ঘোড়ায় চড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ফিরিবার সময় ষ্টেশনে যাইবার জন্য ভাড়াটে গাড়ী না পাওয়ায় সেজমামা তাহার উল্লেখ করিয়া বলেন যাইবার একমাত্র এই উপায় আছে। তিনি মনে করিয়াছিলেন পিতামহাশয় তাহাতে সম্মত হইবেন না; কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাতেই আরোহণ করিয়া ষ্টেশনে গমন করেন। ঘোড়া সওয়ার চিনিতে পারে; তাঁহার হস্তে চালিত হইয়া সুবাধ্য সন্তানের ন্যায় হৃষ্ট ও প্রফুল্লভাবে সে গমন করিল—কোন দুষ্টামির চিহ্নও প্রকাশ করিল না।

যোড়াসাঁকোর বাটীতে তেতলার ছাদে বাগানের দিকে ত্রিকোণচূড়া এক আলিসা আছে। একদিন মামাদের সহিত বাজী রাখিয়া তিনি ইহার উপর দিয়া দৌড়িয়া যান। সামান্য পদস্খলন হইলেই তৎক্ষণাৎ তেতলা

হইতে নীচে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতেন। তাঁহার সাহসিকতার এরূপ দৃষ্টান্ত প্রচুর আছে কিন্তু বাহুল্য ভয়ে অধিক উল্লেখ করিলাম না।

তাঁহার নিজ ইচ্ছামতই পিতামহমহাশয় তাঁহাকে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে বিদ্যাশিক্ষার্থ পাঠান। তদানীন্তন প্রিন্সিপ্যাল প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের তিনি প্রিয় শিষ্য ছিলেন। এইখানেই তিনি ৺রামতনু লাহিড়ী, ৺রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, ৺কালীচরণ ঘোষ, ৺রায় যদুনাথ রায় বাহাদুর (কৃষ্ণনগর রাজার দৌহিত্র) প্রভৃতি বন্ধুগণের সংস্পর্শে আসেন। রামতনু লাহিড়ীপ্রমুখ মনীষীগণের উপদেশ ও উত্তেজনায় পিতা মহাশয় ও আরও কতিপয় ছাত্র জাতিভেদে বিশ্বাসশূন্য হন, এবং যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করেন। আমাদের পিসেমহাশয় ৺পরেশনাথ মুখোপাধ্যায়ও ইঁহাদের মধ্যে একজন। উপবীত-ত্যাগবার্ত্তা শুনিয়া পিতামহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ত্যজ্যপুত্র করেন, কিন্তু শুনিতে পাই পিতামহী ইহাতে মোটেই রাগ করেন নাই; বলিয়াছিলেন ছেলের যাহা সত্য মনে হয় তাহাই করিয়াছে, তা করুক। কিন্তু ঠাকুরদাদা অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই। এমন কি জ্যেঠামহাশয়ের মৃত্যু হইলে পিতাকে বঞ্চিত করিবার জন্য অনেক বিষয় সম্পত্তি তিনি বিক্রয় করিয়া ফেলেন; তথাপি পিতৃদেব স্বার্থের জন্য নিজের মত ও বিশ্বাস ত্যাগ করেন নাই; পিতার ক্রোধবজ্র মাথায় লইয়া এই সময় তিনি নানা সমাজসংস্কার কার্য্যে ব্রতী ছিলেন, এবং নিজ ব্যয় নির্ব্বাহার্থে পুলিসে কর্ম্ম গ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁহার ন্যায় লোকের পুলিসের সব কার্য্য অনুমোদন করিয়া সদ্ভাবে চলা অধিক দিন সম্ভব নহে তাহা বলাই বাহুল্য।

এই সময় মাতামহ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কৃষ্ণনগরে যান ও এই সুদর্শন উৎসাহী সমাজ-সংস্কারক যুবককে দেখিয়া প্রীত ও আকৃষ্ট হয়েন এবং কয়েক বৎসর পরে মাতৃদেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ স্থির হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, পিতা বিবাহ করিতেছেন শুনিয়া ঠাকুরদাদা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েন এবং এই সময় হইতে আবার তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া অন্তরের সহিত তাঁহাকে পুনর্গ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতায় আসিয়া মূল্যবান অলঙ্কার দ্বারা বধূর মুখ-দর্শন করেন এবং তখন হইতে মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আমাদের বাটীতে আসিয়া বাস করিতেন ও আমাদের লইয়া আগারাদি করিতেন। সেকালের হিসাবে তাঁহারও প্রকৃতি উদার ছিল। ব্রাহ্মণত্বের চিহ্ন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করায় তাঁহার মনে আঘাত লাগিয়াছিল কিন্তু অনেকগুলি ছোট খাট কুসংস্কার তিনি নিজেই মানিতেন না।

বিবাহকালে পিতৃদেব মাতামহ-পরিবারের ২টী রীতি গ্রহণ করেন নাই:—১। ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ, ২। ঘরজামাই থাকা। এই সময় তিনি ডেপুটী কলেক্টার ছিলেন। মাতৃদেবীর যখন বিবাহ হয়, তখন তাঁহার বয়স ১২বৎসর মাত্র। মাতামহ কন্যার যে শিক্ষা পত্তন করেন, স্বামীর যত্নে তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠে। পিতা তাঁহার কন্যাদ্বয়কেও পুত্র-নির্ব্বিশেষে শিক্ষা দিয়া আসিয়াছেন, ইহা

সকলেই জানেন। মাতৃদেবী ও আমরা যে কোনো সৎকার্য্যের বা দেশ-হিতকর কার্য্যের প্রয়াস পাইয়াছি তাহাব তিনি প্রধান সহায় ও উদ্যোগী ছিলেন। পূজনীয় মাতুল সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমাজ-সংস্কার-প্রযত্নে তিনিই সর্ব্বপ্রধান সহায় ছিলেন। তাঁহাব বন্ধু-বাৎসল্য যে কি গভীর ছিল, তাহা প্রত্যক্ষ ফললাভদ্বাবা তাঁহাব অনেক বন্ধুই বিশেষভাবে অবগত আছেন। কৃষ্ণনগর কলেজে পড়িবার সময় তাঁহার একজন বন্ধু ছিলেন, তিনি এখন অতি বৃদ্ধ, তথাপি পিতাব অসুস্থতাব সংবাদ পাইয়া দেখিতে আসিবার সমস্ত ঠিক করিয়াছিলেন, আমাদের বিশেষ নিষেধে ক্ষান্ত হন। তাঁহাব একজন সংপাঠী বন্ধুকে তিনি একবার কয়েক সহস্র টাকা ধাব দেন। বন্ধু তাহাব কিয়দংশ শোধ করিয়া একদিন বলিলেন "বাকী হাজার কতক আব আমি দিতে পারছিনে, আমায় মাপ কবে দেও!" পিতৃদেব হাস্যমুখে বন্ধুর এ আবদার মানিয়া লইলেন।

বিবাহের পরেই পিতার বিলাত যাইবাব প্রস্তাব হওয়ায় তিনি ডেপুটী কালেক্টরীর পদ ত্যাগ করেন। কিন্তু নানা অভাবিত কারণে সেই সময় বিলাত যাওয়ায় বাধা পড়ায় তিনি স্বাধীন জীবিকার জন্য ব্যবসা বাণিজ্য আরম্ভ কবেন। সেই সূত্রে বেরিণী কোম্পানীর হোমিওপ্যাথিক দোকান তিনি ক্রয় কবেন। তাহা খুব লাভজনক ছিল। বিক্রয় করিবার অল্পদিন পরে—তাহার পূর্ব্ব মালিক তাহা পুনর্লাভে ইচ্ছুক হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরণাপন্ন হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় পিতৃদেবের একজন বিশেষ বন্ধু ছিলেন। বিদ্যাসাগরের অনুরোধে পিতা গভীর স্বার্থত্যাগ করিয়া দোকান ফিরাইয়া দিলেন।

তাঁহার ত্যাগস্বীকার ও দয়া প্রভৃতি কিরূপ প্রবল ছিল, তাহার আর একটি উদাহরণ দিতেছি। লাটের নিলামে অল্প মূল্যে তিনি অনেকগুলি বিষয় খরিদ করেন; তাহা রাখিলে তিনি লক্ষাধিপতি হইতে পারিতেন। কিন্তু যখন পূর্ব্ব মালিকগণ গললগ্নবাসে আসিয়া জমি ফিরাইয়া দিবার অনুবোধ করেন, তখন তাহার অধিকাংশই তিনি প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন।

বোগীর সেবা তাঁহার একটি প্রধান ব্রত ছিল! পরিবারের সকলেই এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারিবেন। দেশে বিদেশে সর্ব্বত্র তিনি মাতামহ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের যতদূব সেবা করিয়াছেন, আর কেহই তাহা করিতে পাবেন নাই। দাসদাসীর রোগেও তিনি সেবা করিতেন। পূর্ব্বে যোড়াসাঁকোর নবাবী প্রথায় চাকর দাসীদের অসুখের সময় তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র গৃহ ও বৈদ্যের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু পিতা তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেন না; অসুখের সময় নিজে পুনঃ পুনঃ তাহাদের খোঁজ খবর লইতেন; আবশ্যক হইলে নিজেও সেবা করিতেন। সময়ে সময়ে তাঁহাকে এজন্য উপহাসাস্পদ হইতে হইত। গরীব দুঃখীর সেবার জন্য তিনি ঘরে বসিয়া হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শিক্ষা করিয়া বিনা পয়সায় ডাক্তারী করিতেন। কাশিয়াবাগান বাগান-বাড়ীতে আমরা যখন ছিলাম—তখন দেখিয়াছি, বোজ সকালে পাড়ার আর্ত্ত লোকে বাড়ী ভরিয়া যাইত! ভোর হইতে রোগী দেখিয়া ঔষধ

বিতরণ করিতে করিতে বেলা দশটা এগারটা বাজিয়া যাইত। তাহার পর তিনি স্নান আহার করিতেন।

কাহারও বিপদ বা কষ্ট দেখিলে তিনি প্রাণপণ সাহায্য না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। মাতামহমহাশয় এক সময়ে তাঁহার ভ্রাতৃজায়া প্রভৃতির সহিত বৈষয়িক মকদ্দমায় জড়িত হয়েন। তখন পিতা আইনের সূক্ষ্ম জাল ভেদ করিয়া যে নীতি বাহির করেন তাহার দ্বারাই তাঁহার বিষয় রক্ষার বিশেষ সহায়তা হয়। সেই সময় আইনে তাঁহার বিশেষরূপ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখিয়া তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে বিলাত যাইয়া বারিষ্টার হইবার পরামর্শ দেন এবং তিনি আমাদের মাতুলালয়ে রাখিয়া বিলাত যাত্রা করেন। সেখানে অধিকাংশ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন কিন্তু শেষ পরীক্ষার পূর্ব্বেই ছয় বৎসর বয়স্কা কনিষ্ঠা কন্যার মৃত্যু সংবাদে তাঁহাকে দেশে ফিরিতে হয়। ইচ্ছা ছিল. আবার যাইয়া শেষ পরীক্ষা দিবেন এবং তজ্জন্য বরাবর ফি দিয়া নাম বজায় রাখিয়াছিলেন, কিন্তু ঘটনাচক্রে আর যাওয়া হয় নাই।

তিনি পরের কষ্টে এতদূর ব্যস্ত থাকিতেন যে নিজের বৈষয়িক কার্য্য অসম্পূর্ণ হইয়া থাকিত। সান্ত্বনা-পত্রে সকলেই তাঁহার মধুর নম্রতা ও বিনয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। যখন তিনি মৃত্যুশয্যায়, তখনও তিনি সমাগত বন্ধু বান্ধবগণকে যথারীতি অভিবাদন করিয়াছেন, নিজে যাইয়া গাড়ীতে পৌঁছাইতে না পারায় দুঃখ জানাইয়াছেন।

কলিকাতার প্রায় সব সাধারণ হিতকর কার্য্যেই তাঁহার যোগ ছিল। অনেক বৎসর তিনি মিউনিসিপ্যাল কমিসনার ছিলেন। মেকেঞ্জি বিলের প্রতিবাদে যে ২৮ জন কমিসনার পদত্যাগ করেন, তন্মধ্যে তিনি একজন। শিয়ালদহ ও লালবাজার দুই কোর্টেই তিনি অনারারী মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। বৎসরাবধি তাঁহার শরীর অসুস্থ ছিল; মধ্যে মধ্যে এক এক বার শয্যাগত থাকিতেন, কিন্তু একটু সুস্থ বোধ করিলেই কোর্টে ও অন্যান্য কার্য্যে যাইতেন; আমাদের নিষেধ মানিতেন না। এরূপ কর্ত্তব্যনিষ্ঠা বিরল।

ইঁহার সঙ্কলিত "Celebrated Trials in India" নামক পুস্তক সাধারণের একটি বিশেষ অভাব দূর করিয়াছে।

পবলিক কার্য্যের মধ্যে তাঁহার সব চেয়ে প্রিয় কার্য্য ছিল—ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল কংগ্রেস। হিউমের উদ্বোধনে এটি জানকীনাথের স্বহস্তে রোপা, স্বহস্তে জল সেচন করা ও স্বহস্তে বাড়ান জাতীয় মহীরুহ। কংগ্রেসের জীবন আজ ২৮ বৎসর; আজ অনেকেই ইহার বন্ধু, সহায় ও মুরুব্বি, কিন্তু যতদিন এ নাবালক ছিল, ততদিন জানকীনাথই ইহার প্রধান অভিভাবক ছিলেন।

যে সময়ে অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন মাদাম ব্লাভাট্স্কি ভারতবর্ষে আসিয়া থিয়সফি প্রচার করেন সে সময় জানকীনাথ থিয়সফিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত হন। মিঃ হিউমও থিয়সফিষ্ট ছিলেন। সেকালে বৎসরান্তে মান্দ্রাজে একটি থিয়সফিক্যাল কন্‌ফারেন্স হইত; ভারতবর্ষের সকল অংশ হইতে থিয়সফিষ্টগণ সেখানে আসিয়া সম্মিলিত হইতেন। এইরূপ সম্মিলনী হইতেই হিউম সাহেবের মনে একটি ভাবের স্ফুরণ হইল যে, সমগ্র ভারতবাসীর

এইরূপ একটি পলিটিক্যাল সম্মিলনী গড়িয়া তুলিতে পারিলে ভারতবাসীর অশেষ মঙ্গল হইবে। এই ভাব হইতেই কংগ্রেসের উৎপত্তি এবং সেই ভাবটিকে কাজে পরিণত করার মূলে ছিলেন জানকীনাথ ঘোষাল। তিনি তখন কিছুকালের জন্য এলাহাবাদে থাকিয়া "Indian Union" নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। কংগ্রেসের আরম্ভ হইতে তিনি যে কিরূপ ভাবে ইহার জন্য কার্য্য করিয়াছেন, ধন প্রাণ মন দিয়া সকলের তিরস্কার নিগ্রহ সহ্য করিয়া অম্লানচিত্তে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন তাহা সর্ব্বজনবিদিত। মৃত্যুশয্যায় যখন তাঁহার মস্তিষ্কবিকৃতি আরম্ভ হয়, তখন কংগ্রেসে যাইবার উদ্যোগ কতদূর অগ্রসর হইল ক্রমাগত তাহার খোঁজ লইতেন। কংগ্রেস-সঙ্গী ভৃত্য গোপালকে পুনঃপুনঃ শীঘ্র প্যাক্ করিতে আদেশ করিতেন। জষ্টিস আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় আসিলে তাগিদ দিতেন।

পূজনীয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে দুই একটি কথা উদ্ধৃত করিয়া এখন শেষ করিব। "দুঃখীর দুঃখ নিবারণ, বিপন্নের বিপদ উদ্ধার, স্বদেশে শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তার প্রভৃতি যে দিকে যে কোনও কার্য্যে তাঁহার সহায়তার প্রয়োজন হইত, সর্ব্বদাই তিনি তাহাতে আপনার শক্তি ও সামর্থ্য নিয়োগ করিতেন। কোনও ভাল কাজের প্রস্তাব লইয়া তাঁহার কাছে আসিলে কাহাকেও কখনও নিরাশ হইতে হয় নাই। সেই সকল প্রসঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া যাইত, তাঁহার যেন আহার নিদ্রা মনে থাকিত না, কতই যুক্তি আঁটিতেছেন, কতই উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন, কতই সাহায্যের পথ আবিষ্কার করিতেছেন। সে সময়ে তাঁহার নিকট বসিয়া থাকাও একটি আনন্দ।"

আজ ভ্রাতা শ্রীমান জ্যোৎস্নানাথ সুদূর প্রবাসে। তাঁহার অনুপস্থিতিবশতঃ যে পুণ্য কর্ত্তব্য সম্পাদনের ভার আমাদের উপর পড়িয়াছে তাহার ত্রুটি ভক্তির দ্বারা পূর্ণ হইবে এই আশা। এই কর্ত্তব্য-সম্পাদনে যাঁহারা আমাদের সাহায্য করিয়াছেন আর যাঁহাদের স্নেহ ও সহানুভূতি মাতৃদেবীর শোকার্ত্ত হৃদয়ে সান্ত্বনাবারি বর্ষণ করিয়াছে তাঁহারা আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী।

কুণাল *

(বৌদ্ধ গল্প)

প্রিয়দাস ধর্ম্মাশোক। যুবরাজ কুণাল। সুন্দর দু'টি চোখ—রাজহংসের মতো। তাই তাঁর নাম কুণাল। † যে দেখে সেই কুণালকে ভালবাসে। রাজা এই মুকুলটির সাথে আর একটি মুকুল মিলিত করিলেন। বধূ কাঞ্চন ছোট স্বামিটির খেলাধূলায় হাসিকান্নায় নবীন

* অবদান কল্পলতা, ৫৯ পল্লব।

† হিমালয়ের হংসের নাম কুণাল।

জীবনের মধুর দিনগুলি ফুলের পাপড়ীর মতন ফুটাইয়া তুলিয়া চলিল। এমনি করিয়া তাহারা ফুটিয়া উঠিল। সুন্দর কুণাল আরো সুন্দর হইল।

সুযশো বিহার। মহাস্থবির কুণালকে নিভৃতে ডাকিয়া কহিলেন—"বৎস, ভবিষ্যতে তোমার এই সুন্দর আঁখি দু'টি নষ্ট হইবে। চক্ষু চঞ্চল, চাঞ্চল্যের বশীভূত হইও না, তাহাতে আস্থা স্থাপন করিও না। অনাস্থাই সুখের কারণ।"

* * *

বসন্ত আসিয়াছে;—মলয়ানিল গৃহে গৃহে আগমনী গাহিয়া বেড়াইতেছে। দিকে দিকে উৎসবের সাড়া পড়িয়া গেল। তরু মঞ্জুরিয়া উঠিল, কুসুম বিকশিত হইল, পিক পঞ্চমে গাহিল।

বসন্তোৎসব। সমস্ত পুরী সে উৎসবে মাতোয়ারা। উৎসবকুঞ্জে বসন্তোৎসব অভিনয়। নায়কের ভূমিকায় কুণাল।

উৎসবান্তে মুগ্ধ নরনারী গৃহে ফিরিল। রঙ্গালয়ে যবনিকা পড়িল। কুঞ্জের দীপ নিভ নিভ হইল।

রাজার অন্তঃপুরচারিণী, যে যত সবাই মুগ্ধ।—কেহ মুগ্ধ উৎসব মধুরিমায়, কেহ মুগ্ধ অভিনয় মরিদায়। কিন্তু একজন আরো কিছুতে মুগ্ধ—কুণালের সুন্দর মুখে। সে তিষ্যরক্ষা—রাজমহিষী—যৌবনময়ী। *

সকলেই ঘরে ফিরিয়াছে। কিন্তু মুগ্ধা ফিরিল না। সে বসন্তের হিল্লোলে গা ভাসাইয়া দিয়া—পুষ্প সৌরভে, চন্দ্র জ্যোৎস্নায় পাগল হইয়া প্রাসাদের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল।

কুণাল ঘরে ফিরিতেছিলেন, রাণী পথ আগুলিয়া দাঁড়াইল। কুণাল রাণীর সেই আবেশ মাখা চোখের পানে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।

তিনি নয়ন নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। মুখ আর তুলিলেন না।

তিষ্যরক্ষা ক্ষুণ্নমনে কক্ষে ফিরিল।

(২)

তক্ষশীলার রাজা কুঞ্জর কর্ণ। তিনি অশোককে সংগ্রামে আহ্বান করিলেন।

কুণাল সেনাপতি বরিত হইল।

সেনাপতি কুণাল, রাজা কুঞ্জর সকাশে উপস্থিত হইলেন। কুঞ্জর আপন প্রাসাদে অতিথিকে অভ্যর্থনা করিলেন। কুণাল রাজপ্রাসাদে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

* * *

অশোক রুগ্নশয্যায়। ভীষণ ব্যাধি! ভিষক নিরাশ হইয়াছেন। রাজা মনে করিলেন, কুণালকেই রাজা করিবেন।

কুণাল রাজা হইলে আমার সর্ব্বনাশ হইবে! কুণালকে কিছুতেই রাজা হইতে দিব না। রাণী তিষ্যরক্ষা রাজাকে কহিলেন—

"না কুমারের আসিয়া কাজ নাই। শীঘ্রই রোগের উপশম হইবে। আমিই উপশম করিব।"

রাজা মহিষীর বাক্যে প্রফুল্ল হইলেন।

রাণী স্বহস্তে ঔষধ প্রস্তুত করিলেন; সেই

* তিষ্যরক্ষা নৃপতি অশোকের দ্বিতীয়া মহিষী, কুণালের বিমাতা, কুণালের সমবয়সী।

ঔষধে রাজা বাঁচিলেন। রাজা কৃতজ্ঞনেত্রে মহিষীর মুখের পানে চাহিলেন।

নারীর কুটিল নয়নে কুটিল হাসি ফুটিয়া উঠিল।

"মহারাজ, আমি আপনার রোগ সারিয়া দিয়াছি, এখন আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন।"

"পূর্ণ করিব। তোমার প্রার্থনা বল।"

"আমি সাত দিন রাজত্ব করিতে চাই।"

"বেশ!"

রাজসিংহাসনে বসিয়া নারী আদেশ করিলেন,—

"তক্ষশীলায় এখনি দূত প্রেরিত হউক। কুণাল মহাদোষে দোষী। নৃপতি কুঞ্জর সমীপে পত্র প্রেরিত হউক। অনুরোধ—মহাদোষে দোষী কুণালের চক্ষু উৎপাটন ও অন্ধ কুণালের নির্ব্বাসন!

পত্রে রাজার নাম—রাজার শাসনাঙ্ক মুদ্রিত হইল।

(৩)

কুঞ্জর, লিপি পাঠ করিলেন। কুণালও লিপির মর্ম্ম অবগত হইলেন। পিতার আদেশ—রাজার আদেশ! কুণাল কহিলেন—"আমি রাজার আদেশ পালন করিব। কিন্তু পালনের পূর্ব্বে দেবী যেন না জানেন।"

দেবীর অগোচরে অশ্রুভরা দুইটি চোখ মণিহারা হইল।

কি যেন বলিতে দেবী কক্ষে ছুটিয়া আসিতেছিলেন। সোনার নূপুর সোপান গায় খসিয়া পড়িল। চঞ্চল বাতাসে গোলাপী অঞ্চলখানি উড়িয়া গেল! শিথিল কবরী হইতে ফুলের মালা ঝরিয়া পড়িল।

"স্বামিন্ স্বামিন্, দেখ দেখ—"

"দেবী!"

দেবী তখন মূর্চ্ছিতা।

"দেবীর মূর্চ্ছা ভঙ্গ হউক, তারপর রাজার শেষ আজ্ঞা প্রতিপালন করিব"—কুণাল কুঞ্জর সমীপে এই আবেদন প্রেরণ করিলেন।

কুঞ্জর কুণালকে দেখিতে আসিয়া ছিলেন, তিনি সজলনয়নে কক্ষত্যাগ করিলেন। সারা দিনমান, সারা রজনী অমনিই কাটিল।

প্রভাতে দেবী জাগিলেন।

"স্বামিন্, চল আমরা এখনই চলিয়া যাই, মহারাজের শেষ আজ্ঞা প্রতিপালিত হউক।"

"দেবী, আমার পিতৃভবনে ফিরিয়া যাও।"

"স্বামী, এই আমি তোমার হাত ধরিলাম, পার যদি ঠেলিয়া চলিয়া যাও, আমি বারণ করিব না।"

দম্পতীযুগল নির্ব্বাসিত হইলেন। বীণা বাজাইয়া, আনন্দের—অমৃতের করুণগাথা গাহিয়া দুইজন পথে পথে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

এইরূপে বহু বৎসর গত হইল।

* * *

বীণা বাজাইতে বাজাইতে একদিন এক ভিখারী ও ভিখারিণী পাটলীপুত্রে আসিয়া উপনীত হইল।

কুঞ্জতোরণে দাঁড়াইয়া রক্ষী ধমক দিল,—"ভিখারী তোরা! তোরণ পার হইতে চাস্! দূর হ।"

বিতাড়িত ভিখারীদ্বয় হস্তীশালায় আশ্রয় লইল। রাত্রি আসিয়াছে। অন্য আশ্রয় খুঁজিবার সময় নাই।

নগরী দীপমালায় সজ্জিত। গৃহে গৃহে

আনন্দস্রোত বহিতেছে। কুঞ্জে কুঞ্জে নিশার ফুল ফুটিয়া উঠিতেছে।

দেখিতে দেখিতে নগরীর দীপ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। নগরী স্তব্ধ।

নিস্তব্ধ নগরীর বিরাট শিয়রে শুভ্র চন্দ্র উদিত হইয়াছে। নিবিড় শ্যামল কুঞ্জের মাঝে মাঝে কৌমুদীস্নাত ধবল সৌধ-দলী নীরব—নিস্তব্ধ। আলোছায়ার সুষুপ্তি।

প্রহরীর নয়ন ঢুলিয়া আসিল। কিন্তু তবু তাহাকে জাগিতে হইবে।

নিদ্রাতুর প্রহরী ভিখারীকে অনুবোধ করিল—"ভাই! তোর বীণাটা এইবার বাজা।"

ভিখারীর বীণার সুর রাত্রের নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া উঠিতে লাগিল- অন্ধকারের মধ্যে করূণ বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিতে লাগিল।

সুপ্ত নরপতি সুখশয্যায়। বীণার সেই করুণসুরে তিনি জাগিয়া উঠিলেন। এ কার বীণার স্বর! এ যে চিরপরিচিত।

তিনি পাগলের মতো ছুটিয়া বাহির হইলেন।

* * *

পুত্র পিতার বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন;—পিতা পুত্রকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন।

"এমন সুন্দর চক্ষু যে নষ্ট করিয়াছে, সে অক্ষত চক্ষু লইয়া থাকিবে!" নৃপতির কণ্ঠ ক্রোধে কম্পিত হইল।

কুণাল মৃদু হাসিয়া বলিলেন—

"আমার চক্ষু লইয়া যদি মাতার মন প্রসন্ন হইয়া থাকে, তবে তাঁহার সেই প্রসন্নতার বলেই আমি আবার নেত্র লাভ করিব।"

তৎক্ষণাৎ কুণালের চোখ ফুটিয়া উঠিল।

তারপর যুবরাজ কুণালের রাজ্যাভিষেক মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইল।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত।

সমালোচনা

মিডিয়া। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, এম, এ প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। মেটকাফ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এখানি নাটক। গ্রীক রাজকন্যা মিডিয়ার জীবন কাহিনী অবলম্বনে রচিত।

খাঁজাহান। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ প্রণীত। মূল্য এক টাকা। এখানিও নাটক। ঐতিহাসিক। মহাবৎ খাঁর কন্যা সোফিয়া ও হিন্দু সেনাপতি নারায়ণ রাওয়ের প্রেমের ছায়াপাতে রোমান্সটুকু বেশ ফুটিয়াছে।

পদার্থ-পরিচয়। শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ অধিকারী প্রণীত। কলিকাতা ভারত-মিহির যন্ত্রে মুদ্রিত ও সান্যাল কোম্পানি কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা। বস্তু সাহায্যে শিক্ষাদানকল্পে এই গ্রন্থখানি রচিত। পাশ্চাত্য দেশে পণ্ডিতসমাজ একদিন ক্ষুব্ধ চিত্তে দেখিলেন, যে, প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী দ্বারা ছেলেদিগকে মুখস্থ বিদ্যাই শুধু শিখানো হয়—তাহারা কেবল শব্দই শিখে, বিষয় শিখে না। তাহাতে শিক্ষাও অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। ধানের কথা কেতাবে পড়িয়া ধানগাছ সম্বন্ধে সহুরে বাঙ্গালীর হাস্যকর প্রস্তাবাদির কথা এ দেশে প্রবাদের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। বাস্তবিক, বস্তু বা পদার্থের সাহায্যে শিক্ষা না পাইলে আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইতেই পারে না। কাব্যে "সপ্তপর্ণী" বৃক্ষের কথা পড়িয়া ভাবিলাম, না জানি, সে কেমন গাছ! কিন্তু সেই

সপ্তপর্ণীই যে আমাদের চিরপরিচিত ছাতিম' গাছ, ইহা জানিলাম না। ইহার ফল এই হয় যে, পুঁথিগত বিদ্যা মগজের মধ্যেই জমা থাকিয়া যায়, জীবনে সে বিদ্যা খাটাইতে পারি না। এইরূপ অসুবিধা দূরীকরণার্থই কিণ্ডেরগার্টেন শিক্ষাপ্রণালীর ব্যবস্থা হইয়াছে। এ প্রণালী যে উৎকৃষ্টতর, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার সেই কিণ্ডেরগাটেন প্রণালীর উপযোগী করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ তৃপ্তি পাইয়াছি। গ্রন্থের উদ্দেশ্য সাধু এবং তাহা সিদ্ধ হইবে, এ কথা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি। গ্রন্থে ছয়টি প্রকরণ ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ৪।৫ বৎসরের শিশু হইতে আরম্ভ করিয়া ১২।১১ বৎসরের বালকগণের অবধি উপযোগী বিবিধ বিষয়ের পাঠ ইহাতে সঙ্কলিত হইয়াছে। পাঠগুলি বিশদ ও তথ্যপরিপূর্ণ—কোথাও ফাঁকি বা গোঁজামিল নাই। গ্রন্থকার নিজে শিক্ষাবিভাগের একজন প্রবীণ অধ্যক্ষ। বিষয়গুলির সুসন্নিবেশেও তাঁহার অভিজ্ঞতা ও চিন্তাশীলতার পরিচয় পাইলাম। এ গ্রন্থপাঠে উদ্ভিদ্ ও প্রাণিবিভাগ এবং দেহতত্ত্ব বিজ্ঞানের প্রাথমিক তথ্যগুলির সহিত ছাত্রগণের যে সহজ পরিচয় হইবে, তাহা তাহাদিগের ভবিষ্যৎ জীবনের বহু আয়াসশ্রম লঘু করিয়া তুলিবে। গ্রন্থখানি সর্ব্বতোভাবে বিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যশ্রেণীভুক্ত হইবার যোগ্য। বহিখানির ছাপা বাঁধাই কাগজও পরিপাটি হইয়াছে।

পুষ্পরেণু। শ্রীযুক্ত হরনারায়ণ সেন প্রণীত। হবিগঞ্জ হইতে শ্রীরামকমল দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দুই আনা। এখানি কবিতাপুস্তক। ভূমিকাপাঠে জানিলাম, রচয়িতা বালক, দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র। অথচ অতিথির উদ্দেশ্যে কবিতা লিখিতেছেন, 'গালিচা পেতে রেখেছি ঘরে, বস গো এসে। হৃদয়-রাজ্যে করিব রাণী এস গো হেসে।" ছোট ছেলের মুখে এরূপ 'ইঁচড়ে-পাকামি' এ দেশেই সম্ভব, আর এই ভাবকে প্রশ্রয় দিবার জন্য স্কুলসমূহের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মহাশয়ও ভূমিকা লিখিয়া দেন, ইহার চেয়ে লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় আর কি আছে। দেশের শ্রেষ্ঠ কবিগণের lyricএর অংশ চুরি করিয়া বহি ছাপাইয়া কি লাভ হয়, তাহাও আমরা বুঝিতে পারি না। হরনারায়ণ কবিতার চর্চ্চা ছাড়িয়া স্কুলের পড়ায় মন দিন। "কালে হেম-নবীনে পরিণত হইবার" পক্ষে তাঁহার কোনই আশা নাই।

বাঙ্গলার বেগম। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, বাণী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। বহু প্রাচীন ইতিহাস ও চিঠিপত্রের ধূলিজঞ্জাল হইতে লেখক 'লুৎফুন্নিসা,' 'আমিনা' 'মণি বেগম' প্রভৃতি বাঙ্গালার ছয়জন বেগমের জীবন-ইতিহাস সঙ্কলন করিয়াছেন। লেখকের ভাষা বেশ সহজ ও প্রাঞ্জল। বর্ণনার গুণে কাহিনীগুলিও বেশ ফুটিয়াছে। রচনাটি আগাগোড়া সরস ও সুপাঠ্য হইয়াছে। গ্রন্থে কয়েকটি বেগমের চিত্রও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে ঘসিটির চিত্রখানি ত্রিবর্ণে রঞ্জিত। গ্রন্থের ছাপা কাগজও সুন্দর।

পারিজাত। সেখ হবিবর রহমান প্রণীত। যশোহর খুলনা, সিদ্দিকিয়া হইতে মৌলবী আলতাফ হোসেন সাহেব কর্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, লীলা প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য দশ আনা। কোন মুসলমানকে বাঙ্গলা ভাষায় পুস্তক লিখিতে দেখিলে আমাদের বড় আনন্দ হয়। এখানি কবিতা-পুস্তক। ছন্দে লেখকের বেশ একটু অধিকার আছে, নূতন ভাব না থাকিলেও কবিতাগুলি পড়িতে ভাল লাগে।

থেরীগাথা। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত, উয়ারী, ঢাকা। ভারত মহিলা প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। গ্রন্থকারের 'অনুক্রমণিকা'টি মূল্যবান,—প্রাচীন ভারতের নারী-মহিমার সংক্ষিপ্ত সরল বর্ণনায় দীপ্ত সমুজ্জ্বল। গ্রন্থকার বলিয়াছেন, "থেরীগাথা গ্রন্থে ৭৩ জন পূতশীলা নারীর পদ্যরচনা সুরক্ষিত হইয়াছে। প্রায় সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারত রমণীগণ কর্তৃক যে সাহিত্য রচিত হইয়াছিল, তাহার সাহিত্যিক এবং ঐতিহাসিক মূল্য কত, সে কথা সুধী পাঠকদিগকে বুঝাইতে হইবে না। ভগবান বুদ্ধদেব যখন মুক্তির নব সংবাদ প্রচার করিলেন, তখন সহস্র সহস্র

নরনারী মুক্তি-কামনায় তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে রমণীগণ সাক্ষাৎভাবে ভগবানের উপদেশ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ৭৩ জন রমণীর রচনা এই থেরীগাথায় পাওয়া যায়। থেরী শব্দের অর্থ স্থবিরা বা জ্ঞানবৃদ্ধা। * * থেরীগাথা রোমান অক্ষরে যাহা মুদ্রিত আছে, সেই মূল টীকা ও কাব্যানুবাদসহ এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে। সুতরাং নানা দিক দিয়া এই গ্রন্থের বিশেষত্ব উপভোগ্য হইয়াছে।" বিজয়বাবুর অনুবাদগুলি যেমন মিষ্ট, তেমনই মূলের অনুসারী। মূলের কোথাও এতটুকু ব্যভিচার হয় নাই। পাঠ করিয়া আমরা সবিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। প্রতি থেরীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও বিজয়বাবু সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। অনুবাদ শ্লোকগুলিতে মূলের রস পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান আছে। কোথাও সৌন্দর্য্যের হানি হয় নাই। গ্রন্থখানি বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে; গ্রন্থকারের কথার প্রতিধ্বনি তুলিয়া আমরাও বলি, "প্রায় সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পরে আবার এই ভারত-গৌরব রমণী-গণের জীবনী এবং গাথা গৃহে গৃহে পঠিত এবং আলোচিত হউক।"

প্রাচীন ইতিহাসের গল্প। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত, উয়ারী, ঢাকা। ভারতমহিলা প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা চারি আনা। এই গ্রন্থে মিশর, বাবিলন, আসিরিয়া, প্রভৃতি এবং ইহুদী, পারসীক ও ফিনিকজাতি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য সঙ্কলিত হইয়াছে। লেখক বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ছাত্র। তাঁহার এ সাধু উদ্যম প্রশংসার্হ। গ্রন্থের ভাষা সহজ, বর্ণনার ভঙ্গীটিও সরল, অনাড়ম্বর। কাজেই বর্ণনীয় বিষয়টুকুও প্রাণে আসিয়া আঘাত করে।

আদ্যার গম্ভীরা। শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত প্রণীত। মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতি হইতে প্রকাশিত। এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দুই টাকা। "রাঢ়াদি দেশের শিবের গাজনোৎসব মালদহে 'আদ্যের গম্ভীরা' নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। 'গম্ভীরা' শব্দের অর্থ দেবগৃহ। পূর্ব্বকালে চণ্ডীমণ্ডপের ন্যায় গৃহবিশেষকে "মালদহ অঞ্চলে" গম্ভীরি বা গম্ভীরা বলিত। * * গম্ভীরা বলিলে আরাধনা বা ধর্ম্মসংক্রান্ত কোন গৃহকেই বুঝায়। গৃহীলোক আপন বাসভবনস্থ গম্ভীরাগৃহে বুদ্ধপদ বা ধর্ম্মপাদুকা রক্ষা করিত। ক্রমে আদ্যাদেবী (চণ্ডিকাদেবী) তথায় পূজা পাইলেন। চণ্ডিকারূপে পূজা পাইবার সময় আদ্যাদেবীর ঘট গম্ভীরায় থাকিত। ক্রমে চণ্ডিকা শিবপত্নী হইলে 'হরগৌরীরূপে' গম্ভীরা-মণ্ডপে স্থান পাইলেন। এই গম্ভীরাতেই ধর্ম্মোৎসব হইত। সেই গম্ভীরাতেই শৈব প্রভাবকালে হরগৌরীর পূজা ও উৎসব হইতে আরম্ভ হয়।" গম্ভীরা-উৎসবের অপূর্ব্ব ভাবে মুগ্ধ হইয়া গ্রন্থকার প্রায় বিশ বৎসর ধরিয়া মালদহের নদী জঙ্গল, দীঘিদুর্গে পরিভ্রমণ করিয়া নিরক্ষর পল্লীসমাজের কাহিনী শুনিয়া গম্ভীরার ইতিহাস ও বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা তাঁহার অনুসন্ধিৎসা, অধ্যবসায় ও শ্রমশীলতার যে পরিচয় পাইয়াছি, তাহা অনন্যসাধারণ। বাঙ্গালা সাহিত্য তাঁহার নিকট চিরঋণী থাকিবে। বিষয়গুলির সন্নিবেশও সুশৃঙ্খল। ইতিহাসের জীর্ণ ধূলিকে লেখক এমন উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন যে নাটক-নভেলও এতটা চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে না। গ্রন্থের ছাপা কাগজ বাঁধাই সকলই চমৎকার হইয়াছে।

মানস প্রসূন বা মায়াবতী। 'সাধনা'-রচয়িত্রী প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীঅতুলকৃষ্ণ রায়, কালী-ঘাট, ওলিম্পিওন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা মাত্র। এই কাব্যখানি পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্তি লাভ করিয়াছি; মধ্যে মধ্যে ভাব বেশ উচ্চ এবং কবিত্বও মন্দ ফুটে নাই। লেখিকার ভাষা সরল ও শুদ্ধ, ছন্দের সুরটিও মধুর, শান্ত। তবে একঘেয়ে প্রকৃতি-বর্ণনার আতিশয্যে বহু স্থলে রসভঙ্গ হইয়াছে।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ১, সানি পার্ক বালিগঞ্জ হইতে, শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

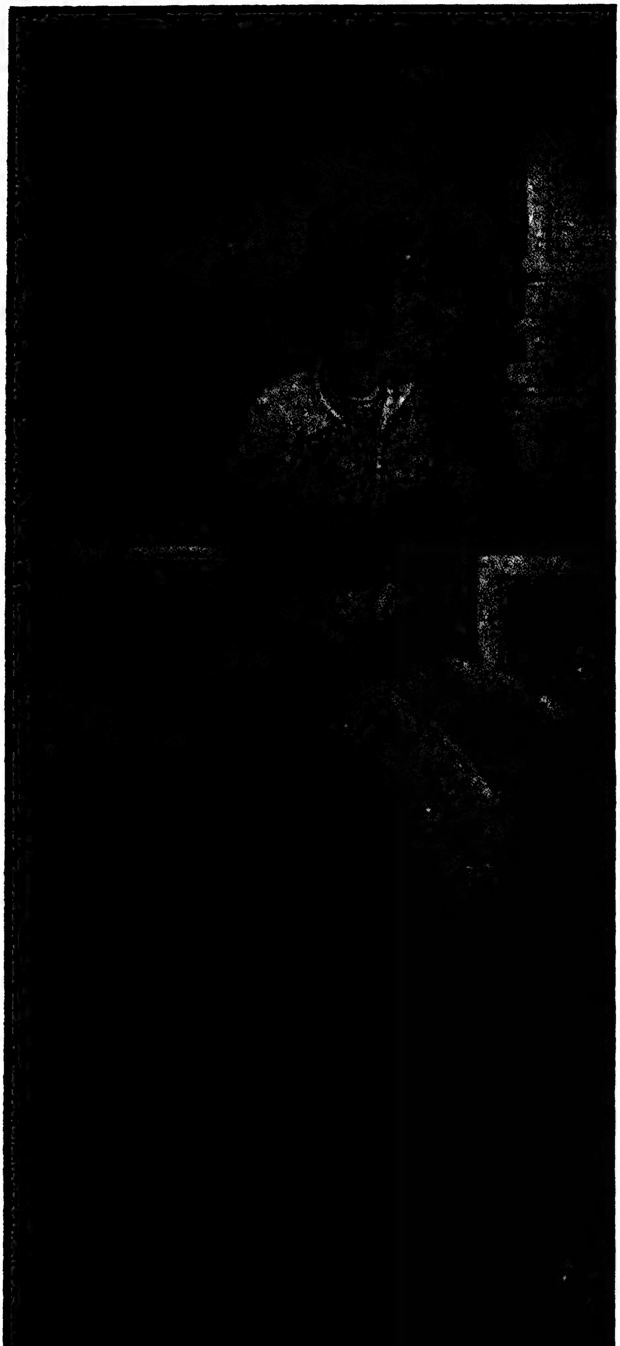

"করুণাময়ী"

(শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত "রাজকন্যা" নাটিকার চিত্র)

ভারতী

৩৭শ বর্ষ] আষাঢ়, ১৩২০ [৩য় সংখ্যা

আসন্ন বর্ষা

কৃশকায়া, যেন ছায়া ভূতলে শয়ান।
রুক্ষ কেশ, শুষ্ক বেশ তৃষিত নয়ান ॥
অঙ্গরাগ অনুরাগ, চিতে নাহি আব।
সঙ্গোপনে তপ্তবনে ঝরে পুষ্প ভার ॥
সুপ্তি হীন নেত্রে দীন নাহিক কজ্জল।
অগ্নি ঢালা দীপ্তি জ্বালা আকাশ পিঙ্গল ॥
কেশ-ভার বদ্ধ তার এক বেণী ধরা।
লুপ্ত ছায়' মেঘ মায়া উচ্চ বসুন্ধরা ॥
ঊর্দ্ধ নেত্র, অহোরাত্র ব্যগ্র দরশন।
চাতকের, পথিকের, ভিক্ষা বরিষণ ॥
শূন্যে হায় অসহায়, মনোরথ চলে'।
কোথা তারা পথহারা বায়ুবেগ বলে ॥.
প্রিয় আশে, স্বীয় পাশে নাহি রহে মন।
ধরণীর সিন্ধুনীর পরশে গগন ॥

বাতায়ন ছাড়ি মন, সিংহদ্বারে ধায়।
অনিবার দূত কার আসে পূর্ব্ব বায় ॥
ধূসরিত বিলম্বিত উত্তরীয় তার।
ছায়া দান করি মান রাখে বসুধার ॥
দিগন্তে অনন্তে বাজে সুদূর দুন্দুভি।
আকস্মিক মাঙ্গলিক উষীর সুরভি ॥
প্রতীক্ষায় তিতিক্ষায় কাটিল বিরহ।
জীবনের মিলনের এল সমারোহ ॥
ঝর ঝর মর মর কল কল তান।
উল্লসিত উচ্ছ্বসিত জলধি বিমান ॥
পুলকিত চমকিত প্রফুল্ল বল্লরী।
তৃণ শ্যাম অবিরাম চুম্বনে শিহরি ॥
গিরিমূলে, নদীকূলে প্রান্তরে কান্তারে।
প্রিয়জন-সম্মিলন বারতা বিস্তারে ॥

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

জলছবি *

ভিখারিণীর দান

আমি পথ চলিতেছিলাম···এক জরাজীর্ণ ভিখারিণী আমায় দাঁড় করাইল।

কঙ্কালসার দেহ—বার্দ্ধক্যে নুইয়া পড়িয়াছে, ক্ষুধায় কাঁপিতেছে; কোটরগত চক্ষু—মৃত, নিষ্প্রভ—তারা দুটির উপরে কে যেন মাটির প্রলেপ টানিয়া দিয়াছে; শত-ছিদ্র বসন ধূলায় কাদায় ভরা—লজ্জা তাহাতে সম্পূর্ণ রক্ষা হইতেছেনা...লাঠিতে ভর দিয়া সে আমার কাছে ধুঁকিতে ধুঁকিতে আসিয়া দাঁড়াইল... চোখের সম্মুখে জীবন্ত দারিদ্র্য!

অনেক কষ্টে ঘাড়টি কাঁপাইতে কাঁপাইতে তুলিয়া সে তাহার সেই আড়ষ্ট চোখে আমার দিকে তাকাইল...শীর্ণ হাতখানি বাড়াইয়া মর্ম্মান্তিক কাতর কণ্ঠে বলিল—"কিছু ভিক্ষে দাও বাবা!"

তাহার সেই কণ্ঠস্বর যেন আমার বুকের পাঁজরে গিয়া বিঁধিতে লাগিল।

আমি ব্যস্ত হইয়া পকেট হাতড়াইলাম ...একটি কাণা কড়িও নাই। গায়ের চাদর খানা পর্য্যন্ত সে দিন লওয়া হয় নাই। কি করি?

আমি আর-কিছু করিতে না পারিয়া তাড়াতাড়ি তাহার সেই হাতখানা মুঠার মধ্যে চাপিয়া ধরিলাম .. ব্যাকুলভাবে বলিলাম —"আজ আমার কিছু নেই যে মা!"

—"ভগবান তোমার মঙ্গল করুন!"...

বৃদ্ধার স্বর বদ্ধ হইয়া আসিবার উপক্রম করিল; সেই নিষ্প্রভ চোখে একটু জীবনের আলো ক্ষণেকের জন্য যেন হাসিয়া উঠিল...সে তাহার হাতখানা আমার কপালে ঠেকাইয়া বলিল—"ভগবান তোমার মঙ্গল করুন বাছা! ঐ মা ডাকেই আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হয়েছে; আর কিছু চাইনে বাবা!" ......

আমি বাড়ি বসিয়া বৃদ্ধার কথা ভাবিতেছি; —তাহাকে আমি কিছুই দিতে পারিলাম না, কিন্তু সে আমায় যথেষ্ট দিয়া গেল।

স্নেহের জয়

শীকারের পর বনের মধ্য দিয়া বাড়ি ফিরিতেছিলাম। সঙ্গে কুকুরটা ছিল।

হঠাৎ দেখি সে গতি মন্থর করিয়াছে, গুঁড়ি মারিয়া চলিতেছে, চক্ষু দুইটা বাহির করিয়া লোলুপ দৃষ্টিতে একটা ঝোপের দিকে চাহিতেছে।

আমি সেই দিকে দৃষ্টি ফিরাইলাম।

একটি চড়ুই পাখীর ছানা বাসা হইতে

* টুর্গেনিভের ইংরাজি হইতে।

ঝড়ে পড়িয়া গিয়াছে......তখনও সে উড়িতে শিখে নাই···মাটিতে উল্টাইয়া পড়িয়া হলুদবর্ণ কচি ডানা দুটি কেবল নাড়িতেছে।

কুকুরটা বকের মতো পা ফেলিয়া ফেলিয়া চলিতেছিল। হঠাৎ ঝটপট্ ঝটপট্ শব্দ করিয়া একটা ধাড়ি চড়ুই গাছের উপর হইতে ঝপ করিয়া মাটিতে পড়িল—একেবারে কুকুরটার সামনে! কী তার আর্ত্তনাদ! অতটুকু কণ্ঠ কিন্তু তাহাতেই মনে হইতেছিল যেন সমস্ত বনটা কাঁপিয়া উঠিতেছে।

"রক্ষা কর! রক্ষা কর!"—আমি ঠিক শুনিলাম পাখীটার আর্ত্তনাদ হইতে যেন একটা কাতর প্রার্থনা বাহির হইতেছে—"রক্ষা কর! রক্ষা কর।"......কিন্তু কে রক্ষা করে?

কুকুরটা তখন ছানাটার প্রায় সামনে গিয়া পড়িয়াছে;—যেন যমদূত।

ধাড়ি পাখীটা দুইবার ডানা তুলিয়া কুকুরটার মুখের উপর ঝাঁপাইয়া তাহাকে বাধা দিবার চেষ্টা করিল।... কুকুরটার সাদা সাদা তীক্ষ্ণ দাঁতগুলা তার চোখের সামনে অমনি ঝক ঝক করিয়া উঠিল। সে ভয়ে ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল কিন্তু নিজের প্রাণ-ভয়ে উড়িয়া পালাইল না ...ডানা দুটি মেলিয়া ছানাটিকে বুকের মধ্যে চাপিয়া পড়িয়া রহিল।

এতটুকু চড়ুই পাখীর সামনে কুকুরটাকে মনে হইতেছিল যেন একটা প্রকাণ্ড দানব!

কুকুরটা একবার ফোঁস করিয়া উঠিল। চড়ুই পাখীর সমস্ত দেহটা তাহাতে শিহরিয়া উঠিল বটে কিন্তু তবুও সে ছানাটিকে ছাড়িল না—বুকে করিয়া অটলভাবে বসিয়া রহিল—এতটুকু নড়িলও না। প্রাণের মায়া তাহার আর নাই;...কি একটা শক্তি যেন সে মায়াকে একেবারে উড়াইয়া দিয়াছে!

কুকুরটা একবার আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিল কিন্তু চড়ুইটার অটলতার পানে চাহিয়া পিছু হঠিয়া আসিল...সেই শক্তির নিকট তাহার হিংস্রতা হার মানিয়া গেল।

আমি তখন সেই হতভম্ব কুকুরটার নাম ধরিয়া ডাকিলাম। সে ধীরে ধীরে আমার দিকে চলিয়া আসিল। আমি সসম্ভ্রমে চড়ুইটার পানে একবার চাহিয়া বাড়ি ফিরিলাম।

সম্ভ্রমের কথা শুনিয়া হাসিও না। সত্যই সেই ছোট পাখীটার উপর আমার সম্ভ্রম আসিয়াছিল।

আমি ভাবিতেছি, ভালোবাসা কেমন সহজে মরণ-ভয়কে হেলায় অতিক্রম করে—প্রত্যক্ষ মরণকেও গ্রাহ্য করে না!

এই ভালোবাসার জন্যই তো জীবন জীবন্ত হইয়া আছে!

প্রকৃতির মন্দির

স্বপ্ন দেখিতেছিলাম যেন মাটির ভিতরে অনেক নীচে এক মন্দিরে আমি আসিয়াছি—অন্ধকারের আবছায়া-আলোয় সেখানটি আলোকিত।

মন্দিরের ঠিক মাঝখানটিতে বেদীর উপরে বসিয়া এক রমণী!—তাঁহার দীর্ঘ সবুজ অঞ্চল-খানি লুটাইয়া পড়িয়াছে—হাতের উপর মাথা রাখিয়া ঘোর চিন্তায় তিনি নিমগ্ন।

বুঝিতে আমার এতটুকু বিলম্ব লাগিল না যে ইনিই প্রকৃতিরাণী স্বয়ং! সম্ভ্রম ও আতঙ্কের একটা চঞ্চল প্রবাহ অন্তরের অন্তর দেশ পর্য্যন্ত বহিয়া গেল।

আমি ধীরে ধীরে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলাম। ভক্তির সহিত মাথা নত করিয়া বলিলাম—"জগৎ জননী! আপনার এত ভাবনা কিসের? মানুষের ভবিষ্যৎ? কিসে তারা জগতে চরম উন্নতি· পরম শান্তি লাভ করবে তাই?"

ক্রুদ্ধ কালো আঁখি আমার দিকে ফিরাইয়া গম্ভীরস্বরে তিনি বলিলেন—"না!"

আমি অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম। তিনি বলিতে লাগিলেন—"আমি ভাবছি উনকি পোকার পাগুলো কি করে আরো একটু সবল করতে পারি—যাতে তারা সহজে আত্ম রক্ষা করতে পারে—আক্রমণ ও আত্মরক্ষার মাপকাঠি ভেঙে গেছে—সেইটে ঠিক করে নিতে হবে।"

আশ্চর্য্য হইয়া আমি চলিলাম—"সামান্য উনকি পোকা তার জন্যে এত ব্যাকুল! আমি জানতুম মানুষই আপনার সব চেয়ে প্রিয়—"

—"প্রিয় আমার সবাই!" তিনি স্পষ্টকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন—"সবাই আমার সমান—এই হাতে তাদের পালন করি—আবার এই হাতেই তাদের ধ্বংস করি—মানুষের প্রাণ, ক্ষুদে পোকার প্রাণ—আমার কাছে কোনো তফাৎ নেই!"

—"কিন্তু!" আমি অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলাম—"কিন্তু উচ্চ নীচ...ন্যায় অন্যায়·· বিচার বিবেচনা—"

বজ্রকণ্ঠে উচ্চারিত হইল—"ও সব মানুষের তৈরি কথা! উচ্চ নীচ আবার কি! ন্যায় অন্যায় আমি মানিনে·· বিচার বিবেচনা আমার রাজত্বে নেই·· আমি প্রাণ দিয়েছি সেই প্রাণ নিয়ে আবার যাকে খুসী আমি দেব—তা সে পোকামাকড়ই হোক্, বাঘভালুকই হোক আর মানুষই হোক্! তা আমি গ্রাহ্য করিনে। যাও তুমি নিজের চরকায় তেল দাও গে—আমায় বিরক্ত কোরোনা!"

আমি উত্তর করিতে যাইতেছিলাম, এমন সময় হঠাৎ পৃথিবী এক গভীর আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—সমস্ত মেদিনী প্রলয়ের মতো কম্পান্বিত হইয়া উঠিল—তাহাতেই আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

তিব্বতীয় স্বরলিপি

লামাদিগের পূজা অনুষ্ঠানের সময় গীত বাদ্য হইয়া থাকে। ঢাক ঢোল, তূরী ভেরী, জয়শিঙ্গা, কাংস্য কর্ত্তাল উহাদের প্রধান বাদ্যভাণ্ড। গানের সময় গায়ক দলপতিদিগের

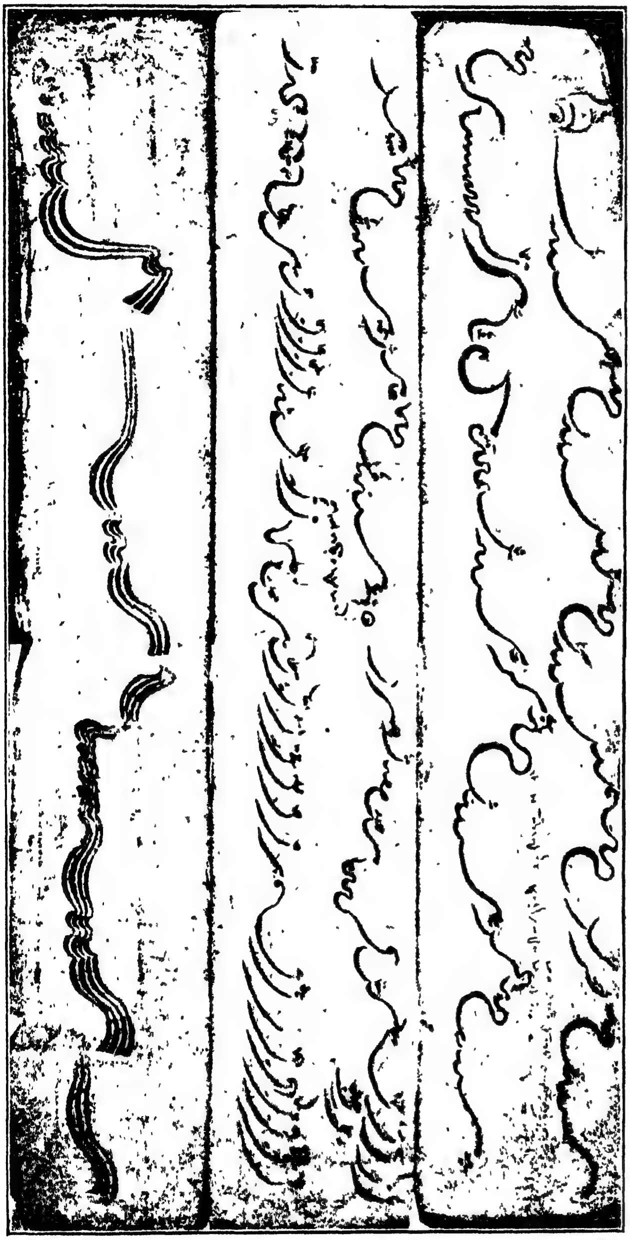

স্বরলিপির ছবি

নিকট এক প্রকার স্বরলিপি থাকে, সেই স্বরলিপিতে, স্বরের পরিস্ফীতি, উত্থান, পতন প্রভৃতি বক্ররেখার দ্বারা প্রদর্শিত হইয়া থাকে এবং গানের যে যে স্থলে একসঙ্গে সমস্ত বাজনা বাজিয়া উঠে, সেই সেই স্থলও পরিচিহ্নিত হয়। বিরাম স্থলগুলি, ঘণ্টা ও কর্ত্তালের দ্বারা সূচিত হইয়া থাকে। এক এক সময়, গগনভেদী বাদ্যের ঘোরতর কোলাহল হঠাৎ থামিয়া যায়, তখন এই নিস্তব্ধতার গাম্ভীর্য্য শ্রোতৃবর্গের চিত্তকে যারপরনাই মুগ্ধ করে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাগ্দত্তা

(৩০)

জীব জগতে মানুষের স্থান সর্ব্ব উর্দ্ধে কেন না তাহারা আহার নিদ্রা প্রভৃতি স্বতঃসিদ্ধ ক্রিয়া ব্যতীত বুদ্ধি পূর্ব্বক কার্য্যাদি সম্পাদনে সক্ষম। কিন্তু এই মানুষের বুদ্ধি যখন কেবল মাত্র নিজের স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্র স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায় তখন মনে হয় সে পশু অপেক্ষাও হিংস্রাধম। করালীচরণ যে দিন প্রথম তাহার স্ত্রীকে গিয়া বলিয়াছিল "কেল্লা ফতে, আর দেখ্‌চিস্ কি বড়লোকের স্ত্রী হলি বলে" তখন রোগ শয্যায় পতিতা দারিদ্র ও অত্যাচার পীড়িতা সত্যকালী তাহার কোটর প্রবিষ্ট চক্ষু স্থির করিয়া ভাবিল "পাগল হলো নাকি!" করালীচরণ সতেজে গৃহ মধ্যে পদচারণা করিতে করিতে অনেকটা আত্মগতই কহিল "কেন আমি এমন সুযোগ ছাড়বো? আমার ভাগ্‌নি, শুন্‌চি আর কেউ ওর নেই, তখন আমিই ওর অভিভাবক, কেন দাঁও মারবোনা? নেই নেই, কেবলই নেই! এখানে কচি খুকি বিছানায় পড়ে হাঁপাচ্চেন, ওষুধ খেলাও, পথ্যি জোগাও কোথা থেকে সব আসে! আমায় কি কেউ ছেড়ে দেয় যে আমিই লোককে ছেড়ে দোব, কখন না, হাজার টাকার কম তো নয়ই।" সত্যকালী মুখ ফিরাইয়া বিকৃত-মুখে কহিল "মদ গিলেচে খুব, এদিকে ঘরে একটু মিছরি নেই যে কাশির সময় মুখে দিই, মরণ হলেই হাড় জুড়োয়।" কথাগুলা করালীর কানে গেল, সে তীক্ষ্ণ স্বরে তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, "মরলেতো আমিও বাঁচতাম, মরিস্ কই?"

শিবনারায়ণ ভক্তিনাথের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহার দ্বারাই করালীচরণকে জানাইলেন "বাগ্‌দত্তা কন্যা লইয়া তিনি কি করিবেন, তাহাপেক্ষা তাঁহারা তাঁহাকে পনের শত টাকা দিচ্ছেন, সব দাওয়া ছাড়িয়া যান।" করালীচরণের চক্ষু ফুটিল। হাজারের স্থলে আপনা হইতে পনের শত হইয়া দাঁড়াইল, জল নাড়া না দিতেই এই, দিলে না জানি আরও কি হয়! সে মাথা চুলকাইয়া কাশিয়া বলিল "তা তা. উনি বড় ভাই এর মত যা আজ্ঞা করবেন, না তো বলতে পারিনে, বড়ই অভাব, যা দিচ্ছেন দয়া করে আর পাঁচটি শো"। শিব নারায়ণ গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন "আর কিছুই নয় যা বলেছি সেই পর্য্যন্ত"। করালীচরণ তাঁহার স্বরের দৃঢ়তায় একটু থতমত খাইয়া গেল, তথাপি একবার শেষ চেষ্টা করিতে ছাড়িল না "নিদান আর একশত"। "শাক মাছের মত ঘরের মেয়েকে দর করিতে লজ্জা হয় না? আর একপয়সাও নয়।"

অধিক নিঙ্‌ড়াইলে লেবুর অম্লরস তিক্ত হইয়া উঠে, করালী চুপ করিয়া গেল। যখন প্রকারান্তরে কথাটা কমলার কর্ণে প্রবেশ করিল ধিক্কারে তাহার সমস্ত হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। ছি ছি, কি ঘৃণ্য জীবন! অর্থ মূল্যে এই দেহখানা বিক্রীত হইবে! ইহাপেক্ষাও কাশীর সেই অসহায় অনাশ্রিত ভয়ানক অবস্থাও যে তাহার ভাল ছিল! সে করুণাময়ীর নিকটে গিয়া দাঁড়াইল, ডাকিল "মা!" "কি মা? "সস্নেহে করুণাময়ী তাহার প্রতি চাহিয়া স্নেহ দৃষ্টিদ্বারা তাহার তাপদাহ প্রশমিত

করিতে চাহিলেন। "মা তোমরা আমায় মামার কাছে টাকা দিয়ে কিন্‌বে! তা হবে না।" স্থির প্রতিজ্ঞার অবিচলিত দৃঢ়তায় তাহার নম্রদৃষ্টি কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। করুণাময়ী চমকিত হইলেন "না না সে কি কথা, কেনা আবার কি? উনি যদি দুটো টাকা নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে যান, বেশতো, তুমি আমাদের থাকবে, আমাদের সেই ঢের।"

একথা সম্পূর্ণ সত্য, তথাপি মন কিছুতে মানিতে চাহে না, দাম দিয়া তাহাকে বিক্রয় করিবে? কমলার নিজের অস্তিত্বটা শুদ্ধ আজ হইতে নিজের বলিতে থাকিবে না? দৃঢ়স্বরে সে কহিল "লোকে কি বল্‌বে? এ হতে পারে না, না মা।" এ লজ্জা করুণাময়ীর মনেও না ছিল এমন নয়, তিনি ইহার যুক্তিও খুঁজিয়া রাখিয়াছিলেন, তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন "কে-জান্‌বে? কেন মা এটাকে বড় করচো? আমাদের ছেড়ে যেতে চাও?" কমলার দৃঢ়তা কোথায় ভাসিয়া গেল সে সলজ্জ অনুতাপে মনে করিল, এ স্নেহের নিকট আত্মবিক্রয় করা এত কি কঠিন? কিন্তু না, সে তো তাঁহাদের নিকট এই স্নেহ মূল্যে নিজের মন প্রাণ সবই দিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু ক্রীতদাসার মত এ দেহ বিক্রয়! তথাপি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায় বুঝিয়া মুখে আর কিছুই বলিল না, মনে মনে বলিল "অসম্ভব।"

করালীচরণ বিদায়কালে একবার ভাগিনেয়ীকে দেখিয়া যাইতে চাহিল। স্বাভাবিক মমতা না থাকিলেও দেড় হাজার টাকায় অকস্মাৎ মমতা জন্মিয়া যায়। শিবনারায়ণের এ দেখা সাক্ষাৎ সেরূপ মনঃপুত ছিল না কিন্তু করুণাময়ীর করুণা এ বাধা মানিতে চাহিল না "আহা হাজার হোক্ তবু মামা একবার দেখবে না।" কমলা নিজেও একটু জিদ করিয়া বলিল "দেখা করায় দোষ কি?" সে মনে মনে স্থির করিয়াছিল হয়ত তাহাকে দেখিলে তাহার মাতুলের মন একটু কোমল হইলেও হইতে পারে, আর তা যদি হয় তাহা হইলে সে একবার তাহার মূল্য সম্বন্ধে তাঁহাকে অনুনয় করিয়া দেখিবে। মানুষের ত প্রাণ, গলিবে না কি? কিন্তু মানুষ জগতে যাহা কিছু ভ্রম করে অন্য লোকের প্রকৃতি বুঝিতে যাওয়া তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ভ্রম। অপাত্রে করুণা এবং অযোগ্য বিশ্বাস স্থাপন দুই-ই ধ্বংসের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। কমলা সন্দেহ মন্থরগতিতে গিয়া মাতুলকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতে তাহার দিকে নেত্রপাত করিয়াই করালীচরণের দুই চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া রহিল, এই কমলা! তাহার ভাগিনেয়ী!

কমলার মুখ ফুটিতে চাহিতেছিল না, তবু সে জোর করিয়া দৃষ্টি উঠাইল, কিন্তু মাতুলের দিকে চাহিয়া সে আর কিছুই বলিবার চেষ্টা করিল না, মূর্ত্তিমান নিরাশাকেই যেন সে সেই কুব্জাকৃতি, রক্তনেত্র, শীর্ণদেহে প্রত্যক্ষ করিল। মাতুল বহুক্ষণ পরে সম্ভাষণ করিলেন "তুমি কমলা! নারাণীর মেয়ে?" তাহার বিস্মিতনেত্র হইতে প্রশংসার রুদ্র ক্ষুধা ঠিকরিয়া পড়িতেছিল, শিকারী শিকারের দিকে চাহিয়া যে দৃষ্টিতে বলে তোমার গায়ে এতখানি রক্ত আছে তা জান্‌তাম না।"

এই দৃষ্টির প্রশংসায় ইহাপেক্ষা কোন

উচ্চভাব বর্ত্তমান নাই। কমলা মৃদুস্বরে উত্তর করিল "হ্যাঁ"।

"তাহলে দুহাজার টাকার এক পয়সা কমেও আমি রাজি হচ্চিনে।"

ঘৃণায় লজ্জায় মরিয়া গিয়া সে দ্রুতপদে পাশের ঘরে চলিয়া গেল। হায়! পৃথিবী যদি তাহাকে গ্রাস করিত!

কিন্তু এই সুস্পষ্ট ঘৃণা ঘৃণার্হের মনকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে পারিল না, বসন্তের নবপুষ্প-সম্পদভূষিত কাননশ্রী উদ্যানপালকের চিত্তে লাভের চিন্তামাত্রই উদ্রেক করে, হস্ত কণ্টকে ক্ষত হইলেও সে ফুটন্ত গোলাপটিকে লাভের খতিয়ানে চয়ন করিতে ছাড়ে না, বাজারের চড়া-দরে সব ক্ষতি পূরিয়া যাইবে এই আশা। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি স্বার্থপর মনুষ্য পশু অপেক্ষাও হিংস্র, পিশাচ হইতেও ভয়ানক! বিশেষতঃ দারিদ্র্যগ্রস্ত চরিত্রহীন লোকের মত 'মরিয়া' সংসারে অল্পই আছে। ইহারা ইহাদের নেশার জন্য এমন পাপ, এমন কোন অপরাধ নাই যাহা সম্পন্ন করিতে দ্বিধাবোধ করে। সাধুচরিত্র নিঃস্বার্থ লোকের সহিত তুলনা করিলে মনে হয় তাহারা ইহাদের সহিত একই সৌরজগতের জীব নয়। করালীচরণ অনায়াসে দন্ত করিয়া শিবনারায়ণকে জানাইল "এমন মেয়ের দর দুই হাজারের কম হইতে পারে না।"

শুনিয়া শিবনারায়ণের চক্ষু আরক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু তখনও তিনি ঈষৎ আত্মসংযমের চেষ্টা করিয়া কহিলেন "ভদ্রলোকের কথা বদল হয় না, যে চুক্তি হইয়া গিয়াছে তাহা বদল হইবে না, টাকা আমি আনাইয়া রাখিয়াছি গণনা করে নিন।" ঘৃণার সহিত নোটে ও টাকায় পূর্ণ থলিটা সম্মুখে টানিয়া আনিলেন।

লোভেই লোভ বাড়ায়, করালীর বুভুক্ষা বৃদ্ধি পাইল, এক কথায় কতটা হইল, নিশ্চয় এ মাছকে খেলাইতে হইবে! মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল "দু হাজার না পেলে আমি আমার ভাগ্নীকে এখনই নিয়ে যাবো।"

"তবে উৎসন্ন যাও, যা খুসী কর আমি আর এক পয়সাও দোবো না, কোথাকার একটা ছোট লোক এসে জুটেচে!"

"দাও আমার ভাগ্নীকে এনে দাও, জোচ্চোর! মেয়ে আটক রাখ্‌বে ভেবেচ? লোক আছ তুমিই আছ আমায় কিসের চোক রাঙ্গাও? আমি তোমায় কেয়াবও করিনে, মিনি পয়সায় বংশজের ঘরের মেয়ে আন্‌বেন, মজা পেয়েছেন!"

সক্রোধে উঠিয়া দাঁড়াইয়া শিবনারায়ণ কহিলেন "আর না ঢের হয়েছে যার ভাগ্যে যা আছে কেউ খণ্ডন করতে পারে না, নিয়ে যাও তোমার ভাগ্নীকে। এক পয়সাও আমি দোব না, পাপের সাহায্য করলেই তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।"

কমলা শুনিল তাহাকে যাইতে হইবে, জন্মের মতই হয়ত এ যাত্রা, ইহাও সে বুঝিল। একবার সে তাহার চারিদিকে হতাশনেত্রে চাহিয়া দেখিল এই ঘর দ্বার সবই যথাযথ বর্ত্তমান থাকিবে শুধু ইহার আশ্রয়তলে আশাপূর্ণ চিত্ত লইয়া এতদিন যে সুদিনের প্রতীক্ষা করিতেছিল সেই দিনই বুঝি আর আসিবে না। এ গৃহের অধিষ্ঠাত্রী আবার ফিরিয়া আসিবেন কিন্তু যে অভাগিনী সূর্য্যমুখী গোপনধ্যানে রজনী যাপন করিতে

চলিল সে আর তাঁহার দেখা পাইবে কি? এই কি তাহার চিরবিদায়?

করুণাময়ী করালীচরণের সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিয়া কহিল "আর পাঁচশত টাকা আমি তোমায় দিব তুমি কমলাকে রেখে যাও, সই থাকলে কি এমন করতে?" উত্তর পাইলেন "টাকা এখনই চাই।" করুণাময়ী এত টাকা এই মুহূর্ত্তে কোথা পাইবেন? সময় দিতে করালীচরণ সম্মত নহে, সে গরজ বুঝিয়াছিল, দর কমাইলে পাছে সব ব্যর্থ হয় তাই এতটুকু ত্যাগস্বীকারে সম্মত নহে। করুণাময়ী আর কি করিবেন, কাজেই অশ্রু পরিত্যাগ করিতে করিতে কমলার চুল বাঁধিয়া কাপড়চোপড় গুছাইয়া দিলেন। কমলা কিন্তু এক ফোঁটাও চোখের জল ফেলিল না, আসন্নবর্ষণোন্মুখ মেঘের মত স্তব্ধ রহিল।

শিবনারায়ণ যখন দেখিলেন সত্যই করালীচরণ কমলাকে লইয়া চলিয়া যায় তখন অগত্যা মান খোয়াইয়া ভক্তিনাথকে দিয়া বলাইলেন "আচ্ছা পাঁচশত টাকা আরও পাইবে, কিন্তু লেখাপড়া করিয়া দিক্ যে আর কিছু দাবী করিবে না।" মাতুল উত্তর করিলেন "দুশো টাকা আরও ফাউ পেলেই লিখে দিই।" কমলা শিবনারায়ণের সজল গম্ভীর মুখের উপরে তাহার স্থিরদৃষ্টি স্থাপন করিয়া জীবনে এই প্রথম দিন কথা কহিল, বলিল "কেন আপনারা আমার জন্য বারে বারে অপমানিত হচ্চেন? টাকা দিয়ে আপনারা আমায় পাবেন না।" নিজের জীবনের প্রতি তাহার অত্যন্ত ঘৃণা হইয়া গিয়াছিল।

(৩১)

শচীকান্ত কল্পনাকুশল কবি না হইলে 'ক্ষণিকের-দেখা' কাব্যে পরিণত হইত না, আর তাহার জীবন-কাব্যেও এ বিষাদের সুর এক ঘেয়ে তানে বাজিত না। কমলাকে কতটুকুই বা সে জানে? দ্বিতীয়বারই বা কত সামান্যক্ষণের জন্যই সে তাহাকে দেখিয়াছে! কিন্তু এ কল্পনা কোনমতেই সে ছাড়িতে পারিল না যে, বাগ্‌দত্তা কমলাকে তাহারই পাওয়া উচিত, এ যুক্তি তাহার মনে যেমনি প্রবল, তাহার প্রতি তাহার আকর্ষণও সেই সঙ্গে যেন তেমনি প্রবলতর হইয়া উঠিতে লাগিল। পিতা যে তাহার প্রতি অবিচার করিয়া মনীশের পক্ষ লইয়াছেন ইহাও সে ভুলিতে পারিল না।

বাসন্তীকে দ্বিতীয়বার প্রত্যাখ্যানের সময় মাসিমার সহিত একটু মনোমালিন্য ঘটিয়া গিয়াছে, কোনরূপ খেয়ালের পশ্চাতে ছোটা গিরিজাসুন্দরীর অসহ্য! বাগ্‌দত্তা মেয়েটি নিরুদ্দিষ্টা এ অবস্থায় তাহার প্রতীক্ষা কেন? কিন্তু খেয়ালী যুবকের খেয়ালের ঝোঁক এইটুকু তিরস্কার লাঞ্ছনা, বা ক্ষতির দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। সে অটল রহিল। মনে মনে বলিল 'তাকে না পাই তার স্মৃতি কেউ কেড়ে নিতে পারবে না তো'। স্বপ্নমুগ্ধ হৃদয় প্রেমপাত্রের উদ্দেশে, ত্যাগের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত নহে। এই সময়ে সহসা একদিন কলিকাতায় পুরাতন বন্ধুমহলে জোর তলব পড়িল, একবার মনে করিল সেখানে মনীশের সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে, সেখানে যাওয়া সঙ্গত নয়। কিন্তু পুনঃ পুনঃ উপরোধ কাটাইতে না পারিয়া বাহির হইয়া

পড়িল। ইতিমধ্যে অগ্রহায়ণ মাস অতীত হইয়া গিয়া প্রথম পৌষে বড়দিনের ছুটি আসিয়া পড়িয়াছে। পথে শিশিরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে নৈহাটি ষ্টেশনে গঙ্গা পার হইয়া ট্রেণ ধরিবে। "ছোটদাবু খুব রোমাণ্টিক রকম বিয়ে করচো নাকি ?

"কে বল্লে তোমায় ?" শচীকান্ত বিস্মিত হইল। "সব খবর পাই। চাদরে যে এসেন্স মেখেছ তাতে কমলা সুলভ হবে।' সে সকৌতুকে হাসিতে লাগিল। শচীকান্ত তাহাকে অঙ্গুলিপীড়িত করিয়া সলজ্জ আস্ফালনে কহিল "জ্বালিও না আর, এসেন্স যদি দুর্ল্লভ বস্তু সুলভ করতে পারত তাহ'লে দেশে বিদেশে ও জিনিষ থাকতে পেত না।"

"ভদ্রা সিঁথায় সিন্দুর আর নয়নে কজ্জল দিয়ে ব্রহ্মচারী অর্জ্জুনের ব্রত ভঙ্গ করেছিলেন। এক্ষেত্রে ভদ্র! তুমি এটুকু পারবে না ?" আবার সে তাড়না ভোগ করিল।

মনীশ কলিকাতায় নাই ; ছুটীতে ভাই ভাই বাড়ী গিয়াছে ; তাহাতে সে যেন বাঁচিল। ফিরিবার সময় আবার যখন নৈহাটী ষ্টেশনে গাড়ি থামিয়াছে সে গাড়ি বদলের জন্য প্লাটফরমে নামিয়া বেঞ্চের উপর গিয়া বসিল। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। পৌষের সন্ধ্যা বেশ একটু ঘোরঘোর হইয়া উঠিয়াছিল, শীতকাতর গাছপালা হিমবায়ুর স্পর্শ হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টায় সরিয়া সরিয়া একপ্রকার মিনতিপূর্ণ মৃদু বিলাপ করিতেছিল। ষ্টেশনের নিকটেই একটা বিস্তৃতশাখ প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছ আকাশের কোল ছাড়িয়া সদ্য সমাগত পক্ষীকলরবে মুখরিত হইয়া রহিয়াছে আর এইখানে এই মানব কুলায়ে বিবিধ পথের যাত্রীগণ নানারূপ শব্দে সান্ধ্যপ্রকৃতির শান্তিনাশ করিতেছিল। সর্ব্বজনীন্ শান্তির শান্ত মুহূর্ত্তেও মানবচিত্তেই বুঝি শুধু শান্তি নাই! শচীকান্ত সহসা একটা কর্কশ কণ্ঠের মন্তব্যে চিন্তাস্রোতের মধ্য হইতে অকস্মাৎ জাগিয়া উঠিল। 'ধেত্তোর, হরিদুর্গা, হরিদুর্গা! হরিদুর্গা কি আছে, তারা কোনকালে অক্কা পেয়েচে।" সে শব্দানুসরণে ফিরিল। প্লাটফরমের একধারে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীস্থানে কতকগুলা পোঁট্‌লাপুটুলীর মধ্যে একটি রুগ্না স্ত্রীলোক হাঁফানির টানের "সহিত হে হরি, হে মা, দুর্গা ভাল করে দাও, নয় নাও মা" ইত্যাদি অর্দ্ধস্ফুট কাতরোক্তি করিতেছে। আর অর্দ্ধবয়স্ক শীর্ণাকৃতি একটি লোক তাহাকে ধমক দিয়া এই কথা বলিতেছিল।

এ দৃশ্য সংসারে বিরল নয়, শচীকান্ত দৃষ্টি ফিরাইতে গেল, কিন্তু নিকটে কতকগুলা পোঁটলাপুঁটুলি ও রুগ্ন শিশুর সঙ্গে পাশাপাশি বসিয়া আর একজন ও কে ? এই হীনাবস্থ হীন চত্ত সহচর বেষ্টিত হইয়া আজ কে তাহাকে আবার দেখা দিল! তাহার বক্ষের উন্মত্ত আলোড়নে যদিও তাহার দৃষ্টি রোধ হইবার উপক্রম করিয়াছিল, বিস্ময়, হর্ষ ভয় যুগপৎ এক সঙ্গে তাহাকে বীতসংজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছিল তথাপি তাহার মুখ চিনিবার পক্ষে বাধিল না,—নিশ্চয়ই এ' সে! কিন্তু কেন সে এখানে ? কেন এই অবস্থায় ? শচীকান্ত নিস্পন্দ লোচনে তাহারই দিকে চাহিয়া রহিল, চন্দ্রের দিকে চাহিয়া সমুদ্র বক্ষের মত তাহারও বুকখানা কখন অনির্ব্বচনীয় আনন্দে স্ফীত হইয়া উঠিতেছিল, কখন আবে-

গের অশ্রু হুহু করিয়া দুই চোখ ছাপাইয়া বাহির হইয়া আসিতেছিল। কিছুই যেন সে জানিতে পারিল না। শুধু এইটুক মাত্র মনে রহিল—ধ্যানের দেবতা প্রত্যক্ষ হইয়াছে, যাহাকে এক দিন বসন্ত প্রভাতে দেখিয়াছিল, শীত সায়াহ্নে সে আজ আবার তাহার সম্মুখীন।

রুগ্না নারী যন্ত্রণাদিগ্ধ কলহের স্বরে কহিয়া উঠিল "আমার ভাগ্যে সবাই মরে, শুধু আমারই অখণ্ড প্রমাই, ঘরে যে হায় হায় করে পড়ে থাকব তাও কপালে নেই, টেনে পথে বার করলে! কোথাও হোঁচুটে পড়ে অপঘাতে মরাই কপালে আছে।" রমণী কাশির ধমকে আড়ষ্ট হইয়া গেল, অভিভাবকটি দন্তে দন্তে চাপিয়া "মরেও না" বলিয়া পুঁটুলির মধ্য হইতে খোলো হুকাটি বাহির করিয়া টিনের কৌটা হইতে তামাক টিকা লইয়া কলিকা সজ্জিত করিতে মন দিল। শচীকান্ত এই সমস্তই দেখিতে শুনিতে ছিল তথাপি সে কিছুই দেখে নাই, কিছুই শুনেও নাই। সে নির্নিমেষে সেই মলিন-বসনা তরুণী মূর্ত্তির পানে চাহিয়াছিল। আকাশ হইতে সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রটা যদি নামিয়া আসিয়া তাহার সম্মুখীন হইত তাহাতেও হয়ত সে এমন বিহ্বল হইত না। তরুণী ভূমে পাখা রাখিয়া রুগ্নার কঙ্কালবৎ শরীরটিকে তাহার চারু বাহুলতার মধ্যে বেষ্টন করিয়া তাহার বক্ষে কোমল হস্ত-মর্ষণে যন্ত্রণা বিদূরিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। মৃদু মৃদু সান্ত্বনার স্নিগ্ধ বাণী তাহার মুখ হইতে দেবাশীর্ব্বাদের মত ক্লিষ্ট হৃদয়ের উদ্দেশ্যে উৎসারিত হইতেছিল, নিরুদ্ধশ্বাস শচীকান্তের কর্ণেও যেন তাহার দু একটা গুঞ্জন প্রবেশ করিয়া তাহার শিরাসমূহে পুলক-তড়িৎ সঞ্চালিত করিয়া দিল। এতক্ষণ ধরিয়া এত কাছে সে তাহাকে আর কখনও পায় নাই।

হুঁকাটি লইয়া ইহাদের সমভিব্যাহারী পুরুষটি তাহারই দিকে অগ্রসর হইতেছিল। তাহার বক্ষের দ্রুত স্পন্দন স্থির হইয়া আসিতে লাগিল। যাহার সহিত সে অপর স্থলে দৃষ্টি বিনিময় করিতেও অপমান বোধ করিত এখন তাহার আগমন দেব-দূতের আগমনের মত মঙ্গল-প্রদ বলিয়া অনুভব করিল। সেই মুহূর্ত্তে একটা রুক্ষ কণ্ঠ তাহাকে সম্বোধন করিয়া ভগ্নকাংস্য পাত্রের মত অকস্মাৎ বাজিয়া উঠিল, "মশায় বলতে পারেন ট্রেনটা কখন আসবে।" কৃতার্থ বোধ করিয়া শচীকান্ত ক্ষীণ লোকে টাইম টেবেল খানা খুলিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল "কোন দিকের গাড়ি?" "মূলোজোড়ের। মশাই কোথায় যাচ্ছেন?"

"রতনপুকুর জেলা যশোহর। বসুন না এইখানে। ট্রেণ আসতে এখনও দেরী আছে। মূলোযোড়ে আপনার বাড়ী?"

"কর্ম্মস্থান। বাড়ী ত্রিবেণী।" তাম্রকূট সেবনকারী মুখ-সঞ্চিত ধূমরাশি বাহিরের দিকে ছাড়িয়া দিতে দিতে শচীকান্তের পার্শ্বে খুব নিকটেই আসন গ্রহণ করিল। একটা উৎকট গন্ধ যুবকের বস্ত্রনিঃসৃত মৃদু সৌরভ চাপা দিয়া আপনার অস্তিত্ব প্রচার করিতেছিল। এক-বারের জন্য সে কুঞ্চিত চাদরের প্রান্তে নাসিকা আবৃত করিতে গিয়াছিল কিন্তু তখনই আপনাকে সামলাইয়া লইল। "উনি আপনার কে?" "আমার মেয়ে"—বলিয়া

আগন্তুক হুঁকাটি তুলিয়া চুম্বনারম্ভ করিল। "মেয়ে! আপনার মেয়ে!" শ্রোতা সচমকে প্রায় লাফাইয়া উঠিল। "হ্যাঁ মশাই।"

হুক্কাধারী গম্ভীর মুখে যথাকার্য্য সম্পন্ন করিয়া যাইতে লাগিল। শচীকান্ত অনেকক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া রহিল, চাহিয়া দেখিল তরুণী রুগ্নার মস্তক অঙ্কে ধারণ করিয়া তাহার মাথায় মৃদু মৃদু বাতাস দিতেছে, মুখ একটুখানি আনত;—করুণাদেবী সশরীরে যেন আর্ত্ত-ত্রাণের উদ্দেশ্যে আবির্ভূত হইয়াছেন। ব্যথিতের জন্য ব্যথাবোধ যে এমন মধুর শচীকান্ত তাহা জীবনে এই প্রথম অনুভব করিল। তাহার মনে হইতে লাগিল সে যদি এই সুস্থ সবল দেহশালী না হইয়া অমনই রোগক্লিষ্ট শরীরে এই খানে মাটিতে পড়িয়া থাকিতে পারিত!

প্লাটফরমের আলোগুলা জ্বলিয়া উঠিয়াছে; ঘণ্টা বাজাইয়া পয়েণ্টস্ ম্যান 'গাড়ি হাঁলি সহর ছোড়া হ্যায়' সংবাদ প্রচার করিয়া গেল। লাইনের আলো অস্পষ্ট দৃশ্যপট উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। অসম্ভব! এ নিশ্চয়ই সে! সে সংশয়াকুল কণ্ঠে প্রবীণ সহযাত্রীকে প্রশ্ন করিল "মেয়েটির নাম কি জান্‌তে পারি?" "স্বচ্ছন্দে! ওর নাম মালতী।" প্রশ্নকারীর মুখে ঘোর নিরাশার ছায়া পতিত হইল। মানুষের সহিত মানুষের মিল থাকে কিন্তু দেবীর সহিত মানবীর এত সাদৃশ্য!

"এটা কি রকম ভদ্রতা মশায়, ভদ্র-লোকের মেয়ের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকা? হলেনই বা আপনি বড়লোক!"

শচী অপ্রতিভ হইল, লজ্জিত মৃদু স্বরে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সে কহিল "মাপ করবেন। আমার মন্দ অভিপ্রায় নয়; এই মেয়েটির সহিত আমার একটি পরিচিতার অভেদমূর্ত্তি, তাই আশ্চর্য্য হইতেছি। মানুষে মানুষে এত মিল সম্ভব! মেয়েটি বিবাহিতা বোধ হয়?" "বিধবা! আপনার সে পরিচিতা আপনার ঘরেই আছেন?"

বিধবা শব্দটা একটা তীক্ষ্ণ তীরের মত শচীকান্তকে বিঁধিল। এই হৃদয়ৈশ্বর্য্য লইয়া সে অভাগিনী বিধবা, আহা! সে কহিল "না তিনি আমার নিকট আত্মীয় নহেন।"

"কোথায় তিনি থাকেন?"

"চাকদায়"।

"বটে, তাঁর নামটি?" শচীকান্ত এই গঞ্জিকাসেবী অপরিচ্ছন্ন সঙ্গীর প্রতি অনেকটা বীতশ্রদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল, তথাপি এ প্রশ্ন প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না। হাজার হোক মালতী তো তাহারই জলন্ত প্রতিবিম্ব! স্নেহস্বরে উচ্চারণ করিল "কমলা।"

অদূরে তরুণী চমকিয়া দুই আনতনেত্র উঠাইয়া তাহার দিকে চাহিল। তাহার গম্ভীর বিষাদপূর্ণ দৃষ্টি, তথাপি তাহাতে সেই বৈদ্যুতিক শক্তিপূর্ণ বিস্ময়ের ছায়া নীরবে যেন কি জিজ্ঞাসা করিতেছিল।

আগন্তুক ঘন ঘন হুঁকায় টান দিতে দিতে পার্শ্বস্থ যুবকের পরিপাটি কেশ-কলাপ হইতে মূল্যবান জুতা জোড়া অবধি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিল, মুখের ভাবে আনন্দ ব্যক্ত হইল। "সে মেয়েটিকে আপনার কি কিছু দরকার আছে? চাকদায় শিবনারায়ণের বাড়ী থাকত, কমলা নামে একটি মেয়েকে আমি জানি।"

"থাকত! নেই নাকি?"

"না মশাই"।

"সত্যি? কেন, কেন! কোথা গেল?" আগন্তুক ধূর্ত্ততার সহিত মিটি মিটি চাহিয়া উত্তর করিল "তার মামা নিয়ে গেছে।" মৃদুস্বরে কহিল "সেখানে বিয়ে হবে না যখন, তখন শুধু শুধু সেখানে রাখবে কেন?"

শচীকান্তের শরীরের রক্তচলাচল বন্ধ হইয়া গিয়া তাহাকে যেন সেখানে জমাইয়া জড়ে পরিণত করিয়া দিল। করালীচরণ অনুমানে ব্যাপারটা যেন বুঝিয়া লইয়াছিল, তাহার অবস্থা লক্ষ্য করিয়া তেমনই মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল। "বংশজের মেয়ে কেন টাকা নেবে না বলুন তো মশাই! তোরা কুলীনরা যদি বেটার বিয়েতে টাকার ছালা ঘরে পুরতে পারিস্ তবে আমরাই বা ছাড়ি কেন? অমন মেয়ের জন্য আড়াই হাজার কিছু বেশী নয়, কিন্তু এমনই কিপ্‌টে কিছুতে দিলে না, উল্টে গাল মন্দ। দেখা যাক্ করালী চক্রবর্ত্তী আড়াই হাজার ঘর আন্‌তে পারে কি না।"

"তাহলে মামার কাছে কমলা আছে? কোথায় করালী চক্রবর্ত্তীর বাড়ী?" শচীকান্ত বাক্‌শক্তি ফিরিয়া পাইয়াছিল কিন্তু জিহ্বার জড়তা কণ্ঠের সঘন কম্পন রোধ করিতে পারে নাই। "মশাই কি এখনও বুঝতে পারচেন না আমিই করালী চক্রবর্ত্তী!"

শচীকান্তর সর্ব্বশরীরে বিপুল বেগে পুলক-তড়িৎ ছুটিয়া গেল, "আর উনিই কমলা!" করালীচরণ নির্লজ্জ ভাবে হাসিয়া হাসিয়া কহিল "ঠিক বলেচেন মালতী নয় কমলা"।

আমার বোম্বাই প্রবাস

(৬)

সিন্ধুদেশ ব্রিটিষ পরিবারের নবোঢ়া বধূ, এদেশ ব্রিটিষ রাজ্যভুক্ত হবার পর এখনো শতাব্দী অতিবাহিত হয়নি। ম্যাপে দেখলে এ প্রদেশ বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত মনে হয় না, মনে হয় যেন পঞ্জাবেরই অঙ্গ। মধ্যে মধ্যে সিন্ধুদেশ পঞ্জাবে যোগ করবারও প্রস্তাব শোনা যায় কিন্তু বোধ করি সিন্ধিদের তা ইচ্ছা নয়—তারা বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের অধীনে সুখে আছে। এদেশের ভাষা সিন্ধি; গুজরাটীর সঙ্গে সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। সংস্কৃতই এ সকল ভাষার আদ্য জননী। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে সিন্ধি লিখনপদ্ধতি উর্দ্দু, সংস্কৃতমূলক নয়। অক্ষর অনায়াসে দেবনাগরী হতে পারত। সিন্ধিভাষায় যতগুলি বর্ণ আছে তা নাগরীতে সহজে লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে। যে দুএকটা বর্ণের একটু আলাদা উচ্চারণ তার মাথায় কোনরূপ রেখা বা বিন্দু দেওয়া; আমরা বাঙ্গলায় যেমন বিন্দু দিয়ে 'ড' ও 'ড়'র প্রভেদ নির্দ্দেশ করি সেইরূপ কোন রকম সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করলেই হয়। এখন জিজ্ঞাস্য এই, তবে কেন নাগরীর বদলে উর্দ্দু বর্ণমালা চলিত হল? তার উত্তর এই—সরকারের হুকুম। যখন ইংরাজেরা সিন্ধুদেশ অধিকার করেন তখন সেখানে লেখাপড়ার চর্চ্চা

ছিল না। বণিকদের হিসাবপত্রে একপ্রকার নাগরীর অপভ্রংশ ব্যবহৃত হত, তাছাড়া বর্ণাক্ষরের প্রচার ছিল না। যখন ব্রিটিষ আদালতসকল স্থাপিত হল তখন কোর্টের একটা ভাষা ঠিক করা আর তার সঙ্গে অক্ষরের সৃষ্টি করা আবশ্যক হয়ে পড়ল। এ সঙ্কটে গবর্ণমেণ্টের কর্তৃপুরুষেরা পারস্য বর্ণমালা গ্রহণ করাই যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করেন। তাঁদের আদেশক্রমে আদালতে উর্দ্দূলিপির ব্যবহার আরম্ভ হয়, ক্রমে তাই আদালত হতে অন্যান্য স্থানে প্রচলিত হল। সিন্ধি গ্রন্থাবলী এক্ষণে উর্দ্দূ অক্ষরেই লিখিত হয়ে থাকে।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে যত দেশ দেখেছি তার মধ্যে সিন্ধুদেশ আমার চক্ষে বিশেষ নূতন ঠেকেছিল। অন্যান্য প্রদেশ হতে

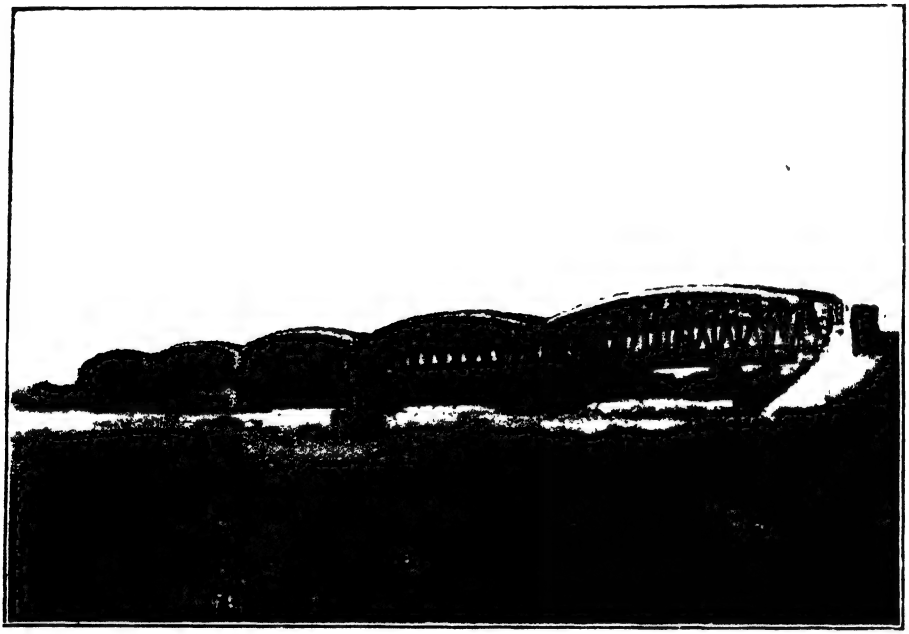

সিন্ধু নদীর উপর কোত্রীর পুল

এখানে প্রকৃতির মুখচ্ছবি, লোকের রীতি চরিত্র অনেক তফাৎ। প্রথমত বর্ষার অভাব। এই খটখটে শুষ্কভাবের দরুণ সিন্ধের বহির্দৃশ্য নূতন প্রকার, ওরূপ সুবিস্তীর্ণ বালুময় মরুপ্রদেশ বোম্বায়ের অন্যত্র দেখা যায় না। নদী নালা খালের জল হতেই সিন্ধের প্রায় সমস্ত কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ হয়। ইন্দ্রদেব বারিবর্ষণ করেন না, পৃথিবীই আপনার স্তন্যনীর দিয়ে জলের অভাব পূরণ করেন।

সিন্ধুদেশের আবহাওয়ায় শীতোষ্ণের আতিশয্য ভোগ করা যায়, বিশেষতঃ উত্তর অঞ্চলে, যেমন ঠাণ্ডা তেমনি গরম। গ্রীষ্মকালে রাত্রে ছাতের উপর কিম্বা বাইরে খোলা জায়গায় শয়ন ভিন্ন গতি নেই। জল ছিটিয়ে

বিছানায় প্রবেশ করতে হয়। শীতকালে তেমনি ঠাণ্ডা—ঘরের ভিতরেও অগ্নিসেবন ভিন্ন চলে না। সিন্ধুদেশে প্রকৃতির শোভা সৌন্দর্য্য বিরল। ভাগ্যি সিন্ধুনদী আছে তাই রক্ষা, নইলে ও দেশ মানুষের বাসযোগ্য হত কিনা সন্দেহ। আমরা যখন হাইদ্রাবাদে ছিলাম তখন সিন্ধুনদীর তীর আমাদের একমাত্র বেড়াবার স্থান ছিল। মরুভূমির মধ্যে যেন সেই একটি আরামের স্থান। সন্ধ্যাবেলা নদীতীরে গিয়া বায়ুসেবন আমাদের নিত্য নিয়মিত কাজের মধ্যে ছিল। নদীতীর পর্য্যন্ত বেশ একটি প্রশস্ত ছায়াপথ—দোধারী বৃক্ষশ্রেণীর মাঝখান দিয়ে গিয়েছে। মধ্যে মধ্যে নদীর উপর নৌকা করে ব্যাড়ান যেত। সিন্ধুনদী অনেকটা গঙ্গার মত প্রশস্ত, দেখলে আমার দেশ মনে পড়ত, মনে হত যেন গঙ্গার বুকের উপরেই ভেসে ব্যাড়াচ্ছি। সিন্ধুনদীতে পাল্লা বলে একরকম মাছ পাওয়া যায়—আমাদের যা ইলিষ। জেলেরা কলসী ভাসিয়ে দিয়ে মজার রকমে এই মাছ ধরে। এ মৎস্য অতীব সুখাদ্য বলে প্রসিদ্ধ। আমাদের এক সিন্ধি চাকর ছিল তার মুখে এক ছড়া শুনতেম মনে আছে—

পল্লা মচ্ছা খানা,
সিন্ধ্ মুলুক ছোড়কে নহী যানা।

নদীর ও খালের উপকূল ভিন্ন অন্যত্রে গাছপালা প্রায় দেখা যায় না। চতুর্দ্দিকে বালুময় ক্ষেত্র ধূ ধূ করছে। এই সকল স্থানে উটের উপর দিয়েই গতিবিধি। এদেশে উট অনেক কাজে লাগে। কলের জল, তেলের ঘানি উট দিয়েই চালিত হয়। উটে গাড়ীটানার কাজও করে—অনের দূর পাল্লা যেতে হলে আমরা কখন কখন আমাদের বয়েল গাড়ীতে উট জুড়ে দিতাম। উটই মরুসাগরের জাহাজ। সমুদ্রপথে যেমন Sea-sickness, যার অনভ্যাস উষ্ট্রবাহনের ঝাঁকানিতেও তার তেমনি দুর্দ্দশা—দুধের রক্ত দধিতে পরিণত হয়। শিক্ষিত উট, ভাল মাহুৎ, অভ্যস্ত সোওয়ার, এই তিন একত্র হলে উটে চড়বার আরাম আছে, নইলে নয়। এক বিষয়ে মরুভূমির উপযোগিতা সহজে মনে হয় না। তা এই যে বালির উপর যেমন সহজে পায়ের দাগ বসে তেমনি চোর ধরবার এ এক সহজ উপায়। আমি যখন শিকারপুরে কাজ করতাম তখন গরুচুরি মকর্দ্দমা রাশি রাশি আমার কাছে আসত। পশুহরণ সিন্ধিদের এক রোগ। এমন দিন যেত না যে ঘোড়া গরু উঠ মেষ মহিষ প্রভৃতি লুটের মকদ্দমা উপস্থিত না হত। কিন্তু তাও বলি ‘যেমন কুকুর তেমনি মুগুর’। গ্রামে গ্রামে যে সকল চৌকিদার আছে তাদের নাম ‘পগী’, নাম থেকেই তাদের পরিচয়, পদচিহ্ন ধরে চোরামাল বার করা তাদের কাজ। মনে কর কোন এক গ্রামে একটা উট চুরি গিয়াছে। অমনি সেই গাঁয়ের পগী অপহৃত উটের পদচিহ্ন দেখতে দেখতে চোরের সন্ধানে বেরলো। সেই পদচিহ্ন সে যদি তার সমীপবর্ত্তী গ্রামে দেখিয়ে দিতে পারে তাহলেই সে তার দায়িত্ব হতে খালাস। তারপর শেষোক্ত গ্রামের উপর জবাবদিহি পড়ল। এই গ্রামের লোকেরা আপনাদের পগী সঙ্গে ক’রে সেই চিহ্ন ধরে বাহির হয়। এইরূপে চোরের আড্ডায় গিয়ে চোরামাল ধরতে

পারলে তাদের পরিশ্রম সার্থক। অনেক স্থলে এই উপায়ে চোরামাল ধরা পড়ে। পগীরা এ কাজে এমনি নিপুণ যে প্রায় তারা শূন্য হাতে ফিরে আসে না। তাদের দক্ষতার প্রমাণ চোরামাল হস্তগত হওয়া। মাল ধরা না পড়লে শুধু তাদের কথার উপর নির্ভর করা যায় না। অনেক সময় মিথ্যা পদচিহ্ন দেখিয়ে এক গ্রামের লোক অন্য গ্রামের উপর অপরাধ চাপাবার প্রয়াস পায় কিন্তু বিজ্ঞ বিচারপতির কাছে ওরূপ প্রযত্ন সফল হয় না।

উট কর্তৃক জল তোলা

শিকার

সিন্ধিরা অত্যন্ত শিকারপ্রিয়। শিকারপুরে থাকতে মাঝে মাঝে প্রায়ই আমার শিকারের সঙ্গী জুটত। একবার আমরা দলবলে সঞ্চর নামে একটা বৃহৎ সরোবরে শিকার করতে গিয়েছিলেম। সেখানে বুনো হাঁস প্রভৃতি নানা জাতীয় পক্ষী পাখালী পাওয়া যেত, আমরা বোটের উপর হতে পাখী শিকার করতেম। একবার মনে আছে আমরা একটা জায়গায় চকাচকির ঝাঁকের মধ্যে এসে পড়ি। সংস্কৃত কাব্যে চক্রবাক্ চক্রবাকীর কথা পড়ে তাদের সঙ্গে এমনি সখ্যবন্ধন হয়ে গেছে যে সেই ঝাকের মধ্যে গুলি চালাতে আমার হাত উঠল না। সে বেচারীদের মধ্যে গুলি চালাতে গিয়ে 'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বং' আকাশবাণী আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়ে আমার অন্তরাত্মাকে দগ্ধ করতে লাগল, আমিও শিকারে ক্ষান্ত দিলাম। সে যা হোক্, আমার ভারি দেখতে ইচ্ছা করে সংস্কৃত কাব্যের চকাচকির বিচ্ছেদ বর্ণনা কতদূর সত্য; তা বাস্তবিক ঘটনা কিম্বা কবির কল্পনামাত্র। সত্যিই কি বিধাতার এমনি কঠোর নির্ব্বন্ধ যে সন্ধ্যা হলেই চকাচকির ছাড়াছাড়ি হবে। এই পাখীদের সম্বন্ধে হিন্দিতে একটি কথা আছে মনে পড়ল। সমস্ত দিন তারা জুটিতে এক সঙ্গে চরে বেড়ায়—অন্ধকার হলেই বিযুক্ত হয়ে পড়ে। এ পারে চখা ওপারে চখী গিয়ে বসে। ওরা পরস্পর ডাকাডাকি করে তবু এ ওর কাছে ঘেঁসতে সাহস করে না।

চকা—চকী মই আঁউ ?

চকী—নহি নহি চকা

চকী—চকা মই আঁউ ?

চকা—নহি নহি চকী

এইরূপ বিরহ বেদনায় রাত্রি ভোর হয়।

ইংরাজ-রাজের পূর্ব্বাধিকারী আমীরেরা বড়ই শিকারভক্ত ছিলেন। তাঁদের হাতে রাজ্য থাকলে এতদিনে সিন্ধুর সমস্ত প্রদেশ শিকারগাহে পরিণত হত। কথিত আছে তাদের এমন কঠোর শাসন ছিল যে কেহ রক্ষিত বনের একটা বরাহ বধ করলে তার প্রাণদণ্ড হত। এখন আর সেকাল নাই। আমীরদের হাতে সে ক্ষমতা নেই। আমীরদের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কেহ ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টে কাজ করছেন, কেহ বা ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের পেন্সন ভোগ করছেন। একজন মীর সাহেব আমার বন্ধু ছিলেন—আমি তাঁর সঙ্গে কখন কখন শিকারে যেতাম। তিনি শিকারে বিলক্ষণ মজবুত, উড়ন্ত পাখী তাঁর গুলি খেয়ে ধরাশায়ী হত। এই মীর একজন ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। একটা খুনী মকদ্দমায় একবার তিনি এক কাণ্ড করে বসেছিলেন। মকদ্দমা সেসনে কমিট হলে যে সকল জিনিষ নথির সঙ্গে প্রমাণ স্বরূপ পাঠাতে হয়, যা চলিত ভাষায় 'মুদ্দামাল' বলে, তার মধ্যে বুদ্ধিমান ম্যাজিষ্ট্রেট মৃত ব্যক্তির মুণ্ডচ্ছেদ ক'রে কাটা মুণ্ডটা সেসন কোর্টে পাঠিয়ে দেন। তা দেখে সেসন জজ ক্রোধান্ধ হয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করেন। এই অতিবুদ্ধির কাজ ক'রে মীরসাহেব ভারি বিপদে পড়েছিলেন।

জাতি বৃত্তান্ত

সিন্ধুবাসী অধিকাংশ লোক মুসলমান।

হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা অধিক। হিন্দুদের আচার ব্যবহার অনেকটা মুসলমানী ধরণে গঠিত। তাহারা আমিষ ভক্ষণ ও সুরাপানে পরাঙ্মুখ নহে। মুসলমানদের মধ্যে কতক আদিম নিবাসী আসল সিন্ধী, কতক বা আফগান বলোচ প্রভৃতি বিদেশী মুসলমান। আফগান বা পাঠান হাইদ্রাবাদ ও উত্তরসিন্ধে সচরাচর দৃষ্ট হয়। ইহাদের অনেকে বংশাদি ক্রমে সিন্ধুতে এখন বাস করছে ও অগাধ ভূমিসম্পত্তির অধিকারী। দেখতে ইহারা বলিষ্ঠ, সুগঠন ও সুশ্রী, আসল সিন্ধী হতে ইহাদের পার্থক্য সহজে ধরা পড়ে।

হিন্দুরা সামান্যত ব্রাহ্মণ, বণিক ও শূদ্র এই তিন বর্ণে বিভক্ত। ব্রাহ্মণদের পোকর্ণ ও সারস্বত দুই শ্রেণী। পোকর্ণ ব্রাহ্মণেরা মহারাজ-ভক্ত বৈষ্ণবপন্থী। ইহারা ভাটিয়া বণিকদের পুরোহিত।

সারস্বত পঞ্চগৌড় ব্রাহ্মণ প্রায় ২০০ বৎসর হতে সিন্ধুদেশে এসে বাস করছে। আচার ব্যবহার কুলশীলে ইহারা বোম্বায়ের সেনই ব্রাহ্মণদের সমতুল্য। মৎস্য মাংস ভক্ষণ ইহাদের নিষিদ্ধ নহে।

বণিক জাতির মধ্যে লোহানা ও ভাটিয়া, এই দুই শাখা অগ্রগণ্য। মূলতানের লোহান-পুর লোহানা বণিকদের মূলনিবাস। ঐ স্থান হইতেই তারা জাতীয় নাম গ্রহণ করেছে। তারা বলোচিস্থান আফগানস্থান প্রভৃতি দূরদেশে ব্যবসা-সূত্রে ছড়িয়ে পড়েছে। ম্লেচ্ছদেশে গমন করলে লোহানা হিন্দুরা জাতিভ্রষ্ট হয় না। এই সকল বিষয়ে অন্যান্য হিন্দুদের তুলনায় লোহানা বণিয়াদের উদার বুদ্ধি প্রশংসনীয়।

লোহানাগণ ব্যবসা অনুসারে আমিল ও বণিক (বণিয়া) এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। বণিকেরা শ্মশ্রুমুণ্ডন, শিখারক্ষণ ও হিন্দুদের মত পাগড়ী পরিচ্ছদ পরিধান করে। আমলদের চালচলন কতকটা ভিন্ন।

আমিল

আমিলেরা সিন্ধী হিন্দুদের অগ্রণী। মুসলমান রাজত্বকালে এই শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। রাজকার্য্যে, বিশেষতঃ হিসাবপত্রের কাজে মুসলমান রাজাদের হিন্দুর সাহায্য ব্যতীত চলিত না। আমিলেরা আমীরদের মন যুগিয়ে চাকরী আরম্ভ করে ও ক্রমে নিজ নিজ বিদ্যাবুদ্ধির চাতুর্য্য প্রভাবে জনসমাজে খ্যাতি প্রতিপত্তি স্থাপন করিয়া লয়। অন্যান্য হিন্দুদের তুলনায় আমিলেরা দেখিতে হৃষ্টপুষ্ট ও সুশ্রী। মুসলমানদের সংসর্গে ও মুসলমান প্রভুদের অনুরোধে তাহারা মুসলমানদের মত বেশভূষা পাগড়ী ও শ্মশ্রু-ধারণ করে— কপালে তিলক একমাত্র প্রভেদ। পান আহারে তাহারা অনেকটা শাক্ত ধরণের লোক, মদ্যমাংসে অরুচি নাই। আমি যখন সিন্ধুদেশে কর্ম্ম করতেম, গবর্ণমেণ্ট আফিস ও বিদ্যালয়ে আমিলদেরই প্রাধান্য দেখা যেত। ইংরাজরাজ্যে কি উপায়ে উন্নতিসাধন করতে হয় তাহারা যেমন ভাল বোঝে অন্য জাতিরা তেমন বোঝে না, সুতরাং তাহারা আর সকলকে ছাড়িয়ে উঠেছে, অন্যেরা পিছিয়ে পড়ে আছে।

এই সকল হিন্দু ভিন্ন হাইদ্রাবাদ সেওয়ান ও অন্যান্য স্থানে অনেক শিখের বসতি প্রত্যক্ষ হয়। খালসা ও নানকসাহী, তাহার

সিন্ধুবাসী দেওয়ান গোপালদাস—কাশ্মীর ষ্টেটের ভূতপূর্ব্ব উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী—(পূর্ণ দস্তুর সিন্ধি পরিচ্ছদে)

দুই শাখা। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, সকলেই শিখধর্ম্ম গ্রহণের অধিকারী। দীক্ষার সময় শিষ্যকে স্নান করাইয়া শিখ মঠে লইয়া যাওয়া হয়; তথায় তিনি গুরু নানককে উপঢৌকন দিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ ক'রে দীক্ষা গ্রহণ করেন—

সৎনাম কর্ত্তা পুরুষ।
নির্ভউ, নির্বৈর, অকাল মুরত,
অযোনি সম্ভব, গুরুপ্রসাদ।
জপ—আদ সচ্, যুগাদ সচ্।
হৈ ভি সচ্—নানক হোসি ভি সচ্।

শিখ মঠে উদাসী (আচার্য্য) শিষ্যমণ্ডলীতে পরিবৃত হয়ে আধিপত্য করেন।

অন্দর মহল

যেখানে মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত সেখানেই অবরোধ-প্রথা পূর্ণ মাত্রায় দৃষ্ট হয়। সিন্ধুদেশেও তাই দেখলাম। স্ত্রীলোকেরা অন্তঃপুরে রুদ্ধ—সূর্য্য চন্দ্রও তাদের রূপ দেখতে পায় না। চন্দ্রের কথা ঠিক হল কি না জানি না—চাঁদের অধিকার চাঁদের হাটে নেই এমন হতেই পারে না, তবে সিন্ধু রমনী যে অসূর্য্যম্পশ্যা এ কথা সাহস ক'রে বলা যেতে পাবে। আমি যতদিন ও দেশে ছিলাম কোন ভদ্র সিন্ধুমহিলার সহিত আলাপ পরিচয় আমার ভাগ্যে ঘটে নি। সিন্ধি বালিকা-বিদ্যালয়ে ও দেশের মেয়েদের যে নমুনা দেখেছি তা বড় তৃপ্তিজনক নয়। তাদের সাজসজ্জায় একটি জিনিস চিরদিন মনে থাকবে—সে হচ্ছে কর্ণাভরণ। কাণের যত রকম গহনা থাকা সম্ভব তা তাদের কাণে ঝুলছে। সে এক মারাত্মক ব্যাপার, দেখলে কষ্ট হয়! ছেলেব্যালায় কৈলাশ মুখুয্যে নামে আমাদের খ্যালার সঙ্গী একটি সুরসিক আমুদে লোক ছিলেন ঐ দৃশ্যে তাঁর মেয়েদের গয়না বর্ণনা মনে পড়ে। ঘরে নতুন বৌ আসছে তাকে কি কি গয়না পরিয়ে সাজাতে হবে তার এক ছড়া তাঁর মুখে শুনতেম। তিনি কাণের গয়নাং যে ছড়া আওড়াতেন—

কাণবালা কাণময়ূর এয়ারিং বোদা—
সে সকলি সিন্ধীবালাদের কাণে ঝুলছে, গয়নার ভারে কাণ ছিঁড়ে পড়েনা এই আশ্চর্য্য!

খ্যাতনামা মিস্ মেরি কার্পেণ্টর যখন দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষে আসেন তখন আমরা সিন্ধুদেশে ছিলাম। তিনি হাইদ্রাবাদে কতকদিন আমাদের বাড়ীতে ছিলেন। সিন্ধিরা তাঁর আতিথ্যসৎকার সেবা যত্ন অনেক করেছিল। স্কুলের ছাত্রেরা মিলে এক নাটক অভিনয় করে, তাতে একটি কবিতা পড়া হয়, তার ধুয়া 'মিস্ মেরি কার্পেণ্টার'—তা যেন এখনো আমার কাণে এসে বাজছে। তাঁকে নিয়ে অন্দরমহল পর্য্যন্ত তোলপাড় হয়েছিল, তা দেখে আমার একটু আশ্চর্য্য ঠেকেছিল কেননা তখনকার কালে সিন্ধী অন্তঃপুরে মেমদেরও প্রবেশ নিষেধ ছিল! তখনও পর্দ্দাপাটির সৃষ্টি হয়নি, কিন্তু Miss Carpenterএর খাতিরে সেদিনের দরজাও খোলা হয়েছিল। যে অন্তঃপুরে আমার স্ত্রী পর্য্যন্ত প্রবেশ অধিকার পান নি তার মধ্যে একজন ইংরাজমহিলাকে ডেকে নিয়ে অভ্যর্থনা করা সামান্য সাহসের কর্ম্ম নয়। আমাদের একটি বিশেষ বন্ধু ন—রায় যদিও তিনি আমাদের বাড়ীতে

ঘন ঘন যাওয়া আসা করতেন, আমাদের সঙ্গে একত্রে বসে আহারাদি করতেন কিন্তু তাঁর পরিবার মধ্যে আমাদের কখন নিমন্ত্রণ করেন নি, মিস কার্পেন্টরের ব্যালায় তাঁর ঘরেরও 'চার দরজা খোলা'—ধন্য মিস্ মেরি কার্পেন্টর !

সুফী ধর্ম্ম

সিন্ধুদেশের বহুসংখ্যক মুসলমান সুফী পন্থী। মহম্মদীধর্ম্মের সহিত সুফীধর্ম্মের অনেক প্রভেদ; এমন কি, গোঁড়া মুসলমানেরা সুফীকে স্বধর্ম্মী ব'লে স্বীকার করতে চায় না। সরস মধুর কবিতাযোগে, কতক বা হিন্দুধর্ম্মের সংস্রবে বা অন্য কারণে কঠোর মহম্মদীধর্ম্ম স্থানে স্থানে ভিন্ন আকার ধারণ করেছে। সুফীধর্ম্ম তার দৃষ্টান্তস্থল। এ ধর্ম্মের আকরস্থান হিন্দুস্থান ব'লে অনেকের বিশ্বাস। তাহারা বলে মুসলমানদের ভারতবর্ষ আক্রমণকালে কোন এক হিন্দুঋষি কর্তৃক এ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়। বস্তুতঃও সুফীধর্ম্মের সহিত বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদের কতক সাদৃশ্য দেখা যায়। সুফীদের খজায়ৎপ্রণালী হিন্দু যোগশাস্ত্রের প্রকারান্তর! এই যোগবলে জীবাত্মার এরূপ উন্নত অবস্থা লাভ হয় যে সে স্বৈরভাবে যথাইচ্ছা গমন করিতে পারে—শত্রুদমন, রোগনাশন, প্রেমপ্রজনন, ব্যোম সঞ্চরণ প্রভৃতি বিচিত্রশক্তি উপার্জ্জন করে, ভূতপ্রেতাদি ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় সকল তাহার প্রত্যক্ষগোচর হয়। সুফীমতে জীবাত্মার আদি নাই, অন্ত নাই, জীবাত্মা পরমাত্মার প্রতিকৃতি, পরমাত্মাই উহার চরমগতি। সাদি হাফেজ প্রভৃতি বড় বড় পারস্য কবি এই ধর্ম্মের অনুরাগী ছিলেন, এ ধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম, সৌন্দর্য্যের ধর্ম্ম, কবি ইহার পুরোহিত, আধ্যাত্মিক মদিরা নৃত্যগীত ইহার পূজোপচার, সুমন্দ বায়ুসেবিত, পুষ্পসুবাসিত, বিহঙ্গকলনাদিত সুরম্য উদ্যান-কানন ইহার ভজনালয়। সুফী কবি সা ভেতাই সিন্ধুদেশের হাফেজ। হাফেজের কবিতার ন্যায় সা ভেতাইএর কবিতা সেখানকার লোকদের হৃদয়গ্রাহী। ভাবুক তার প্রত্যেক বাক্যে গূঢ় অর্থ দেখতে পান, ইন্দ্রিয়সুখকর সামান্য পদার্থ সকল আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে এক অপূর্ব্বরাগে রঞ্জিত হয়।

সিন্ধুদেশে সুফী সম্প্রদায়ের দুই শাখা জলালী ও জমালী। জলালীরা কতকটা শাক্ত ধরণের লোক—তারা অভক্ষ্যভক্ষণ অপেয়পান ইত্যাদি দুর্ব্যসনপরবশ, বল্লভী বৈষ্ণবদের মত পুষ্টিমার্গবিহারী। জমালীদের অন্য ভাব। গুরুভক্তি, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, উপোষণ ভজনপূজন ধ্যানধারণা ইত্যাদি সাধনে তারা অনুরত। তাদের যোগশিক্ষার নাম সুগল, তার নানাপ্রকরণ আছে। সুগলযোগে পরিপক্ক হলে সাধক উচ্চতর তপশ্চর্য্যায় নিযুক্ত হন। এইরূপ সাধনাকে 'হজুর' বলে, কারণ উহাতে সর্ব্বদাই হাজির অর্থাৎ নিবিষ্টচিত্ত থাকতে হয়। হজুর ধ্যানের অনেকগুলি সোপান। গুরু পীর মহাপুরুষ-দের ধ্যান প্রথম সোপান। দ্বিতীয় সোপান মহম্মদের সহিত জ্ঞান ভাব কর্ম্মে সম্পূর্ণরূপে মিলিত হওয়া। এই সোপানপরম্পরা হতে অবশেষে ঈশ্বরে লীন হওয়া—'ব্রহ্মনির্ব্বাণ'। সে অবস্থায় সুফী ব্রহ্মজ্ঞানীর ন্যায় সোঽহং (আনা'ল হক) জ্ঞানের অধিকারী হন।

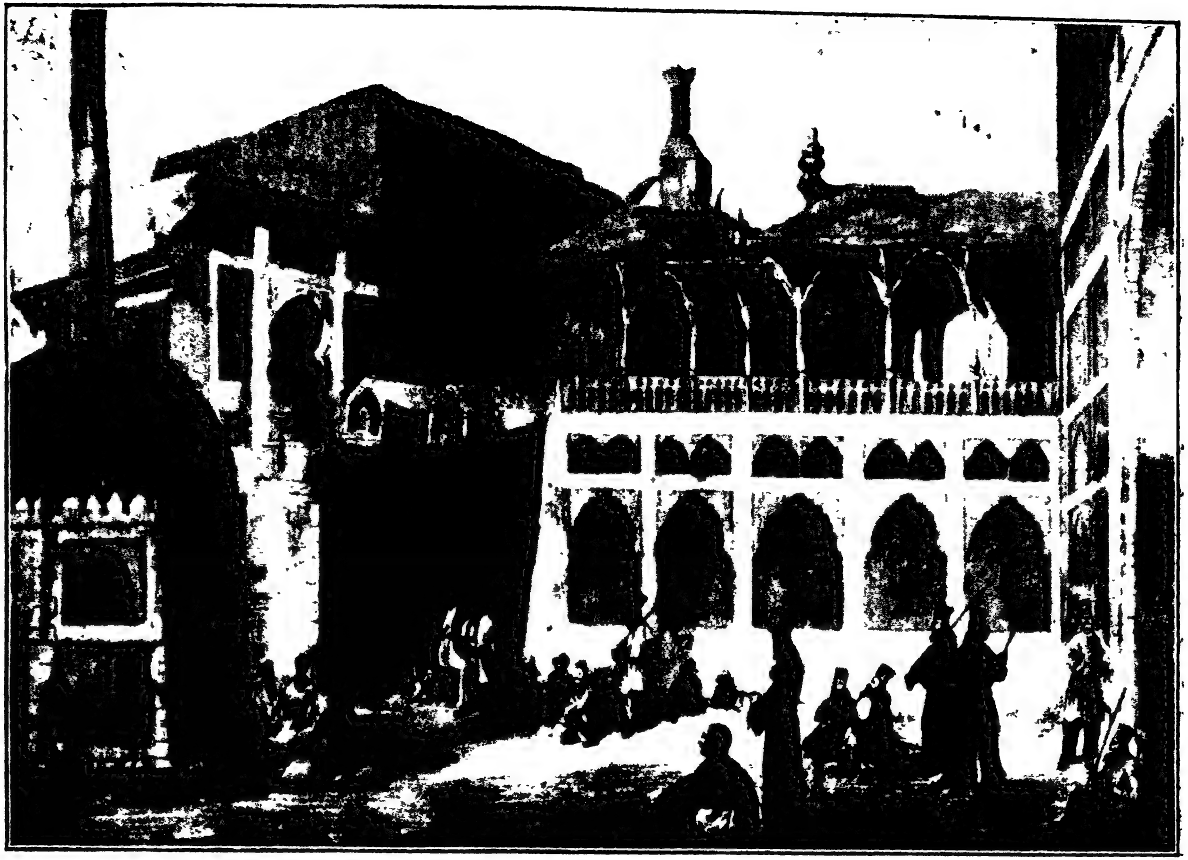

শালসাবাজের দরগা

পীর পূজা

পূর্ব্বে বলা হয়েছে সিন্ধুবাসী হিন্দুদের আচার ব্যবহার অনেকটা মুসলমানীধরণে গঠিত। হিন্দুধর্ম্মের অনুষ্ঠানেও অনেক শৈথিল্য দৃষ্ট হয়। আগেকার মত একালে জোর জবরদস্তী নেই, তবুও অনেকানেক হিন্দু এখনো স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ইসলামধর্ম্ম আশ্রয় করে, মুসলমানও প্রায়শ্চিত্তের পর অনেকে পুনরায় হিন্দুধর্ম্মে ফিরে আসে। ওদিকে আবার হিন্দুধর্ম্মের কুসংস্কার সকল মুসলমানসমাজে প্রবেশলাভ করেছে। পৌত্তলিকতার সংস্রবে ইসলামের একেশ্বরবাদও কলুষিত হয়ে গিয়েছে। অনেক সময় হিন্দু যেমন মুসলমান মুল্লার শিষ্য, তেমনি আবার কখন কখন মুসলমানও হিন্দু আচার্য্যের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়। মুসলমান পীরদের মধ্যে অনেকের হিন্দুনাম ও কোন কোন পীরস্থানে লিঙ্গ প্রভৃতি প্রতীকও রক্ষিত হয়েছে। পীরপূজা সর্ব্বসাধারণে প্রচলিত, ইহা হিন্দুধর্ম্ম ও ইসলামের যোগসূত্র। এই সকল পীর ঈশ্বর ও মানবের মধ্যস্থরূপে জীবের সদ্গতি সাধনে তৎপর, এই বিশ্বাসে লোকেরা পীর বিশেষের শরণাপন্ন হয়। পীরেরা ঐশীশক্তি সম্পন্ন, কত অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার তাদের জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট, লোকদের পীরমাহাত্ম্যে অগাধ বিশ্বাস। এমন অনেকগুলি পীর আছেন যাঁদের উপর হিন্দুমুসলমানদের সমান ভক্তি, তন্মধ্যে সেওয়ানের লালসাবাজ একজন গণ্য। লালসার স্তুতিবাদ পীরভক্তির দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে প্রকটিত হইল :—

পীর মহাপীর তুমি রাজরাজেশ্বর,
সঙ্কট সহায় ভবে সর্ব্বদুঃখহর।
তব ধন্য পুণ্য নাম নিখিল প্রচার,
তাপিত জনের তুমি হর দুঃখভার।
পাথর সুবর্ণ হয় তব কৃপাগুণে,
চরণে শরণ লাগি তব নাম শুনে।
করুণা অপার স্মরি লয়েছি শরণ,
অন্নদানে বঁধু মোরে করহ পোষণ।
মহারাজ বিতর তোমার কৃপাবারি,
তরাও ভকতে ওহে বিপদ-কাণ্ডারী।
আমার যে দশা প্রভু জানিছ সকল,
জীবন শরণ তুমি, সহায় সম্বল।
আশালতা নবীনপল্লবে প্রভু ছাও,
কৃপার দুয়ার তব দাও, খুলে দাও।
ভুবন বিদিত নামে ধরেছি আশ্বাস,
অভাগারে কোরোনা হে নিরাশে নিরাশ।
দুঃখশোক পাপতাপ করহ মোচন
*সেরবন্দ পীর তুমি, ঈশ্বরের জন,
অগতির পরে কর কৃপা বরিষণ।

জেন্দাপীর নামে অপর একটি মহাপুরুষ আছেন তাঁকে স্মরণ ক'রে এই সিন্ধুকাহিনী সমাপন করি। পীর জেন্দা হিন্দুমুসলমান উভয়জাতির পূজার পাত্র। হিন্দুরা এঁকে সিন্ধুনদীর অবতার বলে বিশ্বাস করে। ইঁহার নামে ভক্তেরা যে স্তুতিমালা পাঠ করেন তার কিয়দংশ ভাষান্তরে উদ্ধৃত ক'রে দিলাম :—

সরিৎ সুহৃদ সম কল্যাণ নিলয়,
মহারাজ মহিমা অপার,
ঢালিছ অজস্র স্রোত বল বেগময় —
সেবকেরে সুখে কর পার।

* লালসা'র জন্মভূমি।

অগণ্য অগণ্য পাপে তাপিত অন্তর,
দূর কর প্রভু পাপভার,
তোমার দুয়ারে যাচে কতশত নর,
মনোরথ পূরহ আমার।
অন্নদাতা তুমি সদা কর অন্নদান,
হৃদি দেহ সত্য পুণ্যসার
চৌদিকে ঘিরেছে মোর সঙ্কট মহান্—
দয়াময় করহে নিস্তার।
বিশ্বায় তুমি হে মহামতি,
অপার প্রভুতা, অপার শকতি,
মায়াজাল রচয়িতা অগতির গতি,
পূর আজি ভক্ত মনস্কাম।

শরণ পরমগতি, বহুশক্তিধারী,
কর পার ভগ্নতরি কত নরনারী,
বিপদ তরঙ্গ মাঝে তুমিই কাণ্ডারী;
পূর ওহে ভক্ত-মনস্কাম।
থাক মোর সাথে সর্ব্বকাল,
শোক মাঝে দেহ ধৈর্য্যবল,
সম্পদ বিপদে তুমি একই সম্বল,
অভাগার ঘুচাও অকাল।
সতত তোমায় সখা করিহে স্মরণ,
কাঙ্গালের তুমিই আধার,
সেবকের স্তব স্তুতি করহ গ্রহণ—
দয়াময় দেও হে নিস্তার।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তুমি আমার

তুমি আমার! একলা তুমি! এস মোরে ঘিরে ফেল আজি।
আমি তোমার,—একলা আমি, তোমার মাঝেই লুকিয়ে যেন বাঁচি।
হাসি কান্নার কোলাহলের খেলায়,
ভবসিন্ধুর উন্মাদনার বেলায়,
ছুটে ছুটে শ্রান্ত, ক্ষিপ্ত! কর তৃপ্ত শুধু তোমায় দিয়ে।
পঙ্গু হব, বোবা হব, মরে যাব তোমায় বুকে নিয়ে।

নিবিয়ে দিয়ে আমার জ্বালা বাতি,
নিবিয়ে ভবের দিবা এবং রাতি,
তোমার দিপ্তি প্রকাশিয়ে থাক আমার দৃষ্টিটুকু ছেয়ে;
আলোকিত প্রীত মুখে থাকি সদা তোমার পানে চেয়ে।

অঙ্গ ভরি তোমার পরশ লাগাও,
মর্ম্ম ভরি তোমার প্রীতি জাগাও;
আলোর মত, ছায়ার মত, ছড়িয়ে পড়ি তোমার তলায় আমি।
তুমি আমার, একলা তুমি! আমি তোমার, একলা আমি, স্বামী।

শ্রীঅনঙ্গমোহিনী দেবী।

ইংরাজ রমণীর গৃহস্থালী

ভারতীতে বহুপূর্ব্বে "বিলাতী রমণী" সম্বন্ধে তিনটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। সেগুলি আলাদা আলাদা লেখা হইয়াছিল—ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর রমণী সম্বন্ধে বর্ণনা। ইংরাজ রমণীর গৃহস্থালীর কথা আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধে ইহাই দেখান আমার এখন উদ্দেশ্য যে সকল দেশের রমণী জাতিই দেশের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির মূল কারণ। রমণী জাতি স্বাধীন ও সুশিক্ষিতা না হইলে কোন দেশ, জাতি বা সমাজ কখনই উন্নতিশীল ও ক্ষমতাবান হয় না।

যে দেশে রমণী জাতির অবস্থা উন্নত, সেই দেশই সভ্য, শক্তিশালী ও উন্নত;—এ নিয়মটি সুধু মানব-সমাজে নহে, অভিব্যক্তিবাদে জীব-জগতেও সমান মাত্রায় প্রযুজ্য। উচ্চতম জীবশ্রেণীর যে নাম করণ হইয়াছে—"ম্যামেলিয়া" ("Mammalia") অর্থাৎ "স্তন্য-পায়ী", তাহার মানে আর কিছুই নয়, জীবজগতে জাতি বিভাগ বা শ্রেণী বিভাগ হইয়াছে "মায়ের নামে",—পিতার নামে নহে।

ইহাতেই বেশ বুঝা যায়, মনুষ্য জাতির ক্রম-অভিব্যক্তির কেন্দ্রস্থলে আছেন—রমণী। তাঁহাদেরই সহিত শিশু ও পরবর্ত্তী মানব-জাতির সম্বন্ধ বেশী ঘনিষ্ঠ। সন্তান দশ মাস গর্ভে ধরিয়া তাঁহাদের দেহের মধ্যেই বর্দ্ধিত হয় এবং তার পর ভূমিষ্ঠ হইয়াও প্রায় দুই বৎসরকাল তাঁহাদেরই স্তন্যে ও তাঁহাদেরই যত্নে লালিতপালিত হয়। এই বিষয় উল্লেখ করিয়া বিখ্যাত জীবতত্ত্ববিৎ এ "টমসন্" বলেন—

"The success of Mammals, as we may find it in the name *Mammalia,* which Lenneas first applied to the class, is a *hint of the idea that in the evolution of this class at least the mothers led the way.*"

A. Thomson's "Zoology."

অর্থাৎ লিনিয়স্ নামক এক জার্ম্মান জীববিদ্যাবিৎ পণ্ডিত যখন উচ্চশ্রেণীর জীবের যথা পশু ও মানুষের নামকরণ করিতে মনস্থ করিলেন, তখন তিনি ভাবিয়া ভাবিয়া একটিও তেমন মনের মত "জাতিবাচক মৌলিক" নাম পাইলেন না। শেষে—সন্তানকে স্তন্য পান করানর কথা তাঁহার মনে পড়ে, এবং উচ্চশ্রেণীর জন্তুদের সেইটিই যে বিশেষত্ব ও মানুষের সেইটিই যে উচ্চ অভিব্যক্তির কারণ—অর্থাৎ যে সকল জীব-জন্তুর মধ্যে সন্তানকে স্তন্যপান করানর প্রথা আছে তাহারাই সেই কারণে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ স্থানে উঠিতে পারিয়াছে—এই মনে করিয়া তিনি সেই নামটই নির্ব্বাচন করিলেন।

টমসন বলেন এই "ম্যামেলিয়া" নামটি দেওয়া লিনিয়সের বড়ই ঠিক হইয়াছে; কারণ স্তন্যপায়ী জন্তুমাত্রই যে এত উচ্চ শ্রেণীভুক্ত তাহার আর কিছুই বিশেষত্ব নাই—বিশেষত্ব এই যে তাহারা সন্তানকে স্তন্য পান করায়; এবং সেই জন্য মাতার সহিতই সন্তানের সব চেয়ে এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হওয়াতেই মানব জাতির ও উচ্চ জীবের এত অভিব্যক্তি!

রমণী জাতির "উন্নতি" একথাটির ঠিক অর্থ কি ?

প্রথম, ব্যক্তিগত ও সমাজিক স্বাধীনতা ; দ্বিতীয়, তাঁহাদের উপর সমাজের যত্ন ও সুশিক্ষা।

এই ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বাধীনতা যখন এক সঙ্গে মিলে—তখনই মনিকাঞ্চণের যোগ হয়। তখন তাঁহাদের অন্তরে লুক্কায়িত যে শক্তি সংসারে কার্য্যকরী হয় সেইটি তাঁহাদের—উচ্চশ্রেণীর গৃহস্থালী।

এই গৃহস্থালীতে অনেক কাজ বুঝিতে হইবে ; তবে প্রধানত এই দুইটি—

১। সংসারের সাধারণ গৃহিণীপনা।

২। ছেলে মানুষ করা ও উপযুক্ত শিশু-শিক্ষা দেওয়া।

তা ছাড়া নিজের ও সংসারে ভরণ-পোষণ উপার্জ্জন করিবার নানারূপ কাজও আছে।

এইরূপ উচ্চশ্রেণীর গৃহস্থালীর দ্বারা বিলাতের রমণীগণ দেশ, জাতি ও সমাজকে কিরূপ উন্নত করিয়া তুলিয়াছেন, এ প্রবন্ধে আমি তাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিব। তাঁহাদের গৃহস্থালীর এই আদর্শ, এই প্রথা ভুমণ্ডলের সকল জাতির পক্ষেই একান্ত অনুকরণীয়।

এদেশে বিলাতী রমণীদের দেখিয়া আমরা মনে করি যে তাঁহারা বড়ই অলস ও একান্ত খোষপোষাকী,—সংসারের কাজ তাঁহারা অনুমাত্রও করেন না—সে সব কাজ কেবল তাঁহাদের বাবুর্চি, আয়া ও বেহারারা করে। তাঁহাদের সারাদিনের কাজ—বেশভূষা করিয়া থাকা, ও সাজসজ্জা করিয়া হাওয়া খাইতে যাওয়া। এরূপ ধারণার কারণ এখানে তাঁহাদের আমরা দূরে দূরে দেখি বলিয়া! বস্তুতঃ তাঁহারা এখানেও সংসারের অনেক কাজ করেন ; এবং কাজের সময় কাজ ও আমোদ আহ্লাদের সময় আমোদ আহ্লাদ করিয়া—স্বাস্থ্য মন ভাল রাখিয়া সুখে দিনযাপন করেন।

তাঁহাদের নিজের দেশে যাইয়া তাঁহাদের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া তাঁহাদের অন্তর্জীবন আরও ভাল করিয়া দেখিলে দেখা যায় সে জীবন কি চমৎকার! কি সুশৃঙ্খল! কি উৎসাহপূর্ণ ও মহান!

সাধারণতঃ সে দেশে ছেলেমেয়েরা সাত বৎসর হইতে চৌদ্দ বৎসর অবধি বিদ্যালয়ে পড়িতে বাধ্য। এই সময়ে তাহাদের লেখা পড়া ছাড়া আরও অনেক বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়, যথা—কলাবিদ্যা, সঙ্গীত চিত্রবিদ্যা, ব্যায়াম ইত্যাদি। তাছাড়া—আজকালকার মেয়েদের শিক্ষায়—ঘরের কাজকর্ম্ম শেখানো হয়। সেখানে তাহারা—অন্নব্যঞ্জন রাঁধিতে শিখে ; ঘর ঝাড়িতে, কাপড় কাচিতে শিখে এবং শিশু পালন ও রোগীর পরিচর্য্যা করিবার উপযোগী শিক্ষাও পায়। চৌদ্দ বৎসর বয়সে সেই সব বিষয়ে অধ্যয়ন ছাড়িয়া কেহ কেহ জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য ব্যবসাবাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয় স্বতন্ত্র বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিতে যায়। সেখানে টাইপরাইটিং, ফটোগ্রাফী, সেলাই, টেলিফোনের বা পোষ্টাপিসের কাজ কিম্বা আপিসের কেরাণীগিরির কাজ শিক্ষা করে। সকলেই সেখানে এই বয়স হইতেই স্বাধীন হইতে চায় ও স্বোপার্জ্জিত অর্থে ভরণপোষণ চালাইতে চায়। এইরূপ

অল্প বয়সে স্বাধীন হইবার চেষ্টা অনেকের কাছে আপত্তিজনক হইলেও স্বাধীনদেশে ছেলেমেয়ে সবাইকারই ভিতর এই ভাবটা খুব তীব্র। মেয়েরা ঠিক নিয়মিত কাজের সময় কাজ করিয়া—সংসারের কাজে বাপ মাকে সাহায্য করিয়া—তার পর সুন্দর পোষাক করিয়া প্রায় কোনও সঙ্গীসহ নানারূপ আমোদ প্রমোদ করিতে বাহির হয়। এই সময়ে প্রায়ই তাহাদের সঙ্গী থাকে একজন যুবা পুরুষ। "Two is company but three is none." একটি রমণীর সঙ্গে একটি মাত্র পুরুষ—ইহাই বেড়াইতে যাইবার প্রথা! এক সঙ্গে বহু-লোকে হট্টগোল করিয়া যায় না। এইরূপে তাহারা বেড়াইতে বা কোনও দর্শনীয় স্থান দেখিতে বা থিয়েটার, বায়স্কোপ ইত্যাদিতে যায়। অনেকের আবার এই থেকেই ভালবাসার সূত্রপাত হয়—ও অনেক সময়ে বিবাহও হইয়া যায়।

পিতৃগৃহে থাকিবার সময় ছেলেমেয়েরা সংসারের অনেক কাজে সাহায্য করে; কিন্তু বিবাহ হওয়ার পরই তাহাদের নিজের রীতিমত ঘরকন্না আরম্ভ হয়। প্রথমে স্বামী, স্ত্রী ও তারপর হয়ত গুটি কতক ছেলেপুলে এই লইয়াই তাঁহাদের সংসার। যেমন সংসারের পরিশ্রম, তেমনি সময়ান্তরে একত্র বসিয়া দাঁড়াইয়া সপরিবারে আমোদপ্রমোদ করা। তাঁহাদের শীতপ্রধান দেশে অবসরের সময় বড়-কেহ বাড়ির বা ঘরের ভিতর বসিয়া থাকেন না; নিকটবর্ত্তী কোনও বাগানে বেড়ান বা কোন খোলা বা আমোদের জায়গায় বেড়াইতে যান। সেখানকার মধ্যবিত্ত অবস্থার গৃহিণীর গৃহকার্য্যের কথাই আমি এখানে বিশেষ করিয়া বলিব।

প্রায়ই স্বামী কোনও কাজ করেন আর স্ত্রী সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম্ম দেখেন ও ছেলেপুলে মানুষ করেন; কোনও চাকর চাকরাণীর আবশ্যক হয় না। ঘরঝাড়া, রাঁধা প্রভৃতি উঁচু নীচু সকল কাজই গৃহিণী নিজের হাতে করেন। ঘড়ির মত নিয়মে সংসারের সব কাজগুলি চলে। তাঁহারা বাল্যজীবন হইতে নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া কাজ করিবার যে শিক্ষা লাভ করেন কখনও তাহার ব্যতিক্রম হয় না। তাই এত কাজের পরেও দেহমনের স্বাস্থ্যপ্রদ আমোদপ্রমোদ করিবার অবসর থাকে। এমন কি কাপড় সেলাই, কাপড় কাচা প্রভৃতি কাজগুলিরও নির্দ্দিষ্ট সময় বা দিন আছে। এই সব সামান্য কাজে ঘরের পয়সা সহজে বাহির হইয়া যায় না।

রান্না ও আহারের ব্যবস্থা সে দেশে বড়ই সুবিধাজনক। জিনিষে ভেজাল নাই; যেখানে সেখানে পথে ঘাটে তৈয়ারী আহার পাইবার স্থান আছে। সে সব স্থানে অল্প পয়সায় ঠিক সময়ে স্বাস্থ্যকর খাদ্য পাওয়া যায়। তবে অধিকাংশ সংসারী লোকেই সেখানে ঘরে রান্না করেন। সে রান্না-ঘরগুলির ব্যবস্থা এমন স্বাস্থ্যকর ও সুনিয়ন্ত্রিত, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যে দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। বাজার করা, রাঁধা বাড়া সবই অতি সহজে সমাধা হয়। তাঁহাদের দেশে খাওয়াদাওয়া অতি সংক্ষেপে সারা হয়; কিন্তু খাদ্য দ্রব্যগুলি খুব সারবান ও পুষ্টিকর থাকে। দিনরাতের সমস্ত খাওয়াগুলি যেন একেবারে ঘড়ি ধরিয়া চলে। প্রাতে উঠিয়াই এক পেয়ালা

চা, দুধ ও দুই এক খানি পাঁউরুটি টোষ্ট ও দুটি একটি ডিম সিদ্ধ বা পোচ মাখন জ্যাম জেলী দিয়া সেব্য। তারপর যাকে ব্রেক্‌ফাষ্ট বলে সে আহারে প্রায় খানিকটা মাংস মাছ বা বেকন সিদ্ধ ও পাঁউরুটি মাখন ইত্যাদির ব্যবস্থা। তারপর আবার প্রায় একটার সময়ে লঞ্চ হয়। যাঁহারা কাজের লোক তাঁহারা কর্ম্ম-স্থানের নিকটে কোনো Restaurant বা আহারের স্থানেই এই সময়কার আহারটা সারিয়া লন; আর বাড়িতে ফিরিয়া আসেন না। সেখানে গলিতে গলিতে এইরূপ আহারের স্থান আছে। নানা রকম উপাদেয়, সারবান ও ভেজালহীন খাদ্য এইস্থানে সর্ব্বদাই তৈয়ারী থাকে। "মেনুকার্ড" এক একটি টেবিলে দেওয়া থাকে, তাহাতে প্রত্যেক খাদ্যের দাম আলাদা আলাদা লেখা। যাহা ইচ্ছা আহার করিয়া যাইবার সময়, যে সকল লোক খাদ্য সরবরাহ করে তাহারাই একটু কাগজে দাম লিখিয়া হাতে দেয়; দরজার কাছে এক রমণী হিসাব রাখেন তাঁহারই কাছে মূল্য দিতে হয়। কোনও দরদস্তুর বা সময়ের অপচয় নাই। এইরূপে আমি দেখিয়াছি অনেকের এই সময়কার আহার ছয় পেনী বা এক শিলিংএ সম্পন্ন হয়। আর সে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে খাওয়ারই বা পারিপাট্য কি। একখানি পেনি বা হাফপেনি খবরের কাগজ লইয়া পড়িতে পড়িতে ধীরভাবে আহার হয়। হাজার কাজের লোক হউন-না-কেন আহারে কাহারো তাড়াতাড়ি নাই।

এইরূপ আহারের ঠাঁই অনেক আছে। অধিকাংশ গুলিতেই রমণীরা তত্ত্বাবধানে রত। অনেক ইটালি ও ফরাসী দেশের মেয়ে পুরুষেরা আসিয়া এখানে এইরূপ Restaurant বা আহারের স্থান খুলিয়াছে। কিন্তু সাধারণের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল—জে লয়নস্, (J. Lyons) ইরেটেড ব্রেড কোং; (Aerated Bread Co.) ব্রিটিশ টী টেবল (B. T. T.) ইত্যাদি। তাহাদের যেমন সস্তা খাবার তেমনি সেগুলি ভেজালহীন ও পুষ্টিকর।

এই গেল বিলাতী রমণীদের ঘরে বাহিরে গৃহস্থালী। এইবার তাঁহাদের আর একটি মহত্তর কার্য্যের কথা বলিব। সেটি আর কিছু নয়, শিশু পালন—যা সকল সুশিক্ষিত সভ্য দেশেই অতি সুচারুরূপে হইয়া থাকে। এই বিষয়ে শিক্ষিত হইয়া মা হওয়ার যে সুফল এবং তাহার যে মহিমা ও গরিমা তাহা আমাদের এদেশের কোথাও দেখা যায় না। সুধু ছেলের উপর স্নেহ মমতা নয়—কি করিয়া শিশুকে সুস্থ রাখিয়া লালন পালন করিতে হয়, শিশুদের সুশিক্ষা দিতে হয় সে সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবার চেষ্টা সে দেশে সব মায়েরই অত্যন্ত প্রবল; এ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য যাহা আছে তাহা তাঁহাদের বাল্যশিক্ষারই অন্তর্গত।

সব রমণীই নিজের হাতে নিজের ও নিজেদের ছেলেমেয়ের অনেক সুন্দর সুন্দর পোষাক তৈরি করেন, মেরামত করেন ও কাচেন। বাড়িতে দাসী থাকিলে তাহাদের জন্য আলাহিদা ঘর—বিশ্রাম ও ভোজনাগারের বন্দোবস্ত আছে। আমাদের দাসদাসীর মত হীন অবস্থায় তাহাদের রাখা হয় না। কাজ করিতে করিতে তাহাদের অসুখবিসুখ হইলে

তাহাদের প্রভুই তাহাদের চিকিৎসা করান। সে দেশের রমণীদের 'এপ্রণ' পরা, বুকে ফুল গোঁজা, একটু লাল ফিঁতে পিন দিয়ে আঁটা, ছোট ছোট ফুলকাটা রুমাল,—ছোট ছোট হাতগুলি দিয়ে হাবভাব সহকারে তাহার ব্যবহার—ইহা দেখিলেই মনে হয় যে সংসারে পরিচ্ছন্নতা, স্বচ্ছলতা, স্বাস্থ্য ও শান্তি জাজ্বল্য হইয়া রহিয়াছে। নিজের দেহের পরীর মত সুন্দর পোষাকগুলি সব নিজের হাতেই সেলাই করা। তাই এত সস্তায় এত সমৃদ্ধি! সব কাপড়গুলি কত যত্ন করিয়া রাখা;—নিজের হাতে ধোয়া, পরিস্কার করা।

যখন পুত্রসম্ভবা হন, পাখী যেমন আপনার বাসা তৈয়ারী করে, তুজনে সেইরূপে উদ্যোগী হইয়া নিজ হাতে নিজ পরিশ্রমে ভবিষ্যতের আবশ্যকীয় সামগ্রীগুলির সংস্থান করেন। পাঠ্যাবস্থা হইতেই এই সকল গৃহিণীপনা শিখান আছে কিনা—রাঁধাবাড়া, নৃত্য গীত, সেলাই, শিশুপালন রোগীর পরিচর্য্যা প্রভৃতি সবই—তাই দরকারের সময় আর কোনো গোলমাল হয় না।

রাজাই রাজ্যের খরচে দেশের মেয়েদের এই সব শিক্ষা বিনামূল্যে দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। সেদেশের সকল পিতামাতাই মেয়েদের বাল্যাবস্থায় ঐরূপ ইস্কুলে পাঠাইতে বাধ্য।

আমি যখন প্রবাস হইতে ফিরি, জাহাজে সারা পথ এই বিষয় চিন্তা ও আলোচনা করিয়াছি এবং দেশে ফিরিয়াই এই বিষয়ে একটি ইংরাজীতে লেখা প্রবন্ধ একখানি খবরের কাগজের ম্যানেজারকে দিয়াছিলাম;—ইচ্ছা ছিল যে তখনই সেটি ছাপান হোক কিন্তু ম্যানেজার মহাশয় কংগ্রেসে যাইবার সময় আমার সেই তত যত্নের লেখা প্রবন্ধটি হারাইয়া ফেলিলেন। আমার আর নকল ছিল না, কাজেই আর তার উদ্ধার হয় নাই। সেইরূপ স্বতঃ উৎসাহপূর্ণ ভাবে আর তাহা লিখিতে পারি নাই বলিয়া আমার ঐ অতি প্রিয় বিষয়ে আর এতাবৎকাল লেখা হয় নাই। বিষয়টি ছিল—"Evening fire-side in an English home" "ইংরাজ সংসারে সন্ধ্যামিলন!" সেটি তাঁহাদের শান্তিমাখা স্বর্গের মত স্থান। সেখানে তখন যেন স্বর্গীয় ছবি দেখা যায়। আগন্তুক—বিশেষ বিদেশী লোকদের সেথা কতই আদর অভ্যর্থনা!

এইরূপে নানা কর্ম্মে, নানা শিক্ষায়, আনন্দে এবং স্বাধীনতার স্ফুর্ত্তিতে সেদেশের ছেলেমেয়েগুলি মানুষ হয়। তাহাদের বাল্য জীবন, যৌবন ও প্রৌঢ় অবস্থাও সেইভাবে কাটে। তার পরে স্থবির বয়সেও কাজ করিবার ক্ষমতা একেবারে যায় না। এই শেষ বয়সেও নানারূপ সংসারের হিতকর কার্য্য করিয়া অনেকে সময় কাটান। তাহার মধ্যে দেশের শিশুপালন একটি। চিকাগো একজিবিসনে—যখন আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সকল নূতন রক্তমিশ্রিত জাতিরা নূতন উদ্যমে নিজদের নূতন সভ্যতা নূতন ভাবে গড়িতে বিপুল আয়োজন করিয়াছিল—সেই সময় হইতেই কয়েকটি নূতন চেষ্টার আরম্ভ হয়—তার মধ্যে একটি Child Study Societyর প্রতিষ্ঠা—অর্থাৎ ছেলেদের শারীরমনের সব তত্ত্ব বিশিষ্টরূপে আলোচনা করিয়া সেইমত তাহাদের শিক্ষা ও শরীরমনের যত্ন লইবার ব্যবস্থা। এই কাজে সে দেশের

সুস্থ শরীর সুস্থ মন কত বৃদ্ধ বৃদ্ধা যৌবনের মত সমান উৎসাহে যোগ দিয়াছেন। এই কাজের জন্য কত সভা সমিতি, কত আলোচনা —তাহাতে দেশের কত উপকার!

ঐরূপ আর একটি অনুষ্ঠান আছে। তার নাম Polytechnic. ইহার প্রবর্ত্তক Quinton Hog. যে সমস্ত গরীব লোকেরা সমস্ত দিন কাজের চেষ্টায় ঘোরে তাহাদিগকে দিনের কাজের শেষে সন্ধ্যার অবসরে নানা রূপ জ্ঞানও অর্থ উপায়ের উপযোগী শিক্ষা দিবার জন্য এই পলিটেকনিক। আধা পথে যে সকল ছেলেরা লেখাপড়া ছাড়িয়াছে তাহাদেরও নানা আবশ্যকীয় বিষয় সন্ধ্যাবেলা শিখাইয়া তাহাদের ভবিষ্যতের পথ খুলিয়া দিবার উপায় এই পলিটেকনিক করিয়া দেয়। এখানে সকল আবশ্যকীয় বিষয় হাতেকলমে শিখান হয়, যথা—চিত্রবিদ্যা, ফটোগ্রাফী, টেলিগ্রাফের কাজ, ছাপা, লিথো ইত্যাদি। আমাদের এদেশে রাশি রাশি ছেলে পরীক্ষা পাশ করিতে না পারিয়া আধাপথে সহায়হীন, অপদার্থ হইয়া মারা যায়।—সেখানকার ছেলেদের সেই সব দুর্দ্দশা ঘুচাইবার জন্য এই প্রয়াস।

এখন এই Child Study বা শিশুদের স্বাস্থ্য মনের বিজ্ঞান আলোচনা ও সেই ভাবে শিশুপালন ও শিশুশিক্ষা—এই সব কাজে অনেক বর্ষীয়সী রমণী ও পুরুষ স্বেচ্ছায় নিযুক্ত। সত্তর আশি বছরেও তাঁহারা সমান উদ্যমে এই সকল কাজে ব্যস্ত। শিশু সম্বন্ধে এত কে বোঝে—পুরুষেরা তাহা পারে না—তাই রমণীর এত সাহায্য দরকার। "Hall of Hygiene and Health" অর্থাৎ সুস্থ ও নিরোগিতা প্রচারের সমিতিতে কত রাত্রের অধিবেশনে তাঁহাদের বক্তৃতা ও কার্য্যকলাপ শুনিয়া বিস্ময় ও আনন্দে মুগ্ধ হইতাম। সেখানকার বৃহৎ হলে স্বাস্থ্য ভাল রাখিবার অনুরূপ যত দ্রব্যাদি পাশাপাশি সাজান আছে; সেইগুলি দেখিয়া সহজেই লোকশিক্ষা হইবে এই অভিপ্রায়ে—বেচিবার জন্য নহে।

আমি উদাহরণচ্ছলে একটি মধ্যাবস্থার ইংরাজ সংসারের দৈনিক কার্য্যকলাপ বর্ণনা করিব। তাঁহারা মধ্যবিত্ত রকমের লোক। একটি বিধবা প্রৌঢ়ারমণী—দুইটি ছেলে ও একটি মেয়ে লইয়া একটি ছোট সংসার। দুঃখে কষ্টে সংসার চালাইবার জন্য বাড়ীতে দুই তিনটি পয়সা-দিয়া-থাকার অতিথি—Paying guest রাখেন। ছেলেগুলি সব অল্প বিস্তর কাজ করে কিন্তু কাহারও আয় বেশী নয়। লণ্ডনে বাড়ী তৈরি করিবার এই নিয়ম যে এক-তৃতীয়াংশ জমি ছাড়িয়া বাড়ী করিতে হইবে। তাই সবাই প্রায় একই রকম দেখিতে বাড়ী করে—তাহাতে সংরটি কত সুন্দর দেখায়। বাড়ীর সামনে বাগান ও যেখানে সম্ভব কারুকার্য্য-করা কাচকড়ার টবে ফুল সাজান—ফুলে ভরা। সবাইকারই একএকটি আলাদা শুইবার ঘর আছে—তাহাতে সব আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি, যথা—খাট, বিছানা, মুখ-ধুইবার জল, কাপড় রাখিবার আলমারী ইত্যাদি দিয়া সুন্দর সাজান। আহারের ঘণ্টা বাজিলে সকলে একত্র আসিয়া আহার করেন। জমীর নীচেতেও যে একতালা ঘর আছে সেই স্থানে এই আহারের ঘর। এর পাশে ছোট

পরিস্কার রান্না-ঘর—এই মাটির নীচের তলায়ই থাকে। আর একটি ঘর একতলায় প্রবেশের পথেই আছে, সেটি Common Sitting room Drawing room বা সাধারণ বৈঠকখানা। সকলেই এইখানে অবসর মত একত্রে বসেন ও কথাবার্ত্তা কন এবং বন্ধু-বান্ধব বা আগন্তুক আসিলে তাঁহাদের সঙ্গে বসিয়া গল্পগুজব করেন। সে ঘরটি অতি-পরিপাটিরূপে সাজান—সব সরঞ্জামগুলিই ভাড়া নেওয়া। একটি পিয়ানো আছে; গদিমোড়া সোফা ও চেয়ার আছে। এইখানে অবসরের সময় একত্র মিলিয়া নাচগানও হয়। সে অতি মধুর আনন্দ। তাছাড়া অন্যান্য সময় সবাই আপনার আপনার ঘরে থাকেন বা বাগানে কিম্বা বাহিরে বেড়ান। কাহারও শুইবার ঘরে কেহ দরজায় ঘণ্টা না বাজাইয়া ঢুকিতে পারে না। আমাদের একত্র একান্নবাসের সংসারে—এমন একটি আব্রুর স্থান নাই।

ঘড়ি ধরিয়া প্রত্যেক দিন ঠিক সময়ে আহারের ঘণ্টা বাজে ও আহার সরবরাহ হয়। গৃহিনী মেয়েটির সাহায্য লইয়া সংসারের সব কাজকর্ম্ম করেন ও অতিথিদের পরিচর্য্যা করেন—মায় জুতা ঝাড়া, ঘর পরিস্কার করা, এমন কি পাইখানা পরিষ্কার করা অবধি। রাঁধিবার ঘরটি অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—আমাদের দেশের রান্নাঘরের মত অমন ভীষণ স্থান নহে। সেখানে উনানের চারি ধারে চেয়ার পাতিয়া সন্ধ্যায় একত্র বসিবার বেশ ঠাঁই। কত সাশ্রয়! আর আলাহিদা আগুন পোহাইবার ঠাঁই দরকার হয় না।

সে দেশে রাঁধা খাদ্য বাকি থাকিলে ফেলিয়া দেওয়া রীতি নয়; পরের দিনে তাহা ব্যবহার করা হয়। বহুদর্শী বিচক্ষণ গৃহিনী সে গুলিকে তার পর দিন সুন্দররূপে পরিবর্ত্তন করিয়া পরিবেষণ করেন। খাবারগুলি একটি বড় পাত্রে করিয়া টেবিলের মাঝে থাকে, সবাই আবশ্যক মত ভিন্ন চামচে করিয়া উঠাইয়া লইয়া খায়। সুতরাং কেহই পাতে কিছু ফেলে না। আহারান্তে হাড়গুলি সব জমা হয়; ও যে হাড়গুলির মজ্জায় কিছু সার আছে সে গুলি দিয়া সুপ চড়ান থাকে। রান্না হইয়া গেলে, সেই আঁচে কাচা কাপড়গুলি রাত্রে শুকায়। পরদিন প্রাতে দগ্ধ অঙ্গারের মধ্যে যে কয়লা থাকে সেগুলি, ও সে ছাইটুকুও তুলিয়া রাখা হয়। সেই ছাই ও অঙ্গার দিয়া বাসনগুলি মাজা হয়। রাত্রের উনানে বসানো গরম জলের সাহায্যে বাসনকোষন কাপড়চোপড় পরিষ্কার হয়। টেবিলে বসিয়া একত্রে চুরট খাইতে খাইতে যে ছাইগুলি পড়ে সে গুলিও একটি পাত্রে রক্ষিত হয় এবং তাহার দ্বারা সুন্দর দন্তমঞ্জন প্রস্তুত হয়। একজন মালি থাকে সপ্তাহে সপ্তাহে নির্দ্দিষ্ট সময়ে আসিয়া সে বাগানের গাছগুলির তলা খুঁড়িয়া ঘাস উপড়াইয়া দিয়া যায়; তার বিনিময়ে সেই বাকি হাড়গুলি লইয়া যায়। তারও সে দেশে বাজারে বেচিলে মূল্য আছে। আর ছাইগুলি গাছের গোড়ায় সাররূপে ফেলা হয়। এই রূপে সে দেশের কোনও জিনিষেরই অপচয় হয় না। সময়ের অপচয়, শক্তির অপচয়—কোনও কিছুরই অপচয় নাই। যখন বসিয়া গল্প করিতেছেন তখনও হাতে একটা সেলাই চলিতেছে।

নিজেদের পোষাকের মত শিশুদের সব

পোষাক নিজের হাতেই সেলাই করা হয়; তার জন্য আলাহিদা পয়সা খরচ করিয়া কিনিতে হয় না। পোষাকগুলি নিত্য নিত্য আপনারাই সাবান জলে কাচেন। এই সকল কাজের মাঝেও ছেলে মানুষ করার প্রথা এমন পরিপাটি যে দুই কাজই একত্রে সুশৃঙ্খলায় চলে। ছেলেগুলিও সেখানে সব সুশিক্ষিত ও সুস্থ। বাল্য-শিক্ষার স্কুলে তাহারা সকলে বেশ নিয়মবদ্ধরূপে পড়ে, খেলে ও কাজ করে। শিশুকে বড় একটা কাঁদিতে দেখা যায় না। তাহাদের এমন অভ্যাস করান হয় যে যথাসময়ে মল মূত্র ত্যাগ করিবে;—কোন বিষয়েই অনিয়ম নাই; সব কাজে ধরা বাঁধা। এই সকল অত্যাশ্চর্য্য অভ্যাস কেবল শিশুকে শেখানর গুণে হইয়াছে। আমাদের এই অনবরত "ছেলে-কাঁদার দেশের" শিক্ষিতা জননীদের সামান্য চেষ্টায় এইরূপ ছেলের অভ্যাস হওয়া সহজেই সম্ভব। সেখানকার শিশু এমন সুবাধ্য বলিয়াই সংসারের সকল কাজে এমন শৃঙ্খলা। তাই সেখানে দেখা যায় কার্য্যের অবসরে ঠেলাগাড়ী করিয়া খোকা খুকী লইয়া মা বেড়াইতে চলিয়াছেন আর তাঁর পাশে পাশে আরও অনেকগুলি ছেলে মেয়ে পুতুল হাতে করিয়া প্রসন্ন মনে বেড়াইতে চলিয়াছে;—কেহ কোনো গোলমাল করিতেছে না। সংসারের এ সব কাজ পিতাকে কিছুই দেখিতে হয় না। তিনি সমস্ত দিন অক্লান্তভাবে খাটিয়া সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরেন। অনেক সময় তাঁহার বাড়ী ফিরিবার সময় তাঁহার স্ত্রী শিশুগুলিকে লইয়া পথে অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন। দেখা হইলেই সবাইকার মুখে মুখে চুমু দিয়া সম্ভাষণ। এমন যে সকল পরিবারে হয় তাহা নয়; তবে এ সুমধুর দৃশ্য অহরহই দেখা যায়। শিক্ষিত দেশে তাহারা এমনি করিয়াই স্বাধীন, কর্ম্মঠ ও আনন্দপূর্ণ ভাবে তাহাদের সংসার গড়িয়াছে।

আর দুই একটি কথা বলিলেই আমার এই প্রবন্ধ শেষ হয়। সে দেশের ছেলেদের এত রোগ হয় না; আমাদের গরম ও অস্বাস্থ্যকর এদেশের মত সেখানে এত অকাল মৃত্যু ও চিররোগ নাই। সে দেশের স্বাস্থ্য বড়ই ভাল। আর রাজ্যের কর্ম্মচারীরা এমন ঘুসখোর নয়। সুতীক্ষ্ণ নয়নে সব বিষয় পর্য্যালোচনা করেন। ভেজাল দেওয়া খাবার সে তল্লাটে পৌঁছিতে পারে না। কোন রূপ সংক্রামক রোগ হইলে তাহা প্রকাশ্য স্থানে লিখিয়া সকলকে সাবধান করিয়া দেওয়া হয়। তাহাতে লোকে ঘরে ঘরেই পূর্ব্ব হইতেই তাহার প্রতিবিধান করিতে পারে।

আমাদের দেশে ও তাঁহাদের দেশে স্ত্রী-জাতির অবস্থায় এই যে অসীম প্রভেদ তাহা কেন হইল? তাঁহাদের দেশের জাতিগত বিশেষত্ব এই যে, সে দেশের লোকেরা জ্ঞানের ও উদ্যমের পক্ষপাতী—সকল বিষয়ে চোখ চাহিয়া পথ চলেন। আমাদের এদেশের মত কল্পনা ও ভাবে বিভোর হইয়া পথ হারান না। আমাদের মত তাঁহারা এত হানিকর কুসংস্কারের দাস নহেন। দেশের রাজার চেষ্টা দেশে সমতা, একতা ও সাধারণ-লোক-শিক্ষা-প্রচার। সেই মহৎ চেষ্টার ফলেই এই বর্ত্তমান সুখশান্তি ও সমৃদ্ধি।

ইউরোপের সকল দেশের লোক-সংখ্যার তালিকায় দেখা যায়—পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী এবং আয়ুও

তাঁহাদের বেশী। কিন্তু আমাদের দেশের তালিকায় ঠিক ইহার উল্টা। দেশের নানারূপ কঠোর নিয়মানুসারে আমাদের দেশের স্ত্রী-জাতিকে কতই না কষ্ট সহ্য করিতে হয়;—এই জন্যই আমাদের দেশের রমণীদের মৃত্যু এত বেশী এবং তাঁহাদের সংখ্যা পুরুষের তুলনায় এত স্বল্প।

"The hand that rocks the cradle rules the world."

—তাঁদের দেশের স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে এই মূল মন্ত্রকে কার্য্য-ক্ষেত্রে কখনো অমান্য করা হয় না; কিন্তু আমাদের দেশের তদপেক্ষা সুললিত ভাষায় লেখাগুলি সব ব্যর্থ হইয়া আছে :—

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র সম্পদা।"

শেষ কথা, পৃথিবীর অভিব্যক্তিবাদের ইতিহাসে দেখা যায় যে, উন্নতিশীল ও সমৃদ্ধি-বিশিষ্ট জাতিদের সুপ্রথাগুলি অনুকরণ করিয়াই অপেক্ষাকৃত কম উন্নত জাতির অভিব্যক্তি হয়। আমাদের দেশেও সেইরূপ না করিলে এ দেশের আর নিস্তার নাই।

শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।

কালিদাসের নাটক

শকুন্তলা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কালিদাস তাঁহার বিষয়টিকে কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ করিয়াছেনঃ আশ্রমে দুষ্মন্তের আগমন হইয়া প্রথম অঙ্কের আরম্ভ এবং রাজা যখন তাঁহার শিশুপুত্রকে পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন, তখনই নাটকের শেষ। কবির একটি গুণপনা এই-খানে লক্ষ্য করা আবশ্যক,—কালব্যবধান স্পষ্টরূপে কোথাও তিনি নির্দ্দেশ করেন নাই;—সর্ব্বত্রই ঐ কথাটা এড়াইয়া গিয়াছেন। দেখা যায়, অঙ্কগুলি পরস্পরের সহিত অনুস্যূত,—ধারাবাহিকতার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। এবং যে দর্শক, তৃতীয় অঙ্কে শকুন্তলাকে বিবাহ করিতে দেখিয়াছে, পঞ্চম অঙ্কে তাহাকে গর্ভবতী হইতে দেখিয়াছে, সেই দর্শক যখন আবার সপ্তম অঙ্কে শকুন্তলার দৃঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ পুত্রকে সিংহের সহিত লড়াই করিতে দেখে, তখন সে কিছুমাত্র বিস্মিত হয় না। একথা সত্য, কালিদাস নৈপুণ্যসহকারে প্রত্যাখ্যাতা পত্নীকে একটা সমস্ত অঙ্ক হইতে অন্তর্হিত করিয়া দিয়াছেন; সপ্তম অঙ্কে, একটা অনির্দ্দিষ্ট অস্পষ্ট কালের জন্য শকুন্তলাকে যেন তরল তরঙ্গের উপর ভাসাইয়া রাখিয়াছেন; ঐ অঙ্কের শেষভাগে, বিস্ময়রসের একটু পূর্ব্বাস্বাদ দিয়া দর্শককে পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত রাখিয়াছেন, এবং সপ্তম অঙ্কের দৃশ্যটিকে স্বর্গে লইয়া গিয়াছেন,—এমন একটি রহস্যময় পুণ্য-লোকে লইয়া গিয়াছেন, যাহা পৃথিবী হইতে বহুদূরে, এবং যেখানে আর কাল গণনা হয় না। কবি পৌরাণিক কাহিনীর ঘটনাগুলি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রতিভার প্রেরণাবলে তাঁহার কল-কাঠিটি বদলাইয়া দিয়াছেন। মহাভারতের আখ্যানে অনেকগুলি ঘটনা আছে যাহার কোন

হেতুনির্দ্দেশ বা ব্যাখ্যা নাই। কিন্তু শ্রোতা অপেক্ষা দর্শকের কৈফিয়তের দাবী একটু বেশী। দর্শকেরা জিজ্ঞাসা করে, শকুন্তলাকে দুষ্মন্ত কেন ভুলিলেন?—কোন উত্তর পায় না। শকুন্তলা তাহার শিশুটিকে লইয়া উপস্থিত হইলে দুষ্মন্ত যখন তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন, তখন কোন প্রকার রাজনৈতিক হেতু দেখাইয়া রাজার এই জঘন্য আচরণের দোষক্ষালন করা যায় না। উভয়ের প্রতি উভয়ের প্রেম অক্ষুণ্ণ ছিল ইহাই দাঁড় করাইবার জন্য কালিদাস উভয়কেই শাপগ্রস্ত করিয়াছেন। শাপগ্রস্ত না হইলে, তাঁহাদের প্রেমপথে কোন বাধা পড়িত না; এবং এই অভিশাপও একটা ঘটনাচক্র হইতে উৎপন্ন,—ইহা একটা সামান্য আকস্মিক ঘটনামাত্র নহে। শকুন্তলা যখন প্রেমে বিভোর হইয়া একাগ্রচিত্তে স্বীয় প্রেমাস্পদের ধ্যান করিতেছিল, সেই সময় একজন তাপসের আহ্বান সে শুনিতে পায় নাই। সুতরাং অজ্ঞাতসারে আতিথ্যধর্ম্মপালনে তাহার ত্রুটি হয়। তাপস তাহাকে এই অভিশাপ দিলেন—সেও তাহার পতিকর্ত্তৃক বিস্মৃত হইবে। ভারতবর্ষে মুনিঋষির এইরূপ প্রচণ্ড ক্রোধ কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নহে, বিশেষতঃ সর্ব্বাপেক্ষা কোপনস্বভাব দুর্ব্বাসা মুনির পক্ষে ইহা ত খুবই স্বাভাবিক; কিন্তু কালিদাস দুর্ব্বাসাকে রঙ্গভূমিতে আনেন নাই, দুর্ব্বাসার বাক্য কেবল নেপথ্য হইতে শ্রুত হইয়াছিল। তা ছাড়া, এই কষ্টকর ব্যাপারের তীব্রতা কমাইবার জন্য মুনিবর তাঁহার অভিশাপজনিত ফলভোগের কাললাঘব করিতে সম্মত হইলেন। তিনি বলিলেন, বিবাহের নিদর্শনস্বরূপ রাজা শকুন্তলকে যে অঙ্গুরীটি দিয়াছিলেন, সেই অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীটি রাজাকে দেখাইবামাত্র শাপের অবসান হইবে। কিন্তু শকুন্তলা, অঙ্গুরীটি স্নান করিবার সময় হারাইয়া ফেলে। দুষ্মন্তের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া শকুন্তলা অনেক তর্কবিতর্কের পর শেষে প্রত্যক্ষ ভৌতিক প্রমাণের দ্বারা রাজার বিশ্বাস উৎপাদন করিতে যখন ইচ্ছা করিল, তখন অঙ্গুরীটি খুঁজিয়া পাইল না। কাজেই রাজা, স্ত্রীস্বভাবসুলভ শঠতার উল্লেখ করিয়া শকুন্তলাকে উপহাস করিবার ন্যায্য অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। পরে এক ধীবর ঐ অঙ্গুরীটি এক মৎস্যের উদরে প্রাপ্ত হইয়া রাজার নিকট আনিল, তখন রাজা তাঁহার ভ্রম উপলব্ধি করিলেন। ঐ ভ্রমের জন্য রাজার কোন দায়িত্ব ছিল না। অবশ্য এই অভিজ্ঞান-চিহ্নের কথা এই সর্ব্বপ্রথম দুষ্মন্ত-কাহিনীর মধ্যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং ইহা কালিদাসের রচনাবলীর একটি বিশেষ-লক্ষণ। কেননা, কবি এই নাটকের নামকরণেই ইহার নির্দ্দেশ করিয়াছেন:—অভিজ্ঞান-শকুন্তলা। আমরা এই নাটকীয় কৌশলের প্রয়োগ বিক্রমোর্ব্বশীতে ("সংগমন-মণি") আবার দেখিতে পাই। রত্নাবলী প্রভৃতি উত্তরবর্ত্তী নাটককারদিগের নাটকেও এইরূপ প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়।

সাত অঙ্কের পুষ্টিসাধনার্থ অথবা দর্শকের ঔৎসুক্যবৃদ্ধির নিমিত্ত, প্রচলিত নাট্যশাস্ত্রের নিয়মানুসারে, কালিদাস একদিকে এই পাত্র-গুলির অবতারণা করিয়াছেন:—যথা, বিদূষক মাধব্য, বৃদ্ধ কঞ্চুকী, রাজপুরোহিত সোমরত, নগরপাল ও তাহার দুই সহকারী, দূত করভক,

দৌবারিক রৈবতক, দুইজন বৈতালিক। অন্য দিকে—নায়িকার সখিদ্বয় অনুসূয়া ও প্রিয়ম্বদা, প্রতিহারী বেত্রবতী, অন্তঃপুরের পরিচারিকাগণ :—চতুরিকা, মধুকরিকা, পরভৃতিকা; বৃদ্ধা তাপসী গৌতমী, কণ্বমুনি, কন্বমুনির চার শিষ্য শারঙ্গরব শারদ্বত হারীত গৌতম। কবি, নিম্নশ্রেণী লোকদিগের মধ্য হইতে ধীবরের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন এবং দিব্যধামবাসী দেবযোনিদিগকে রঙ্গভূমে অবতারণা করিয়াছেন :—ইন্দ্রের সারথি মাতলি; মারিচ ও তাঁহার পত্নী অদিতি;—জগতের পূজনীয় জনকজননা; অপ্সরা মিশ্রকেশী, মেনকার সখী। এই পাত্রগণের মধ্যে প্রত্যেকেরই একটা স্বাতন্ত্র্য আছে, একটা পার্থক্য আছে। অনুসূয়া ও প্রিয়ম্বদা দুইজনই শকুন্তলার একান্ত অনুগতা সখী হইলেও উহাদের সখ্যের মধ্যেও একটু সুকুমার বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়; অনুসূয়া গম্ভীর-প্রকৃতি ও চিন্তাশীলা; প্রিয়ম্বদা "বড় দুষ্টু," রঙ্গময়ী ও পরিহাসপ্রিয়। ঐরূপ, শারদ্বত ও শারঙ্গরব—যাহারা শকুন্তলাকে সঙ্গে করিয়া রাজপ্রাসাদে লইয়া যায়, উহাদের মধ্যে একজন শান্তপ্রকৃতি ও অল্প কথায় অর্থগর্ভ বাক্য প্রয়োগ করে এবং আর একজন উদ্ধত ও কোপনস্বভাব। মারীচ ও অদিতির চরিত্রে একটা প্রশান্ত উন্নতভাব, একটা পবিত্র গাম্ভীর্য্য প্রকাশ পায়। শিশুর বীরত্ব ভংতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভয়ে কম্পমান দীনপ্রকৃতি দরিদ্র ধীবরের সামনাসামনি নগর-রক্ষীদের নিষ্ঠুর ধরণধারণ, স্থূল আমোদ প্রমোদ এবং উহাদের রূঢ় অহঙ্কারও বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে।

সমস্ত বিষয়টির মধ্যে অলৌকিক বিস্ময়রস অনুপ্রবিষ্ট হওয়ায় পাছে মানবসুলভ হৃদয়-আবেগের তরঙ্গলীলার ব্যাঘাত ও মানবীয় ঔৎসুক্যের লাঘব হয় এই আশঙ্কা সহজেই হইতে পারে। কিন্তু কালিদাস এই বিস্ময়-রসকে গৌণভাবে কাজে লাগাইয়াছেন; কেবল যেস্থলে জটিল ঘটনাজালের গ্রন্থিউন্মোচনের জন্য আবশ্যক হইয়াছে, যে স্থলে রুচি ও শাস্ত্র উভয়ই অনুমোদন করিয়াছে, সেই স্থলেই কবি এই বিস্ময়রসের আশ্রয় লইয়াছেন। সর্ব্বত্রই অস্থায়ীভাবে দৈবের অবতারণা করা হইয়াছে; যে জগতে নাটকীয় কার্য্যটি ঘটিতেছে, দর্শককে উহা শুধু সেই জগৎকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। এইরূপ, প্রথম অঙ্কে শকুন্তলার বিবাহ সম্বন্ধে কণ্বের ভবিষ্যদ্‌বাণী; দ্বিতীয় অঙ্কে আশ্রমের বিঘ্নকারী রাক্ষসদিগের উল্লেখ; যে অশরীরী বাণী শকুন্তলার বিবাহ-ঘটনা কণ্বকে জানাইয়া দেয় সেই অশরীরী বাণী; যজ্ঞানুষ্ঠানকালের শুভ সূচনা; শকুন্তলার প্রতি বনদেবীগণের বিদায়-সম্ভাষণ; কোন অদৃশ্য দৈব শক্তির দ্বারা শকুন্তলার অন্তর্ধান; দুষ্মন্তের সাহায্যের জন্য ইন্দ্রকর্তৃক মাতলীকে প্রেরণ। ঘটনাগ্রন্থি উন্মোচন করিবার জন্যই দেবতারা কখন কখন মধ্যস্থ হইয়া মানবকার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। ষষ্ঠ অঙ্কে যাহার প্রবেশ দেখা যায় সেই অপ্সরা মিশ্রকেশী সাক্ষীরূপে সমস্ত কার্য্য দর্শন করিতেছেন মাত্র, তাহাতে লিপ্ত হইতেছেন না। তা ছাড়া, ইহাও তিনি দর্শকবৃন্দকে জানাইতে ত্রুটি করেন নাই যে, মেনকার অনুরোধে চর্ম্মচক্ষে সমস্ত দেখিবার জন্যই তিনি তাঁহার দিব্য-দৃষ্টিশক্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন। যে নাট্য-

কৌশল আমাদের অতিমার্জ্জিত রুচির নিকট নিতান্ত ছেলেমানুষি বলিয়া মনে হইতে পারে, তাহা ভারতবাসীর চোখে আদৌ বিসদৃশ বলিয়া ঠেকে না; পৌরাণিক কাহিনীতে,—সামান্য মানুষের সহিত মিশিবার জন্য, দেবতারা অনেক সময় ইচ্ছা করিয়াই স্বকীয় অতিপ্রাকৃত শক্তি হইতে আপনাদিগকে বঞ্চিত করিয়া থাকেন। এই নাটকে যে মুহূর্ত্তে নায়ক নায়িকাদের মধ্যে দৈবক্রমে সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছে, সেই মুহূর্ত্ত হইতে নায়ক নায়িকারা আপনারাই আপনাদের কার্য্য-পরিচালক এইরূপ মনে হয়। রাজা স্বেচ্ছাক্রমেই আশ্রমে রহিয়া গেলেন, শকুন্তলা স্বেচ্ছাক্রমেই আত্মসমর্পণ করিল। দুর্ব্বাসার শাপে এমন কিছুই ছিল না যাহাতে ভারতবাসী বিস্মিত হইতে পারে। নিজের দোষেই শকুন্তলা শাপগ্রস্তা হয়। তাছাড়া এই শাপে দুষ্মন্তের চিত্ত একেবারে অসাড় হইয়া গিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না, উহা যেন কুয়াসায় আচ্ছন্ন হইয়াছিল মাত্র। পঞ্চম অঙ্কে যখন রাজা, মহিষীর বিলাপ-গীতি শুনিতে পাইলেন, তখন একটা অস্পষ্ট বিষাদের ভাবে তাঁহার চিত্ত আচ্ছন্ন হইল; তিনি তাহার প্রকৃত হেতু উপলব্ধি করিতে পারিলেন না; কেবল একটা গভীর বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। এইটি বিশেষরূপে লক্ষ্য করা আবশ্যক—ঘটনার উপর মানুষের কিছুমাত্র কর্ত্তৃত্ব নাই; ঘটনার উপর মানুষ ক্রমাগত জয়লাভ করিতেছে ইহা যদি নাটকে প্রদর্শিত হয়, তাহা হইলে নাটক মিথ্যা হইয়া পড়ে। মানুষের উপর বাহ্যঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত প্রদর্শন করা,—বাহ্যঘটনার দ্বারা মানবচিত্তে যে সকল প্রচণ্ড আবেগ উৎপন্ন হয়, যে সকল উচ্চভাব উদ্দীপিত হয়, তাহা প্রদর্শন করাই নাট্যকলার উদ্দেশ্য।

শকুন্তলা নাটকের প্রধান রস—আদিরস; আলঙ্কারিকেরা প্রেমের যতগুলি অবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন, কালিদাস স্বকীয় নায়ক নায়িকাদের সেই সকল অবস্থায় বেশ নিপুণ-ভাবে স্থাপন করিয়াছেন। নাট্যশাস্ত্রে এই সম্বন্ধে যে সকল দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে, তৎসমস্তই এই শকুন্তলা-নাটকে একাধারে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কাব্যের অবস্থাবৈচিত্র্য প্রদর্শন করিবার জন্য সম্ভবতঃ কালিদাসকে বড় একটা কৌশল উদ্‌ভাবন করিতে হয় নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী আদর্শ প্রস্তুত থাকায় তাঁহার পক্ষে সুবিধা হইয়াছিল;—তিনি তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন মাত্র। যেস্থলে রাজা লতাগুল্মের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তিনটি তাপসকুমারীকে নিরীক্ষণ করিতেছেন, সেই প্রথম অঙ্কের সুন্দর দৃশ্যটি (তৃতীয় অঙ্কেও এইরূপ একটি দৃশ্য আছে), "মালবিকার" তৃতীয় অঙ্কে পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। "মালবিকায়" অগ্নিমিত্র লতাকুঞ্জে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া নায়িকার বিশ্রব্ধপ্রেমালাপের প্রতি কর্ণপাত করিতেছেন; এবং সেই প্রথম রচনার পরেও পুনর্ব্বার কবি শকুন্তলা-নাটকে যেরূপ দক্ষতাসহকারে ও সহজভাবে এইরূপ দৃশ্যের বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে উহা যে উভয় নাটকের সাধারণ সম্পত্তি তাহা বেশ হৃদয়ঙ্গম হয়।

যে সকল বিষয় প্রেমশাস্ত্রে সচরাচর বর্ণিত হইয়া থাকে, তাহার সহিত কালিদাস আরও এমন কতকগুলি বিষয় সংযুক্ত করিয়াছেন, যাহার দ্বারা তাঁহার গুণপনার

ও রচনাশক্তির বৈচিত্র্য বিশেষরূপে প্রকাশ পায়। রথ-গতির বর্ণনা, সায়াহ্নের বর্ণনা, পার্থিব তপোবন ও স্বর্গীয় তপোবনের বর্ণনা, —এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে নাটকীয় উপাদান তেমন কিছু নাই। এইগুলি যেন নাটকের অতিরিক্ত রচনা। উহা নাটকীয় পাত্রের উক্তি নহে, উহা স্বয়ং কবিরই উক্তি। কালিদাসের উত্তরবর্ত্তী নাটককারদিগের গ্রন্থে, এই সকল অতিরিক্ত রচনা, পরগাছার ন্যায়, উদ্দাম উদ্ভিজ্জের ন্যায় নাটককে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। কালিদাস এই আতিশয্য হইতে আপনাকে দূরে রাখিয়াছেন। তিনি তাঁহার শ্রোতৃমণ্ডলীর রুচিকে পরিতুষ্ট করিয়াছেন, অথচ দাসবৎ তাহার অনুসরণ করেন নাই। যে অঙ্কটি সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মস্পর্শী, সেই পঞ্চম অঙ্কে ওরূপ চিত্তরঞ্জক অলঙ্কার একটিও নাই। ঐ একই প্রকার দক্ষতা ও চতুরতার সহিত তিনি নটদিগের বিশেষত নটীদিগের সমস্ত প্রয়োজন সংসিদ্ধ করিয়াছেন। ভ্রমর-অনুসৃতা শকুন্তলার ভীতি নাট্যনর্ত্তকীকে স্বভাবতই নাচিবার একটা ছুতা দিয়া থাকে। বনদেবীদের গানে, রাণী হংসবতীর গানে, নাট্যাভিনয়ের সহিত কণ্ঠসংগীতের মোহিনীশক্তি সংযোজিত হইয়াছে। "শকুন্তলা" পরিণত বয়সের রচনা। কালিদাসের প্রতিভা, আলঙ্কারিকদিগের প্রাণহীন সূক্ষ্মতত্ত্বগুলিকে এক অমোঘ মন্ত্রের বলে যেন সজীব করিয়া তুলিয়াছে, এই সকল পাণ্ডুবর্ণ ও জড়বৎ অচল মূর্ত্তিগুলির মধ্যে প্রভূতপরিমাণে শোণিত সঞ্চালন করিয়াছে, জীবন উদ্যমের চাঞ্চল্য আনয়ন করিয়াছে, পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের বাঁধা-বাঁধি মামুলী আদর্শপাত্রদিগের স্থানে অস্থিমাংসময়, মনোময়, প্রাণময় জীবন্ত বাস্তব পাত্রদিগকে সংস্থাপন করিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মশক-সমস্যা

আরামের ব্যাঘাত এবং রোগের বিস্তার করিতে মশা মাছির ন্যায় আর দুইটি প্রাণী জীব জগতে আছে কিনা সন্দেহ। উভয়ে মিলিয়া মানুষের অনিষ্ট-সাধনের জন্য কি বিরাট অভিযানেই না ব্যাপৃত রহিয়াছে! উভয়ের মধ্যে শ্রমবিভাগের কি সুন্দর ব্যবস্থা! সমস্ত দিন মানুষকে আক্রমণের পর রাত্রে মাছি যখন ক্লান্ত হয়, তখন মশা অমনি তাহার স্থান অধিকার করে।

মশকের ক্রিয়াকলাপ যাঁহারা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন তাঁহারা বলেন—সাধারণত স্ত্রী-মশকের দংশনেই আমরা বিব্রত হইয়া থাকি। পুং-মশকেরা অনেকটা শান্ত, শিষ্ট, নিরীহ এবং ক্ষণস্থায়ী জীবনের ভঙ্গুরতা উপলব্ধি করিয়া সরস উদ্ভিদের রসাল রসেই সন্তুষ্ট; কিন্তু স্ত্রীমশকগণ সর্ব্বদা রক্তের অনুসন্ধানেই ঘুরিতেছে। সত্য বটে, লক্ষ লক্ষ মশক-নারী জীবনে শোণিতবিন্দুর আস্বাদ মাত্র না পাইয়াই মশকলীলা সম্বরণ করে,—কিন্তু যাহারা একবার রক্তের আস্বাদ পায়

তাহাদিগের হাত হইতে আর রক্ষা নাই। মশক-নারীদিগের শোণিতলোলুপতা পুং-মশকগণের মধ্যেও সংক্রামিত হইতেছে বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা মাঝে মাঝে শঙ্কা প্রকাশ করিতেছেন; কিন্তু তথাপি বিকৃতধর্ম্মী পুরুষ মশকের সংখ্যা এখনও এতই অল্প যে ইহাদের দ্বারা অনিষ্টের আশঙ্কা আপাতত বড় অধিক নাই।

মশক কুলের সংখ্যাধিক্যে বিরক্ত হইয়া, ইহাদের উৎপত্তি-রহস্য চিন্তায় যাঁহারা আকুল তাঁহারা অনাবৃত পয়ঃপ্রণালী এবং আবর্জ্জনাময় জলকুণ্ডগুলির প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিবেন। কেবল স্থির, অচঞ্চল জলেই মশকের উৎপত্তি সম্ভব। একটা মুখ-ভাঙ্গা বোতলের কয়েক-ইঞ্চি পরিমিত জলে যে মশক জন্মে, তাহাতে এক সপ্তাহ ধরিয়া একটা গৃহস্থ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতে পারে; এবং একটা কেরো সন টিনের আধ টিন ময়লা জলে এত মশক জন্মিতে পারে যে, তাহারা বংশ পরম্পরায় একটা বিস্তীর্ণ পল্লীকে সমস্ত গ্রীষ্ম কাল মধুর গুঞ্জনে গুঞ্জরিত করিয়া রাখিতে পারে।

শুধু দংশক বলিয়া নহে, রোগ সংক্রামক বলিয়াও মশকের একটা অপবাদ আছে। এ অপবাদ যে সম্পূর্ণ সত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। বৈজ্ঞানিকেরা নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণ করিয়াছেন যে, প্রধান তিন জাতীয় মশকের মধ্যে আনোফিলিস্ (Anopheles) জাতীয় মশক ম্যালেরিয়া বিস্তারক এবং ষ্টিগোমিয়া (Stegomia) জাতীয় মশক পীতজ্বর সংক্রামক। কুলেক্স (Culex) জাতীয় মশকের দ্বারা ডেঙ্গুজ্বরের বিস্তার হইতেছে বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা আপাতত সন্দেহ করিতেছেন। ক্রমে পর্য্যবেক্ষণের ফলে আরও বহু প্রকারের ব্যাধি, মশকের দ্বারা সংগৃহিত ও সঞ্চারিত হইতেছে বলিয়া যে পরে প্রকাশ পাইবে, তাহা আর বিচিত্র কি!

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মশক-কর্ত্তৃক রোগ বিস্তারের কথা যখন প্রথম আবিষ্কৃত হয়, তখন হইতে এ পর্য্যন্ত এই তথ্যের দ্বারা সভ্য জগতে বহু মঙ্গল সাধিত হইয়াছে। ম্যালেরিয়া এবং পীতজ্বরে দলে দলে লোক মরিতেছে বলিয়া যে পানামা-খাল খনন কার্য্য ফরাসীরা বহু অর্থব্যয়ের পর অবশেষে হতাশ ভাবে ছাড়িয়া দিলেন, আমেরিকাবাসীরা কেবল মশক-ধ্বংসের উপায় অবলম্বন করিয়া সেই বিরাট্ কার্য্য সুসম্পন্ন করিলেন। আমেরিকান্‌দের এই যে অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ হইল, ইহাতে বিচক্ষণ ইঞ্জিনিয়ারগণের যে অত্যদ্ভুত কৃতিত্ব, তাহা অপেক্ষা মশক-ধ্বংস-কার্য্যে ব্যাপৃত ডাক্তারগণের কৃতিত্ব যে কোন অংশে কম তাহা নহে। কার্য্যক্ষেত্রের দশ মাইলের মধ্যে যদি একটি মশক দেখা দিয়াছে বলিয়া রব উঠিয়াছে তো অমনি স্বাস্থ্যরক্ষক কর্ম্মচারী মোটরে করিয়া বায়ুবেগে তথায় গিয়া উপস্থিত। এরূপ করিয়াই না মনুষ্য-জীবন রক্ষা করিয়া পানামা খাল খনন সম্ভবপর হইয়াছে!

আমেরিকার হাভানা, নিউ অর্লিয়েন্স প্রভৃতি নগর পূর্ব্বে ম্যালেরিয়ার লীলাক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল; মিউনিসিপ্যালিটি এবং চিকিৎসকগণের প্রণালীবদ্ধ তত্ত্বাবধানের ফলে আজ ঐ সকল স্থান মশকশূন্য হইয়া স্বাস্থ্যনিবাসে পরিণত হইয়াছে।

এমন কি, পূর্ব্ব-আফ্রিকার একটি ক্ষুদ্র সহরে সম্প্রতি মশক-ধ্বংসের জন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছে; এবং সেখানকার অধিবাসীরা মশক-নিবারণ-কার্য্যে মিউনিসিপ্যালিটিকে সাহায্য করিতে আইন অনুসারে বাধ্য।

মশক স্বয়ং রোগের উৎপাদন করে না সত্য কিন্তু মশক না থাকিলে জ্বররোগ কখনই এত সংক্রামক ও প্রবল হইতে পারিত না। ইহা নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, যে যে স্থানে মশকবংশ ধ্বংশ করা হইয়াছে, সেই সেই স্থানে জ্বররোগের সংখ্যা অত্যাশ্চর্য্যরূপে হ্রাস পাইয়াছে। মশকের জীবন-যাত্রাপ্রণালী একবার জানা হইলে, ইহাদিগকে বিনাশ করা বড় কঠিন নহে। এই হেতু মশকসম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়-গুলি সাধারণের জ্ঞানগোচর করা সর্ব্ব প্রথম কর্ত্তব্য।

মশক-জাতির উৎপত্তি বৃত্তান্ত বিস্ময় উদ্দীপক। পূর্ণাঙ্গ মশক একেবারে মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয় না। পরিণত কলেবর লাভ করিবার পূর্ব্বে মশকের কয়েকটি অবস্থান্তর ঘটিতে দেখা যায়;—মশক-ভ্রূণকে বিভিন্ন অবস্থা অতিক্রম করিতে হয়। প্রবন্ধনিবিষ্ট চিত্র দুইটি অনুধাবন করিয়া দেখিলে পাঠকবর্গ মশকের ডিম্বাবস্থা হইতে পূর্ণাবস্থা প্রাপ্তি-কালের অবস্থান্তর-রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

মশক-স্ত্রী জলের উপরিভাগে গুচ্ছ গুচ্ছ ডিম্ব প্রসব করে। অনন্যসাধারণ উৎপাদিকা-শক্তির গুণে প্রতি প্রসবে ঐ সকল ডিম্বের সংখ্যা তিন শত পর্য্যন্ত হয় এরূপ দেখা গিয়াছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ডিম্বগুলি ফুটিয়া উঠে, এবং উহাদের মধ্য হইতে স্ক্রুর ন্যায় মোচড়ান দেহ-বিশিষ্ট এক প্রকার কীট বিনির্গত হয়। ড্রেনে, আবদ্ধ-সরোবরে, জলপূর্ণ টিন বা অন্যান্য পাত্রে এইরূপ শত শত কীট অনেকে দেখিয়া থাকিবেন। ইহারা নিশ্বাস গ্রহণের জন্য থাকিয়া থাকিয়া জলের উপর ভাসিয়া উঠে। লেজে ক্ষুদ্র নলের ন্যায় যে পদার্থ জুড়িয়া থাকে, উহাই উহাদের নাসিকা। মাথা নীচু করিয়া এবং লেজ উপরে তুলিয়া ঐ নলের সাহায্যে ইহারা শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করে। জল মধ্যে গলিত উদ্ভিদাদির রস এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটাণু খাইয়া ইহারা বাড়িতে থাকে। এই-রূপে, মাঝে মাঝে খোলস ছাড়িয়া, প্রায় দশ দিনের পর ঐ সকল অণ্ডনির্ম্মুক্ত কীট গোল মস্তকবিশিষ্ট ক্ষুদ্র গুটিবিশেষে পরিণত হয়। এই গুটির শ্বাসনালী মস্তকের উপর সন্নিবিষ্ট থাকে। এইরূপে ক্রমে ডিম্ব হইতে কীটে এবং কীট হইতে গুটিবিশেষে পরিণত হইবার দুই দিবস পরে মশক-ভ্রূণের শেষ রূপান্তর পরিদৃষ্ট হয়। তখন গুটিটি জলের উপর ভাসিয়া উঠে এবং পূর্ণাঙ্গ মশকশিশু গুটির আবরণ ভেদ করিয়া বিনির্গত হয়।

মশক-জীবনের এই সকল বিকাশ ও পরিণতি খুবই কৌতুকজনক। কেহ ইচ্ছা করিলে একটা বিস্তৃত-মুখ জলপাত্রে কতক-গুলি মশক ডিম্ব ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। গুটি ভেদ করিয়া মশক যাহাতে বাহির হইয়া যাইতে না পারে, তজ্জন্য জলপাত্রের মুখ জাল দিয়া আবৃত করা আবশ্যক। পুং-মশক হইতে স্ত্রী-মশক বাছিয়া লওয়া কঠিন নহে। রেফ দেখিয়া উহাদের পার্থক্য উপলব্ধি করা যায়। পুরুষের রেফ

পালকযুক্ত—হংসপুচ্ছের ন্যায়; স্ত্রীমশকের রেফ পালকবিহীন।

উপরি উক্ত জন্মবৃত্তান্ত হইতে আমরা মশকদিগের মৃত্যুবাণের সন্ধান প্রাপ্ত হই। যখন দেখা যাইতেছে যে, মশক ফুটিয়া বাহির হইতে ডিম্বের অন্ততঃ দশ দিন স্থির

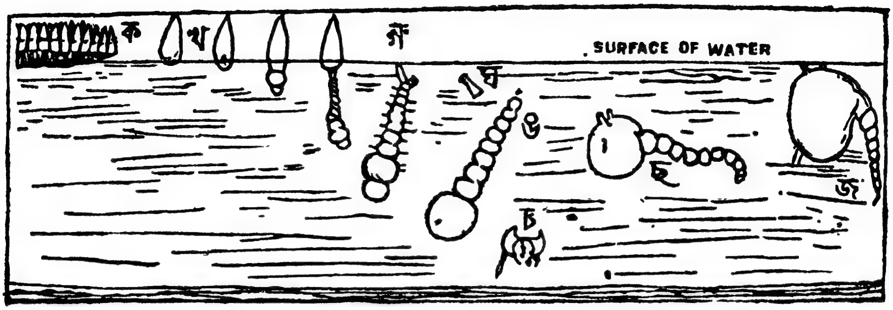

(ক) নৌকাকৃতি, ভাসমান, মশক-ডিম্ব-গুচ্ছ।

(খ) জলের উপর ভাসমান ঐরূপ একটি মশক-ডিম্ব।

(গ) মশকের পোকা-অবস্থা, ডিম্বনির্ম্মুক্ত মশক কীট। লেজসন্নিবিষ্ট নাসিকা দ্বারা বায়ু হইতে শ্বাস গ্রহণ করিতেছে।

(ঘ) মশক-কীটের শ্বাস-নালী বা নাসিকা (মশকের কীটাবস্থা হইতে গুটিপোকার অবস্থায় পরিণত হইবার পূর্ব্বে এই শ্বাসনালী খসিয়া পড়ে)।

(ঙ) মশক-কীটের অন্যবিধ রূপান্তর।

(চ) মশক-কীটের বিচ্ছিন্ন মুণ্ড।

(ছ) মশকের গুটি-পোকা অবস্থা (এই গুটির শ্বাসনালী মস্তকে সন্নিবিষ্ট থাকে)।

(জ) পূর্ব্বোক্তরূপ একটি শিশু গুটি নিশ্বাস লইতেছে।

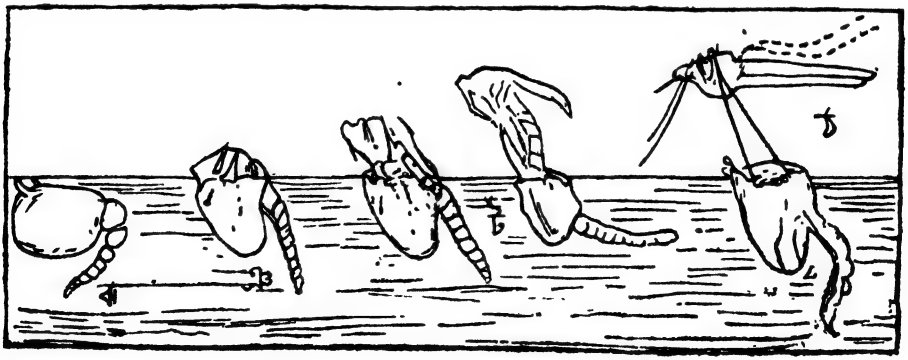

(ঝ) পরিণত-কলেবর মশক-গুটি।

(ঞ) গুটি হইতে পূর্ণাঙ্গ মশক ফুটিবার উপক্রম হইয়াছে।

(ট) মশক সম্পূর্ণরূপে ফুটিয়া জল হইতে ঊর্দ্ধে অবস্থিত রহিয়াছে।

(ঠ) মশক ফুটিয়া উড়িয়া যাইতেছে; ভাসমান গুটির খোলস জলের উপর পড়িয়া রহিয়াছে।

জলে থাকা নিতান্ত আবশ্যক, তখন সপ্তাহে সপ্তাহে একবার করিয়া আবর্জ্জনাপূর্ণ আবদ্ধ জলরাশি পরিষ্কার করিয়া দিলে, মশক-কুলের ধ্বংসের পথ নিশ্চয়ই অনেকটা সুপ্রশস্ত হয়। বৃষ্টির পর যে যে স্থানে জল দাঁড়ায়, সেই স্থান গুলি মাটি দিয়া ভরিয়া দেওয়া কিংবা তাহাদের জল সেচিয়া দেওয়া আবশ্যক; যে সমস্ত পাত্রের জল কোন ব্যবহারে আসে না, তাহা শূন্য করিয়া ফেলিতে হইবে; বাসনাদি ধৌত করিবার জন্য যে চৌবাচ্ছা ব্যবহৃত হয়, তাহা পুনরায় জল পূর্ণ করিবার পূর্ব্বে, অবশিষ্ট জল নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে;—এইরূপ ব্যবস্থা করিলে, মশক-কুল তাহাদের বংশবৃদ্ধি করিবার পক্ষে যথেষ্ট সময় পাইবে না। কেরোসিন তৈল মশক-বীজ বিনাশের এক অব্যর্থ মহৌষধ। বাড়ীতে যাহাদের লোহার চৌবাচ্ছা (Iron-tank) আছে, তাঁহারা এক চামচ কেরোসিন তৈল জলের উপর ফেলিয়া দিবেন; তৈল জলের উপর ভাসিতে থাকিবে, সুতরাং নীচের নল দিয়া জল বাহির করিয়া লইলে, জলের কোন ক্ষতি হইবে না; অথচ অণ্ডনির্ম্মুক্ত মশক কীটগুলি যখন শ্বাসগ্রহণ করিতে জলের উপর ভাসিয়া উঠিবে, তখন কেরোসিন তৈলের সংস্পর্শমাত্রই স্নায়বিক বিক্ষেপ হেতু সঙ্গে সঙ্গে মরিয়া যাইবে। মশক অধিক দূর উড়িয়া যাইতে অক্ষম; সুতরাং কতকটা স্থান ব্যাপিয়া এই সকল প্রতিষেধক উপায় অবলম্বন করিলেই সেই স্থান একেবারে মশক শূন্য হইবে।

যাঁহারা মনে করেন গায়ে কোনরূপ ঔষধ বা প্রলেপ মাখাইলে মশক-বিষ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়, তাঁহারা ভ্রান্ত। মশকের হুল $\frac{1}{3\cdot 6}$ ইঞ্চি লম্বা। মশক ইহার সমস্তটাই রক্তের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেয়। রক্ত তরলতর হইলে শোষণ করিবার পক্ষে সুবিধা হয়; এজন্য মশকের হুলে বিষ থাকে। সুতরাং বিষ একবার রক্তের সহিত মিশিয়া যাইলে, চর্ম্মের উপর প্রলেপ লাগাইয়া বিশেষ কোন ফল নাই। কর্পূর, মেনথল, লবঙ্গ-নির্য্যাস প্রভৃতি সামগ্রী মশকের দংশন-জ্বালা উপশম করে, কিন্তু বিষ নষ্ট করে না।

যাহা হউক, রোগের প্রশমন অপেক্ষা প্রতিষেধই ভাল। এবং যখন মশক নিবারণ সমস্যা তত গুরুতর নহে, তখন এবিষয়ে অনতিবিলম্বে সুব্যবস্থা হওয়া উচিত।

ব্যক্তিগত চেষ্টায় মশকধ্বংসের প্রয়াস সম্পূর্ণ নিষ্ফল;—কেবল নিজের ঘরে মশক নিবারণের চেষ্টা করা অনর্থক পণ্ডশ্রমমাত্র। স্বগৃহ মশকনির্ম্মুক্ত হইলেও, প্রতিবেশীদিগের অযত্নে যে সহস্র সহস্র মশক প্রতিদিন জন্মলাভ করিতেছে, তাহাদের দংশন জ্বালা হইতে মুক্তিলাভের উপায় কি? সুতরাং অন্যান্য সর্ব্ববিধ কার্য্যের ন্যায় মশকধ্বংস ব্যাপারেও সমবেত চেষ্টাই দরকার। পক্ষান্তরে, বাধ্য না হইলে অধিকাংশ ব্যক্তিই স্বাস্থ্যবিষয়ক কোনপ্রকার প্রচেষ্টাতেই যোগদান করিতে পরাঙ্মুখ; এই হেতু মশকধ্বংসের অভিযান কর্তৃপক্ষগণের দ্বারাই নির্ব্বাহিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

যদি আমাদের দেশের মিউনিসিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও লোকাল বোর্ডসমূহ আবশ্যকীয় উপবিধি প্রণয়ন এবং উপদেশসম্বলিত পুস্তিকা বিতরণ করিয়া মশকধ্বংসকার্য্যে ব্রতী হয়েন

এবং উপদেশসমূহ কার্য্যে পরিণত হইতেছে কিনা দেখিবার জন্য তাঁহাদের নিযুক্ত পরিদর্শকগণের সতর্ক দৃষ্টির অভাব না হয়, তাহা হইলে মশক সমস্যা নিরাকৃত হইয়া আমাদের এই ব্যাধিপীড়িত মাতৃভূমি যে বহুবিধ কষ্টকর জ্বররোগ হইতে মুক্তিলাভ করিবে, তাহা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে।

শ্রীদীনবন্ধু সেন।

শারীর স্বাস্থ্য-বিধান

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(১৪)

সংক্রামক রোগ নিবারণের ব্যবস্থা

মশা, মাছি প্রভৃতি যে সকল ক্ষুদ্র প্রাণীর সাহায্যে সংক্রামক রোগের বিস্তৃতি সাধিত হয়, তাহাদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি প্রত্যক্ষভাবে, অপরগুলি পরোক্ষভাবে রোগ-বিস্তারের সহায়তা করিয়া থাকে। মশক প্রভৃতি কতকগুলি কীট দংশন দ্বারা রক্তের সহিত রোগের বীজ মিশ্রিত করিয়া দেয়। সাধারণ মাছি, পিপীলিকা প্রভৃতি প্রাণীসমূহ প্রত্যক্ষভাবে শরীরের মধ্যে রোগের বীজ প্রবেশ করাইয়া দেয় না; তাহারা পদ, শুঁয়া বা অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির দ্বারা রোগের বীজ একস্থান হইতে অন্য স্থানে বহন করিয়া লইয়া যায় এবং এই অবস্থায় উহারা আমাদিগের খাদ্যাদির সংস্রবে আসিলে তন্মধ্যে রোগের বীজ সংলগ্ন হইয়া যায়। ঐ খাদ্য আমাদিগের উদরস্থ হইলে আমরা ঐ সকল রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকি।

১। মশক (Mosquitoes)—ইহাদিগের মধ্যে বিস্তর জাতিবিভাগ আছে। অবশ্য সকল জাতি মশকই রোগ-বিস্তারের সহায়তা করে না। এনোফিলিস্ (Anopheles) জাতীয় মশকের দ্বারা ম্যালেরিয়া জ্বর, কিউলেক্স (Culex) জাতীয় মশকের দ্বারা কাইলিউরিয়া (Chyluria, গোদ প্রভৃতি রোগ, এবং ষ্টেগোমিয়া (Stegomia) জাতীয় মশকের দ্বারা ইয়োলো ফিভার্ (Yellow fever) একব্যক্তি হইতে অন্য ব্যক্তিতে সংক্রামিত হইয়া থাকে। ম্যালেরিয়া জ্বরের সহিত এনোফিলিস্ জাতীয় মশকের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। ম্যালেরিয়া জ্বরের উৎপত্তি সম্বন্ধে দূষিত জলপান, দূষিত বায়ুসেবন প্রভৃতি যে সকল কারণ কিছুদিন পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করা হইত, এক্ষণে অভ্রান্তরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে ইহাদের মধ্যে একটিও ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকৃত কারণ নহে। যেখানে মশা নাই, সেখানে ম্যালেরিয়াও নাই, ইহাই বর্ত্তমান বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত।

এস্থলে বলা কর্ত্তব্য যে স্ত্রী মশকদিগেরই জিঘাংসাবৃত্তি অতিশয় প্রবল। মশকীরাই রক্ত শোষণ করে এবং ইহাদিগের দংশন দ্বারাই ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগের বিস্তার

ঘটিয়া থাকে। মশক বেচারিরা এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরপরাধ।

২। মিজেস্ (Midges)—ইহারাও মশক জাতীয় কিন্তু মশক অপেক্ষা আয়তনে অনেক ক্ষুদ্র। ইহাদের খাদ্য গলিত উদ্ভিদ্। ইহাদিগের মধ্যে জাতি-বিভাগ আছে; প্রায় সকলগুলিই জলের মধ্যে ডিম পাড়িয়া থাকে। ইহারা দংশন দ্বারা পেলাগ্রা (Pellagra—আমবাতের ন্যায় রোগবিশেষ) নামক রোগ-বিস্তারের সহায়তা করিয়া থাকে।

৩। সাণ্ড্ফ্লাই (Sand fly)—ইহারা আকৃতিতে মশকের ন্যায় কিন্তু আয়তনে তদপেক্ষা এত ছোট যে "নেটের" মশারির ছিদ্র দ্বারাও ইহারা ভিতরে প্রবেশ করিয়া বড় জ্বালাতন করিয়া থাকে। মশকীর ন্যায় ইহাদিগের স্ত্রীজাতিই দংশনপটু এবং দংশন দ্বারা তিন হইতে পাঁচ দিন স্থায়ী এক প্রকার জ্বর-রোগের বীজ রোগীর শরীর হইতে সুস্থ শরীরে প্রবেশ করাইয়া দেয়। অন্ধকারময় শীতল আর্দ্রস্থানে ইহারা দিবাভাগে থাকিতে ভালবাসে। তরকারীর খোসা ইত্যাদি উদ্ভিজ্জ আবর্জ্জনা ইহাদিগের প্রধান আহার; যে সকল স্থানে এইরূপ আবর্জ্জনা নিক্ষিপ্ত হয়, তথায় ইহারা অবস্থিতি করে এবং ডিম পাড়ে। অতএব এই জাতীয় আবর্জ্জনা যাহাতে বাটীর সন্নিকটে সঞ্চিত না থাকে, তাহার উপায় অবলম্বন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

৪। ফ্লী (Flea)—ইহারা একজাতীয় পোকা; ইহাদিগের ডানা নাই। ইহাদিগের মধ্যে নানা জাতিবিভাগ আছে। কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি কতকগুলি গৃহপালিত পশুর শরীরে এই জাতীয় পোকা বাস করিতে দেখা যায় কিন্তু উহাদিগের দ্বারা মানুষের কোন অনিষ্ট সাধিত হয় না। যে জাতীয় পোকা ইন্দুরের শরীরে বাস করে (Rat flea), তাহারাই দংশন দ্বারা প্লেগগ্রস্ত ইন্দুরের শরীর হইতে মনুষ্য শরীরে প্লেগের বীজ প্রবেশ করাইয়া দেয়। এতদ্ব্যতীত আফ্রিকা মহাদেশে সাণ্ড্ফ্লী (Sand flea) বা চিগর্ (Chigger) নামক এই জাতীয় পোকাকে বালুকাময় ভূমির মধ্যে বাস করিতে দেখা যায়; ইহাদিগের দংশনে একপ্রকার ক্ষত রোগ ও জ্বর উৎপন্ন হয়।

৫। ছারপোকা (Bed-bug)—কোন কোন ডাক্তারের মতে আসামের বিষম কালাজ্বর (Kala-azar) ছারপোকার দংশন দ্বারা রোগীর শরীর হইতে সুস্থ ব্যক্তির শরীরে সংক্রামিত হইতে পারে, তবে এ সম্বন্ধে সুনিশ্চিত মীমাংসা এ পর্য্যন্ত হয় নাই। কেহ কেহ বলেন যে কুষ্ঠ রোগও ছারপোকা দ্বারা বিস্তৃতি লাভ করিয়া থাকে। যাহা হউক, বিছানা মাদুরে অথবা বসিবার আসনাদিতে ছারপোকা যাহাতে কোন মতে থাকিতে না পারে, তদ্বিষয়ে সবিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। ছারপোকা একবার জন্মিলে তাহার নির্ম্মূল করা বড়ই কঠিন ব্যাপার, বিশেষতঃ ইহারা বহুদিন পর্য্যন্ত উপবাস করিয়া (অর্থাৎ রক্ত পান না করিয়াও) বাঁচিয়া থাকিতে পারে।

৬। টিক্স্ (Ticks)—ইহারা মাকড়সা জাতীয় অতিক্ষুদ্র পোকাবিশেষ; ইহারাও ছার পোকার ন্যায় বহুদিন উপবাসী থাকিতে পারে। ইহারা মেঝের চিড়ের বা দেওয়ালের

ফাটলের মধ্যে দিবাভাগে লুক্কায়িত থাকে এবং ছারপোকার ন্যায় রাত্রিকালে বাহির হইয়া মনুষ্যকে দংশন করে। ইহাদিগের দংশনে রিলাপ্সিং ফিভার্ (Relapsing fever), মিয়ানা (Miana) প্রভৃতি কতকগুলি রোগ একের শরীর হইতে অন্যের শরীরে সংক্রামিত হইয়া থাকে।

৭। টেট্‌-সী ফ্লাই (Tse-Tse fly)—আফ্রিকা মহাদেশের স্থানবিশেষে ইহারা বাস করে। ইহারা মক্ষিকা জাতীয়। ইহারা দিবাভাগেই উপদ্রব করে এবং স্ত্রীপুরুষ উভয় জাতিই দংশন দ্বারা রক্ত শোষণ করিয়া লয়। ইহাদিগের দংশনে সাংঘাতিক "কালনিদ্রা" (Sleeping sickness) নামক রোগের বীজ (Trypanosomes) এক শরীর হইতে অন্য শরীরে প্রবেশ করে। আফ্রিকার অন্তঃপাতী উগাণ্ডা (Uganda) প্রদেশে বহু সংখ্যক লোক এই মক্ষিকার দংশন দ্বারা "কালনিদ্রায়" অভিভূত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে ও হইতেছে।

৮। সাধারণ মক্ষিকা (House-fly)—আমাদিগের বাটীর মধ্যে সচরাচর ফেকাসে রংএর ছোট মাছি ও নীল রংএর বড় মাছি দেখিতে পাই। ইহাদের কোনটাই দংশন করে না। সুতরাং ইহারা প্রত্যক্ষ ভাবে রোগীর শরীর হইতে সুস্থ ব্যক্তির শরীরে কোন রোগের বীজ প্রবেশ করাইয়া দেয় না। তবে ইহারা রোগের বীজ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পদ বা অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা বহন করিয়া লইয়া যায় এবং এইরূপে পরোক্ষভাবে রোগ-বিস্তৃতির সহায়তা করে। টাইফয়েড্ জ্বর বা কলেরা রোগীর পরিত্যক্ত মলাদির উপর এই সকল মক্ষিকা বসিলে উহাদিগের পদদেশে ঐ সকল রোগের বীজ বহুল পরিমাণে সংলগ্ন হইয়া যায়; অতঃপর ঐ সকল মাছি তদবস্থায় আমাদিগের খাদ্যদ্রব্যে উপবেশন করিলে উহাদিগের পদসংলগ্ন রোগের বীজ খাদ্যের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া যায় এবং ঐ দূষিত খাদ্য আমাদিগের উদরস্থ হইলে আমরা ঐ সকল রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকি। যক্ষ্মা রোগের বীজও মক্ষিকা সাহায্যে এইরূপে বিস্তৃতি লাভ করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত কোন খাদ্যদ্রব্যে মাছি বসিলে উহা ভক্ষণ করিবার পূর্ব্বে পেট হইতে একপ্রকার পদার্থ খাদ্যদ্রব্যের উপর উদ্গার করিয়া দেয়; এই উদ্গীর্ণ পদার্থের মধ্যে বিবিধ সংক্রামক রোগের বীজ অবস্থিতি করিতে দেখা গিয়াছে। সুতরাং বাটীর মধ্যে, বিশেষতঃ রান্না ঘরে, যাহাতে মাছির উপদ্রব না হয় এবং উহারা যাহাতে কোন মতে কোন খাদ্যদ্রব্যের সংস্পর্শে আসিতে না পারে, তদ্বিষয়ে যথোচিত সাবধান হওয়া উচিত। অনেক সময়ে আমরা দেখিতে পাই যে বাটীর নিকটে কোন সংক্রামক রোগের অস্তিত্ব না থাকিলেও পরিবারের মধ্যে কাহারও সহসা সংক্রামক রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে; এরূপ স্থলে যথোচিত সাবধান সত্ত্বেও আমাদিগের অজ্ঞাতসারে মক্ষিকা দ্বারা রোগের পরিব্যাপ্তি হওয়া অসম্ভব নহে। অনেক সময়ে শুনা যায় যে দোকানের খাবার খাইয়া "কলেরা" হইয়াছে। দোকানে যেরূপ ভাবে খাদ্যদ্রব্য সাজাইয়া রাখা হয় এবং তজ্জন্য তাহার উপর যেরূপ মাছির উপদ্রব হইয়া থাকে, তাহাতে যাঁহারা বাজারের খাবার

ব্যবহার করেন, সেই সকল পরিবারের মধ্যে এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিবার সর্ব্বদা সম্ভাবনা। এই জন্য কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় বাজারের খাবার কোন মতেই ব্যবহার করা উচিত নহে। মনুষ্যের ও গৃহপালিত পশুদিগের বিষ্ঠাই মাছির প্রধান খাদ্য, সুতরাং ইহারা যে তন্মধ্যস্থিত রোগের বীজ একস্থান হইতে অন্য স্থানে বহন করিয়া লইয়া যাইবে অথবা আপনাদের উদরের মধ্যে উহা সঞ্চয় করিয়া রাখিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এই কথাটি সর্ব্বদা আমাদিগের মনে থাকিলে বোধ হয় আমরা মাছির উপদ্রব নিবারণে করিতে কখনই অমনোযোগী হইব না।

৯। পিপীলিকা (Ants)—ইহারাও প্রত্যক্ষ ভাবে রোগ-বিস্তারের সহায়তা করে না, তবে সাধারণ মক্ষিকার ন্যায় রোগের বীজ বহন করিয়া খাদ্যদ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া ইহাদিগের পক্ষে অসম্ভব নহে। আমাদিগের গৃহিণীরা খাবারে "পিঁপড়া ধরা" বড় একটা দোষের কথা মনে করেন না, পিঁপড়া ঝাড়িয়া সেই খাবার বালকবালিকাদিগের হাতে দিতে কোনরূপ দ্বিধা প্রকাশ করেন না। অবশ্য অনেক স্থলে ইহা দ্বারা কোনরূপ অনিষ্ট সাধিত না হইলেও স্থলবিশেষে মহা অনর্থপাত হইতে পারে; সেই জন্য খাদ্যদ্রব্যে যাহাতে পিপীলিকা সংলগ্ন না হয়, তদ্বিষয়ে সাবধান হইলে এরূপ বিপৎপাতের কোন সম্ভাবনা থাকে না। খাদ্যদ্রব্যের পাত্র জলপূর্ণ অন্য পাত্রের উপর বসাইয়া রাখিলে পিপীলিকার উপদ্রব হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়। পুনশ্চ তদুপরি সূক্ষ্ম জালের ঢাকা চাপা দিলে মাছির উপদ্রবেরও আশঙ্কা থাকে না। প্রত্যেক বাটীতে খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণের এইরূপ সুব্যবস্থা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

১০। খোসের পোকা (Itch insect)—খোস পাঁচড়া এক জাতীয় পোকার আক্রমণে উৎপন্ন হয়; ইহারা মাকড়সা জাতীয়। ইহারা রক্ত শোষণ করে না, তবে স্পর্শ দ্বারা অথবা রোগীর ব্যবহৃত বস্ত্র, গাত্রমার্জ্জনী বা শয্যা দ্বারা একের শরীর হইতে অন্য শরীরে প্রবেশ লাভ করে। কেহ কেহ বলেন যে এই জাতীয় পোকা দ্বারা কুষ্ঠ রোগও বিস্তৃতি লাভ করে।

১১। উকুণ (Pediculidae)—ইহাদিগকে মস্তকের কেশের মধ্যে এবং গায়ের চুলের গোড়ায় অবস্থিতি করিতে দেখা যায়। রক্তবীজের ন্যায় ইহাদিগের বংশবৃদ্ধি হইয়া থাকে। একটী স্ত্রী-উকুণকে ২ মাসের মধ্যে ১০০০০ হাজার উকুণ-শাবক উৎপাদন করিতে দেখা গিয়াছে। গায়ের উকুণ এক শরীর হইতে অন্য শরীরে সহজেই সংক্রামিত হইয়া থাকে। ইহারা দংশন দ্বারা রিলাপ্সিং ফিভার্ (Relapsing Fever) নামক একপ্রকার জ্বর রোগীর শরীর হইতে সুস্থ শরীরে প্রবেশ করাইয়া দেয়। উকুণ মাথায় বা গায়ে জন্মিলে বুঝিতে হইবে যে সেই ব্যক্তি নিতান্ত অপরিষ্কৃত অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় বাস করে—ইহা যে নিতান্ত লজ্জা ও নিন্দার বিষয়, সেবিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

এতদ্ব্যতীত অপর কয়েক জাতীয় কীট রোগ-বিস্তৃতির সহায়তা করিয়া থাকে; বাহুল্য ভয়ে তাহাদিগের বিষয় এ স্থলে বর্ণিত হইল না। (ক্রমশঃ)

শ্রীচুনীলাল বসু।

ভাগ্য-স্রোতে

(ছোট-গল্প)

[illegible]

„সেও স্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া যাইবে [illegible]

„তবে আর কোথায় যাইবে ?„

„যাহার সঙ্গে দেখা মিলিবে ।„

„স্রোত কোথায় যাইবে ?„

„স্রোত যে দিকে যাইতেছে ।„

„কোথায় যাইতেছে ?„

[illegible]

"কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো!
বিরহানলে জ্বালোরে তারে জ্বালো।"
--"গীতাঞ্জলি" রবীন্দ্রনাথ।

শ্রীমুকুলচন্দ্র দে অঙ্কিত চিত্র হইতে।

দেবদাসী

(১)

ত্রিনাবেলীর সুপ্রসিদ্ধ পিঙ্গলেশ্বর মন্দিরের বৃদ্ধ পুরোহিত আপ্পে চিদম্বরম্ যখন শিশু বিশোকার সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়া তাহার মুমূর্ষু জননীকে নিশ্চিন্ত চিত্তে মরিবার অবসর দিলেন, তখন হইতেই সকলে বুঝিল, এ মন্দিরে একজন দেবদাসীর সংখ্যা বাড়িল।

মন্দিরে পাঁচজন দেবদাসী বাস করিত। বয়োজ্যেষ্ঠা চম্পা শিশু বিশোকার লালন-ভার গ্রহণ করিলেন। শিশুর মুখে যখন প্রথম কথা ফুটিল, তখন সে চম্পার ক্রোড়ে বসিয়া ডাকিল, "মাম্ মা।" চমকিয়া দ্বিতীয়া দেবদাসী অবলা শিশুর মুখ চাপিয়া ধরিয়া মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "চুপ্! চুপ! মা তোর আবার কে?"

দেবদাসী দেবোদ্দেশ্যে উৎসর্গিতা। এ পৃথিবীর সহিত তাহার কোনরূপ সম্পর্ক পাতানো চলে না। সে কাহারও কন্যা নয়, বনিতা বা মাতা,—কিছুই সে নয়, শুধু দেবদাসী! ইহাই তাহার একমাত্র পরিচয়।

ইহার পর হইতে যখনই শিশু না বুঝিয়া পালন-কর্ত্রীকে মাতৃ-সম্বোধন করিতে গিয়াছে, তখনই সে বাধা পাইয়াছে। জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মা বুলি সে ভুলিয়া গেল। সকলের কাছে শুনিয়া শিখিয়া সে-ও চম্পাকে 'বড় ঠাকুরাইন্' বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল।

পাঁচজন দেবদাসী। দেব মন্দির-সংশ্লিষ্ট উদ্যানের প্রান্তে তাহারা বাস করে। লম্বা টানা দালানের ধারে ধারে পাঁচ জনের জন্য অনতি-বৃহৎ পাচটি কুঠ্‌রি। সে ধরণের আরও দুই-চারিটা ঘর খালি পড়িয়া ছিল।

বিশোকার বয়স তখন আট বৎসর। একদিন চম্পা তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন, "আজ থেকে তুমিও আমাদের মত নিজের একটি ঘর পাবে। এস, তোমায় তোমার ঘর দেখিয়ে আনি।" বালিকা কিছু না বলিয়া চম্পার অনুসরণ করিল।

অল্প বয়সে স্বাধীনতার প্রতি অন্তরের কেমন একটা টান থাকে। নিজের একটি ঘর পাইবে শুনিয়া বিশোকা যথেষ্ট আনন্দ বোধ করিল। প্রথমে সে ঘরটিতে প্রবেশ করিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল। প্রথম দর্শনেই নবজাত সন্তানের প্রতি জননীর যেমন বাৎসল্য সঞ্চারিত হয়, এই আপনার জিনিষ গৃহটির প্রতিও তেমনি এক অভিনব আকর্ষণ সে অনুভব করিল। ভিতরে ঢুকিয়া চারি ধারে সে খানিক নড়িয়া ফিরিয়া বেড়াইল, আপনার ক্ষুদ্র শয্যাটির উপর একবার বসিল, জানালা দিয়া চিরপরিচিত উদ্যান-সীমানায় দৃঢ় প্রাচীরটিও একবার নূতন করিয়া দেখিয়া লইল, তারপর ফিরিয়া দড়ির আলনায় ঝুলান ঘাঘরি-আঙ্গিয়া-কয়টি নাড়িয়া চাড়িয়া গুছাইতে লাগিল। তাহার মুখ দেখিয়া এমনই মনে হইতেছিল, যেন এক বৃহৎ সংসারের কর্ত্রীরূপে সে আজ তাহার নূতন গৃহস্থালীর মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

কিন্তু এ আনন্দ নিতান্তই ক্ষণিক! যখন সে শুনিল, এই ঘরে রাত্রে তাহাকে একা শয়ন করিতে হইবে, তখন তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। চম্পার ওড়না চাপিয়া সে কহিল, "আমি তোমার কাছে শোব।"

"না, ছিঃ, আব্দার করো না। তোমায় আব্দার করতে নেই।"

"কেন ঠাকুরাইন?"

"আস্‌ছে পূর্ণিমায় তুমি দেবদাসী হবে যে।"

এ কিছু নূতন কথা নয়। চিরদিনই উঠিতে বসিতে এ কথা বিশোকা শুনিয়া আসিতেছে। ভবিষ্যৎ দেবদাসীকে অনর্থক হাসিতে নাই, দৌড়িয়া চলিতে নাই, আব্দার করিতে নাই, এক কথায় তাহার কিছুই করিতে নাই, শুধু দুইটি খাইতে হয়, আর দেহ মাজিয়া ঘষিয়া, চোখে কাজল টানিয়া, নৃত্য গীত শিক্ষা করিতে হয়। জ্ঞানোদয় হওয়া অবধি এ কথা সে অন্ততঃ সহস্র বার শুনিয়া আসিয়াছে;—শুনিয়া সেই ভাবেই কাজ করিয়া আসিতেছে,—তবুও এ বিস্মৃতি! তবে এই আগামী পূর্ণিমার কথাটাই সে এবার এই নূতন শুনিল। কিন্তু আজিকার এ উপদেশ গ্রহণ করা বালিকার পক্ষে বড় সুবিধার নহে। বাহিরে কৃষ্ণ-পক্ষের গাঢ় অন্ধকারে চারি ধার তখন ভরিয়া গিয়াছে,—সকলের শেষের ঘরটায় সে একা থাকিবে,—মনে করিতেই তাহার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। একা থাকিবে? না, না। সাহস করিয়া সে বলিয়া ফেলিল, "ভয় করবে যে, ঠাকুরাইন? আমার বড় ভয় করবে!" বলিতে বলিতে সে তাঁহার কাছে আরও ঘেঁষিয়া আসিল। ভয়! সে কথাটা মনে পড়িলেই যে মানুষের প্রাণ ভয়ে কাঁপিয়া উঠে।

দেবদাসী চম্পার মনে যে কোমলতা ছিল না, এমন কথা ঠিক বলা যায় না। কিন্তু চিত্ত নির্ব্বিকার রাখাই দেবদাসীর কর্ত্তব্য! সেই কর্ত্তব্যের বিরুদ্ধাচরণ তো আর করিতে পারেন না! কাজেই জোর করিয়া বালিকার ভয়-কাতর মিনতির পানে লক্ষ্য না করিয়াই তিনি গম্ভীর মুখে কহিলেন, "ভয় কি! দেবদাসীর প্রাণে ভয় থাকতে দিতে নেই। যাও, কোনদিকে না চেয়ে নিজের ঘরে যাও, দোর বন্ধ করে শুয়ে পড়। এ ক'দিন অভ্যাস করে নাও। পূর্ণিমার আর দেরী নেই।" অনিচ্ছুক বালিকার হাত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে তিনি ভিতরে লইয়া গেলেন,—ভিতরে রাখিয়া ফিরিয়া বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। মন তাঁহার কাঁদিতে চাহিল, বিশোকাকে ফিরাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল,—আহা, ভয়-চকিতা বালিকা!—কিন্তু না,—ব্রতভঙ্গ-পাপ হইবে! সে পাপ কে বহন করিবে?

সংসার-জীবের প্রতি দেবদাসীর মায়া শোভা পায় না! বাহিরের দিক হইতে একটা ভয়ার্ত্ত কাতরোক্তি, পরক্ষণে দ্রুত পদধ্বনি, নীরব রজনীর ঘন অন্ধকার চিরিয়া শূন্যে মিশিয়া গেল। রুদ্ধ দ্বারের অন্তরালে শয্যায় পড়িয়া বিনিদ্রা চম্পা ছটফট করিয়া শুধু প্রহর গণিল, তথাপি নিয়ম ভঙ্গ হইতে দিল না।

ওখানে নির্জ্জন গৃহে আড়ষ্ট বালিকা পেচকের কর্কশ শব্দে শিহরিয়া দুই হস্তে কর্ণ আচ্ছাদন করিল। অলক্ষ্য তাহার রুদ্ধ কণ্ঠ ফাটিয়া সভয় কাতরোক্তি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, "মাগো!"

দেবদাসী

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত চিত্র হইতে

হায়, কোথায় কে! কোথায় তাহার মা! মা বলিয়া ডাকিয়া, কোন অনির্দ্দেশ্য সুদূর লোকে তাহার শরীরিণী অথবা অশরীরিণী মাতার বক্ষে সে কোন অজ্ঞাত আকুলতা জাগাইয়া তুলিতে পারিল কি না, কে জানে! কিন্তু এ জগতের কাহাকেও সে টানিতে পারিল না। ভাষাহীন ক্রন্দনে তাহার সারা প্রাণ পূর্ণ হইয়া উঠিল; তথাপি কেহ আসিল না। উৎকণ্ঠিত বক্ষে কোনমতে সে রজনী যাপন করিল।

ভোরের আকাশ তখনও বেশ নির্ম্মল হয় নাই, দীপ্ত শুকতারা ঈষৎ ম্লান চোখে চাহিয়াছিল; পূর্ব্বদিক একটা ভাবী সৌভাগ্যের সূচনায় অরুণ রক্ত বর্ণে রাঙ্গিয়া উঠিতেছে—সহসা বাহিরে মনুষ্য-পদধ্বনি শ্রুত হইল, এতক্ষণে সেই পরিচিত ধ্বনিটুকু শুনিয়া যেন মৃত দেহে জীবন-লাভের মতই তাহার অর্দ্ধলুপ্ত সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। তবে আবার সে মানুষের মুখ দেখিতে পাইবে! তবে সে বাঁচিয়া আছে,—মরে নাই!

বাহিরে আসিতেই সে বুঝিল, সতর্ক দ্রুত ত্রস্ত পদে কে যেন চলিয়া গেল। বিদ্যুতের মত ক্ষিপ্র গতি! কে ও? বিশোকা চিনিল, ডাকিল, "মা,—বড় ঠাকুরাইন!" ঠাকুরাইন ফিরিলেন না।

পরীক্ষার কয়টা দিন কাটিয়া গেলে যথাসময়ে সাড়ম্বর সমারোহে অষ্টমবর্ষীয়া বিশোকা ষষ্ঠ দেবদাসীর স্থান অধিকার করিল। সে দিন, সে কি আনন্দ! নূতন অলঙ্কার-বস্ত্র, ও পুষ্পমাল্যে ভূষিতা বালিকা বিগ্রহ-কণ্ঠে মাল্য পরাইয়া আপনাকে দেব-চরণে উৎসর্গিতা করিল। পার্থিব জগতের সকল সুখ দুঃখে জলাঞ্জলি দিয়া অপার্থিব জীবনে সে আপনাকে বিকাইয়া দিল। ক্ষুদ্রা মানবী আপনাকে দেবীত্বে অভিষিক্তা করিয়া এক বিপুল গৌরবে আপনার জন্ম সার্থক ভাবিল।

(২)

সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসরে সংসারে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। প্রধান পুরোহিত চিদম্বরম্ আপ্পে গতিশীল জগতের চক্রনেমির আবর্ত্তনে নূতন পথে যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহার স্থানে মহশিব দেশপান্তে এখন প্রধান আচার্য্য। চতুর্থা দেবদাসী রঙ্গিলা কঠিন রোগশয্যায় শায়িতা, অবলা অপসৃতা এবং বালিকা বিশোকা এখন পূর্ণ ত্রয়োদশ বৎসরে অতুল শ্রী-বিভূষিতা নবোদ্ভিন্ন-যৌবনা কিশোরী।

এখন আর একা থাকিতে তাহার ভয় ছিল না। শয্যাতলে সুন্দর তনু এলাইয়া দিয়া বিশ্রাম-সুখ-ভোগে যামিনী যাপন এবং সেই চারু দেহ মার্জ্জিত শোভিত করিয়া তুলিতেই দিবসের অধিকাংশ সময় কাটিয়া যায়। সন্ধ্যায় যখন সে হরিদ্রা, গোলাপী বা নীল বর্ণের পেশোয়াজ, আঙ্গিয়া ও ফিরোজী ওড়না পরিয়া নাট-মন্দিরে নাচিতে যায়, তখন দর্শকের দল বিপুল বিস্ময়ে, প্রশংসমান নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া থাকে! তাহারা যেন বিহ্বল উন্মত্ত হইয়া উঠে। তাহার সঙ্গীত, এস্রাজ-বীণায় তাহার আলাপ,—সে অপূর্ব্ব! নৃত্যশীলা তটিনীর ন্যায়ই তাহার গতিটুকু লঘু, লীলা-চঞ্চল! দর্শকের মনে হয়, এ যেন বাস্তবিকই সেই দেব-সভার অপ্সরীর নৃত্য! সারা ত্রিনাবেলী জুড়িয়া দেবদাসী কিশোরী

বিশোকার লাবণ্য ও কৃতিত্বের খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল।

প্রতিদিনই মন্দিরের নাট্যশালায় দর্শকের সংখ্যা বাড়িয়া উঠিতেছিল। বহু ধনী, এমন কি স্বয়ং রাজাধিরাজও একদিন তাহার দর্শনে আসিয়া, প্রত্যহই প্রায় দশকরূপে তথায় আগমন করিতে লাগিলেন।

বিশোকা কিন্তু এ সবের কোনই খোঁজ রাখিত না। সারাদিন বিবিধ বেশে নিজেকে সে সাজাইত, বিবিধ ছাঁদে কবরী রচনা করিত, নবীন সুরে তন্ত্রী আঁটিয়া নব-নব সঙ্গীত সাধনা করিত। তার পর সেই সারা দিনের সমস্ত শ্রম এতটুকু সুখাবেশের আকাঙ্ক্ষা রাখিত না। কাহারও প্রশংসা-বাণী তাহার কর্ণে প্রবেশ করিত না। সকল প্রাণ-মন, যাঁহার পরিতোষের জন্য সে উৎসর্গ করিয়াছে, তাঁহারি পানে অনিমেষে মুগ্ধ দৃষ্টিতে সে চাহিয়া রহিত!

অবশেষে যখন চারি দিকে দর্শকের দল হইতে বাহবার করতালি, পুষ্পমাল্য ও স্বর্ণরজত-বর্ষণের ঘটা পড়িয়া যাইত এবং অপর দেবদাসীগণ সেই সকল সংগ্রহে ব্যাপৃত থাকিত, বেহালাবাদক সঘন বেগে ছড়ি টানিয়া বাদ্য-শেষের সূচনা প্রকাশ করিত, তখন স্পন্দিত বক্ষে সে যুক্তপাণি হইয়া বিগ্রহের পানে চাহিয়া থাকিত। আন্তরিক ব্যাকুলতায় তাহার সারা চিত্ত বিগ্রহ-চরণে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িত,—যেন সে বলিত, "প্রসন্ন হইলে ত! ওগো আমার জীবন-দেবতা! দাসী তোমায় মুহূর্ত্তের জন্যও তৃপ্তি দিয়াছে কি?" তারপর কোলাহল-হুড়াহুড়ির ভিতর দিয়া কোনদিকে লক্ষ্য মাত্র না করিয়া যথার্থ দেবলোক-চারিণীর মতই সে নিজ স্থানে ফিরিয়া যাইত। কৃপাপ্রার্থীর দল অশেষ-বিশেষ চেষ্টাতেও তাহার দৃষ্টি-আকর্ষণে সমর্থ না হইয়া ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িত। রোষে ক্ষোভে তাহাদিগের চিত্ত গর্জ্জিয়া বলিত, কি অহঙ্কার! কাহাকেও দৃক্‌পাত নাই!

বাস্তবিকই যে বিশোকার মনের মধ্যে একটা প্রচণ্ড অহঙ্কার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা নহে। মর্ত্ত্যচারী মানবের তুলনায় আপনাকে সে কোন সুদূর ঊর্দ্ধলোকের জীব বলিয়া মনে করিত। সে জানিত, ইহারা মানুষ, কিন্তু সে দেবী। দেবতা ভিন্ন কাহারও সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। এ সংসারের কোন্‌খানে কি ভাবে কে চাহিয়া আছে, সে সংবাদে তাহার কোন প্রয়োজন নাই!

এমনি করিয়া দিন কাটিতেছিল। দিনের পর মাস, মাসের পর বৎসর আসিয়া ক্রমে আরও দুই বৎসর কাটিয়া গেল।

ক্রীড়াশীল নদী-তরঙ্গের মতই কালস্রোত বহিয়া চলিয়াছে। সে অবিরাম স্রোত-ধারা কাহারও পানে চাহিবার জন্য ফিরিয়া দাঁড়ায় না! তট ভাঙিয়া, গ্রাম ভাসাইয়া, নিজের গতিপথকে সে যেমন ঠিক রাখে, সময়ও তেমনি শিশুকে বালকত্ব, কিশোরকে যৌবন ও প্রৌঢ়কে বৃদ্ধত্ব দান করিয়া সম তালে নিজের পথ ধরিয়া বহিয়া যায়। তাহার স্পর্শে, কোথায় কোন্ তরুণ লতায় ফুল ধরিল, কোন্ জীর্ণ শাখা শুকাইল, এ সংবাদ লইবার জন্য তাহার গতি ফেরে না।

বসন্তের নবমুঞ্জরিত মাধবীর ন্যায় নূতন শোভা-সম্পদের মধ্যে বিশোকার দেহও

"আঁধারেতে ভয় করিনা, আঁধার আমি বাসি ভাল,
আঁধার দেখলে মনে পড়ে, শ্যামা মা মোর এমনি কাল।
ভয়ের আকার দেখলে পরে ডাকি আমার শ্যামা মারে,
ছায়া-পথে দেখতে পাই সে মায়ের রাঙা পায়ের আলো।"

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত চিত্র হইতে

অভিনব নিটোল মাধুর্য্যে ভরিয়া উঠিয়াছিল। নীল রঙের বসনে সাজিয়া সে দিন বসন্ত-সায়াহ্নে দেবারতির পর যখন সে নিজের গৃহে ফিরিতেছিল, তখন তাহার প্রাণের মধ্যে বসন্তের উতলা হাওয়ার মতই একটা অত্যন্ত এলোমেলো ভাবের বাতাস গুঞ্জরিয়া উঠিল। চারিদিকে তখন চাঁদের আলোর ঢেউ লাগিয়াছে; যতদূর দেখা যায়, আকাশে কেবল আলোর মালা গাঁথা; দেব-মন্দিরের সুরভিজলে সিঞ্চিত পুষ্প-পরাগের স্নিগ্ধ গন্ধ বায়ুর অঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে; বিশোকার প্রাণের মধ্যে তখনও সে দিনকার সন্ধ্যার সুরের হাওয়া একটি মিষ্ট আবেশে ঘুরিয়া ফিরিতেছিল। কিন্তু তাহার মাঝখানে আবার এ কি? গান যখন শেষ হইয়া গেল, তখন এক মুগ্ধ চিত্তের অর্দ্ধস্ফুট বাণী,—"সুন্দরি! এ সুর কেন অনন্ত হইল না?" অতি মৃদু-উচ্চারিত এ স্তুতিটুকু, তাহার উদ্দেশ্যে,—কে পাঠাইল? সেই এক তরুণ নেত্রের সতৃষ্ণ দৃষ্টি, সে কত মুগ্ধ ভাবেই না তাহার পানে নিবদ্ধ ছিল! ভাষা যাহা প্রকাশ করিতে পারে না, সে দৃষ্টিতে বুঝি তাহাই প্রকাশ পাইতেছিল।

বিশোকার সর্ব্ব শরীর সে নেত্রপাতে শিহরিয়া উঠিয়াছিল! সকল শিরার শোণিত-প্রবাহ সেই দৃষ্টির তাড়িৎ-আকর্ষণে ছুটিয়া উভয় গণ্ড বাহিয়া বাহির হইতে চাহিয়াছিল! সে তাহার সরল দৃষ্টি আজ দর্শকের মুখে তাই তেমনভাবে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই, শুধু সলজ্জ-সঙ্কোচে নত নেত্রে চাহিয়াছিল।

ঘরে ফিরিয়া সে বসন ত্যাগ করিল না, শয্যা-প্রান্তে বসিয়া পড়িয়া নীরবে কত কথা ভাবিতে লাগিল। দেশের অধিপতি কেন আজ এমন করিয়া তাহার পানে চাহিতেছিলেন,—কণ্ঠে তাঁহার আজ কেন সে সুর!

রাত্রি বাড়িয়া চলিল। গাছের আড়ালে জ্যোৎস্না জাল ক্রমে ক্ষীণ হইল। চাঁদ ম্লান হইয়া আসিল। নিরালা পথে গ্রামের কুকুর ডাকিয়া থামিয়া গেল। এই অভিনব সংশয় হইতে আপনার অনভিজ্ঞ হৃদয়কে মুক্ত করিতে না পারিয়া বিশোকা আস্তরণতলে শ্রান্ত দেহ বিছাইয়া দিল। চক্ষে তাহার ঘুম আসিল। স্বপ্নে আবার সেই সুর ফুটিয়া উঠিয়া কানের কাছে মৃদু গুঞ্জনে কুহরিয়া গেল, "সুন্দরি, এ সুর কেন অনন্ত হইল না!"

প্রভাতে চক্ষু মেলিতে সে দেখিল, এ কি দৃশ্য! এ আলো, এ কিরণ, এ কি কোন নূতন লোকের? নূতন সূর্য্যের? বাহিরে মধুর বাতাস কত পাখীর গানে ভরিয়া উঠিয়াছে! ফুলের বর্ণে-গন্ধে এ কি নব মাধুর্য্য! ধরণী-বক্ষ কি মনোমোহন শ্যামলতায় আজ ভরিয়া উঠিয়াছে! এ কি নূতন—? না, এতদিন সে অন্ধ ছিল,—আজ প্রথম তাহার দৃষ্টি খুলিয়াছে?

আজ সবার মাঝে, সকল কাজে, সেই একটি চাহনি, একটি সুর, অখণ্ড বিচিত্র তালে-ছন্দে বাজিয়া ফিরিতেছিল,—তাহা সুন্দরীকে স্মৃতির সরমে রাঙাইয়া তুলিতেছিল।

প্রধান পুরোহিত এতদিন শুধু লক্ষ্য করিয়াছেন, আজ তাঁহার পর্য্যবেক্ষণ সার্থক হইয়াছে। আজ তিনি দেখিয়াছেন, তরুণ নৃপের পিপাসু লোচনের মুগ্ধ দৃষ্টি কিশোরীর প্রতি তেমনি আবদ্ধ, কিন্তু সে দৃষ্টিকে কিশোরী আজ অবহেলা করিতে পারিতেছে না, সে দৃষ্টির সম্মোহনে সে আজ মুগ্ধ! রাজ-নেত্রে সরলতার সে স্বচ্ছতা নাই, সে নেত্র ক্ষণ-কম্পিত৷ কিশো-

শরীরও কণ্ঠে আজ বিহঙ্গীর আত্ম-নিবেদনের সে সুর নাই, আপনাকে ঢাকিবার একটা প্রবল চেষ্টা সে সুরে বিদ্যমান ছিল। মৃদু হাসিয়া সদাশিব ভাবিলেন, দেবপ্রসাধনের স্থান মানবচিত্তের দুরাকাঙ্ক্ষায় ভরিয়া উঠিয়াছে, তাই কি এই কৃত্রিমতার সৃষ্টি?

সেদিন সভা ভাঙিবামাত্র বিশোকা নাট-মন্দির ত্যাগ করিল, দেবতার দিকেও আজ ভাল করিয়া সে চাহিতে পারিল না, কি যেন এক গোপন অপরাধের সঙ্কোচে নিজের কাছেই সে কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিল,—অননুভূত-পূর্ব্ব কি এক গভীর স্পন্দনে তাহার বুকখানা মুহুর্মুহু আজ কাঁপিয়া উঠিতেছে। মনে হইতেছে, জীবনে তাহার কি একটা প্রকাণ্ড ভুল হইয়া গিয়াছিল, আজ প্রথম সেই ভুলটুকু ধরা পড়িয়াছে। এত দিনে সে যেন একটা পথ পাইয়াছে, কিন্তু আবার ভিতর হইতেও একটা অস্পষ্ট অন্ধকার, একটা আতঙ্কের ছায়াও এই সঙ্গে ফুটিয়া উঠিতেছিল।

সেদিনও সেই জ্যোৎস্না-স্বর্ণখচিত ওড়নায় অঙ্গ ঢাকিয়া রজতাম্বরা নিশীথিনী বাসক শয়নে চলিয়াছে, আকাশপথে দাঁড়াইয়া প্রজ্বলিত দীপ হস্তে পূর্ণিমার চন্দ্র মর্ত্ত্য-পানে চাহিয়া-ছিল,—এমন সময়, অতি নিকটে মৃদু স্বরে কে ডাকিল, "সুন্দরি!"

চমকিয়া বিশোকা ফিরিল। তাহার সর্ব্বশরীর বেতসের মত কাঁপিয়া উঠিল। সম্মুখে স্বয়ং রাজাধিরাজ উৎপলাদিত্য!

রাজা এক পদ অগ্রসর হইলেন, কহিলেন, "ভয় নাই। তোমাকে আমি বলিয়াছি, তুমি স্বর্গের পবিত্র ফুল! তাই ভয় হয়, পৃথিবীর পাপ পঙ্কে পাছে কোন দিন মলিন, কলুষিত হও! যদি অভয় পাই ত একটি কথা নিবেদন করি—"

বিশোকা যেন তড়িতাহত হইয়া পড়িয়া-ছিল, তাহার চেতনা ছিল না। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে সে চাহিয়া রহিল, প্রশ্ন বুঝিল না, উত্তরও সে খুঁজিল না। শুধু একটা তীব্র আনন্দে সে কেমন বিহ্বল হইয়া পড়িল! কিসের এ আনন্দ,—তাহাও সে বুঝিল না।

নৃপতি আর একপদ অগ্রসর হইলেন,—কহিলেন, "এ দেবমন্দির পুণ্যভূমি, সন্দেহ নাই,—কিন্তু দেবদাসীর পক্ষে জীবনটাকে পবিত্র রাখা সুকঠিন। দেবদাসী নামেই শুধু দেবদাসী, প্রকৃতপক্ষে তাহারা মন্দিরেরই পুরোহিত-যাজকগণের সেবিকা। শিহরিতেছ? তুমি নিতান্ত সরলা, তাই আজও যে জীবনের মাঝখানে তুমি বর্দ্ধিত, সে জীবন চিনিতে পার নাই, নিজের অবস্থাও অনুভব করিতে পারিতেছ না! কিন্তু এ কথা সত্য, তোমার দুঃখের দিন আগতপ্রায়! যদি এমনি পবিত্র, নির্ম্মল থাকিতে চাও, তবে অবিলম্বে এ স্থান ত্যাগ কর।"

বিশোকা এখনও কিছু বুঝিল না, কিন্তু একটা আশঙ্কায় তাহার শরীর শিহরিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তাহার বিপদের দিন আসন্ন,—কি বিপদ! দেবদাসীর বিপদ! মহারাজ আজ এ কি কথা বলিতেছেন। পুরোহিতের সেবিকা! নামে শুধু দেবদাসী! কম্পিত দৃষ্টি তুলিয়া সে যেন কি বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু অস্ফুট মর্ম্মরে তাহার নিবেদনটুকু ভাষা হারাইয়া থামিয়া গেল। কি বলা যাইতে পারে, তাহাও সে ভাবিয়া পাইল না!

রাজা তাহার অন্তরের ভাব বুঝিলেন। বুঝিয়া চারিদিকে চাহিয়া আর একটু নিকটবর্ত্তী হইলেন, বলিলেন, "বিশোকা, এ বুকের মধ্যে যাহা আছে, তাহা এখন অব্যক্তই থাক! দেব নির্ম্মাল্য মানুষ শুধু মস্তকে ধারণেরই অধিকারী, আর কিছুর নয়। সেই অধিকার আমায় দাও। এমন কোন নিরাপদ স্থানে তোমায় রক্ষা করি, যেখানে—এমন কি, আমি নিজেও তোমায় আর কখনও না দেখিতে পাই। আমার মা কাশীবাসিনী, সেখানে তাঁহার কাছে যাইবে?" বিশোকা নীরবে নত নেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না। রাজা আবার কহিলেন, "সময় নাও, কাল এইখানে আবার সাক্ষাৎ হইবে। নিজের উপরও আমার তেমন বিশ্বাস নাই। কি জানি, কি ভাব আসিয়া পড়ে—দেবতার ধনে মানুষের লোভ হয় কেন! তাহা শুধু ধ্বংশই আনে। কিন্তু হায়, দেবতা কোথায়? তুমি পুরোহিতের,—সে তোমায় যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারে। তাহার হাত হইতে তোমায় রক্ষা করিতে পারি, এমন ক্ষমতা আমার নাই, কাহারও নাই! তাই অনেক ভাবিয়া এই উপায় আমি স্থির করিয়াছি,—তোমায় নিরাপদ করিয়া তোমার সহিত পার্থিব জগতের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিব, নহিলে বুঝিতে পারিব না—"

কে যেন সরিয়া গেল! একটা ছায়া!

"বিদায় বিশোকা—" চকিতে উৎপলাদিত্যের দীর্ঘ মূর্ত্তি অন্ধকার স্তম্ভান্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল। সকল শরীরে তাড়িতাঘাত, মনের মধ্যে সুখ-দুঃখ-ভয়ের মিশ্রনে একটা বিপুল আলোড়নের বেগ বালিকাকে একেবারে স্তম্ভিত করিয়া তুলিল। মধ্যাহ্ন আকাশে পূর্ণগ্রাসী-সূর্য্য-গ্রহণের মতই,—বিপুল তীব্র আলোর মাঝখানে,—অকস্মাৎ আজ এ কি বিরাট অন্ধকার!

(৩)

শয্যায় পড়িয়া বিশোকা রাজার কথাই ভাবিতেছিল। কি মুগ্ধ চাহনি, কি মিষ্ট সুর, কি সরল প্রাণ! কিন্তু এ কি,—এ কি হেঁয়ালির কথা! সে দেবতার নয়, পুরোহিতের? না, সে দেবী—সে দেবী!—দেবতার চরণে বিক্রীত এ দেহ,—ইহাতে কাহারও অধিকার নাই। নৃপতি হয় ভ্রান্ত, না হয়—না, তাহা অসম্ভব! সে কণ্ঠে ত ছলনার আভাষ নাই! তবে—কি তবে? এ কথা তবে কেন তিনি বলিলেন? ভ্রান্তি—? বোধ হয়, ভ্রান্তিই!

গৃহ-দ্বার মুক্ত ছিল, আহার্য্য সে স্পর্শও করে নাই! শয্যার আস্তরণ স্থান-চ্যুত হয় নাই। তাহারি উপর বালিকা আপনার সজ্জিত তনুখানি ঢালিয়া দিয়াছিল। সদাশিব দ্বারে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন, "বিশোকা!"

কে ও! ও কে ডাকে? ধড়মড়িয়া কিশোরী উঠিয়া বসিল। না, ভয় নাই! প্রধান পুরোহিত স্বয়ং আসিয়াছেন!

সদাশিব অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "রাজা তোমায় কি পরামর্শ দিতেছিলেন, দেবদাসী? নিশ্চয়ই এমন কোন গূঢ় কথা নয়, যাহা আমার কাছে গোপন রাখিবে! কি কথা?"

বিশোকার মনে নিমেষে সেই কণ্ঠ সেই সুর বাজিয়া উঠিল,—"দেবদাসী! যথার্থ তাহারা···" অন্তরে সে শিহরিল। হয় ত

এ কথা মিথ্যা না হইতেও পারে। রঙ্গিলা, অবলা—এমন কি চম্পা——! সদাশিব তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া আর একটু অগ্রসর হইয়া হাসিয়া কহিলেন, "কি দেবদাসী, চুপ করিয়া রহিলে যে! রাজার কথাটা বড় গোপন না কি?"

এ ব্যঙ্গোক্তিতে বিশোকা জ্বলিয়া উঠিল। মুখ তুলিয়া সগর্ব্বে সে কহিল, "কাহারও সহিত আমার কোন গোপন-কথা নাই। তিনি আমাকে শীঘ্র এ স্থান ত্যাগ করিতে বলিলেন। তিনি বলিলেন, আমার বিপদের দিন আগ্রতপ্রায়, যদি পবিত্র থাকিতে চাই, তবে যেন এ মন্দির ছাড়িয়া যাই।"

"মন্দিরের চেয়ে রাজোদ্যানটা বেশী পবিত্র বুঝি?" পুরোহিত বক্র হাসি হাসিলেন। সে হাসির ইঙ্গিত না বুঝিলেও বিশোকার কানে তাহার স্বরটা ভাল লাগিল না। সে কহিল, "না, রাজোদ্যানে তিনি আমায় ডাকেন নাই, তাঁহার মায়ের কাছে কাশীধামে পাঠাইতে চাহেন। তিনি বলেন, দেবদাসী শুধু নামে দেবদাসী, প্রকৃত পক্ষে সে পুরোহিতেরই সেবিকা—এ কথা—"

"তিনি ঠিকই বলিয়াছেন,—ও কি!—অমন করিতেছ কেন? যেদিন বিগ্রহের কণ্ঠে তুমি মাল্যদান করিয়াছ, সেইদিনই কি বুঝ নাই, সে মালা কাহার কণ্ঠে পড়িয়াছে! পুরোহিত দেব-প্রতিনিধি, সমুদয় দেব-সম্পত্তিতে তাহারই অধিকার। ইহাতে রাজার কোন হাত নাই! রাজার সাধ্য কি, এখান হইতে তোমায় লইয়া যায়! তুমি আমার।"

নিমেষে তখন সমস্ত ব্যাপার বিশোকার চক্ষে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। সে সব বুঝিল। সে তবে তাহার, দেবতার নয়! এই মানবের,—সদাশিব দেশপান্তের—! অনেক কথাই আজ তাহার মনে পড়িল! স্বপ্ন টুটিয়া সত্য আজ ভীষণ মূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিল!

পুরোহিত শয্যার নিকটবর্ত্তী হইয়া আসন গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "তুমি নিতান্তই বালিকা, নির্ব্বোধ! তাই ইহাতে এত চঞ্চল হইয়াছ। আসল কথা, তুমি রাজার রূপে মুগ্ধ, রাজাও নিজে তাই,—কিন্তু মন্দির-সেবিকা রাজার জন্য নয়। এ দুরাশা ত্যাগ কর, রাজরাণী হওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব নয়! যে পদ পাইবে, তাহার চেয়ে শ্রেষ্ঠ পদেই আছ। রাজার সহস্র চেষ্টাও তোমার এই গণ্ডীর এক চুল বাহিরে লইয়া যাইতে সক্ষম হইবে না, স্থির জানিয়ো। বরং প্রয়োজন বুঝিলে এখানে তাঁহার আগমন আমি বন্ধ করিতে পারি। তুমি দেবদাসী,—ধরিতে গেলে, আমার স্ত্রী। আমি সে অধিকার গ্রহণ করিলাম। তুমি আমারই।"

বিশোকার কণ্ঠ হইতে একটা অস্ফুট ধ্বনি বাহির হইল। ঘৃণায় সে দূরে সরিয়া আসিল, বলিল, "না, আমি দেবতার। পিঙ্গলেশ্বর আমার স্বামী! তুমি আমায় অমন কথা বলিয়ো না।"

"বটে! আমি বলিব না,—আর রাজা যখন বলিতেছিলেন, তখন ত শুনিতে দিব্য লাগিতেছিল।"

"তিনি অমন লোক নহেন, তিনি আমায় ও সব কথা কিছুই বলেন নাই। তুমি যাও,

নহিলে আমি বড় ঠাকুরাইনকে সব কথা বলিয়া দিব।"

পুরোহিত আসন ছাড়িয়া উঠিলেন, মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "কি বলিবে? চিরকালই এই প্রথা,—দেবদাসীমাত্রেই পুরোহিতের সম্পত্তি—এ কথা কে না জানে? তোমার বড়-ঠাকুরাইন কি দেবদাসী ছাড়া? পুরোহিতের পত্নীপদ বড় নগণ্য নয়। বেশ, আজ চলিলাম। রাজার আশা ছাড়িয়া এখন তুমি নিদ্রা যাও। কাল যেন তোমায় এ সব দুশ্চিন্তায় মাথা ঘামাইতে না দেখি। তুমি আর কাহারও নও, তুমি আমার।"

ইন্দ্রজালে সব যেন কেমন পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। স্বর্গযাত্রী চাহিয়া দেখিল, কোথায় স্বর্গ! সে রসাতলে! সে দেবতার দাসী ছিল, তাহার কিছুরই প্রয়োজন ছিল না,—দেবতাই তাহার সকল অভাব পূর্ণ করিয়া রাখিয়া ছিলেন, কিন্তু এখন কোথায় দেবতা? তিনি তাঁহার মন্দিরে পূজা গ্রহণে ব্যাপৃত, আর সে—নিঃসঙ্গ নির্ব্বান্ধব, নিঃসহায়! কাতর অবসাদে তাহার শরীর মন যেন ভাঙিয়া পড়িতেছিল।

এক গৃহস্থ রমণী কোলের সন্তান লইয়া ঠাকুর-প্রণাম করিতে আসিয়াছিল। নিত্যই সে আসে,—কোনদিনই আসিবার ভুল হয় না, সেদিন আসিয়া হাস্য-রহস্যময়ী সুবেশ-ভূষিতা এই চঞ্চলা হরিণীকে মন্দিরে একাকিনী স্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া ধীরে ধীরে সে তাহার নিকটবর্ত্তী হইল, জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁগা, তোমার কি হয়েচে?"

শিশু কলহাস্যে ডাকিল, "মা-ম্-মা!"

বিশোকা সবিস্ময়ে ফিরিয়া চাহিল। আহা, কি সুন্দর,—নধর-কান্তি, এই সহাস শিশু! সাগ্রহে দুই বাহু বাড়াইয়া সে শিশুকে মুহূর্ত্তে ছিনাইয়া লইল। শিশু ডাকিল, "মা!" আহা, কি মধুর! কি মধুর এ সম্বোধন রে! প্রাণ যে ইহার তালে তালে নাচিয়া উঠে, বুক যে জুড়াইয়া যায়! চুম্বনের পর চুম্বনে শিশুকে সে বিব্রত করিয়া তুলিল

নারী কহিল, "তুমি খুব ছেলে ভালবাস, বুঝি? আচ্ছা, এখন ওকে দাও। কেউ আবার দেখবে,—লোকে এতে আমাদের নিন্দা করতে পারে।"

এ কথার কূট অর্থ বিশোকা বুঝিল না। শিশুকে সে দুই হাতে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"তা করবে না! তোমরা হচ্ছ নাচওয়ালী, তোমাদের সঙ্গে কি ভদ্রঘরের ছেলেমেয়েদের মিশতে আছে! তবে তুমি কি না নেহাৎ ছেলেমানুষ, আর দেখতে বড় সুন্দর, কাজেই তোমায় ভাল না বেসে থাকা যায় না। আহা, এ ব্যবসা না করে যদি বিয়ে করে ঘর-সংসার করতে ত, কেমন হত! দেখ দেখি, কপাল! তোমাদের বুঝি বিয়ে হয় না?"

"পিঙ্গলেশ্বর আমার স্বামী।"

"ওমা, মানুষের আবার কখনো ঠাকুর স্বামী হয় বুঝি?" বলিয়া বিশোকার শিথিল বাহুমধ্য হইতে শিশুকে টানিয়া লইয়া জননী চলিয়া গেল।

পিঙ্গলেশ্বর! এই তাহার পদ? ইহা লইয়াই সে এতদিন নিজেকে দেবীত্ব দান করিয়া আপনাকে এত ঊর্দ্ধে রাখিয়াছিল! সে নর্ত্তকী! গৃহস্থ-বধূ ঘৃণায় তাহার ছায়া

স্পর্শ করিতে চাহে না! পবিত্রতম শিশুদেহও তাহার পিপাসাতপ্ত বক্ষস্পর্শে কলঙ্কিত হয়! কি দুর্ব্বিসহ, এ জীবন! পিতা নাই, মাতা নাই, স্বামী—না, কোথায় স্বামী? তুমি দেবতা! দেবতার সহিত মানুষের কিসের সম্পর্ক? স্বামী নাই,—সন্তানও থাকিবে না! গৃহ, বান্ধব, আরামস্নিগ্ধ, সেবা-শীতল একটি মৃত্যুশয্যাও তাহার অদৃষ্টে ঘটিবে না! তবে হায়, কিসের আশা আছে? কিছুরই না! সে দেবতার নহে, মানবেরও নহে, শুধু দেবনামে উৎসর্গিতা, মানবের ক্রীড়াদাসী-মাত্র। হায়, মহারাজ! হায়, ক্ষুদ্র শিশু! এ অনভিজ্ঞ শূন্যতার মধ্যে এ কি দুরন্ত ক্ষুধা আজ তোমরা জাগাইয়া দিয়াছ! এমন শূন্য জীবন লইয়া কি মানুষ কখনও বাঁচিতে পারে?

সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকারে লতা-মণ্ডপের অন্তরালে আসিয়া মৃদুকণ্ঠে রাজা ডাকিলেন, "বিশোকা—"। কেহ সাড়া দিল না। রাজার প্রাণ কি-এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় কাঁপিয়া শিহরিয়া উঠিল। অগ্রসর হইয়া তিনি আবার ডাকিলেন, "বিশোকা—"

সহসা দূর হইতে একটা অস্পষ্ট কোলাহল বায়ুতরঙ্গে ভাসিয়া আসিল। কোলাহল লক্ষ্য করিয়া সতর্ক ধীর পদে রাজা অগ্রসর হইলেন। মন্দিরের নিকট আসিয়া তিনি দেখিলেন, দ্বারে অত্যন্ত ভিড় জমিয়াছে! সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, তথাপি আরতির শঙ্খঘণ্টা এখনও বাজিয়া উঠিল না, কেন? ভক্তবৃন্দের সে বন্দনা-গুঞ্জনও শুনা যায় না! ব্যাপার কি? প্রশ্ন করিয়া রাজা জানিলেন, আরতি-পূজায় দারুণ বাধা পড়িয়াছে—!

সন্ধ্যার পূর্ব্বে সেবকগণ মন্দির-সংস্কারে আসিয়া দেখে, পূজার আসনে বসিয়া কনিষ্ঠা দেবদাসী বিশোকা মহাধ্যানে নিমগ্না। সে ধ্যান এখনও কেহ ভাঙ্গাইতে পারে নাই।

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

আগে আগে

পরিহরি অতিদূর পর্ব্বত কন্দর,
অতিক্রমি শৈল নদী কানন প্রান্তর,
চলিয়াছি পদ-ব্রজে কি জানি কোথায়
মুদি' আঁখি।
আগে আগে কে গো ওই যায়
অদৃশ্য মূরতি? তার চরণ-চুম্বিত
রুণু রুণু রুণু রুণু নূপুর-শিঞ্জিত
নিরন্তর পশে কানে। মৃদু বেণু রব
সুরের শিকলি রচি' প্রাণ মন সব
কাড়ি' লয়, পদ মম করে আকর্ষণ
অজ্ঞাত শকতি-বশে!
সিন্ধু-গরজন
শ্রবণে পশিল যেই, থামিল অমনি
মুখর মঞ্জীর সহ মুরলীর ধ্বনি
অকস্মাৎ। চেয়ে দেখি—নাহি কিছু আর,
কানে শুধু বাজে দূরে চাপা হাসি কা'র!

শ্রীভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী।

বর্ষার দিনে

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত চিত্র হইতে

সৌধ-রহস্য

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ যথানিয়মে চলিয়া গেলেও জেনারেল হিথারষ্টনের চিন্তা আমার মন হইতে মুহূর্ত্তের জন্য অপসৃত হইল না। বৃথা আমি জমিদারীর কাজে অত্যধিক মনঃসংযোগের চেষ্টা দেখিতেছিলাম। হস্ত, পদ ও চক্ষু সে কার্য্যে নিবিষ্ট থাকে—মন কিন্তু সেই পুরাতন চিন্তা সূত্রেরই গ্রন্থি-মোচনে লাগিয়া থাকে। কৌতূহল মুহুর্মুহু ভিতর হইতে প্রশ্ন তুলে,—ব্যাপারখানা কি? ইহার শেষই বা কোথায়?

যখনই কোন কার্য্যোপলক্ষে সেই কাষ্ঠনির্ম্মিত উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত সুদৃঢ় লৌহ কবাটযুক্ত ক্লুমবারের পাশ দিয়া যাতায়াত করিতাম, তখনই আমার মনের ভিতর সেই চিন্তা কেবলই ওতঃপ্রোত হইয়া বহিতে থাকিত। এই যে সুদৃঢ় আবরণের অন্তরালে একটি সসঙ্কোচ কাহিনী প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে,—সেটি কি? কল্পনায় যত রকম উদ্ভট, অলৌকিক বা অস্বাভাবিক ব্যাপারের সৃষ্টি করা যাইতে পারে—সে সকলের সাহায্যেই আমি বহু বিপদের চিত্র মনে মনে গড়িতে ভাঙ্গিতে লাগিলাম—কিন্তু আসলে তাহার কোন্‌টির সহিত যে বাস্তবের মিল আছে,—তাহা কে বলিয়া দিবে? এই সামান্য "কিন্তু" কথাটাই আমার চিন্তার সকল সূত্র ছিন্ন করিয়া দিত! মনটা অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িত।

রাত্রে এসথার আমাদের দরিদ্র প্রতিবেশিনী লুথার মার পীড়িত সন্তানটিকে দেখিতে গিয়াছিল। এ সকল কাযে কোন দিনই তাহার সময়-জ্ঞান থাকিত না। দরিদ্রের প্রতি তাহার করুণার যেন কোন সীমা ছিল না। সে জন্য সে অল্পদিনের মধ্যেই প্রায় সকলের কাছেই অত্যধিক ভক্তি ও স্নেহের পাত্রী হইয়া উঠিয়াছিল। নির্গন্ধ ফুলের মত মমতাহীনা নারীর চিত্তকে সে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিত। আমার স্নেহ-প্রতিমা বোনটি আপনার নির্ম্মল চিত্ত ও অসীম পর-দুঃখকাতরতায়, সুবাসিত কুসুমসৌরভের মতই, আমাদের গৃহ-ভূমিটিকে চির-প্রফুল্ল করিয়া রাখিয়াছিল।

রাত্রে বাটি ফিরিয়া সে আমায় জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, তুমি কোনদিন রাত্রে কি ক্লুমবারের দিকে দেখেচ কখনো?"

আমি একটা ভ্রমণ-কাহিনীর মধ্যে তখন তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলাম, তথাপি এসথারের মুখে ক্লুমবারের কথা শুনিয়া বইখানা মুড়িয়া রাখিয়া উত্তর দিলাম, "যেদিন জেনারেল আর ম্যাকলীন প্রথম বাড়ী দেখ্‌তে এসেছিলেন, সেই রাত্রি ছাড়া আর কোন রাত্রে আমি ও দিকে চেয়ে দেখিনি। কেন বল দেখি?" এসথার আমার টুপিটা আগাইয়া দিয়া হাতটা একটু আকর্ষণ করিয়া বলিল, "তবে একবার এস দেখি, দেখবে। একটু বেড়ানও যাবে।"

বাতির ছায়ায় তাহার মুখের ভাব ভাল বুঝা না যাইলেও, কথার ধরণে ও গলার স্বরে একটা কেমন সংবাদের যেন সূচনা পাওয়া গেল। কে জানে, কি এক অজ্ঞাতের নেশায় আমি

যেন কেমন* উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলাম। তবু পরিহাসের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন? কি হয়েচে, এসথার? হলে আগুন লাগেনি ত? তোমার গলার সুরটা এমন গম্ভীর হয়েচে যে আমার ভয় হচ্চে, সমস্ত উইগটাউন সহরটাতেই বুঝি আগুন লেগেছে!" ঈষৎ হাসিয়া এসথার উত্তর দিল, "রক্ষা কর! সে রকম সর্ব্বনাশ কিছু হয়নি অবশ্য! তবু একবার ওঠই না—কিই বা তোমার তাতে ক্ষতি হবে!" এ কথার পর এসথার মুখটা একটু গম্ভীর করিয়া ঈষৎ ভর্ৎসনার সুরে বলিল, "আচ্ছা দাদা, তুমি যে তামাসা করছিলে,—সমস্ত সহরটায় বুঝি আগুন ধরে গেছে—আহা, তোমার দুঃখ হয় না—? মা গো, দেশ-শুদ্ধ লোক পুড়ে মরবে—"

"দূর পাগলী! মুখে বল্লেই কি আর সত্যি সত্যি সহরে আগুন ধরে যায়!"

আমি বই রাখিয়া টুপিটা উঠাইয়া লইলাম, তাহার পর অন্ধকারে দুই জনে বাহিরে আসিলাম।

চারিধার তখন নীরব, জনহীন। অন্ধকারে জোনাকিগুলা গাছের মাথায় তাল পাকাইয়া দীপালীর দীপাবলীর মত মৃদু আলো বিকীর্ণ করিতেছিল,—আকাশভরা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে একরাশি নক্ষত্রও ক্ষীণভাবে জ্বলিতেছিল। সেই অল্প-আলোয় সাবধানে মাঠের ভিতরকার সরু রাস্তা ধরিয়া এসথার অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া আমায় পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল,—এ সব পথ তাহার নিত্যকার পরিচিত। খানিকটা পথ চলিয়া একটা উঁচু উই ঢিবির মত জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। সেখান হইতে হলটা বেশ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই স্থানে দাঁড়াইয়া এসথার বলিয়া উঠিল, "দাদা, দেখ্‌চ?"

চাহিয়া দেখিলাম, একটা তীব্র উজ্জ্বল আলোকে হল যেন জ্বলিতেছে! নীচেকার জানালাগুলা ক্ষুদ্রাকৃতি, সে জন্য সেখানে আলোটুকু অস্পষ্ট, কিন্তু দ্বিতল হইতে সমুচ্চ চূড়া পর্য্যন্ত সমস্ত গৃহের সুবৃহৎ জানালা দিয়া উজ্জ্বল আলোক-রশ্মি চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছিল। সে আলোক এত তীব্র যে প্রথম দৃষ্টিতে আমার ভ্রম হইয়াছিল, বুঝি টাওয়ারে সত্যই আগুন লাগিয়াছে! কিন্তু একটু পরেই বুঝিতে পারিলাম ভাল ভাল লণ্ঠন ও বড় বড় ল্যাম্প প্রভৃতি দ্বারা প্রত্যেক ঘরের প্রত্যেক জানালায় যে লণ্ঠন জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছে, এ তীব্র উজ্জ্বল আলোক তাহারই। তবে আশ্চর্য্য এই যে, যদিও বাড়ীটাকে আলোর মালা পরাইয়া দিবালোকের মত করিয়া তোলা হইয়াছে, তথাপি তাহার অধিকাংশ কক্ষই জনহীন, এমন কি বহুসংখ্যক কক্ষই নিরাভরণা নারীর মত একেবারে সজ্জাহীনা। অত বড় প্রকাণ্ড বাড়ীটায় মনুষ্য-বাসের কোন চিহ্ন আছে বলিয়াও বাহির হইতে মনে হয় না। কেবল সেই নিবাত-নিষ্কম্প দীপমালা বক্ষে ধরিয়া প্রকাণ্ড বাড়ী উন্নত শিরে দণ্ডায়মান থাকিয়া নিশাচর কৌতুহলী পথিকের মনে কেবল অজ্ঞাত রহস্যের নূতন আভাষ জাগাইয়া তুলিতেছিল। আমি অবাক হইয়া শুধু সেই আলোক-মালার পানে চাহিয়া রহিলাম। "এ কি রহস্য? বিপদের প্রতি ব্যঙ্গোক্তি করিতে এ কি উৎসবের বর্ত্তিকা জ্বালাইয়া তোলা!"

অতি নিকটে ব্যথিত নিশ্বাসের মৃদু শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া চাহিলাম। "এসথার, ভয় পেয়েচ ?"

"চল দাদা, আমরা বাড়ী ফিরে যাই। কে জানে, কেন, আমার বড় ভয় হচ্চে।"

এ পর্য্যন্ত এসথারকে ক্রুমবার হল সম্বন্ধে আমি কোন কথাই বলি নাই। কি জানি, ছেলেমানুষ ! হয়ত সে ভয় পাইতে পারে ! তাহার মাথায় হাত রাখিয়া সান্ত্বনা দিবার জন্য আমি হাসিয়া বলিলাম, "কিসের ভয় ! ভয়ের কি পেলে, শুনি ? এমন আলো,—আনন্দ করবারই ত কথা।"

"আমি কিছুই বল্‌তে পারচি না, দাদা ! কিন্তু জেনারেলের জন্য সত্যই আমার বড় কষ্ট হচ্চে। কেন, তিনি এমন করে বাড়ীর চারিদিকে আলো জ্বেলে দিনের মত করে রাখেন ? রাত্রিকে তাঁর কিসের এত ভয় ? আমাদের পাড়াতেও সবার কাছে শুনেচি, এঁরা নিত্যই শুধু-শুধু এম্‌নি আলো জ্বেলে রাখেন। কোন লোক দেখা কর্‌তে গেলে ভয়ে ঘরের মধ্যে আত্মগোপন করেন। নিশ্চয়ই তাঁর জীবনের সঙ্গে এমন কোন ভয়ানক ঘটনা জড়িত আছে, যার জন্যে তাঁকে এমনি ভাবে থাকৃতে হয়েচে। কত বড় বড় যুদ্ধের যোদ্ধা,—তাঁর এই দশা ! দাদা—এ কি কম দুঃখের কথা ! সত্যই আমার তাঁর জন্যে কান্না পাচ্চে।"

করুণাময়ী নারী ! কঠিন-চিত্ত পুরুষ আমরা, তাই তোমাদিগকে তুচ্ছ ভাবিয়া নিজের জ্ঞানের বড়াই করিয়া বেড়াই ! সান্ত্বনার ভাষা খুঁজিয়া পাইলাম না, নীরবে তাহাকে সঙ্গে লইয়া গৃহের পথে ফিরিলাম। জেনারেলের সম্বন্ধে যতটুকু সংবাদ আমি জানি, ইচ্ছা করিয়াই তাহা ভাঙ্গিলাম না। সে-ও নিজে হইতে আর কোন কথা তুলিল না। আমার মনে হইল, শুধু আলো দেখিয়াই হয়ত সে ভয় পায় নাই ! তাহার ভক্তবৃন্দ দরিদ্র চাষাভুষাদের নিকট হইতে হয়ত সে আরও কোন নূতন তথ্য সঞ্চয় করিয়াছে, যাহাতে তাহার কোমল হৃদয় এতটা বেদনাতুর হইয়াছে ! অবশ্য পরে জানিয়া ছিলাম, আমার সে অনুমান নিতান্ত মিথ্যা নহে।

প্রথমতঃ আমাদের এই নূতন প্রতিবেশী-দের সম্বন্ধে দারুণ কৌতুহলই, তাঁহাদের প্রতি আমাদিগকে মনোযোগী করিয়া তুলিলেও পরে তাঁহাদের সহিত আমাদের এমন ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া গিয়াছিল, যে আমরা আর শুধু কৌতুকাবহ রহস্যের দর্শকমাত্র না থাকিয়া তাঁহাদের সুখ-দুঃখের সহিত সম্পূর্ণভাবেই জড়াইয়া পড়িলাম। মরডণ্ট আমার নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করে নাই। সুবিধা পাইলেই সে মধ্যে মধ্যে আমাদের বাড়ী আসিত। অনেক সময় তাহার সুন্দরী ভগিনীটিকে সে সঙ্গে আনিতে ভুলিত না। আমরা চারি জনে মাঠে-বাগানে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। মেঘ-নির্ম্মুক্ত দিনে সমুদ্র-বক্ষে নৌকায় চড়িয়া বেড়াইয়া আসিতাম। কখনও বা জলে ছিপ ফেলিয়া মরডণ্ট ও আমি মাছ ধরিতাম ; আর গেব্রিয়েল, এস-থারের নিকট তাহার নূতন নূতন পাঠের পরীক্ষা দিয়া প্রতিদানে করুণাময়ী এসথারের নিকট হইতে প্রচুর আদর পাইয়া লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিত। ক্বচিৎ আমার প্রসংশমান

দৃষ্টির সহিত তাহার দৃষ্টি মিলিত হইলে বালিকার ললাট হইতে গণ্ড অবধি যেন রক্ত উছলিয়া পড়িত। বাস্তবিকই তাহাদের মেধা অসাধারণ ছিল। যে শিক্ষা লাভ করিতে সাধারণের এক মাস সময় লাগে, ইহারা তাহা এক সপ্তাহের অনধিক কালেই আয়ত্ত করিয়া ফেলে! এমন মণিকে খনির তিমির গর্ভে জেনারেল প্রচ্ছন্ন রাখিতে চাহেন! কস্তুরী-মৃগ যেমন আপনার সৌরভ-সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, শিশুর মতই সংসার জ্ঞান-অনভিজ্ঞ এই দুইটি ভাই-বোনও তেমনি আপনাদের সৌন্দর্য্য-সদ্‌গুণের সীমা নির্দ্ধারণে অনভিজ্ঞ। বিলাসিতা বা কৃত্রিমতা-হীন নির্ম্মল দুইটি মানব প্রাণ সংসারের বাহিরে অত্যন্ত গোপনে বর্দ্ধিত হইয়া সংসারের পাপ কুটিলতার অন্তরালে বাস করিতেছিল! অনেক সময় সেই দুইখানি সরল মুখের পানে চাহিয়া আমার মনে হইত, তাহারা সেই আদি কালের আদম ও ইভের মতই যেন অন্য জগতে বাস করিতেছিল, বুঝি, জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাওয়াইয়া আমরাই তাহাদিগকে সংসারের উত্তপ্ত মরু-বাতাসের মধ্যে টানিয়া আনিতেছি।

কিন্তু আমার কল্পনা আমাকে পীড়িত করিলেও বাস্তবিক আমাদের সঙ্গ তাহাদের পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর হয় নাই। মুক্ত আকাশের তলে, সীমাহীন নক্ষত্র-চন্দ্রাতপ-খচিত প্রান্তরের মধ্যে ছুটাছুটি করিতে, তরঙ্গ তাড়িত সমুদ্র-বক্ষে সায়াহ্ন-সূর্য্যাস্ত দেখিতে দেখিতে নৌকা-ভ্রমণে,—কখনও সোনালী রৌদ্র-রঞ্জিত, বিহঙ্গকুল-কাকলিত, মৃদু পবন-সঞ্চালিত, চেরি ফুলের সুগন্ধ-পূরিত সুমধুর প্রভাতে আমাদের ছোট বাগানটিতে পরস্পরের সহিত হাত-ধরাধরি করিয়া গল্প করিতে, তাহাদের বাধাহীন সরল আনন্দ, পুষ্পগন্ধের মতই উচ্ছ্বসিত আবেগে ঝরিয়া পড়িত। বন্দী-শালার প্রহরী-শাসন হইতে মুক্ত হইয়া চির-কারাবাসীর যে আনন্দ, খোলা মাঠের খোলা বাতাসে মুক্ত আকাশের নীচে উড়িয়া বেড়াইতে পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গের যে সুখ, স্বাধীন জগতের স্বাধীন জীব আমরা, তাহা কল্পনাতেও আনিতে পারি না। আমাদের বন্ধুত্ব এমনই ভাবে ক্রমে গভীর ভালবাসায় পরিণত হইয়া আসিল।

নিজেদের কথা অন্তর-মধ্যে গোপনে রাখিতে হইলেও সাধারণকে এইটুকু জানাইয়া রাখা প্রয়োজন যে, ইতিমধ্যে গেব্রিয়েলের সহিত আমার এবং মরডন্টের সহিত এস্‌থারের ভবিষ্যৎ জীবনের বন্ধন বেশই দৃঢ় সূত্রে জড়িত হইয়া গিয়াছিল, আর এ বন্ধনে চির কালের মত আবদ্ধ থাকিবার জন্য আমরা পরস্পরের ভগবানের নিকট প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইয়াছিলাম।

জেনারেলের সহিত আমাদের যে কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছিল, ইহা হইতেই বোধ হয় সকলে তাহার পরিচয় পাইবেন।

বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া গেলে মরডণ্ট ও গেব্রিয়েল সর্ব্বদাই আমাদের বাড়ী বেড়াইতে আসিত। আমরাও সুবিধামত তাঁহাদের বাটীর বাহিরে সাক্ষাতের সুযোগ অন্বেষণ করিতাম। জেনারেলের বাতের বেদনা বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি ইদানীং আর এ সকল সংবাদ রাখিবার অবসর পাইতেন না।

প্রথম দিন আলাপের পর হইতেই বাবা তাহাদিগকে ঠিক আমাদের মতই স্নেহ

করিতেন। তাঁহার নিকট আমাদের কোন কথাই গোপন ছিল না। আজকাল আবার তিনি প্রাচ্য কবিদের দুই একটি সময়োচিত কবিতা দ্বারা আমাদের নবীন মনোভাবের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া স্নেহ-মিশ্র দুই চারিটা মিষ্ট পরিহাসও করিতেন; সময় সময় যখন জেনারেলের খেয়াল সজাগ হইয়া উঠিত, তখন মরডণ্ট বা গেব্রিয়েল কেহই গৃহের বাহির হইতে সাহস করিত না। কোন কোন দিন তিনি ফটকে চাবী দিয়া নিজেই বাড়ীর চারি দিকে প্রহরীর কার্য্য করিয়া বেড়াইতেন। কোন দিন বা রাস্তার চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মধ্যে মধ্যে তীক্ষ্ণ সন্দেহ-পূর্ণ দৃষ্টিতে বাড়ীর পানে চাহিয়া দেখিতেন। তাঁহার তখনকার ভাব দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইত যে তিনি তাঁহার বাড়ীর লোকগুলিকেও ঈষৎ সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছেন! তাহারা হয়ত গোপনে বাহিরের লোকদের সহিত মিশিতে আরম্ভ করিয়াছে। এক এক দিন হলের পাশ দিয়া কোথাও কোন কাজে যাইবার সময় দেখিতাম, জেনারেলের শীর্ণ মুখ, সন্দিগ্ধ দৃষ্টি বেড়ার ফাঁক ভেদ করিয়া আমারই প্রতি নিবদ্ধ হইয়াছে! কখনও বা তিনি অন্ধকারে গাছের তলায়-তলায় সতর্ক লঘু গতিতে বেড়াইতেছেন! তাঁহাকে দেখিলে একটা অব্যক্ত বেদনায় আমার সারাচিত্ত ভরিয়া উঠিত। তাঁহার সেই ভীত সন্ত্রস্ত ভাব, ব্যাকুল দৃষ্টি, চিন্তা-কাতর বিবর্ণ মুখশ্রী, ও কুঞ্চিত ললাটে মানসিক চিন্তার সুগভীর রেখা—সে সব দেখিলে কে বলিবে যে এই সদা-শঙ্কিত দুর্ব্বল-চিত্ত মানবই একদিন রণ-ক্ষেত্রে অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়া নশ্বর জগতে অবিনশ্বর কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। আমার অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া একটা সুগভীর দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইত—হায়,—হতভাগ্য, অসুখী জীব!

সন্দিগ্ধচেতা বৃদ্ধের সহস্রচেষ্টা সত্ত্বেও আমাদের মিলনে এতটুকু বিঘ্নের সৃষ্টি হয় নাই। হলের চারিধারে যে কাষ্ঠ প্রাচীর দেওয়া হইয়াছিল, তাহারই দুইখানা তক্তার জোড় একটু শিথিল ছিল, বহু চেষ্টায় তক্তা দুইখানা খুলিয়া আমরা সেই দ্বারপথে যাতায়াত করিতাম, সঙ্গে সঙ্গেই আবার তক্তা দুইখানা সাবধানে যথাস্থানে সংযোজিত করিয়া রাখিতাম। বাড়ীর চারিদিকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বেড়ানোতে জেনারেলের কোন আলস্য ছিল না, তাই সর্ব্বদাই আমাদের মনে একটা ভয় ছিল, কখন কোথায় তিনি আসিয়া পড়িবেন! তাহার কোন স্থিরতা ছিল না! কাজেই আমাদের গোপন সাক্ষাৎটুকু তাঁহার বাতের বেদনা কমিবার সঙ্গে সঙ্গেই সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিল।

সে সব দিন এখনও কেমন স্পষ্ট আমার মনে জাগিয়া আছে! যে ভয়ানক ঘটনা আমাদের মাথার উপর দিয়া অগ্নিপুচ্ছ ধূমকেতুর ন্যায় আকস্মিক মহাপ্রলয়ের ভীষণ বজ্রসংঘাত আনিয়া দিয়া জীবনের অনেকখানি অংশকে একেবারে বিদগ্ধ করিয়া গিয়াছে, সেই ভয়ানক ঘটনার অস্পষ্ট ছায়ায় দাঁড়াইয়াও আমাদের তখনকার সেই ছোটখাট মিলনের দিনগুলি কত সুখ-স্বপ্নই না বহন করিয়া আনিত! কঠিন মাটির উপর ঘর বাঁধিয়া মানুষ বেশ সুখে নিশ্চিন্ত মনে ঘরকন্না করে, সহসা কোথা হইতে অভাবনীয়ভাবে

ঝড় আসিয়া এক মুহূর্ত্তে তাহার সে ঘর-দ্বার ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সমস্ত সমভূমি করিয়া দিয়া যায়। বাহ্য প্রকৃতিতেই যে শুধু এমন হয়, তাহা নহে—মানব-জীবনেও সন্ধান করিলে এমন কত শত দৃষ্টান্ত মিলে। যে অতীত সরসী-সলিলে আমরা পূর্ব্বস্মৃতি নিমজ্জিত রাখি, তাহার জলরাশি বড় অল্প আলোড়নেই আবিল হইয়া উঠে;—তখন কেবল একটা বুকভাঙ্গা বেদনার হাহাকার, একটা অস্পষ্ট আকুলতাই অবশেষ রহিয়া যায়। যদিও আমাদের তখনকার অতীত জীবনে দুঃখের ভীষণ ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছে, যদিও প্রলয়নিশির গভীর অন্ধকারে আমরা তলাইয়া গিয়া ভাবিয়াছি, বুঝি, ইহাই শেষ, তথাপি যে করুণাময় পরমেশ্বরের নিয়মে দিনের পর রাত্রি, আলোর পর অন্ধকার, সেই পরমেশ্বরই দুঃখের মধ্যে সুখের স্মৃতি আমাদের জন্য প্রচুর পরিমাণে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন।

আমার মনে পড়ে, যখন আমি মাঠের মধ্যে আলের উপর দিয়া ব্যগ্র আগ্রহ বক্ষে বহিয়া ধীরে ধীরে ঈপ্সিত পথে অগ্রসর হইতাম, নলকর্ষিত ভূমির একটা সলিলসিক্ত আর্দ্র গন্ধ আমার নাসিকায় প্রবেশ করিত; ভিজা ঘাসের মধ্য হইতে কোন্ এক চারাগাছের সদ্য-ফোটা ফুলের মিষ্ট গন্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসিত। জেনারলের বাগানে সায়াহ্নে বৃষ্টির জলে-ধোয়া সবুজ গাছপালার মধ্যে সাদারাঙ্গা মণি-গাঁথা ফুলের শোভা দূর হইতে চোখে পড়িত। আর দেখিতাম, বেড়ার উপর হাত রাখিয়া গেব্রিয়েল তাহার নীল চোখের কোমল দৃষ্টি লইয়া পথের দিকে চাহিয়া নীরবে আমার প্রতীক্ষা করিত। পালে বাতাস লাগিলে তরণীর গতি যেমন ক্ষিপ্র, চঞ্চল হইয়া উঠে, আমার সমস্ত অন্তরাত্মাও তেমনি চঞ্চলভাবে তাহার অভিমুখে মুহূর্ত্তে ছুটিয়া যাইতে চাহিত।

কতদিন আমরা একত্রে মুগ্ধ নেত্রে প্রকৃতির শোভা দেখিতাম। দিগন্তব্যাপী নীলাম্বুরাশি, ফেনশীর্ষ, শুভ্র তরঙ্গে সে নীল বক্ষ খচিত। জ্বালাহীন রক্ত গোলকাকার সায়াহ্ন-সূর্য্য সেই নীলাম্বুরাশির নীলিমার মধ্যে ডুবিয়া যাইতেছে। দিগ্বলয়ের মধ্যস্থলে কেবল এই একটি মাত্র বিন্দু,—মহান্ বিশ্ব-রাজ্যের এক ক্ষুদ্রতর অণুকণা চতুর্দ্দিকের নীলিমার মধ্যে কৃষ্ণ-তারকার ন্যায় ভাসিয়া চলিয়াছে। শ্বেত ফেনরাশির মুখে গোধূলির গোলাপী আলোক ক্রমে ধূসর বর্ণে পরিণত হইয়া আসিত। এবং উত্তর পশ্চিমে অতিদূরে থাষ্টন পর্ব্বতের উচ্চ চূড়ায় সূর্য্যাস্তের শেষ রক্তরেখা মিলাইয়া যাইত। সমুদ্র-বক্ষে বেলফাষ্টগামী অর্ণবযান বিস্তারিত-পক্ষ চঞ্চল পক্ষী-শিশুটির মতই কৃষ্ণ ধূম উড়াইয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই চোখের সম্মুখে অদৃশ্য হইয়া যাইত। এই সকল শোভা-সৌন্দর্য্যের মধ্যে দুইজনে আত্মহারা হইয়া থাকিতাম! দেখিতে দেখিতে গেব্রিয়েল্ কখনও বলিয়া উঠিত, "জন, কি সুন্দর—কি মধুর, এই প্রকৃতির রাজ্য! আমরা যদি সব বিপদ-আপদ টেনে ফেলে দিয়ে এমনি আনন্দে এমনি স্বাধীনভাবে সমুদ্রের বুকে ঢেউয়ের মত খেলা কর্‌তে পেতেম!"

একদিন আমি এই মন্তব্যের সঙ্গে সঙ্গেই সস্নেহে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি বিপদ্-আপদ তুমি

ঝেড়ে ফেল্‌তে চাইছ, বেলা? আমি কি তোমায় এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার অধিকার, এখনও পাইনি? তোমার সুখ-দুঃখের অংশ গ্রহণ করবার কি আমার কোন অধিকার নেই?" সুগভীর বিষাদের ছায়া বালিকার ম্লান নেত্রে প্রতিভাত হইল। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া সে কহিল, "তুমি ত জান, তোমার কাছে আমার কোন কথাই গোপন নেই—বাবার এই অস্বাভাবিক ব্যবহারের জন্যই আমাদের কত কষ্ট! ভেবে দেখ দেখি, এ কি কম দুঃখ,—যিনি একদিন মহাবীর নাম গ্রহণ করে জগতের মধ্যে সম্মানের উচ্চ সিংহাসনে সগর্ব্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনিই আজ যেন কোন ভীষণ অপরাধে অপরাধীর মত সংসারের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটাছুটি করে, প্রাচীর-বেষ্টনের সংকীর্ণ সীমানায় আপনাকে রুদ্ধ রাখবার চেষ্টা করচেন, পৃথিবীটা যেন তাঁর চোখ থেকে মুছে গিয়ে একটুখানি সীমাবদ্ধ ভূমিখণ্ডে পরিণত হয়েছে!"

বালিকার কম্পিত রুদ্ধ স্বরে এবং অশ্রুগোপনের অভিপ্রায়ে সহসা মুখ ফিরাইয়া লওয়ায়, আমার মনের বেদনাহত স্থানটায় আরো আঘাত লাগিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে তাহার ডান হাতখানি নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া আমি জিজ্ঞাসালাম, "আচ্ছা, গেব্রিয়েল, তুমি কি মনে কর, তোমাদের বিপদটা সত্য!"

"তা আমি জানি না।"

আমি বিস্ময় গোপন করিতে না পারিয়া সহসা বলিলাম, "কিন্তু তোমার দাদা ত সবই জানেন?"

বালিকা শান্তভাবে উত্তর দিল, "তা জানেন,—মাও জানেন,—আমার কাছে তাঁরা বরাবরই সব গোপন করে থাকেন। আজকাল বাবার চাঞ্চল্যটা এত বেশী হয়েছে—যে তিনি যেন দিনরাত ভয়ে একবারে অজ্ঞান হয়ে রয়েচেন। সামনেই ৫ই অক্টোবর। সে তারিখটা চলে গেলে তবে তিনি আবার অনেকটা শান্ত হবেন!"

সমস্যা ক্রমেই যেন জটিল হইতে জটিলতর হইয়া আসিতেছিল। এও এক নূতন তথ্য! বিস্মিত হইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি বল্লে, গেব্রিয়েল—৫ই অক্টোবর?"

ম্লান মুখের নত দৃষ্টি ধীরে ধীরে উন্নমিত করিয়া গেব্রিয়েল উত্তর দিল, "তাই যে আমি বরাবর দেখে আসচি। ৫ই অক্টোবর এলেই বাবার ভয় যেন চরমে এসে দাঁড়ায়। আমার বেশ মনে আছে, এই ৫ই অক্টোবর দাদাকে আর আমাকে বাবা চাবি বন্ধ করে রেখে দেন, সে জন্যে সেদিন যে কি ঘটনা ঘটে, আমরা তা কিছুই জান্‌তে পারি না। কিন্তু জন্, এটা আমরা বেশ লক্ষ্য করেচি যে, ঐ দিনটার পর থেকে ফিরে ঐ তারিখ না আসা পর্য্যন্ত বাবা অনেকটা ভাল থাকেন। এখন ত সেপ্টেম্বরের শেষ! অক্টোবরের আর বড় বেশী দেরি নেই।"

গেব্রিয়েলের কথায় আমার চিত্তে বিস্ময়ের মাত্রা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছিল। আমি কহিলাম, "৫ই অক্টোবরের ত আর মোটে দশ দিন বাকী,—আচ্ছা গেব্রিয়েল, তোমাদের সমস্ত অনাবশ্যক ঘর গুলোতে পর্য্যন্ত রাত্রে অত আলো জ্বালা থাকে, কেন, বল দেখি?"

বিষাদের ক্ষীণ হাসি গেব্রিয়েলের সূক্ষ্ম ওষ্ঠ-পুটে ফুটিয়াই মিলাইয়া গেল। "তা'হলে সেটাও তুমি লক্ষ্য করেচ জন। এও বাবার একটা ভয়ের চিহ্ন। সমস্ত বাড়ীতে কোথাও তিনি এতটুকু অন্ধকার সহ্য করতে পারেন না; চাকরদের উপর কড়া হুকুম, সন্ধ্যার আগেই উপরে-নীচে সমস্ত ঘর-বারাণ্ডা-জানলা চারদিকে আলো দিয়ে একেবারে দিনের বেলার মত করে তুলতে হবে। বাবা নিজেই রোজ চারদিকে তদ্বির করেন,—হুকুম ঠিক্-ঠিক্ তামিল হচ্চে কি না!"

আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "তোমরা যে চাকর-বাকর টিকিয়ে রাখ্‌তে পার— এই-টুকুই সব চেয়ে আশ্চর্য্য! ছোটলোকেরা একেই ত কুসংস্কারে ভয়ানক আচ্ছন্ন, তার উপর এ সব জিনিষ তাদের জ্ঞানের বাইরে, তারা যা বুঝ্‌তে পারে না—তা আবার একেবারেই তারা সহ্য করতে পারে না।"

আসন্ন সন্ধ্যার ধূসর ম্লানিমা বালিকার ম্লান মুখের উপর দীর্ঘ ছায়া ফেলিয়া দ্রুত অগ্রসর হইতেছিল,—একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া সে উত্তর দিল, "আমাদের ঝি র'াধুনী—তারা অনেক দিনকার পুরোনো লোক। আমাদের ধরণধারণের সঙ্গে তারা একেবারেই মিশে গেছে। তা ছাড়া নূতন যারা থাকে, বেশী মাইনে দিলে এক রকম করে চলে যায়। এখানকার লোকের মধ্যে—এক ঐ ইজরে'টেক কোচ্‌ম্যান,—ও লোকটা ত বেশ সাহসী, সৎ; তবে একটু বোকাটে ধরণের বলেই মনে হয়।"

আমি আমার পার্শ্বস্থিতা সুন্দরী তরুণীর পানে চাহিয়া দেখিলাম। নির্দ্দোষ, নিষ্কলঙ্ক ছবি! সংসারানভিজ্ঞ অকৃত্রিম সরলতার স্বচ্ছতা তাহার সেই মুখখানিকে যেন চিত্তের দর্পণ-স্বরূপই করিয়া রাখিয়াছিল। তথাপি পিঞ্জরের পাখীর মতই একটা উদ্বেগ কাতর ব্যাকুলতা তাহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে যেন দুই ব্যগ্র বাহু বিস্তার করিয়া আমারই পানে ছুটিয়া আসিতেছিল! যেন তাহার সারা চিত্ত ব্যথিত বেদনায় বলিতে চাহিতেছিল, "ওগো! আমায় স্বাধীনতা দাও, আলো দাও, মুক্তি দাও—আমি বুঝি হাঁফাইয়া মরি!"

কতকটা আত্ম-বিস্মৃতভাবেই আমি বলিলাম, "গেব্রিয়েল, এ তবে তোমার থাক্‌বার মত স্থান নয়। তোমার এ অবস্থা থেকে তোমায় উদ্ধার করবার অধিকার কেনই বা তুমি আমায় দিচ্চ না? আমি তোমার বাবার কাছে গিয়ে তোমায় ভিক্ষা করে চেয়ে নি—!"

শরাহত মৃগ-শিশুর ন্যায় সে চমকিয়া কাঁপিয়া উঠিল। আমি দেখিলাম, তাহার বিবর্ণ নীল ঠোঁট দুইখানি অব্যক্ত বেদনায় থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। কম্পিত স্বরে ব্যথিত বালিকা কহিল, "ক্ষমা কর, জন, এমন কাজও তুমি করো না, কখনো;—তা হলে কি হবে জান? সেই রাত্রেই, বাব আমাদের নিয়ে চলে যাবেন,—কোথায়—ঈশ্বর জানেন, কোথায়! কতকাল ধরে কত দেশ ঘুরে তিনি আমাদের নিয়ে এমন কোন বন্ধুহীন নির্জ্জন পুরীতে কঠোর শাসনে বন্দী করে রাখবেন, যেখানে একটা পাখীর মুখেও তোমাদের কোন সংবাদ পাব না। চোখের

দেখা,—সে-ত একেবারেই অসম্ভব! মনে ভেবে দেখ দেখি—সে আমাদের কি জীবন্মৃত হয়ে থাকত হবে!—কি ভয়ানক! আমি ত কল্পনা করতেও পারি না। তা ছাড়া এই যে তাঁর বিনানুমতিতে বাড়ীর বাইরে যাতায়াত—বাইরের লোকেদের সঙ্গে মেলামেশা করি,—এ অপরাধ জানতে পারলে তিনি ক্ষমা করবেন না, কখনই না।"

আমি একটু অবিশ্বাসের সহিত উত্তর দিলাম,—"কৈ, তাঁকে দেখে ত তেমন নিষ্ঠুর বলে মনে হয় না। আমি দেখেচি, বাইরে থেকে তাঁর মুখের ভাব যতই কঠোর দেখাক, ভিতরে অন্তঃসলিলা নদীর মত একটি কোমলতার ক্ষীণ নির্ঝর-ধারা যে বয়ে চলেছে, তার বেশ আভাষ পাওয়া যায়।"

দুই হাত অঞ্জলি-বদ্ধ করিয়া যেন আপনার উদ্বেলিত অন্তরের উচ্ছ্বাস রোধ করিতে করিতে বালিকা ব্যাকুল কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "না, না, জন্! বাবাকে তুমি ভুল বুঝ না, সত্যই তিনি নিষ্ঠুর নন,—তাঁর স্নেহ অগাধ! কিন্তু তবুও যদি কেউ তাঁর অমতে কোন কাজ করে বা তাঁর কাজে বাধা দেয় তা হলে তিনি তা কোন মতেই সহ্য করতে পারেন না; তখন তিনি এত ভয়ানক রেগে ওঠেন যে সে বলা যায় না। সে রকম রাগ তুমি তাঁর কখনও দেখনি! ঈশ্বর করুন্, যেন কখনও তা দেখ্‌তেও না হয়! তিনি নিজে কখনও কোন অন্যায় করেন নি তাই অপরের অন্যায়ও কখনও সহ্য করতে পারেন না। এই দৃঢ়তাই তাঁকে কঠোর দায়িত্বপূর্ণ সৈনিক জীবনে উন্নতির শীর্ষ সীমায় তুলে দেবার সহায় হয়েছিল। গল্প মনে করো না, আমি যথার্থই বলচি, ভারতবর্ষে সকলেই তাঁকে খুব মহৎ লোক জেনে সম্মান করত। সৈন্যরা তাঁর আদেশে হাসিমুখে মৃত্যুর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়্‌তে এতটুকু ইতস্তত করত না।"

"আচ্ছা! বল দেখি, তখনও কি তাঁর এই রকম উদ্বেগ, ভয়, কি চাঞ্চল্য ছিল?"

"কখনও কখনও হত বৈ কি,—কিন্তু এতটা নয়; তাঁর বিশ্বাস বিপদটা এবার ক্রমেই এগিয়ে আস্‌চে। মাথার উপর খোলা তলোয়ার যেন ঝোলান রয়েছে, প্রতি মুহূর্ত্তেই তার পতন-সম্ভাবনা! কি ভয়ানক, বল দেখি! আমার পক্ষে সব চেয়ে কষ্টকর এই যে, বিপদটা কোন্ দিক থেকে আস্‌বে, তা জানা দূরে থাক,—তার ছায়াটুকু অবধি আমি ধরতে পার্‌চিনে।"

প্রিয়তমার হৃদয়-বেদনা আত্ম হৃদয়ে অনুভব করিয়া আমি মর্ম্মাহত হইলাম। বালিকার ব্যথা-কাতর অন্তরে সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে একটু নিকটে টানিয়া সস্নেহে তাহার হাত দুইখানি ধরিয়া ধীরে ধীরে বলিলাম, "গেব্রিয়েল,—আমাদের মাথার উপর ঐ যে নীল নির্ম্মল আকাশ, সম্মুখে তরঙ্গোচ্ছ্বাসময় ফেনপুঞ্জকিরীট দিগন্ত-বিস্তৃত বারিবিশাল মহাসমুদ্র, আর পদতলে এই যে সবুজ মখমলের আস্তরণ-বিছানো হাস্যময়ী ধরণী, এ সব কি সুন্দর! কি শান্তিময়! এই আনন্দ-পূর্ণ জগতে এই অকারণ উদ্বেগ কেন, গেব্রিয়েল? ঐ ধূসর মাঠের মাঝখানে লাল টালিতে-ছাওয়া ছোট ছোট কুঁড়ে ঘরগুলির পানে চেয়ে দেখ,—ওখানে যত সরল ঈশ্বর-বিশ্বাসী মানুষের বাস। দেশে

ওদের কেউই শত্রু নেই, নিজের পরিশ্রমে ওরা খায়। আমাদের এখান থেকে সাত মাইলের মধ্যে একটি বড় সহর আছে,—শান্তি-রক্ষার জন্য যা কিছু প্রয়োজন, তাব সমস্তই সেখানে মজুত,—সেখান থেকে দশ মাইল তফাতে একটা ছাউনি। একটি টেলিগ্রাফের অপেক্ষা, অতি অল্প সময়ের মধ্যে একদল সৈনিক এখানে এসে হাজির হতে পারে। এখন বেশ করে ভেবে বল দেখি, এই যে নির্জ্জন প্রদেশ, এখানে তোমাদের বিপদের কী সম্ভাবনা থাকৃতে পারে? তুমি কি জোর করে বল্‌তে পার এই যে বিপদ-সম্ভাবনা,—এটা তোমার বাবার একটা মনের খেয়াল মাত্র নয়?"

"আমি তোমায় নিশ্চয় বল্‌তে পারি, জন্‌, এটা একেবারে যে কল্পিত বিপদ তা নয়। যদিও ডাক্তার ডেয়ারি বাবাকে দু-একবার দেখতে এসেছিলেন বটে, কিন্তু সেটা সাধারণ অসুখের জন্যে।"

আমার অন্তরে যে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, তাহারই বলে একটু হাসিয়া আমি বলিলাম, "তা হলেও আমি তোমায় শপথ করে বল্‌তে পারি, তোমাদের কোন বিপদ ঘট্‌বে না;—এটা নিশ্চয়ই কোন মানসিক ব্যাধির ফল। সত্য যদি এতে কিছুমাত্র থাকত, তা হলে এতদিনে তুমি কোন-রকমে না-কোন-রকমে তা জান্‌তে পার্‌তেই।"

আমার এ সান্ত্বনার ভাষায় গেব্রিয়েলের মুখ হইতে বিষণ্ণতার ছায়া অপসারিত হইল না। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ঈষৎ গম্ভীরভাবে সে উত্তর দিল, "যদি এটা বাবার মনের বিকারই শুধু হয়, সত্যি এতে কিছু না থাকে, তা হলে দাদা এই অল্প বয়সে কেন অমন বুড়ো হয়ে গেলেন? আর মা? তাঁর অমন সুন্দর চেহারা ভয়ে-ভাবনায় শুকিয়ে যেন কি হয়ে গেছে!—এ সবই কি তুমি খেয়াল বল্‌বে?"

"অসম্ভব মনে কোরো না, গেব্রিয়েল! তোমার বাবার দীর্ঘকাল-ব্যাপী মানসিক ব্যাধি দেখে-দেখে, আর তাঁর এই কোপন স্বভাব সহ্য করে করে—তাঁদেরও মনের ভাব এই রকম হয়ে পড়েচে। সর্ব্বদা সাপ সাপ শুনতে শুনতে, রজ্জুতেও মানুষের সর্প-ভ্রম হয়, জান ত। সেই রকম সর্ব্বদা বিপদের সম্ভাবনার কথা শুনে শুনে এখন ওঁরাও সেটাকে প্রকৃত বলে মেনে নিয়েচেন।"

সজল চক্ষে, মৃদু-নিক্ষিপ্ত শ্বাসে বালিকা উত্তর দিল, "না জন্‌—তা নয়। বাবার ভয় আর রাগ, দুই-ই ত আমি বরাবর দেখে আস্‌চি; তবে আমি কেন মার মত বা দাদার মত বুড়ো হয়ে যাইনি? তার কারণ, ওঁরা যা জানেন, সেই ভয়ানক কথা,—আমি তা জানি না।"

বালিকার যুক্তিপূর্ণ কথার উপযুক্ত উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া, শুধু তাহাকে শান্ত করিবার ইচ্ছায় আমি একটু হাসিয়া উত্তর দিলাম, "তোমাদের এই 'বিপদ'টা যেন একটা ভৌতিক ব্যাপারের মত বলেই আমার মনে হয়, তবে সুখের বিষয়, আজকালকার দিনে ভূতে আর বড় মানুষের পেছু নেয় না। সভ্য সমাজের ভূতেরাও ক্রমশঃ সভ্য হয়ে উঠ্‌চে কি না! ভারী লজ্জার কথা গেব্রিয়েল, যে, তোমরাও এ সব কুসংস্কার মেনে চল। আমায় বিশ্বাস কর বেলা! আমি বল্‌চি, তোমাদের

বিপদ বলে কোন জিনিষ পৃথিবীতে নেই, ভারতবর্ষের তপ্ত আগুনে হাওয়াতেই তোমার বাবার এই মস্তিষ্ক বিভ্রাট ঘটেছে।"

আমার কথার সে কি উত্তর দিত, জানি না; সহসা চমকিয়া সে একদিকে তাহার শঙ্কিত স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া চা'হয়া রহিল। আমি দেখিলাম, তাহার মুখ পাংশু, নীল হইয়া গিয়াছে—চোখের দৃষ্টি দারুণ ভয়ে স্থির হইয়া পড়িয়াছে—সবিস্ময়ে তাঁহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া সেইদিকে আমি চাহিয়া দেখিলাম,—কি সর্ব্বনাশ! ভয়ে আমার অন্তরাত্মা অবধি কাঁপিয়া উঠিল।

বেড়ার ভিতরকার ফাঁক দিয়া আমি দেখিলাম, আমাদের অদূরে একটা ঝাউগাছের তলায় কে-একজন দাঁড়াইয়া আছে। লোকটির মুখের যতটুকু দেখা যাইতেছিল, তাহা হইতেই বেশ বুঝিলাম, একটা বিজাতীয় ঘৃণায় ও ক্রোধে তাহার মুখখানা ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে।

আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছি বুঝিতে পারিয়া তিনি বেড়ার ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া আসিলেন এবং ঠিক আমাদের সম্মুখেই সরলভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। সন্দেহ ভীষণ সত্যে পরিণত হইয়া উঠিল। তিনি আর অপর কেহই নহেন, স্বয়ং গৃহস্বামী জেনারেল হিথারষ্টন। ক্রোধে তাঁহার মাথার চুলগুলা অবধি খাড়া হইয়া উঠিয়াছিল। বাবার নিকট শুনিয়াছিলাম, পূর্ব্বকালে প্রাচ্য দেশের সাধুদের চোখের ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে নাকি মনুষ্য-দেহ দগ্ধ হইয়া যাইত। তখন তাহা গল্প-কথাই মনে করিয়া ছিলাম। আজ সহসা সেই কথা আমার স্মরণ হইল। দৃষ্টির যদি দাহিকা-শক্তি একালেও থাকিত, তাহা হইলে আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি—তাঁহার সেই প্রখর দৃষ্টির অনলে আমি তখনই পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতাম! ভয়ে আমার দেহের রক্ত-স্রোত সহসা যেন নিশ্চল হইয়া জমাট বাঁধিয়া উঠিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।

প্রাক্ ঐতিহাসিক অতিকায় জন্তু

হেম্বার্গের সন্নিকটে ষ্টেলিঞ্জেন নামক স্থানের প্রাণি-বাটিকায় পুরাকালের পৃথিবীর যাবতীয় ভয়াবহ ও বিস্ময়কর জীবজন্তুর কল্পিতমূর্ত্তি সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। মাত্র তিন বৎসর হইল এই বিরাট ব্যাপারের অনুষ্ঠান সম্পাদিত হইয়াছে, ইহার মধ্যেই ইহার নাম ভুবনখ্যাত হইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃতির কুসুমরাগধূসরিত শ্যামল শোভাময় হেম্বার্গের উপবনে এই প্রাণীভবন অবস্থিত। কোথাও বা ফোয়ারা-উদ্বেলিত মায়াসমুদ্রে পুরাপ্রাণীর দন্ত, কোথাও বা তাহার স্কন্ধাগ্রভাগ কথঞ্চিৎ ভাসিয়া উঠিয়াছে, আবার মৃদুমন্দ পবনহিল্লোলিত তরঙ্গভঙ্গে কোথাও লুকাইয়া যাইতেছে! কোথাও কুমুদকহ্লারকুঞ্জের আশে পাশে কোনও প্রাচীন সর্প ধীরে ধীরে লতামণ্ডপ পরিবেষ্টনের প্রয়াস পাইতেছে, ব্যর্থকাম হইয়া কাণ্ড বাহিয়া নিম্নে ঝুঁকিয়া যাইতেছে, আবার কোথাও শ্যামলবল্লরীশোভিত কুঞ্জতোরণের ফাঁক দিয়া কোন অতিকায় জন্তুর অতি বিশাল মস্তকের বিরাট ছায়া যেন চক্রবাল রেখায় মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। এই কৃত্রিম প্রাণীদিগকে দেখিলে মানুষের ভাস্কর্য্য বা

খোদিত শিল্প কতদূর উন্নতি লাভ করিতে পারে তাহা ভাবিয়া মন বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া যায়।

এই প্রাণী-ভবনের শ্যামশষ্পাবৃত সরোবর-তীরে চাহিয়া দেখিলে দেখা যায় কত অপরিচিত তৃণভোজী জন্তু যেন কোমল কচি ঘাসের সন্ধান পাইয়া অনেক দূর হইতে —যুগযুগান্তরের বিস্মৃতির গর্ভ হইতে—উঠিয়া আসিয়াছে। তাহাদের কাহারও দৃষ্টি বিস্ময়বিস্ফারিত—কেহ বা নয়ন ভরিয়া আহারীয় সামগ্রীর শোভা দেখিয়া লইতেছে, আবার কেহ কেহ অতি তৎপরভাবে উদর পরিতৃপ্তি করিতে ব্যস্ত।

হেন্বার্গের এই যাদুঘরের যিনি যাদুকর তাঁহার নাম পলেনবার্গ;—ইঁহার সুনিপুণ ভাস্কর্য্যখ্যাতি দিগন্ত বিস্তৃত। ইঁহার কৃতিত্বে সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বের অতিকায় জন্তু—যাহারা ধ্বংস ও বিস্মৃতির গর্ভে লীন হইয়া গিয়াছিল, তাহারা আবার দর্শকের চোখের সম্মুখে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

এই যাদুঘরে বহুবর্ণ ও বিচিত্র ডিনোসোর নানা অবস্থায় কুঞ্জকুটীরের বৃক্ষপার্শ্বে সবুজ ঘাসের উপরে স্থাপিত রহিয়াছে—তাহাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে ইগুয়েনোডোন্ যেন নিতান্ত সরলভাবে একত্র বিচরণে প্রয়াসী হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের উচ্চতা প্রায় পঁচিশ ফুট হইবে; সেই জন্য তুলনায় পার্শ্বের বৃক্ষ গুলিকে নেহাৎ খর্ব্বাকৃতি ও ছোট বলিয়া অনুমিত হয়। অপর পার্শ্বে অধিকতর স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে ডিপ্লোডকাস্; দৈর্ঘ্যে ৬৬ ফুট ও উচ্চতায় ১৮ ফুট বলিয়া বর্ত্তমান কালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অতিকায় প্রাণী হস্তীকে ইহার নিকট হার মানিতে হয়; আধুনিক বৃহৎকায় হস্তীকে ডিপ্লোডকাসের তুলনায় একটি বামন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ষ্টেগুসেয়ুরাস্ নামধেয় প্রাণীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অভিনবত্ব স্বতঃই মন আকৃষ্ট করে;—ইহার পৃষ্ঠদেশ হাড়ের পাটীদ্বারা আবৃত এবং পুষ্পমঞ্জরী পরিশোভিত। ট্রিসেরেটপস্ আর এক প্রকারের অদ্ভুত জন্তু। ইহার মুখের উপরিভাগে তিনটি শিং খুব খাড়া ভাবে গজাইয়াছে; কণ্ঠের শোভা আরও অদ্ভুত, যেন পুষ্পমঞ্জরীবেষ্টিত হাঁসুলি পরিয়াছে! এতদ্ভিন্ন ইহাদের পার্শ্বে স্লথ, ভোডো এবং ম্যামথ্ প্রভৃতি বিচিত্র জন্তুর সমাবেশ দেখিয়া মনে আতঙ্কের সঞ্চার হয়। এইখানে অদ্ভুত ডানা-

ষ্টেগুসেয়ুরাস্

সংযুক্ত অতিকায় সর্প দেখিতে পাওয়া যায়। পাখীর আরও সুন্দর। কত রকমের অদ্ভুত অদ্ভুত পাখী যে শাখে শাখে বসিয়া আছে তাহার ঠিক নাই। সেকালের টিকটিকি যেন দৈত্যবিশেষ! কচ্ছপ, অথবা ভেকের আকৃতির পরিচয় বিশেষভাবে না দিয়া কেবল ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে আধুনিক পশুসমাজে তাহা অদ্ভুত ও প্রকাণ্ড দর্শন ;—এখনকার ভেক বা কচ্ছপের সম্মুখে তাহাদের ধরিলে তাহারা নিশ্চয় তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণকে অস্বীকার করিবে।

বিগত পাঁচ বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর আদি জীব-বিজ্ঞানের সমধিক উন্নতি হইয়াছে। মিঃ পলেনবার্গ, শেকুটৌন্ হাচিন্‌সন্ প্রভৃতি ধীমানদিগের গবেষণায় অনেক লুপ্ত কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে। অনেকে বলেন, পৃথিবীর আদি-বাসিন্দা সম্বন্ধে বেদে পুরাণে যে সকল জীবজন্তুর উল্লেখ আছে তাহার পক্ষ সমর্থন করিবার মত কঙ্কালও পাওয়া গিয়াছে। কোন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রাচীন নরকঙ্কালের সহিত এইরূপ নব-আবিষ্কৃত পশুকঙ্কালের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে পশুকঙ্কালটি অযুত বৎসর পূর্ব্বে বিচরণ করিত। তাহার মৃত্যু বা জন্মের তারিখ অনুমান করিবার লক্ষণ তিনি পান নাই; তবে শারীরিক যন্ত্রাবলীর সুঠাম দেখিয়া মনে করেন যে, এইরূপ কঙ্কালসমন্বিত দেহ অন্যূন দশ হাজার বৎসর বাঁচিতে পারে। প্রস্তরীভূত অস্থিরূপে প্রাপ্ত লুপ্তকঙ্কাল

পক্ষযুক্ত সর্প

ইউরোপে নব জ্ঞান জাগাইয়া তুলিয়াছে। প্রাচীনত্বের নিদর্শনে উহাদের সঠিক রূপ কল্পনা করিতে গিয়া এক বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ—ডিপ্লোডকাসের কঙ্কাল পাইয়া কেহ কেহ অনুমান করেন যে ইহার কঙ্কাল মাংসপুষ্ট হইলে অন্যূন দৈর্ঘ্যে ২০ ফুট হইতে পারিত, আবার কেহ বলেন—না, ৩০ফুট হইত; অপর ব্যক্তির মতে ৮০ ফুট। এইরূপ বাদপ্রতিবাদের পর মিঃ পলেনবার্গ মানসী প্রতিমা সাকারগঠনে গড়িয়া তুলিবার প্রয়াস পাইলেন। হেম্বার্গে যাদুঘর স্থাপনের অন্যূন চতুর্দ্দশ বৎসর পরে তিনি একবার পৃথিবী ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরকাল ইউরোপ, এসিয়া প্রভৃতি প্রাচ্যপ্রতীচ্য দেশে দিন যাপন করিয়া তিনি যে দূরদর্শিতা ও প্রাণীতত্ত্বে অপূর্ব্ব অধিকার লাভ করিতে পারিয়াছিলেন তাহার আংশিক নিদর্শন উক্ত প্রাণিবাটিকায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইউরোপের সমুদয় যাদুঘর তিনি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে বিরত হন নাই, যেখনে কণিকামাত্রও শিক্ষণীয় সামগ্রী দেখিয়াছেন তৎক্ষণাৎ অতি আদরে সেই উপাদেয় বস্তুর পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। দক্ষিণ কেন্‌সিংটনে এইজন্য তাঁহার দুই বৎসর কাটিয়াছিল; তথাকার বৈজ্ঞানিক আগারে অতিকায় পুরাপ্রাণীর স্তূপীকৃত বহুতর কঙ্কালের ড্রয়িং ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংগ্রহ করিয়া তিনি ভ্রমণের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই প্রকারে তিনি আমেরিকায় নিউইয়র্কে স্থাপিত বিখ্যাত ইতিহাস-ভবন হইতেও প্রচুর সাহায্য পাইয়াছিলেন; এইখানে জীবজন্তুর কঙ্কালের প্রতিকৃতি লইয়া উহাদের পরিধি পরিমাপেরও সুবিধা ঘটিয়াছিল। নানা দিগ্দেশ হইতে এবম্বিধ তথ্য সংগৃহীত হইলে আপন ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য চতুর্দ্দশ বৎসর বল্কলধারী দাশরথির ন্যায় একান্ত কর্ম্মনিষ্ঠ ভাবে কাজ করিয়া মিঃ পলেনবার্গ স্বদেশে ফিরিয়া যান। সেখানে প্রথমে কর্দ্দম দ্বারা জন্তুর প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করেন; পরে সেই মৃত্তিকা-প্রস্তুত জন্তু সম্বন্ধে মতামত জানিতে ইচ্ছুক হইয়া ইউরোপের প্রধান প্রধান যাদুঘরের ম্যানেজার ও প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিদ্‌দের নিকট উহাদের নমুনা প্রেরণ করেন। উচ্চ প্রশংসার সহিত মিঃ পলেনবর্গের মূর্ত্তিগুলি ঠিক বলিয়া গৃহীত হইবার পর ইনি প্রাক্‌ঐতিহাসিক জন্তুর ভবন প্রস্তুত আরম্ভ করেন।

প্রাচীন বাদুড়

পলেনবার্গ প্রতিষ্ঠিত সরোবরের কথা একটু পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি; মিঃ পলেনবার্গ জন্তুগুলিকে এইরূপ কৌশলে পাতার ফাঁকে ফাঁকে অথবা সলিল অবগুণ্ঠনে সাজাইয়া রাখিয়াছেন যে নিকটবর্ত্তী না হইলে তাহাদের সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না। এই যাদুঘরে কোথাও বা আরামকুঞ্জে সুদৃশ্য পক্ষীকুল নিঃশব্দ রাগিণীতে তানের ভান করিতেছে, কোথাও লতামণ্ডপে বিশালকায় ডিপ্লোডকাস্ অসহ্য গুমটে যেন নাসিকার অগ্রভাগ স্ফীত করিয়া আছে। ডালে—টিসেরেটপ্সদের ভীষণ সংগ্রাম চলিতেছে, অদূরে শূন্যবিহারী পক্ষধারী সর্প বাতাস খাইতে উর্দ্ধমুখে প্রয়াণ করিবার উদ্যোগ করিতেছে, বজ্রনাদী

গোধিকাগণের উল্লাস-বিলোড়নে যেন প্রাচীন শাল বৃক্ষ ভাঙিয়া পড়িতেছে। এই সব অতিকায় ও অভিনব জন্তুর লীলাস্থলে দাঁড়াইলে মনে হয় যেন আমরা এ কালের মানুষ নহি, যেন কোন্ সত্য যুগে গিয়া পৌঁছিয়াছি! এই সব অ-দৃষ্ট জন্তু যেন সহস্র সহস্র বৎসরের বাধা ব্যবধান ঘুচাইয়া দিয়া পুরাতনকে নূতন করিয়া দিতেছে।

গুল্মভোজী ইগুয়েনোডনের মস্তক ভূভাগ হইতে পঁচিশ ফুট উচ্চে অবস্থিত। ইহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও আকৃতি দৈর্ঘ্যে ৩০ ইঞ্চি ও প্রস্থে ৪।৫ ফুট। সাসেক্সের বনভূমে কিছুকাল পূর্ব্বে এই জন্তুর পদচিহ্ন লক্ষিত হইয়াছিল। ইহা দ্বারা বৈজ্ঞানিকগণ ও প্রাণীতত্ত্ববিদেরা অনুমান করেন যে এই প্রাণীটী পক্ষীবৎ পশ্চাৎপদে ভর করিয়া চলাফেলা করিত। ১৮৯৮ অব্দে প্রায় পঁয়ত্রিশটী পশুকঙ্কাল বেলজিয়ামের কয়লার খনিতে পাওয়া যায়। মিঃ পলেনবার্গ প্রভৃতি পশুকঙ্কাল অনুসন্ধান সমিতির সদস্যবর্গ পরীক্ষায় ঠিক করেন যে ইহারা সকলেই ইগুয়েনোডনের বংশধর। প্যারীর সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞান-মন্দিরে এই কঙ্কাল প্রেরিত হওয়ার পর ইহার স্বাভাবিক রূপ কল্পনা সম্বন্ধে মতদ্বৈধ মিটিয়া যায়। এই অদ্ভুত জন্তুটির আরও একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহার অঙ্গুলিগুলি সুতীক্ষ্ণ ছুরিকার ন্যায় ধারাল ও ভীষণাকার। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে যখন মৃত্তিকানিম্নে ইহার অঙ্গুলি প্রথম পাওয়া যায় তখন অনেকেই সেগুলিকে ইগুয়েনোডনের শিং বলিয়া ভ্রম করিয়াছিলেন। তারপর পরীক্ষা দ্বারা সেই শিং আঙ্গুল বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। তীক্ষ্ণ ছুরিকাবৎ ধারাল অঙ্গুলি লম্বায় প্রায় ১৮ ইঞ্চি করিয়া।

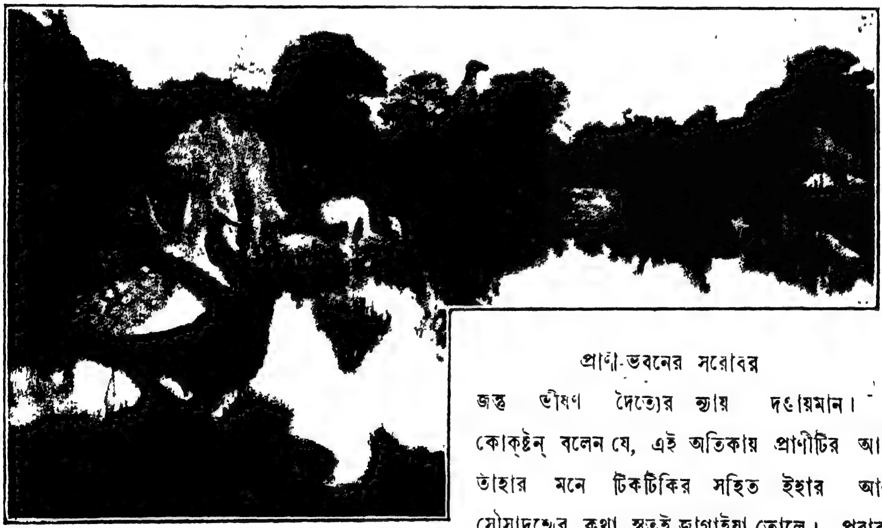

প্রাণী-ভবনের সরোবর

সরোবরের অপর পার্শ্বে ডিনোসোর জাতীয় জন্তু ভীষণ দৈত্যের ন্যায় দণ্ডায়মান। মিঃ কোক্‌টন্ বলেন যে, এই অতিকায় প্রাণীটির আকৃতি তাহার মনে টিকটিকির সহিত ইহার আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্যের কথা স্বতই জাগাইয়া তোলে। পুরাকালে ইহা যে গোধিকারূপেই প্রাণী-জগতে পরিচিত ছিল তাহারও সুন্দর প্রমাণ ইনি দিয়া থাকেন। তখন এই টিকটিকি জাতীয় জন্তুটি হস্তপদের সমন্বয়ে চলাফেরা করিত।

ডিপ্লোডকাস্ জাতীয় জন্তুরা যখন গমনাগমন করিত সম্ভবতঃ তাহাদের পদনিষ্পেষণে এক বর্গফুট পরিমিত ভূমি প্রকম্পিত হইত ও ভারবহনের ফলস্বরূপ সেই স্থান অনেকটা বসিয়া যাইত। ডিপ্লোডকাস্ মহাত্মাদের অনুকম্পায় বসুমতী তখন 'থর হরি' কম্পিত হইত কিনা কে জানে! রাত্রে নিদ্রার স্থান বাছিয়া লইতে তাঁহাদের কিরূপ বেগ পাইতে হইত, ভাবিলে বিস্মিত হইতে

ইগুয়েনোডন্

ডিনোসোর

হয়। ষ্টেলিঙ্গনের যাদুঘরে যে ডিপ্লোডকাস্ রক্ষিত আছে, তাহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৬৬ ফুট; কিন্তু দক্ষিণ-কেন্‌সিংটন যাদুঘরের ডিপ্লোডকাসটি দৈর্ঘ্যে, স্কন্ধ হইতে পায়ের গোড়ালি পর্য্যন্ত ধরিয়া, ৮৪ ফুট ও উচ্চে ·৪ ফুট। এই অতি বৃহৎ কঙ্কালটী ১৮৯৯ অব্দে সেণ্ট্রাল আরমিং কঙ্কালভবনে একটী প্রাচীন কবরে পাওয়া গিয়াছিল। মিঃ পলেনবার্গের আদর্শে অনুপ্রাণিত ডিপ্লোডকাসের চেহারাটি বেশ খুব্‌সুরৎ। টিকটিকির ন্যায় লম্বা লেজ, উটপাখীর ন্যায় কোমল সরু ঘাড়, মর্ম্মর বিনির্ম্মিত দেহ, পুরু থামের ন্যায় হস্তীবৎ পদচতুষ্টয়! জীবিতাবস্থায় বোধ হয় এই প্রাণীর ওজন ৩০ টনের উপরে (১ টন = ২৭ মণ) ছিল। ডিপ্লোডকাস জীবটী ছিল উভচর, খুব স্বচ্ছ অথচ অতলস্পর্শী স্থানে জলক্রীড়া করিত এবং উপরে উঠিয়া শাকশবজীও ভোজন করিত।

পুরাকালে এই সমুদয় অতিকায় জন্তুর গর্জ্জনে যখন গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া উঠিত, তাহাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাসে যখন ঝড় বহিতে থাকিত, পদক্ষেপে যখন ভূমিকম্প হইয়া উঠিত তখনকার চিত্র পাঠকবর্গ একবার কল্পনায় আনিয়া দেখুন। শুনা যায়, এই সকল অতিকায় জন্তু অত্যন্ত হিংস্রপ্রকৃতি ছিল; পরস্পরে দিনরাত কামড়াকামড়ি মারামারি করিত। খুব সম্ভবত এই কারণেই—ইহাদের অমন প্রভূত শক্তিশালী বংশ লোপ পাইয়াছে।

ভূভাগে বিচরণশীল সর্পজাতীয় ট্রিসেরেটপ্সের মাথাটী অবিকল গণ্ডারসদৃশ কিন্তু বর্ত্তমান গণ্ডারের প্রতিকূলে ইহাকে সুবৃহৎ শিং ও গলায় পুষ্পমঞ্জরীর হাঁসুলি এই দুইটী বিশেষ ভারবাহী দ্রব্য বহন করিয়া চলিতে হইত। ইহার মাথার খুলি সাতফুট অথবা তাহার কিঞ্চিৎ অধিক হইবে।

সত্যকথা বলিতে হইলে, ক্রমবাদে বজ্রনাদী গোধিকা প্রথম স্থান পাইতে পারে না—কারণ ইহার আগমনের বহু পূর্ব্বেই প্লেসিয় সেয়ুরিয়া এবং ইক্থিয় সেয়ুরিয়া নামধেয় দুই মহান্ বংশের অভ্যুত্থান ঘটে। ইহাদের পরে পক্ষবাহী অতিকায় সর্প জাতির কাল নির্ণীত হইয়াছে। বৃহদায়তনের জন্য ডিনেসোরজাতিই পুরাপ্রাণী মধ্যে সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হইয়াছে। কিন্তু প্লেসিয় সেয়ুরিয়ার মাহাত্ম্য এই যে ডিপ্লোডকাসের ন্যায় ইহাদেরও সমস্ত শরীরের উপাদান যোগাইতে বহুবিধ

ডিপ্লোডকাস

অপরাপর জন্তুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ছাঁচ লইতে হইয়াছে। ইহার মাথাটা টিক্‌টিকির মস্তকের সহিত অবিকল একরূপ; ঘাড়টি ঠিক যেন লম্বা সাপের কাঁধের মত, দাঁতগুলি কুমীরের বট্‌কটে দাঁতের মত, পঞ্জর ও দাঁতের পাটি তিমি মৎস্যের হুবহু অনুকরণে অনুপ্রাণিত! ইহারা দৈর্ঘ্য ২২ ফুট। জলে সাঁতার কাটিতে এ জন্তুটি বড় মজবুত, আবার ডাঙ্গাতেও চলাফেরা করে! বড় সুবিধা। জলে মাছগুল্যাদি এবং ডাঙ্গায় টিকটিকি ও পক্ষী প্রভৃতির দ্বারা ইহাদের উদর পরিপুষ্টি হয়। এ প্রাণীর প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহাদের অর্দ্ধাংশ স্তন্যপায়ীর ন্যায় ও অপরার্দ্ধ মৎস্যাকৃতির ন্যায়।

প্রাণীভবনে খেচর সর্পও বহুবিধ আছে। কোন কোন সাপ ঠিক চড়ুইয়ের ন্যায় আবার কোনটি পুচ্ছসমেত ১৮ ফুট। হ্রদে পুরাকালের কুম্ভীর, মৎস্য ও ডানাসংযুক্ত টিক্‌টিকির সঙ্করণ দেখা যায়। ‘টিক্‌টিকির পাখা’ কথাটা নিতান্ত ‘গাঁজাখুরি’; কিন্তু কোনদিন যে ইহার অস্তিত্ব ছিল তাহা আর অস্বীকার করিবার পথ নাই।

যে জীর্ণশীর্ণ কঙ্কাল আজ পুরাতনের পরিকল্পনার

ট্রিসেরেটপ্স

অবকাশ ঘটাইয়া দিয়াছে, উহাদের অস্তিত্ব যদি বায়ুতেই মিশিয়া যাইত, তবে প্রাণীতত্ত্বের একদিক্ নিবিড় তমসাচ্ছন্ন হইয়া থাকিত সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান বিজ্ঞানবিদ্‌দিগের অতি সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে তখন এই সমুদয় অতিকায় প্রাণীর কঙ্কালবাহী পর্ব্বতমালা এখনকার মত এত কঠিন ছিল না। সুকোমল ভূমিতে উহাদের কঙ্কাল সংরক্ষিত হওয়ায় আজও তাহার নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। মধ্যযুগে ইহারা কিছু শক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তারপর হইতে কঠিন পাথরে পরিণত হইয়া গিয়াছে। আবিষ্কৃত কঙ্কালের অনেকগুলিকেই ভূমিসংলগ্ন দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। ইহার কারণ এই যে, পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ গ্যাসের চাপে ও আভ্যন্তরীণ অগ্ন্যুৎপাতে খণ্ডিত ও চূর্ণীকৃত হয়; এবং এই হেতু কঠিন আবরণটা বিপর্য্যস্তভাবে ওতঃপ্রোত হওয়ায় নিম্নপর্ব্বতের মৃত্তিকা-স্তবক, বর্ত্তমানে পর্ব্বতশৃঙ্গে স্থান পাইয়াছে। এই নিম্নস্তরের মৃত্তিকার অধোগতি হইতে সুউচ্চে স্থানলাভের আনুমানিক কাল স্থির করিতে পারিলেই প্রাণীগণের বয়স সম্বন্ধীয় অনুমান অভ্রান্ত হইয়া যাইবে।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

দিবা-স্বপ্ন

বসন্ত আসিয়াছিল, গোলাপ ফুটিয়াছিল,
তুলেছিল ভ্রমর ঝঙ্কার,
সব ছিল—সব গেছে; নিদাঘের দিনে
বিশ্বব্যাপী একি হাহাকার!

বসন্ত আসিবে ফিরে, গোলাপ ফুটিবে ধীরে,
দোয়েল কোয়েল গাবে গান;
যে জন চলিয়া গেল, সে কেন আসে না ফিরে,
জীবন কি স্বপন সমান?

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মৈত্র।

সুরার সৃষ্টি

(নাটিকা)

(টলষ্টয় রচিত একখানি নাটিকা-অবলম্বনে)

প্রথম অঙ্ক

মাঠ।

কৃষক। (চষিতে চষিতে দাঁড়াইয়া আকাশের পানে চাহিল) ওঃ, ভারী রোদ্দুর হয়েছে। একেবারে চড়চড়ে রোদ! গরুটাকে খুলে একটু ঠাণ্ডায় ছেড়ে দি—একটু ও চরে নিক। আহা, ঘেমে নেয়ে উঠেছে! (বলদের স্কন্ধ হইতে লাঙ্গল খুলিয়া)—চ'। গরুটাকে ছেড়ে দিয়ে আমিও দুটি খেয়ে নি। পান্তা কটি এনে ভালই হয়েছে—খাবার জন্যে আর এ রোদে বাড়ী যেতে হবে না—অথচ কিছু না খেলেও চলে না—পেরে উঠব কেন? তেষ্টায় ছাতি যেন ফেটে যাচ্ছে!... খেয়ে একটু জিরিয়ে নিলে আবার সন্ধ্যা অবধি এক টানে খাটতে পারব! যে রোদ, মাথাটা একেবারে যেন আগুন হয়ে উঠেছে! গরুটাকে,—ঐ যে ওখানটায় ছায়া আছে, ঘাসও মন্দ দেখছি না, ছায়ায় ছেড়ে দি—একটু চরেও নিক। (বলদ লইয়া ক্ষেত্র-প্রান্তে বৃক্ষতলাভিমুখে চলিয়া গেল।)

পাপের দূত প্রবেশ করিল—একটা ঝোপের পাশে সে লুকাইল।

দূত। লোকটা ত আচ্ছা! সমানে খাটছে! এত কষ্টেও ভগবানকে দুটো গাল পাড়ছে না! অবাক করলে!... আচ্ছা, দাঁড়াও সোণার চাঁদ—ভগবানকে গাল পাড় কি না, একবার দেখে নিচ্ছি! এই ত, মুখে দেবে বলে খোরায় করে দুটি পান্তা ভাত এনেছ—তোমার সেই সাধের পান্তা লোপাট কচ্ছি, এবার। ক্ষিদের চোটে ফিরে এসে পান্তার দেখা না পেলে প্রাণটা একেবারে টগবগিয়ে উঠবে'খন। এই গরম!—ভগবানকেও কোন্ না দু-চারটে গরম কথা শোনাবে!

খোরা হইতে পান্তা ভাত লইয়া ঝোপের পার্শ্বে আসিয়া লুকাইয়া বসিল।)

কৃষক। (বলদ রাখিয়া প্রত্যাবর্ত্তনান্তে) হরিবোল, হরিবোল!...আঃ, ভারী ক্ষিদে লেগেছে—ভাত খাই, তার পর পুকুর থেকে আঁজলা ভরে জল খেয়ে নিয়ে গাছতলাটায় একটু হাত-পা মেলিয়ে দেওয়া যাবে! এখন—(গামছা তুলিয়া) এ কি—বাঃ, ভাত কোথা গেল? যেমন খোরা তেমনি রয়েছে,—ভাত খেয়ে গেল কে? ভারী মজা ত! বাঃ—এই গামছার নীচে ঢাকা দিয়ে রেখে গেছি—

দূত। (ঝোপের অন্তরালে বসিয়া স্বগত) হ্যাঁ, হ্যাঁ—এইবার চাঁদ—আর একটু হরিবোল চালাও না!

কৃষক। (চারিধারে চাহিয়া) নাঃ, ভারী আশ্চর্য্য ত! পাখীতে খেয়ে গেল না কি? তাই বা কি করে হবে?—পাখীতে খেলে এমন চেঁচে-পুঁছে ত আর খেতে পারত না—দুচার টুকরোও অন্ততঃ খোরায় পড়ে থাকত! এ

একেবারে খোরা চেটে খেয়ে গেছে দেখ্‌ছি! কুকুরে—? নাঃ, তাই বা কি করে হবে—কুকুর এল কখন? এলে আর আমি দেখতে পেতুম না! তা ছাড়া খোরা যেমন গামছায় ঢাকা, তেমনি ঢাকা রয়েছে—কুকুর হলে ত আর খেয়ে খোরার উপর আবার গামছা চাপিয়ে চলে যেতে পারে না।... তবে হল, কি—? এ্যাঁ—

দূত। (স্বগত) এবার গান সুরু কর!

কৃষক। যাক্, যখন নেই, তখন ত আর খুঁজলে পাওয়া যাবে না। কেউ চুপি চুপি এসে খেয়ে গেছে, বোধ হয়! কোন ভিখিরি টিখিরি হবে আর কি! আহা, থাক্ বেচারা—খেয়ে যদি আরাম পেয়ে থাকে ত থাক্—তার পেটটা যদি ভরে থাকে ত সে ভালই হয়েছে! আমার অবিশ্যি এমন কিছু খিদে পায় নি যে, এখুনি না খেলে একেবারে মরে যাব! যাক্, যা হয়েছে, ভালই হয়েছে—হরি বল, মন! হরি বল!

দূত। (স্বগত) কোথাকার হতভাগা গো! এ্যাঁ! একটা গাল পাড়লে না—ভাত চুরি গেল, তা কাউকে নির্ব্বংশ করে, জাহান্নমে পাঠাবার ব্যবস্থা নয়! নাঃ, একে পারা ভার হল, দেখ্‌ছি!

সন্নিহিত বৃক্ষ-তলে গিয়া কৃষক বসিল; গামছায় কপালের ঘাম মুছিয়া মাটির উপর শয়ন করিল—পরে ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িল।

দূত। (ঝোপের অন্তরাল হইতে উঠিয়া আসিয়া) নাঃ—মহারাজের হুকুম হলে কি হবে—তামিল করা যে বড় মুস্কিল দেখ্‌ছি! তিনি ত স্রেফ হুকুম দিয়ে বল্লেন, "যেমন করে পার, চাষা-লোক ধরে আনো,—ভদ্দর লোকে নরক গুলজার হয়ে গেল! চাষা কই?" এখন চাষা ধরি, কি করে? কোনো বেটা যে জালে পড়তে চায় না। এক বেটাকেও আঁকড়াতে পাচ্ছি না। এরা না জানে ঝগড়া, না জানে মারামারি, না জানে গালিগালাজ! ভগবানের উপর তোফা নির্ভর রেখে দিন কাটাচ্ছে! এই যে বেটার পান্তা লোপাট করে দিলুম, তা লোকটা কাউকে গাল দিলে না, জাহান্নমে পাঠালে না—তার ভালই হয়েছে, ভাল হোক বলে, সটান্ 'হরি বল মন' করে শুয়ে পড়ল! আরে ছ্যাঃ, এ বেটা কি মানুষ? যাই, এখন মহারাজকে খবর দিই গে—আমি ত ভেবে কোন কূল-কিনারা ঠাওরাতে পারছি না!

(ভূ-গর্ভে অদৃশ্য হইয়া গেল)

দ্বিতীয় অঙ্ক

নরকের রাজ-সভা।

সিংহাসনোপরি মহারাজ পাপ উপবিষ্ট। মন্ত্রী নিকটস্থ বেদীর উপর খাতা খুলিয়া বসিয়া,—পার্শ্বে দোয়াত-কলম। চতুর্দ্দিকে সশস্ত্র শান্ত্রী-প্রহরী। দক্ষিণ পার্শ্বে পাঁচজন দূত সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান। বাম পার্শ্বে প্রবেশদ্বার—তথায় দৌবারিক; মহারাজের সম্মুখে খাতাঞ্জি দাঁড়াইয়া আছে।

খাতাঞ্জি। এই যে মহারাজ—খাতা খুলে হিসেব দিচ্ছি—তিন বছরের সব হিসেব ঠিক আছে। শুধু ডু'লাপ বিশ হাজার পাঁচজন মানুষের যে চালানখানা—তার পাকা ফর্দ্দ এখনও পাইনি।

পাপ। আচ্ছা—যা আছে, তার হিসেবটা ফর্দ্দ-মাফিক পড় দেখি! মন্ত্রী, শুনে যাও—পাকা খাতার সঙ্গে মিলিয়ে নাও। আজ আবার বড় গরম—মাথা দিয়ে যেন ঝাঁজ বেরুচ্ছে।

বেশী ক্ষণ আমি বসতে পারব না। জমা-খরচের সমস্ত খাতা তলব করে শেষ জমাগুলো মিলিয়ে নাও।

মন্ত্রী। মহারাজের কথামত সব খাতাই তলব করেছি! সব দুতই হাজির—

পাপ। আচ্ছা—পড় শুনি।

খাতাঞ্জি। ওহে ভদ্দর দূত! খাতা ধর। (খাতাঞ্জি যখন যাহকে ডাকিতে লাগিল, তখনই সেই দূত আসিয়া আপনার জাব্‌দা খতিয়ান সম্মুখে ধরিতে লাগিল—খাতাঞ্জি দেখিয়া পাকা খাতার সহিত মিলাইবার জন্য মন্ত্রীর হাতে তাহা তুলিয়া দিতে লাগিল) ভদ্দর লোক এসেছে—এক হাজার আট শ ছত্রিশ জন! ব্যবসা দূত! ব্যবসাদার ছোট-বড় মিলিয়ে ন'হাজার ছ'শ তেতাল্লিশ! উকিল-মোক্তার-ব্যারিষ্টার তিন হাজার চার শ' তেইশ জন! মেয়ে মানুষের ফর্দটা এইমাত্র পেয়েছি—পাকা-খাতায় জমা এখনো তোলা হয়নি মেয়েমানুষ, সধবা-বিধবা মিলিয়ে—এক লাখ ছিয়াশি হাজার তিন শ' পনেরো, কুমারী সতের হাজার চার শ' আটত্রিশ। পাড়া-কুঁদুলী, হিংসুকো, ঘরভাঙ্গানি, কুচরিত্রা—সব একসঙ্গে জমা রয়েছে—এইগুলো ভাগ হয়ে আলাদা-আলাদা ঘরে হিসেব পড়বে! দু-তিন জনের খাতা এখনো আসেনি—চাকুরে,—এর মধ্যে হাকিম, কেরাণী, পেয়াদা, সব আছে—তবে গে, ডাক্তার-বদ্যি আছে, আর চাষাভুষো আছে—সেটার মধ্যে দু'লাখ বিশ হাজার পাঁচজনের হিসেব পাচ্ছি। সেটা পেলে চার লাখ আটত্রিশ হাজার ছ'শ ষাটজনের পাকা হিসেব জমা হয়ে যায়।

পাপ। আজ ওটা শেষ করে ফেল। যারা পাকা হিসেব দেয়নি, তাদের সব তলব কর। হিসেব খতিয়ে দিতে না পারলে, সব জরিমানা হবে। হিসেব দিতে এত দেরি কিসের? মানুষ গুলো কে চুরি করেনি ত! এই যে কে আসে—

(চাকুরে-দূতের প্রবেশ)

দূত আসিয়া পাপকে অভিবাদন করিল।

পাপ। তোমার খবর কি?

দূত। (অভিবাদনান্তে) আজ্ঞে, মহারাজ—চালানি-কাজ খুব বেড়ে গেছে। একা আর পেরে উঠি না। হাকিমদের মধ্যে এমন জন কতককে পেয়েছি—যাদের গুণের কথা শুনলে আপনি অবধি লজ্জায় লাল হয়ে উঠবেন—আমরা কোন্ ছার! আমাদেরও তারা ছাড়িয়ে চলেছে!

পাপ। কি রকম?

দূত। আজ্ঞে হুজুর—আগে শুধু ঘুষখোর হাকিমই চালান দিতুম—এখন শুধু ঘুষ-খোর নয়! বাদী-প্রতিবাদীর বাগান-মজলিসে আমোদ মেরে অনেক হাকিম তাদের সুবিধামত রায় দিতে সুরু করেছে—তার উপর আত্মীয়-বন্ধু উকিলের দিকে সায় দেওয়া সে-ত আছেই। উপরিওলার রাঙা চোখের ভয়েও রায়ের এদিক ওদিক হচ্ছে! তা ছাড়া নিজেদের ফাইল সাবাড় করবার জন্যেও বাদী-প্রতিবাদীর কথা কানে না তুলেই অনেক সময় হাকিমের মর্জ্জিমত রায় হয়—তা ছাড়া ঘুষখোর পেস্কারের কথাতেও রায় বিগড়ুচ্ছে,—এমন লোক বিস্তর পাচ্ছি আজকাল।

পাপ। খুব ভাল খবর বটে! মন্ত্রী, নরকের এ জায়গায় আর কুলোবে না, দেখছি—

একটা কমিটি বসানো যাক্—কতটা জমি, কোনখানে নেওয়া যাবে, তারা তা ঠিক করে রিপোর্ট দিক্।...ও কে ?

দৌবারিক। (অভিবাদনান্তে) চাষা-দূত।

(চাষা-দূতের প্রবেশ)

পাপ। খবর কি ?

চাষা-দূত। আজ্ঞে মহারাজ, আর ত চাকরি রাখতে পারি বলে মনে হয় না। (পান্তা ভাতের পুঁটুলি খুলিতে লাগিল)

পাপ। ও কি ?

চাষা দূত। আজ্ঞে, পান্তা ভাত!

পাপ। ওতে কি হবে ? তোর লোক কই ? চাষা ধরলি কটা ?

চাষা-দূত। আজ্ঞে একটিও নয়। পারিই নি!

পাপ। পারিস নি ? তার মানে ?

চাষা-দূত। আজ্ঞে, মানে আর কি— চাকরি রাখা দুষ্কর দেখছি। হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, হুজুর—তবু একটারও চুলের মুঠি ধরতে পারছি না। আজ মাঠ থেকে একটা চাষার খাবার পান্তা ভাত চুরি করলুম, তা, জেনেও সে কাউকে গাল দিলে না, জাহান্নমেও পাঠাতে চাইলে না—হরি ঠাকুরকে ডেকে সটান শুয়ে পড়ল! এত চেষ্টা করছি, ফিকির করচি, তা একটাকেও বাগাতে পারছি না।

পাপ। বাগাতে পারছিস্ না ? বটে! চালাকি পেয়েছিস—আমার কাছে ? এক ঘুসিতে তোর নাক উড়িয়ে দেব, তা জানিস্! মাইনে খাবে, আর বসে ঝিমিয়ে আরাম করবে— বেটা পাজী—

চাষা-দূত। হুজুর, চেষ্টার কোন ত্রুটি করছি না, আমি—

পাপ। ত্রুটি করচিস্ না! ত্রুটি আর কাকে বলে! এত ভদ্দর লোক এল, উকিল ডাক্তার এল, হাকিম এল, আর চাষা বেটাদের এমন ক্ষমতা, এত বুদ্ধি যে, একটাও ধরা পড়ল না—চাষার ফর্দ্দ একেবারে খালি! কাকে তুই বোঝাতে চাস্ ?

চাষা-দূত। আজ্ঞে হুজুর—আমি স্বরূপ কথাই বলছি। আপনার যদি বিশ্বাস না হয় ত কাকেও স্পেশাল এন্‌কোয়ারিতে পাঠান; —সাক্ষী-তলবে বিরুদ্ধ প্রমাণ পান ত যে শাস্তি হুজুর দেবেন, তাই আমি মাথা পেতে নিতে রাজী আছি! হুজুর, তারা সারা দিন খাটে-খোটে, বাড়ী ফিরে ছেলে-পিলেদের আদর করে, খায় দায়, ঘুমোয়—ব্যস্! কারো কোন ঝঞ্চাটে যায় না—অল্পেই সব সন্তুষ্ট—পরের জন্য মাথা দিতে ছোটে,—নিজের স্বার্থ নিজেরা বোঝে না! এই যে হুজুর, তাদের দিন-রাত্রের পরিশ্রমে ধান-চাল জন্মাচ্ছে —ধান-চাল না হলে ভদ্দর লোকের দল ত কোনকালে শুকিয়ে মারা যেত—তা সেই ধান-চাল কত শস্তায় তারা বিকিয়ে দিচ্ছে। কোন মতে তাদের দিনটা গেলেই হল—মোটা ভাত, মোটা কাপড়,—এর উর্দ্ধে তারা উঠবে না, এর বেশীও কেউ চাইবে না—না আছে সখ, না জানে ফূর্ত্তি—এ রকম হলে, কি করে আর তাদের বাগে পাই, বলুন! এই যে দুপুর রোদে খেটে ঘেমে চাষাটা খিদে-তেষ্টায় চার ধার অন্ধকার দেখছিল, তার সেই মুখের গ্রাস কেড়ে নিলুম, তা তাতে একটু রাগলে না— গাল দিলে না—বিরক্ত হল না—তারা কি মানুষ, হুজুর যে, ধরব—গাছ-পালার মতই সব অসাড় অজ্ঞান!

পাপ। ও সব বক্তৃতা আমি শুনতে চাই না। ছেঁদো কথায় আমি ভুলছি না। যেমন করে হোক, চাষা আনা চাইই! চাষা না পেলে আমার মান থাকে না,—রাজ্য টেঁকে না! তুই বেটা পান্তা ভাত দেখিয়ে ভোলাবি আমাকে? তা ভুলছি না!

চাষা-দূত। আজ্ঞে মহারাজ—যে শাস্তি বলেন, আমি তা ঘাড় পেতে নিতে রাজী আছি; —কিছু মিথ্যা বলিনি। ভদ্দর লোক-টোককে ধরা ঢের সহজ! এই সব যত রাজা-মহারাজা— তাদের এক টুকরো হীরে কি মাণিক দেখান, কিম্বা কিছু বিষয়-সম্পত্তি দেখান্—কি একটা সুন্দরী স্ত্রীলোক, অমনি তারা হাত বাড়িয়ে আপনার গণ্ডীতে ছুটে আসবে, তখন তাদের যে দিকে ফেরাবেন, সেই দিকেই তারা ফিরবে যত বড় শক্ত কাজ তাদের করতে বলুন তাও তারা তখনই করবে! আর অন্য যে-সব লোক,—তারাও টাকায় ভোলে— দুটো টাকা ছড়িয়ে রাখুন, চুম্বকের মত সেই টাক মহারাজ, আপনার গণ্ডীর মধ্যে তাদের টেনে আন্‌বে! কিন্তু এই চাষাগুলো টাকার দাম জানে না—নারীর রূপে ভোলে না—কিছুতে তাদের একটা আকাঙ্ক্ষা নেই! গতর খাটিয়ে খেটে মোটা ভাত কাপড় পেলেই তাদের সব অভাব মিটে যায়! হুজুর, আমাকে অবিশ্বাস হয় ত আর কাউকে পাঠিয়ে না হয় খবর নিন!

পাপ। আর কাকেও পাঠাব না—আমি। তোকেই চাষা ধরে আনতে হবে! চাষা কোথায় তার ঠিক নেই, বেটা কাপড়ে বেঁধে দুটি পান্তা ভাত নিয়ে হাজির হল! মাথা খাটা, বেটা, নতুন ফন্দী-ফিকির বার কর্—কেমন করে চাষার দল এড়িয়ে থাকে, একবার দেখি!

চাষা দূত। আমার দ্বারা হবে না, এ কাজ, হুজুর। আমায় বরখাস্ত করুন— হুজুরের মাইনে খেয়ে যে হুজুরকে কাজ দেখাতে পাচ্ছি না—

পাপ। দাঁড়া, তোকে শায়েস্তা করছি। এই,—কে আছিস?

প্রহরী। (করযোড়ে) হুজুর—মহারাজ!

পাপ। এই নিরেট বেটার পিঠের কাপড় তুলে পঁচিশ কোড়া লাগা!

প্রহরী। (চাষা-দূতের পৃষ্ঠে কোড়া প্রহার করিতে লাগিল; চাষা-দূত প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল)

পাপ। কেমন, এবার পারবি ত?

চাষা দূত। আজ্ঞে—

পাপ। আবার আজ্ঞে—লাগা, ফের্ দশ কোড়া—

চাষা-দূত। (প্রহার খাইতে খাইতে) পারব, হুজুর, পারব। দোহাই মহারাজের—

পাপ। আচ্ছা—মাথা খাটিয়ে মতলব বার কর্! আমার দূতের অসাধ্য কাজ ত্রিভুবনে আছে! তাতে আমার অপমান হয় না?

চাষা-দূত। এবার এক মতলব বার করব, হুজুর। আমায় শুধু তিনটি বছর সময় দিন। এর মধ্যে যেমন করে পারি, উপায় করবই। তবে দরবারে যেন এ তিন বছরের মধ্যে আর হাজ্‌রে দিতে না হয়।

পাপ। আচ্ছা, যা,—তিন বছর সময় দিলুম। এর যদি মধ্যে না পারিস ত তোর গা থেকে আস্ত ছাল ছাড়িয়ে ফেলাব।...তোর

যে যেখানে আছে, সকলের মাথা সবকাবে জামিন রেখে তুই এখন যা!

তৃতীয় অঙ্ক

কৃষকের গোলাবাড়ী।

চাষা-দূত 'জন' খাটিতে ব্যস্ত। গাড়ী-গাড়ী ধান বোঝাই আসিতেছে—চাষা-দূত 'জন'-বেশে তাহা তুলিতে ব্যস্ত।

(কৃষকের প্রবেশ)

কৃষক। কি রে?

চাষা-দূত। আজ্ঞে কর্ত্তা, গোলা ত সব ভরে গেছে, কোন্ খানে আর রাখি!

কৃষক। তাইত! জায়গাও ত আর কোথাও দেখছি না। আচ্ছা, ওদিককার চালাগুলোর মধ্যে কিছু জায়গা হয় কি না, একবার দেখে আসি। (প্রস্থান)

চাষা-দূত। (মাথার পাগড়ী খুলিয়া ফেলিল—ললাটের শৃঙ্গ দেখা গেল।) আঃ—একটু জিরিয়ে নি! কি বিপদেই পড়েছি। মাথা আর চাকরি এ দুটি বজায় রাখতে, এই চাষা বেটার চাকর হয়ে কম খাটুনিটা খাটতে হচ্ছে! একটু হাঁফ্ ফেলবার অবসর নেই।…… মোদ্দা এবার মতলব যা বার করেছি, তাতে আমার চাষার পো এড়ান পান কি করে, একবার দেখে নিচ্ছি! ওর জন্যেই ত এত খোয়ার…তিন বছরও এদিকে শেষ হয়ে এল—আর একটা দিন মোটে বাকী আছে।…এই যে এত ধান বাকী পড়েছে, এ আর রাখবার জায়গা নেই! এই ধানেতেই কাম ফতে করব। কত ধানে কত চাল, বাছাধনও এবার হাড়ে হাড়ে বুঝবেন! একবার মহারাজ আসতেন ত আমার খাটুনির বহরখানা দেখে তাঁর তাক লেগে যেত! আমি কি না বসে ঝিমুই! বটে!…এই যে, কে আবার আসে এ দিকে—মাথার পাগড়ী, তবে মাথায় ওঠ ধন! (মাথায় পাগড়ী উঠাইল।)

(কৃষকের প্রতিবেশী প্রবেশ করিল।)

প্রতিবেশী। কি রে মাধা—তোর নাম মাধা, না?

চাষা-দূত। আজ্ঞে কর্ত্তা।

প্রতিবেশী। তোর মনিবের যে বেজায় এবার ধান হয়েছে রে! এ বছর তল্লাটে কোথাও ধানের নিশেনা নেই, বাণের জলে যত মাঠ, সব ভেসে গেছে। পাহাড়ের কোলে চাষ করে তোর মনিবই একা শুধু ফেঁপে উঠেছে, দেখছি!

চাষা-দূত। আজ্ঞে কর্ত্তা!

প্রতিবেশী। তার উপর তোর মত জন পেয়ে সে একেবারে বর্ত্তে গেছে! কি খাটুনিই তুই খাটছিস্—একটু জিরেন নেই, হাত কামাই নেই—তোর গতরও ত খুব!

চাষা-দূত। আজ্ঞে, আপনার আশীর্ব্বাদে এই গতরের জোরেই টিঁকে আছি।

প্রতিবেশী। তোর মনিবের খুবই বরাত জোর। আর-বছর ঐ জলাটার কোলে চাষ করতে গেল—ও জলা তার পূর্ব্বে কেউ নিতে চাইত না—তোর মনিব ত কপাল ঠুকে নিয়ে ফেললে! তার পর পড়বি ত পড়্, সেবার এমন গরম পড়ল, যে বৃষ্টির ফোঁটাটি দেখা দিলে না—আমাদের ধান সে চড়চড়ে রোদে শুকিয়ে ঝরে গেল, একটু জল পেলে না,—আর জলায় তোর মনিবের ধান পড়পড়িয়ে মাথা ঠেলে দাঁড়াল। যেন জলা ভরে' কে সোনা ছিটিয়ে দিলে!

চাষা দূত। আজ্ঞে কত্তা!

প্রতিবেশী। তা তোর মনিব এখন কোথায় গেল রে? আমার যে একটু কাজ আছে—

চাষা-দূত। আজ্ঞে, ঐ যে—

(কৃষকের প্রবেশ)

প্রতিবেশী। কিহে পরাণ,—তোমার খুব জোর বরাত বলতে হবে। আমাদের সব ধান, বাণের জলে হেজে-মজে গেল—আর তোমার বরাতে পাহাড়ের কোলে মা অন্নপূর্ণার আঁচল ছিঁড়ে যত ধান কি-না ঝরে পড়ল! বেশ দাদা, বেশ—

কৃষক। (মৃদু হাসিয়া) আমার বরাতে নয়, দাদা, এ সব মাধার হাতের গুণে!

চাষা-দূত। আজ্ঞে কত্তা, আমাকে ব্যাভ্রম করছেন!

প্রতিবেশী। যাই হোক, তোমার হিংসে করছি না, দাদা—তবে বলতে এসেছি, কি যে, কাচ্ছা-বাচ্ছা নিয়ে ঘর করি - তোমার গোলা এমন ভরা থাকতে যেন শুকিয়ে না মরি,—এই আর কি!

কৃষক। আমার গোলায় ধান থাকলে কি আর—তোমরা জাত-ভাই হচ্ছ—তোমরা শুকিয়ে মরবে!

প্রতিবেশী। না, এই আর কি, এই আর কি! তোমার মাধা কিন্তু খুব—ওর ভারী গতর!...তা,··· কি জান, আমাকে আজ দুটি ধান দিতে পার দাদা? এই ধার—ধার—পারি যদি ত আর বছর শোধ করব।

কৃষক। এ আর বেশী কথা কি? মাধা—

চাষা-দূত। (কৃষকের কানে কানে) দেবেন না কত্তা, দেবেন না—

কৃষক। যা রে পাগলা—একটা থলে চেয়ে আন গে, যা—থলেই বা আর কোথায়—তা—

প্রতিবেশী। আচ্ছা, আমিই একটা থলে নিয়ে আসছি. বাড়ী থেকে— তার আর কি!

(প্রস্থান)

চাষা দূত। (স্বগত) নাঃ, এত ধান হল, এত এ-তা এখনো সেই মামুলি চাল ছাড়লে না! বোকারাম—আর কাকে বলে! আচ্ছা দাঁড়াও, আমিও তোমায় দেখে নিচ্ছি!

কৃষক। হ্যাঁ রে মাধা,—তুই বারণ করছিলি কেন? এত ধান হয়েছে, দুটি দিলুমই বা—ও ত ধার নিচ্ছে, আবার শোধ দেবে।

চাষা-দূত। হ্যাঁ, শোধ আর দিয়েছে! বলে, কথাই আছে,—

নেবার বেলাই আপন-আপন—
ওগো আমার আপনি—
দেবার বেলায় হাত নড়ে না
শিরে ধরেন কাঁপুনি।

কৃষক। না রে মাধা, না। লোকের কথা যা, কাজও তাই!

চাষা দূত। এত ধান—নিয়ে করবে কি, বলছ?

কৃষক। তা না ত কি, তুইই বল্!

চাষা-দূত। এই ধান থেকে আমি এমন খাসা মিঠে পানি বেনিয়ে দিতে পারি—কত্তা, যে তা খেলে আর মুয়ে রা পড়বে না।

কৃষক। কি মিঠে পানি রে?

চাষা-দূত। ভারী মিঠে পানি! সে পানি মুয়ে দিলে, হাঁ—দুব্লার বল হয়,—ক্ষিদে-তেষ্টা

থাকে না—মনে ভাবনা হলে সে ভাবনা চলে যায়—ফূর্ত্তি হয়, সাহস হয়—চার ধারে সে আলো দেখে! তিত্‌কুটে দুনিয়াটা একদম্ মিঠে লাগে!

কৃষক। দূব পাগলা!

চাষা-দূত। আজ্ঞে—পাগলা ত বটেই! যেখন—ঐ পাহাড়-তলিটায় চাষ করবার লেগে বলেছিনু, তখনও কত্তা পাগলা বলে আমায় হুড়িয়ে দিছলেন—তার পর সেই পাগলার কথা খাটল ত।

কৃষক। তা বটে—তা কি দিয়ে তুই এ মিঠে পানি তৈরি করবি, শুনি!

চাষা-দূত। এই ধান দিয়ে।

কৃষক। ধান দিয়ে!

চাষা-দূত। আজ্ঞে কত্তা—

কৃষক। তা খেলে কোন দোষ হবে না ত রে?

চাষা-দূত। হুঁঃ, দোষ কিসের?

কৃষক। তুই এত সব শিখলি কোত্থেকে রে মাধা?

চাষা-দূত। আজ্ঞে, পেটের দায়ে চাকরির জন্যে কত দেশ-ভুঁই ঘুরতে হয়েছে—তাই এক বাবু আমার শিখিয়েছিল।

কৃষক। এ খেলে গায়ে বল পাব! বলিস কি, মাধা?

চাষা-দূত। আজ্ঞে, বল বলে বল! একেবারে সিঙ্গীর বল!

কৃষক। শুধু ধান দিয়ে তৈরি করবি—আর কিছু মেশাবি নে? কিছু চাস্‌নে?

চাষা-দূত। আজ্ঞে, শুধু একটা তামার আর দুটো লোহার পাত্তর চাই।

কৃষক। আমার কাছে লোহার একটা পাত্তর আছে—আর, একটা—আচ্ছা, ঐ ছিদামের কাছে পাব! তামার পাত্তর? দেখি, রাইমণিদের বাড়ী যেন একটা তামার বড় গামলা দেখেছি বলে মনে পড়ছে—সেইটে চেয়ে এনে দিচ্ছি!

চতুর্থ অঙ্ক

গোলা-বাড়ীর প্রাঙ্গণ।

প্রজ্বলিত সুবৃহৎ উনানের উপর প্রকাণ্ড তাম্র-কটাহ; তন্মধ্যে তরল পদার্থ জ্বাল হইতেছে।

'জন'-বেশী চাষা-দূত ও কৃষক।

চাষা-দূত। এই যে—এবার তৈরি হয়েছে!

কৃষক। তাই ত রে, গন্ধ ত মন্দ লাগছে না। এত জল এল কোত্থেকে? এ্যাঁ—?

চাষা-দূত। জল নয়, কত্তা—রস। এইটেই হল গে, আসল জিনিস—এই সে মিঠে পানি!

কৃষক। রংটাও ত চমৎকার! বেশ সোনালি-সোনালি ধরণের—খাসা! বাঃ! স্বাদ কেমন?

চাষা-দূত। দেখুন না, একটু মুখে দিয়ে! (এক পাত্র তুলিয়া দিল)

কৃষক। (পান করিয়া) হুঁ—মন্দ লাগল না। তবে এটুকুতে ঠিক আঁচ পাওয়া গেল না। আর একটু দে দেখি!

চাষা-দূত। এই যে, নিন্ না! (আবার পাত্র ভরিয়া দিল)

কৃষক। (পানান্তে) চমৎকার! খাসা—এমন জিনিস জন্মে কখনো খাইনি—এর কাছে কোথায় লাগে, খেজুর রস! বাঃ!

চাষা-দূত। আর একটু নিন—তা হলে (পাত্র দান) শরীরটেয় জুৎ লাগছে কেমন?

কৃষক। জুৎ বলে জুৎ! একেবারে

"ন যযৌ ন তস্থৌ"

শ্রীযুক্ত দুর্গেশচন্দ্র সিংহ অঙ্কিত চিত্র হইতে

মজবুৎ হয়ে উঠেছি যেন! বাঃ, বাঃ—গিন্নিকেও ডাকি—দু-এক পাত্র খেয়ে নিক্—ওঃ—চমৎকার! বলি, গিন্নি—ওগো গিন্নি, একবার এদিকে এস—চট্ করে এস! তা মাধা—এ মিঠে পানির নাম কি—?

কৃষক। ধান থেকে তৈরি—ধানের গে হল আসল খাঁটি রসটুকু—তাই একে বলে, ধান্যেশ্বরী!

কৃষক। বাঃ—বেঁচে থাক ধান্যেশ্বরী! প্রাণেশ্বরীও এর কাছে হার মানে, বাবা! তর্ হয়ে গেছি!...এই যে গিন্নি—আরে এস, এস।

বালিকা কন্যা-সহ কৃষক-পত্নীর প্রবেশ।

পত্নী। কি গো, ডাকছ কেন? ব্যাপার কি?

কৃষক। আর, ব্যাপার কি? নাও, নাও, এক পাত্তর নিয়ে মুখে দাও—কাঁচা বয়স ফিরে পাবে আবার—শরীর তর্ হয়ে যাবে!

পত্নী। বলি, কি ও—হ্যাঁ গা—তুমি যে মেতে উঠেছ একেবারে!

কৃষক। মাতবে না? এ যে কি চিজ্ গিন্নি, তা আর কি বলব! এক পাত্তর মুখে দিয়ে দেখ—মাধা—

চাষা-দূত। আজ্ঞে—

কৃষক। দে না বেটা, তোর মা ঠাকরুণকে এক পাত্তর্ দে'না!

চাষা-দূত। এই যে নিন, মা-ঠাকরুণ! (পাত্র দান)

পত্নী। এ কি গন্ধ গো—এঁ্যা, কি এ? হ্যাঁ গা, বল না গো, কি?

কৃষক। খাও, খাও, জন্ম সার্থক হয়ে যাবে গিন্নি—তোমার কোন পুরুষে এমন জিনিস মুখে দেয়নি!

পত্নী। বটে! দেখি—(পান) বাঃ—বাঃ—দিব্যি ত!

কৃষক। হুঁ-হুঁ—বুড়ো হচ্ছ, গায়ে জোর নেই—হাতে পায়ে বাত ধরেছে, বলে, দুঃখ কর না—? এখন প্রাণ চাঙ্গা হয়ে উঠল কেমন—? মাধা রে, কি ক্ষণেই তোকে পেয়েছি যে বাবা, তা আর কি বল্‌ব! কেমন, গিন্নি—লাগল কেমন—প্রাণের মধ্যে যেন হরেক রঙের ফুল ফুটে উঠছে! নয় কি? আবার সেই যোয়ান রক্ত ফিরে বইছে যেন! আঃ—(তৃপ্তিসূচক হাই তুলিল।)

পত্নী। এ কি বাবু হ্যাঁঃ!—এ কি খাওয়ালে? আমার যে নাচতে ইচ্ছে হচ্ছে, গাইতে ইচ্ছে হচ্ছে—এঁ্যা—আমি বুড়ো মাগী—ওগো,—

কৃষক। আবার বলে, বুড়ো মাগী!—আরে, পাকা মাথা কাঁচা হয়ে উঠেছে যে—

পত্নী। ওগো, মেয়েটাকেও একটু দাও—আহা! আমি গান গাই—(গান ধরিল) তুমি নাচবে?—হ্যাঁ গা, একটু নাচ না—

কৃষক (কন্যার প্রতি) নে বেটী খা—(কন্যাকে পান করাইল)—কি রে বেটী, কেমন লাগল?

কন্যা। বেশ—বাবা—আর একটু আমায় দে না!

কৃষক। আবার? নে বেটী, নে, খা! (কন্যাকে পাত্র প্রদান) এক কাজ কর্ দেখি, এখন একবার আমার বুড়ো দাদা,—তোর কত্তা মশাই রে—একলাটি আঁধার কোণে বসে আছে—তাকে ডেকে আন্। তোর মামা,

কাকা, পিসে—সব মাঠে আছে, সকলকে ডাক্—বল্‌গে এক নতুন জিনিস পেয়েছি—সব খেয়ে যাক্! যা যা—ছোট্—ছোট্—উড়ে যা রে বেটী—(কন্যা ছুটিয়া প্রস্থান করিল; পরে স্ত্রীর প্রতি) কি গো, আর এক পাত্তর নেবে?

পত্নী। আবার—? তা, দাও—

কৃষক। প্রথমে জিভ্‌টা কেমন ঠাণ্ডা হয়ে যায়—তারপর মাথা—তার পর সারা গা! পা দুটো ভারের মত মনে হত, এখন যেন লতার মত লগ্‌বগে বোধ হচ্ছে! লতার মতই শরীরটে দুলতে চাইছে!

পত্নী। মাধা—আর একটু আমায় দে—

চাষা-দূত। এই যে মা-ঠাকরুণ। (স্বগত) আর কি—এবার বাগে পেয়েছি! কেমন! আজ হল গে, সেই তিনটি বছরের শেষ দিন! এখন আসুন মহারাজ—আমি ত কাম ফতে করে দিয়েছি!

(কৃষকের বৃদ্ধ পিতামহ ও কয়েকজন আত্মীয় প্রবেশ করিল)

পত্নী। এস সব—আমোদ কর—হাওয়ায় যেন কোথায় উড়ে চলেছি!

(গীত)

হাওয়াতে উড়িয়ে দে রে সব—
কোণে বসে কিসের কলরব!
ভয় কি রে—পাপ যদিই বা সে হয়—
পাপের ভরা শিরে কে না বয়!

ঠাকুর্দ্দা। এ কি—সেঁউতির মেয়ের মাথা বিগড়ে গেছে না কি! ছি, ছি—হায়া নেই, ঘেন্না নেই! কি, এ?

কৃষক। ঠাকুর্দ্দা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছ কি? এক ঢোক খেয়ে ফেল—গায়ে বল পাবে, মনে তেজ হবে, প্রাণে ফূর্ত্তি পাবে,—এক কথায় হারানো বয়স ফিরে পাবে, ঠাকুর্দ্দা!

ঠাকুর্দ্দা। নাঃ!—সব বিগড়েছে, দেখছি—কাণ্ড কি এ? বলি, অ নাতবৌ—এ—করছ কি? এত লোকের মাঝখানে—তোমায় ভূতে পেয়েছে না কি!

কৃষক। বুঝবে না—বুঝবে না। আগে একটু এই মিঠে পানি পেটে ঢাল দেখি—তখন সব বুঝবে! দুনিয়ায় কেন এসে খেটে মরছ—চারধারে আলোর ঝাড় দুলছে—দেওয়ালির আমোদ চলেছে! খালি ফুর্ত্তি কর—খালি ফুর্ত্তি! কাজ-কর্ম্ম সব দূর করে টেনে ফেলে দাও! কেন খাটা? মিছে সে সব! আয়েস কর, আমোদ কর। হারু, ভুবন, নাও ভাই, সব এক-এক পাত্তর খেয়ে নাও। বুড়োর কথা শুনো না! মাধা, দে সকলকে—

চাষা-দূত। এই ন্যান্ কত্তারা সব। (বৃদ্ধ ব্যতীত সকলে পাত্র লইল-সকলের পান।)

কৃষক। কেমন লাগল? আবার খাও—মাধা, দে, আবার আমায় আর এক পাত্তর দে।

পত্নী। আমাকেও আর এক পাত্তর! যত খাই, তত্তই যেন প্রাণ উতলে ওঠে—(গীত)

ওরে আমার নয়ন-মণি—

ঠাকুর্দ্দা। থাম্ বলছি! নাঃ,—সব গেল! (মাথা নাড়িয়া বসিয়া পড়িল)

চাষা-দূত। খেয়ে যান, কত্তারা—কত খাবেন! বুড়ো দাদা—আপুনি একটু খাও—

ঠাকুর্দ্দা। চোপ্—!

কৃষকগণ। দে, আমাদের দে, মাধা—আবার দে!

চাষা-দূত। এই যে—এই যে—(সকলের পান)

কৃষকগণ। এস ভাই—মজলিস লাগিয়ে দি, সব! খালি নাচ গান,—কাজ-কর্ম্ম সব শিকেয় তোল—একটু আমোদ করে নি! চিরদিনই কি খাটব? কেন—? বয়ে গেছে, খাট্‌তে!

(সকলে নৃত্য-গীত আরম্ভ করিয়া দিল)

কৃষক। ঠাকুর্দ্দা—একটু খেলে হত না—?

ঠাকুর্দ্দা। (উঠিয়া কটাহস্থ তরল পদার্থ উনানের মধ্যে ঢালিয়া দিল।)

কৃষক। কি! এত বড় আস্পর্দ্ধা—ঠাকুর্দ্দা বলে এ আব্দার মানছি না—এত বড় বেয়াদপি! (ঠাকুর্দ্দাকে ধরিয়া সজোরে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল) বেরসিক বুড়ো,—সবটুকু আগুনে ঢেলে দিয়েছে! এ্যাঁ! এমন মিঠে পানি—ঠাণ্ডা সরবৎ—আহা হা হা—

ঠাকুর্দ্দা। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) নিজেদের সর্ব্বনাশ ডেকে এনেছিস, সব,—এখন আর মানা মানবি কেন? ওরে, সকলের মতিচ্ছন্ন ধরেছে যে, তোদের—! মাঠের এমন ফসল—চেষ্টা-বেষ্টা করলে সব ঘরে ঘরে সোনার খনি বানিয়ে ফেলতে পারতিস! ভাত-কাপড়ের কোন দুঃখু থাকত না! মেয়েগুলোর গায়েও পৈঁছে-খাড়ু দিতে পারতিস! যেমন তোদের বরাত! এ ত সব বিষ গিলছিস্—বেহুঁস হয়ে গিলছিস! এর পর, শতেক খোয়ার হবে, দেখে নিস্! এ তোদের ঠাণ্ডা সরবৎ? হারে হতভাগা—এ সরবৎ নয়—এ আগুন গিলছিস! খেয়ে ঠাণ্ডা হবি, ভেবেছিস্—? এ খেয়ে জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যাবি সব!

(একখণ্ড জ্বলন্ত কাষ্ঠ লইয়া কটাহের উপর রাখিল; কটাহের অভ্যন্তর জ্বলিয়া উঠিল। কৃষকের দল সন্ত্রস্তভাবে সেইদিকে চাহিয়া রহিল।)

পঞ্চম অঙ্ক

কুটীরাভ্যন্তর।

'জন'-বেশী চাষা দূত।

চাষা-দূত। এখনো যা ধান পড়ে আছে—তা অঢেল! রাখবে কোথা, এমন জায়গা নেই! তবে ধান্যেশ্বরীর স্বাদ যখন একবার পেয়েছে, তখন আর দেখতে হবে না! আবার কড়া চড়িয়ে এসেছি—খুব চড়া জ্বাল লাগিয়েছি! গাঁয়ে এখনও অনেক চাষা আছে, যারা এখনো এ ধান্যেশ্বরীর স্বাদ পায়নি! পরাণকে দিয়ে সকলকে ডাকাই। সকলকে খাইয়ে একটা দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধিয়ে দেওয়া যাক্। এ জিনিসও এমন নয় বাবা!—বড়র পিরীতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেক চাঁদ! এই গলাগলি—একটু পরেই অমনি হাতাহাতি বাধিয়ে দিতে এমন মন্তর আর দুটি নেই! তার পর দলশুদ্ধ একেবারে মহারাজের দরবারে চালান করে দোব। কিন্তু—ঐ বুড়োটা ত আচ্ছা জোর বাঁধুনিতে মনটাকে বেঁধেছে—সে বাঁধ একটু টস্‌কালো না!... এ কি—মহারাজ—

(পাপের প্রবেশ)

চাষা-দূত। (অভিবাদন করিল)

পাপ। তোমার খবর কি? বাগাতে পারলে? পান্তা ভাতের প্রায়শ্চিত্ত হল?

চাষা-দূত। আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর! কাজ এবার বাগিয়েছি, চমৎকার! আপনি একটু আড়ালে থাকুন—দলশুদ্ধ এখনি ধরা পড়বে। সবাই এখানে এসে জুটবে'খন! ঐ ও ধাবে ধোঁয়া দেখছেন—? মস্ত উনোন কেটে তার উপর প্রকাণ্ড কড়া চাপিয়েছি ধান্যেশ্বরী বিপুলা হয়ে বিরাজ করবেন—আপনারও কাজ হবে।...চাষাকে পরামর্শ দিয়েছি,—তার ঠাকুর্দ্দা তার জমি-জমা কেড়ে নেবে—তাই সে এখানে আজ গাঁয়ের লোক ডেকে পঞ্চায়েৎ বসাচ্ছে—তারা ধান্যেশ্বরীর মহিমায় হাঁ-কে না বলে যাবে—মিথ্যের নামতা আওড়াবে—অমনি আমাদের শেকলে বাঁধা পড়বে! ব্যস্—

পাপ। বেশ—বেশ—আমি একটু আড়ালে যাই। ঐ বুঝি সব আসছে?

(অন্তরালে গমন)

(পরাণ ও তৎসহিত একদল কৃষকের প্রবেশ)

১। হ্যাঁরে পরাণে, আজ আর বুঝি মিঠে পানি-টানি তৈরি করাস্ নি?

২। তোমার মিঠে পানির সুখ্যাতিতে ত দাদা, গাঁয়ে একেবারে ধন্যি-ধন্যি পড়ে গেছে! কি রকম জিনিসটা হে—আমরা ত কখনো এমন জিনিস মুখেও দিইনি—

৩। শুনলুম না কি—কাঁচা বয়স ফিরে আসে—তোমার ঐ মিঠে পানি খেলে?

৪। ভারী আশ্চর্য্য ব্যাপার, বল কি!—এ্যা?

১। তাই ত—এমন জিনিসও পাওয়া যায়—যা খেলে আর দুঃখু-কষ্ট থাকে না--

৫। প্রাণ না কি তর্ হয়ে যায়?

কৃষক। মাধা—

চাষা দূত। এই যে কর্ত্তা, এনে দিচ্ছি। (পাত্র ভরিয়া মিঠা পানি আনিয়া দিল। সকলের পান।)

১। না! খাসা বটে!

কৃষক। খাও সকলে!

(কৃষক-পত্নীর প্রবেশ)

এই যে, গিন্নি এসেছ—তুমি তা হলে সকলকে খাওয়াও দেখি।

চাষা-দূত। (জনান্তিকে, পাপের প্রতি) এবার আমি একটু মজা করি, দেখুন, মহারাজ! এরই পান্তা কেড়ে নিছলুম, এই পরাণের। তখন ও এতটুকু রাগ করে নি! আর এখন দেখুন—ওর বৌয়ের পায়ে একটা কাঁটা ফুটিয়ে দি—চমকে উঠে অমনি ও পাত্র ফেলে দেবে! এই ধান্য-রস, ধান্যেশ্বরীর জন্যে ও কেমন রেগে ওঠে, দেখুন।

পত্নী। বেশ, বেশ—আমি দিচ্ছি।

(চলিতে গিয়া তাহার পা লাগিয়া একটি পাত্র উল্টিয়া পড়িয়া গেল)

কৃষক। কি! ভারী নবাবী চালে চলেছিস যে, দেখছি! এমন জিনিস ফেলে দিলি, মাগী—(স্ত্রীর কেশগুচ্ছ ধরিয়া সজোরে তাহার পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিল)

পত্নী। তবে রে মিন্সে, আমার গায়ে হাত তুললি! আজ তোর একদিন, কি আমারই একদিন—(প্রহারোদ্যতা)

সকলে। আহা হা—কর কি—কর কি! যেতে দাও, যেতে দাও—

চাষা-দূত। (জনান্তিকে, পাপের প্রতি) দেখলেন মহারাজ—ধান্যেশ্বরীর প্রভাবটা একবার দেখলেন? এরাই আগে কত ভাল মানুষ ছিল—কারুকে কড়া কথাটি বলত না—

আজ ধান্যেশ্বরী পেটে ঢুকেছেন অমনি দাঙ্গা অবধি বাধিয়ে দিতে পেছ-পাও নয়!

পাপ। (জনান্তিকে) বেশ—বেশ—তোমার বখশিস্ মিলবে!

চাষা-দূত। (জনান্তিকে) আরও দেখবেন 'খন—আগে কড়ার ঐ রসটুকু ফুরিয়ে যাক না, একবার। আমি কড়ার তলায় ছোট একটা ফুটো করে দিয়েছি—তা দিয়ে সব রস আগুনে পড়ে যাচ্ছে। ও ত এখনি ফুরিয়ে যাবে—তখন একবার কাণ্ডখানা দেখবেন। এখন এর মাহাত্ম্যে এই পরাণে ব্যাটার সব খোসামোদ করে কি রকম, দেখুন—ঠিক শেয়ালের মত সব ল্যাজ নাড়তে থাকবে'খন! একেই বলে, শেয়ানে-শেয়ানে কোলাকুলি!

কৃষক। দেখ, ভাই সব—আজ আমি তোমাদের পঞ্চায়েৎ ডেকেছি—একটা মীমাংসার জন্যে। আমার ঠাকুর্দ্দা—সেই বুড়ো—আমার সঙ্গে ঝগড়া করে এখান থেকে ত চলে গেছে—ভিন্ গাঁয়ে আমার এক জ্ঞাতি খুড়ো আছে, তার বাড়ীতে গিয়ে সে উঠেছে। সে বলে পাঠিয়েছে, আমি কাজ-কর্ম্ম করছি না, চাষ-বাসে গাফিলি করার দরুণ তার জমিগুলো বরবাদ যেতে বসেছে! তা শোন ভাই সব—আগে সাব্যস্ত হোক ত, জমি কার,—তারপর তার কৈফিয়ৎ—কি বল?

সকলে। নিশ্চয়—নিশ্চয়—

কৃষক তা তোমরা পাঁচ জনে যা বলবে, আমি তা মাথা পেতে নিতে রাজী আছি—ওরে মাধা—পাত্তর দে না—সবাইকে দে। (চাষা-দূত-কর্ত্তৃক সকলকে পাত্র প্রদান—সকলের পান)

সকলে। হ্যাঁ, তারপর?

কৃষক। তার পর, হাঁ, যা বলছিলুম,—আমার কথা এই, আমি আজ বিশ বছর এই জমি চাষ করছি;—মানি বটে, এ জমি ঠাকুর্দ্দার। কিন্তু বিশ বচ্ছর ব্যবহার না করে তার স্বত্ব এতে লোপ পায়নি কি? বুড়ো বলে, তা কেন? তোমায় দিয়ে আমি জমির চাষ করাচ্ছিলুম—তুমি লাভের কড়ি খেয়েছ—আমার স্বত্ব যাবে কেন? তা—তোমরা কি বলতে চাও, এটা আমার জমি নয়—? আমার এতে কোন অধিকার জন্মায় নি? ওরে মাধা—পাত্তর দে—পাত্তর দে! (কথাবৎ কার্য্য)

১। নিশ্চয়, এ জমি তোমার—(পান)

২। খবরদার ছেড়ো না-(পান)

৩। বুড়ো এবার চাইতে এলে, তার মাথায় এক লাঠি বসিয়ে দিয়ো—গোল চুকে যাবে। (পান)

৪। ব্যস্, ব্যস্, বুড়োর মাথা, ঘুন ধরা মাথা—একেবারে ফেটে চৌচির হয়ে যাবে—(পান)

৫। তার পর কে তোমার দখল কাড়ে? (পান)

১। ওহে পরাণ, আর এক পাত্তর দিতে বল—মোদ্দা, ও জমি তোমার—কে তোমার ঠাকুর্দ্দা? তাকে আমরা চিনি না—

২। বটেই ত, জমি তোমার—

৩। একশ' বার তোমার—

৪। পাঁচ শ বার -

৫। হাজার বার। ডাক হে—ঠাণ্ডা পানি ডাক—বিস্তর মাথা ঘামানো গেছে!

কৃষক। মাধা—

চাষা-দূত। (করযোড়ে) আজ্ঞে কত্তা —অবধান হয় - বড় ব্যাভ্রম হয়েছে। মিঠে পানি আজ আর নেই। সব সাবাড় হয়ে গেছে!

সকলে। কি! সাবাড়? অপমান—! বটে!

কৃষক! (শশব্যস্তে) আর একবার দেখ্ না, মাধা—দেখ্, দেখ্—

চাষা-দূত। আর গ্যাখ্‌ব কি! কড়ায় কি আর রস গ্যাখতে পাব—এখন চড়ক গাছ গ্যাখতে হবে!

সকলে। কি! ডেকে এনে অপমান করা! পরাণে, তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা! বেটা—ঠকিয়ে তুমি জমি গাপ্ করতে চাও—

১। আমরা চল্লুম তোর ঠাকুর্দ্দার কাছে—

২। এত তারই জমি—তোর জমি কোথা থেকে হল রে, বেটা?

কৃষক। আজ্ঞে—

৩। আবার, আজ্ঞে!—সরে যা, নইলে মার খাবে।

৪। ওহে, অত চট কেন! বলি, পরাণ ত আর বলছে না যে, আর পানি দেবে না—

১। কি—খোসামুদি! এমন বাপের বেটা নই আমি যে, কারো খোসামোদে ভুলব! আমি হলুম গে, পাঁচ পুরুষ ধরে গাঁয়ের মোড়ল! আমার কাছে চালাকি?

৪। বলি, শোনই না—

১। আবার—কথার উপর কথা!—(বিরাট ঘুসি প্রহার)

৪। কি? মার্—? দেখবি তবে? পরাণে—

৫। মাঝেরপাড়ার দল আমরা—ন' পাড়ার কাছে হঠে যাব? কিছুতে না—এক ঘুসি দিয়েছ—তবে এই নাও, দু ঘুসি! একটা শোধ, একটা সুদ! (প্রথমকে প্রহার করিল)

২। বটে! জমাতে চাও? তবে, এস। রণং দেহি, রণং দেহি, রণং দেহি দেহি মে

(দুই দলে দাঙ্গা বাধিয়া গেল)

চাষা-দূত। (জনান্তিকে পাপের প্রতি) এবার সেই সিঙ্গীর বল দেখা দিয়েছে! সিঙ্গীর মত সবার রক্ত ঝেঁজে উঠেছে! আর এক পাত্র দেওয়া যাক্—মজা দেখবেন'খন।

কৃষক। চুপ—চুপ, মারামারি কেন?

চাষা-দূত। (দৌড়িয়া গিয়া পাত্র আনিয়া দিল) কত্তা, এই যে পাত্তর পাওয়া গেছে—

সকলে। দাও, দাও—(সকলের পান) এস ভাই, ঝগড়াঝাঁটি ভুলে যাও—আবার সব ভাই-ভাই! ওহো, ভাইরে—(পরস্পর আলিঙ্গন) এস একটা গান ধরা যাক্—

(সমস্বরে গাত)

কিসের এত ঝগড়া-ঝাঁটি, গণ্ডগোল বা কেনই হায়?
শরণ সবাই নিইছি যখন, ধান্যেশ্বরীর কোমল পায়—
(মরি হায় রে!)

ষষ্ঠ অঙ্ক

গ্রাম্য পথ।

দক্ষিণ পার্শ্বে ভূপতিত একটা বৃক্ষ-কাণ্ডে ঠাকুর্দ্দা বসিয়াছিল। মধ্যে বালক-বালিকারা খেলিতেছিল। কিশোরীর দল টুকরি বুনিতেছিল। বাম পার্শ্বের কুটীর হইতে সুরাপায়ীগণের জড়িত কোলাহল ভাসিয়া আসিতেছিল। একজন কৃষক টলিতে টলিতে কুটীর হইতে বাহিরে আসিয়া পথের উপর পড়িয়া গেল। পরাণ কৃষকের প্রবেশ।

ঠাকুর্দ্দা। কি, এ সব? হল কি এ! আগে ত এমন ছিল না। দিন ভোর মাঠে-ঘাটে খেটে, রাত্রে যে যার কুঁড়েয় ফিরে, ছেলে-পিলেদের নিয়ে আদর-গল্প করে তোফা খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে জিরিয়ে নিত! আবার ভোর হতে না হতেই কাজ করতে মাঠে ছুটত! কোন অভাব ছিল না, বালাই ছিল না! যেমন শান্তি, তেমনি তৃপ্তি! লোভ-হিংসে কেউ জানত না! আর আজ? (কুটীরাভ্যন্তরে ভীষণ কোলাহল শুনিয়া কর্ণে অঙ্গুলি দিল) নাঃ, এ অসহ্য! মানুষ অধঃপাতে চলেছে—পাপের রাজ্য পূর্ণ হচ্ছে! শুধুই খাওয়া, শুধুই ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি—পশুর মত কি এ ব্যাপার! ছি!

(কুটীরাভ্যন্তর হইতে সুরাপানোন্মত্ত কয়েকজন লোক বাহিরে আসিল। একজন এক কর্ম্ম-নিরতা কিশোরীর হাত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইল।)

কিশোরী। এ—কি—ও বাবারে, অ ঠাকুর্দ্দা—হীরু দা, হীরু দা,—আমি, আমি মেনকা—

ঠাকুর্দ্দা। (উঠিয়া কিশোরীকে মুক্ত করিয়া) বদমায়েস, পাষণ্ড, কাণ্ড-জ্ঞান হারিয়ে বসেছ! এত দূর অধঃপাতে গেছ!

কিশোরী। এখান থেকে আমরা পালাই, ঠাকুর্দ্দা—

(কিশোরী ও বালক-বালিকাগণের প্রস্থান)

পরাণ। কি,—ঠাকুর্দ্দা যে! আছ, কেমন? আমি পঞ্চায়েতের সালিসি ডেকে ছিলুম। তারা বলেছে, ও জমি আমার! জমি নেবে না? বাহাত্তুরে বুড়ো—আজ বাদে কাল চোখ কপালে উঠবে, এখনও জমির লোভ! জমি নেবে? এই নাও—(দুই হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সবলে বৃদ্ধের মুখে গুঁজিয়া দিল। বৃদ্ধ সরিয়া গেল। টাল রাখিতে না পারিয়া পরাণ বৃক্ষ-কাণ্ডের উপর পড়িয়া গেল)

ঠাকুর্দ্দা। চমৎকার জানোয়ার সব তৈরি হয়েছিস, দেখছি! (গমনোদ্যত)

কোলাহল করিতে করিতে কুটীর-মধ্য হইতে কৃষকগণের প্রবেশ।

সকলে। ঠাকুর্দ্দা, যাচ্ছ কোথায়—বলি, অ ঠাকুরর্দ্দা, একটা গান শুনে যাও—

(গীত)

মনে হা হা—মনে আহা, বেজায় এ কি ফুর্ত্তি!
দিবা-নিশি করি পূজা ধান্যেশ্বরীর মূর্ত্তি!

(নৃত্য ও সকলের পতন)

ঠাকুর্দ্দা। (ঘৃণার সহিত তাহাদিগের পানে চাহিয়া বিরক্তভাবে স্থান-ত্যাগ করিল)

চাষা-দূত। দেখলেন, মহারাজ! এই ধানই ছিল, এদের লক্ষ্মী—এই ধানের জোরেই এরা মানুষ ছিল—আপনাকেও মানত না! আর এই ধান দিয়েই আজ তাদের বন্দী করলুম! এই ধান থেকে ধান্যেশ্বরীর সৃষ্টি! এখন কেমন শূয়রের মত সব মুখ গুঁজে পড়েছে, দেখুন! সে সিংহ-বিক্রম, সে শেয়ালের মত ল্যাজ নেড়ে ধূর্ত্তুমি—সে সব কোথায় গেছে! এখন সব শূয়রের মত হয়ে গেছে। এই যে পরাণ—মাটিতে পড়ে, মুখে কাদা মাখা,—দেখতে কেমন হয়েছে, দেখুন—ঠিক শূয়রের মতই না?

পাপ। তাই ত—এ কি? শেয়াল, সিঙ্গী আর শূয়র কেটে ধানের সঙ্গে বুঝি তাদের রক্ত

মিশিয়ে ধান্যেশ্বরী করেছিস? খেয়ে এরা ত দেখলুম, শেয়ালের মত খানিক ল্যাজ নাড়লে; সিঙ্গীর মত গর্জ্জন আস্ফালনও দেখলুম, আবার এখন শূয়রের মতই মাটিতে মুখ গুঁজে সব ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করচে!

চাষা-দূত। এই পরাণ—আগে যতদিন তার ধান-চাল ঠিক সমানভাবে জন্মাচ্ছিল, তত দিন নিজেও বেশ ছিল। তারপর আমি নিজে জন' খেটে ওর দরকারের চেয়েও ঢের বেশী ধান জন্মে দেওয়ালুম। প্রচুরের সঙ্গে সঙ্গে ওর আকাঙ্ক্ষা বেড়ে গেল, বিলাস এল—ব্যস্—তার পর ফরমায়েস, ফুর্ত্তি চাই! আয়েস চাই! তারই ফলে সেই পরাণকে এখন মহারাজের পায়ের নফর করে দিতে পেরেছি! এক ধান্যেশ্বরীর প্রভাবেই আমার কাজ কত সোজা হয়ে গেছে!

পাপ। খাসা জিনিস, তোর এই ধান্যেশ্বরী ত! তোকে রীতিমত বক্‌সিস দেব। এ যা জিনিষ মাথা খাটিয়ে তুই বের করেছিস, এর জোরে দুনিয়া লুটে নেব। এত লোকজন, পাইক বরকন্দাজ, এত তোড়-জোড়, ফাঁদ-ফন্দী কিছুরই দরকার থাকবে না, নরকের খরচও ঢের কমে যাবে। শুধু এই ধান্যেশ্বরীকে পাঠালেই চল্‌বে। এ একাই সকলের কায করতে পারবে। আজই রাজ্যে ফিরে ঘোষণা দেব, ধান্যেশ্বরীকে আমি পাটরাণী করব! সে আমার সহায় থাকলে, আমি আর কারো সাহায্য চাই না, পলকে দুনিয়া জয় করে ফেলব!

যবনিকা।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

সভাপতির অভিভাষণ

[উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনীর দিনাজপুর অধিবেশনে পঠিত]

প্রাচীন ঋষিরা সভা ও সমিতিকে প্রজাপতি-দুহিতা বলিয়া আখ্যান করিয়াছেন। এই সভা তাঁহাদিগের স্তুতিছন্দের সম্পূর্ণ উপযুক্ত, যদিচ আমি তাহা উচ্চারণ করিবার যোগ্য নহি। তবে আজ পরিষদের অনুগ্রহে সভাপতি-পদে বৃত হইয়াছি বলিয়া, সেই দ্যুতিমতী ভাষায় আপনাদিগের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিবার অধিকার আছে।

সভা চ সমিতিশ্চ অবতাম্ প্রজাপতে দুহিতরৌ সম্বিদানে।
যেনাসংগচ্ছে উপমা স শিক্ষাৎ চারুবদানি পিতর
সঙ্গতেষু॥
বিদ্মাতে সভানাম্ নরিষ্টা নাম বৈ অসি।
যে তে কে চ সভাসদস্তে তে মে সন্তু সবাচসঃ॥
এষামহং সমাসীনানাং বর্চ্চো বিজ্ঞানমাদদে।
অস্যাঃ সর্ব্বস্যাঃ সংসদো মামইন্দ্র ভগিনং কৃনু॥
যদ্বো মনাঃ পরাগতং যদবদ্ধং ইহ বেহ বা।
তদ্বাঃ আবর্ত্তায়ামসি ময়ি বো রমতাং মনঃ॥

এই সভা আমার উপর সুপ্রসন্ন হউন।

আমি যেন উপস্থিত পিতৃদিগের আশীর্ব্বাদে উপস্থিত সভাস্থলে চারুবাদী হইতে পারি।

এই সভার অর্থ, আমি জ্ঞাত আছি, ইহার অন্যতর নাম অক্ষুণ্ণা।

সভাসদেরা যেন আমার সহবাচী হয়েন।

আমি যেন তাঁহাদিগের তেজ ও জ্ঞানের গৌরব প্রাপ্ত হই।

এই সংসদের সৌভাগ্য আমি যেন লাভ করিতে পারি।

যদি এই সভায় কাহারো মন পরাগত হইয়া থাকে, কিম্বা ইতস্ততঃ আবদ্ধ থাকে, যেন এই স্থানে আবর্ত্তিত হইয়া আমার মনেতে অনুরক্ত হয়।

যে দেবভাষায় আপনাদিগকে অভিভাষণ করিলাম, তাহাতে আমার অধিকার নাই স্বীকার করি। সেই জ্যোতির্ম্ময়ী ভাষা, আদিকবিদিগের হৃদয়ের ভাষা; সকলের তাহাতে অধিকার নাই। অধিকার সত্ত্বেও আমরা অধিকার ভ্রষ্ট। পূর্ব্বের অধিকার কিসে যে রক্ষা করিয়াছি তাহা জানি না। নিজের ভিটা ছাড়িয়া, আবর্জ্জনাস্তূপের উপর স্থান গ্রহণ করিয়াছি; উচ্ছৃঙ্খল জীবন অবলম্বন করিয়াছি; ধর্ম্মের বন্ধন ছিন্ন করিয়াছি, সমাজের বন্ধন অবজ্ঞা করি; প্রাণের বন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছে। হৃদয়ে অনার্য্য ভাব, জিহ্বাগ্রে অনার্য্য ভাষা। গ্রামে গৃহস্থ নাই, দেবমন্দিরে জাগ্রত দেবতা নাই; নিজের ঘর ছাড়িয়া, পরের দ্বারে উপযাচক আমরা। আমাদের কিসে অধিকার আছে? নির্ম্মম হৃদয় নির্ব্বাক অথচ আমরা বহুবাচী, অতএব সত্যের প্রতি লক্ষ্যশূন্য। নির্ভীক আত্মা হিরণ্যবর্ত্তিনী, পঙ্কিল পদে সে পথে চলা যায় না। গৃহে আলোক নাই, অথচ "মুস্কিল আশান" সাজিয়া; পরের কল্যাণ কামনা করিয়া বেড়াইতেছি। যদি তাহাতেই কিছু পাথেয় সংগ্রহ করিয়া লইতে পারি। শূন্য হস্তে আশীর্ব্বাদ করিতে শিখিয়াছি। ভিক্ষার ধন লইয়া দান করিতে বসিয়াছি। সূর্য্যোদয় হয় পূর্ব্বে; আমরা পরাঙ্মুখ হইয়া আছি।

হে ইন্দ্র, আমাদিগকে জ্ঞান দাও, পিতা যেমন পুত্রকে জ্ঞান দান করে। এমন পথে শিক্ষা দাও, জীবনে যেন সূর্য্যকে দেখিতে পাই। হে পুরুহুত, আমরা যজ্ঞের জীব, আমরা যেন প্রত্যহ সূর্য্যকে প্রাপ্ত হই।

ইদং ক্রতুং ন আ ভর পিতা পুত্রেভ্যো যথা।
শিক্ষা নো অস্মিন পুরুহূতয়ামনি, জীবা জ্যোতিরশীমহি॥

যদি আমরা এই প্রার্থনা করিতে পারিতাম, ঈশ্বরও আমাদিগকে সুপথ দেখাইয়া দিতেন।

সচন্দ্রজ্যোতিঃপ্রকাশিতা নেত্রী ঊষা আকাশের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া, দাঁড়াইয়া আছেন; দীপ্তিমতী আলোক বিকাশিতাঙ্গী দেবী ঊষা প্রত্যহ সেই দ্বারে দণ্ডায়মানা, আমরা নিদ্রাতুর কখনো তাঁহাকে দেখি না। এই বিচিত্রা বিস্তীর্ণা দেবীকে যাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের স্তুতি দেবলোকে গ্রাহ্য হইত। আমরাও বিনীতভাবে আজ স্তুতি করিতেছি। আমাদের আঁধার হৃদয়ে আলোক আনিয়া দাও, প্রাণে বল আনিয়া দাও। অনাবৃত আকাশের নীচে, স্বাধীনচেতা কবি গুরু ছিলেন। নিতান্ত ক্ষুদ্রচেতা আমরা, তাঁহাদিগের মত মনের সাহস আমাদিগের হইবে কিসে?

তাঁহাদিগের এক একটি শব্দ, এক একখানি আলেখ্য।

ঊষা জ্বলন্ত বলিয়া, "ভাস্বতী"।

আলোকের উৎস বলিয়া "ওদতী"।

অন্তকে আলোকিত করেন বলিয়া "দ্যোতনা"।

রক্তিম বলিয়া "অরুষী"।

শ্রেষ্ঠ বলিয়া "মঘোনী"।

শুদ্ধ বলিয়া "রিতাবরী"।

জাজ্বল্যমান বলিয়া "বিভাবরী" যাহা আমাদের ভাষায় আজকাল রাত্রি।

সঞ্চারিণী বলিয়া "সুনৃতা"।

দেবতা কি, না বুঝিলে, তাঁহার উপযুক্ত নাম ধরিয়া কেহ ডাকিতে পারে না। বৈদিক কবি উষাকে অনাবৃতাবক্ষা নর্ত্তকীর সহিত তুলনা করিতে সঙ্কোচ করেন নাই। যে কণ্ঠে তাঁহাকে মঘোনী ও রিতাবরী সম্বোধন করিয়াছেন সেই কণ্ঠে, দেবী তুমি কন্যার ন্যায় শরীর বিকাশ করিয়া, দীপ্তিমান সূর্য্যের নিকট গমন কর; যুবতীর ন্যায় উজ্জ্বল দীপ্তি-বিশিষ্টা হইয়া, হাস্যমুখে তাঁহার সম্মুখে বক্ষোদেশ অনাবৃত কর বলিয়া স্তুতি করিয়াছেন।

মনে যেরূপ দেখিয়াছেন, সেরূপ অবতারণা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হ'ন নাই। তাঁহাকে কখনও বালিকা, কখনও জরামৃতা, কখনও সূর্য্যপত্নী, কখনও বা সূর্য্য-জনয়িত্রী বলিয়া অভিহিতা করিয়াছেন। নির্ভীক কবি সহস্র ভিন্ন ভাবে তাঁহাকে দেখিয়াছেন। দ্বিধাশূন্য সংশয়শূন্য, অপরের অবলম্বন রহিত বীর্য্য-শালী মহাপুরুষের পক্ষে যাহা সম্ভব হইয়াছিল, তোমার আমার সে চেষ্টায় পাপ স্পর্শে। সৃষ্টি বিষয় তাঁহারা কি বলিতেছেন শুন :—

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নোব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্ম্মন্নম্ভঃ কিমাসীৎ গহনং গভীরং॥
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং নতর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চনাস॥

Nor aught nor naught existed; yon bright sky
Was not, nor heaven's broad woof outstreched above.
What covered all? what sheltered? what concealed?
Was it the water's fathomless abyss?
There was not death—hence was there naught immortal.

Maxmuller.

দাম্ভিক কবি গর্ব্বের সহিত বলিয়াছেন—আমরা সত্যবাদী—মিথ্যা কহি না।

নূনমৃতা বদন্তো অনৃতং রপেম।

এই সত্যের তেজোবলেই তাঁহাদিগের কাব্য তেজোময়। আমাদিগের হৃদয়ে যে দিন এইরূপ বল আসিবে, আমাদিগের কবিতাও ওজস্বিনী হইবে। সাহিত্যের মূলে সত্য ও সাহস চাই। এ বল আসিবে কিসে? ধর্ম্মের পথ অবলম্বন না করিলে, সামাজিক গ্রন্থি দৃঢ় না করিলে, অসত্য উপেক্ষী না হইলে, এ শক্তির কখনও সঞ্চার হইবে না। আপনার পারিচর্য্যে আপনাহারা হইয়া চিরদিন রহিতে হইবে। একদিন ঘরের দিকে চোখ পড়িয়াছিল, অবসন্ন আত্মা গৃহ-দেবতাকে জাগ্রত দেখিতে পাইয়াছিল, নূতন ভাব মনে অঙ্কুরিত হইয়াছিল, নূতন আলোক আপনার হৃদয়ে দেখিতে পাইয়াছিলাম; বহু দিনের কথা নহে, কিন্তু আলোক স্তিমিতপ্রায়, সে অঙ্কুর বিকাশের পূর্ব্বেই যেন শুকাইয়া গেল, দেবতা শিলাখণ্ডে পরিণত হইল, দৃষ্টি

আবার বাহিরের জঞ্জালের উপর নিক্ষিপ্ত হইল। ভাগ্যের দোষ দেই না। বালকত্ব না ঘুচিতেই আমরা পিতা; শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিতেই আমরা শিক্ষক; মাত্রা শুদ্ধ না হইতেই আমরা লেখক। সাধ্যাতীতের সাধনা অপচয় মাত্র, তাহাতে অকল্যাণ ভিন্ন কল্যাণ হইতে পারে না। যাহা আয়ত্তাধীন তাহাতেই বলের পরিচয় পাওয়া যায়। অধিকার যতই আমরা অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিব, আমরা ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া পড়িব। জাতীয়তার অবতারণা রাজসূয় যজ্ঞ, সংজ্ঞে সে যজ্ঞের অধিকারী হওয়া যায় না। শুদ্ধ, সংযমী, প্রশান্তচেতা হওয়া চাই। আমার হৃদয় আমারই রাজ্য, অনুভব করা চাই, আমি আছি না বুঝিলে, আপনার কি অপরের চিনিয়া লইবে কি প্রকারে? আদর্শভ্রষ্ট আমরা বারবণিতার অঞ্চল ধরিয়া মার অনুসন্ধানে চলিয়াছিলাম। প্রথমে আপনার ঘরের ভিতর আপনার স্থান কর, পরে পৃথিবীর কোন্ খণ্ডে বাসা বাঁধিয়াছ তাহা বুঝিতে পারিবে, বিশ্বের সহিত কি সম্বন্ধ তখন উপলব্ধি হইবে। ঋত্বিকেরাই আহুতি দিতে সক্ষম, আহুতি ভেদে দেব কি দানব, যজ্ঞক্ষেত্র অধিকার করে।

আদি কবিই আর্য্যাবর্ত্তে আদি পুরোহিত, গুরু ও শিক্ষক ছিলেন। সে স্থান আজ কে অধিকার করিতে পারে? আমরা নিজের খেয়ালে, আপন আপন ধর্ম্ম গড়িয়া লইতে শিখিয়াছি। কখনও বা ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছি, কিম্বা করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। আমরা বিজ্ঞানের দোহাই দিতে শিখিয়াছি, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, বোম্ মাপ জোক করিতে পারি, জগৎ কারণ অপরিমেয় বলিয়া তাঁহার ধ্যান করা নিষ্ফল মনে করি। আমরা দেবতার ধার ধারি না, দেবালয়ের পাশ দিয়া চলি না—আমরা কি বলের উপর নির্ভর করিয়া অপরকে বল দান করিতে পারি? তুমি আপনি অবলম্বন রহিত, কি ভরসায় তোমায় অবলম্বন করিব? তাই বলি চিত্ত শুদ্ধ করিতে শিক্ষা কর, নিজের গৃহ পরিষ্কার করিয়া লও। ঘরের আঁধার কোণে বসিয়া জগতের আঁধার অনুভব করা সহজ, কিন্তু অবারিত দ্বারে না দাঁড়াইলে জগতের বিস্তীর্ণ আলোক দেখা যায় না। তাই বলি হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত কর। বিশ্বের প্রাণের ভিতর স্থান না পাইলে বায়ু বিতাড়িত বাষ্পের ন্যায় শূন্যে মিলাইয়া যাইবে। সমাজে প্রাণ নাই, বিশ্বের প্রাণ অনুসন্ধান নিষ্ফল।

স্বাধীনচেতারই হস্তে লেখনী জ্বালামুখী হয়। দেবীতমা সরস্বতী সূর্য্যালোকাবৃতা; অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি ভিন্ন স্থূল দৃষ্টির গোচর নহেন। এই দৃষ্টি সাধনায় মেলে। যখন বলিতে পারিবে, My mind to me a kingdom is তখন সে রাজ্যে দেবীতমার পূর্ণোপচারে পূজা সম্ভব। মিথ্যার বোঝা ঘাড়ে লইয়া সমাজ গড়া যায় না। দেবীর পূজা সোনার ফুল দিয়া হয় না। সত্যই জীবনের ভিত্তি, মানব হৃদয়ের সাহস। ধর্ম্মবল, কাব্যবল, সবই সত্যের উপর নির্ভর করে। সমাজে লুকাচুরি করিতে করিতে মন জরাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। মুখে যাহা কাজে তাহা যে জাতি করিতে অশক্ত, কোন্ আশা তাহার ফলবতী হইবে? বক্তা বাঙ্গালী বাহিরে বীর, গৃহ

মধ্যে প্রবেশ করিলেই মার্জ্জার হইয়া পড়েন। ধর্ম্মাচার্য্য বাঙ্গালী আপনার গৃহমধ্যে অত্যাচার করিতে কুণ্ঠিত হ'ন না, কিন্তু পরের কোষ্ঠী কাটিতেও অনুমাত্র সঙ্কোচ করেন না। সকলেই প্রায় অনাচারী, কিন্তু সকলেই আচারের গণ্ডীর ভিতর আছি বলিয়া বুঝাইতে চাই। মিথ্যার হাটে মূর্ত্তি কেনা বেচা চলিতে পারে, দেবী পাওয়া যায় না।

প্রসিদ্ধ ফরাসী কবি Beranger, নেপোলিয়নের সমসাময়িক ছিলেন। নেপোলিয়নের পতনের পর ফ্রান্সের সামাজিক অবস্থা পঙ্কিল হইয়া পড়িয়াছিল। Beranger সাহিত্য-সমাজের কাছে এই বলিয়া বিদায় লইয়াছিলেন—"আর লিখিব না বলিতে পারি না, কিন্তু লেখা প্রকাশ করিব না, ইহা প্রতিজ্ঞা করিতেছি। দেখিবার শক্তি আছে, কিন্তু আর দেখিতে চাহি না। জীবনের শেষ সন্ধ্যাতে চক্ষু মুদিয়া থাকিতে থাকিতে ঘুমাইয়া পড়িতে ইচ্ছা নাই। সময় আসিয়াছে মনে হইলে, অকাতরে ধরাশায়ী হইয়া চিরনিদ্রা লাভ করিব। প্রাণের কথা লইয়া হাটের মধ্যে দাঁড়াইতে পারি না, সে কথা যদি বেচা কেনা চলে চলুক—ঘরে যে ক্ষুদ কুঁড়া আছে তাহাতেই আমার চলিবে। আতুরের পায়ের ধূলি চক্ষুতে নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা নাই।" অনেকেই এ কথার সত্যতা বোধ হয় অনুভব করেন। আমি বলিলাম বলিয়া যদি আমাকে মাপ করা প্রয়োজন মনে করেন মাপ করিবেন। আপনাদিগকে বিশ্বাস করিতে বলি, আমি সত্য যাহা ভাবি তাহাই বলিতেছি। হাটের মধ্যে বাস করিবার অনিচ্ছাসত্ত্বেও অবস্থাক্রমে আমরা অনেকেই হাটের মধ্যে বাস করিতে বাধ্য। হাটে বারওয়ারি হইতে পারে, কিন্তু উহা পূজার স্থান নহে।

কথা সত্য তাহার অন্য প্রমাণ আছে। বাঙ্গালা নাটক সাধারণতঃ বলিতে গেলে নাট্যজগতে উচ্চ স্থান পায় নাই। আমাদিগের সামাজিক অবস্থায় পাইতে পারে না। পৃথিবীর কোন স্থানে পারে নাই। নাটক সাহিত্যের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করে। জাতীয় ধীশক্তির প্রধান পরিচয় নাটকেই পাওয়া যায়। অন্য কবিতা কবির মানসজাত, গাথা নিজের প্রাণের গান, মহাকাব্য পৌরাণিক ইতিহাসের অবতারণা—যাহারা আর জগতে নাই, কল্পনার সাহায্যে কবি কঙ্কালে পুনর্জ্জীবন দেন। তাঁহার রচনা মধ্যে দৈবদেবী মানব যেখানে উপযুক্ত মনে করেন, সেইখানে বসাইয়া ল'ন। কিন্তু যথার্থ নাটক সামাজিক চিত্র; যাহা আছে কবি তাহাই পরিস্ফুট করিয়া তোলেন। যাহা প্রত্যহ দেখি তাহার ভিতরের প্রাণ কোথায় প্রচ্ছন্ন আছে তাহাই খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। একের মনোভাব নহে, সামাজিক প্রাণীসকল কি সূত্রে গ্রথিত আছে, যদি বিচ্ছিন্ন থাকে কোথায় তাহার ছেদ হইয়াছে তাহাই আবিষ্কার করা—তাহাই সেই সমাজের লোকের যাহাতে উপলব্ধি হয় সে শিক্ষা নাটক হইতে হয়।

যোগ বিয়োগ শুদ্ধমাত্র গণিতের ভাষা নহে, মানবহৃদয়ের ভাষা। এক এক জনের আশা, মনোভাব লইয়া সমাজ সৃষ্ট নহে—অথচ মানুষের নিজত্ব যতদিন আছে ততদিন

আমার হৃদয়ের আশা আমারই, আমার স্নেহ মমতা আমারই, কিন্তু সমাজের শৃঙ্খল কোথায় তাহা অবরোধ করিয়াছে—কোথায় তাহার বিস্তৃতি সাধনা করিতেছে, কোথায় তাহা বিশ্বজগতের প্রাণের ভিতর আমাকে হাত ধরিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহাই যথার্থ নাটকে প্রতিভাত। সুন্দর কুৎসিত, সত্য মিথ্যা, অনুরাগ বিরাগ সকলেরি নাট্যরাজ্যে স্থান আছে। নাটক মানব-সমাজের প্রতিরূপ, মনুষ্য হৃদয়ের জ্বলন্ত, জীবন্ত আখ্যান—পয়ারে তাহাকে আবদ্ধ করা কঠিন, গদ্যে তাহা সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত হয় না; তাহার ভাষা, তাহার ছন্দ কবিকে আবিষ্কার করিয়া লইতে হয়, তাহা নিয়মবদ্ধ করা যায় না। বহির্জগৎ কিম্বা অন্তর্জগৎ বিশ্লেষণ করা কাব্যের উদ্দেশ্য নয়। সম্ভাবিতের বিস্তৃতি আর সুদূর অস্পষ্ট আশাকে পরিস্ফুট করিয়া তোলা, অর্থাৎ অসম্ভাবিতকে সম্ভবপর করার সাধনা, বিরাগ হইতে নূতন রাগের মূর্ত্তি অবতারণা করা, অকল্পিতকে কল্পনার আয়ত্ত মধ্যে আনা, সকল প্রকার কাব্যেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু সেই আশা, সেই অনুরাগ, সেই আদর্শ সমাজের হৃদয়ে জাগ্রত করা নাটকের শিক্ষা। নাটকেই কবি প্রকৃত পক্ষে শিক্ষক।

ইংলণ্ডের সাহিত্যের ইতিহাস দেখ এই কথার সত্যতা প্রমাণ হইবে। এলিজাবেথের সময় ইংলণ্ডে নাটক চরম উৎকর্ষ লাভ করে, সর্ব্বোচ্চ সোপান আরোহণ করে। সে সময় ইংলণ্ডে নূতন প্রাণ আসিয়াছিল, নূতন আশা নূতন শক্তির সঞ্চার হইয়াছিল। ক্ষুদ্র দ্বীপবাসী জগতের রাজ্য অধিকার-প্রয়াসী হইয়াছিল। সেই সময়ে ইংরাজী ভাষাতেও নূতন তেজের আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন এক সময় আমাদের দেশে বাঙ্গলা লেখাপড়ার অনাদর ছিল, ইংলণ্ডেও এই সময়ের পূর্ব্বে ঠিক তাহাই ছিল। লাটিন এবং গ্রীকের চর্চ্চা ভিন্ন শিক্ষিত সম্প্রদায় ইংরাজী ভাষার চর্চ্চা লজ্জাকর মনে করিতেন। আমাদিগের পণ্ডিতেরাও সংস্কৃত ভাষা ছাড়া, বাঙ্গলা ভাষার অনাদর বহুকাল পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন, আর আমাদের ইংরাজী ভাষামুগ্ধ শিক্ষিত সম্প্রদায় বাঙ্গলা ভাষা ব্যবহার করা, অনেক দিন ধরিয়া হেয় জ্ঞান করিতেন। Roger Ascham ইংরাজী ভাষায় বই লিখিবার সময় এইরূপ ভূমিকা করিয়াছিলেন—"...although to have written this book either in Latin or Greek had been more easier and fit for my trade in study, yet I have written this English matter in English tongue for Englishmen..." তাহার পর কিছুকাল ধরিয়া লেখকেরা লাটিন আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া এক অদ্ভুত রচনারীতি সৃজন করেন যখন I trust the learned poets will give me leave and vouchsafe my book passage as being for the rudeness thereof no prejudice to their noble studies but even (as my intent is) an *instar cotes* to stir up some other of meet ability to bestow travail in this matter. আমাদের দেশেও তাহা ঘটিয়াছিল, নবজলধর-পটলসংযোগে প্রভৃতি সমাসের ও অনুপ্রাসের দৌরাত্ম্যে বাঙ্গলা ভাষার হাতে সোণার

হাতকড়ি ও পায়ে বেড়ী পড়িয়াছিল। পুস্তকের নাম Hecatompathia ও প্রভুকম্রতত্ত্বনন্দিনী প্রায় এক জাতীয়। তখন ইংরাজী ব্যাকরণ শুদ্ধ করিয়া লিখিবার প্রয়োজন জ্ঞান জন্মায় নাই; more easier প্রভৃতির ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যাইত। আমরাও তাই করিয়াছি, বাঙ্গলায় ব্যাকরণ নাই বলিয়া যাহা ইচ্ছা তাহা লেখা হইয়াছে। রাজা সতী অসতী, শনি ভানুতনুজা প্রভৃতি অনেক কথা এইরূপ পাওয়া যায়। কিন্তু এরূপ করিতে করিতে সহজ সরল ভাষায় লিখিবার চেষ্টা জন্মিতে থাকে। লাটিন দেবদেবী ছাড়িয়া, সাধারণ মানুষের জীবনের উপর ক্রমে দৃষ্টি পড়ে। ইংলণ্ডে Morality plays, Interludes, Senecan tragedies, Chronical plays একে একে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। শূন্য পুরাণ মানিক চাঁদের গান, রাম যাত্রা, পাঁচালি প্রভৃতি রচনা আমাদের মধ্যে আজকাল নাই। নিজের ঘরের ছেলেমেয়ের উপর যখন চোখ পড়ে তখন নিজের কর্ত্তব্যও অনুভূত হয়। সেই সময় ইংলণ্ডে জাতীয় জীবন উদ্ভাসিত হয় বলিয়া সেই সময়ের কাব্য নাটক অদ্ভুত বীর্য্যশালী, তাহার প্রত্যেক ছত্রে নবজাত ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষার প্রতিভা নূতন ছন্দে প্রতিভাত হয়। Sackville ও Shirleyর মধ্যবিং সময়ে এই বলের উদ্ভাস প্রত্যক্ষ হয়। দেখিতে দেখিতে সেক্ষপীয়র সাহিত্য-জগতে সূর্য্যের মত উদিত হইলেন। পূর্ব্ব সময়ের নাটকগুলি পড়িয়া দেখিলে অনেক কুৎসিত কথা ও জঘন্য ভাব দেখিতে পাইবেন। কিন্তু কুৎসিত কথা মানুষের মুখে আছে, কুৎসিত ভাব মানবের মনে আছে। পাপ অপ্রচ্ছন্ন ভাবে সমাজে আছে, পুণ্যই অনেক সময় প্রচ্ছন্ন থাকে। পাপপুণ্যে মানুষের হৃদয়, পাপপুণ্যে আমাদের জগৎ, অপাপবিদ্ধ জগৎ মানুষের নহে, দেবতার। এ জগতে ঈশ্বরের স্বরূপ রাহুগ্রস্ত; তাই তাহার সম্যক উপলব্ধি এ জগতে সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে।

সত্য যদিচ বলের কারণ, তাহাতে অহং-এর অধিকার নাই, তাহা সার্ব্বজনীন। সত্য যেমন মানব আত্মার ভাষা, মিথ্যা তেমনি মানব হৃদয়ের দরদ দিয়া মাখা;—এই সত্য-মিথ্যা-জড়িত মানবসমাজের চিত্র নাটকে প্রতিফলিত। সব সময়ে জীবনে মিথ্যা পরাজিত হয় না; Renan এক স্থানে বলিয়াছেন "জগদীশ্বর তোমার রহস্য বুঝিতে পারি না, তুমি সে রহস্য আমাদের দৃষ্টি হইতে প্রচ্ছন্ন রাখ, সেটা আমাদের উপর তোমার আশীর্ব্বাদ। সত্য যদি সর্ব্বত্র প্রকাশিত হইত, তাহা হইলে মানব হৃদয়ের স্বাধীনতা থাকিত না।"

যথা ইচ্ছা মন যায়, পৃথিবীতে মানব যথা ইচ্ছা বিচরণ করে। নাটক এই যথেচ্ছাচারী মানবসমাজের অন্তর্নিহিত রহস্য উদ্ভাসিত করিয়া তোলে। সেক্ষপীয়রের পূর্ব্বে যেমন কতক ইংরাজ কবি তাঁহার জন্য স্থান প্রস্তুত করিয়াছিল, তাঁহার পরেও কতক কবি, সেস্থান অধিকার করিবার চেষ্টা করে। যত দিন ইংলণ্ডে সেই নব-জীবনের স্রোত বহিয়াছিল ততদিন ধরিয়া ইংরাজী নাটকের প্রতিপত্তি ছিল। যে সময় হইতে সে আবেগ মন্দীভূত হয়, সেই সময় হইতে ইংরাজী নাটকের গৌরব হ্রাস হইয়াছে। বড় গাছে যেমন পরগাছা আশ্রয় করে, সেইরূপ

তাঁহাদিগের আধুনিক নাটক পরগাছা স্বরূপ। নাট্যশালায় তাঁহারা ফরাসী নাটক অনুবাদ করিয়া চালাইতেছেন। বিলাতের জীবনের বিশেষত্ব গিয়াছে, উৎসাহ সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, আজকাল বহুদেশের সংসর্গে তাহাদের সকলের সহিত মিলিয়া চলিতে হইতেছে, যাহা আছে তাহা বজায় রাখিতে যত্নবান হইতে হইয়াছে। সমাজের প্রাণী সবই প্রায় এক ছাঁচে ঢালা, মানসিক তেজ বহু ব্যাপারে বিক্ষিপ্ত হইয়া কেন্দ্রীভূত হইতে পারিতেছে না। তাহা ছাড়া ঘরে কোঁদল বাধিয়াছে। গৃহের ভিতর কচকচিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত—নাটক লিখিবার অবসর

মাননীয় বিচারপতি আশুতোষ চৌধুরী এম, এ, এল্, এল্, বি

[দিনাজপুর সাহিত্য-সম্মিলনীর সভাপতি]

কোথায়? যেমন ইংরাজী সাহিত্যে নাটকের উদ্ভাসের কথা বলিলাম, ফরাসী দেশেও ঠিক ঐরূপ হইয়াছিল। ফ্রান্সের চারিদিকে অন্য অন্য দেশ, কাজেই তাহাকে নিজের বিশিষ্টতা বজায় রাখিয়া চলিতে হইয়াছে। যখন রোমান সভ্যতা চূর্ণ হইয়া যায়, ফরাসী ভাষার তখন জন্ম—ল্যাটিন ভাষা হইতেই তাহার উৎপত্তি। রোমানদিগের পূর্ব্বের কেণ্টদিগের প্রভাবের ছায়া তাহাতে পড়ে নাই। Conquering Frankরাও সেই ভাষার মধ্যে নূতন ভাষা চালাইতে পারে নাই। ক্রমে এই ভাষার তেজ বৃদ্ধি হইতে লাগিল কিন্তু চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে Civil War গৃহবিচ্ছেদের দরুণ ফ্রান্সের সাহিত্য চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। সেই সময়ের শেষভাগে বিশৃঙ্খল ফরাসী সমাজে নূতন ভাবের আভাষ পাওয়া যায়। সেই বিশৃঙ্খল সমাজে এক মহাকবি জন্ম গ্রহণ করেন; কিন্তু এই কবি দস্যু ছিলেন,—বহু দিন ধরিয়া কারাবদ্ধ ছিলেন, একবার তাঁহার উপর প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়া কোনরূপে পরিত্রাণ পান, কিন্তু এই অসাধারণ পুরুষ, অসাধারণ কাব্য শক্তির পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাম Villon. সেই সময় হইতে Ronsard পর্য্যন্ত দিন দিন ফরাসী সাহিত্যের উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময় Byzantine রাজত্ব ধ্বংস হয় এবং এক নূতন তেজ ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন এবং ইংলণ্ডে উদ্ভূত হয়। ফ্রান্সে এই সময় Ronsard বলিয়া এক-জন মহাকবির অভ্যুত্থান হয় এবং নাট্য জগতে Cornneille, Racine পরে Moliere এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে Voltaire এক এক যুগের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। ফ্রান্সের ইতিহাস এক মহাকাব্য—ফ্রান্সের সাহিত্য তাহারি পথবর্ত্তী; ফ্রান্সে কবি, শিক্ষক চিরদিনই সমাদৃত। Pleiade দিগের সময় হইতেই ফরাসী দেশে সাহিত্যের একটি বিশেষ সমাজ সৃষ্টি হয়। সে সমাজে রাজা প্রজা ছিল না, গুরু শিষ্য ছিল, ধনী নির্ধন ছিল না; সকলেরি সেই সমাজে সমান অধিকার। ফ্রান্স যেমন দিন দিন প্রতাপান্বিত হইয়া উঠে তাহার সাহিত্য-সমাজ দিন দিন নূতন বলে বলীয়ান হইয়া উঠিয়াছে। French Revolution-এর সময় দেখ, জাতীয় তেজের কি আশ্চর্য্য বিকাশ দেখিতে পাইবে। এই সময়ের একটী চিত্র আপনা-দিগের সম্মুখে উপস্থিত করিতে চাই।

ফরাসী সমাজে যেমন এক সময়ে অভি-জাতবর্গ এবং জনসাধারণের মধ্যে একটি ঘোর বিচ্ছেদ হইয়া পড়িয়াছিল, ফরাসী সাহিত্যে, বিশেষ কাব্যের ভাষাতেও সেইরূপ Noble এবং Bas, মহৎ ও নীচজাতীয় কথার ভাগ হইয়াছিল। যাহা সাধারণের ভাষা তাহা নীচ বলিয়া অভিহিত ও কাব্যে অব্যবহার্য্য ছিল। নীচের ভাষা নীচভাবে কলুষিত মনে করা হইত। গাছ বলা অসঙ্গত, বিটপি কিম্বা পাদপ না বলিলে ভাগবত অশুদ্ধ হইত। Racine তাঁহার একখানি নাটকে Chien কুক্কুর কথাটি ব্যবহার করেন, তাহা লইয়া কতই না আন্দোলন চলিয়াছিল, mouchoir রুমাল কথা এক স্থানে ব্যবহার হইয়াছিল বলিয়া, নাট্যশালায় খুনাখুনি হইয়া গিয়াছিল। আমাদের দেশে এখন পর্য্যন্ত কেহ কেহ চলিত কথা ব্যবহার করিতে কাতর হ'ন। কথার

মধ্যেও আমরা ব্রাহ্মণ চণ্ডালের ন্যায় জাতি দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু যে জাতিতে বড় ছোটর মধ্যে ভেদ অবহেলে উঠাইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিল, সেই জাতির কবিও কতদিন ধরিয়া কথার জাতিভেদ সহ্য করিতে পারে? এই বিষয় লইয়া সাহিত্য জগৎ Victor Hugor র কিছু পূর্ব্বে হইতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। একদল লেখক Romantic School নামে পরিজ্ঞাত, সাধারণ কথাগুলি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে তাহাদের Classic School এর সহিত ঘোর দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল। যাহারা আধুনিক, তাহাদের বয়স কম, সাহস অধিক, তাহারা উন্মাদের মত এই বিবাদে যোগ দিলেন; এমন কি অনেকে নিজের পারিবারিক নাম পর্য্যন্ত তুলিয়া দিলেন; তাহার স্থানে Dick, Tom, Harry যাহা মনে আসিল তাহাই ডাকনাম করিয়া লইলেন। পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধেও তাহাই হইল। তাহারা ভদ্র-সমাজের কালো Hat, Coat ছাড়িয়া সন্তুষ্ট হইলেন না;—বিবিধ বর্ণের বিবিধ রকমের কাপড় পরিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ লম্বা চুল রাখিলেন, কেহ মাথা মুড়াইয়া লইলেন; পারিসের রাস্তায় যেখানে সেখানে এই অদ্ভুত বেশধারী, অভিনবের দল দেখা যাইতে লাগিল। ইহারা প্রায় সকলেই সাহিত্যসেবক। অপর দলের মধ্যে কতিপয় যুবক, Jupiter, Neptune, Mars প্রভৃতি দেবতাদিগের সাজে সজ্জিত হইয়া পথে চলিতে লাগিলেন। দুই দলে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইলে লাঠালাঠিতে পরিণত হইত। এই সময় Victor Hugor কাব্যের অভ্যুদয় হয়। সময় থাকিলে তাহার প্রথম নাটক Cromwell এর উপক্রমণিকার কিয়দংশ পড়িয়া শুনাইতাম। Theophile Gautier এই উপক্রমণিকাকে সাহিত্যের Mount Sinai এর Ten Commandments বলিয়া গিয়াছেন।

Cromwell লইয়া অনেক বাদ বিসম্বাদ চলিল। তাহার পরেই তিনি Hernani বলিয়া নাটকখানি লেখেন। ফরাসী সাহিত্য-সমাজে 25th Feb. 1830, যে দিন Hernani অভিনীত হয়, 14th July এর মত পূজার দিন বলিয়া গণ্য। Hernani পৌরাণিক শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া ফ্রান্সের কাব্য জগতকে নূতন আলোকে আলোকিত করিল। Hugo পুরাতন ছন্দের নিয়ম অনায়াসে ওলট পালট করিয়া নূতন ছন্দের সৃষ্টি করেন। প্রথম অভিনয়ের দিন বেলা দ্বিপ্রহর হইতে সহস্রাধিক Hugo-সেবকের দল রঙ্গালয় দখল করিয়া লইলেন; পৌরাণিকের দলও স্থান বলপূর্ব্বক অধিকার করিতে ছাড়িলেন না। অদ্ভুত বেশধারী শত শত যুবক-বৃন্দ সারাদিনের খাদ্য দ্রব্য লইয়া রঙ্গালয়ে সারাদিন যাপন করিবার যোগাড় করিয়া লইয়া গিয়াছিল। দাঙ্গা হইবার সম্ভাবনা জানিয়া, ভিতরে পুলিশ, বাহিরে সৈনিকের দল রঙ্গালয়-রক্ষার্থে নিয়োজিত হইয়াছিল। অভিনয়ের সময় উপস্থিত হইল। পটোত্তলন মাত্র অভিনবের দলের হুঙ্কারে আকাশ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। পৌরাণিকেরাও গর্জ্জন করিতে ছাড়িলেন না। একটু অবসর পাইবামাত্র অভিনয় আরম্ভ হইল। সূত্রপাতেই Escalier derobe (বিবস্ত্র সোপানাবলী) উচ্চারিত হইবামাত্র

বিষম হুলস্থুল পড়িয়া গেল - derobe নূতন রকমের বিশেষণ, আবার তাহার উপর এক ছত্রের শেষ ভাগে বিশেষ্য Escalier তার পর ছত্রে তাহার বিশেষণ derobe. ভাষার উপর একি ভয়ঙ্কর অত্যাচার বলিয়া পৌরাণিকেরা গালাগালি আরম্ভ করিলেন। অভিনবেরা তাঁহাদিগকে বাপান্ত করিতে ছাড়িলেন না, তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গেল। গোলমাল কিছু কমিয়া গেলে আবার অভিনয় আরম্ভ হইল। সাপও বংশীধ্বনিতে মুগ্ধ হয়, এই অসাধারণ কবির ভাষা ও ছন্দে মন্ত্রমুগ্ধবৎ ক্রমে সকলে ধীরভাবে কতকটা শুনিলেন, মধ্যে মধ্যে তর্জ্জন গর্জ্জনও চলিতে লাগিল। একজন প্রকাশক চতুর্থ অঙ্ক অভিনয়ের পূর্ব্বেই Victor Hugoর নিকট গিয়া নাটকখানি প্রকাশের সত্বের জন্য ৬ হাজার ফ্র্যাঙ্ক দিবেন বলিয়া হাতে পায়ে ধরিতে লাগিলেন, বলিলেন প্রথম অঙ্ক শেষ হইতেই দুই হাজার ফ্র্যাঙ্ক দিবেন ঠিক করেন, ২য় অঙ্কের শেষে ৪০০০, তৃতীয় অঙ্কের পর ৬০০০ দিতে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন, অভিনয় স্থগিত থাকুক, কথাবার্ত্তা শেষ কর, না হইলে পঞ্চম পর্য্যন্ত শুনিলে ১০০০০ ফ্র্যাঙ্ক দিতে ইচ্ছা হইবে, কিন্তু দিবার সাধ্য নাই। Hugoর তখন দুই পাউণ্ড পর্য্যন্ত ঘরে সম্বল ছিল না, তিনি ৬০০০ হাজার ফ্র্যাঙ্ক আনন্দসহকারে গ্রহণ করিলেন, অভিনবেরা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, সজোরে গান ধরিয়া দিলেন। অন্য পক্ষও ছড়া কাটিতে ছাড়িলেন না, এইরূপে অভিনয় শেষ হইল। কোনরূপে পুলিশে ও সৈনিকে শান্তিরক্ষা করিল। কিছুদিন ধরিয়া এইরূপ ঝগড়াঝাটি চলিয়াছিল—পরে সকলেই নত মস্তকে কবির শিক্ষা সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেন; ভাষায় ব্রাহ্মণ চণ্ডাল নাই স্বীকার করিয়া লইলেন। Hernani নাটক-কল্পে উচ্চ স্থান অধিকারের উপযুক্ত নহে কিন্তু ফরাসী সাহিত্যে ইহা নূতন ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া এখনও পূজিত। আমি তাই বলি মাতৃভাষার আদর না জানিলে, নিজ সমাজের সমাদর করিতে না শিখিলে, মিথ্যার মধ্যে সত্যের রূপ না দেখিতে পাইলে, সাহিত্যসেবা বৃথা। আমাদের ভাষার আদর করা কি এতই কঠিন? যে ভাষায় মাকে আহ্বান করিতে শিখিয়াছি, তাহার যদি সম্মান করিতে না জানি, নরকেও আমাদের স্থান হইবে না। আজকাল মনে হয় এ কথাটি আমরা বুঝিয়াছি। তবে দুটি কথা বলিতে পারি কি? নিজের মা থাকিতে পরের গৃহিণীকে মা বলিও না। আর নিজের মাকে বিদেশী জামাজোড়া পরাইও না। প্রথমটি স্বতঃসিদ্ধ, দ্বিতীয়টির অর্থ বুঝাইয়া দেওয়া প্রয়োজন আছে কি?

এক স্থানে পূর্ব্বেই বলিয়াছি বাঙ্গলার পায়ে এক সময় সোণার শৃঙ্খল ভূষিত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু আজকাল আমরা দেব দেবীর প্রতিমা জর্ম্মান ডাকের সাজে সাজাই, দেবীর পূজায় হোটেলের খানা দিয়া দেবের ভোগ দেই; আর্য্যসঙ্গীত হার্ম্মোনিয়ামের সাহায্য ভিন্ন চলে না। তেমনই ঘরের কথাগুলিকে বিদেশী রূপ না দিলে, আমাদের বিশ্বাস বাঙ্গলা ভাষায় তেজ হয় না। তাই আজ কাল দেখি বর্ণসঙ্কর ও জারজ কথার ছড়াছড়ি। জিজ্ঞাসা করি, বাঙ্গলা লিখিয়া যদি তাহার পার্শ্বে ইংরাজী

পদ দিয়া তাহার অর্থ বুঝাইয়া দিতে হয়, সেটা কি উচিত? বাঙ্গালীর ছেলেকে বাঙ্গলা লিখিয়া বুঝাইতে পারিলাম না, ইহা লজ্জার কথা। যে ইংরাজী ভাবটি (চৌর্য্য বৃত্তিলব্ধ) বাঙ্গলায় অনুবাদ করিতে হয়, করুন, কিন্তু এমন কথা প্রয়োগ করিয়া অনুবাদ করবেন না, যাহার পাশাপাশি ইংরাজী কথাগুলি না বসাইয়া দিলে বোধগম্য হয় না। আজ কাল দেখিতে পাই ইংরাজী এক আধটি কথা মাত্র নহে, সমগ্র পদ পর্য্যন্ত না বসাইয়া দিলে অর্থবোধ সঙ্কট। সংস্কৃত যে ভাষার মাতা তাহার অভাব কি? তবে সংস্কৃত সাহিত্য পড়ি না, জোর করিয়া শব্দ গড়াইতে বসি। ইংরাজী ভাব, সংস্কৃত ধাতু অবলম্বন করিয়া অনুবাদ করা সহজ নহে, কিন্তু আমরা এ কথাটী যেন ভুলিয়া না যাই যে শব্দ মাত্রেরই জীবনের ইতিহাস আছে। পৃথিবীতে যেমন geological periods আছে শব্দেরও সেইরূপ। মানুষের যেমন উন্নতি অবনতি আছে শব্দেরও সেইরূপ। সুব্যবহারেই শব্দ গৌরবান্বিত, অসাধু প্রয়োগে তাহার অগৌরব; শব্দের প্রাণ পিঞ্জরাবদ্ধ করা কঠিন। সে একের নহে, কোটী প্রাণের ধন, অগণ্য কণ্ঠে উচ্চারিত। তবে যিনি মৃত কথায় জীবন দান করিতে পাবেন, কিম্বা নূতন কথা সৃজন করিতে পারেন তিনি সঞ্জীবনী মন্ত্রজ্ঞ ঋষি পুরুষ, তিনি দেবতুল্য। তবে আমরা নাকি সকলেই গঙ্গা মৃত্তিকা লইয়া শিব গড়িতে বসিয়াছি তাহাতেই মনে দ্বিধা উপস্থিত হয় কি গড়িতে গিয়া কি গড়িয়া বসি। ভাস্কর হস্তে দেবমূর্ত্তি বিকশিত হয়। হাতুড়ি পেটা কথা সহজে চলে না।

বাঙ্গলা সাহিত্য জটিল হইয়া পড়িতেছে। ইংরাজী না জানিলে অনেক সময় লেখকের মনের ভাব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইংরাজী ভাষা জারজ, Froude বলেন mongreal, তাহাব শব্দার্থে অনেক বৈচিত্র আছে। পরের ঘর হইতে মেয়ে আনিয়া নিজের ঘরের করিয়া লইতে সময় লাগে; অনেক সময় একবারেই নিজের ঘরের হয় না; হৃদয়ে অনুরাগ না জন্মাইলে সে এক-প্রাণা হইতে পারে না। ক্ষেত্রতত্ত্ব না বলিয়া জ্যামিতি বলা, রসায়ন শাস্ত্রকে কিমিতিনির্নিতি বলাতে পাগলামী আছে। জোর করিয়া Geometry ও Chemistryর সহিত জ্ঞাতিত্ব স্থাপন করা বিধেয় মনে করি না। কুল ভাঙায় গৌরব নাই। এক সময় শিক্ষিত বাঙ্গালী সম্প্রদায় নিজের নামেও বিদেশীয় রূপ দিয়াছিলেন, তাহা মনে করিলে হাসি পায়। হিন্দু দেবী "কালী" নামের পরিবর্ত্তে collie স্কচ কুকুরের নাম আনন্দ বহন করিতে দেখা গিয়াছে। সেইরূপ নিজের দেশের কথাকেও বিলাতি চেহারা দেওয়া হেয় জ্ঞান করি। যাহারা নিজের হাট বাজারে পরের জিনিষ লইয়া বেচা কেনা করে, তাহাদের পক্ষে নাম ভাঁড়ানই প্রয়োজন। তবে সাহিত্য পণ্য-জগতের নহে, সাহিত্যের গৌরব যদি রক্ষা করিতে চাহ, ইউরোপীয় সজ্জা দূর করিবার চেষ্টা কর। বুঝি কথার অভাব পড়ে, ভাষাতে নূতন ভাব বিকাশের সহিত নূতন কথার প্রয়োজন। France এর Academy যেমন নূতন কথার উপর, কথার নূতন ব্যবহারের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে আমাদিগের পরিষদের সেইরূপ কর্ত্তব্য। একবার বসিয়া বাঙ্গলার অভিধান

ঝাড়িয়া বাছিয়া লওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আর সহ্য করিতে পারি না আধ আধ ভাষা, সে ভাষা অপোগণ্ড শিশুর মুখে ভাল লাগিতে পারে, মানুষের মুখে নহে। আজকাল কবিতাতে এইরূপ কথার ছড়াছড়ি দেখিতে পাই—মুখানি, আলা, জোছনা, দিঠি, ইত্যাদি। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য। চিরদিন কি আমরা সৌখীন কবিতা লিখিয়া সময় কাটাইব? তরুলতা জাতিযুথি, সোনার আলা, সাঁজের বেলা, জোছনা রাতি, সবই অতি সুন্দর; কিন্তু এই সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে ক্লান্তি কি কখনো হয় না? স্বীকার করি, বাঙ্গালী কবি এই সৌখীন কাব্য-জগতে অদ্বিতীয়; বাঙ্গলা ভাষার মত মধুর ভাষা কাব্য জগতে নাই; বাঙ্গালীর পক্ষে মুক্তার হার গাঁথা সহজ। তবে "জোছনা" দেখিতে দেখিতে মনে হয় বলি, 'আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে?' রাহুর পায়ে ধরিয়া বলিতে ইচ্ছা করে, যদি চন্দ্র গ্রাসই করিলেন তবে অত সহজে তাহাকে ছাড়িবেন না; আমরা এই অবসরে গঙ্গা স্নান করিয়া লই—আঁধারের মাহাত্ম্য একটু বুঝিয়া লই। মনে হয় না কি—কি কারণে "মহাকাব্য" লিখিতে বসিয়া বাঙ্গালী কবি লিখিতে পারিলেন না। তোড় জোড়ের অভাব হয় নাই, তবে বাঙ্গালী ঢাল তলওয়ার লইয়া বেহাত হইয়া পড়েন। বাঙ্গালী কবি মাতৃদুগ্ধপিপাসু বালিকার হৃদয়ের দুলাল, দুধে আলতা দেওয়া সরস ভাষার পক্ষপাতী। আমাদের দেশেই রাইরাজা। আমাদের কবি শৈশব যৌবনের মিলনের সৌন্দর্য্যবিমুগ্ধ, কিন্তু সেই মোহমুগ্ধ হইয়া কত দিন যাপন করিবে? তোমাকে মদনমনোহর বেশ ত্যাগ করিতে বলি না, সে বেশে তুমি অতি সুন্দর স্বীকার করি, আমার বিশ্বাস যে তুমি অন্য বেশেও সুন্দর। তোমার মত ধীশক্তি জগতে বিরল, তোমাতে অসাধারণ কল্পনার প্রতিভা আছে, তুমি সরস্বতীর বরপুত্র, তবে রতি-মন্দিরে দিন যাপন করিও না। সহস্র নির্ঝরপ্রসূত মন্দাকিনীবারিবিধৌত সাহিত্যের প্রাণ মহাসাগরে লীন হইয়া আছে। এই সাগর মন্থন করিবার শক্তি সাধনায় মেলে।

আমি এক স্থানে বলিয়াছি সত্য-জগতে "অহং"-এর স্থান নাই। ইহাতে প্রকৃত আমার যাহা বলিবার ইচ্ছা তাহা পরিস্ফুট হয় নাই। সত্য কাহারও বিশেষ সম্পত্তি নহে। একজনের মনে সত্য আবিষ্কার হইতে পারে, কিন্তু আবিষ্কার হইবামাত্র সমগ্র জগতের ধন হইয়া যায়; সত্যে কোন ব্যক্তি কিংবা কোন সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র অধিকার নাই। সাহিত্য ও ধর্ম্ম, বহির্জগতের সহিত অন্তর্জগতের যে সম্বন্ধ আছে, ভিন্ন পথে তাহারই আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়া থাকে। সেই জন্য কবি ও ঋষি সময়ে একই ছিলেন। Prophet Poet, Vates and Seer অনেক ভাষাতেই একই নাম। সাহিত্য সেই জন্য "সাধনা"। সত্যের অবতারণাতেই সাহিত্যের সৌন্দর্য্য ও সাহিত্যের শক্তি।

জাতীয় জীবনের ইতিহাস ও সাহিত্যের ইতিহাস একই। এই জীবন পরিস্ফুট না হইলে সাহিত্যে তেজ ও বল দেখা যায় না। মধ্যে মধ্যে বড় বড় লেখক জন্মাইতে পারে, কিন্তু সাহিত্য যথার্থ যাহাকে বলে তাহার জন্মগ্রহণ হয় না। ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সের

ইতিহাসে এই কথার সত্যতা প্রমাণ হয়। এবং এই দুই দেশের সাহিত্য দেখিলে, দেখিতে পাইবেন যে জাতীয়-ইতিহাস কতটা সাহিত্যের সহায়।

সুকুমার সাহিত্যে বাঙ্গালীর বিশেষ প্রতিপত্তি আছে। তবে সুকুমার সাহিত্য, যে "সাধনার" কথা আমি বলিলাম, তাহার উপযোগী নয়। যেমন চন্দ্রালোক সুন্দর, প্রচণ্ড সূর্য্যালোকও সুন্দর। চন্দ্রালোকে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতে পারে, কিন্তু জীবনের উল্লাসের জন্য রৌদ্র তেজের প্রয়োজন।

আমি পূর্ব্বে এক স্থানে বলিয়াছি যে, জাতীয় ভাষার সাহায্য ভিন্ন জাতি কখনো গঠিত হয় না। নিজের হৃদয়ে, নিজের দেশের ভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষারই স্থান সংকীর্ণ। সাহিত্য বিদেশী সাজে সাজাইলে কখনই সুন্দর হইতে পারে না। যেমন ভাষা জারজ হয়, সেইরূপ বিভিন্ন ভাব-মিশ্রণে ভাবেও বর্ণ সঙ্করের উৎপত্তি হয়। Burnsএর নাম আপনারা সকলেই জানেন; স্কটলাণ্ডের মহাকবি; তিনি ইংরাজীতেও অল্প স্বল্প কিছু কবিতা লিখিয়াছিলেন। তাহার সবগুলিই প্রায় অপাঠ্য। ফ্রেঞ্চ কবি Musset ইটালিয়নে, Heine ফ্রেঞ্চে কবিতা লিখিয়াছিলেন। সেইগুলিও প্রায়ই অপাঠ্য। একথাটি বিশেষ করিয়া বলার আমার একটু উদ্দেশ্য আছে। বাঙ্গলায় বিদেশী ভাষার ছাঁদ আমার কাছে অত্যন্ত জঘন্য মনে হয়। আমি ইংরাজনবিশ সম্প্রদায়ের মধ্যে 'অমুকে আমার উপর ডাকিয়াছিলেন' অর্থাৎ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, ইংরাজীতে called on meর অনুবাদ করিয়া বলেন। এ ভাষা কি নিতান্ত ঘৃণাজনক নয়? তাঁহারা আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন না বলিয়া আমাদের "ডাকিয়াছেন" বলিতে শুনিয়াছি, অর্থাৎ they have asked me. এইরূপ ভাষা সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য। কিন্তু যাঁহারা এইরূপ ভাষা ব্যবহার করেন, তাঁহাদেরই এই দোষ দিই বা কি করিয়া? মাতৃদুগ্ধপালিত শিশু ও মেলিন্স ফুড-প্রভৃতি বিদেশী দুগ্ধপালিত শিশুতে প্রভেদ আছে। শিক্ষার প্রথম অবস্থায় যদি বাঙ্গলা না শিখিয়া অন্য ভাষা শিখিবার জন্য আমরা সকলেই প্রাণপণ প্রয়াসী হই, তাহা হইলে শিখিবার শক্তির কত অপচয় হয়। আমাদের শিক্ষার এইটি মৌলিক দোষ। এই দোষ যতদিন পর্য্যন্ত রহিবে ততদিন বাঙ্গালীর জাতীয়তা লাভ করিবার আশা স্বপ্নমাত্র। নিজের দেশের ভাষায় অর্থ যতখানি বোঝায় পরের ভাষাতে তাহা বুঝাইতে পারে না। বিমাতা মাতা হইয়াও মাতা নহে। সৌভাগ্যের বলে আমরা এখনও পর্য্যন্ত বিপিতা প্রাপ্ত হই নাই। তবে কপালে কি আছে বলিতে পারি না।

কথার রূপ আছে। সেই রূপ সম্যক উপলব্ধি না হইলে, তাহার উপযুক্ত ব্যবহার করা কঠিন ও তাহার প্রকৃত পরিচয় দেওয়াও কঠিন। ইংরাজী শিক্ষার গুণে আমাদের মানসিক অনেক উপকার হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে; আমাদের সাহিত্যও তাহার বলে বলীয়ান হইয়াছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। তবে ইউরোপীয় সাহিত্যও ইহুদীয় আদর্শ ও গ্রীক মনোবিজ্ঞানের আদর্শের উপর সংগঠিত। এই ইহুদীয় প্রভাবটুকু আমরা প্রাচ্য বলিয়া

ধরিয়া লইতে পারি। সেইখানেই যাহা কিছু সামঞ্জস্য আছে। বাইবেলের ভাষা ও ভাবের মধ্যে অনেক স্থলে আমাদের আর্য্য ঋষিদিগের ভাষা ও ভাবের আভাষ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইউরোপীয় সাহিত্যের বৈচিত্র্যের কারণ বহুতর। তাহাদিগের সমাজ একেবারে স্বতন্ত্র। তবে মানুষের হৃদয়মাত্রই এক এবং সেই নিমিত্ত গীতিকাব্য প্রায় সব দেশেরই সমান। একজন ফ্রেঞ্চ মহাকবি বলিয়াছেন 'মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ভাষা বলিয়া থাকে, কিন্তু অমর জগতের ভাষা একই।' এ বিষয় উল্লেখ করিবার এই উদ্দেশ্য যে, এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় অনুবাদ এক পক্ষে যেমন উন্নতির কারণ হইতে পারে, তেমনি অপর পক্ষে সাহিত্যের প্রাণ যাহা, তাহা ক্রমশঃ লোপ পায়; অর্থাৎ জাতীয় বিশেষত্ব ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পড়ে। সেইজন্য আমি সাহিত্যে অনুবাদের বিশেষ পক্ষপাতী নহি। যতদিন হইতে ইংলণ্ডে Russian কিংবা Danish উপন্যাস অনুবাদ আরম্ভ হইয়াছে, ততদিন হইতে ইংলণ্ডে কোন বিশেষ বড় নভেল প্রকাশ পায় নাই। তাঁহাদিগের জীবনের বৈচিত্র্য হেতু এবং সকলে নিয়ত বিবিধ ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকার দরুণ আজকাল ইংলণ্ডে চিন্তার সময় কম হইয়া পড়িয়াছে; দেশ বিদেশের কথা এবং দেশ বিদেশের বিভিন্ন সমাজের প্রয়োজনোদ্ভূত নূতন উত্তেজনার প্রায়োজন হইয়া পড়িয়াছে;—সাধারণ সাদা সিধা কথায় ও দৈনিক সামাজিক চিত্রে মনে উত্তেজনা পায় না বলিয়া, বাহিরের উত্তেজনার জন্য ব্যস্ত হইয়া থাকে। তাহার জন্য আজকালকার ইংরাজী সাহিত্যে ইংরাজ জাতির বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। ফরাসী দেশের সাহিত্যের প্রথম উল্লাসের সময়—Les chansons de geste এবং পরে Chante Fableএর দরুণ অর্থাৎ জাতীয় গীতি-কবিতার বলে সাধারণ-মধ্যে সাহিত্য প্রচারিত হইয়া পড়ে। আমাদের দেশেও সাহিত্যের প্রথম অবস্থায় মাণিকচাঁদের গীত প্রভৃতি, গাম্ভীরা চণ্ডী ইত্যাদির প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আজকাল কিসের বলে সাহিত্য গড়িয়া তুলিবেন?

বাঙ্গলার ইতিহাসের আলোচনা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই ইতিহাস যদি উদ্ধার করিতে পারেন, তাহা হইলে আমাদিগের সাহিত্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে, আমার বিশ্বাস। সেইজন্য আনন্দ এবং উৎসাহের সহিত 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির' কার্য্য এখানে উল্লেখ করিতেছি। যাঁহাদের যত্ন এবং চেষ্টায় এই সমিতি সংগঠিত হইয়াছে ও সংরক্ষিত হইতেছে তাঁহাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

উপসংহারে বাল্যবন্ধু দ্বিজেন্দ্রলালের কথা দুই একটি বলিতে চাই। তাঁহার বিয়োগে আমার মনে অত্যন্তই আঘাত লাগিয়াছে। অনেক বৎসর ধরিয়া আমরা একত্র ছিলাম। চিরকাল তাঁহাকে আমি নিজের ভাইয়ের মত দেখিয়া আসিয়াছি এবং তিনিও আমাকে বড় ভাইয়ের মত শ্রদ্ধা করিতেন ও ভাল বাসিতেন। অতি বাল্যকালে তাঁহার সুমধুর সঙ্গীত শুনিয়াছি। তাহাও আজ মনে পড়িতেছে। তিনি যদি "আমার দেশ" ও "আমার জন্মভূমি" এই দুইটি গান মাত্র রচনা করিয়া রাখিয়া যাইতেন, তাঁহার

কীর্ত্তি চিরদিনের মত অক্ষয় রহিত। তিনি যেখানে গিয়াছেন সেখানে অনেকের স্থান নাই, অনেকের স্থান কখনো হইবে না; আমাদের মধ্যে অনেকেই তাঁহার পার্শ্বে বসিবার যোগ্য নহি। কিন্তু তোমার স্মৃতি চিরদিনই হৃদয়ে আদরের সহিত রক্ষা করিব। এই প্রার্থনা করি, তুমি যে চক্ষে নিজের দেশকে সুন্দর দেখিয়াছিলে, আমাদের ছেলে মেয়েরা যেন সেই চক্ষে এই দেশকে সুন্দর দেখে এবং এই দেশের সন্তান বলিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করে। স্বর্গ হইতে তুমিও তাহাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করিও।

শ্রীআশুতোষ চৌধুরী।

কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

সত্যই এবার বাঙ্গলার আকাশে ভীষণ কাল-বৈশাখী দেখা দিয়াছে। একে একে অনেকগুলি মহীরুহ উৎপাটিত হইল। অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর, বিনয়েন্দ্রনাথ, কর্ম্মবীর জানকীনাথ প্রভৃতির চিতা নিবিতে না নিবিতে বঙ্গবাণীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান দ্বিজেন্দ্রলালের চিতা জ্বলিয়া উঠিল! 'আষাঢ়ে' ও 'হাসির গানে'র কবি, 'বঙ্গ জননী'র গৌরব-মুগ্ধ সন্তান, 'দুর্গাদাস,' "রাণা প্রতাপ' 'ভীষ্ম' প্রভৃতির নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাকালের দুর্লঙ্ঘ্য ইঙ্গিতে ইহজগৎ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন।

কবি গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কাব্য আছে; নাট্যকার গিয়াছেন, নাটক যায় নাই; গায়ক গিয়াছেন, গানের সুর এখনও বাঙ্গলার আকাশে-বাতাসে ভরিয়া রহিয়াছে! কবির দেহ নশ্বর, চিতার অনল তাহা গ্রাস করিয়াছে, কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তি অবিনশ্বর—প্রলয়-দাহেরও সাধ্য নাই, তাহা ভস্মসাৎ করে!

দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুতে প্রকৃতই যেন বঙ্গ-সাহিত্যের একটা ইন্দ্রপাত হইয়াছে—বাঙ্গলাব এক কোণ খসিয়া গিয়াছে – চন্দ্র অস্তমিত হইয়াছে।

মৃত্যু আজ নিতান্ত অতর্কিতভাবে আসিয়াছিল, পূর্ব্বাহ্নে তাহার এতটুকু আভাষ পাওয়া যায় নাই—তাই আমাদের বেদনা কোনরূপ সান্ত্বনা মানিতে চাহে না।

দ্বিজেন্দ্রলাল আপনার রচনা-পরিমার্জ্জনে ব্যস্ত ছিলেন, সহসা শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ হওয়ায়, তিনি পুত্রকে ডাকিয়া টেবিলের উপর মস্তক রক্ষা করিয়া চেয়ারেই উপবিষ্ট রহিলেন। তখন সন্ধ্যা। পুত্র আসিয়া দেখিল, তাঁহার এতটুকু চৈতন্য নাই। বন্ধুবান্ধবও ডাক্তারে ঘর ভরিয়া গেল- সকলের চেষ্টাই ব্যর্থ হইল! দ্বিজেন্দ্রলালের সে লুপ্ত চেতনা আর ফিরিল না। রাত্রি নয় ঘটিকার সময় তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ সহরময় রটিয়া গেল!

সাহিত্য-সেবীর পক্ষে এ মৃত্যু শ্লাঘ্য—বিশ্বের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে খোদিত রাখিবার যোগ্য।

সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান কোথায়, আলোচনা করিয়া তাহার সীমা-নির্দ্দেশের এ সময় নহে! আজ শুধু সংক্ষেপে তাঁহার সম্বন্ধে আমরা দুই-চারিটা মাত্র কথা বলিব।

১২৭০ সালে দ্বিজেন্দ্রলালের জন্ম হয়। সাহিত্যের প্রতি তাঁহার অনুরাগ বাল্যেই সঞ্চারিত হইয়াছিল। তাঁহার পিতা কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় কৃষ্ণনগর-রাজের দেওয়ান ছিলেন;—সাহিত্য-সমাজেও তাঁহার নাম অপরিচিত নহে। তাঁহার রচিত কৃষ্ণনগর রাজবংশের ইতিহাস ও আত্ম-চরিত গ্রন্থে নব্য বাঙ্গালার ইতিহাসের বহু উপাদান সঞ্চিত আছে।

কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

ঐতিহাসিকের নিকট সে গ্রন্থদ্বয়ের মূল্য নিতান্ত সামান্য নহে। দ্বিজেন্দ্রলাল কার্ত্তিকেয় চন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র। এখান হইতে এম, এ পাশ করিয়া কৃষিবিদ্যাশিক্ষার্থ তিনি বিলাত যাত্রা করেন;—তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনান্তে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন্। সম্প্রতি শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ তিনি অবসর গ্রহণ করিয়া সাহিত্য-চর্চ্চাতেই সকল অবসর ঢালিয়া দিবেন, স্থির করিয়াছিলেন; অবসর-গ্রহণের অনুমতিও মিলিয়াছিল, কিন্তু কালের নির্ম্মম তর্জ্জনী হেলনে সমস্তই বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল।

বিলাত যাইবার পূর্ব্বে দ্বিজেন্দ্রলালের 'আর্য্য গাথা' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে তিনি নিজে লিখিয়া গিয়াছেন, "বাল্যাবধি কবিতা ও নাটকপাঠে আমার অত্যন্ত আসক্তি ছিল। এত অধিক ছিল, যে বিদ্যাভ্যাসকালে বায়রণের Manfred ও Childe Haroldএর দুই Canto এবং মেঘদূত ও উত্তরচরিতের কাব্যাংশ আমি মুখস্থ করিয়াছিলাম।...১২ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে আমি গান রচনা করিতাম। ১২ বৎসর হইতে ১৭ বৎসর পর্য্যন্ত রচিত আমার গীতগুলি ক্রমে আর্য্যগাথা নামক গ্রন্থের আকারে প্রকাশিত হয়। তখন কবিতাও লিখিতাম! কিন্তু তখন কোন কবিতা প্রকাশিত হয় নাই। কেবল 'দেবঘরে সন্ধ্যা' নামক মৎপ্রণীত একটি কবিতা নব্যভারতে প্রকাশিত হয়। বিলাতে গিয়া ইংরাজিতে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করি এবং সেই কবিতাগুলি একত্রিত করিয়া স্যর্ এডুইন আর্নল্ডকে উৎসর্গ করিবার অনুমতি চাহি এবং তৎসঙ্গে কবিতাগুলির পাণ্ডুলিপি পাঠাই। তিনি কবিতা প্রকাশ সম্বন্ধে আমাকে উৎসাহিত করিয়া পত্র লেখেন ও সে কবিতাগুলি তাঁহাকে উৎসর্গ করিবার অনুমতি সাগ্রহে দান করেন। তখন সেই কবিতাগুলিকে Lyrics of Ind আখ্যা দিয়া প্রকাশ করি।" (নাট্য-মন্দির, শ্রাবণ, ১৩১৭।)

ইহাই তাঁহার কাব্য-রচনার প্রথম ইতিহাস।

তাহার পর 'হাসির গান' এবং 'আষাঢ়ে'র ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া বাঙ্গালা ভাষায় হাস্য-রসাত্মক কবিতার অভাব পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে Ingoldsby Legendsএর অনুকরণে কতকগুলি হাস্যরসাত্মক বাঙ্গালা কবিতা লিখিয়া "আষাঢ়ে" নামে প্রকাশ করি। * * * কতকগুলি হাসির গানও রচনা করি।" Ingoldsby Legendsয়ের অনুকরণে লিখিত হইলেও 'আষাঢ়ে'র রহস্য-কবিতাগুলি কবির নিজস্ব ভাবে ভঙ্গীতে সম্পূর্ণ-সুন্দর। বাঙ্গলা সাহিত্যে তাহা এক অভিনব সৃষ্টি। পূর্ব্বে এমন রচনা বাঙ্গলায় ছিল না, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পূর্ব্বতন কবিগণের রহস্যে ব্যঙ্গে একটা ব্যক্তিগত শ্লেষ প্রায়ই থাকিত—তাহাতে খাঁটি সাহিত্যরসের আনন্দ-টুকু সাধারণের উপভোগ্য ছিল না, তদ্ভিন্ন অশ্লীলতার মলামাটিও তাহা হইতে একেবারে বাদ পড়িত না।

সকল রচনায় একটা ধারাবাহিক সুর দেখা যায়—কোন একটি বিশেষ রস ধীরে ধীরে ফুটিয়া একেবারে তাহার চরম বিকাশে

সার্থকতা লাভ করে,—যেমন ধরা যাক্, একটা গল্প, বা সনেট, বা নাটক। সূত্রপাতেই একটি বিশেষ রস অল্প ফুটিয়া থাকে, ক্রমে তাহাই climaxএ উঠিলে রসের পূর্ণ বিকাশ হয়। সকল সার্থক রচনাতেই প্রায় এই স্তর বিভাগটি সুস্পষ্ট লক্ষ্য হয়—কিন্তু দ্বিজেন্দ্র লালের হাসির কবিতা বা গান এই স্তর-বিভাগের কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম মানে নাই। তাহা গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্তই একেবারে হাস্য-রসে ভরপূর—সে হাস্য-রস কোথাও এতটুকু ম্লান নহে, তাহার পরিমাণেও কোথাও এতটুকু ইতর-বিশেষ নাই। তাহা যেন, একটা flood of laughter—সমুদ্রের ঢেউয়ের মতই তাহা আমাদিগকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলে। তাহাতে যে গোড়ার লাইনটি বাদ দিয়া শেষের সেই climax অংশটুকু পড়িয়াই এক আঁচড়ে সব রসটুকু উপভোগ করিব, তাহা চলিবে না। তাহার প্রতি ছত্রই যেন এক একটি পরিপূর্ণ রস-কোষ! তাহার উপর এই কবিতাগুলির রচনায় এমন একটি বৈচিত্র্য আছে, বর্ণনাভঙ্গীতে এমন একটি কায়দা আছে, যাহা বঙ্গসাহিত্যে আর কোথাও বড় দেখা যায় না। কবিতার মিলগুলিতে কোন চেষ্টা নাই, তাহা যেমন সহজ, তেমনই নূতন। অধিক নহে, দুইটি দৃষ্টান্ত দিলেই চলিবে।

"* * * তুই কি একটা মানুষ ?
তুই ত পশু, পক্ষী, মৎস্য, লাটিম কিম্বা ফানুষ।"
"এও কি দাদা হয়—বাপ—এ কি ছেলের হাতে মোয়া ?
এমনি মার্ব্ব রগে চড় যে দেখবে সবই ধোঁয়া!"

(আষাঢ়ে। অদল-বদল।)

এই যে মানুষের সঙ্গে ফানুষ এবং মোয়ার সহিত ধোঁয়ার মিল—ইহা যেমন সহজ ও স্বাভাবিক, তেমনই অভিনব। তাহার উপর এ রচনার আর দুইটি গুণ অনুপ্রাস ও antithesis যেমন,—

অনুপ্রাশ,—

"নৌকা ফি সন ডুবিছে ভীষণ, রেলে কলিসন হয়।"
"আরও অভ্যাস দু বেলা, বাজিয়ে বাজিয়ে তবলা,
সকল সময় জ্ঞান থাকে না, তবলা কি অবলা—
বিনা বহু বাক্যব্যয়ে,—অতি পরিপাটী
সোজা গিন্নীর বাঁ মস্তকে দিলাম একটি চাঁটা।"

এই 'তবলা কি অবলা'য়—কেমন সুন্দর antithesisটুকু ফুটিয়া উঠিয়াছে! এরূপ ছবি অন্য সাহিত্যে বড় বেশী পাইয়াছি বলিয়া ত মনে হয় না!

হাসির গানে ও কবিতায় দ্বিজেন্দ্রলাল ভাষাটাকে লইয়া যথেচ্ছভাবে মুচ্‌ড়াইয়াছেন, ভাঙ্গিয়াছেন—কিন্তু ভাষা তাহাতে এতটুকু আঘাত বা বেদনা পায় নাই, জর্জ্জরিত বা ক্ষত-বিক্ষত হয় নাই। ভাষা সে আদরের আঘাতে তীব্র আনন্দেই যেন নাচিয়া ছুটিয়াছে!

যাহা হউক, আজ আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের রচনাবলীর আলোচনা করিতে বসি নাই—এখন তাহা সমীচীন বলিয়াও মনে হয় না। ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা করিবার আমাদিগের ইচ্ছা রহিল।

সহসা তিনি নাটক লিখিতে আরম্ভ করিলেন কেন, তাহার কারণ অনেকে হয়ত না জানিতেও পারেন। এ সম্বন্ধে তিনি নিজে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই এস্থলে উদ্ধৃত হইল। দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিয়াছেন, "বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমি কলিকাতার রঙ্গমঞ্চ সমূহে প্রহসনগুলির অভিনয় দেখিয়া সেগুলির স্বাভাবিকতায় ও সৌন্দর্য্যে মোহিত

হইতাম বটে, কিন্তু অশ্লীলতা ও কুরুচি দেখিয়া ব্যথিত হই। ......বাঙ্গালা ভাষায় নাট্য-সাহিত্যে স্বাভাবিকতা ও আখ্যান-বস্তু-গঠনে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিতাম কিন্তু তাহাতে কবিত্বের অভাব বোধ হইত। আমার কাব্য-শক্তি (যাহা কিছু ছিল) আমি আমার নাটকে প্রকটিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।”

শুধু রঙ্গ-রহস্যেই দ্বিজেন্দ্রলালের শক্তি পর্য্যবসিত হয় নাই। তাঁহার হৃদয় যথেষ্টই ভাবপ্রবণ ছিল;—শৈশব হইতেই এ গভীর ভাবাধিক্যের পরিচয় প্রস্ফুট হইয়াছিল;—তাঁহার বাল্য-রচনা “আর্য্য গাথায়” মধুর রসাশ্রিত বহু কবিতা স্থান পাইয়াছে। ইদানীংকার সদ্ভাবোদ্দীপক, মধুর ও করুণ রসাশ্রিত কবিতাগুলি তাঁহার “মন্দ্র” ও “আলেখ্য” গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। এই দুইখানি গ্রন্থ খণ্ড-কাব্য-হিসাবে বঙ্গসাহিত্যের রত্নস্বরূপ।

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া যখন তিনি সমাজে উঠিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তখন সমাজ তাঁহাকে বিনা-প্রায়শ্চিত্তে পুন-র্গ্রহণ করিতে সম্মত হয় নাই। ইহার ফলে, গদ্যে তিনি একখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন—পুস্তকখানির নাম, “একঘরে”; ইহাতে, তিনি মনে আঘাত পাইয়া সমাজের একদেশদর্শিতা ও সঙ্কীর্ণতার যে সমালোচনা করিয়াছিলেন, তাহা যেমন তীব্র, তেমনই যুক্তিপূর্ণ! যাহা হউক, এই ভাবাধিক্য তাঁহার পরজীবনে রচিত নাটকাবলীর বহু চরিত্রে আকার পাইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে!

তাঁহার প্রথম নাটক “তারাবাই”; দ্বিতীয়, “সীতা।” “সীতায়” তিনি গতানুগতিক পন্থা অবলম্বন করেন নাই। আধুনিক নীতির মাপ-কাঠিতে মাপিয়া চরিত্রগুলি আধুনিক Stand-point হইতে ফুটাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন—তাহাতে সর্ব্বত্র সেই পুণ্য-রামায়ণ-চিত্রিত চরিত্রগুলির মর্য্যাদা রক্ষিত হয় নাই বটে, কিন্তু নাটক হিসাবে তাহার মূল্য উড়াইয়া দেওয়া যায় না। তাঁহার ‘সীতা’ আদর্শ নারী। তাঁহার “পাষাণী” নাটক গৌতম-পত্নী অহল্যার পৌরাণিক কাহিনীর ভিত্তির উপর গঠিত, কিন্তু কবির নিজস্ব ভাবে, নিজস্ব উপাদানে তাহা অনুপ্রাণিত! গৌতম আদর্শ ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণের প্রধান গুণ, ক্ষমাপরায়ণতা। এই গুণ গৌতম-চরিত্রে রীতিমত দক্ষতার সহিতই প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহার “রাণা প্রতাপ” দেশ-প্রাণ রাজপুত-মহাত্মার গৌরব সম্পূর্ণ রক্ষা করিয়াছে। তাঁহার “দুর্গাদাস” প্রভু-পরায়ণতা ও কর্ত্তব্যপালনের দীপ্ত চিত্র! “মেবার পতন” নাটকে তিনি এক উচ্চ আদর্শ প্রতিফলিত করিয়াছেন, মনুষ্যত্বের ভিত্তি কি, তাহা বুঝাইয়াছেন। এই গ্রন্থে তিনি এক ‘মহানীতি’ প্রচারের চেষ্টা পাইয়াছেন। সে নীতি, “বিশ্বপ্রেম।” এ সম্বন্ধে “মেবার পতনের” ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন, “কল্যাণী, সত্যবতী ও মানসী এই তিনটি চরিত্র যথাক্রমে দাম্পত্য প্রেম, জাতীয় প্রেম এবং বিশ্বপ্রেমের মূর্ত্তিরূপে কল্পিত হইয়াছে। এই নাটকে ইহাই কীর্ত্তিত হইয়াছে যে বিশ্বপ্রীতিই সর্ব্বা-পেক্ষা গরীয়সী। ‘আমি’ হইতে যতদূর প্রেমকে ব্যাপ্ত করা যায়, ততই সে ঈশ্বরের কাছে যায়।” এই নাটকে তিনি আরও দেখাইয়াছেন, যে আমাদের সঙ্কীর্ণ দেশাচারই আমাদের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ।

মানসী। মা সত্যবতী! মেবারের পতন কি আজ আরম্ভ হোল! না মা; তার পতন আজ হয়নি। তার পতন বহুদিন পূর্ব্ব হতে আরম্ভ হয়েছে। এ পতন সেই পতন পরম্পরার একটি গ্রন্থি মাত্র।

সত্যবতী। সে পতন কবে থেকে আরম্ভ হয়েছে, মা?

মানসী। যে দিন থেকে সে নিজের চোখ বেঁধে আচারের হাত ধরে' চলেছে। যে দিন থেকে সে ভাবতে ভুলে গিয়েছে। মা, যত দিন স্রোত বয়, জল শুদ্ধ থাকে। কিন্তু সে স্রোত যখন বন্ধ হয়, তখনই তাতে কীট জন্মে। তাই এই জাতিতে আজ এই নীচ স্বার্থ, ক্ষুদ্রতা, ভ্রাতৃদ্রোহিতা, বিজাতি বিদ্বেষ জন্মেছে। সেই উদার, অতি উদার, হিন্দু ধর্ম্ম আজ প্রাণহীন একখানি আচারের কঙ্কাল। যার ধর্ম্ম গেল মা, তার পতন হবে না? জাতি যে পাপে ভরে গেল, তা দেখবার কেউ অবসর পায় না। মেবার গেল বলে ক্রন্দন কল্লে কি হবে, মা।

রবীন্দ্রনাথও তাঁহার "অচলায়তনে" এই ব্যাপারের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল এ পতন হইতে উদ্ধারের যে পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাও উদ্ধৃত হইল :—

সত্যবতী। এ দুঃখে কি তবে এই সান্ত্বনা?

মানসী। না, তার চেয়েও বড় সান্ত্বনা আছে। সে সান্ত্বনা এই যে মেবার গিয়েছে যাক্, তার চেয়ে বড় সম্পৎ আমাদের হোক! আমি চাই, যে আমার ভাই নৈতিক বলে শক্তিমান হোক; যে সে দুঃখে নৈরাশ্যে, ঝঞ্ঝায়, অন্ধকারে ধর্ম্মকে জীবনের ধ্রুবতারা করুক। যদি তা সে না করে ত সে উচ্ছন্ন যা'ক্; আমি ক্ষুব্ধ নহি।* * * এ জাতি আবার মানুষ হোক্।

কি করিয়া মানুষ হইবে, তাহাও তিনি বলিয়াছেন :—

"যেদিন তারা এই অথর্ব্ব আচারের ক্রীতদাস না হয়ে নিজে আবার ভাবতে শিখবে; যেদিন তাদের অন্তরে আবার ভাবের স্রোত বইবে; * * * যেদিন তারা যুগজীর্ণ পুঁথি ফেলে দিয়ে নব ধর্ম্মকে বরণ করবে।*** সে ধর্ম্ম ভালবাসা। আপনাকে ছেড়ে ক্রমে ভাইকে, জাতিকে, মানুষকে, মনুষ্যত্বকে ভাল বাসতে শিখতে হবে। তার পরে আর তাদের—নিজের কিছুই কর্ত্তে হবে না; ঈশ্বরের কোন অজ্ঞেয় নিয়মে তাদের ভবিষ্যৎ আপনিই গড়ে আসবে। জাতীয় উন্নতির পথ শোণিতের প্রবাহের মধ্য দিয়ে নয় মা, জাতীয় উন্নতির পথ আলিঙ্গনের মধ্য দিয়ে। যে পথ বঙ্গের শ্রীচৈতন্যদেব দেখিয়ে গিয়েছেন, সেই পথে চল মা। নহিলে নিজে নীচ, কুটিল, স্বার্থসেবী হয়ে রাণা প্রতাপ-সিংহের স্মৃতি মাথায় রেখে ভূত গৌরবের নির্ব্বাণ প্রদীপ কোলে করে, চিরজীবন হাহাকার করলেও কিছু হবে না!"

নাটক মানুষকে উন্নত করে, তাহার হৃদয়কে আদর্শ-পথে চালিত করে। ইহাই নাটকের কর্ত্তব্য। বাঙ্গলায় নাটক এই প্রথম দেখা দিয়াছে; এখনও সে সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টিলাভের অবসর পায় নাই, তথাপি এ কথা অসঙ্কোচে বলা যায় যে এমনই সদ্ভাব এবং উচ্চ মনোবৃত্তির ব্যঞ্জনামূলক নাটকেই দেশের উপকার ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়!

দ্বিজেন্দ্রলালের "নুরজাহান" মনস্তত্ত্বের সুগভীর আলোচনায় পরিপূর্ণ! মানব-চিত্তের সূক্ষ্ম সুনিপুণ বিশ্লেষণ—'নুরজাহান' চরিত্রটিকে সুন্দর ফুটাইয়া তুলিয়াছে। বাঙ্গলার আর কোন নাটকে এ ভাবের চরিত্র-বিকাশ দেখি নাই! নুরজাহানে কাব্য এবং রোমান্সেরও বেশ একটি মিষ্ট রেখাপাত ঘটিয়াছে। "সাজাহানে"র ঔরঙ্গজেব, সাজাহান, জাহানারা, সিপার, দারা প্রভৃতির চরিত্র উজ্জ্বল, অভিনব। তাঁহার 'পরপারে' সামাজিক নাটক। আধুনিক সমাজে নীতির ধারা কোন্ পথে ছুটিয়াছে, এই নাটকে তাহাই দেখাইবার তিনি চেষ্টা

পাইয়াছেন। 'পরপারে' নাটকের ideaটি সুন্দর, কিন্তু তাহা পরিণতি লাভ করিয়াছে কি না, সে সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ আছে! মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি "ভীষ্ম" নামে একখানি পৌরাণিক নাটক লিখিয়া গিয়াছেন; "সিংহল বিজয়" নামে আর একখানি নাটক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; সেখানি শেষ করিয়া যাইতে পারে নাই।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকাবলী সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা এরূপ অল্প সময় ও অল্প পরিসরে সম্ভব নহে। আমরা সংক্ষেপে দুই-চারিটি মাত্র কথা বলিলাম। ভবিষ্যতে বিশদভাবে সকল কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল।

তাঁহার নাটকগুলি পাঠ করিয়া মোটামুটি যে কথাটা মনে উদয় হয়, তাহা এই,—মানব-হৃদয়ের বিবিধ ভাব, সেন্টিমেণ্ট, প্রবৃত্তি যেন আকার পাইয়া তাঁহার নাটকে মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিয়াছে! বাঙ্গলা নাটকে সেন্টিমেণ্টের এমন লীলা, দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্ব্বে কোন নাট্যকারই স্বীয় নাটকে দেখাইতে পারেন নাই! তাহার উপর দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক-সম্বন্ধে যতই মতভেদ থাকুক না কেন, একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহার নাটক প্রকাশিত হইবার পর হইতেই বাঙ্গলা রঙ্গমঞ্চ-সমূহের নাট্যরচনার প্রণালীতে একটা পরিবর্ত্তন আসিয়াছে—থিয়েটারি ঢং হইতে মুক্তি পাইবার জন্য রঙ্গমঞ্চের নাটক চেষ্টা পাইতেছে;—নাট্যকারের শক্তি-অনুযায়ী কোথাও সে চেষ্টা সফল, কোথাও বা বিফল হইতেছে! পূর্ব্বকার অধিকাংশ উৎকৃষ্ট নাটকও এই থিয়েটারি ঢংয়ের হাত হইতে নিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। থিয়েটারি সাহিত্যে একটা intellectual আব-হাওয়াও যে সম্প্রতি প্রবেশ-লাভের চেষ্টা করিতেছে, ইহাও দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক-সংসর্গের ফল। তাঁহার নাটকের সকলগুলিই রচনা-হিসাবে উৎকৃষ্ট না হইতে পারে, আর এমন কোন্ লেখক আছেন, যাঁহার সকল রচনাই উৎকৃষ্ট? তবে সেগুলি যে উচ্চ ভাব, কবিত্ব এবং স্বদেশ-প্রেমের স্নিগ্ধ রশ্মিপাতে উজ্জ্বল—এ কথা অসঙ্কোচভাবে বলা যাইতে পাবে।

তাহার পর আর একটি কথা বলিয়াই আমরা এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। দ্বিজেন্দ্রলাল মনে-প্রাণে খাঁটি স্বদেশ-প্রেমিক ছিলেন। আচারে, বা ব্যবহারে কখনও তিনি তাঁহার দেশকে ভুলেন নাই। নিজে বিলাত-ফেরত হইয়াও কোন দিন তিনি বিলাতী ভাবের বশ্যতা করেন নাই। সে ভাবের প্রশ্রয়-দানে সমাজে কি পাপ সঞ্চারিত হয়, তাহার 'প্রায়শ্চিত্ত' নামক প্রহসনে তাহা তিনি ফুটাইয়া দেখাইয়াছেন। দেশে যখনই তিনি কোন বিষয়ে ভণ্ডামি বা ধূর্ত্তামি বা কোনরূপ দোষ-দুর্ব্বলতা দেখিয়াছেন, অমনই তাঁহার লেখনী-মুখে তখনই শ্লেষের আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার 'নন্দলাল' 'বিলাত ফের্ত্তা' 'Reformed Hindoos' 'হতে পার্ত্তাম' 'বেশ করেছো' প্রভৃতি হাসির গানগুলি উচ্চ অঙ্গের Satire;—এই ব্যঙ্গরসে তিনি তাঁহার তপ্ত হৃদয়ের সমস্ত দাহ যেন ঢালিয়া দিয়াছেন—কোথাও এতটুকু রাখিয়া ঢাকিয়া বলেন নাই। তপ্ত সূর্য্য-কিরণের মতই তাহা সমাজের সমস্ত আবর্জ্জনা দগ্ধ করিয়া দিবার

জন্য ঝরিয়া পড়িয়াছে! আরও এই হাসির কবিতায় দ্বিজেন্দ্রলাল দেখাইয়াছেন, সাহিত্যে ব্যক্তিগত কটাক্ষ ও হাস্যরস দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ। সাহিত্য একটিকে আমোল দেয় না, দিবেও না—অপরটি তাহার পঞ্চ-প্রাণেরই অন্যতম! দেখাইয়াছেন যে, ব্যক্তি-গত কটাক্ষপাত না করিয়াও শক্তিশালী লেখক সাহিত্যে এমন বিশুদ্ধ হাস্যরসের সৃষ্টি করিতে পারেন, যাহার তুলনা নাই, উপভোগেও যাহা ক্ষয় হয় না!

কিন্তু শুধু এই হাসির গান ও কবিতা নাটকেই তাঁহার পরিচয় নহে। তিনি মাতৃ-ভূমির উদ্দেশ্যে যে গানগুলি রচনা করিয়া গিয়াছেন—দেশের আকাশ বাতাস যে গানের তান বুকে পূরিয়া ধন্য হইয়াছে। সেই গান,—"বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ"—কবির গন্ধভরা উল্লাস, মুগ্ধ অন্তরের আত্মনিবেদন-উচ্ছ্বাস! এ গানের তুলনা নাই। এ গানের তানে প্রাসাদবাসী হইতে অন্নহীন ভিখারী বাঙ্গালীর প্রাণ অবধি সাড়া দিয়া উঠে, আশা ও আশ্বাসের মন্দাকিনী ধারা বাঙ্গালীর শুষ্ক মরু প্রাণ সঞ্জীবিত করিয়া তুলে! তাহার পর সেই গান—"আমার এই দেশেতে জনম, যেন এই দেশেতে মরি!" এমন সরল ভক্তির সহজ উচ্ছ্বাস—সাহিত্যে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না! আর একটী গানও বঙ্গসাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে—সেটি দেশবাসীর উদ্বোধন-সঙ্গীত :—

"কিসের শোক, করিস ভাই!—আবার তোরা মানুষ হ।
গিয়েছে দেশ, দুঃখ নাই,—আবার তোরা মানুষ হ।
ভুলিয়ে যা রে আত্মপর, পরকে নিয়ে আপন কর্;
বিশ্ব তোর নিজের ঘর—আবার তোরা মানুষ হ।
শত্রু হয় হোক্ না যদি সেথায় পাস মহৎ প্রাণ,
তাহারে ভালবাসিতে শেখ্, তাহারে কর্ হৃদয় দান।
মিত্র হোক—ভণ্ড যে—তাহারে দূর করিয়া দে;—
সবার বাড়া শত্রু সে;—আবার তোরা মানুষ হ'।
জগৎ জুড়ে দুইটী সেনা পরস্পর রাঙায় চোখ;—
পুণ্যসেনা নিজের কর, পাপের সেনা শত্রু হোক্;
ধর্ম্ম যেথা সেথায় থাক্; ঈশ্বরেরে মাথায় রাখ্;
স্বজন দেশ ডুবিয়া যাক্—আবার তোরা মানুষ হ'।

বাঙ্গালার নবযুগে রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্র-লালের বীণা এমনই করিয়া স্বদেশবাসীর চেতনা উদ্বুদ্ধ করিতে শুভ অবসরে বাজিয়া উঠিয়াছিল। আজ তাঁহাদের মধ্যে একজনের বীণা নীরব—এবং তাহারই শোক আজ বাঙ্গালার ঘরে ঘরে।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

সনেট-সপ্তক

[ইংলণ্ডে, কোন বিশেষ অবস্থায় পড়িয়া, জনৈক বঙ্গযুবকের হৃদয় এবং মন, সহসা যুগপৎ প্রণয় এবং কবিত্ব-রসে আপ্লুত হইয়া উঠে। তিনি তৎক্ষণাৎ একটি পকেট-বুকে পূর্ব্বোক্ত বাহিক এবং মানসিক অবস্থার বিষয় নোট করিয়া রাখেন। তৎপরে সেই নোট অবলম্বনে স্বীয় মনোভাবের বর্ণনা করিয়া ইংরাজি ভাষায় ছয়টি সনেট রচনা করেন। আমি তাঁহার হস্তলিখিত পুঁথি হইতে এই সনেট কয়েকটি বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়াছি। সনেটগুলির প্রধান গুণ এই যে তাহার ভাব কিম্বা ভাষায় কৃত্রিমতার লেশমাত্র নাই। এতদ্ব্যতীত, Ideality এবং Realityর এরূপ অপূর্ব্ব মিশ্রণ—কাল্পনিক এবং বাস্তব জগতের এরূপ ওতপ্রোত ভাবে একত্র সমাবেশ, আমি

পূর্ব্বে কখনও অন্য কোন বঙ্গকবির রচনায় দেখি নাই। অথচ কবির হৃদয় যে খাঁটি বাঙ্গালী হৃদয় সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার "বঙ্গভাষা এবং সাহিত্য" নামক বিখ্যাত গ্রন্থের পাতায় পাতায় এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন, যে, মধুর রসে বিগলিত হইয়া অবিরল অশ্রুমোচন করিতে বাঙ্গালী কবি যেরূপ জানে পৃথিবীর অন্য কোন কবি তাহার সিকির সিকিও জানে না। বুকের রক্ত জল হইয়া চক্ষু হইতে নির্গত হওয়াতেই যদি বাঙ্গালী কবির কবিত্ব নির্ভর করে তাহা হইলে আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে, যে এই অপরিচিত যুবকটি বঙ্গদেশের একটি শ্রেষ্ঠ কবি। এই সনেটগুলি পাঠ করিবার সময় রসগ্রাহী পাঠক অন্ততঃ দুচার ফোঁটাও চোখের জল ফেলিতে বাধ্য হইবেন। অনুবাদে মূলের ভাষার সৌন্দর্য্য রক্ষা করা যায় না, এবং সেই কারণে আমি অসম্ভবকে সম্ভব করিবার কোনরূপ বৃথাচেষ্টা করি নাই। যদি মাছি মারা তরজমা নামক কোনরূপ পদার্থ থাকে তাহা হইলে আমার এ তরজমা তাই, অর্থাৎ আমি যতদূর সম্ভব অবিকল অনুবাদ করিয়াছি। প্রথম সনেটটি আমি কবির পকেট-বুকের নোট অবলম্বনে রচনা করিয়াছি, যাহা গদ্য আকারে ছিল তাহা পদ্য আকারে পরিণত করিয়াছি। আমি সেই নোট নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, তদ্দৃষ্টে ইংরাজি ভাষাজ্ঞ পাঠক মাত্রেই দেখিতে পাইবেন যে অনুবাদ স্থলে আমি নিজের কলম চালাই নাই।

Note :—

(1) Winding rivulet (2) Brook vocal (3) Rustic bridge (4) Railing (5) Beautiful lady leaning against (6) Playing violin (7) Lawn (8) Rabbit running about (9) Clear stream (10) Feeling heavenly bliss.

অনুবাদক]

প্রথম

নীচেতে চলেছে জল আঁকিয়া বাঁকিয়া,
তরল আবেগ-ভরে ঝাঁকিয়া ঝাঁকিয়া;
কানে শুনি তারি গান শুধু কুলুকুলু,
রসাবেশে হয়ে আসে চক্ষু ঢুলু ঢুলু।

উপরেতে ভাঙ্গা সাঁকো, হেরিনু যুবতী
রেলিঙেতে ভর দিয়ে আছে রূপবতী;
আপন ভাবেতে ভোর বাজায় বেয়ালা;
রূপে মোর ভরে গেল নয়ন পেয়ালা।

নির্ম্মল নির্ঝর নীর নাহি তাহে পঙ্ক,
রূপসি চাঁদের পারা শশ-হীন অঙ্ক,
শশক বেড়ায় ছুটে পেয়ে সমভূমি;
চাঁদ যদি হাতে পাই একবার চুমি।

সে রূপ বর্ণনা করে বর্ণ নাই বর্গে।
না মরিয়া চলে গেনু একদম স্বর্গে॥

দ্বিতীয়

তব হস্তে যন্ত্র করে ভ্রমর গুঞ্জন;
কভু ধ্বনি শুনি কাছে, কভু বহু দূরে,
কভু লম্ফে ঊর্দ্ধে ওঠে, কভু পড়ে ঘুরে;
জানিনে সে সুর আমি স্বর কি ব্যঞ্জন,
হৃদিতন্ত্রী কিন্তু মম করে ঝন্‌ঝন্‌!
লেগেছে ভাবের নেশা বেয়ালার সুরে;
সঙ্গীতের মদ্যে হয়ে অতি চুর্‌চুরে,
তালে তালে নাচে মোর নয়ন খঞ্জন।

সেই সঙ্গে নাচে মোর পরাণ পুঁতুল
পাগলের পারা হয়ে আনন্দে অতুল;
চোখের সুমুখে ভাসে দিবসের চাঁদ,
চাঁদির কিরণ দেয় চৌদিকে ছড়িয়ে;
ভেঙ্গে চুরে সব মোর হৃদয়ের বাঁধ,
কবিতার রস মনে পড়িছে গড়িয়ে।

তৃতীয়

আমার বুকের কূপে একি তোলপাড় !
এতদিনে বুঝি মনে জাগে ভালবাসা !
এক বৃন্তে ফুটে ওঠে ভয় আর আশা,
এ জীবনে এল বুঝি প্রথম আষাঢ় !

কখনো আশার জলে বেলোয়ারি ঝাড়,
কভু ঘিরে আসে মনে ভয়ের কুয়াশা ;
ও রূপ-মদিরা পিয়ে বাড়িছে পিপাসা,
হৃদয় মাতাল খায় বুকেতে আছাড় ।

কি রস ঢালিলে প্রাণে হৃদয়ের রাজ্ঞী !
বর্ণনা করিতে নারি নহি আমি বাগ্মী ।

প্রেমসিন্ধু পানে এবে চলি ভরাপালে,
দোলা খায় অন্তরাত্মা মুখে নাহি বাণী ;
কি করি বুদ্ধির হালে পায়নাকো পানি,
দুর্গা বলে ভেসে পড়ি যা থাকে কপালে !

চতুর্থ

ভাল তোমা বাসিবারে নাহিকো সাহস,
ভয়, পাছে লোকে বলে মোর আছে ছিট্ !
গগনের তারা তুমি আমি ক্ষুদ্র কীট্ !
তোমারে হেরিয়ে শুধু হয়েছি বেহোঁস্ ।
কিন্তু যদি হইতাম আমি খরগোস্,
এ দেহে পড়িত তব নয়নের দিঠ ;
নিশ্চয় ছুটিতে তুমি মোর পিঠ পিঠ,
ধরা দিয়ে মানিতাম বিনাবাক্যে পোষ ।

দূরে বসি এবে দেখি তব খোলা চুল,
তোমার আমার মাঝে আছে ভাঙা পুল ;
মিলন আশায় তাই হইয়ে হতাশ,
তোমার রূপের ঢেউ বসে বসে গুনি ;
কানে কানে বলে মোরে নিষ্ঠুর বাতাস
কভু তুমি ও নারীর হবেনাকো "উনি" !

পঞ্চম

পড়িতেছে আজ শুধু লুটিয়ে লুটিয়ে
আমার মনের পাখী বুকের বাসায় ;
কোথা হতে জল এসে নয়নে নাসায়
ফোয়ারার মত পড়ে ছুটিয়ে ছুটিয়ে ।

মনের দুঃখের কালি ঘুঁটিয়ে ঘুঁটিয়ে
কবিতা আজিকে লিখি ইংরাজি ভাষায় ;
পড়িবে তোমার চোখে ধরি এ আশায়
কথায় ব্যথার ফুল ফুটিয়ে ফুটিয়ে ।

কবি আমি হইয়াছি অবস্থায় পড়ে' ।
তরণী ছন্দেতে দোলে পড়িলেক ঝড়ে ॥

ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে মনের বাঁধন
কবিতায় তাই আজি করি আপশোষ ।
এখন আমার কাজ শুধুই কাঁদন,—
কোথা সেই বাহু লীন কোথা খরগোস্ !

ষষ্ঠ

আশা ছিল একদিন আমি হেসে হেসে,
বলিব মনের কথা তব কানে কানে,
তোমার দেহের শাদা চুম্বকের টানে
বসিব তোমার আমি অতি কাছে ঘেঁসে ।

সে সব প্রাণের সাধ আজ গেছে ভেসে
কোন দূর গগনেতে কেবা তাহা জানে !
গা ঢেলে বিরহে চলি অকূলের পানে,
—আশার ডিঙার মোর গেছে তলা ফেঁসে !

মন আজ বলে শুধু "কোথা প্রাণ সই,
ফোটে যার বেয়ালাতে সঙ্গীতের খই ?"
এ বুকে লেগেছে তার বেয়ালার ছড়ি,
তারি টানে অবিরল চোখে আসে জল ।
ভালবেসে পরদেশে এই হল ফল,
—রহিল বুকেতে চেন—চলে গেল ঘড়ি !

সপ্তম

খুলে যদি দেখ মোর হৃদয়-ফলক,
দেখিবে সেথায় প্রিয়া, ঈষৎ হেলিয়ে,
চিত্রাপিতা হয়ে আছে, কুন্তল এলিয়ে,
সুনীল কাঁচের চোখে না পড়ে পলক ;

প্রতি অঙ্গ হতে ছুটে রঙের ঝলক,
মনের আঁধারে দেয় বিদ্যুৎ খেলিয়ে ;
বুকের মাঝারে তাই উঠিছে ঠেলিয়ে
প্রাণের মধুর রসে প্রবল বলক।

যদিচ প্রিয়ার ছবি মনে আছে আঁকা,
প্রিয়া বিনে সব মোর লাগে ফাঁকা ফাঁকা।

কতকাল র'ব বল শুধু স্মৃতি নিয়ে ?
অশ্রুজলে যাক বুকে ছবি ধুয়ে মুছে !
অলীক সাদার মোহ যাক মনে ঘুচে !
করিব স্বদেশে ফিরে কালো মেয়ে বিয়ে !

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

সমালোচনা

ইউরোপ ভ্রমণ। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু এম, এ বি, এল প্রণীত। ভাবরাজ্যে যে বীজ উৎপন্ন হয় কর্ম্মক্ষেত্রে অবশেষে তাহাতেই ফল ধরে; সেই জন্যই ভাবের আদানপ্রদানে নব-যুগের উপযুক্ত নব-ভাবের যে সৃষ্টি হয় তাহার এত মূল্য। উন্নতিশীল জাতি মাত্রেরই জাতীয় জীবনের লীলা-ভূমিতে একটি ভাবের আব্-হাওয়া স্পষ্ট অনুভব করা যায়, যাহা উন্নতির লক্ষণও বটে কারণও বটে। আমাদের দেশে নানা ক্ষেত্রে নানাবিধ চেষ্টার ক্রমশঃ যে বৃদ্ধি হইতেছে তাহা আশাজনক সন্দেহ নাই কিন্তু আমাদের জাতীয় কোন বিশেষ কেন্দ্রস্থানে সেই ভাবের আব্হাওয়া লক্ষিত না হওয়ায়, ভাবের আদান প্রদানের সুযোগ বা ইস্থার চিহ্ন না পাওয়ায়, এই সকল চেষ্টার সফলতা সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে বড়ই শঙ্কিত হইতে হয়।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসুর "য়ুরোপ ভ্রমণ" পড়িতে পড়িতে এই কথাই মনে উদয় হইল। অনেকেই অনেক স্থানে ভ্রমণ করেন; অনুভব করিবার, চিন্তা করিবার, শিক্ষা করিবার কত প্রকার নূতন নূতন ভাব, তথ্য ও বৃত্তান্তের সংঘর্ষে আসেন; কিন্তু সেগুলি আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব ও স্বদেশের উপভোগ বা উপকারার্থে সংগ্রহ ও প্রকাশ করিবার পরিশ্রমটুকু কয়জন স্বীকার করেন? আমরা নরেন্দ্রবাবুর প্রকাশিত পুস্তকে তাঁহার বিদেশ ভ্রমণকালেও স্বজনের প্রতি সজাগ অনুরাগের পরিচয় পাইয়া প্রীতি লাভ করিয়াছি।

কল্পনা-রাজ্যে বিহার করা অপেক্ষা খাঁটি বাস্তব জগতে বসবাস করাটাই যে নরেন্দ্র বাবু পছন্দ করেন, তাঁহার পুস্তকে সে কথার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে সেটা ষোল আনা সুখের বিষয় বলিয়া আমরা মনে করি না। নরেন্দ্রবাবুর মনে কোন্ কোন্ অবস্থায় উচ্চ বা গভীর ভাবের উদয় হইয়াছিল তাহা তিনি আমাদের জানাইতে ত্রুটি করেন নাই বটে, কিন্তু সে ভাবের চেহারাটা আমাদের প্রদর্শন করিতে বা তদনুরূপ ভাব আমাদের মনে সঞ্চারিত করিতে তিনি চেষ্টামাত্র করেন নাই। এই ভাব-রসভোগের ভাগ পাওয়া সম্বন্ধে বঞ্চিত হওয়ায় গ্রন্থকারের প্রতি আমাদের অভিযোগ রহিয়া গেল। অপর পক্ষে এ কথা নিশ্চিত যে নরেন্দ্রবাবু বহুযত্ন সহকারে প্রত্যেক উল্লেখযোগ্য স্থান সম্বন্ধে কাজে লাগিবার মত যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা তাঁহার পরবর্ত্তী ভ্রমণকারীগণের বিশেষ উপকারে লাগিবার সম্ভাবনা। শ্রীসু।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ গীতা। শ্রীযুক্ত বিজয়নাথ মজুমদার সঙ্কলিত। তত্ত্বমঞ্জরী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। কলিকাতা, গ্রেট ইডিন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা মাত্র। শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব বর্ত্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ। নানা সময়ে উপদেশ ও শিক্ষা প্রভৃতির ছলে তিনি যে সকল কথা বলিতেন, তাহা গুচ্ছাকারে বহু পুস্তকে সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইয়াছে। মহাপুরুষগণের এই সকল মহাবাণী জীবন-যজ্ঞে মন্ত্রের কাজ করে, সুতরাং সেগুলির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। তাহাতে জাতীয়তা গঠন ও তাহার বর্দ্ধনে সুবিধা হয়। বর্ত্তমান সংস্করণের বিশেষত্ব, রামকৃষ্ণ দেবের মহাবাণীর সহিত ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রাদি ও বাইবেল প্রভৃতি হইতে তদনুরূপ বাণীসমূহও পাশাপাশি সংগৃহীত হইয়াছে। একটি ত্রুটি শুধু লক্ষ্য করিলাম—পরমহংস দেবের অনন্য-সাধারণ সহজ সরস ভাষার উপর সঙ্কলয়িতা মহাশয় তাঁহার মোটা কলম চালাইয়া পরিচিত মিষ্ট সুরটুকু মাঝে মাঝে কাটিয়া দিয়াছেন। এ ত্রুটির মার্জ্জনা নাই। বহিখানির ছাপা কাগজেরও সুখ্যাতি করিতে পারিলাম না।

বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় প্রণীত। অতুল লাইব্রেরী, ৫৪।৬ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। বিশ্বকোষ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের কাহিনী আজ বিশ্বে কাহারও একেবারে অবিদিত নাই; তবে সেগুলির সহিত বিশদ পরিচয় বোধ হয় অনেকেরই নাই। তাহার কারণ, যাঁহারা অবিশেষজ্ঞ, বৈজ্ঞানিক বিশিষ্টতার জন্য মূল বিষয়গুলি তাঁহাদিগের পক্ষে সম্যক আয়ত্ত করা দুরূহ। বঙ্গভাষায় এ সম্বন্ধে বহু আলোচনা হইলেও সহজ সরলতার অভাবে সেগুলি মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না। এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে আচার্য্য প্রবরের আবিষ্কারের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে নিতান্ত অবিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরও জ্ঞানলাভ হইবে। ইহার ভাষা অত্যন্ত সহজ, বর্ণনার প্রণালীটিও সরল, মনোজ্ঞ। বক্তব্যগুলি চিত্রমালায় পরিস্ফুট করায় বুঝিবার পক্ষে এতটুকু বাধা থাকে না। সহজ ভাবে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিতে গ্রন্থকারের শক্তি অসাধারণ। এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকার বঙ্গ সাহিত্যের একটি দারুণ অভাব মোচন করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি বঙ্গ-সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন।

ঋগ্বেদ-সংহিতা। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সাহিত্য-সরস্বতী কর্ত্তৃক বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদিত। শিলচর, বৈদিক সাহিত্যপ্রকাশ অফিস হইতে প্রকাশিত। শিলচর এরিয়েন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দুই টাকা। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, দুই টাকা চারি আনা। প্রথম অষ্টক। সায়ণ-ভাষ্য অবলম্বনে এই অনুবাদ সম্পাদিত হইয়াছে। অনুবাদ সরল ও প্রাঞ্জল হইয়াছে। কোনরূপ জটিলতা নাই। এই বিপুল অধ্যবসায় ও প্রচেষ্টার জন্য সাহিত্যসরস্বতী মহাশয় বঙ্গবাসীমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন, সন্দেহ নাই। আশ্বাস ও উৎসাহ পাইলে চতুর্ব্বেদেরই এইরূপ সরল প্রাঞ্জল অনুবাদ সাহিত্যসরস্বতী মহাশয় প্রকাশ করিবেন বলিয়া ভরসা দিয়াছেন। আমাদিগের বিলক্ষণ আশা আছে, এ আশ্বাস ও উৎসাহ-দানে বাঙ্গালী কার্পণ্য করিবেন না। বেদ ভারতের মহাগ্রন্থ—ঘরে ঘরে তাহার প্রচার যে একান্ত আকাঙ্ক্ষণীয় ও শুভপ্রদ, সে বিষয়ে কাহারও তিলমাত্র সন্দেহ নাই।

মাননীয় বিচারপতি হরিনাথ রায়

কয়েক মাস হইল কলিকাতা স্মলকজ কোর্টের জজ শ্রীযুক্ত হরিনাথ রায় মহাশয় হাইকোর্টের বিচারপতির পদে উন্নীত হইয়াছেন। এই আনন্দ-সংবাদ গত মাসে প্রকাশ করিবার আমাদের ইচ্ছা ছিল; কিন্তু ঘটিয়া উঠে নাই।

মাননীয় বিচারপতি হরিনাথ রায় ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং দুই বৎসর পরে বি, এল পরীক্ষা পাশ করেন; কিছুদিন হুগলি আদালতে ওকালতি করিবার পর মুন্সেফি পদ প্রাপ্ত হন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি সবজজ এবং ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা স্মলকজ কোর্টের বিচারপতির পদে উন্নীত হন।

মাননীয় বিচারপতি হরিনাথ রায়

ভ্রম সংশোধন

(১)

গত মাসে ডাক্তার গণেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের ছবির স্থানে ভুলক্রমে জষ্টিশ হরিনাথ রায় মহাশয়ের ছবি ছাপা হইয়া গিয়াছিল। সে ভ্রম সংশোধন করিবার জন্য এমাসে আমরা ডাক্তার গণেন্দ্রনাথ মিত্রের প্রতিকৃতি প্রকাশ করিলাম। আশা করি,

ডাক্তার গণেন্দ্রনাথ মিত্র

পাঠকবর্গ আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

(২)

গত মাসের সমালোচনায় প্রাচীন ইতিহাসের গল্পের লেখককে আমরা বোলপুর আশ্রমের ছাত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলাম। তিনি ছাত্র নহেন, অধ্যাপক।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ১, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে

কমলমনোহরা

(রাগিণী)

শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ মিত্র অঙ্কিত চিত্র হইতে

কান্তিক প্রেস] [২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

ভারতী

৩৭শ বর্ষ] শ্রাবণ, ১৩২০ [৪র্থ সংখ্যা

নবাবিষ্কৃত কবি-ভাসের গ্রন্থাবলী

ত্রিবন্দ্রমের পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত গণপতি শাস্ত্রী সংস্কৃত পুঁথির অন্বেষণে যখন দক্ষিণ-ত্রিবঙ্কুরে ভ্রমণ ক'রতেছিলেন তখন পদ্মনাভ-পুরের নিকটবর্ত্তী মনলিক্কর-মঠে ১০ খানা নাটকের হাতে-লেখা পুঁথি প্রাপ্ত হন। ৩০০ বৎসর পুরাতন হইলেও, প্রথম ১২ পৃষ্ঠা ছাড়া, তাহার অন্য কোন অংশে অক্ষর-বিলোপ ঘটে নাই। নাটকগুলির নাম :—

১। স্বপ্নবাসবদত্ত।

২। প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণ।

৩। পঞ্চরাত্র।

৪। চারুদত্ত।

৫। দূত-ঘটোৎকচ।

৬। অভিমারক।

৭। বালচরিত।

৮। মধ্যম ব্যায়োগ।

৯। কর্ণভার।

১০। উরুভঙ্গ।

এইগুলি ছাড়া আর একটি নাটকের হস্তলিপি আরম্ভ হইয়াছিল মাত্র, কিন্তু প্রথম পত্রের উল্টা দিকের মাঝামাঝি এক স্থানে অসম্পূর্ণভাবে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহার পর, আর একবার যখন তিনি ভ্রমণে বাহির হন, তখন কড়ুথুরুত্তির নিকটবর্ত্তী কলসপুরের গ্রহাচার্য্য গোবিন্দ-পিশরোদির নিকট পূর্ব্বোক্ত ধরণের আরও ২ খানা নাটক প্রাপ্ত হন;—তাহার নাম, অভিষেক-নাটক ও প্রতিমা-নাটক। তাহার পর তিনি জানিতে পারিলেন, উক্ত দুই গ্রন্থ প্রাসাদ-লাই-ব্রেরীতেও আছে। এই সকল পুঁথি মলয়লম্ অক্ষরে তালপাতায় লেখা; সম্ভবত ৩০০।৪০০ বৎসরের পুরাতন। এইরূপে, অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব ১২ খানা সংস্কৃত নাটক সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এই নাটকগুলির একটি বিশেষ লক্ষণ এই দেখা যায়,—অন্যান্য নাটকে যেরূপ নান্দীতে আরম্ভ হয়, তাহার পর "নান্দ্যন্তে সূত্রধারঃ" এইরূপ লেখা থাকে,—এই নাটকগুলির গোড়াতেই "নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ" এইরূপ লিখিত হইয়াছে, পরে নান্দীর মঙ্গলশ্লোক সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তা ছাড়া "প্রস্তাবনা"র স্থানে এই নাটকগুলিতে

"স্থাপনা" শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। আরও এক কথা,—শূদ্রক ও কালিদাস প্রভৃতির নাটকের প্রস্তাবনায় গ্রন্থকারের নাম ও রচনাদির উল্লেখ থাকে, কিন্তু এই নাটকগুলির "স্থাপনায়" তাহার কিছুই নাই। এবং নিম্নলিখিত ভরত-বাক্য দিয়া প্রায়ই এই নাটকগুলি শেষ করা হয়:—

"ইমাং সাগরপর্য্যন্তাং হিমবদ্বিন্ধ্যকুণ্ডলাম।
মহীমেকাতপত্রাঙ্কাং রাজসিংহ প্রশাস্তনঃ"॥

এই সকল নাটকের বাক্য রচনা ও গঠন পর্য্যালোচনা করিলে নিসংশয়রূপে প্রতীতি হয় যে উহা একই গ্রন্থকারের রচনা।

এই সকল নাটকের "স্থাপনায়" গ্রন্থকারের কিংবা গ্রন্থের নাম দেওয়া হয় নাই; ইহাতে মনে হয়, ঐরূপ নামোল্লেখের রীতি প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে এই নাটকগুলি রচিত হয়। "স্বপ্নবাসবদত্ত" নাটকের উল্লেখমাত্র কোন কোন আলঙ্কারিক গ্রন্থে পাওয়া যায়। এতাবৎকাল আধুনিক পণ্ডিতদিগের বিশ্বাস ছিল যে, ঐ গ্রন্থখানি একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। "স্বপ্নবাসবদত্ত" যে ভাসের রচিত তাহা "শক্তি মুক্তাবলী"তে উদ্ধৃত কবিরাজশেখরের একটি শ্লোকে অবগত হওয়া যায়:—

ভাসনাটকচক্রেঽপিচ্ছেকৈঃ ক্ষিপ্তে পরীক্ষিতুম্।
স্বপ্নবাসবদত্তস্য দাহকোঽভূন্ন পাবকঃ॥ (১)

কালিদাস মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রস্তাবনায় বলিয়াছেন:—

"প্রথিত যশসাং ভাসসৌমিল্ল কবিপুত্রাদিনাং প্রবন্ধাতিক্রম্য"।

আবার কবিবর বাণভট্ট, ভাসের নাটকগুলিকে, "সূত্রধার কৃতারম্ভৈঃ" বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন। কারণ ভাসের নাটকগুলির গোড়াতেই থাকে:—"নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ।"

সূত্রধারকৃতারম্ভৈর্নাটকৈর্বহুভূমিকৈঃ।
সপতাকৈর্যশো লেভে ভাসো দেব কুলৈরিব॥

কালিদাস প্রভৃতি ভাসের উত্তরবর্ত্তী কবিগণের কোন কোন শ্লোকে ভাসের ছায়া ও রচনাভঙ্গী পরিলক্ষিত হয়। যথা, ভাসের অভিষেক-নাটকের চতুর্থ অঙ্কের একস্থলে এইরূপ আছে:—

"যস্যাং ন প্রিয়মণ্ডনাপি মহিষী দেবস্য মন্দোদরী
স্নেহাল্লুম্পতি পল্লবান ন চ পুনর্বীজন্তি যস্যাং ভয়াৎ।
বীজন্তো মলয়ানিলাঅপি করৈরস্পৃষ্টবালদ্রুমা
সেয়ং শক্ররিপোবশোকবণিকা ভগ্নেতি বিজ্ঞাপ্যতাম॥"

উক্ত শ্লোকে ব্যবহৃত "প্রিয়মণ্ডনাপি," "স্নেহাৎ," "পল্লবান্," "সেয়ং" এই শব্দগুলি কালিদাসের শকুন্তলার চতুর্থ অঙ্কের ঐরূপ একটি শ্লোকেও পরিলক্ষিত হয়, যথা:—

"পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি পয়ো যুষ্মাস্বপীতেষু যা
নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্।
আদ্যেবঃ কুসুমপ্রসূতিসময়ে যস্যা ভবত্যুৎসবঃ
সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্ব্বৈরনুজ্ঞায়তাম্॥"

আবার, ভাসকৃত "বালচরিতের" প্রথম অঙ্কের একটি শ্লোকে আছে, দেবকী স্বীয় শিশুটিকে বাসুদেবের হস্তে সমর্পণ করিবার সময় মনে হইতেছে যেন তিনি দুই বিভিন্ন দিকে গমন করিতেছেন—তাঁহার শরীর তাঁহার কারাগারের দিকে, এবং তাঁহার মনটি শিশুর দিকে অগ্রসর হইতেছে। যথা:—

"হৃদয়েনেহ তত্রাঙ্গৈর্দ্বিধাভূতেব গচ্ছতি।
যথা নভসি তোয়ে চ চন্দ্রলেখা দ্বিধাকৃতা॥"

(১) ফরাসী পণ্ডিত Felicien levir গ্রন্থেও এই শ্লোকগুলির উল্লেখ আছে—২।৩ মাস পূর্ব্বে ভারতীতে মৎকর্তৃক অনূদিত হয়।—শ্রীজ্যো।

এই ভাবের একটি শ্লোক কালিদাসের প্রথম অঙ্কে আছে। যথা :—

"গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্তুতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য॥"

ভাস ও কালিদাসের রচনার মধ্যে এইরূপ ছোটখাট অনেক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে, এইরূপ সাদৃশ্য ভবভূতীর রচনাতেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার দৃষ্টান্ত :—"স্বপ্নবাসবদত্ত"-নাটকের প্রথম অঙ্কে "ব্রহ্মচারীব" ব্যাক্যালাপের সহিত, "উত্তরচরিতের" "অত্রেয়ীব" বাক্যালাপের খুবই সাদৃশ্য আছে। আবার অভিষেক-নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কের অনুরূপ, উত্তরচরিতের ষষ্ঠ অঙ্কে "বিদ্যাধরের" বাক্যালাপ।

যে মৃচ্ছকটিক-নাটক কালিদাসের নাটক অপেক্ষাও পুরাতন বলিয়া খ্যাত, তাহাতে ভাসের রচনাবলীর সহিত অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এমন কি ভাসকৃত "চারুদত্ত"-নাটকের কতকগুলি শ্লোক ও উক্তি অবিকৃতভাবে অথবা স্বল্পপরির্ত্তনসহকারে মৃচ্ছকটিক-নাটকে গৃহীত হইয়াছে।

"চারুদত্ত"-নাটকের প্রথম অঙ্কে এইরূপ একটি শ্লোক আছে যথাঃ—

"যাসাং বলির্ভবতি মদ্গৃহদেহলীনাং
হংসৈশ্চ সারসগণৈশ্চ বিভক্তপুষ্পঃ
তাস্বেব পূর্ব্ববলিরূঢ়য়বাঙ্করাসু
বীজাঞ্জলিঃ পততি কীটমুখাবলীঢ়॥"

ইহার অনুরূপ শ্লোক "মৃচ্ছকটিকে" যথা :—

"যাসাং বলিঃ সপদি মদ্গৃহদেহলীনাং
হংসৈশ্চ সারসগণৈশ্চ বিলুপ্তপূর্ব্বঃ।
তাস্বেব সংপ্রতি বিরূঢ়তৃণাঙ্করাসু
বীজাঞ্জলিঃ পততি কীটমুখাবলীঢ়ঃ॥"

আবার, চারুদত্ত-নাটকের তৃতীয় অঙ্কে আছে :—

"মার্জ্জারঃ প্লবনে বৃকোঽপসরণে শ্যেনো গৃহালোকনে
নিদ্রা সুপ্তমনুষ্যবীর্য্যতুলনে সংসর্পণে পন্নগঃ।
মায়া বর্ণশরীরভেদকরণে বাগ্ দেশভাষান্তরে
দীপো রাত্রিষু সংকটে চ তিমিরং বায়ু স্থলে নৌর্জলে'॥

ইহার অনুরূপ মৃচ্ছকটিকে :—

"মার্জ্জারঃ ক্রমণে মৃগঃ প্রসরণে শ্যেনো গৃহালুঞ্চনে
সুপ্তাসুপ্ত মনুষ্যবীর্য্যতুলনে শ্বা সর্পণে পন্নগঃ।
মায়ারূপশরীরবেষরচনে বাগ্ দেশভাষান্তরে
দীপো রাত্রিষু সংকটেষু ডুডুমো বাজী স্থলে নৌর্জলে॥"

এইরূপ অনেকগুলি শ্লোক ও বাক্যাবলী দুই নাটকেই সমান। বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত করিলাম না। উভয় নাটকেরই নায়ক চারুদত্ত। তবে কে কাহার পূর্ব্ববর্ত্তী তাহাই বিচার্য্য। "চারুদত্ত-নাটক" হইতেই যে "মৃচ্ছকটিক" নাটকের মূল-আখ্যান এবং অনেক শ্লোক ও বাক্য গৃহীত হইয়াছে তাহা খুব সম্ভব বলিয়া মনে হয়। কেননা, পরবর্ত্তী কালের নাটকেই গ্রন্থকারের ও গ্রন্থের নামাদির উল্লেখ আছে। "মৃচ্ছকটিকের" প্রস্তাবনায় গ্রন্থকার ও গ্রন্থের বর্ণনা আছে, কিন্তু "চারুদত্ত" নাটকে তাহা নাই। ইহাতেই সপ্রমাণ হয়, মৃচ্ছকটিক-নাটক পরবর্ত্তীকালের রচনা। তবে, মৃচ্ছকটিক নাটকে এমন কতকগুলি ভাল-ভাল শ্লোক আছে যাহা চারুদত্তনাটকে নাই। ইহা হইতে এইরূপ অনুমান হয়, চারুদত্ত-নামক ক্ষুদ্র নাটকটি, আরও কতকগুলি ভাল-ভাল শ্লোকসংযোগে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে এবং উহার আখ্যানবস্তুও আরও একটু চিত্তাকর্ষক করিয়া রচিত হইয়াছে। শূদ্রককে মৌলিক গ্রন্থকার

বলা যাইতে পারে না, তিনি শুধু পুরাণো মালমস্‌লা লইয়া একটি ইমারৎ পুনর্নির্ম্মাণ করিয়াছেন মাত্র। শূদ্রক কালিদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী এরূপ কোন নিশ্চিত প্রমাণ নাই। তবে ইহা নিশ্চিত, শূদ্রক, অলঙ্কারগ্রন্থকার বামনের পূর্ব্ববর্ত্তী। কেননা, তাঁহার গ্রন্থে এই কথা আছে:—

"শূদ্রকাদি রচিতেষু প্রবন্ধেষস্য (শ্লেষাখ্যগুণস্য) ভূয়ান্ প্রপ্রঞ্চো দৃশ্যতে।"

ভাসের নাটকগুলি কালিদাসের সময়ে যে খুব প্রচলিত ছিল তাহা এই শ্লোকে স্পষ্ট অবগত হওয়া যায়:—

"প্রথিত-যশসাং ভাসসৌমিল্লকবিপুত্রাদিনাম্।"

পক্ষান্তরে কোন কারণে শূদ্রকের সময়ে ভাসের নাটকগুলি বিরলপ্রচার হইয়াছিল। তাই শূদ্রক, "চারুদত্ত" নাটকের বিবিধ শ্লোক সংগ্রহ করিয়া এবং কিছু কিছু নূতন যোজনা করিয়া তিনি তাঁহার মৃচ্ছকটিক নাটক রচনা করেন।

ত্রিবন্দ্রমের গণপতি শাস্ত্রীমহাশয় যেরূপ শ্রম ও অধ্যাবসায় সহকারে মহাকবি ভাসের এই লুপ্ত নাটকগুলির আবিষ্কার করিয়াছেন, তজ্জন্য ভারতের ও সমস্ত সভ্যজগতের সংস্কৃত-সাহিত্যানুরাগী ও প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়ী ব্যক্তি-মাত্রই তাঁহার নিকট চরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হইবেন, সন্দেহ নাই। এই আবিষ্কৃত গ্রন্থের মধ্যে "চারুদত্ত" ছাড়া আর সবগুলিই মুদ্রিত হইয়াছে। শাস্ত্রীমহাশয় অতীব পাণ্ডিত্য সহকারে গ্রন্থগুলি প্রতিসংস্কৃত করিয়াছেন এবং "স্বপ্নবাসবদত্তের" ভূমিকায় ভাসের কাল ও রচনাবলী সম্বন্ধে যে বিচার করিয়াছেন, তাহাই আমি সংক্ষেপে এই প্রবন্ধে প্রকাশ করিলাম।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মুসলমানকোর্টে বাঙ্গালী সেনাপতি

১০৩০ খৃষ্টাব্দে পারস্যবিজয়ের পর সুলতান মাহমুদ প্রাণত্যাগ করেন। অনন্তর তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ যথাক্রমে গজনীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। পরিশেষে ১১৫২ খৃষ্টাব্দে ঘোরনগরের অধিপতি আলাউদ্দীনের সহিত গজনীরাজ বেহরামের কলহ হইতে থাকে। তাহার ফলে আলাউদ্দীন বিজয়লাভ করিয়া গজনীনগরী বহ্নি ও অসিদ্বারা ছারখার করিয়া সেই সুন্দর রাজধানীর ধ্বংস সাধন করেন। সেই হইতে গজনীরাজ্য বিলুপ্ত হয়। একথা ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন। আমরা যে সেনাপতির কথা বর্ণনা করিব তিনি সুলতান মাহমুদের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই কর্ম্মগ্রহণ করেন। তিনি তিলক নামে অভিহিত। ইনি নরসুন্দর পুত্র ছিলেন বলিয়া উক্ত; ইঁহার পিতার নাম জয়সেন। তিলক সুপুরুষ এবং মিষ্টভাষী ছিলেন। তাঁহার বাগ্মীতায় সকলেই মুগ্ধ হইত। ইনি বহুদিন কাশ্মীরে বাস করেন। তথায় অবস্থানকালে হিন্দী ও পারশীতে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার হস্তাক্ষর মুক্তা-

পাতির ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইত। কথিত আছে, তিনি কাশ্মীরে বাস করিয়া যাদুবিদ্যা, আত্মগোপন প্রভৃতি বিদ্যা শিক্ষা করেন।

এই সময়ে আমীর মাহম্মদ একজন সুদক্ষ এবং সুচতুর কর্ম্মচারী অন্বেষণ করিতেছিলেন। তিনি তিলককে দোভাষীর কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। কর্ম্মদক্ষতায় আমীর মাহমুদ তাহার উপর সবিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। ঐতিহাসিক আবুল ফজেল বলেন, তিনি তিলককে আমীর মাহমুদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া যুগপৎ দোভাষী ও সেক্রেটরীর কর্ম্ম করিতে দেখিয়াছেন। এইপ্রকারে তাঁহার অদৃষ্ট খুলিয়া গেল।

অনন্তর সুলতান মামুদের রাজত্বকালে তিলক তাঁহার কতিপয় গুরুতরকার্য্য গুপ্তভাবে সাধন করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি সুলতান মামুদের কৃপাদৃষ্টিতে পতিত হন। তিনি কৌশল অবলম্বন করিয়া হিন্দুকাতার ও কতিপয় বহির্ভাগের প্রদেশ স্বকবলে আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সাহ মাহমুদের হিরাট হইতে বল্‌ক নগরে প্রত্যাগমনকালে সুন্দর নামে জনৈক হিন্দু-সেনাপতি তথায় অনুপস্থিত ছিলেন। সেই সুযোগে তিনি তিলককে হিন্দু সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিয়া আপন সমভিব্যাহারে লইয়া যান। তিলককে সেনাপতিত্বে বরণ করিয়া তাঁহার সম্মানের জন্য সা মাহম্মুদ তাঁহাকে একটি স্বর্ণালঙ্কৃত পরিচ্ছদ প্রদান করেন; তাঁহার গলদেশে বিবিধ মণিমুক্তাখচিত সুবর্ণমাল্য প্রদত্ত হয়। তাঁহার অধীনে সর্ব্বদা একটি সৈন্যদল থাকিত। এখন হইতে তিনি একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হইয়া উঠেন। তাঁহার ব্যবহারোপযোগী একটি তাঁবু ও ছত্র তাঁহাকে প্রদান করা হয়, এবং তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র বাসভবনও নির্ম্মিত হয়। তাঁহার দ্বারদেশে সর্ব্বদা ভেরী নিনাদিত হইত। তৎকালে যাঁহারা হিন্দু অধিনায়ক হইতেন তাঁহাদের বাসভবনের জন্য ঐ প্রকার ব্যবস্থা ছিল। অচিরে তাঁহার বিশাল ভবন সুবর্ণচূড়াবিনির্ম্মিত ধ্বজপতাকাদি দ্বারা শোভিত হইল। ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি প্রসন্না হইলেন। তিনি রাজসভায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবৃন্দের সহিত উপবেশন করিবার সম্মান প্রাপ্ত হইলেন। আবুল্‌ফজেল্ বলেন, তাঁহার উপর রাজাসংক্রান্ত বহু গুরুভার ন্যস্ত ছিল।

একদা আমীর উদ্যানবিহারে গমন করিয়াছেন। তথায় দিবসরজনী আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। ইতিমধ্যে কতিপয় জরুরী পত্র প্রাপ্ত হইয়া আমীর উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। সেই পত্রসমূহের সারমর্ম্ম এই :—"নিয়ালটিগীন তুর্কীগণের সহিত লাহোরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাহার সহিত বহু দুর্দ্দান্ত লোক যোগ দিয়াছে। দিনে দিনে তাহার দল বাড়িয়া উঠিতেছে। যদ্যপি অচিরে ইহার প্রতিবিধান না হয় তবে দেশের অবস্থা অতি ভীষণ এবং শোচনীয় হইয়া পড়িবে। তাহার ক্রমেই প্রতাপ বর্দ্ধিত হইতেছে।" এই সংবাদ পাইবামাত্র আমীর একটি গুপ্ত পরামর্শসভা আহ্বান করিলেন। তাহাতে জঙ্গীলাট, সেনাপতিগণ এবং সৈন্যদলের কর্ম্মচারীগণকে উপস্থিত হইতে আদেশ করা হইল। সকলে সমবেত হইলে আমীর উপস্থিত বিপদ বিজ্ঞাপিত করিয়া সকলকে ইহার উপায়

উদ্ভাবন করিতে বলিলেন। নিয়ালটিগীন ঘটিত বিপ্লব দমন করিবার উদ্দেশ্যে জঙ্গীলাট (Com an ler-in Chief) বলিলেন, "যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাভব করিবার চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। যগুপি হুজুর আমাকে তথায় গমন করিতে আজ্ঞা করেন তাহা হইলে এখনি আমি তাহা সম্পাদন করিতে পারি। আমি গ্রীষ্মাধিক্য সত্ত্বেও সপ্তাহ মধ্যে সমগ্র বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়া নিয়ালটিগীনের বিরুদ্ধে যাত্রা করিতে পারি।" আমীর বলিলেন, "তোমার এক্ষণে তথায় গমন করা অকর্ত্তব্য দেখিতেছি। কারণ খোরাসানে বিদ্রোহানল জ্বলিয়াই আছে। খাটলান ও টুকারিস্থানে রাজবিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছে। মন্ত্রী খাজা আহমুদকে তথায় প্রেরণ করিয়াছি। তিনি তথায় বিলক্ষণ সুবন্দোবস্ত করিতেছেন। শরৎকাল শেষ হইয়া গেলে আমাকে একবার বল্‌খে যাইতে হইবে। তোমাকেও সেই সঙ্গে সসৈন্যে তথায় গমন করিতে হইবে। আমি অন্য একজন সেনাপতি তথায় প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করি।"

তিলক দেখিলেন, জঙ্গীলাট ভিন্ন সকল সামন্তেরাই মস্তক অবনত করিয়া বিষণ্ণ ভাবে উপবিষ্ট আছেন। হিন্দুস্থানের কষ্টকিচ্ছ্ কার্য্যে তাঁহারা কেহই গমন করিতে ইচ্ছুক নহেন। সেই জন্য আমীর চিন্তাভারাক্রান্ত। তাহা দেখিয়া তিলক বলিয়া উঠিলেন, "প্রভু, দীর্ঘ জীবী হউন। হুজুর যগুপি আজ্ঞা করেন তাহা হইলে আমি তথায় গমন করিয়া বিদ্রোহ দমন করিয়া কৃতার্থ হই এবং হুজুরের উদ্বিগ্নতা বিদূরিত করি। অপিচ, আমি হিন্দুস্থানবাসী, ঐ দেশের জলবায়ু আমার কোন অনিষ্ট করিবে না। আপনি পণ্ডিত, যগুপি উপযুক্ত বিবেচনা করেন তাহা হইলে আমি উক্ত কার্য্য সাধনে তৎপর হইতে পারি।" আমীর পূর্ব্ব হইতেই তিলকের কার্য্যপটুতা অবগত ছিলেন, এক্ষণে পূর্ব্বোক্তরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সমবেত সভ্যমণ্ডলীর মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলে একবাক্যে সম্মতি প্রদান করিলেন। তাঁহার মনে মনে বলিলেন, "যাক শত্রু পরে পরে"।

তিলক কর্ম্ম-নিয়োগ-পত্র—"লিখিত নামা" প্রাপ্ত হইয়া, অচিরে নক্সা দ্বারা কার্য্য প্রণালীর বিশদ বিবরণ বাদসার গোচরীভূত করিলেন। আমার তিলককে যথোচিত ক্ষমতা প্রদান করিয়া হিন্দু প্রজাগণের নিকট হইতে কর সংগ্রহের ভার ন্যস্ত করিলেন। ইহাকে পারশীতে "বাজবুরক" কহে। তিলক বিপুল সৈন্য লইয়া হিন্দুস্থান অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

মঙ্গলবারে ঈদ্ উৎসব সম্পন্ন হইয়া গেল। আমীর সঙ্গীগণ লইয়া আনন্দে ভরপুর এমন সময় লাহোর হইতে সংবাদ আসিল, নিয়াল-টিগীন দুর্গ অধিকার করিয়াছে। কিন্তু তাহাতে এ কথাও উক্ত আছে যে তিলক নামে জনৈক বঙ্গীয় হিন্দু 'কমাণ্ডার ইন-চিফ' চতুর্দ্দিক হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া একটি মহতী সেনার সমাবেশ করিয়াছেন। তিনি নিয়ালটি-গীনের দিকে ক্রমেই অগ্রসর হইতেছেন। এই দুই সৈন্যদলের ব্যবধান দু ক্রোশ মাত্র। অল্পদিনের মধ্যে কিরমানে একটি যুদ্ধ হইল। তাহাতে দুই হাজার হিন্দু, এক হাজার তুর্কী এবং এক হাজার কার্দ্দ সৈন্য ছিল। তিলক স্বীয় কৌশলবলে বিভিন্ন স্থানে

সৈন্য সমাবেশ করিয়াছিলেন। তিনি অপর স্থানে সৈন্যাদির স্থান নির্দ্দেশ করিয়া, মাত্র চারিহাজার সৈন্য লইয়া কিরমানের পথে অগ্রসর হইতেছিলেন। ইত্যবসরে শত্রুপক্ষ আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে। তাঁহার সঙ্গে সৈন্যগণের সামান্য মাত্র রসদ ছিল; তাহাও নিঃশেষ হইয়া আসিল। এই যুদ্ধের ফল তত সন্তোষজনক হইল না। তাঁহার হিন্দু সৈন্যগণকে চারিমাসকাল খাদ্যাভাবে বার্লীর রুটি খাইয়া থাকিতে হইয়াছিল। যুদ্ধের ফল সন্তোষজনক না হইবার ইহাও একটি কারণ।

আমীর তিলকের সংবাদ পাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। পরিশেষে তিনি ৪২৫ হিজীরা বা ১০৩৪ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে ফসরে বহির্গত হইলেন।

অবশেষে তিনি মদ্যপান করিয়া দিনরাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপে এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। সেপ্টেম্বর মাসের শেষদিনে তিলকের নিকট হইতে দূতগণ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা বলিল "মদগর্ব্বী বিদ্রোহী আহম্মদ নিয়ালটিগীন হত এবং তাহার পুত্র ধৃত হইয়াছে। নিয়ালটিগীনের তুর্কী পারিষদবর্গ তিলকের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে।" এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমীর উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি জয়ঢক্কা বাজাইবার অনুমতি প্রদান করিলেন। দূতগণকে সম্মানসূচক পরিচ্ছদে বিভূষিত করা হইল। অতঃপর তিলকের নিকট হইতে পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাতে আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত এইরূপ লিখিত আছে;—তিলক লাহোরে উপস্থিত হইয়া কতিপয় দুর্দ্দান্ত মুসলমান নেতাকে কারারুদ্ধ করেন। তাহারা আহম্মদের অনুচর। তিলক তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি প্রদান করিয়া অন্যান্য অনুচরবর্গকে অত্যন্ত ভীত এবং সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিলেন। তাঁহার অপ্রতিহত ক্ষমতা দর্শন করিয়া বহুসংখ্যক ব্যক্তি আহম্মদ নিয়ালটিগীনের দল পরিত্যাগ করিয়া তিলকের শরণাপন্ন হইল। তাহার পর হইতে লাহোরের শান্তিরক্ষা ও রাজস্ব আদায় বিধিপূর্ব্বক সম্পাদিত হইতে লাগিল। যখন তিলক দেখিলেন উক্ত দুইটি কঠোর কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে তখন তিনি বিপুল সৈন্য লইয়া নিরাপদে আহম্মদের পশ্চাদনুসরণ করিলেন। তাঁহার সৈন্যমধ্যে হিন্দু সৈন্যই অধিক ছিল। কিয়ৎকাল পর হইতেই নিয়ালটিগীনের সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উহার প্রত্যেকটিতেই আহম্মদ পলায়ন করিতে লাগিল। তিলক পশ্চাদনুসরণে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। অবশেষে একটি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। নিয়ালটিগীনের দল পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে লাগিল। অবশেষে নিয়ালটিগীন আর স্থির থাকিতে না পারিয়া যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। তাহার তুর্কী সৈন্যগণ একযোগে তাহার পক্ষ ত্যাগ করিয়া তিলকের নিকট আসিয়া আশ্রয়প্রার্থী হইল। তিনি তাহাদের অভয় দিয়া বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। আহম্মদ কেবলমাত্র তিনশত অশ্বারোহী লইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলেন। তিলক সময় নষ্ট না করিয়া বিদ্রোহী জাঠগণকে লিখিয়া পাঠাইলেন—"যদ্যপি তোমরা মঙ্গল চাও বিনাপত্তিতে আমার আশ্রয় গ্রহণ কর।"

তাহারা এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল এবং কালবিলম্ব না করিয়া তিলকের শরণাপন্ন হইল। অবশেষে তিনি দেশমধ্যে প্রচার করিয়া দিলেন যদ্যপি কেহ নিয়ালটিগীনের মস্তক লইয়া আসে এবং তাহার পুত্রকে জীবিতাবস্থায় ধৃত করিতে পারে তাহাকে ৫০০,০০০ ডারহাম নামক রৌপ্যমুদ্রা প্রদান করা হইবে। উহা গ্রীসদেশীয় মুদ্রাবিশেষ। উহার প্রত্যেকটির মূল্য ৯½ পেন্সের কিঞ্চিৎ অধিক। উক্ত মুদ্রা প্রাচীন গ্রীশে, তুর্কীস্থানে, আরব ও পারস্যদেশে ব্যবহৃত হইত। এই কথা প্রচারিত হইবামাত্র চতুর্দ্দিকে লোক ছুটিতে লাগিল। তখন আহম্মদের জীবন শঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল। জাঠ ও অন্যান্য বিদ্রোহীগণ তাহাকে ধরিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল।

একদা নিয়ালটিগীন দুইশত অশ্বারোহী লইয়া একটি নদী উত্তীর্ণ হইয়েছে এমন সময় দুই তিন সহস্র জাঠ অশ্বারোহী তাহাকে অতর্কিতভাবে পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিল। সে তৎক্ষণাৎ হস্তীপৃষ্ঠ হইতে পুত্রসহ নদী মধ্যে ঝম্প প্রদান করিল। তখন চতুর্দ্দিক হইতে জাঠগণ আক্রমণ করিয়া তাহার ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন করিল। দেখিতে দেখিতে নদী মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। আহম্মদের মুষ্টিমেয় সৈন্যকে বিধ্বস্ত করিয়া জাঠগণ নিয়ালটিগীনের সম্মুখীন হইল। সে তখন তাহার পুত্রকে নিজহস্তে হত্যা করিবার জন্য প্রয়াস পাইল কিন্তু জাঠগণ তাহাতে বাধা প্রদান করিয়া তাহার পুত্রকে নদীগর্ভ হইতে উত্তোলন করিল। পরিশেষে তাহারা আহম্মদকে লক্ষ্য করিয়া তরবারি চালাইল। অচিৎাৎ নিয়ালটিগীনের মস্তক দ্বিখণ্ড হইয়া পড়িল; তাহার পর হতাবশিষ্ট লোকদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া আসিল। তিনি তখন জাঠগণকে এক লক্ষ ডারহাম নামক রৌপ্যমুদ্রা প্রদান করিলেন। তাহারা নিয়ালটিগীনের মস্তক ও তাহার পুত্রকে তিলকের নিকট প্রদান করিল। তিলক জয়োল্লাসে আহম্মদের মস্তক এবং পুত্রটিকে লইয়া লাহোরে গমন করিলেন। তার পর তিনি সেখানকার শান্তি রক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়া আমীরের দরবার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

তিলক নিজের ক্ষমতায় প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। ভাগ্যলক্ষ্মী সকল সময়ই তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্না ছিলেন। কোথাও তিনি অকৃতকার্য্য হয়েন নাই। বাঙ্গালী বীর *তিলক স্বল্পকাল মধ্যে স্বীয় প্রতিভাবলে প্রকৃত মনুষ্য পদবাচ্য হইয়া উন্নতির চরম সীমায় অধিরোহণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর মধ্যে তিনি ভিন্ন আর কেহ জঙ্গীলাট হয়েন নাই। তাঁহার জীবনের আর অধিক কোন কথাই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অতএব আমরা এই স্থলেই তাঁহার জীবনের উপসংহার করিলাম।

শ্রীগণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ।

* তিলক যে বাঙ্গালী ছিলেন— এ প্রবন্ধে তাহার কোনই প্রমাণ নাই। আশা করি প্রবন্ধ লেখক পরে তাহার প্রমাণ দেখাইয়া পাঠকের সন্দেহ ভঞ্জন করিবেন। ভাঃ সং

শারীর স্বাস্থ্য-বিধান

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(১৫)

মশা মাছি তাড়াইবার উপায়

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মশা, মাছি প্রভৃতি দ্বারা সংক্রামক রোগের বিস্তার সংঘটিত হইয়া থাকে। আমাদের বাঙ্গালা দেশে জ্বরে যত অধিক সংখ্যক লোক মৃত্যু মুখে পতিত হয়, এমন আর কিছুতেই নহে! পুনশ্চ সকল প্রকার জ্বরের মধ্যে এদেশে ম্যালেরিয়া জ্বরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। মশকদংশন ব্যতীত ম্যালেরিয়া জ্বর উৎপন্ন হয় না, ইহা এক্ষণে অভ্রান্তরূপে সপ্রমাণ হইয়াছে। অতএব কি উপায় অবলম্বন করিলে আমরা মশকের দৌরাত্ম্য হইতে একেবারে না হউক, কিয়ৎ পরিমাণেও আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হই, তাহাই এস্থলে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

ম্যালেরিয়া রোগ বিস্তারের জন্য ম্যালেরিয়া-গ্রস্ত রোগী ও এনোফিলিস্ (Anopheles) জাতীয় মশক, এতদুভয়ের অবস্থিতি অবশ্য প্রয়োজনীয়। ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর রক্তের মধ্যে উক্ত রোগের কীটাণু বিদ্যমান থাকে; মশকী দংশন দ্বারা উহাকে রোগীর রক্তের সহিত শোষণ করিয়া লয়। পরে মশকীর দেহের মধ্যে থাকিয়া উক্ত কীটাণুর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় এবং অবশেষে ঐ মশকী সুস্থ ব্যক্তিকে দংশন করিয়া তাহার শরীরের মধ্যে ঐ পরিবর্ত্তিত কীটাণু প্রবেশ করাইয়া ম্যালেরিয়া রোগ উৎপাদন করে। অতএব দেখা যাইতেছে যে ম্যালেরিয়া রোগের বিস্তার নিবারণ করিতে হইলে, হয় মশককুল একেবারে ধ্বংস করিতে হইবে, নতুবা রোগীর রক্তের মধ্যে যে ম্যালেরিয়া রোগের কীটাণু অবস্থিতি করে, তাহার ধ্বংস করিবার উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, কেন না তাহা হইলে মশকের দংশন দ্বারা উহা রোগীর শরীর হইতে অন্য শরীরে সংক্রামিত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় ম্যালেরিয়াবাহী মশককুলের এককালীন ধ্বংস সাধন করা অসম্ভব। যেখানে জল অবরুদ্ধ হইয়া থাকিবে, সেইখানেই মশকের প্রাদুর্ভাব হইবে। পল্লীগ্রামে নালা, ডোবা, অপরিষ্কৃত পুষ্করিণী, স্রোতবিহীন নদী এবং যে সকল স্থানে অল্পগভীর জল সঞ্চিত থাকে, সেই সকল স্থানেই মশকের বংশবৃদ্ধি হইবার সুবিধা হয়। এইরূপ স্থানেই মশকীরা ডিম পাড়ে এবং কালে ঐ ডিম ফুটিয়া অসংখ্য নূতন মশকের সৃষ্টি হইয়া থাকে। বর্ত্তমান কালে আমাদের দেশে জল নিকাশ হইবার স্বাভাবিক পথ সমূহ অনেক স্থানে একেবারে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং এই সকল স্থানই ম্যালেরিয়ার প্রধান আবাসভূমিরূপে পরিণত হইয়াছে। আমরা দেখিতে পাই যে, বর্ষার অব্যবহিত

পরেই পল্লীগ্রামে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে এবং বসন্তের প্রারম্ভে, যখন বর্ষাসঞ্চিত জল শুষ্ক হইয়া যায়, তখন ম্যালেরিয়ার প্রকোপ একেবারেই হ্রাস প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বে যখন ম্যালেরিয়ার প্রকৃত কারণ জানা ছিল না, তখন চিকিৎসকেরা মনে করিতেন যে জলাভূমি প্রভৃতি যে সকল স্থানে জল অবরুদ্ধ থাকে, তথা হইতে এক প্রকার দূষিত বাষ্প উত্থিত হইয়া ম্যালেরিয়া রোগ উৎপাদন করে। জলাভূমির ন্যায় স্থান সমূহে মশক জন্মিবার সুবিধা হয় বলিয়াই উহারা ম্যালেরিয়ার আকর; ঐ সকল স্থান হইতে দূষিত বাষ্প উৎপন্ন হইলেও উহা ম্যালেরিয়া জ্বর উৎপাদন করে না অথবা ঐ সকল স্থানের জল পান করিলেও ম্যালেরিয়া রোগ উৎপন্ন হয় না।

আমাদের দেশে জল নিকাশের সুব্যবস্থা এক অতি কঠিন সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। ইহা বহুব্যয়সাপেক্ষ, সুতরাং ইহার ব্যবস্থা-প্রণয়ন সাধারণ লোকের ক্ষমতার বহির্ভূত। গবর্ণমেণ্ট্ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন কিন্তু ব্যয়বাহুল্যবশতঃ ইহা সম্পূর্ণ হইতে অনেক সময় লাগিবে। সুতরাং বিস্তৃতভাবে জল নিকাশের বন্দোবস্তের কথা ছাড়িয়া দিয়া পল্লীগ্রামবাসীদিগের স্ব স্ব ও সমবেত চেষ্টায় যে উপায়ে গ্রামে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কমিয়া যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটী কথা বলা হইল।

১। বাটীর মধ্যে বা আশে পাশে ডোবা, গর্ত্ত প্রভৃতি থাকিলে দূর হইতে মাটী আনিয়া তাহা বুজাইয়া দিবে—যেন কোন মতে তথায় জল জমিয়া থাকিতে না পারে। পল্লীগ্রামে অনেক সময়ে নূতন বাটী নির্ম্মাণ করিবার জন্য বাটীর নিকট হইতেই মাটী খুঁড়িয়া লওয়া হয় এবং সেই সকল ডোবা কোন কালে বুজান হয় না। এরূপ ব্যবস্থা নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর। ঐ সকল স্থানে জল জমিলেই মশকীরা তথায় ডিম পাড়িবে এবং বাটীর মধ্যে মশার প্রাদুর্ভাব হইবে।

২। জল নিকাশের নালার মধ্যে যদি জল জমিয়া থাকে অথবা বাটীর নিকটে বড় ডোবা বা অপরিস্কৃত পুষ্করিণী থাকে (যাহা মাটী দ্বারা বুজাইবার সম্ভাবনা নাই), তাহা হইলে ঐ সকল স্থানে প্রতি সপ্তাহে একদিন জ্বালানি কেরোসিন্ তৈল ঢালিয়া দিবে; ইহা দ্বারা মশকের ডিম ও শাবক নষ্ট হইয়া যাইবে। কেরোসিন তৈলের সহিত পেষ্টারিন্ (Pesterine) নামক কেরোসিন্ জাতীয় অপর এক প্রকার তরল পদার্থ সমভাবে মিশ্রিত করিয়া জলে ঢালিয়া দিলে মশককুল শীঘ্র বিনষ্ট হয়।

৩। বাটীর মধ্যে উঠানে বা উহার সন্নিকটে ভাঙ্গা হাঁড়ি, গাম্‌লা, পুরাতন টিনের কানেস্তারা, কৌটা ইত্যাদি সঞ্চিত হইয়া থাকিতে দিবে না। এই সকল পাত্রের মধ্যে জল সঞ্চিত হইলে তন্মধ্যে মশকী আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ডিম পাড়ে। এই সকল অব্যবহার্য্য পদার্থ বাটী হইতে বহুদূরে নিক্ষেপ করিবে।

৪। বাটীর মধ্যে অবস্থিত এবং গ্রামের সাধারণ জলপথগুলি যদি "কাঁচা" না হইয়া "পাকা" করিয়া "গাঁথা" হয়, তাহা হইলে উহাদিগকে সর্ব্বদা পরিস্কৃত রাখিতে পারা যায়, সুতরাং তথায় মশকজাতির বসবাসের বা ডিম পাড়িবার সুবিধা হয় না। যে সকল গ্রামে "পাকা" ড্রেনের বন্দোবস্ত আছে,

তথায় মশকের উপদ্রব এবং ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কম দেখিতে পাওয়া যায়।

৫। গ্রামের মধ্যে যে সকল বৃহৎ পুষ্করিণী পানীয় জলের জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহাদিগকে অনেক সময়ে নিতান্ত অপরিস্কৃত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারাও মশকদিগের এক একটী প্রধান আবাসস্থল। এই সকল পুষ্করিণীর মধ্যে কেরোসিন্ ঢালিয়া মশক ধ্বংস করা কোনক্রমে সুবিধা জনক নহে, কারণ জলে কেরোসিন্ ঢালিয়া দিলে উহা এরূপ দুর্গন্ধযুক্ত হয় যে কেহ সহজে উহা পান বা রন্ধন কার্য্যের জন্য ব্যবহার করিতে পারে না। পুনশ্চ পুষ্করিণীর জল কেরোসিন্ মিশ্রিত হইলে উহার মধ্যে যে সকল মৎস্য থাকে, তাহারা মরিয়া যায়। এইজন্য ব্যবহার্য্য পুষ্করিণীর মধ্যে কেরোসিন্ না ঢালিয়া অন্য উপায়ে মশক ধ্বংসের ব্যবস্থা করা উচিত। পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে কতিপয় ক্ষুদ্র জাতীয় মৎস্য মশকের ডিম ও মশক শাবকের পরম শত্রু—দেখিতে পাইলেই উহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া ফেলে। আমেরিকার অন্তঃপাতী বার্বাডোজ (Barbadoes) নামক প্রদেশে একপ্রকার ক্ষুদ্র মৎস্য জন্মে; তাহারা "বার্বাডোজ্ মিলিয়ন্স্" (Millions) নামে পরিচিত। ইহারা মশকেব ডিম ও শাবক নষ্ট করিয়া ঐ স্থান একপ্রকার ম্যালেরিয়া মুক্ত করিয়াছে। সেদিন কলিকাতা মেডিক্যাল্ ক্লবে গভর্ণমেণ্ট ফিসারির সুযোগ্য কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বনোয়ারিলাল চৌধুরী বি এস্ সি মহাশয় এ সম্বন্ধে একটী সুন্দর প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি মশক ধ্বংসের জন্য পুষ্করিণীর মধ্যে কেরোসিন্ ঢালিবার পক্ষপাতী নহেন। তিনি বলেন যে কয়েক জাতীয় মাছ পুষ্করিণীর মধ্যে জন্মাইলে এ বিষয়ে আমরা অধিকতর কৃতকার্য্য হইতে পারিব। এই সকল মৎস্যের মধ্যে "তেচোকো", "পাঁচচোকো", "খলসে", "কই", "চিলুই" প্রভৃতি মৎস্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। "তেচোকো" মাছ অল্পজলে বাস করে, অতি শীঘ্র সংখ্যায় বাড়িয়া যায়, সহজে মরে না এবং পুষ্করিণীর কিনারায় "দামের" মধ্যে (যেখানে মশকীগণ ডিম পাড়ে) থাকিতে ভালবাসে। মশকের ডিম ও শাবক ইহাদিগের প্রধান আহার।

এতদ্ব্যতীত বেঙ্গাচিগণ (Tadpoles) মশকের ডিম ও শাবক ভক্ষণ করিয়া মশক কুল ধ্বংস করিয়া থাকে।

৬। বাটীর মধ্যে বা চতুষ্পার্শ্বে ঝোপ বা জঙ্গল থাকিতে দিবে না। এই সকল স্থানে মশকগণ দিবাভাগে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং সন্ধ্যাব সময়ে বাহির হইয়া লোকের গৃহমধ্যে প্রবেশ করে। ঝোপের মধ্যে অন্যান্য বিষাক্ত প্রাণীও আশ্রয় লাভ করিয়া থাকে, সুতরাং কোন স্থানে ঝোপ দেখিলে তৎক্ষণাৎ উহা পবিষ্কার করিয়া ফেলিবে।

৭। গ্রামের চতুঃপার্শ্বের জমীর ২০০ হাত বাদ দিয়া চাষের কাজ করিবে এবং ৪০০ হাতের মধ্যে ধান জমী রাখিবে না।

৮। গৃহের মধ্যে যে স্থান অন্ধকারময়, যে স্থানে বই, কাগজ, শিশি বোতল প্রভৃতি রাখা হয় অথচ উহাদিগকে সর্ব্বদা স্থানান্তরিত করা হয় না, যেখানে কাপড় জামা টাঙ্গান

থাকে, তাহার আশেপাশেই মশকদিগকে দিনের বেলায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে দেখা যায়। গৃহের মধ্যে প্রচুর আলোক ও বায়ু প্রবেশ করিলে এবং গৃহের সর্ব্বস্থানের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপর দৃষ্টি থাকিলে মশকেরা গৃহের মধ্যে বাস করিবার সুবিধা পায় না।

৯। মশকেরা ধূনা, লোবাণ, গন্ধক, কর্পূর, নিমপাতা, আকরকরা (Pyrethrum), ঘুঁটে প্রভৃতির ধূম এবং টার্পিন্, কেরোসিন্, ফর্ম্মালিন্, মেন্থল্ প্রভৃতি পদার্থের গন্ধ সহ্য করিতে পারে না। সন্ধ্যার পর ঘর রীতিমত বন্ধ করিয়া তন্মধ্যে এই সকল পদার্থের ধূম উৎপাদন করিলে গৃহে মশকের উপদ্রব যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়া যায়।

১০। এনোফিলিস্ নামক যে জাতীয় মশক, দংশন দ্বারা ম্যালেরিয়া রোগের বীজ বহন করে, তাহারা দিবাভাগে উপদ্রব করে না, ঝোপের মধ্যে অথবা গৃহাভ্যন্তরস্থ অন্ধকারময় স্থানে লুকাইয়া থাকে। উহারা সন্ধ্যার সময় বাহির হইয়া উপদ্রব করিয়া থাকে। এইজন্য ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত স্থানে দিবাভাগে অবস্থান করিলে নবাগত ব্যক্তির কোন অনিষ্ট হইতে দেখা যায় না, কিন্তু রাত্রি কাটাইলেই ঐ রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা।

১১। পল্লীগ্রামে রাত্রিকালে মশারি না খাটাইয়া শয়ন করা কদাচ উচিত নহে। ডাক্তার রস্ বলেন যে যদি পল্লীগ্রামের প্রত্যেক ব্যক্তি মশারির মধ্যে শয়ন করে, তাহা হইলে ম্যালেরিয়া রোগের আক্রমণ শতকরা ৯০ ভাগ কমিয়া যাইতে পারে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কেবল এনোফিলিস্ জাতীয় মশক থাকিলেই ম্যালেরিয়া রোগ হয় না; মশকের সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়া-পীড়িত ব্যক্তির অবস্থানও অবশ্য প্রয়োজনীয়। মশক দংশন দ্বারা উক্ত রোগীর রক্ত হইতে ম্যালেরিয়ার বীজ সংগ্রহ করিয়া সুস্থ ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করাইলে পর ঐ রোগ উৎপন্ন হয়, সুতরাং রোগীকে সমস্ত রাত্রি মশারির মধ্যে রাখিয়া দিলে মশকেরা রোগীর শরীর হইতে সুস্থ ব্যক্তির শরীরে রোগ সংক্রমণ করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হয় না। ম্যালেরিয়াপ্রপীড়িত স্থানে ঘরের মাপের মত বড় মশারি প্রস্তুত করিয়া সন্ধ্যার সময় হইতে তন্মধ্যে পরিবারস্থ সকলে অবস্থান করিলে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে অনেক পরিমাণে রক্ষা পাইতে পারা যায়। ঘরজোড়া মশারি হইলে বিছানা না পাতিয়া ঘরের মেঝেয় বসিয়া মশারির মধ্যে আবশ্যকীয় গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারা যায়। একসময়ে ইতালির প্রদেশ-বিশেষে ও আমেরিকার অন্তঃপাতী পানামা নামক স্থানে ম্যালেরিয়ার ভয়ঙ্কর প্রাদুর্ভাব ছিল; নূতন লোক সেখানে যাইলে ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়া দুই তিন বৎসরের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইত। লোকে মশকের দংশন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সূক্ষ্ম তারের জালের গৃহনির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বাস ও সমস্ত কাজকর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিল। এই সকল গৃহের মধ্যে একটীও মশক প্রবেশ করিতে সমর্থ হইত না। যাহারা এই সকল গৃহের মধ্যে বাস করিত, তাহারা ম্যালেরিয়া রোগের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিত। এরূপ গৃহ-নির্ম্মাণ অতিশয়

ব্যয়সাপেক্ষ; আমাদিগের দেশের সর্ব্ব-সাধারণেব মধ্যে ইহার প্রচলন অসম্ভব। তবে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত স্থানের সঙ্গতিপন্ন লোকেরা তারের জালের দুই একটী বড় ঘব প্রস্তুত করিয়া ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবের সময় রাত্রিকালে উহার মধ্যে বাস করিতে পারেন। গৃহস্থ লোকের বাটীর সমস্ত দরজা জানালায় সূক্ষ্ম মল্‌মল্ কাপড়ের পর্দ্দা বা চিক টাঙ্গাইয়া দিলে রাত্রিকালে বায়ুসঞ্চালনের ব্যাঘাত হইবে না, অথচ মশকের উপদ্রব হইতে অনেকাংশে অব্যাহতি লাভ করিতে পারা যাইবে। সাধারণ লোকের পক্ষে ম্যালেরিয়ার কয়েক মাস বড় মশারির ভিতর সন্ধ্যা হইতে সমস্ত রাত্রি থাকিবার বন্দোবস্ত করাই অল্পব্যয়সাপেক্ষ ও সহজসাধ্য। ইহা বিস্তৃত-ভাবে পল্লীগ্রামে প্রচলিত হইলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অনেক কমিয়া যাইবে।

১২। মশকেরা প্রায়ই হস্ত বা পদদ্বয়ে দংশন করিয়া থাকে; এইজন্য ম্যালেরিয়াব সময়ে এই সকল স্থান আবৃত করিয়া রাখিলে উহাদিগের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। যাঁহারা সঙ্গতিপন্ন, যাঁহাদিগকে নগ্নপদে কোন কার্য্য করিতে হয় না, তাঁহাদিগের রাত্রিকালে মোটা গরম মোজা পায়ে দেওয়া থাকিলে ভাল হয়। অনেক সময়ে ইউকালিপ্টস্ তৈল (Eucalyptus Oil) অথবা নেবুর তৈলের (Oil of Lemons) ন্যায় কোন সুগন্ধি তৈল পায়ে হাতে মাখাইয়া রাখিলে মশা কাছে আসে না। মশকেরা কেরোসিন্ তৈলের গন্ধ সহ্য করিতে পারে না। সামান্য অবস্থার লোকে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবের সময় গৃহমধ্যে কেরোসিন্ ছড়াইয়া দিলে অথবা সন্ধ্যার পর হাতে পায়ে কেরোসিন্ মালিস করিলে মশকের দংশন হইতে অব্যাহতি এবং জ্বরের আক্রমণ হইতে কতক পরিমাণে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে। কেহ কেহ বলেন যে হাতে পায়ে সরিষার তৈল মাখিলে মশকের উপদ্রব অধিক সহ্য করিতে হয় না।

১৩। বাটীর মধ্যে মশক যেখানেই থাকুক না কেন, দেখিতে পাইলেই কষ্ট করিয়া উহাকে মারিয়া ফেলিবে।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এনোফিলিস্ জাতীয় মশক ম্যালেরিয়া বীজের বাহন হইলেও যদি একটীও ম্যালেরিয়া রোগী না থাকে, তাহা হইলে সহস্র মশক বিদ্যমান থাকিলেও ম্যালেরিয়ার বিস্তার সংঘটিত হইতে পারে না। সুতরাং মশকের অস্তিত্বের ন্যায় ম্যালেরিয়া রোগগ্রস্ত রোগীর বিদ্যমানতাও এই রোগের বিস্তারের অন্যতম কারণ। রোগীর রক্তের মধ্যে যে ম্যালেরিয়ার বীজ অবস্থিতি করে, যদি কোন উপায়ে তাহার ধ্বংস সাধন করিতে পারা যায়, তাহা হইলে মশকের দ্বারা এই রোগের বিস্তৃতি ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না, কারণ যদি রোগের বীজেরই অভাব হয়, তাহা হইলে মশকের দংশন কষ্টকর হইলেও উহাদ্বারা রোগোৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে না। কুইনিনের ন্যায় ম্যালেরিয়ার বীজ ধ্বংস করিবার শ্রেষ্ঠ ঔষধ আর নাই। ম্যালেরিয়া রোগের বীজ রক্তের লোহিত কণিকার মধ্যে অবস্থিতি করে। যখন উহা পূর্ণ-বিকাশ প্রাপ্ত হয়, তখন উহা বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া বংশবৃদ্ধি সাধন করে। এই সকল ক্ষুদ্র বীজাণু (spores) রক্তকণিকা হইতে বহির্গত হইয়া

রক্তস্রোতের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে রোগীর কম্পজ্বর উপস্থিত হয়। এইরূপ বংশবৃদ্ধি হইতে বীজ বিশেষে ২৪, ৪৮ বা ৭২ ঘণ্টা সময় লাগে; এইজন্য আমরা ১ দিন, ২ দিন বা ৩ দিন অন্তর পালা জ্বরের আক্রমণ দেখিতে পাই। যথারীতি কুইনিন্ সেবন করিলে এই সকল বীজ এরূপ নির্জীব হইয়া পড়ে যে উহাদের বংশবৃদ্ধি স্থগিত থাকে, সুতরাং কম্পজ্বর বন্ধ হইয়া যায়। কুইনিন্ অধিক দিন সেবন করিলে ম্যালেরিয়া রোগের বীজ যে একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, কেবল তাহাই নহে, উহা দ্বারা সুস্থ ব্যক্তিও ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়া থাকে। সময়ে সময়ে ম্যালেরিয়া জ্বর কুইনিন্ সেবনেও বিরামলাভ করিতে দেখা যায় না, এইজন্য কেহ কেহ বলেন যে কুইনিন্ দ্বারা উপকার হওয়া দূরে থাকুক, অনেক স্থলে অপকার সাধিত হয়। এ বিশ্বাসের কোন ভিত্তি নাই। কুইনিন্ ম্যালেরিয়া জ্বরের অমোঘ ঔষধ। যে স্থলে কুইনিন্ ব্যবহার করিয়া উপকার দর্শে না, সে স্থলে, হয় কুইনিন্ যথারীতি সেবিত হয় নাই, অথবা উক্ত জ্বর ম্যালেরিয়াঘটিত নহে।

সম্প্রতি সিমলা শৈলে যে ম্যালেরিয়া কমিসন্ সম্মিলিত হইয়াছিল, তাহার মতে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবের সময়ে প্রত্যেক সুস্থব্যক্তির প্রত্যহ অপরাহ্নে ৫ গ্রেণ কুইনিন্ সেবন করা কর্ত্তব্য। পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, সুস্থ ব্যক্তি বহুদিন কুইনিন্ এই মাত্রায় ব্যবহার করিলেও কোন অনিষ্ট সংঘটিত হয় না। (ক্রমশঃ)

শ্রীচুনীলাল বসু।

বৈজ্ঞানিক জীবনী

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নিউটন

যেমন শিব নটকুলচূড়ামণি, যেমন পর্ব্বতের মধ্যে হিমাদ্রি শ্রেষ্ঠ, যেমন তারকাসুন্দরীগণের মধ্যে রোহিণী বরণীয়া, যেমন "কবিষু কালিদাসঃ শ্রেষ্ঠঃ" তেমনই বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে নিউটন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শুধু ইংরাজ কেন, পৃথিবীর যাবতীয় সভ্য জাতি একবাক্যে নিউটনকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের আসন প্রদান করিয়াছেন। অথচ এই আত্মাভিমান-শূন্য কর্ম্মবীর মৃত্যুর পূর্ব্বে বলিয়া গিয়াছিলেন "আমি জানি না জগৎ আমার কার্য্যাবলী সম্বন্ধে কি মনে করিবে; কিন্তু আমার নিজের মনে হয় যে আমি জ্ঞানসমুদ্রের তীরে বসিয়া ক্ষুদ্র বালকের ন্যায় প্রস্তর খণ্ড কুড়াইয়াছি মাত্র, আর বিশাল জ্ঞানসমুদ্র সমস্তই অনাবিস্কৃতভাবে আমার সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে।"

১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী লিনকনসায়ারের মধ্যস্থ উলস্থর্প নামক গ্রামে নিউটনের জন্ম হয়। যিনি এককালে বিশ্বের 'আকর্ষণ' আবিষ্কার করিয়া যশস্বী হইবেন, তিনি ভূমিষ্ঠ হইবার কালে এত ক্ষুদ্রকায় ছিলেন যে তাঁহার মাতা বলিয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার সন্তানকে একটা

বোতলের মধ্যে অনায়াসে রাখিতে পারিতেন। ভূমিষ্ঠ শিশু এতই দুর্ব্বল ছিল যে দুইটি স্ত্রীলোক তাহার জন্য ভিন্ন গ্রামে ঔষধ আনিতে যাইবার কালে মনে করে নাই যে তাহারা ফিরিয়া আসিয়া শিশুটিকে জীবন্ত দেখিতে পাইবে। যাহা হউক, বিধাতা পৃথিবীর হিতের জন্য যাহাকে সৃজন করিয়াছিলেন, তাহাকে তিনিই বাঁচাইয়া রাখিলেন।

নিউটনের জন্মের পূর্ব্বেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার মাতা পুনরায় বিবাহ করিলে তাঁহার মাতামহী তাঁহাকে লালনপালন করেন। বাল্যকালে নিউটন নিজ গ্রামের সন্নিকটস্থ এক স্কুলে পড়িতেন। লেখাপড়ায় বালক নিউটনের বিশেষ আগ্রহ দেখা যাইত না, এবং ক্লাশে তিনি সকলের নীচে থাকিতেন। তবে অন্য বালকেরা যখন খেলা করিয়া বেড়াইত তখন নিউটন স্বহস্তে ছোট ছোট খেলনা প্রস্তুত করিয়া তাহা লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। কখনও জল ঘড়ি প্রস্তুত হইতেছে, কখনও একটা ইঁদুরকে ধরিয়া তাহার দ্বারা একটা ছোট কল চালান হইতেছে, আবার কখনও কখনও একটা ঘুড়ির লেজে একটা কাগজের লণ্ঠন বাঁধিয়া দেওয়া হইত, যেন গ্রামের লোকেরা দিনের বেলায় তারা দেখিতে পায়! এইরূপ ক্রীড়াকৌতুকে তাঁহার বেশী আগ্রহ দেখা যাইত। একদিন উপর ক্লাসের একটি বেশী বয়সের ছেলে তাঁহাকে একটা লাথি মারে; নিউটন তাহার ধৃষ্টতা সহ্য করিতে না পারিয়া তাহার সহিত মারামারি করেন। এই মারামারিতে তাঁহারই জয় হয়। মারামারিতে জয় লাভ করার পর হইতে লেখাপড়ায়ও অপর বালকদিগকে জয় করিবার জন্য তাঁহাকে সচেষ্ট দেখা যায়। ইহার পর হইতে নিউটন স্কুলের একজন ভাল ছেলে বলিয়া পরিগণিত হইলেন। যখন তাঁহার বয়স পনের বৎসর তখন তাঁহার মাতা পুনরায় বিধবা হইয়া উলস্থর্পে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া আনেন এবং চাসবাসের তত্ত্বাবধান কার্য্যে তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়া দেন। কিন্তু শীঘ্রই দেখা গেল যে চাসবাসের তত্ত্বাবধান তাঁহার দ্বারা ভালরূপ হইতেছে না। প্রায়ই দেখা যাইত যে তিনি চাসবাসের তত্ত্বাবধান ফেলিয়া কোন বেড়ার বা ঝোপের ধারে বসিয়া বসিয়া অঙ্ক কসিতেছেন বা ছোট ছোট কল প্রস্তুত করিতেছেন। এই ব্যাপার দেখিয়া তাঁহার এক মামা তাঁহার মাকে বলিয়া তাঁহাকে পুনরায় স্কুলে পাঠাইয়া দিলেন এবং সেখান হইতে শীঘ্রই তিনি বিখ্যাত কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ট্রিনিটী কলেজে প্রেরিত হইলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ করার পর হইতেই তাঁহার অন্তর্নিহিত ধীশক্তি বিকাশ লাভ করিতে থাকে। তিনি অনন্যমনে অঙ্কশাস্ত্রের চর্চ্চা করিতে লাগিলেন এবং শীঘ্রই সতীর্থ যুবকগণকে ঐ বিদ্যায় ছাড়াইয়া গেলেন। কলেজের পঠদ্দশাতেই তিনি অঙ্কশাস্ত্র সম্বন্ধে অনেকগুলি মৌলিক গবেষণা করিয়াছিলেন। একুশ বাইশ বৎসর বয়ক্রমকালে তিনি দ্বিপদ-সিদ্ধান্ত (binomial theorem) আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন এবং শীঘ্রই শূন্যবৃদ্ধি-সিদ্ধান্ত

(theory of fluxions) আবিষ্কার করিয়া ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস্ (Differential calculus) নামক গণিতবিদ্যাব ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এই সকল আবিষ্কাব কবিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন, উহা প্রকাশ কবিবার কল্পনা তাঁহার মনে আদৌ উদিত হয় নাই। ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বি, এ পাশ করিয়া একটি বৃত্তি প্রাপ্ত হন এবং তাহার পর বৎসব কেম্ব্রিজে প্লেগ হওয়াতে তিনি নিজ গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

বিশ্বাকর্ষণ আবিষ্কার

কেম্ব্রিজ হইতে প্রত্যাগমন করিবার পূর্ব্ব হইতেই নিউটন জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। জ্যোতিষেব একটা প্রশ্ন তাঁহাকে বড়ই চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি সর্ব্বদাই মনে মনে ভাবিতেন "আচ্ছা! চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে ঘোবে কেন? গ্রহ উপগ্রহগণই বা সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়ায় কেন? উহারা সোজা চলিয়া যায় না কেন? বৃত্তাকারে ঘুরিয়া বেড়ায় কেন? একটি গোল মার্ব্বেলকে একটি সমতল ক্ষেত্রের উপর গড়াইয়া দিলে উহা বাতাস বা ক্ষেত্রের ঘর্ষণজনিত কোনও প্রকার বাধা প্রাপ্ত না হইলে বরাবর সোজাই চলিতে থাকিবে। তবে গ্রহ উপগ্রহ সকল সোজা চলিয়া যায় না কেন? কোন্ শক্তি উহাদিগকে ঘুরাইতে থাকে?" তিনি ইহার কারণ কিছুতেই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

এইরূপ মানসিক অবস্থা লইয়া প্লেগের বৎসরে তিনি স্বগ্রামে চলিয়া গেলেন। সেখানেও সেই চিন্তা। একদিন বাগানে বসিয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে সম্মুখস্থ একটি বৃক্ষ হইতে একটি পক্ক আপেল ফল মাটিতে সশব্দে পড়িয়া গেল। তিনি উহা লক্ষ্য কবিলেন, তখনই মনে মনে প্রশ্ন উঠিল, আপেল পড়ে কেন? মনে মনে তখনই উহাব জবাবও মিলিল;—"পৃথিবী আপেলকে আকর্ষণ করে বলিয়াই আপেল মাটিতে পড়ে।" যেমন জলমগ্ন ব্যক্তি সম্মুখস্থ কাষ্ঠখণ্ড দর্শনে অথবা অন্ধকার গৃহমধ্যস্থ বন্দী অপ্রত্যাশিত ক্ষীণ জ্যোৎস্না দর্শনে যেরূপ পুলকিত হয়, নিউটনও এই অপ্রত্যাশিত মানসিক উত্তর পাইয়া সেইরূপ আনন্দিত হইলেন। পৃথিবীর আকর্ষণ যে ইতিপূর্ব্বে আবিষ্কৃত হয় নাই এমন নহে। নিউটনের ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে ভাবতের বৈজ্ঞানিকগনের উজ্জ্বল ভাস্কর ভাস্করাচার্য্য বলিয়া গিয়াছেন :—

আকৃষ্টশক্তিশ্চ মহী তয়া যৎ খস্থং গুরু
স্বাভিমুখং স্বশক্ত্যা।
আকৃষ্যতে তৎ পততীব ভাতি সমে সমন্তাৎ ক্ক
পতত্বিয়ং মে॥

অর্থাৎ "পৃথিবীর আকর্ষণ করিবার শক্তি আছে; সেই শক্তির বলে শূন্যমার্গে প্রক্ষিপ্ত গুরু বস্তু পুনরায় পৃথিবী অভিমুখে আকৃষ্ট হয় বলিয়াই বস্তু সকল পতনশীল বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, আর পৃথিবীর চতুর্দ্দিকের আকাশ সমান হওয়াতে পৃথিবী আর কোথায় পড়িবে?" অতএব পৃথিবীর আকর্ষণ প্রাচীন কালে ভারতে আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়া ভারতবাসী গৌরব করিতে পারেন।

নিউটন এই পৃথিবীর আকর্ষণকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্থাপিত করিয়া উহা বিশ্বের আকর্ষণের অঙ্গীভূত বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং এই বিশ্বাকর্ষণ সম্বন্ধে পরিমাণাত্মক নিয়মও (quantitative law) আবিষ্কার করিয়া সমগ্র জ্যোতিষশাস্ত্রকে এক অভিনব সূত্রে গ্রথিত করিয়াছিলেন।

নিউটন ভাবিলেন, যদি পৃথিবী ক্ষুদ্র আপেল ফলটিকে বা উর্দ্ধে প্রক্ষিপ্ত বস্তুমাত্রকেই টানিতে পাবে তবে উহা পৃথিবী অপেক্ষা ক্ষুদ্র, চন্দ্রকে আকর্ষণ কবিবে না কেন? পৃথিবী যদি চন্দ্রকে আকর্ষণ কবে তাহা হইলে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম জ্যোতিষ্ক সূর্য্য, পৃথিবী ও গ্রহনক্ষত্রবর্গকে আকর্ষণ কবিবে না কেন? নিউটন ক্রমশঃ স্থির কবিলেন যে এই বিশ্বাকর্ষণই জ্যোতিষ্কমণ্ডলীকে শূন্যমার্গে বৃত্তাকারে ঘুরাইতেছে। পাঠকবর্গকে নিউটনের সিদ্ধান্ত সহজেই বুঝান যাইতে পারে। এক খণ্ড দড়িতে একটা ঢিল বাঁধিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে যদি ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ঢিলটা সোজা চলিয়া যাইবে; কিন্তু ঘুবাইবার সময় হস্তসংলগ্ন দড়ির আকর্ষণে উহা বৃত্তাকারে ঘুবিতে থাকিবে। প্রতি মুহূর্ত্তে ঢিলটির উপর তুইটি শক্তি ক্রিয়া করিতেছে—একটি শক্তির দ্বারা উহা সোজা চলিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত ও অপবটি অর্থাৎ হস্তের আকর্ষণ উহার সোজা গতিকে প্রতিনিয়ত ফিরাইয়া দিতেছে। এইরূপে ঢিলটি হস্তের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াও হস্তেব উপরে পড়িতেছে না, বৃত্তাকারে ঘুরিতেছে। সেইরূপ চন্দ্র কোন অজ্ঞাত শক্তির প্রভাবে গতিশীল; উহা পৃথিবী দ্বারা আকৃষ্ট না হইলে বরাবর সোজা চলিয় যাইত; কিন্তু পৃথিবীর দ্বারা আকৃষ্ট হওয়াতে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে। সেইরূপ এই আকর্ষণের জন্য সূর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া উহাকে কেন্দ্র করিয়া অপর জ্যোতিষ্কমণ্ডলী উহার চারিদিকে ঘুরিতেছে।

নিউটন

এইরূপে নিউটন মানসপটে ভ্রাম্যমান অসংখ্য জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতির রহস্যময় চিত্র অঙ্কিত করিতে লাগিলেন।

তিনি এই আকর্ষণ-শক্তি আবিষ্কার করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না; তিনি আকর্ষণের পরিমাণ জানিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। বিখ্যাত জ্যোতিষী কেপ্‌লার নিউটনের পূর্ব্বে আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া দীর্ঘবৃত্তাকারে (ellipse) চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে। এইরূপ ভ্রমণকালে গ্রহগণ সূর্য্যের নিকটস্থ হইলে বা সূর্য্য হইতে দূরে অবস্থিতি করিলে আকর্ষণের কিরূপ বিভিন্নতা হয় তাহা নিউটন গণনা করিতে লাগিলেন। এইরূপ গণনার ফলে দেখিতে পাইলেন যে সূর্য্য হইতে গ্রহগণ যতই দূরে যায়, সূর্য্যের আকর্ষণ ততই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে কমিতে থাকে। তিনি স্থির করিলেন যে এই আকর্ষণ দূরত্বের বর্গফলের বিপরীত ভাবে (inversely as the square root of the distance) কমিতে থাকে; যথা—দূরত্ব যদি দ্বিগুণ হয় আকর্ষণ চতুর্থাংশ হইয়া যাইবে, যদি তিনগুণ হয়, আকর্ষণ নবমাংশ হইবে ইত্যাদি।

বিশ্বের আকর্ষণ সম্বন্ধে এই পরিমাণাত্মক নিয়ম আবিষ্কার করিয়া তিনি তাঁহার সিদ্ধান্ত সঠিক কি না তাহা সপ্রমাণ করিবার জন্য চন্দ্রের গতি পৃথিবীর আকর্ষণের দ্বারা কিরূপে নিয়ন্ত্রিত হয় তাহার গণনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই গণনাতে পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে পৃথিবীর পরিধি পর্য্যন্ত দূরত্ব জানা আবশ্যক। কিন্তু তৎকালে পৃথিবীর পরিধি বা ব্যাস সঠিক জানা ছিল না। যাহা জানা ছিল তাহা লইয়া তিনি গণনা করিয়া দেখিলেন যে তাঁহার গণনা ও পরীক্ষার দ্বারা প্রাপ্ত চন্দ্রের গতি মিলিতেছে না;—চন্দ্রের পরীক্ষিত গতি তাঁহার গণনা অপেক্ষা কিছু বেশী হইয়াছে। তিনি এই অসামঞ্জস্য মিলাইতে না পারিয়া, কাগজ পত্র সমস্ত দেরাজের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিলেন। তাহার পর অনেক বৎসর কাটিয়া গেল। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি তাঁহার আবিষ্কার সম্বন্ধে কোনও প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন নাই বা কাহাকেও সে সম্বন্ধে কোন কথাও বলেন নাই। ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে একদিন রয়েল সোসাইটির অধিবেশনে পিকার্ড নামক একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিকের একটি প্রবন্ধ পঠিত হয়। এই প্রবন্ধে তিনি সঠিকভাবে পৃথিবীর পরিধি নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নির্দ্ধারিত পরিধি প্রচলিত মাপ হইতে কিছু বেশী হইয়াছিল। নিউটন এই সংবাদ প্রথমে পান নাই। কয়েক বৎসর পরে এই সংবাদ পাইয়াই তিনি বাটী গিয়া পুরাতন কাগজপত্র বাহির করিয়া আবার গণনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এইবার ঠিক মিলিয়া গেল। কথিত আছে, যে যখন তিনি অঙ্ক কসিতে কসিতে দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার গণনা মিলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে তখন তিনি আনন্দে এমনই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে গণনার শেষ ফল তিনি একজন বন্ধুকে কসিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এইরূপে তাঁহার সুদীর্ঘকালব্যাপী সাধনা সফল হইয়াছিল;—তিনি অনন্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতির কারণ সঠিকরূপে আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

“প্রিন্সিপিয়া” গ্রন্থ

ইহার পর হইতে তিনি কয়েক বৎসর ধরিয়া অনন্যমনে বিশ্বাকর্ষণ-সম্বন্ধে চিন্তা করিতে

লাগিলেন ; এবং তাঁহার গবেষণার ফল জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ "প্রিন্সিপিয়া" নামক পুস্তকে সন্নিবেশিত করিতে লাগিলেন। তিনি এই সময় চিন্তায় এমনই নিমগ্ন থাকিতেন যে স্নানাহারের কথা অনেক দিন ভুলিয়াই যাইতেন। একদিন তাঁহার এক বন্ধু—ডাক্তার ষ্টকূলে তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়া দেখিতে পাইলেন যে একটি টেবিলে নিউটনের জন্য খাবার ঢাকা দেওয়া রহিয়াছে ; নিউটন কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে ভোজন সমাপ্ত করিয়া মুরগীর হাড়গুলি প্লেটে রাখিয়া দিয়া যেমন ঢাকা ছিল সেইরূপ ঢাকা দিয়া রাখিয়া দিলেন ; তার পর অনেকক্ষণ পরে বন্ধুর সহিত আলাপ করিতে করিতে আবার আহার করিতে বসিয়া প্লেট খুলিয়া বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিলেন—"অ্যাঃ! আমি মনে করিয়াছিলাম যে আমি এখনও খাই নাই বুঝি, এখন দেখিতেছি আমার খাওয়া হইয়া গিয়াছে।" এইরূপ একাগ্রতা, এইরূপ অধ্যবসায় না থাকিলে "প্রিন্সিপিয়ার" ন্যায় অমূল্য গ্রন্থ কখনও রচিত হইতে পারিত না। নবাবিষ্কৃত বিশ্বাকর্ষণের সিদ্ধান্ত হইতে বহু নূতন তথ্য অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্যে তিনি আবিষ্কার করিয়া এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। ইংরাজের পরম দুর্ভাগ্য যে জগতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ ইংরাজ কর্তৃক লিখিত হইলেও ইংরাজি ভাষায় লিখিত হয় নাই—তখনকার প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী ল্যাটিনভাষায় লিখিত হইয়াছিল। যখন এই মহাগ্রন্থের প্রথমভাগ সমাপ্ত হইল তখনও উহা প্রকাশ করিবার কল্পনা নিউটনের মনোমধ্যে উদিত হয় নাই। তিনি প্রকৃত জ্ঞানেরই উপাসক ছিলেন, নামের উপাসক ছিলেন না। তাই তিনি লিখিত পাণ্ডুলিপিগুলি একটা দেরাজে বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিলেন ; ইচ্ছা ছিল যে তাঁহার মৃত্যুর পর কেহ উহা প্রকাশ করিবে। কিন্তু ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ এডমণ্ড হ্যালে প্রিন্সিপিয়ার পাণ্ডুলিপি নিউটনের নিকট হইতে সংগ্রহ করেন এবং ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে নিজব্যয়ে উহা মুদ্রিত করেন। যখন উহা প্রকাশিত হইয়াছিল তখন বৈজ্ঞানিক সমাজে দশ বারো জন লোকও উহা সম্যক বুঝিতে পারিয়াছিলেন কিনা সন্দেহের বিষয়। ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে প্রিন্সিপিয়ার এক নূতন সংস্করণ বাহির হয়, এই সংস্করণ আজ পর্য্যন্ত বিদ্যমান। এস্থলে এই মহাগ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলির সম্যক পরিচয় দেওয়া অসম্ভব, সেইজন্য নিম্নে গুটিকতক বিষয়ের চুম্বকমাত্র প্রদত্ত হইল।

বিশ্বাকর্ষণের নিয়ম। জড়জগতের প্রত্যেক অণু পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। এই আকর্ষণ-শক্তি প্রত্যেক অণুর ভার অনুযায়ী ও দূরত্বের বর্গফলের বিপরীতানুযায়ী। (varies directly as the mass and inversely as the square of the distance)

গতি নিয়মাবলী। (Laws of the motion)—গেলিলিও গতিশীল বস্তু সম্বন্ধে যে তিনটি নিয়ম পরীক্ষার দ্বারা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, নিউটন সেগুলি বিশদভাবে বর্ণনা করেন এবং তাহাদের বিশদ ব্যাখ্যা দেন। তিনি এই সকল

নিয়মের সাহায্যে পতনশীল দ্রব্যের গতির নিয়ম গণনা করেন এবং তাহাদের পথের স্বরূপও নির্ণয় করেন।

কেপলারের আবিষ্কৃত নিয়মাবলী।—কেপলার জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতি সম্বন্ধে যে তিনটি নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছিলেন নিউটন সেইগুলির বিশদ ব্যাখ্যা করেন এবং তাহা হইতে বিশ্বাকর্ষণের দূরত্বমূলক নিয়ম ও অন্যান্য কয়েকটি নিয়ম আবিষ্কার করেন।

দ্রব্যের ওজন ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর আপেক্ষিক গুরুত্ব। তিনি নির্দ্ধারণ করেন যে বিশ্বাকর্ষণই দ্রব্যসমূহের ওজনের কারণ এবং সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি পৃথিবী অপেক্ষা কতগুণ গুরু বা লঘু তাহাও তিনি নির্ণয় করেন, যথা চন্দ্র পৃথিবী অপেক্ষা প্রায় তিরাশি গুণ লঘু এবং সূর্য্য ৩১৬০০০ গুণ ভারী।

জোয়ার ভাটার কারণ।—তিনি দেখাইয়াছেন যে চন্দ্র ও সূর্য্যের আকর্ষণের জন্যই সমুদ্রে জোয়ার ভাটা খেলে; এবং জোয়ার ভাটার পরিমাণও তিনি গণনা করিয়াছিলেন।

পৃথিবীর আকার।— তিনি কেবল মাত্র গণনার দ্বারা সপ্রমাণ করেন যে পৃথিবী ঠিক গোলাকার নহে, উত্তর দক্ষিণে একটু চাপা এবং কতটা চাপা তাহাও সঠিক নির্ণয় করেন। তিনি দেখাইলেন যে ভূমধ্য রেখা-ব্যাস মেরু-রেখা-ব্যাস অপেক্ষা ২৮ মাইল বড়।

গ্রহগণের পরস্পর আকর্ষণ জনিত তাহাদের গতির বিকৃতি।—তিনি দেখিলেন যে প্রত্যেক গ্রহ কেবল সূর্য্যের দ্বারা আকৃষ্ট হয় না, অন্যান্য গ্রহের দ্বারাও হইয়া থাকে, সেই জন্য উহাদের গতির বিবিধ বিকৃতি সাধিত হইয়া থাকে। তিনি এই সকল ব্যাপারের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেন ও তাহাদের পরিমাণও নির্দ্ধারণ করেন।

ধূমকেতু।— তিনি দেখাইলেন যে অনিশ্চিত ধূমকেতুও বিশ্বাকর্ষণের অধীন এবং তাহারা পরবলয় (parabola) আকারে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া থাকে। তাহাদের পুনরাগমনের কালও গণনা করা যাইতে পারে।

উপরোক্ত এই সকল তথ্য ভিন্ন বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্যোতির্ষিক ব্যাপারের ব্যাখ্যা ও গণনা এই মহাগ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তিনি গ্রন্থের শেষভাগে এই অনন্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি ও গতির অনন্ত সৌন্দর্য্য মানসপটে নিরীক্ষণ করিয়া ভক্তিনম্র মস্তকে জগতস্রষ্টার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া বিদায়গ্রহণ করিয়াছেন। পাঠকগণকে বুঝাইতে হইবে না যে এই বিশ্বাকর্ষণ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিষশাস্ত্র এক সম্পূর্ণ অভিনব শাস্ত্রে পরিণত হইয়াছে। এখন আর গ্রহজ্যোতিষ্কবর্গ মানবনেত্রের সম্মুখে লক্ষ্যহীন বিচ্ছিন্নভাবে ঘুরিতেছে না, উহারা পরস্পরের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া একটি সম্পূর্ণ সমষ্টির অঙ্গ প্রত্যঙ্গরূপে প্রতীয়মান হইতেছে।

বিশ্বাকর্ষণ ও প্রিন্সিপিয়া গ্রন্থের আলোচনা করিতে গিয়া নিউটনের জীবন ঘটিত ঘটনাবলীর উল্লেখ করিবার অবসর পাই নাই। আমরা ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে প্লেগের বৎসরে তাঁহাকে স্বগ্রামের বাটীর বাগানে

বসিয়া বৃক্ষ-পতিত আপেল সম্বন্ধে চিন্তা করিতে দেখিয়া আসিয়াছি। ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে তিনি যে কলেজে পড়িতেন সেই কলেজের ফেলো নির্ব্বাচিত হন এবং দুই বৎসর পরে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত লিউকেশিয়ান-অধ্যাপক-পদে ডাক্তার ব্যারোর স্থানে নিযুক্ত হন। ডাক্তার ব্যারো অবসর গ্রহণ করিবার সময়, অঙ্কশাস্ত্রে নিউটনের অসামান্য পারদর্শিতা দেখিয়া, নিজেই তাঁহার নিয়োগের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। এইরূপে নিউটন মাত্র ছাব্বিশ বৎসর বয়সে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হন। ক্রমশঃ তাহার যশ পরিব্যাপ্ত হইতে থাকিলে ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি বিখ্যাত রয়েল সোসাইটির সভ্য নির্ব্বাচিত হন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রিন্সিপিয়া গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইহার পাঁচ বৎসর পরে তিনি পার্লামেণ্ট মহাসভার একজন সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হন এবং ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে টাঁকশালের কর্ত্তৃত্বপদ প্রাপ্ত হন। ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি রয়েল সোসাইটীর সভাপতি নির্ব্বাচিত হন এবং যাবজ্জীবন তিনি ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

সূর্য্যালোক বিশ্লেষণ
(Dispersion of sunlight)

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ১৬৬৬ সাল হইতে ১৬৭২ বা তাহার কিছুকাল পর পর্য্যন্ত নিউটনের বিশ্বাকর্ষণ সম্বন্ধে গবেষণা বন্ধ ছিল। কিন্তু তাই বলিয়া এই কয় বৎসর তিনি যে চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন তাহা নহে। ঐ সময় তিনি আলোকশাস্ত্রে (optics) মনোবিবেশ করিয়াছিলেন এবং আলোক সম্বন্ধে বহু গবেষণা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন যে, যে বিষয়ে গবেষণা করিতে হইবে সেই বিষয়ে একেবারে তন্ময়মনা হইতে না পারিলে আশানুরূপ ফল প্রাপ্তি ঘটে না। তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ একাগ্রতা সহকারে আলোকশাস্ত্রের কয়েকটি আবিষ্কার লইয়া এই কয় বৎসর যাপন করিয়াছিলেন। রামধনুর বিচিত্র বর্ণ দেখিয়াছেন ত? কিন্তু ঐ বিচিত্র বর্ণ কেমন করিয়া হয়? সপ্তদশ খৃষ্টাব্দে এনটনিও ডমিনিস নামক একজন ইটালিয় ধর্ম্মযাজক সর্ব্বপ্রথমে রামধনুর বর্ণের সঠিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কবিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে সূর্য্যকিরণ জলবিন্দুর উপর প্রতিভাত হইয়া রামধনুর সৃষ্টি করিয়া থাকে। তাহার পর ডেকার্টে দেখাইয়াছিলেন যে সূর্য্য-কিরণ একটি ত্রিশিরা (prism) কাচের মধ্য দিয়া যাইলে রামধনুর ন্যায় বিচিত্র বর্ণ উৎপাদন করে। কিন্তু নিউটনের পূর্ব্বে কেহই স্থির করিতে পারেন নাই যে কেন এবং কিরূপে এইরূপ বিচিত্র বর্ণের উদ্ভব হইয়া থাকে।

নিউটন একটি অন্ধকার ঘরের জানালায় একটি গোল ছিদ্র করিয়া তন্মধ্য দিয়া সূর্য্যরশ্মি আনয়ন করিয়া একটি ত্রিশিরা কাচের মধ্যে প্রেরণ করিয়া দেখিলেন যে অপর দিকস্থ একটি পর্দ্দার উপর একটি লম্বা রামধনুর বিচিত্র বর্ণবিশিষ্ট বর্ণছত্র (spectrum) শোভা পাইতেছে। সেই বর্ণছত্রে তিনি সাতটি রং উপরি উপরি দেখিতে পাইলেন—সর্ব্বনিম্নে লাল, তাহার উপরে কমলালেবুর রং, তাহার উপর হরিদ্রার রং, সবুজ রং,

নীল রং, গাঢ় নীল, সর্ব্বোপরি বেগুনে রং। বাস্তবিক বর্ণছত্র যে ঠিক সাতটি রঙ্গের সমবায় তাহা নহে—অসংখ্য রং উহাতে আছে, তবে সাতটি রং বেশ ধরা যায়। এখন নিউটনের জিজ্ঞাস্য হইল দুইটি বিষয়—প্রথম, এই বিচিত্র বর্ণছত্র সূর্য্যের শ্বেত আলোক হইতে কিরূপে আসিল? এবং দ্বিতীয়, বর্ণছত্র গোল না হইয়া লম্বা হইল কেন? এই দুইটি প্রশ্নের মীমাংসা করিবার জন্য তিনি বর্ণছত্রের প্রত্যেক রং এক একটি করিয়া অপর একটি ত্রিশিরা কাচের মধ্যে প্রেরণ করিয়া উহা আর একটি পর্দ্দায় ধরিলেন। তাহাতে তিনি দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিলেন—প্রথম, এই সাতটি রঙ্গের কোনটিও ত্রিশিরা কাচের মধ্য দিয়া গিয়া আর ভাঙ্গিয়া অন্য রঙ্গে পরিণত হইতেছে না, লাল রং লালই থাকিয়া যাইতেছে, বেগুণে রং বেগুনেই থাকিতেছে। দ্বিতীয়—যে রংটি বর্ণছত্রে যে স্থান অধিকার করিয়াছিল, এখনও উহা ঠিক পর পর সেই স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ইহা হইতে তিনি তাঁহার দুইটি প্রশ্নেরই উত্তর পাইলেন। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে স্থির করিলেন যে যখন লাল প্রভৃতি সাতটি রং বিশ্লিষ্ট হইয়া অন্য রঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইতেছে না, তখন উহারা আদি রং (primitive colours) এবং সূর্য্যের শ্বেত আলোক এই সাতটি আদি রঙ্গের সমষ্টি বা সংমিশ্রণ; ত্রিশিরা কাচের মধ্য দিয়া যাইবার সময় শ্বেত আলোক বিশ্লিষ্ট হইয়া সাতটি আদি রঙ্গে পরিণত হয়। তাঁহার দ্বিতীয় প্রশ্নেরও উত্তর মিলিল—তিনি দেখিতে পাইলেন যে সাতটি রং ত্রিশিরা কাচের মধ্য দিয়া যাইবার সময় বিভিন্ন পরিমাণে বাঁকিয়া যায় (refracted);—লাল রং সর্ব্বাপেক্ষা কম বাঁকিয়া থাকে আর বেগুনে রং সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বাঁকিয়া যায় এবং অন্য অন্য রংগুলি এই দুই রংএর মাঝামাঝি পরিমাণে বাঁকিয়া থাকে। সেই জন্যই বর্ণছত্রে লাল রং সর্ব্বনিম্নে থাকে এবং বেগুনে রং সকলের উপরে থাকে এবং অপর রংগুলি এই দুইয়ের মাঝামাঝি থাকে। এইরূপে রংগুলির জন্য বিভিন্ন স্থানের সংকুলান করিতে গিয়া বর্ণছত্র লম্বা হইয়া পড়ে।

এই সকল পরীক্ষার দ্বারা নিউটন দুইটি বিষয় আবিষ্কার করিলেন—প্রথম, সূর্য্যালোক আদি রং নহে, উহা সাতটি রঙ্গের সমষ্টি বা সংমিশ্রণ; দ্বিতীয় প্রত্যেক রং ত্রিশিরা কাচের মধ্য দিয়া যাইবার সময় বিভিন্ন ভাবে বাঁকিয়া যায়। নিউটন শুধু শ্বেতালোক বিশ্লিষ্ট করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি সাতটি আদি রং মিলাইয়া শ্বেত রং প্রস্তুত করিয়াও গিয়াছেন। একখানি কার্ডবোর্ডের বড় চাকৃতিকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ভাগে সাত রকম কালি দিয়া সমান করিয়া পাঁচটি বর্ণছত্র আঁকিলেন; তাহার পর এই চাকৃতিখানি একটি ঘোরাইবার যন্ত্রের উপর রাখিয়া জোরে জোরে ঘুরাইতে লাগিলেন; ঘুরাইবার সময় সাতটি রং এক সঙ্গে চক্ষুতে প্রতিভাত হইবার দরুণ একত্র মিলিত হওয়াতে সাদা বা ঈষৎ ধূসরবর্ণের সাদা দেখাইতে লাগিল। একেবারে সাদা না দেখাইবার কারণ আর কিছুই নয়—সকল কালির রং বর্ণছত্রের সাতটি রঙ্গের ঠিক অনুরূপ হয় না।

নিউটন শ্বেত আলোকের স্বরূপ আবিষ্কার করিয়া রঙ্গের স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা

করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন দ্রব্যের রং দ্রব্যে নাই, উহা আলোকে আছে। লাল দ্রব্য যে লাল দেখায়—তাহার কারণ এই যে, ঐ দ্রব্য লাল ব্যতীত অন্য রঙ্গের আলোক শোষণ করিয়া থাকে, কেবল লাল আলোক শোষণ করিতে পারে না। নীল কাচের মধ্যে দিয়া সূর্য্যালোক যাইলে সূর্য্যালোক নীল হইয়া যায়, তাহার কারণ নীল কাচ

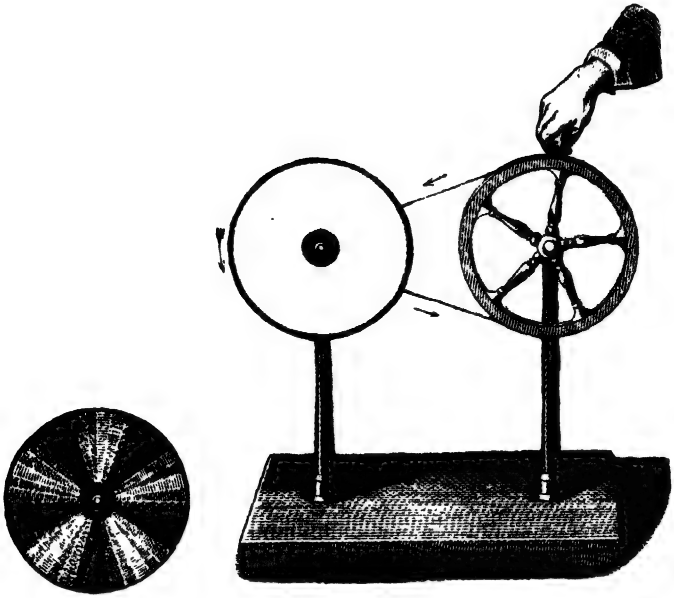

সাতটি রঙ্গে চিত্রিত কার্ডবোর্ড ঘুরাইবার সময় সাদা দেখাইতেছে।

সূর্য্যালোকের আর সকল প্রকার রঙ্গের আলোককে শোষণ করিয়া ফেলিয়া কেবল নীল আলোককে যাইতে দেয়। নিউটনের এই অভিনব মত তখনকার প্রচলিত মতের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। অনেকে তাহার এই মত খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হয়েন নাই।

"অপ্‌টিকস্" গ্রন্থ

নিউটন আলোক সম্বন্ধে আরও অনেক আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আলোক সম্বন্ধে বিবিধ আবিষ্কার তাঁহার "অপ্‌টিকস্" (optics) নামক দ্বিতীয় মহাগ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তিনি আর কিছু না করিয়া যদি কেবল এই গ্রন্থখানিই রচনা করিয়া যাইতেন তাহা হইলেও তিনি বৈজ্ঞানিক সমাজে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেন। এখানে এই সকল আবিষ্কারের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর নহে বলিয়া সংক্ষেপে দুই একটির উল্লেখ করা গেল মাত্র।

নূতন দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার।

—সুপ্রসিদ্ধ ইটালীয় বৈজ্ঞানিক গেলিলিও দূরবীক্ষণ যন্ত্র প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার যন্ত্রে কাচ নির্ম্মিত উন্নতোদর লেন্সের (convex lens) ব্যবহৃত হইত

বলিয়া পূর্ব্বোক্ত বর্ণছত্র ছবির চারিপাশে দেখা যাইত। তাহাতে ছবি অস্পষ্ট হইত। নিউটন কাচের লেন্স পরিত্যাগ করিয়া পরিষ্কার উজ্জ্বল ধাতুনির্ম্মিত নতোদর দর্পণ (concave metallic mirror) ব্যবহার করিলেন। এইরূপ দূরবীক্ষণ যন্ত্রকে "পরাবর্ত্তনীয় দূরবীক্ষণ যন্ত্র" (reflecting telescope) বলে এবং আধুনিক বৃহত্তম দূরবীক্ষণ যন্ত্র নিউটনের আবিষ্কার যন্ত্রের অনুযায়ী করিয়া নির্ম্মিত হইয়া থাকে। তাঁহার নির্ম্মিত দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি রয়েল সোসাইটীতে এখনও রক্ষিত আছে। উহার একখানি প্রতিকৃতি এখানে প্রদত্ত হইল।

ষষ্ঠাংশ যন্ত্র।—(sextant)। আধুনিক নাবিকেরা উপরোক্ত যন্ত্র এখন যে আকারে ব্যবহার করেন তাহার আবিষ্কর্ত্তা নিউটন।

আলোকের স্বরূপ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত।—আলোক কিরূপে উৎপন্ন হয় সে সম্বন্ধে নিউটনের মত এই ছিল যে আলোকিত দ্রব্য হইতে খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পদার্থ নির্গত হইয়া আমাদের চক্ষে পতিত হয় বলিয়া আলোকের উদ্ভব হয়। এই সিদ্ধান্তকে আলোকের "নির্গম সিদ্ধান্ত" (emission theory) বলে। আলোক সম্বন্ধে নিউটনের এই সিদ্ধান্ত এখন আর প্রচলিত নাই। এখন স্থির হইয়াছে যে ইথার (ether) বা ব্যোম নামক সর্ব্বত্র বিদ্যমান অতি সূক্ষ্ম পদার্থের হিল্লোলে আলোকের উদ্ভব হইয়া থাকে।

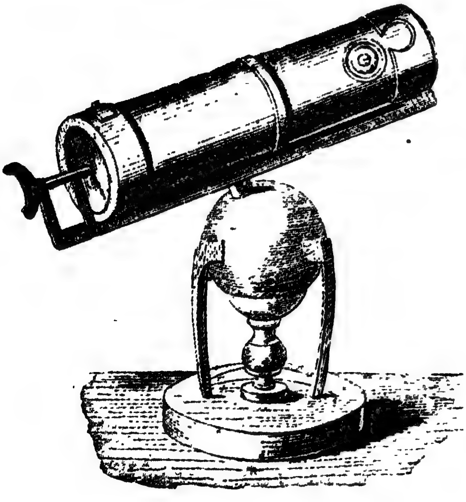

নিউটনের আবিষ্কৃত দূরবীক্ষণ যন্ত্র

শব্দের গতি নির্ণয়।—আলোক সম্বন্ধে গবেষণা ব্যতীত শব্দ (sound) সম্বন্ধেও তাঁহার অনেক গবেষণা আছে। শব্দ সম্বন্ধে বিবিধ গবেষণা তাঁহার প্রিন্সিপিয়া গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রাচীন হিন্দুরা ব্যোম বা আকাশের (ether) গুণ শব্দবহন বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান সপ্রমাণ করিয়াছে যে ইথার প্রকৃতপক্ষে শব্দবহ নহে, বায়ুই শব্দবহ। শব্দিত দ্রব্যের দ্বারা বায়ুর মধ্যে তরঙ্গ উত্থিত হয় এবং সেই তরঙ্গ কর্ণপটহে আঘাত করে বলিয়া আমরা শব্দ শুনিতে পাই। শব্দজনিত বায়ুর তরঙ্গ কিরূপে উত্থিত ও পতিত হয় নিউটন তাহা সঠিক ব্যাখ্যা করিয়া যান এবং শব্দের গতিও (velocity) নির্ণয় করেন। তাঁহার গণনা একেবারে সঠিক না হইলেও তাহা প্রথম চেষ্টার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

নিউটনের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা শুধু জ্যোতিষ ও পদার্থবিদ্যার গবেষণাতে ক্ষান্ত হয় নাই, নিউটন রসায়নশাস্ত্রেও গবেষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহার ডায়মণ্ড নামক কুকুর তাঁহার অনুপস্থিতে একদিন একটা বাতি উল্টাইয়া ফেলিয়া দেওয়াতে সেই আগুনে তাঁহার রাসায়নিক গবেষণার পাণ্ডুলিপিগুলি সব পুড়িয়া গিয়াছিল। তিনি এই দুর্ঘটনায় অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন এবং কুকুরটিকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন "ডায়মণ্ড! ডায়মণ্ড! তুমি জাননা যে তুমি আজ কি ক্ষতিই করিয়াছ!" এই দুর্ঘটনার পর তিনি আব কোনও বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিতে পারেন নাই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে নিউটন আবিষ্কার করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন, অনেক সময় তাহা জনসমাজে প্রচারিত করিবার কল্পনা তাঁহার মনে উদিত হইত না। তাহার ফল এই হইয়াছিল যে অনেক সময় তাঁহাকে স্বীয় আবিষ্কারের মৌলিকতা লইয়া অপরের সহিত বিবাদ করিতে হইত। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে তিনি শূন্যবৃদ্ধি-সিদ্ধান্ত (theory of fluxions) আবিষ্কার করিয়াছিলেন, কিন্তু উহার বহু পরে অর্থাৎ ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দে উহা প্রকাশিত হয়। উহা প্রকাশিত হইবামাত্র বিখ্যাত জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক লাইবনিটজের সহিত উক্ত আবিষ্কারের পূর্ব্বাপর লইয়া তাঁহার বিলক্ষণ তর্কবিতর্ক হইতে থাকে। যদি তিনি উক্ত আবিষ্কাব সময়মত প্রকাশ করিতেন তাহা হইলে লাইবনিট্জের দাবী আদৌ উঠিত না। ফলে যে সময় উহা প্রকাশিত হইয়াছিল সেই সময়ে জার্ম্মাণিতেও উহা লাইবনিট্জ দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। আবার যখন "প্রিন্সিপিয়া" রচনার অনেক পরে উহা হ্যালে কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইল তখনও হুক নামক আর একজন ইংরাজ বৈজ্ঞানিক তাঁহার আবিষ্কারের ভাগ লইবার দাবী করিয়া বসিলেন। আসল কথা এই যে বিশ্বাকর্ষণ সম্বন্ধে নিউটনের আবিষ্কার যথাসময়ে প্রকাশিত না হওয়াতে হুক, রেন, হ্যালে প্রভৃতি অপরাপর বৈজ্ঞানিকগণও ঐ সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। সমকালীন আবিষ্কার বৈজ্ঞানিকজগতে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল অপ্রীতিকর তর্কবিতর্ক চিরশান্তিপ্রিয় নিউটনকে বড়ই মর্ম্মপীড়া দিত। তিনি একদা বলিয়াছিলেন "বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এমনই মোকদ্দমাপ্রিয় যে তাঁহার অনুচরবর্গকে তাঁহার সেবা করিতে হইলে বিলক্ষণ আইনজ্ঞও হইতে হইবে।" আর এক সময় তিনি লাইবনিট্জকে লিখিয়াছিলেন "আমার আলোক সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত লইয়া তর্কবিতর্কে আমি এত উত্যক্ত হইয়া পড়িয়াছি যে আমার দুঃখ হয় যে একটা ছায়ার পশ্চাদ্ধাবন করিতে গিয়া আমি আমার জীবনের সুখশান্তি হারাইয়া ফেলিয়াছি।"

নিউটনের শেষজীবন স্বচ্ছন্দেই কাটিয়াছিল। তিনি টাঁকশালের অধ্যক্ষপদে উন্নীত হইয়া বাৎসরিক বারশত পাউণ্ড মাহিনা পাইতেন। তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ইউরোপের সর্ব্বত্রই সম্মানিত হইয়াছিল। সাম্রাজ্ঞী অ্যান ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে

নাইট উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি বিবাহ করেন নাই, বোধহয় বিবাহ করার কল্পনাও তাঁহার মনে কখনও উদিত হয় নাই। তাঁহার এক ভাগিনেয়ী ও তাঁহার স্বামী তাঁহার গৃহস্থালী রক্ষা করিতেন। তিনি চিরকাল ধর্ম্মবিশ্বাসী ছিলেন এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনাও করিতেন। ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে ১০ই মার্চ্চ তারিখে পঁচাশী বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি স্বর্গারোহণ করেন। ওয়েষ্টমিনিষ্টার এবীতে মহাসমারোহে তাঁহার সমাধি হয় এবং ছয়জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার শবাধার বহন করেন। গেলিলিওর শোচনীয় পরিণাম ও তাঁহার প্রতি ইটালীবাসীগণের অকৃতজ্ঞতার কথা মনে করিলে যেমন ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতে হয় তেমনি নিউটনের প্রতি ইংলণ্ডের অধিবাসীগণের এইরূপ সম্মান-প্রদর্শনে আনন্দ হয়।

নিউটনের আবিষ্কার কাহিনী সম্যক পাঠ করিলে স্বতই বিস্মিত হইতে হয় যে কেমন করিয়া এক ব্যক্তি এতগুলি আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মনে রাখিতে হইবে পাঠদ্দশাতেই তিনি দ্বিপদ সিদ্ধান্ত (binomial theorem) ও শূন্যবৃদ্ধি সিদ্ধান্ত (theory of fluxions) আবিষ্কার এবং শ্বেত আলোক বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। তাহা ভিন্ন দিক্‌দর্শন যন্ত্রের উন্নতিসাধন, ষড়াংশযন্ত্র নির্ম্মাণ, আলোক-সিদ্ধান্ত, রং সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত, শব্দের গতিনির্ণয় প্রভৃতি বহুবিধ আবিষ্কার তিনি একাই করিয়াছিলেন এই আবিষ্কারগুলি যদি দুইজন বৈজ্ঞানিক মিলিয়া করিতে পারিতেন তাহা হইলে প্রত্যেকেই এক একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বলিয়া স্বীকৃত হইতেন। কিন্তু সর্ব্বোপরি যখন দেখিতে পাই যে এ সকল ভিন্ন তিনি বিশ্বাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়া জগৎ সৃজনের একটি গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া গিয়াছেন, অনন্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর ব্যোমমার্গে অত্যদ্ভুত ভ্রমণবৃত্তান্তনিহিত নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে সমগ্র জ্যোতিষ শাস্ত্রকে এক অভিনব সূত্রে গ্রথিত করিয়া গিয়াছেন তখনই তাঁহার অতিমানুষিক মানসিক শক্তির প্রাখর্য্য উপলব্ধি করিয়া বিস্মিত হই। এইরূপ একজন বিস্মিত ফরাসী বৈজ্ঞানিক বলিয়া গিয়াছেন "নিউটন কি আমাদের মত মানুষের ন্যায় পানাহার করিতেন ও নিদ্রা যাইতেন? আমার নিকটে তিনি কিন্তু স্বর্গের দেবতা বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকেন— যেন তিনি এই মরজগতের বাঁধাবাঁধির অতীত।" অথচ এই মহাপুরুষ মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন "আমি কেবল জ্ঞানসমুদ্রের তীরে বসিয়া পাথর কুড়াইয়াছি মাত্র, অনন্ত জ্ঞানসমুদ্র অনাবিষ্কৃতভাবে আমার সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে।" যিনি "মহতো মহীয়ান" তাঁহার জগৎসৃষ্টির অনন্ত রহস্যের মধ্যে যিনি ডুবিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন এই কথা তাঁহারই উপযুক্ত হইয়াছিল।

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী।

(৩২)

জঙ্গলে পূর্ণ পরিত্যক্ত পল্লীগ্রামগুলিকে বাহির হইতে স্থানে স্থানে শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য বলিয়া ভ্রম জন্মে, কিন্তু ইহারই মধ্যে ভগ্ন গৃহে গৃহস্থ তাহার সুখদুঃখ লইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। বাহিরে লোনাধরা দেওয়ালে বঙ্গভূমির সম্পদচিহ্ন শ্যামলতা প্রকটিত, ভিতরে তাহারই সঞ্চিত ম্যালেরিয়া পূর্ণ প্রকোপে প্রতিষ্ঠিত। কর্দমদল ও কমলাচ্ছন্ন ডোবার উপর মহাকলরবে মশকগণ সান্ধ্যস্তোত্র গাহিয়া বিষ বর্ষণ করিতেছে, জ্বরের ধমকে বৃদ্ধ বিছানায় পড়িয়া কাঁপিতেছে, কচি ছেলে চেঁচাইয়া রুগ্না প্রসূতির যন্ত্রণা দ্বিগুণ করিতেছে, গৃহের অভিভাবক কলিকাতার মেসের বাবু সপ্তাহে গৃহে আসিয়া দুহপ্তার অফিস কামাই জন্য জরিমানা দিয়াছেন, ঘরে যত কুইনিনের শিশি জমিয়া উঠিতেছে সাবুর বাটীতে দুধ মিছরির অংশ ততই কম পড়িতেছে। সুজলা, সুফলা বঙ্গভূমির, অবস্থা এইরূপ। গ্রামের বড় লোকেরা প্রায় সকলেই গ্রাম ত্যাগ করিয়া সহরবাসী হইয়াছেন। পাড়া নিবন্ত, দোল দুর্গোৎসব ক্রিয়াকাণ্ড সবই প্রায় বিলুপ্ত। কোথাও কোন নিস্তব্ধ গৃহে দূরসম্পর্কীয়া প্রবীণা আত্মীয়া সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালাইয়া পুরোহিত দ্বারা গৃহদেবতাকে একমুঠা আতপ চাউল ও দুটা ফুল ফেলিয়া দিয়া নিয়ম রক্ষা করিতেছেন। কোথাও চিলেরছাদে, প্রাচীরে অশথবট সদর্পে মাথা উঁচু করিয়া আশ্রয় স্থলকে মাথা নীচু করিতে বাধ্য করিয়াছে, প্রবেশ দ্বারে তালা বন্ধ।

এইরূপ একটি জঙ্গলমরুস্থানে একখানি অপরিচ্ছন্ন গৃহে করালীচরণ আসিয়া সংসার পাতিল। মূলাযোড়ের বিখ্যাত কালীবাড়ীতে সে পূর্ব্বে কিছুদিন দপ্তরখানায় কাজ করিয়াছিল, পুরাতন দাবী তুলিয়া একটা কর্ম্ম জোগাড় করিয়া সে যে ত্রিবেণী ত্যাগ করিল তাহার প্রধান কারণ কমলার দর বাড়ান। ত্রিবেণীতে থাকিলে শিবনারায়ণ সর্ব্বদা সংবাদ পাইবেন, একটু সরিয়া থাকিলে তাঁহারা শীঘ্র শীঘ্র তাহার নিকট হইতে বন্দকী গহনার মত কমলাকে খালাস করিয়া লইবার জন্য ব্যগ্র হইবেন। শিবনারায়ণকে সে পত্র লিখিল "কমলার জন্য অপর পাত্র স্থির হইয়াছে, সে ব্যক্তি আড়াই হাজার টাকা দিতে চাহে আপনার ইচ্ছা থাকিলে উক্ত টাকা লইয়া আগামী সোমবার নৈহাটী ষ্টেশনে অপেক্ষা করিবেন, কমলাকে দিয়া টাকা লইয়া আসিব।" সোমবার সে সপরিবারে ত্রিবেণী ত্যাগ করিল। সেখানে প্রচার করিয়া আসিল কলিকাতায় বিবাহ দিতে যাইতেছে। সেদিন ষ্টেশনে সন্ধ্যা অবধি চাকদহ হইতে কেহ আসিল না, করালী একটু ফাঁপরে পড়িল, এতটাকা দিয়া অপর কেহ কমলাকে বিবাহ করা সম্ভব নয় তাহা সে বুঝিত। দরিদ্র বংশজ সন্তানগণ পাঁচ সাত সতেরর অধিক উঠিতে অক্ষম, ধনীগণ পণ দিয়া বিবাহে অসম্মত, শিক্ষিত

সমাজে পুত্রপণপ্রথা সসম্মানে চলিতে থাকিলেও কন্যাপণ ঘৃণ্য বলিয়াই বিবেচিত। বেশী টানিতে গিয়া জাল ফাঁসিল নাকি?

কিন্তু সে পত্র যে শিবনারায়ণের নিকটে আদৌ পৌঁছায় নাই এ সংবাদ সে জানিত না। ডাকঘরে প্রেরণের জন্য শিশু হস্তে দত্ত পত্রখানা কমলা হাতে পাইয়া পাঠান্তে রন্ধন চুল্লির মধ্যে তাহাকে স্থানদান করিয়াছিল।

সে মনে মনে বলিল 'আমার জন্য তাঁদের এ অপমান আমি ঘটিতে দিব না।' কিন্তু তথাপি নৈহাটি ষ্টেশনে সে বারম্বার সম্মুখে পার্শ্বে চমকিয়া চাহিতেছিল, হায় যদি সহসা, অতর্কিত তাঁহাদের কেহ একজন আসিয়া পড়িতেন! যদি কেহ তাহাকে ইহাদের হাত হইতে উদ্ধার করিতে পারিতেন! গর্ব্বের সহিত অনুতাপের বিষম দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল; সে বলিল, তুমিইতো অহঙ্কার করিয়া চিঠি ছিঁড়িলে, নহিলে হয়ত মুক্তি পাইতে।" ভিতর হইতে আত্মমর্য্যাদা মাথা তুলিয়া উত্তর দেয় 'যাহয় হউক, তাই বলিয়া আমি তাঁহাদের কাছে অর্থমূল্যে কেমন করিয়া আত্মবিক্রয় করিব? এমন করিয়া দিন কাটাইয়া দিব তথাপি তাহা পারিব না।

আজন্ম বুভুক্ষার আদর্শ লইয়া মাতুল গৃহের নূতন গৃহস্থালী কমলাকে তাহার গৃহিণী পদে বরণ করিল। অভাব তাহার শীর্ণ বাহু তুলিয়া কঠোর কর্কশকণ্ঠে আবাহনের আগমনী গাহিল। দাসী পাচিকা গৃহিণী এতগুলি সম্মানিত অধিকার একসঙ্গেই লাভ—এমন তরুণ বয়সে সবার ভাগ্যে জুটিয়া উঠে না।

কিন্তু আর যাহার পক্ষে যাহাই হউক, সত্যকালী তাহাকে পাইয়া যেন বাঁচিলেন। বিবাহের পর হইতেই তাঁহার জীবনে অন্ধকার দারিদ্র্যের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। সহানুভূতিহীন স্বার্থচিন্তামগ্ন স্বামীর নিকটে এতটুকু শান্তি কোনদিন আদায় হয় নাই, শারীরিক মানসিক উভয় শ্রমে দেহ পিশিয়া গিয়াছে, হৃদয় চূর্ণ হইয়াছে তবু বিশ্রাম মিলে নাই? এতদিনে তাঁহার মনে হইল "তবে বোধহয় দেবতা আছেন!' কমলার হাত ধরিয়া বলিলেন 'আর জন্মে তুই আমার মা ছিলি মা! নৈলে এতদিন পরে এ সময় কোথা থেকে এলি বল্ দেখি!"

অনেকগুলি মরিয়া হাজিয়া এখন বিবাহিতা মেয়েটি ছাড়া আরও তিনটি পুত্র কন্যা। সবগুলিই কাঁচ কাচা বুভুক্ষিত এবং রুগ্ন। ইহার মধ্যে মেয়েটির উপরই একটু যত্ন লওয়া হইত কারণ তাহার পিতা বলিতেন "ভুলে যেওনা,—হাবি আমার পাঁচশো টাকার মাল।" ছেলে গুলা কুলীন সন্তান নহে কাজেই তাহাদের আদর নাই। কমলা আসিয়া এই পরিত্যক্ত মানবগুলিকে সদয় চিত্তে কাছে টানিয়া লইল। অবসর যদিও একান্ত অল্প তথাপি সে নিজে বিশ্রাম না লইয়া, ধোয়াইয়া মোছাইয়া ঘা-পাঁচড়ায় ঔষধপত্র দিয়া তাহাদের মানুষের চেহারা বাহির করিল। সাত বছরের বড় ছেলেটির পিলার দাপটে পেটটা বাদ্যযন্ত্র বিশেষের মত আকার ধারণ করিয়াছিল, বসিলে তাহা বুকের উপরেও ঠেলিয়া উঠিত। সেকালের গৃহিণীরা অনেক টোটকা ঔষধ জানিতেন। করুণাময়ী ভট্টাচার্য্য-গৃহিণীর নিকট এই

সকল বিদ্যার কিছু কিছু শিখিয়াছিলেন, কমলা তাঁহার দেখাদেখি ছেলেটির পেটে গোমূত্রের সেক ও গাছড়ার ঔষধ খাওয়াইয়া মাসখানেকের মধ্যেই তাহাকে অনেকখানি সুস্থ করিল। একখানা বর্ণপরিচয় সংগ্রহ করিয়া শিশু দুইটিকে সুযোগমত একটু একটু পড়াইতে গিয়া দেখিল মেধাশক্তি এই জন্ম-অনাদৃত শিশুদিগের এখনও কিছুমাত্র অল্প নয়। করুণায় হৃদয়পূর্ণ করিয়া সে ভাবিল, এ ভালই হইয়াছে অত টাকা অন্য কেহই দিবে না সেদিকে আমি নিশ্চিন্ত, চাহি কি সারা জীবন ধরিয়াই আমি এই দুর্ভাগাদের লইয়া কাটাইয়া দিব। নাই বা আমার সুখ হইল, নাই বা আমি তাঁহাদের পাইলাম, সেই দুদিনের সুখস্মৃতি স্মরণ করিব, দুঃখের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া দুঃখীদের সুখী করিব, আর কি চাই? মামার পণ্য হওয়ার চেয়ে শতগুণে সে আমার ভাল।"

সংসারে সকলেই গুণের বশ, সত্যকালীর রোগশোকঅভাবগ্রস্ত অসহিষ্ণু চিত্ত এই মোহিনী মায়ায় সম্পূর্ণ বশীভূত হইয়া উঠিয়াছিল, বিশেষতঃ ছেলে দুটির উপর কমলার যত্ন দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়া যাইতেন। গালিগালাজ নাই, মারামারি কমিয়া গয়াছে, চেহারাও ফিরিয়াছিল, আহা যদি এতদিন কমলা থাকিত তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহার অন্য সন্তান দুইটি ভুগিয়া ভুগিয়া অসময়ে চলিয়া যাইত না। করালীচরণ দাওয়ায় বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে সব চাহিয়া চাহিয়া দেখে, তাহার মুখের পাষাণ রেখার মত কঠোর কাঠিন্যে সামান্য দাগটুকুও পড়ে না, মনে মনে সে হাসিয়া বলে মেয়েটা খুব সেয়ানা, ভেবেছে ভোল দেখিয়ে ভুলিয়ে দেবে, তা তেল দাও ফুল দাও ভবি ভোলবার নয়।"

কিন্তু যত বড়ই সুগৃহিণী হোউন, যতই তিনি আত্মোৎসর্গ করুন সংসার চালাইতে হইলে আর একটা জিনিষের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন আছে তাহা রৌপ্যচক্র! এ সংসারে সেই বস্তুটির সব চেয়ে টানাটানি। কাজেই গৃহিণীপণার যত কিছু কৌশল আছে সব খাটাইয়াও শ্রীবৎস উপাখ্যানের অচল তরণীর ন্যায় ইহাকে চালান কমলার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। মাতুলের সহিত কথা কহা তাহার পক্ষে একান্ত ক্লেশকর, বিশেষ টাকা কড়ির কথা। সত্যকালীকে দিয়া সে তাঁহাকে বলাইল। করালীচরণ মুখবিকৃত করিয়া কহিলেন—"টাকা আমি কি বাটপাড়ি করে আনব নাকি? যেমন চলচে চালিয়ে নাও না।" সত্যকালী কহিলেন "ওই কি বাটপাড়ি করতে যাবে নাকি? কথা শোন যেন ও-ই চোর দায়ে ধরা পড়েচে, যে ক'টাকা হাতে ছিল এতদিন সে কটি খুইয়ে তোমার সংসার চালালে, বার মাস কোথা পাবে?"

"যেখান থেকে পায় দিক, ওর জন্যেই আমার ডবল খরচ পড়চে। হতভাগা ছোঁড়া দুটোর অত আদর কেন? তোমার কাপড় তো দেখি দিব্যি সাফ; আদা, মরিচ, মিছরি, নিত্যি আস্‌চে কেবল বাজে খরচ?" আমি কি নবাব যে অত সব জোগাব?"

"নিজের গাঁজা ভাঙ্‌, তামাকের পয়সা গুলো যত কাজের খরচ, না? সাফ্ কাপড়

পরি না পরি তোমার কত খরচ তাতে করিয়েছি শুনি! ছেলে দুটো যেন তোমার আপদ হয়েছে, সব ক'টাই তো গেছে ওদেরও তুমি বাঁচতে দেবে না দেখচি"—বলিতে বলিতে সত্যকালী ক্রোধে দুঃখে, অভিমানে মর্ম্মপীড়িতা হইয়া পিছন ফিরিয়া শয়ন করিলেন। পরদিন দ্বিপ্রহরে কমলা বড় ছেলে নিত্যানন্দকে সঙ্গে করিয়া একখানা চাদর মুড়ি দিয়া একটি প্রতিবেশীর গৃহে প্রবেশ করিল, সেই বাড়ীর একটি মেয়ের সহিত স্নানের সময় পুখুর ঘাটে তাহার একটু আলাপ হইয়াছিল। ফিরিবার সময় করুণাময়ী দত্ত বালা দুই গাছি তাহার হাতে আর দেখা গেল না। এক গাছি করিয়া রাঙ্গা কড়া ইহার স্থান অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু বেশীক্ষণ এ সম্মান লাভ তাহাদের অদৃষ্টে ঘটিল না; কাজ কর্ম্মের ভিড়ে পলকা জিনিষ দুই খণ্ড হইয়া খসিয়া পড়িল, কমলা একবার মাত্র শিহরিয়া তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়া হাতখানা ঢাকিয়া ফেলিয়া পুনরায় আরব্ধ কর্ম্মের দিকেই মনোনিবেশ করিল। সত্যকালী ভর্ৎসনার সহিত স্বামীকে সংবাদটা জানাইলে মাতুল ভাগিনেয়ীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "বটে! তবে তো মেয়েটার বুদ্ধি সুদ্ধি ভাল দেখতে পাচ্চি! বেশ করেচে কখন চোর এসে ছিনিয়ে নেয়ে যেত, তবু কাজে লাগল।" কমলার সহিত সাক্ষাৎ হইলে কহিল "বড় খুসী হয়েচি, হাজার হোক নারাণীর মেয়ে তো, নারাণী বড় মানুষের ঘরে গেছলো দাদা বল্‌তে খুন হত, ভাই ফোঁটার সময় মিহি মিহি শান্তিপুরে ধুতি পাঠাত। আমার বরাতে অমন বোন চলে গেল, না হলে আমার ভাবনা কি?"

(৩৩)

পৌষ গত হইয়া মাঘ মাসেরও অর্দ্ধার্দ্ধি চলিয়া গিয়াছে, শীতের প্রকোপ ক্রমেই মন্দীভূত হইতেছিল। রাত্রে হিমপাত অল্প হইয়া গ্রহ তারকার উজ্জ্বলতা এবং শুক্লা জ্যোৎস্নার হৈমপ্রভা উভয়ই বর্দ্ধিত হইত, নূতন ভূষণ গ্রহণের জন্য উন্মুখ বৃক্ষলতাগুলি পুরাতন জীর্ণ পত্ররাশি পরিত্যাগ করিতেছিল। আকাশে বাতাসে সূর্য্যের কিরণে, নবোদ্গত কিশলয়ের চিক্কণ অরুণিমায় সর্ব্বত্রই একটা পরিবর্ত্তনের মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিতেছিল। আবার শুধুই জড় জগতে নহে জীব জগতেও এই নব বসন্তের সূচনা দেখা দিয়াছে। পশু পক্ষীগুলাও প্রকৃতির প্রদান প্রত্যাখ্যান করে নাই, গহ্বরশায়ী কীট গুলা বাহিরে আসা আরম্ভ করিয়াছে, নবীন চ্যূতমুকুলের আঘ্রাণে আমোদিত মধুমক্ষিকা ঝাঁক বাঁধিয়া সেইখানেই বাসা বাঁধিয়াছে, এমন কি ঝোপ ঝাপের মাঝখান হইতে ইতিমধ্যেই বসন্তের সহচর তাহার চিরপরিচিত রাগিণীর আলাপ সুরু করিতে ভুল করে নাই।

মানুষের মধ্যেও ঋতুর প্রভাব কম কার্য্যকরী নহে। শীত কমায় আজকাল সত্যকালী অনেকখানি সুস্থ বোধ করিতেছিলেন, বিছানা ছাড়িয়া প্রথম দিন একটু বাহিরে আসিয়া বসিতে পারিয়াছিলেন। সেদিন তাঁহার চির বিষণ্ণমুখে একটু ক্ষীণ হাসি ফুটিয়া উঠিল, সে টুকুর অর্থ এবারের মত তবে আমি বাঁচিয়া গেলাম!" যে যতই দুঃখ ভোগ করুক

সকলেই প্রায় মরণকে সকল দুঃখের সেরা বলিয়াই মনে করে।

আজ কাল বোধ হয় নব বসন্তের উতলা হাওয়া কমলার মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার রুদ্ধদ্বার নিকুঞ্জের মাধবী শাখার পত্রমর্ম্মরে সুপ্ত কোকিলকে জাগাইয়া তুলিয়াছিল। কাজ কর্ম্ম সারিয়া সন্ধ্যার পর নির্ব্বাপিতালোক কক্ষের কঠিন শয্যায় আর সে বিনিদ্র যামিনী যাপন করে না। তৈল খরচের ভয়ে সন্ধ্যায় একবার জ্বলিয়াই দীপ নেভে বটে কিন্তু সেও সেই সঙ্গে ঘর ছাড়িয়া বাহিরে জ্যোৎস্নালোকে চলিয়া আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। প্রতিবাসী দু একজনমাত্র, সবারই গৃহের মধ্যে পচা পুষ্করিণীর ধারে; কালকাসন্দা, ডাঁটাপত্র বেড়া ঘেরা সবজির বাগান ব্যবধান। সে স্তব্ধ বক্ষে অদূর বংশবনে বাতাসের খেলায় জ্যোৎস্নার হিল্লোল চাহিয়া দেখে, সারাচিত্ত ভরিয়া তেমনি একটা আশা-শোকবিকম্পিত পুলকহিল্লোল মধ্যে মধ্যে তাহারও বুকের ভিতর তরঙ্গিত হইয়া উঠে, বাতাস বন্ধ হইয়া চারিদিক নিঃসাড়া হইয়া যায়, তাহারও বক্ষ কাতর তৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিতে থাকে। উপরে আকাশভরা ফোটা ফুলের মত নক্ষত্রের দীপ্তি, আশে পাশে গাছের গায়ে গায়ে জোনাকীর ঝিক্‌মিকানি, কমলার দৃষ্টি উর্দ্ধ হইতে নিম্নে, অধঃ হইতে উর্দ্ধে ব্যাকুল হইয়া ফিরে, যদি সে ঐ সব ছোট ছোট আলোগুলির কোনটির মধ্যে একদিন নৈশ অন্ধকারে চিতাগ্নির পাশে করুণাপূর্ণ বেদনাব্যথিত যে মুখ দেখিয়াছিল তাহারই ছায়াটি দেখিতে পায়! কিন্তু হায়, বৃথা এ প্রতীক্ষা, এ আশা আকাশকুসুম মাত্র! কোথায় তিনি, আর সে কোথায়? মন তবু বুঝে না প্রতিদিন প্রভাতে উঠিয়া মনে হয় আজ সেখান হইতে কেহ আসিবে, রাত্রে বিছানায় পড়িয়া কেবলই সেই দুর্দিনের স্বপ্ন চোখের সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া উঠে, প্রত্যূষে সেই স্মৃতিটুকু অবলম্বন করিয়া সে দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ করিয়া যায়,—কিন্তু দিন কাটিয়া সন্ধ্যা হইয়া গেলেও কেহ আসে না, কেবল দুই চোখে জল ভরিয়া আসে।

সেদিন কর্ম্মক্লান্ত শরীরে সে যখন প্রাত্যহিক বিশ্রামস্থানটি গ্রহণ করিল তখন আকাশে চাঁদ অনুজ্জ্বল হইয়া আসিয়াছে, একখানা হাল্কা মেঘ লঘুপক্ষ শ্বেত পক্ষীর মত বায়ুভরে উড়িয়া যাইতেছিল। সে অল্পক্ষণ পরেই সেদিন নিরানন্দ চিত্তকে গভীর সুস্বপ্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রাত্রি বাড়িয়া যাইতেছে, অল্প দূরে একদল শৃগালের ঐক্যতানে প্রথম প্রহর অতীতপ্রায় এই সংবাদ ঘোষণা করিতেছিল, পশ্চাৎ ফিরিতে গিয়া সহসা যেন চমকিয়া দুই পদ পিছাইয়া আসিল, তাহার পশ্চাতে জ্যোৎস্নালোকে মৃত্তিকা'পরে লিখিত তাহার নিজের ছায়াপার্শ্বে অপর আর এক ব্যক্তির ছায়া· পুরুষের দীর্ঘ মূর্ত্তি! সে সুস্পষ্ট দেখিল মুহূর্ত্তে ছায়া অন্ধকারের দিকে সরিয়া গিয়াছে। আতঙ্কে তাহার পা হইতে মাথা অবধি কাঁপিয়া উঠিল, কণ্ঠের অত্যন্ত নিকট একটা সাতঙ্ক আর্ত্তনাদ মুহূর্ত্তে ঠেলিয়া আসিয়াছিল,—কিন্তু যাহার জীবন শীত দেশের কাঁচের ঘরের মধ্যে বন্ধ করা গ্রীষ্মের লতার মত আবরণের চাপ মাথায় করিয়া বাড়িয়া উঠে নাই, মুক্ত আকাশের তলায় নিজের শক্তিতে বাঁচিয়া

থাকিবার জন্য পদে পদে যুদ্ধ করিতে করিতে বর্দ্ধিত হইয়াছে;—শৈশব অতিক্রান্ত হইতে না হইতে রৌদ্র বৃষ্টি মাথায় লইয়া ঝড় ঠেলিয়া যাহার উর্দ্ধদিকে গতি,—বাজ পড়িলেও সে নিঃশঙ্ক চিত্তে দাঁড়াইয়া দগ্ধ হয়, ভাঙ্গিয়া পড়ে না। সে চীৎকার করিল না, যেদিকে ছায়া অপসৃত হইয়াছিল সেইদিকে বরং একটুখানি অগ্রসর হইল কই কেহ কোথাও নাই। গাছের ফাঁকে ফাঁকে শুভ্র জ্যোৎস্না প্রবেশ করিয়া বিবিধ আকার ধারণ করিয়াছে, চাঁদ নীচের দিকে নামিয়া পড়িতেছিলেন। বাতাসে শাখা নড়িয়া শুষ্ক পত্রগুলা ঝরাইয়া ফেলিল, মনে হইল কে যেন সাবধানে চলিয়া যাইতেছে, নিজের চমকে নিজে লজ্জিত হইয়া সে ফিরিতে গেল,—এ কি! তাহার পদস্পৃষ্ট হইয়া একটা গোলাকার বস্তু গড়াইয়া গেল,—ইট কাঠের মত জিনিষটা নহে কোন ধাতু দ্রব্য হইবে! শব্দানুসরণে সে নিকটে গিয়া উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে একটা চকচকে টিনের কৌটা ভূমি হইতে কুড়াইয়া লইল। ছেলেরা ফেলিয়া গিয়াছে এই কথাই প্রথমটা মনে হইয়াছিল, কিন্তু সহসা মনে হইল কই এ কৌটা তো তাহাদের নিকট দেখি নাই! কে রাখিল? কৌটাটা অন্যমনস্ক ভাবে খুলিয়া ফেলিল। মেঘখানা সরিয়া গিয়াছে, দিবালোকের মত উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে ধরণী তৃণপুষ্পটি পর্য্যন্ত সুগোচর হইতেছিল—তাহার হস্ত যেন সেই মুহূর্ত্তে একটা ভয়ালসর্প স্পর্শ করিল এমনি সে শিহরিয়া উঠিয়াছিল দেখিল, সেই কৌটা মধ্যে দুই গাছি স্বর্ণ কঙ্কন রহিয়াছে। তা ছাড়া সেই সঙ্গে বড় বড় অক্ষরে লেখা একখানি পত্র। উপরের বৃহদাকার অক্ষরে লেখা সর্ব্বপ্রথম্ চোখে পড়িল "কমলার জন্য"। তাহার কম্পিত হস্ত ভার বহনে অক্ষম হইয়া আসিল, সেই সঙ্গে সমস্ত শরীরও অবশ হইয়া আসিয়াছিল। অবলম্বনের জন্য সে নিকটবর্ত্তী গৃহ প্রাচীরে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল। এত বড় অপমানও তাহার ললাটে লিখিত ছিল! ঘৃণার্হ বস্তু যেমন করিয়া ঠেলিয়া ফেলে তেমনই করিয়া সেই কৌটাটা মাটিতে সে নিক্ষেপ করিতে গেল, কিন্তু আবার মনে হইল পত্রখানা সব পড়িয়া দেখা উচিত। অক্ষর বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট আলো ছিল সে সাবধানে পত্রখানা বাহির করিয়া পাঠ করিল, তাহা এইরূপ;—"কমলার জন্য"

তোমার অযোগ্য হইলেও গ্রহণে কুণ্ঠিত হইও না; তোমাকে দিবার অধিকার না থাকিলে দিতে সাহসী হইতাম না জানিও। এরূপ ভাবে রাখিয়া যাইবার কারণ প্রকাশ্যে দিবার অধিকার 'এখনও আমি পাই নাই।"

"এখনও 'আমি পাই নাই!' তবে এক দিন যদি এ অধিকার পাইবেন এ তাঁহারই দান! হায় মূঢ় কমলা, তুই না জানিয়া কাহাকে অপমান করিতেছিলি? গভীর আবেগের অশ্রুজলে তাহার কৌমুদী বিভাষিত গণ্ডযুগল প্লাবিত হইয়া গেল, সকল দুঃখ যেন আজ সার্থক মনে হইল। নির্নিমেষ জাগ্রত দেবতার মত তিনি তাহার চারিপাশে নিজের রক্ষা হস্ত বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন! সে যে ভূষণহীন হস্তে রহিয়াছে ইহা তাঁহার প্রাণে সহে নাই, তাই এ অকাল উপহার! গভীর কৃতজ্ঞতায় তাহার সারা চিত্ত ভরিয়া উঠিতে লাগিল। একই প্রচণ্ড ক্ষুধা যেন এক মুহূর্ত্তে সর্ব্বগ্রাসী শক্তি লইয়া উদ্দাম

হইয়া উঠিল, জোয়ারের জলের মত মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্ত হৃদয়ের ঢেউ উথলাইয়া কূল ছাপাইয়া বাঁধ ভাসাইয়া দিল। তখনি সে সমুদয় দ্বিধা লজ্জা সরাইয়া ফেলিয়া সেই প্রথম প্রাপ্ত উপহার সসম্ভ্রমে তুলিয়া লইয়া নিজের ললাটে ঠেকাইল। সে শ্রদ্ধা এ জড়ের প্রতি নয় যে চেতন পুরুষ এই জড়ের মধ্যে তাঁহার স্নেহ প্রীতির ধারা ঢালিয়া ইহার মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন প্রণাম সেই তাঁহার অভয় পদোদ্দেশ্যে। বলয় দুগাছি বহুমূল্য নয়—কিন্তু কমলার চোখে তাহা সাত রাজার ধন মাণিকের মত অমূল্য বস্তু বলিয়া মনে হইল। যে অলক্ষ্য দৃষ্টি তাহার এই নিরলঙ্কার হাতখানি সহিতে পারে নাই তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়াই যেন সে সেইখানে দাঁড়াইয়া তাঁহারই দত্ত অলঙ্কার ধারণ করিল, তিনি হয় ত এখনও কোন অদৃশ্য স্থান হইতে প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিতেছেন। এই কথার সঙ্গে সঙ্গে তখন সহসা মনে পড়িয়া গেল এইমাত্র সে যে ছায়া তাহার পশ্চাতে অপসৃত হইতে দেখিয়াছিল যে পদ শুনিয়াছিল তাহা তবে তাহার ভ্রম নহে? সেই ছায়া মনীশের। সেই পদশব্দ তাঁহারই?

তাহার আত্মাভিমান আজ বিজিত বন্দীর মত মাথাবনত করিয়া বলিল 'আর না পণ ছাড়!' আজ গর্ব্বের পরাজয়ে হৃদয়রাজ্যের চারিদিকেই মহোৎসবের বাদ্য বাজিয়া উঠিয়াছে। আর কি মান অপমান ধরিয়া নিজের সহিত যুদ্ধ করা চলে। দেবতা যখন নিজেরই দ্বারের অতিথি তখন কিসের আবার লজ্জাদ্বিধা! যুক্তি তখন ইহার অনুকূল হইয়া কহিল "যাঁহাকে সর্ব্বস্ব দিতে পার এ জীবন জন্মান্তর উৎসর্গ করিতে পার এই তুচ্ছ দেহখানা কি! তাহা লইয়া এত মান অপমান! এই ক্ষুদ্রতার অভিমানে ভরা মন লইয়া কি পূজার অধিকার পাওয়া যায়? সেদিন সন্ধ্যার কর্ম্মাবসরে বাহিরে বসিয়া সে চিত্ত স্থির করিয়া লইল। মানুষের অজ্ঞাতে পলে পলে তাহারই মর্ম্মের মধ্যে যখন নূতন নূতন সৃষ্টি চলিতে থাকে তখন মাতৃকুক্ষিস্থিত শিশুর মত তাহা নিজের নিকট সম্পূর্ণ গোপন থাকে, কিন্তু যখন তাহার সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণ হইয়া উঠে তখনি সে মাটির উপরে সর্ব্বলোচনে আত্ম প্রকাশ করে। কমলা যে আজই এই মতটা স্বীকার করিয়া লইয়া আত্মাভিমান বিসর্জ্জন করিল তাহা নয়; এত দিন ধরিয়া যে নবযুগ তাহার মধ্যে বীজে বৃক্ষের মত, মহাপ্রকৃতির মধ্যে ভবিষ্য সৃষ্টির ন্যায় লীনাবস্থায় ছিল তাহাই আজ সহসা অঙ্কুরিত উদ্বোধিত হইল মাত্র। আপনাকে সে দানের সুখে ধূপের মত নিঃশেষ করিয়া দিল, কিছু বাকি রাখিল না। মনের মধ্যে এই কথা বলিয়া সে সান্ত্বনা লাভ করিল যে 'এই ভাল, তাই হোক আমার স্বাতন্ত্র্যে আর কাজ নাই।'

হায় সে যদি এ কথা আগে জানিত!

রাত্রির অন্ধকারকে সহস্র রশ্মিচ্ছটায় বিদ্ধ করিয়া অম্লান প্রভাত আত্মপ্রকাশ করিল। প্রত্যূষে উঠিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কমলা তাড়াতাড়ি গৃহকর্ম্ম সমাপনান্তে কাগজ কলম জোগাড় করিয়া করুণাময়ীকে পত্র লিখিতে বসিল. এক রাত্রির ভিতরে ইটালী জয় হইয়াছিল. এক রাত্রের ভিতরে তাহার অন্তরের মধ্যে একটা যুগান্তর হইয়া গিয়াছে। মানসিক প্রফুল্লতা কর্ম্মব্যস্ত কমলার চোখে মুখে

কণ্ঠস্বরে ব্যক্ত হইয়া পড়িতেছিল। আজ তাহাকে কেহ দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া যদি পথে পথে ঘুরিতে বলে এখান হইতে মুক্তি ক্রয় করিবার জন্য বোধ হয় সে তাহাতেও অসম্মত হয় না, সে এখন কোন মতে চাকদায় ফিরিতে পারিলেই বাঁচে—যেন আর বিলম্ব সহিতেছিল না।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া করালীচরণ তাহার স্ত্রীকে ডাকিয়া অস্বাভাবিক প্রসন্ন কণ্ঠে কহিলেন "ওগো বিছানা ছেড়ে উঠে পড়, কমলির কাল গায় হলুদ তরসু বে।" "বলো কি এত শীঘ্র?" "হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তাদের এই রকম মরজি, তারা আর দেরি করতে চায় না। আমি টাকা গুলো কলকতায় জমা দিতে যাচ্চি। জানিস্ এই থলিতে কত টাকা আছে? পাঁশিচ শো! বিয়ের দিন আরও পাঁচশো দেবে বলেচে। দুটো চারটে আরও যদি এমনি ভাগ্যি থাকত। তোর যে ছাই ছাই সব মেয়ে!" ক্রমশঃ

আমার বোম্বাই প্রবাস

(৭)

সোলাপুর

সোলাপুর জেলায় আমি অনেক বৎসর কর্ম্ম করি। ১৮৭৪ সালে বিজাপুর তাহার সহিত সংযুক্ত হইয়া এই দুই জিলা একটি জজিয়তীর অন্তর্ভূত হয়। আমি প্রথম হইতেই এই কোর্টের ভার গ্রহণ করি এবং কোর্টের সমুদায় কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া তাহাদের কার্য্য শৃঙ্খলা বাঁধিয়া দেওয়া, এ সমস্ত আমাকেই করিতে হয়। সোলাপুরে মল্লাপ্পা (আপ্পাসাহেব) বারদ প্রমুখ কতিপয় দেশানুরাগী কর্ম্মিষ্ঠ সজ্জন ছিলেন, তাঁহাদের উদ্যোগে কাপড়ের কল-কারখানা ও অন্যান্য সার্ব্বজনিক মঙ্গল কার্য্যের সূত্রপাতে ঐ পুরী অনতিকাল মধ্যে সৌভাগ্যশালী হইয়া উঠে। আমার বন্ধু আপ্পাসাহেব বারদ এখন আর নাই, তিনি একটি নাবালক পুত্র সন্তান রাখিয়া পরলোকগত, কিন্তু সোলাপুরে তাঁহার কার্য্য কলাপের স্মৃতি-চিহ্ন সকল বিদ্যমান*—তাঁহার কর্ম্মচেষ্টা বৃথায় যায় নাই। আমার সময় একটি মাত্র কাপড়ের কল ছিল, এইক্ষণে ৫।৬টি যন্ত্র পরিচালিত হইতেছে, বড় বড় বাড়ীঘর নির্ম্মিত হইয়াছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, সোলাপুর ধন-দৌলতে ফাঁপিয়া উঠিয়াছে, সে সোলাপুর বলিয়া এখন আর তাহাকে চেনা যায় না।

* বারদ তাঁহার স্বোপার্জ্জিত বিষয় সম্পত্তি ট্রষ্টীর হস্তে দিয়া তার একটা সুব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, সোলাপুর হইতে এই সংবাদ পাইয়া আহ্লাদিত হইলাম। ট্রষ্টীগণ আমাকে বারদের ও তাঁহার নূতন বাসগৃহের যে ফোটো পাঠাইয়াছেন পর পৃষ্ঠায় তাহার প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল

লিঙ্গায়ৎ

এ অঞ্চলে লিঙ্গায়ৎ বলিয়া এক সম্প্রদায় আছে, এই সম্প্রদায়ের লোক অনেক দেখা যায়। ইহাদের বিশেষত্ব এই যে ইহারা শৈব অথচ সাধারণ হিন্দুসমাজ বহির্ভূত বেদ-বিরোধী স্বতন্ত্র সম্প্রদায়। লিঙ্গায়ৎ স্ত্রী পুরুষ সকলেই গলদেশে শিবলিঙ্গ ধারণ করে, তাহা হইতে তাহাদের নাম লিঙ্গায়ৎ। তাহাদের আদিগুরুর নাম বসপ্পা (বৃষভ শব্দের অপভ্রংশ), লিঙ্গায়তেরা তাঁহাকে নন্দীর অবতার বলিয়া বিশ্বাস করে। তিনি বিজাপুর অঞ্চলে একটি শৈব ব্রাহ্মণের বংশে জন্মগ্রহণ করেন ও ১১৬৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। কথিত আছে যে উপনয়নের

আপ্পাসাহেব বারদ

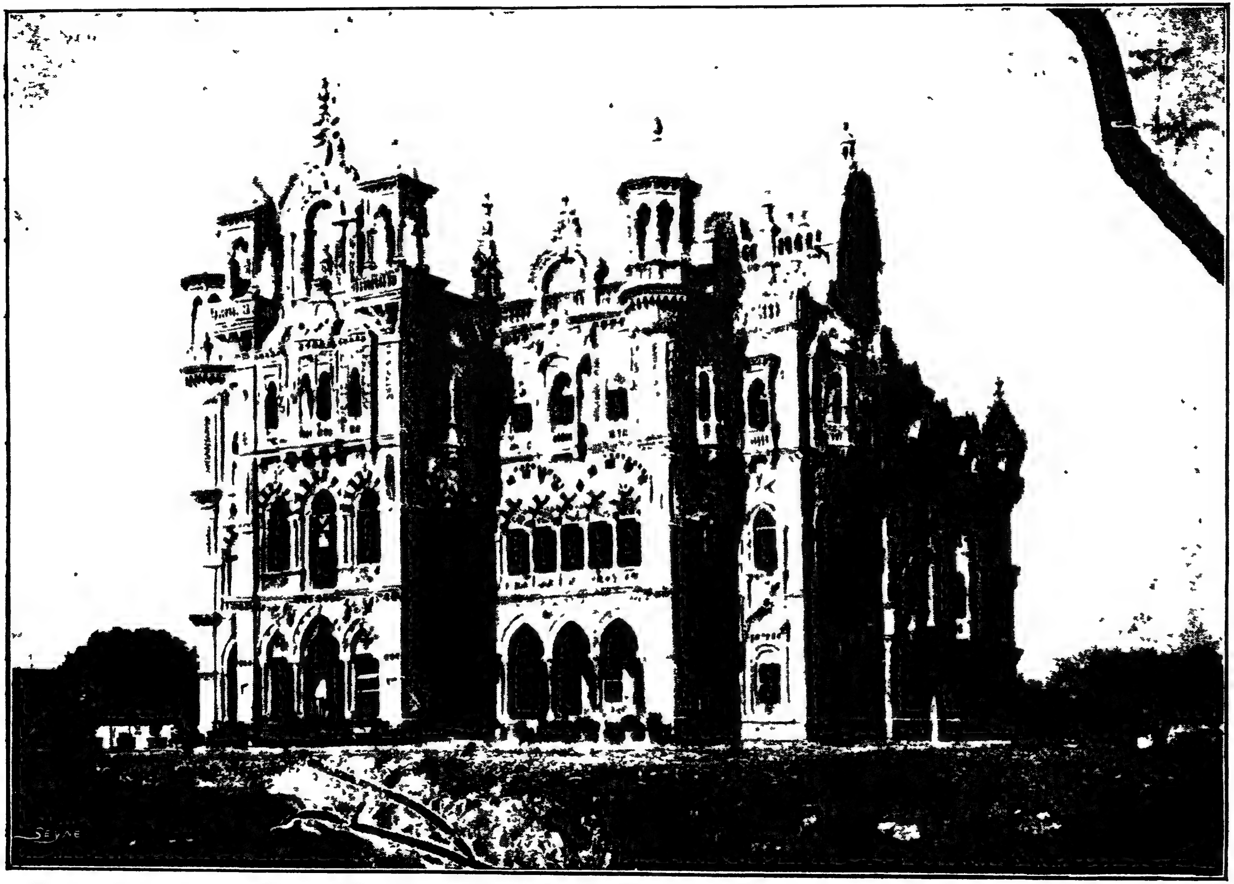

বাবদ ভবন

সময় বালক বসপ্পা গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করিয়া উপবীত ধারণ করিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না—বলিলেন ঈশ্বর ভিন্ন আমার কোন গুরু নাই। এই অপরাধে পিতা তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। বসপ্পা পলায়ন করিয়া বিজ্জল রাজার শরণাপন্ন হন। বিজ্জলের রাজধানী কল্যাণ তথায় তাঁহার এক মাতুল পুলিষাধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার বাটী গিয়া রহিলেন এবং তাঁহাকে মুরব্বি ধরিয়া সরকারী চাকরী-

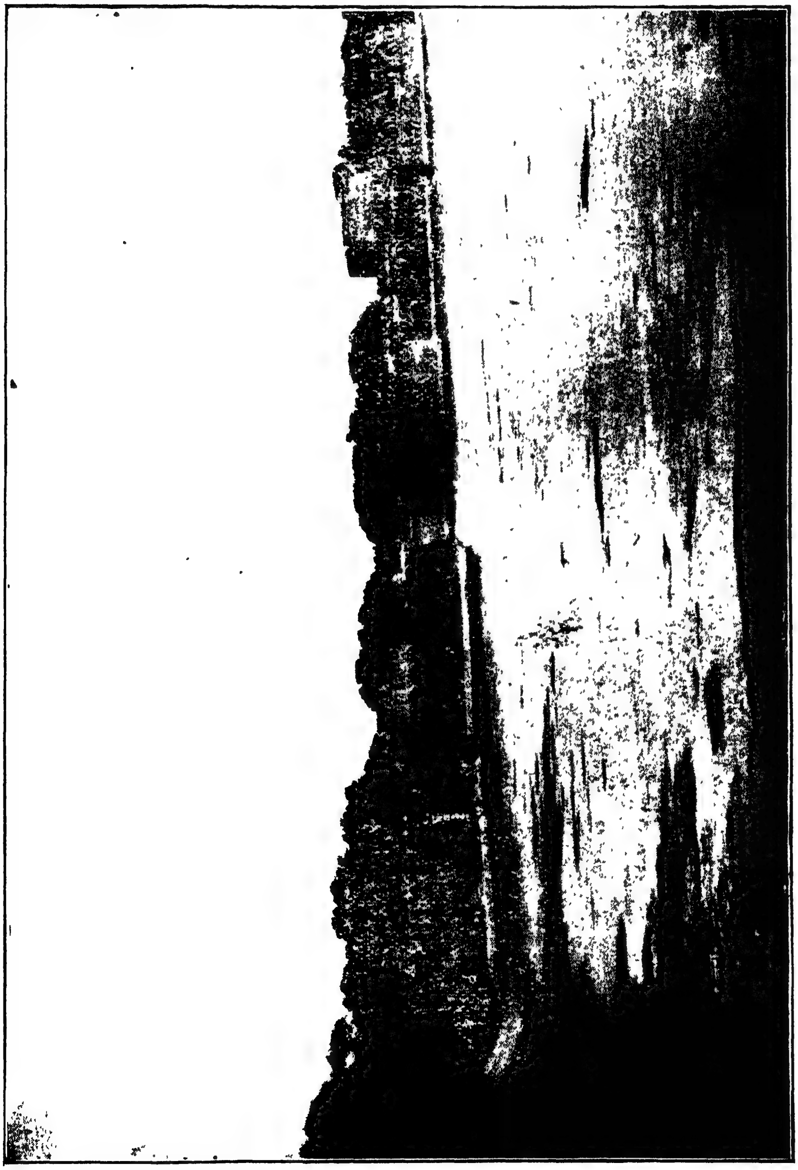

সালাপুর দুর্গ

সিদ্ধেশ্বর মন্দির

যোগে প্রচুর ধনসম্পত্তি অর্জ্জন করিলেন, এবং পরে তাঁহার উপার্জ্জিত বিত্ত দানধর্ম্মে ব্যয় করিয়া লোকের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। যখন তাঁহার খ্যাতিপ্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠ হইল তখন জৈন স্মার্ত্ত বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিরুদ্ধে তাঁহার নূতন মত প্রচার আরম্ভ করিলেন। লিঙ্গোপাসনা, শৌচাশৌচ অবমাননা, বেদ-ব্রাহ্মণ নিন্দা ইত্যাদি উপদেশ সেই মতের অঙ্গীভূত। এই সকল কারণে তিনি জৈন ও অপরপন্থী লোকদের বিদ্বেষ-ভাজন হইয়া উঠিলেন। তাহারা তাঁহার বিপক্ষে রাজার নিকট অভিযোগ করিল। রাজার কোপানলে পড়িয়া অবশেষে তাঁহাকে কল্যাণ ছাড়িয়া পলাইতে হইল। কিন্তু তাঁহাকে নির্যাতন করিতে গিয়া রাজা স্বয়ং বিপদে পড়িলেন ও বাসবের এক শিষ্য কর্ত্তৃক নিজ প্রাসাদেই নিহত হইলেন। বাসব (বসপ্পা) কল্যাণ ছাড়িয়া কৃষ্ণা ও মলপ্রভার সঙ্গমস্থল সঙ্গমেশ্বরে বাস করিতেছিলেন, সেখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

বৃষভ পুরাণ নামক একখানি পুরাণে বাসবের চরিত্র বর্ণনা আছে। এই পুরাণ লিঙ্গায়ৎদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ। ইহার মতে জাতিভেদ, প্রায়শ্চিত্ত, তীর্থভ্রমণ, ব্রাহ্মণভোজন ও উপবাস, শৌচাশৌচবিচার, অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া পদ্ধতি, হিন্দুধর্ম্মের বিধি ও অনুষ্ঠান ভ্রমাত্মক বলিয়া পরিত্যাজ্য। কিন্তু ফলে দেখা যায় যে হিন্দু আচার ও ক্রিয়াকাণ্ডের অধিকাংশই লিঙ্গায়ৎ ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়াছে। একমাত্র শিবপূজা তাহাদের শাস্ত্রবিধান হইলেও তাহার উপরে দেবদেবী ও সাধুভক্তের পূজা স্থান পাইয়াছে।

লিঙ্গায়ৎ পুরোহিতের নাম জঙ্গম। জঙ্গমদের মধ্যে গৃহস্থ ও বিরক্ত দুই শ্রেণী। গৃহস্থ জঙ্গম বিবাহ করে, বিরক্ত জঙ্গম অবিবাহিত। লিঙ্গায়ৎদের শবদাহন প্রথা নাই, গোর দেওয়া তাহাদের রীতি। মৃত্যু তাঁহাদের নিকট ভয়ের জিনিস নহে, প্রত্যুত মৃত্যুই কৈলাস-শিখরে আরোহণের পথ, এই জানিয়া মৃত্যুতে তাঁহারা অভিনন্দন করেন। লিঙ্গায়ৎ শবগৃহে অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করা যায়। একদিকে বিধবার ক্রন্দনধ্বনি, অন্যদিকে বাদ্য-সমারোহে জঙ্গমদের ভোজ লাগিয়া যায়। মৃত্যুর পর মৃতদেহ পুষ্পচন্দন বসন ভূষণে সজ্জিত হইয়া গাড়ী করিয়া সমাধিস্থলে সমানীত হয়। সম্মুখে বাদ্যের ঘটা পশ্চাতে শবযাত্রীর প্রোশেসন চলিয়াছে। তাহাদের গুরুভক্তি এমনি প্রবল যে গুরুর পাদোদক মৃতদেহোপরি সিঞ্চিত হয় ও মহাদেবের প্রতি গুরুর আজ্ঞাপত্র তাহাতে সংলগ্ন হয়, সে পত্র পাইবামাত্র মহাদেব প্রেতাত্মাকে স্বীয় দেবনিকেতনে সাদরে ডাকিয়া লইয়া যান। সমাধিস্থলে কুল-পুরোহিত উপস্থিত থাকিয়া আত্মার সদ্গতি সাধনের বিবিধ উপায় সকল যোজনা করিতে তৎপর থাকেন।

ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়

ডাক্তার নিশিকান্তের সঙ্গে সোলাপুরে আমার প্রথম আলাপ। তখন তিনি য়ুরোপ হইতে সদ্য প্রত্যাগত হইয়াছেন—বৈলাতিক তীব্রবাস তাঁহার গায়ে লাগিয়া আছে। বিলাত হইতে খুব নাম করিয়া আসিয়াছেন—কোন এক জর্ম্মন য়ুনিবর্সিটি হইতে Doctor of Philosophy উপাধি

পাইয়াছেন—রুষিয়ায় গিয়া কি সব কাণ্ড করিয়াছেন—তাঁগাকে গুপ্তচর (Spy) সন্দেহ করিয়া ও-দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছিল, সে নির্ব্বাসনবার্ত্তাও তাঁহার গৌরব বহন করিয়া আনিয়াছে। তাঁহার উপর দেশের আশা ভরসা কতই ছিল! ইংরাজী ফরাসী জর্ম্মন রুষ—এই বিবিধ য়ুরোপীয় ভাষা তাঁর মুখাগ্রে—তাঁহার ইচ্ছা ছিল এদেশে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের অধীনে Foreign officeএ প্রবেশ করিয়া আপনার কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তাহাতে যদিও কৃতকার্য্য হইলেন না তথাপি দেশে ফিরিয়াই মহানুভব বড়লাট রিপণের অনুগ্রহে নিজাম-রাজ্যে শিক্ষাবিভাগে একটা বড় কাজে নিযুক্ত হইলেন—হাইদ্রাবাদ কালেজের প্রিন্সিপাল, খুবই উচ্চপদ! দুর্ভাগ্যক্রমে সে পদ অধিকদিন রাখিতে পারিলেন না। পরে অন্য দুই এক কাজে তাঁহার আত্ম-পরিচয় দিবার সুযোগ হইল কিন্তু নিজ দোষে একে একে সব হারাইলেন। নিজামরাজ্যে তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি ক্রমে হ্রাসোন্মুখ হইতে চলিল, শেষে হাইদ্রাবাদে অপদস্থ হইয়া যথাকথঞ্চিৎরূপে দিনপাত করিতে লাগিলেন। তাঁর একে এই আর্থিক দুরবস্থা, তার উপর আবার পারিবারিক অশান্তি! আমি হাইদ্রাবাদে একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই—তখনো তিনি মাথা তুলিয়া আছেন, Wolseyর ন্যায় তাঁহার পতন হয় নাই। সে সময়ে নিজামৎগগনে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী বঙ্গসূর্য্য দীপ্তি পাইতেছে—দুই চট্টোপাধ্যায়, নিশিকান্ত ও অঘোরনাথ। এই শেষোক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্বনাম অপেক্ষা তাঁহার প্রতিভাশালিনী কন্যা সরোজিনী নাইডুর নামে লোকসমাজে সমধিক পরিচিত। এইরূপে দিন যায়, পরিশেষে একদিন শোনা গেল যে নিশিকান্ত ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া জাতিভ্রষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার আন্তরিক স্পৃহা এই ছিল কোন এক বেগমের পাণিগ্রহণ করিয়া হাইদ্রাবাদ নবাবপরিবারভুক্ত হন—তাঁহার বিশ্বাস এই যে তাঁহার রূপগুণে সেখানকার সকলেই এমনি মুগ্ধ যে তিনি একটুকু ইঙ্গিত করিবামাত্র কতশত বেগম তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িবে। হায়, তাঁহার সে সাধ পূর্ণ হইল না! এই গোলযোগের মধ্যেই সেদেশে তাঁহার মৃত্যু হয়। কি আপশোষ! তাঁর মুখে একটু জল দিবার জন্য আপনার লোক কেহ কাছে নাই—তাঁহার স্ত্রী তাঁহা হইতে বহু দূরে—একটিমাত্র পুত্র অনেকদিন মারা গিয়াছে এই শোকতাপ দুঃখযন্ত্রণায় বিদেশে প্রাণত্যাগ করেন—মনে হইলেও কষ্ট হয়!

লোকটার বিদ্যাবুদ্ধি পাণ্ডিত্য অসাধারণ ছিল কিন্তু হইলে কি হয়, কেবলমাত্র বুদ্ধির জোরে মনুষ্যত্ব হয় না। তাঁহার চরিত্রগত কি একটা নৈতিক বিকলতা ছিল—সেই এক ছিদ্র হইতে তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি পৌরুষ মানসম্ভ্রম একে একে সকলি ক্ষরণ হইয়া তাঁহাকে অপদার্থ করিয়া ফেলিল। নিশিকান্তকে দেখিলাম, তড়িতের ন্যায় তাঁর প্রকাশ তড়িতের ন্যায় অন্তর্ধান। যাক্, ওসব কথায় আর কাজ নাই—মৃতের ভাল দিক্ দেখাই ভাল—

De mortuis nil nisi bonum—
Of the dead nothing but good!

শ্যামাজী কৃষ্ণবর্ম্মা

সোলাপুরে খ্যাতনামা পণ্ডিত শ্যামাজী কৃষ্ণবর্ম্মার সহিত আমার চেনাপরিচয় হয়। তাঁহার বিচিত্র ঘটনাপূর্ণ জীবনকাহিনী কৌতূহলজনক। তিনি এদেশের একজন কৃতিবিদ্য পণ্ডিত ছিলেন, প্রোফেসর মোনিয়র উইলিয়ম্‌সের সহিত বিলাতযাত্রা করিয়া অক্সফোর্ডের বেলিয়ল কালেজে অধ্যয়ন করেন। যখন এদেশ হইতে যান তখন লাতিন গ্রীকের ক অক্ষর জানিতেন না অথচ অল্পকাল মধ্যে এই দুই কঠিন য়ুরোপীয় ক্লাসিকের প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি বিদ্যাবুদ্ধি পাণ্ডিত্যে ইংলণ্ডে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করেন। অধ্যাপক উইলিয়ম্‌স্ সে সময়ে তাঁহার সংস্কৃত ইংরাজি অভিধান রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন শ্যামাজী ঐ কার্য্যে তাঁহাকে বিস্তর সাহায্য করেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে যে Oriental Congress বসিয়াছিল তাহাতে তিনি ভারতবর্ষের প্রতিনিধিস্বরূপ প্রেরিত হন। অক্সফোর্ডে অধ্যয়ন সমাপন করিয়া তিনি আইন শিক্ষায় প্রবৃত্ত হন ও বারিষ্টর হইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। দেশে আসিয়াই রতলমের দেওয়ানী পদ পাইলেন। এই সময়ে তাঁহার জ্ঞাতি-বর্গের অনুরোধে তিনি নাসিকে গিয়া শিরোমুণ্ডন ও পঞ্চগব্য ভক্ষণ করিয়া ম্লেচ্ছসংসর্গজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু ইহার পরেও বিলাতযাত্রার নেশা ছুটিল না, পুনর্ব্বার সিন্ধুপারে তাঁহার সাধের বিলাতভূমিতে গিয়া উত্তীর্ণ হইলেন! এবার কিন্তু সেদেশে গিয়া এক নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিলেন, ইংরাজ রাজদ্রোহী ঘোরতর anarchist হইয়া দাঁড়াইলেন। ঐ মুখোস পরিয়া তিনি এদেশের গবর্ণমেণ্টকে ভয় দেখাইতে লাগিলেন—দূর হইতে অশেষ প্রকার উপদ্রব আরম্ভ করিলেন। তাঁহার উপর দিয়াও অনেক ঝড় তুফান বহিয়া গেল—শেষে এমন হইল যে প্রাণের দায়ে ইংলণ্ড ছাড়িয়া বিদেশী গবর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হইতে বাধ্য হইলেন। এক্ষণে তিনি ফরাসী রাজদ্বার পারী নগরীতে বাস করিতেছেন ও সেখানে লুক্কায়িত থাকিয়া এই গবর্ণমেণ্টের উপরে যথাসাধ্য গোলাগুলি বর্ষণ করিতে ক্ষান্ত নহেন।

'নবেলী' শকুন্তলা

সোলাপুরে থাকিতে বাহির হইতে গাইয়ে-ওস্তাদ, নাট্যমণ্ডলীর লোকেরা মধ্যে মধ্যে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিত। একবার এক পারসী নাট্যশালার ম্যানেজার আসিয়া আমাকে মুরব্বি ধরিয়াছিল, তাহার অনুরোধে আমি অগত্যা তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। তাঁহারা জজ সাহেবের অভিমতে নাটক অভিনয় করিবেন কিন্তু কি নাটক? তাঁহাদের অভ্যস্ত নাটকের তালিকা আমার নিকট পাঠানো হইল তাহার মধ্যে আমার যাহা ইচ্ছা বাছিয়া দিবার কথা। দুর্ভাগ্য-ক্রমে অভিজ্ঞান 'শকুন্তলা' আমার মনোনীত হইল। ঘনঘটা করিয়া অভিনয় আরম্ভ হইল—সে অভিনয় দেখিয়া আমার আপদমস্তক সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। তাপসকন্যা একেলে পারসী রমণীর বেশে রঙ্গ ভূমিতে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন, দুষ্যন্ত একালের নবেল বর্ণিত প্রণয়ী। নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ হিন্দুস্থানী

ভাষায় গান করিতে লাগিল। দুষ্যন্তের পুত্র, সেও নব্য পারসী বালক, পিতাকে দেখিয়া তাহার উপর একটা বই ছুঁড়িয়া মারিল,—'সর্ব্বদমন' বালকের সেই আত্ম পরিচয়! আর সে যে আশ্রম, সে ঋষিকুমার, সে কণ্বমুনি—কালিদাস তাঁহার নাটকের এইরূপ অপব্যবহার দেখিলে কি মনে করিতেন বলিতে পারি না। আমি মনে মনে ভাবিলাম—"কবির মুখ হইতে হঠাৎ দুর্ব্বাসার শাপের মত কি অভিশম্পাৎ বর্ষণ হত কে বলতে পারে—শেষে ম্যানেজার বেচারাকে মুস্কিলে পড়তে হত!"

পণ্ডরপুর

ভীমানদী তীরস্থিত সোলাপুর জিলায় এক প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান। এখানে বিঠ্যল বা বিঠোবা দেবের মন্দির ও আর কয়েকটি মন্দির আছে। বিঠোবাদেব বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পূজিত। শিবাজী রাজার সমসাময়িক সুবিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় কবি তুকারাম বিঠোবাদেবের পরম ভক্ত ছিলেন, তাঁহার রচিত অভঙ্গাবলি বিঠোবার স্তুতিগীতে পূর্ণ। তাঁহার পিতামাতা বংশানুক্রমে পণ্ডরপুরে তীর্থ করিতে যাইতেন। প্রবাদ এই যে, বিশ্বম্ভর নামে তাঁহার কোন এক পূর্ব্বপুরুষ চিরন্তন প্রথানুসারে এই তীর্থ যাত্রায় যাইতেন। এইরূপ ষোলবার তীর্থ করিবার পর একদা রাত্রিতে তাঁহার স্বপ্ন হয় যে বিঠোবাদেব ও রুক্মাই দেবীর স্বয়ম্ভু মূর্ত্তি তাঁহার গ্রামের এক আম্রবনে নিহিত আছে—এই স্বপ্নদৃষ্ট বিগ্রহ উদ্ধার করিয়া তিনি নিজ গ্রামে ইন্দ্রায়ণী নদী তীরে এক ক্ষুদ্র মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সেই অবধি বিঠোবাদেব বিশ্বম্ভরের কুলদেবতা হইলেন। আষাঢ়ী ও কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় পণ্ডরপুরে বৎসরে দুইবার মেলা হয় তাহাতে অসংখ্য অসংখ্য যাত্রী নিশান উড়াইয়া বিঠোবা দর্শনে সমাগত হয়। এই সকল যাত্রীর নাম 'বারকরী।' পুরাকালে এই স্থান সম্ভবতঃ বৌদ্ধদের ধর্ম্মক্ষেত্র ছিল, বুদ্ধ মূর্ত্তির স্থান এইক্ষণে বিঠোবাদেব অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। উৎসবের দিন জগন্নাথ ক্ষেত্রের ন্যায় এখানেও মন্দিরের ভিতর জাতি বিচার থাকে না—সেইটুকু সীমার মধ্যে অস্পৃশ্য জাতির হস্ত হইতেও অন্নগ্রহণ দূষ্য বলিয়া গণ্য হয় না।

মন্দিরে দুই শ্রেণীর পুরোহিত আছে—বড়ুয়া ও সেবাধারী। এই দুই দলের ঘরাও বিবাদে অনেক সময় দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধিয়া পূজা বন্ধ হইত। আমি তাহাদের বিবাদ মীমাংসা করিয়া দিতে সাধ্যমত চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। তাহাদের প্রত্যেক শ্রেণীর অধিকার নিরূপিত হইয়া ডিক্রী জারী হইল তবুও তাহাদের বিবাদ ভঞ্জন হয় না। বড়ুয়াদের হস্তে শুধু যে ঠাকুর পূজার ভার তাহা নহে, তাহারা আবার মন্দিরের কোষাধ্যক্ষ। পেশওয়া প্রভৃতি মহা মহা যাত্রীদের প্রসাদে বিঠোবাদেবের ধনরত্নের অভাব নাই, মন্দিরে স্থানাভাব প্রযুক্ত সেই সকল বহুমূল্য মণি মুক্তা বড়ুয়াদের ঘরে ঘরেই রাখিতে হইত, তাহাদের উপর সেই সমস্ত গহনা পত্রের অপব্যবহারের চার্জ আসে, ইহার মীমাংসা করা—বিঠোবাদেবের বিবিধ অলঙ্কারের তালিকা করিয়া সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া সামান্য ঝঞ্ঝাটের কর্ম্ম নহে। মোগলাই আমলে বিঠোবার রক্ষণাবেক্ষণের কাজ

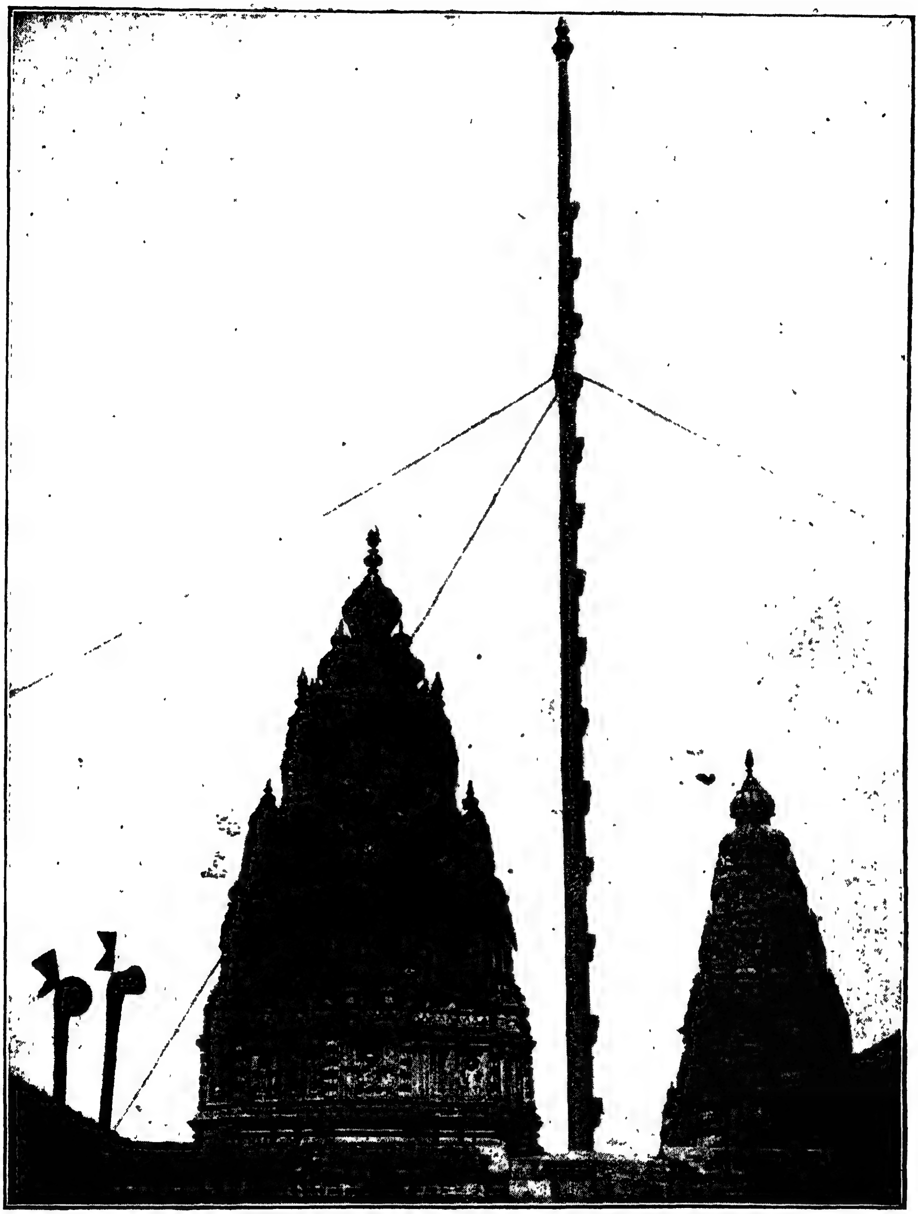

বিঠোবা মন্দির

বড় য়াদের হস্তে ছিল। তথাকার যুদ্ধ বিগ্রহ অশান্তির মধ্যে ঠাকুরের অন্য একটি মূর্ত্তি গড়াইয়া তাহার সংরক্ষণের জন্য একটি গুপ্ত স্থান প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল। জজ সাহেবের ভাগ্যে তাহারও দর্শন ঘটিয়াছিল অন্য লোকেরা যাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত জানিত না।

পণ্ডরপুরে অনাথাশ্রম ও বিধবাশ্রম, এই দুইটি আশ্রম উল্লেখ যোগ্য। ১৮৭৬।৭৭ সালে

বিঠোবা মূর্ত্তি

পুণ্ডলীক মন্দির

সোলাপুর জিলায় ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। তাহাতে পিতামাতা আপন শিশু সন্তান ছাড়িয়া অনেকে দূর দেশে চলিয়া যায়, কতক বা মরিয়া যায়, এইরূপ পিতৃমাতৃহীন অনেক শিশু সন্তান আশ্রয় হীন হইয়া পড়ে। এই সময়ে প্রার্থনাসমাজের একটি সভ্য লালশঙ্কর উমিয়াশঙ্কর পণ্ডর-পুর জিলায় সব জজ ছিলেন। তিনি এই নিরাশ্রিত শিশুদের আশ্রয় দানে কৃতসংকল্প হইয়া চাঁদা তুলিতে আরম্ভ করেন ও ১৩০০০ টাকা সংগ্রহ করিয়া তাহাদের জন্য একটি আশ্রম নির্ম্মাণ করেন। প্রথমে একটি স্থানীয় কমিটি তাহার কার্য্য-নির্ব্বাহের ভার গ্রহণ করে ও পরে সেই কার্য্য বোম্বাই প্রার্থনা সমাজের হস্তে আইসে। এইক্ষণে একজন বেতনভুক্ অধ্যক্ষ আশ্রমের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইয়াছেন। এই সঙ্গে ভ্রূণহত্যা নিবারণের উদ্দেশে একটি বিধবাশ্রম ও প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দুই বিভাগ মিলিত হইয়া যে একটি প্রতিষ্ঠান হইয়াছে তাহার জন্য ম্যুনিসিপালিটি কর্ত্তৃক ৫০০ টাকা বার্ষিক দাতব্য নিরূপিত হইয়াছে। আহ্লাদের বিষয় যে ইহা হইতে অনেকগুলি বালিকা ও প্রাপ্তবয়স্কা বিধবা রমণী বিবাহ করিয়া সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে ও অনেক অনাথ বালক শিক্ষা লাভ করিয়া স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে।

পণ্ডর পুরের কথায় একটা ছড়া মনে হইতেছে তাহা এই :—

পাউস পড়লা চিখ্‌থল ঝালা নদিলা আলাপুর
মাঝা ইথেচ পণ্ডরপুর।
বৃষ্টি বাদল, কাদায় পিছল, নদী এল পুর
আমার হেথাই পণ্ডরপুর।

বিজাপুর

আমি যখন সোলাপুরে জজ ছিলাম তখন বিজাপুর আমার অধীনে ছিল, ইহাদের কলেক্‌টর আলাদা কিন্তু একই জজ। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর অগ্র পশ্চাৎ প্রায় দুইশত বৎসর বিজাপুর দাক্ষিণাত্যের অধীশ্বর ও আদিলসাহী বাদসাদের রাজধানীরূপে প্রখ্যাত ছিল। এই সহর সোলাপুরের ৬০ মাইল দক্ষিণ সীমা ও কৃষ্ণা নদীর অধিত্যকায় অবস্থাপিত। ইহা দাক্ষিণাত্যের পূর্ব্ব দক্ষিণ রেলওয়ের একটি নামাঙ্কিত ষ্টেসন। ইহার আশপাশে প্রকৃতির শোভা সৌন্দর্য্য বিশেষ কিছু নাই। বৃক্ষপল্লব পরিবর্জ্জিত তরঙ্গায়-মান মাঠ ময়দান—মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট শস্যক্ষেত্র এই যা প্রকৃতির মুখচ্ছবি। রেল গাড়ীতে যাইতে যাইতে দূর হইতে বিজাপুরের দূতস্বরূপ "গোলগুম্বজ" ইমারতখানি পথিকের নয়ন আকর্ষণ করে—ক্রমে তাহার বিবৃদ্ধ আকার দক্ষিণ আকাশ ব্যাপিয়া দৃশ্যপটে উদ্ভাসিত হয়। পরে সহরের যত নিকটবর্ত্তী হওয়া যায়, ততই গোর মসজিদ ও অন্যান্য ছোট বড় ইমারতের ভগ্নমূর্ত্তি সকল নেত্র পথে পতিত হয়। সহরের চতুর্দ্দিকে প্রস্তর প্রাচীর, ইহার পরিধি অন্যূন তিন ক্রোশ ব্যাপী। এই প্রাচীর গভীর পরিখায় পরিবেষ্টিত ও অল্লাধিক বলশালী শতাধিক বুরুজে সুরক্ষিত।

পঞ্চতোরণের মধ্যদিয়া সহরে প্রবেশ করা যায়। তার চারিটী অক্ষত রহিয়াছে; পঞ্চমদ্বার সরকারী ঘরবাড়ীতে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যে দিক্ দিয়া প্রবেশ কর সহরের এক সুমহান্ অপূর্ব্ব দৃশ্য আবিষ্কৃত হয়।

বিজাপুরের প্রাচীর বুরুজ, ইমারতের ভগ্নাবশেষ দৃষ্টে ইহা এক সুবিস্তীর্ণ জনাকীর্ণ নগর বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। ভিতরে প্রবেশ করিলে সে ভ্রম দূর হয়। সহরে বসতিগুলি কেমন খাপছাড়া ও গুটিকত প্রাচীন ইমারত ছাড়িয়া দিলে তাহাতে বাড়ী ঘর দুয়ার বিশেষ কিছুই বর্ণনীয় নাই। প্রাচীন ও নব্যসহরে আকাশ পাতাল প্রভেদ। আধুনিক লোকালয় পশ্চিম দ্বারের সন্নিহিত। তাহা ছাড়াইয়া গেলে অন্তরের ভগ্ন বিজনতা স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়া চিত্তকে ঘনবিষাদে পূর্ণ করে। নগরের মধ্যভাগে দোধারী বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য দিয়া যে রাজপথ গিয়াছে তাহা পথিককে মধ্যদুর্গে লইয়া যায়। এই দুর্গের নাম 'আর্ক কেল্লা'। ইহা গোলাকৃতি, ইহার বেষ্টন প্রায় এক মাইল হইবে। 'আর্ক কেল্লায়' যত বড় বড় সাহেব সুবার বাসগৃহ গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় প্রভৃতি সার্ব্বজনিক ইমারতশ্রেণী। কেল্লার মধ্যগত 'সাত মজলী' প্রাসাদ, 'আনন্দ মহল' 'গগন মহল' বাহিরে 'আসার মহল' 'মালক জহান' মস্‌জিদ ও আলি আদিলসার অসম্পূর্ণ সমাধিমন্দির মিলিয়া যে সৌধমালা উন্মেষিত হয় তাহার বিজাপুরের প্রাচীন কীর্ত্তিস্মৃতিতে পূর্ণ। এই পূর্ব্বগৌরবের কঙ্কাল সকল সহরময় বিক্ষিপ্ত দেখা যায়। কোথাও বা বনজঙ্গল পরিবৃত ছাদহীন ভগ্নগৃহ, কোথাও একটি গোর কিংবা মস্‌জিদ ঝোপঝাপের মধ্য হইতে উঁকি দিতেছে, কোথাও বা ভগ্ন স্তূপের মধ্যে ফোয়ারা ও জলযন্ত্রসংযুক্ত মনোহর উদ্যানের চিহ্ন সকল পড়িয়া আছে। কোথাও ভগ্ন জলযন্ত্র শুষ্ক, ফল-ফুলের বৃক্ষসকল বনজঙ্গলে সমাচ্ছন্ন, কোনস্থানে হয়ত একটি অযত্নসম্ভূত জুঁইলতা ভগ্ন প্রাচীর বাহিয়া উঠিয়াছে। হায়, সেই ভুবনবিখ্যাত বিজাপুরের এই দুর্দ্দশা—

যদুপতেঃ ক্ক গতা মথুরাপুরী
রঘুপতেঃ ক্ক গতোত্তরকোশলা
ইতি বিচিন্ত্য কুরু স্বমনঃ স্থিরং
ন সদিদং জগদিত্যবধারয়।

কোথা মথুরাপুরী গেছে যদুপতির।
রঘুপতির কোশলা ও সেই পথে।
সবে এতেক ভাবি মন করহ স্থির
জেনো কিছুই স্থির নহে এ জগতে॥

উপরে আর্ককেল্লার নামোল্লেখ করিয়াছি। আর্ককেল্লাই বিজাপুরের শোভনতম স্থান, ইমারতরাজির রত্নভাণ্ডার। যুসফ আদিল সা প্রথম সুলতান এই দুর্গ নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন, ইব্রাহিম আদিল সা'র আমলে ইহার কার্য্য শেষ হয়; ইহার প্রত্যেক গৃহ, প্রত্যেক ভূমিখণ্ড প্রাচীন বিজাপুরের সহস্র স্মৃতিতে পরিপূর্ণ। এই দুর্গ আদিলসাহী বাদসাদিগের কত লীলাখেলা, যুদ্ধ বিগ্রহের স্থান—ইহাই আবার সেই রাজবংশ নিপাতের সাক্ষী। বিজাপুর পতনকালে এই স্থানে সুলতান সেকন্দর সহস্র সহস্র প্রজার হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদের মধ্যে বিজয়ী ঔরঙ্গজীবের চরণে স্বীয় রাজমুকুট সমর্পণ করেন। যদিও ইহার সৌধাবলী ভগ্ন প্রায়, ইহার উদ্যান কানন তৃণ কণ্টকাবৃত, ইহার উৎস জলপ্রণালী সকল শুষ্ক তথাপি ইহা এক অনির্ব্বচনীয় মহিমামণ্ডিত, সেই সমুদ্ধত রাজবংশের কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে বিরাজমান।

বিজাপুরে যে সমস্ত প্রাচীন ইমারতের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান তন্মধ্যে "গোলগুম্বজ"

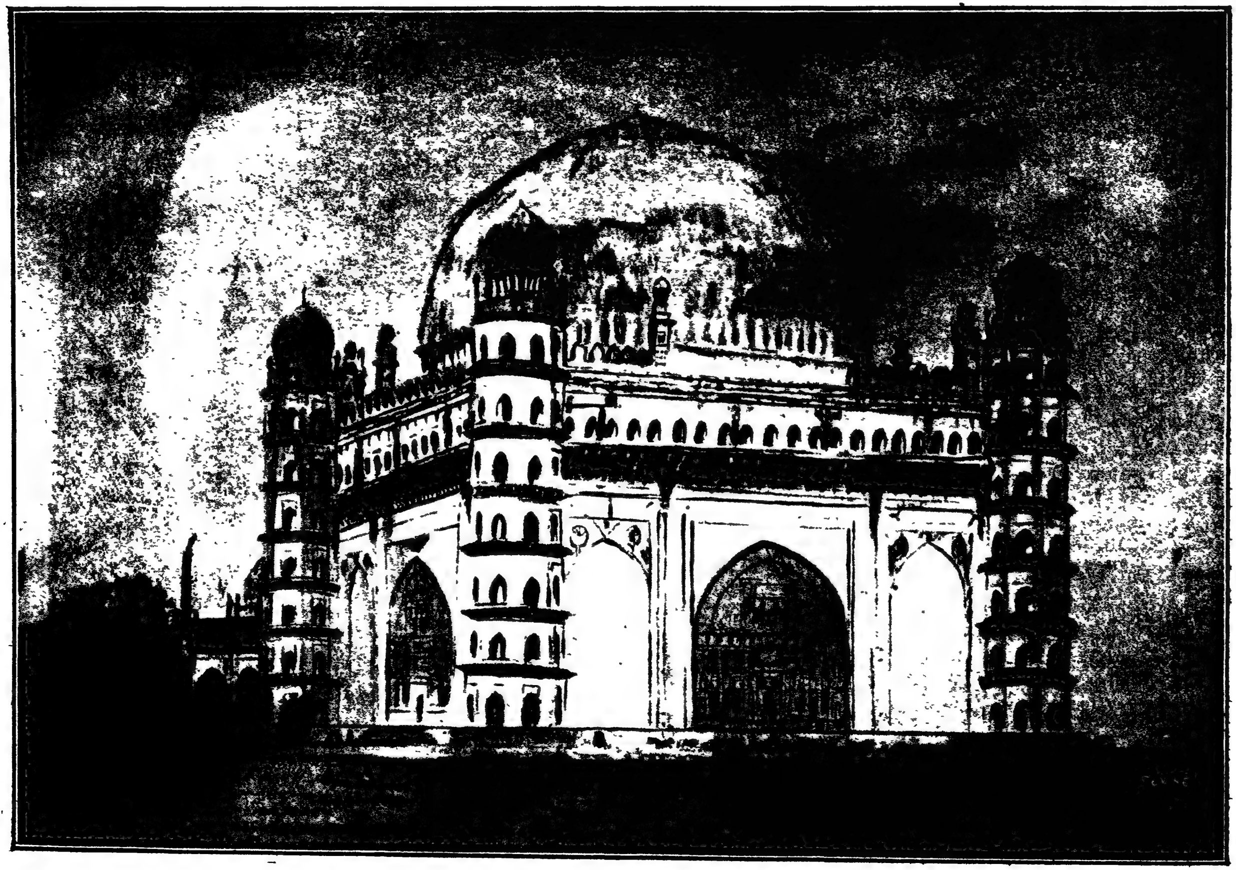

গোলগুম্বজ

সর্ব্বাগ্রগণ্য। ইহা সুলতান মাহমুদের সমাধি মন্দির। সহরের মধ্যে ইহা অদ্বিতীয়, পৃথিবীতেও দুএকটি ভিন্ন এমন বিশাল গুম্বজ আর নাই। গুম্বজরাজ বহির্ভাগ হইতে ১৯৮ ফুট উচ্চ ও যে চতুষ্কোণ প্রাকারের উপর স্থাপিত তাহার প্রত্যেক পার্শ্ব ১৩৫ ফুট দীর্ঘ। ইমারতখানি সমচৌকস ১৮,২২৫ ফুট, রোমনগরের পান্থিয়ন হইতেও বৃহত্তর। বাহিরের চারিকোণে চারিটি গবাক্ষময় মিনার। ইহার একটির সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া ছতালা পর্য্যন্ত আরোহণ করিলে ছাদের উপর হইতে চতুর্দ্দিকের শোভন দৃশ্য সন্দর্শন করা যায়। ভূচর নরকীটেরা কি ক্ষুদ্র আকার ধারণ করে। এই গুম্বজে প্রতিধ্বনি গ্যালরি (Whispering gallery) এক চমৎকার জিনিস। তথায় প্রতিধ্বনির আর বিরাম নাই। একসীমায় কাণে কাণে কথা কহিলে সীমান্তর পর্য্যন্ত স্পষ্ট শুনা যায়। এককণ্ঠ বিনির্গত সুর হইতে শত শত কণ্ঠধ্বনির প্রতিধ্বনি হয়। দক্ষিণদ্বার হইতে সমাধি গৃহে প্রবেশ করিয়া এক প্রস্তর মঞ্চের উপর সুলতান মাহমুদ, তাঁহার মহিষী ও পুত্রদের গোরপ্রস্তর সকল দেখা যায়। দক্ষিণদ্বার নিকটস্থ প্রস্তরের উপর কতকগুলি পারস্য লেখ আছে। তাহাতে সুলতান মাহমুদের স্বর্গারোহণের তারিখ পাওয়া যায় তাহা ১০৬৭ অর্থাৎ ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দ।

এই সকল বৃহৎ প্রস্তরের ইমারত, ইহাদের শিল্প নৈপুণ্য দেখিয়া লোকের মনে সহজে কৌতূহল জন্মিতে পারে, কি উপায়ে কি কলকৌশলে এই সমস্ত কারখানার সৃষ্টি হইল, না জানি ইহাদের উপর কত মজুর মিস্ত্রী খাটিয়াছে—কত না অর্থ ব্যয় হইয়াছে। ইব্রাহিম রোজানামক ইব্রাহিম বাদসার গোরস্থানে পারস্য ভাষায় একটি শিলালেখ আছে, তাহাতে এই সকল বিষয়ের কিছু কিছু জ্ঞান লাভ হয়। সে লেখ এই :—"মালিক সান্দাল ১॥০ লক্ষ ৯০ হুন ব্যয় করিয়া অনেক পরিশ্রমে এই গোর মন্দির নিম্মাণ করেন।" হুনের মূল্য ৭ শিলিং করিয়া হিসাব করিলে ৫২,৮১৬ পৌণ্ড দাঁড়ায়, মোটামুটি ধর ৫॥০ লাখ টাকা। কিন্তু এ হয়ত শুধু গুম্বজ নির্ম্মাণের ব্যয়—সমুদয়টা ধরিতে গেলে ১ কোটি মুদ্রারও অধিক হইয়া যায়। ঐ লেখে আরো আছে যে এই কাজে ৬,৫৩৩ লোক খাটিত, কার্য্য শেষ হইতে ৩৬ বৎসর ১১ মাস ১১দিন লাগিয়াছিল। এত লোক সংখ্যায় মুটে মজুর প্রভৃতি সাধারণ শ্রমজীবি সামিল কি না সন্দেহ। সম্ভবতঃ উহা শিল্পী রাজমিস্ত্রী প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর কারিগরের সংখ্যা নির্দ্দেশক। তদ্ভিন্ন নিকৃষ্ট শ্রমজীবিদিগকে অন্ন বস্ত্র দিয়া ইচ্ছামত সংগ্রহ করা যাইত তাহার সন্দেহ নাই, নতুবা এই সকল ইমারত নির্ম্মাণ কল্পনা করা দুঃসাধ্য।

জীবিত থাকিতে থাকিতে আপনার সমাধি মন্দির প্রস্তুত করা, মুসলমানদের এক অদ্ভুত রীতি। হিন্দুরা মৃতদেহ ভস্মসাৎ করিয়া মৃত্যুর স্মরণ চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিতে উৎসুক, মুসলমানদের বাসগৃহ অপেক্ষা প্রেতালয়ের প্রতি অধিক মনোযোগ। সুলতান মাহমুদের পুত্র আলি আদিল সা গোলগুম্বজের সমস্পর্দ্ধী এক গোরমন্দির

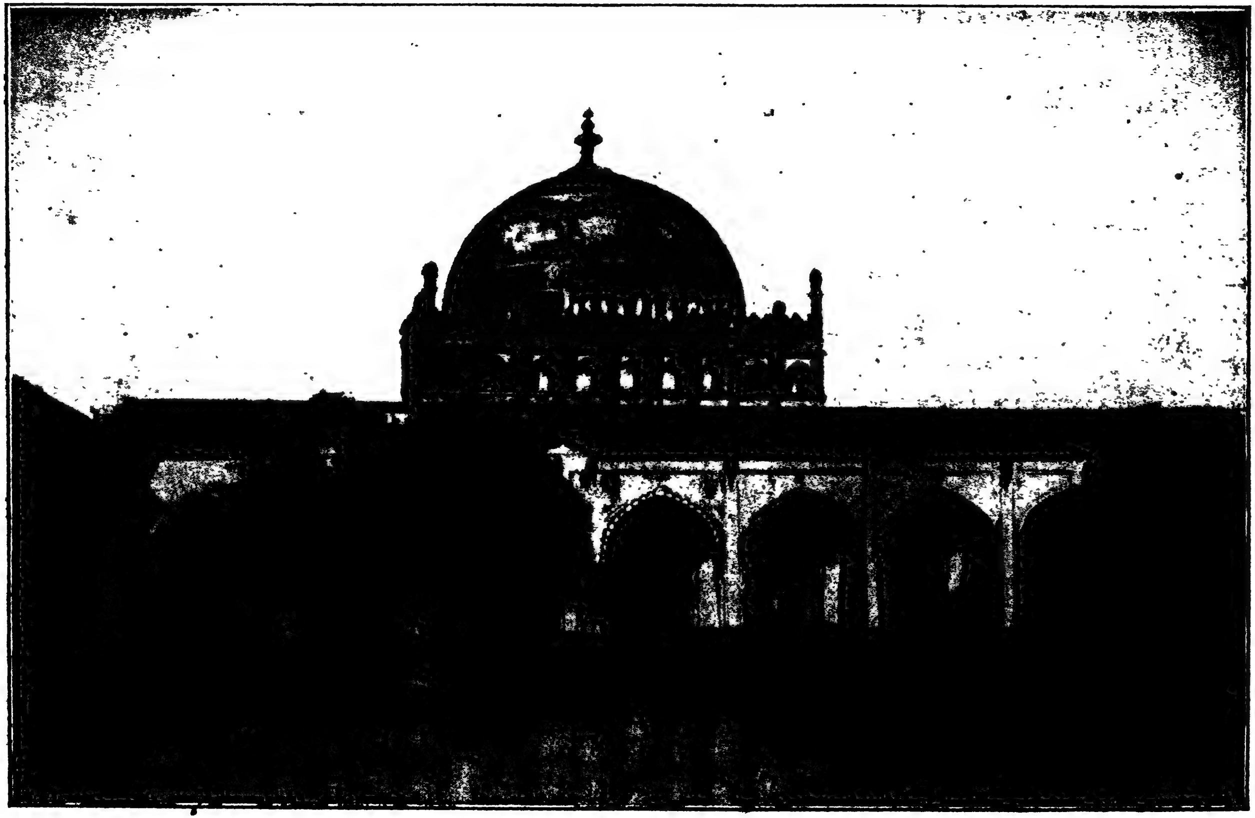

ইব্রাহিম রোজা

নিজের জন্য পত্তন করেন। তাহার ছায়া পিতার গোরের উপর গিয়া পড়ে, এই তাঁহার ইচ্ছা কিন্তু দুরদৃষ্ট ক্রমে সে ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। মন্দির প্রস্তুত হইতে না হইতেই রাজা মৃত্যুমুখে পতিত হন ও এই ভগ্নগৃহেই তাঁর সমাধি হয়। এই সমাধি মন্দির অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই এক্ষণে দৃষ্ট হয়। ইহার নাম "আলিরোজা।" কিন্তু মৃতহস্তীরও দাম লাখ টাকা; সেইরূপ ইহার ভগ্নমূর্ত্তিও চমৎকার ব্যাপার। ইমারত সম্পূর্ণ হইলে ইহা সত্য সত্যই গোলগুম্বজকে অতিক্রম করিয়া উঠিত—আলিও মনের সাধ মিটাইয়া সুখে মৃত্যুশয্যায় বিশ্রাম করিতে পারিতেন।

ইহার উত্তরে মক্কা ফটক হইতে কেল্লার পথ দুটি গোর মন্দিরে অলঙ্কৃত, তাহাদের পরস্পর সান্নিধ্যবশত 'যমক বোন' নাম হইয়াছে। দ্বিতীয় আলির সচিবপ্রধান খাওয়াস খাঁ ও তাঁহার গুরু আবদুল খাদির এই দুই মন্দিরে শয়ান রহিয়াছেন। ইহাদের গোরগুলি ভিত্তি প্রস্তরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন, গম্বুজগৃহ যেন বাসস্থানের জন্য নির্ম্মিত বোধ হয়। বস্তুতঃ ইহার একটি গম্বুজ বাসগৃহে পরিণত হইয়াছে, শ্মশানভূমির উপরে জীবন্ত মনুষ্য বাস করিতেছে।

যমকের অনতিদূরে প্রাচীরবেষ্টিত একটি উদ্যানের মধ্যে ঔরঙ্গজীবের মহিষীর গোরস্থান। এই গোরের শ্বেতপাষাণ দিল্লী হইতে আনীত হয়, এরূপ প্রস্তর বিজাপুর অঞ্চলে পাওয়া যায় না। কেহ কেহ বলেন ইহা সম্রাটের কন্যার গোরস্থান। এই সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, শিবাজী রাজার দিল্লি প্রবাসকালে রাজকুমারী তাঁহার প্রেমে মুগ্ধ হন। শিবাজী মুসলমানধর্ম্ম স্বীকার করিলে তাঁহার সহিত কন্যার বিবাহ দিতে বাদসাহের কোন আপত্তি ছিল না কিন্তু শিবাজী তাহাতে সম্মত হইলেন না। রাজকুমারীর পাণিগ্রহণে অনেকে উৎসুক ছিল কিন্তু তিনি সেই অবধি আর বিবাহ করেন নাই। অবিবাহিত অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয় ও বিজাপুর বিজয়ের তিন বৎসর পরে ঐ স্থানেই তিনি সমাধিস্থ হন।

গোরস্থান ভিন্ন মসজিদ অট্টালিকা অনেকানেক আছে—কতক ভাল কতক বা ভগ্নাবস্থায়, প্রাচীনের এই স্মৃতিচিহ্ন সকল যেখানে সেখানে পড়িয়া আছে। গোরের মধ্যে যেমন গোলগুম্বজ, মসজিদের প্রধান তেমনি জুম্মা মসজিদ।

দাক্ষিণাত্যে জুম্মামসজিদের মত সুন্দর মসজিদ প্রায় দেখা যায় না। লালিত্য, শিল্পকৌশল ও কার্য্যকারিতা ইহা সর্ব্বপ্রকারেই প্রশংসার্হ। এ মসজিদ একজনের রচনা নহে। প্রথম আলি আদিলসা হইতে ঔরঙ্গজীব পর্য্যন্ত নৃপতিগণের হস্তচিহ্নসকল ইহাতে বর্ত্তমান। প্রধান দ্বার দিয়া চতুষ্কোণ প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিয়া দেখিবে তিন দিকে মসজিদের গৃহাবলী, প্রাঙ্গণের মধ্যভাগে একটি শুষ্ক ফোয়ারা। মসজিদের খিলান, স্তম্ভময় সুদীর্ঘ শালা, সুন্দর গুম্বজ, সুরঞ্জিত ভজনালয় (মেহরাব) সকলি চমৎকার। চকচকে মেজের উপর এক একজন উপাসকের বসিবার আঁচড়কাটা আসন আছে, সে সকল গণনা করিলে দেখা যায় ইহাতে প্রায় ৪০০০ উপাসকমণ্ডলীর বসিবার স্থান সঙ্কুলান হয়। মেহরাবে

কতকগুলি শিলালেখ আছে, তাহার চারিটি বচন দিওয়ান হাফেজের গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত; অবশিষ্ট দুইটি লেখ হইতে জানা যায় যে, সুলতান মাহমুদের আদেশে তাহার ভৃত্য মালিক কাফুর কর্ত্তৃক ১০৪৬ (১৬৩৬) অব্দে এই মেহরাব নির্ম্মিত ও অলঙ্কৃত।

আর একটি মসজিদ কারুকার্য্যের জন্য বিখ্যাত—তাহার নাম "মেহতর মহল"। ইহার কারুকার্য্য বাস্তবিক প্রশংসনীয়। দোতলার ছাদ এক অদ্ভুত ব্যাপার। উহা সমতল ও কড়িকাঠের উপর অবলম্বিত। কড়িকাঠ বলা ঠিক হয় না, কেননা উহা প্রস্তরময়। এই সকল পাথরের কড়িকাঠ যে কিসের উপর নির্ভর করিয়া আছে তাহা বোঝা যায় না। পৃথিবী বাসুকীর পৃষ্ঠে—বাসুকীর আশ্রয় কে? মেহতর মহলের ছাদ সম্বন্ধেও এই প্রহেলিকা,—ইংরাজ এঞ্জিনিয়র-দেরও ধাঁধা লাগিয়া যায়। এই গৃহের শিল্পকার্য্য যে দেখে সেই মোহিত হয়। পাথরের উপর ফল ফুল প্রভৃতি নানারকম নক্সা। ফরগসন সাহেব বলেন যে অলঙ্কার ও শিল্পচাতুর্য্যে এই বাড়িটি মিশরের কায়রোর কোন বাড়ীর নিকট হার মানে না।

আর্ক কেল্লার মধ্যভাগে আনন্দমহলের সন্নিকট মক্কা মসজিদ। মক্কায় যে মসজিদ আছে তাহার আদর্শে নির্ম্মিত বলিয়া ঐ নাম। ইহা বেশ একটি সুন্দর ছোটখাট মসজিদ, ঠিক যেন একটি খেলানার জিনিস। ইহার ভজনকোষ্ঠ বিচিত্র সুন্দররূপে খোদিত ও অলঙ্কৃত এবং মসজিদটি উন্নত প্রাকারে পরিবেষ্টিত।

প্রাসাদের মধ্যে 'আসার মহল' অপেক্ষাকৃত অক্ষত অবস্থায় দৃষ্ট হয়। ইহা সুলতান মাহমুদের রচিত। প্রথমে ইহা আদালতের জন্য নির্ম্মিত হয় বলিয়া ইহার নাম 'আদালত মহল' অথবা 'দাদমহল' ছিল। আচ্ছাদিত সেতুবন্ধনে ইহা রাজবাড়ীর সহিত সংযুক্ত ছিল, পরে এক নূতন আদালত প্রস্তুত হইলে ইহার নাম পরিবর্ত্তন ও ইহা কার্য্যান্তরে নিয়োজিত হয়। মহম্মদের শ্মশ্রুর দুইটি কেশ ইহার ভাণ্ডারজাত হওয়াতে ইহার পদোন্নতি হইয়াছে। অন্যান্য ইমারতের ন্যায় এই পবিত্র নিকেতনের উপর বিশেষ কোন উপদ্রব ঘটে নাই, মহম্মদের শ্মশ্রুর প্রসাদে সে অনেক বিঘ্নবিপত্তি হইতে উদ্ধার পাইয়াছে। আসার মহল চতুষ্কোণাকৃতি, ১৩৫ ফুট প্রস্থ দ্বিতলগৃহ। দ্বিতীয় তলের একটি ঘরে মহম্মদের শ্মশ্রু রাখা হইয়াছে। এই ঘর প্রায়ই বন্ধ থাকে, বার্ষিক উৎসবে ভক্তদের দর্শন জন্য কেবল একবারমাত্র খোলা হয়। আর কতকগুলি ঘর কার্পেট, বিছানা, চীনের বাসন প্রভৃতি পুরাণো সামগ্রী সকলের ভাণ্ডার ঘর। এই সকল ঘরের প্রাচীর ও ছাদ বিচিত্র লতাপাতা ও মানুষের ছবিতে চিত্রিত। শেষ প্রকোষ্ঠে প্রাচীরের গায়ে মাহমুদ বাদশার ছবি মোগল সম্রাটের বর্ব্বরহস্তে পড়িয়া নষ্ট হইয়াছে। আরো অনেকগুলি চিত্র কালের দংশনে বিবর্ণ ও বিলুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে আর্ক্ কেল্লা ইমারতরাজির রত্নভাণ্ডার। এই কেল্লায় যে সকল বিশাল সুন্দর ইমারত একত্রীকৃত তাহার একভাগে চীনমহল। চীনমহলের সৌধমালা জজের আদালত, কলেক্টর

মাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে পরিণত হইয়াছে। এই মহলের এককোণে এক সবোবরতীবে সপ্ততল প্রাসাদ (সাতমঞ্জলী) গগনভেদ করিয়া উঠিয়াছে। "গগনমহল" রাজাদের দরবারশালা। তাহার সম্মুখে যে বিশাল খিলানদ্বার (arch) মুখব্যাদান করিয়া আছে তাহা বিজাপুরের সর্ব্বোৎকৃষ্ট খিলান উদ্যানসংযুক্ত সুসজ্জিত "আনন্দমহল" রাজাদের বিহারভবন ছিল। ইহা এক প্রকাণ্ড তৃতলগৃহ। রাণীদের বায়ু সেবনের জন্য উপরে প্রশস্ত ছাদ—ছাদের উপর হইতে অদৃশ্যভাবে বাহিরের তামাসা দেখিবার সুবিধা। এই গৃহে কত সিঁড়ি, খুপরি খুপরি ঘর তাহার অন্ত নাই বোধ হয় যেন ইহা রাজারাণী মিলিয়া লুকাচুরি খেলিবার জন্য নির্ম্মিত।

বিজাপুরে এইরূপ যে কত অট্টালিকা, কত কত গোর গুম্বজ মসজিদের ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে তার ইয়ত্তা নাই। তাহাদের সবিস্তার বর্ণন করিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়, অতএব এইখানে শেষ করি। যাহা কিছু বলা হইয়াছে তাহাতে যদি কাহারো কৌতূহল উদ্দীপন হইয়া থাকে তিনি একবার বিজাপুরে গিয়া চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করিয়া আসুন, এই আমার অনুরোধ।

পুরাতন বিজাপুরের কথায় আমরা যেন নিজ সহরটুকু বিজাপুর বলিয়া কল্পনা না করি। সহর অপেক্ষা সহরতলি ভারি, সহরের শাখা প্রশাখা অনেকদূর বিস্তৃত ছিল। আর আমরা যে লক্ষ লক্ষ লোকের বসতির বিবরণ শুনিতে পাই, সে সহর সহরতলি সবটা ধরিয়া। বিজাপুরের প্রান্তবর্ত্তী জোরাপুর, ইব্রাহিমপুর, নৌরসপুর, সাহাপুর ইত্যাদি পুররাজির মধ্যে সাহাপুরই প্রধান। এই সাহাপুর বিজাপুর মিলিয়া স্থান জুড়িয়া যে প্রদেশ তাহাই সাধারণভাবে বিজাপুর সংজ্ঞায় অভিহিত। ইহার মধ্যে প্রায় ১০ লক্ষ লোকের বসতি ছিল।

সাহাপুরের অন্তর্গত আফজুলপুর সুবিখ্যাত আফজুল খাঁর বাসস্থান ছিল—সেই আফজুল খাঁ যিনি রাজা শিবাজীকে মারিতে গিয়া নিজে মরিলেন। গ্রামের কিয়দ্দূরে নবাব পরিবারের কতকগুলি গোর দেখা যায়, তৎসম্বন্ধে এক লোমহর্ষণ গল্প আছে। গোরগুলি সকলি স্ত্রীলোকের গোর। এক লাইনে সাতটি গোর এমন ১ লাইন। সকলেরই আকার প্রকার প্রায় সমান। গল্পটা এই যে আফজুল যখন শিবাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিবেন, তখন গণৎকারেরা গণিয়া বলে যে এই যাত্রাই তাঁহার শেষ যাত্রা, আর তাঁহাকে দেশে ফিরিতে হইবে না। তাঁহাদের কথায় প্রত্যয় করিয়া তিনি পূর্ব্ব হইতেই গৃহ কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া যাইতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। তাঁহার সপ্ত সপ্ততি বেগম ছিল তাহাদের গতি কি হইবে? তিনি এক উপায় স্থির করিলেন, বেগমদের পুষ্করিণীর জলে ডুবাইয়া পুকুরের ধারে তাহাদের সারি সারি গোর দিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া যুদ্ধ যাত্রায় নিষ্ক্রান্ত হইতে পারেন, এই ভাবিয়া তাহাই করিলেন। গল্পটা সত্য কি না ঠিক বলা যায় না, কিন্তু সারি সারি একই ধরণের এতগুলি স্ত্রীলোকের গোর দেখিয়া ইহা নিতান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হয় না।

সাহাপুরের পশ্চিমে নৌরসপুর। দ্বিতীয়

ইব্রাহিম বিজাপুর ছাড়িয়া এই এক নূতন রাজধানী পত্তনের সংকল্প করিয়াছিলেন। ঐ উদ্দেশে ঐ স্থানে ১৬০০ অব্দে অনেক বড় বড় ঘর বাড়ী নির্ম্মাণ আরম্ভ হয়। স্থানটি গিরিকানন পরিবৃত, বিজাপুর অপেক্ষা দেখিতে সুদৃশ্য। ইব্রাহিমের সাধ কিন্তু অপূর্ণ রহিল। আবার সেই গণৎকারের অন্তরায়। তাঁহারা তাঁহাকে রাজধানী পরিবর্ত্তনে অমঙ্গল বলিয়া সতর্ক করাতে তিনি সে পরামর্শ অগ্রাহ্য করিতে আর সাহস করিলেন না। তাঁহার সে সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হইল। আমাদের নূতন দিল্লীর দশা সেরূপ না হয় তবেই রক্ষা!

বিজাপুরের সুখ সম্পদের পূর্ণাবস্থার মধ্যে এক একজন পরিব্রাজক আসিয়া বিস্ময়ানন্দ উচ্ছ্বাসে যে সহরবর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে সেকালের অবস্থা কতকটা অবগত হওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্থলে আসাদবেগের লিখিত বিবরণ দেওয়া যাইতে পারে। আসাদবেগ লোকটা কে তাহা জানা আবশ্যক। ১৬০০ সালের প্রারম্ভে ইব্রাহিম আদলসা ও সম্রাট আকবর—ইঁহাদের মধ্যে এক সন্ধিবন্ধন হয়। সেই উপলক্ষে সম্রাটের পুত্র রাজকুমার দানয়েলের সহিত ইব্রাহিম স্বীয় কন্যার বিবাহ দিতে প্রতিশ্রুত হন। এই সময়ে আসাদবেগ মোগল সম্রাটের দূত হইয়া বিজাপুর আসেন। তথায় সুলতান যথোচিত আতিথ্য সৎকার সহকারে অভ্যর্থনাপূর্ব্বক বহুমূল্য উপহার দিয়া তাঁহাকে রাজকুমারী সমভিব্যাহারে বিদায় করেন। সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস-লেখক ফেরিস্তাও কন্যাযাত্রী দলে ছিলেন। এই সঙ্গে মোগল সম্রাটের জন্য বহুমূল্য মণি রত্ন ও বাছা বাছা হস্তী উপঢৌকন প্রেরিত হয়। এই বিবাহে রাজকুমারীর নিজের ইচ্ছা ছিল না। তিনি ভীমা তীর পর্য্যন্ত আসিয়া ফিরিয়া যাইতে চাহিলেন। রাত্রে এক প্রবল ঝড় উঠিল, তাম্বু কানাত ছিন্নভিন্ন হইল ও রক্ষকের ছড়িভঙ্গী হইয়া পড়িল। এই অবসরে রাজকুমারীও পলায়ন করিলেন। সকালে আবার তাঁহাকে ধরিয়া আনা হয় ও আসাদবেগ যথা নির্দ্দিষ্ট স্থানে তাঁহাকে পৌঁছিয়া দেন। এই আসাদবেগ বিজাপুর দর্শনে মোহিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সহর বর্ণনা এই:—বিজাপুর প্রাসাদঅট্টালিকা পূর্ণ সুবিস্তীর্ণ নগর। বাজার ৬০ হস্ত প্রস্থ, দুই ক্রোশ বিস্তৃত। প্রত্যেক দোকানের সামনে এক একটি ছায়াতরু ও হাটবাজার সকলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এই সকল দোকান যে সকল পণ্য সামগ্রীতে সজ্জিত তাহা অন্যত্রে সচরাচর দেখা যায় না। গহনা, বস্ত্র, অস্ত্র শস্ত্র, মৎস্য মদ্য মাংস ফল মিষ্টান্নের ও অন্যান্য লোভনীয় জিনিসের দোকান, পান্থশালা, নাট্যশালা, এই সকল বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন—কোন স্থানে সহস্র সহস্র লোক নৃত্যগীত আমোদ প্রমোদে রত, বিবাদ বিসম্বাদ নাই, অবিরাম আনন্দ-ধারা; এরূপ সুচারু দৃশ্য পৃথিবীর অন্য কোথাও আছে কি না সন্দেহ। তাঁহার বর্ণনা পড়িয়া মনে হয়—মর্ত্ত্যে যদি কোথাও বেহস্ত (স্বর্গ) থাকে তবে তাহা এই—

অগর বেহস্ত অন্দর জমীন হস্ত্‌
হমীনস্ত্‌ হমীনস্ত্‌ হমানস্ত্‌
স্বর্গ যদি কোথাও থাকে মর্ত্ত্য ধামে,
সে তবে এইখানে এইখানে—এইখানে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কাল বৈশাখী

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত চিত্র হইতে

রাবণের চিতা

(গল্প)

আমি সবেমাত্র বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়া বেকার বসিয়া আছি, এমন সময় হঠাৎ একদিন আমার এক উকিল বন্ধুর অনুগ্রহে জগদীশপুরের বিপুল ষ্টেটের রিসিভারের চাকরি আমার জুটিয়া গেল। জগদীশপুরের জমীদার কয়েকটি নাবালক পুত্র রাখিয়া মারা যান। ষ্টেট বহু দেনা ও নানা গণ্ডগোলে ভারাক্রান্ত। জমীদারবাবু জমীদারীর কাজ কর্ম্ম কখনো ভালো করিয়া দেখিতেন না;— তীর্থে তীর্থে এবং দেশে বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। কর্ম্মচারীরা যাহা-খুসি করিয়া এবং যথেচ্ছা আত্মসাৎ করিয়া বিষয়টাকে প্রায় উৎসন্ন দিয়াছিল; কাজেই তাহা রিসিভারের হাতে না আসিলে আর উপায় ছিল না।

বিষয়টা হাতে পাইয়াই আমি নূতন উদ্যমে কাজে লাগিয়া গেলাম,—কাগজপত্র আগা-গোড়া-সমস্ত ভালো করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্ব্বে জমীদার-বাবু উইল করিয়া যান। উইলে তিনি তিন পুত্রকে সমান অংশে বিষয় বিভাগ করিয়া দিয়া গিয়াছেন; একমাত্র কন্যার জন্য নগদ পঞ্চাশ হাজার এবং একখানি বাড়ি দান করিয়াছেন।

ইহা ছাড়া, উইলে আরো অনেক দানের উল্লেখ ছিল; তাহার মধ্যে একটি অত্যন্ত অদ্ভুত। সেটি এই:—"১২৭৯ সালে বৈশাখী পূর্ণিমার রাত্রে পুরীর ডাক-বাংলার কাছে, অনন্ত সমুদ্রের সম্মুখে, যে পুণ্যবতী বিধবার প্রাণ অনন্তের কোলে মিশিয়া গিয়াছিল, তাঁহার কোনো নিকট আত্মীয়—পুত্র হৌক কিম্বা কন্যা হৌক—যিনি থাকেন তাঁহাকে আমার বিষয়ের আয় হইতে এককালীন নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে হইবে। আমার বিষয় যাঁহারা ভোগ করিবেন তাঁহাদের উপর আমার এই আদেশ রহিল যে উল্লিখিত বিধবার আত্মীয় কে কোথায় আছেন তাহা ভালো করিয়া সন্ধান লইয়া উল্লিখিত পঞ্চাশ হাজার টাকা যেন দান করেন। তাঁহারা যদি আমার জীবনের এই শেষ-ইচ্ছা প্রতিপালনে অবহেলা করেন তাহা হইলে তাঁহারা যেন অচিরে উৎসন্ন যান—এবং আমার অভিশাপ বজ্রের মতো যেন তাঁহাদের মাথার উপর পড়ে! যে বিধবার কথা বলিলাম তাঁহার যেটুকু পরিচয় আমি জানি তাহা আমার উইলের সংশ্লিষ্ট লাল ফিতা-বাঁধা কাগজে লেখা রহিল।"

লাল ফিতা বাঁধা কাগজের তাড়া উইলের সঙ্গেই ছিল। তাহাতে যাহা লেখা আছে আমি তাহা নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত করিলাম।

"তাঁহার সহিত আমার পরিচয় জীবনে এক রাত্রের কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য। বৈশাখী পূর্ণিমার জ্বলন্ত রাত্রে তাঁহাকে সেই যে চকিতের মতো দেখিয়াছিলাম, আর দেখা হয় নাই। জীবনে কত লোকের সহিত কতবার দেখা হইয়াছে, তাহাদের অনেককে তো মনেই পড়েনা; কিন্তু কি জানি কি নিগূঢ় রহস্যের আবর্ত্তনে তাঁহার সহিত এক মুহূর্ত্তের সংস্পর্শ আমার সমস্ত জীবনটাকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিল।

আমি সমুদ্র উপকূলে বসিয়া বসিয়া জ্যোৎস্না-সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেছিলাম। তরল চন্দ্রকিরণ, সমুদ্রের উচ্ছ্বাসের সহিত আনন্দে দুলিতেছিল নাচিতেছিল; দুগ্ধনিভ ফেণপুঞ্জের মাথায় মাথায় স্বর্ণকিরীট ফুটিয়া উঠিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছিল; আমি তন্ময় হইয়া ভাবিতেছিলাম—ও কার স্বর্ণকিরীট! কেনই বা উহার চূড়া ক্ষণেকের জন্য জাগিয়া, মিলাইয়া যাইতেছে! আমার মনে হইতেছিল, যেন এই নীলসমুদ্রের নীলাম্বরী রাণী জলবিহারে আসিয়া, হঠাৎ আমাকে দেখিয়া যেন লজ্জায় লুকাইয়া পড়িতেছেন!

এই বিপুল বিশাল উচ্ছ্বাসময় সমুদ্রের গোপন-অতলতার মধ্যে কত কী যে রহস্য লুকানো আছে কে জানে। আমি ভাবিতে ভাবিতে সমুদ্রের কলকল্লোলে যেন ঘুমাইয়া পড়িতেছিলাম।

হঠাৎ আমার শান্ত মনের নিস্তব্ধতার উপরে ঢেউ তুলিয়া আমার পাশে আসিয়া কে যেন বসিল। চাহিয়া দেখি, এক তরুণী।

সে আমার দিকে তাকাইল না;—একমনে সমুদ্রের পানে চাহিয়া রহিল। মনে হইতেছিল, তাহার পিপাসিত চিত্ত যেন সমস্ত সৌন্দর্য্য রস এক-নিশ্বাসে পান করিয়া লইতেছে।

দেখিলাম তরুণী বিধবা।

আকাশে, বাতাসে চতুর্দ্দিকেই শুভ্রতা;—তাহার মধ্যে শুক তারার মতো এই শ্বেতবসনা রমণীকে দেখিয়া আমার মনে হইতেছিল যেন এই অসীম শুভ্রতা হইতে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া স্বয়ং বীণাপাণি সশরীরে নামিয়া আসিয়াছেন। সেই স্নিগ্ধ মূর্ত্তির পানে চাহিয়া আমার চক্ষু যেন জুড়াইয়া গেল। ক্ষণেকের জন্য আমার মুগ্ধ মন, সমুদ্র-তরঙ্গের উচ্ছ্বাস-চঞ্চল সৌন্দর্য্য হইতে ফিরিয়া আসিয়া, এই শান্ত স্তব্ধ সৌন্দর্য্যের উপর নিবদ্ধ হইয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিল।

চন্দ্রকিরণের তালে তালে নাচিয়া নাচিয়া সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল;—সীমাবদ্ধ অসীম সমুদ্র আজ মনের আনন্দে সীমা হারাইয়া উপচাইয়া পড়িতেছিল! মনে হইতেছিল, যেন জল স্থল আকাশ আজ এখনই একাকার হইয়া যাইবে!

পায়ের কাছে জল আসিয়াছে, তবুও দেখিলাম রমণীর দৃকপাত নাই—এ লোক হইতে তাঁহার মন উড়িয়া গিয়া যেন কোন্ মায়ালোকের স্বপ্নে বিভোর হইয়া আছে। তাঁহার এ সুখস্বপ্ন ভাঙাইতে আমার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু উপায়ান্তর না দেখিয়া আমায় কথা কহিতে হইল।

কিন্তু আমার ডাকে তাঁহার চমক ভাঙিল না;—তিনি যেমন বসিয়াছিলেন তেমনি বসিয়া রহিলেন। পায়ের কাছে আসিয়া উচ্ছল জলদল মণিমুক্তার অর্ঘ্য সাজাইয়া দিয়া যাইতে লাগিল। এ যেন ঠিক সুন্দরের পূজা সুন্দর করিতেছেন! আমার মনে হইতেছিল, অনন্ত সৌন্দর্য্য হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া যে সৌন্দর্য্য রমণীরূপে পৃথিবীতে ফুটিয়া উঠিয়াছিল আজ যেন আবার তাহা সেই অনন্ত সৌন্দর্য্যের সহিত এক হইতে আসিয়াছে!

•

কতক্ষণ কাটিয়া গিয়াছিল ঠিক আমার মনে নাই। হঠাৎ দেখি, রমণী উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন;—তাঁহার সিক্ত বসনের উপর শীকরসম্পৃক্ত

বাতাস লাগিয়া তাঁহার ক্ষীণ তনুখানিকে কাঁপাইয়া তুলিয়াছে।

গগনের শুকতারা যেমন করিয়া অস্ত যায় তেমনি করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন...... ক্ষণেকের জন্য চন্দ্রালোক যেন নিষ্প্রভ হইয়া আসিল, সমুদ্র স্তব্ধ হইল, বাতাস নিস্পন্দ হইয়া গেল!

উদাস মনে আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। অন্যমনস্ক ভাবে পদচারণা করিতে লাগিলাম;—রমণী যেখানে বসিয়াছিলেন, কি জানি কেন, বার কতক সেইখানে থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম। মনের মধ্যে কিসের একটা অস্পষ্ট উত্তেজনা আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছিল।

বেড়াইতে বেড়াইতে পায়ের দিকে হঠাৎ চোখ পড়াতে দেখিলাম, কি একটা কালো মতন জিনিস সাদা বালির উপরে পড়িয়া রহিয়াছে। হাতে করিয়া উঠাইয়া লইয়া দেখি—একখানা খাতা। তাড়াতাড়ি পাতাগুলি একবার উল্টাইয়া গেলাম। সুন্দর ছাঁদে, পরিষ্কার করিয়া লেখা ছোটো বড় অনেক কবিতায় খাতাখানি ভরা। বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল;—সমস্ত রক্তস্রোত ক্ষণেকের জন্য যেন বন্ধ হইয়া গেল। গরীব ভিক্ষুক অপ্রত্যাশিত বিপুল ধনলাভে যেমন আত্মহারা হয় আমিও তেমনি আত্মহারা হইয়া পড়িলাম।

জ্যোৎস্নার আঁচল-বিছানো বালির চরের উপরে গা এলাইয়া চাঁদের আলোয় কবিতা পড়িতে আরম্ভ করিলাম। সমস্ত মনটা একেবারে ভরিয়া উঠিল। চমৎকার! কী সুন্দর রচনা! যেমন ভাব, তেমনি ছন্দ—যেন পাগল করিয়া দেয়। ভাবে রসে গানে ছন্দে সুন্দর একখানি হৃদয় যেন আমার চোখের সম্মুখে আসিয়া হাসিয়া দাঁড়াইল। আমি উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে সমুদ্রের পানে চাহিয়া বলিয়া উঠিলাম—হে রত্নাকর! আজি এ কী রত্ন উপহার আনিয়া দিলে! ধন্য আমি!

* * *

আমি ধনবানের পুত্র। লক্ষ্মীর অচঞ্চল কৃপা আমাদের বংশের চিরখ্যাতি। পিতার চেষ্টায় সরস্বতীর অনুগ্রহলাভে আমি যে নিতান্ত বঞ্চিত ছিলাম তাহা নহে। বিদ্যামন্দিরের সর্ব্বোচ্চ কক্ষে আমার স্থানলাভ ঘটিয়াছিল। কিন্তু আমি নিতান্তই দুরাকাঙ্ক্ষ। সরস্বতী যে শতদলটির উপরে পা রাখিয়া বীণাবাদন করেন তাহারই একটি দল হইয়া আমি ফুটিয়া থাকিব, ইহাই আমার জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল। আর সব খ্যাতি বৃথা—ক্ষণিক, ভঙ্গুর! কেবল কবিত্ব-খ্যাতিই দিকদিগন্তবিস্তৃত, অনন্তকালস্থায়ী;—মহাপ্রলয়েও তাহার ধ্বংস হয় না। সেই খ্যাতি যদি লাভ করিতে পারি তবেই তো জীবন সার্থক! আজ আমার বাঁশি যে গান গাহিবে অনন্তকাল সেই গানে আকাশ বাতাস মুখরিত হইয়া থাকিবে;—শত বর্ষ পরেও আমার রচিত প্রণয়-সঙ্গীত গাহিয়া ভবিষ্যযুগের প্রণয়ীরা প্রণয় নিবেদন করিবে। এ কি কম প্রলোভন! আমি এই মরীচিকার পিছনে পিছনে ছুটিতেছিলাম। কিন্তু হায়, আমার আশা, মরীচিকার মতোই মিলাইয়া যাইতেছিল! সাধ থাকিলে কি হয়, সাধ্য কোথায়? মানুষের সাধ কখনো সাধ্য বুঝিয়া চলে না। বামন চাঁদে হাত

দিতে চায়—পঙ্গু গিরি উল্লঙ্ঘনের আশা রাখে!

মনকে কিছুতেই আমার অক্ষমতা স্বীকার করাইতে পারিতাম না। সে আমাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। যেমন করিয়াই হৌক কবিত্ব-যশ অর্জ্জন করিতেই হইবে। কিন্তু কেমন করিয়া? তাহা সে শুনিতে চাহিত না। মনের এই দাবী মিটাইবার জন্য আমাকে কী না ছুটাছুটি করিতে হইয়াছে! পাগলের মতো বেড়াইয়াছি, কিন্তু আশার আলো পাইয়াছি কৈ!

জানি, সাধনা ভিন্ন সিদ্ধি হয় না। কিন্তু সরস্বতীর সাধনা বড় দুশ্চর সাধনা। দেবী বীণাপাণি পাষাণী;—অল্পে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করা যায় না। কত মহা মহা তপস্বী, কত শত দেবদেবীকে তপস্যায় সন্তুষ্ট করিয়াছেন কিন্তু সরস্বতীর বরলাভ কয় জনের ভাগ্যে ঘটিয়াছে?

আমার সাধনায় আমি যেটুকু লাভ করিয়াছি তাহার মূল্য কতটুকু! কতটুকুই বা তাহার প্রাণ! কত দিনই বা সে আমার স্মৃতি বহন করিবে! জলবুদ্বুদের মতো ভাসিয়া উঠিয়া লাভ কি!

আমি হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছিলাম।

* * *

সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস মেঘগর্জ্জনে কূলের উপর আছড়াইয়া পড়িতেছিল। উল্লসিত চন্দ্র-কিরণকে সমস্ত বুক দিয়াও পৃথিবী আর ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিল না—কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিয়া উপচাইয়া পড়িতেছিল। কবিতার খাতাখানি বুকে করিয়া আমাকেও আমি আর ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিলাম না। মনে হইতেছিল, চতুর্দ্দিকেই আজ প্রকৃতির দান অপর্য্যাপ্ত!

আমি বালির উপরে পড়িয়া পড়িয়া লুটাইতেছিলাম;—সমস্ত চন্দ্র-কিরণটা সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া মাখিয়া লইতেছিলাম।

এমন সময় আবার সেই রমণী। দেখিলাম, তিনি ব্যাকুলভাবে চারিদিক চাহিতে চাহিতে আসিতেছেন;—দৃষ্টি আর কোথাও নাই—কেবল মাটির দিকে।

রমণী এবার বসিলেন না—চতুর্দ্দিকে ব্যস্তভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। আমার কাছে আসিয়া হঠাৎ একবার থমকাইয়া দাঁড়াইলেন।

নয়নে তাঁহার কী করুণ দৃষ্টি! যেন একখানি সদ্য শোকাহত হৃদয় দর্পণ হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আমি তাঁহার চোখের পানে চাহিতে না চাহিতেই, বাতাস হা হা করিয়া উঠিল—সমুদ্রের ভিতর হইতে একটা আর্ত্তনাদ গুমরাইয়া উঠিতে লাগিল। আমার বুকের ভিতরটাও শুষ্ক হইয়া উঠিল!

রমণী আমার পানে চাহিয়া কথা কহিলেন। কিন্তু সে যেন কথা নয়—কান্না! শুধু দুইটি শব্দ—"আমার খাতা!" মুখ হইতে বাহির হইবা মাত্রই যেন সমস্ত প্রকৃতি স্তব্ধ হইয়া গেল! বাতাসের হিল্লোল, সমুদ্রের কল্লোল সেই কথা দুইটি লইয়া দিকে দিকে ছুটিয়া গেল;—গগনের গায়ে গায়ে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল—"আমার খাতা!"—"আমার খাতা!"

আমি সেই শব্দে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহার সেই করুণ দৃষ্টি, আমাকে

আবার সজাগ করিয়া তুলিল। অমনি আমার হৃদয়ের মধ্যে যেন সুরাসুরের যুদ্ধ বাধিয়া গেল। চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল উজ্জ্বল দৃশ্য—আমি যেন সম্রাট হইয়া বসিয়াছি, যুগযুগান্তরের ও দেশদেশান্তরের মানবকুল আমার বন্দনা করিতেছে! আকাশে আকাশে উড়িতেছে আমার নামের মহিমা-উজ্জ্বল ধ্বজা;—পবনে পবনে ধ্বনিত হইতেছে আমার কীর্ত্তির গৌরব-গাথা!

রমণী আমার নিকট হইতে কোনো উত্তর না পাইয়া হতাশভাবে মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন। তাঁহার সে কী কাতরতা! কে যেন তাঁহার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া লইয়াছে—বুকের ধন কে যেন কাড়িয়া লইয়াছে!

তাঁহার এ মর্ম্মভেদী কাতরতা দেখিয়া আমার ইচ্ছা হইতেছিল খাতাখানা ফিরাইয়া দি। কিন্তু কথাটা মনে হইবামাত্রই চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল—একটা অসীম শূন্যতা লইয়া আমার ভবিষ্যৎ! আমি সে দিকে চোখ মেলিয়া বেশীক্ষণ চাহিতে পারিলাম না।

আমি পাষাণ হইয়া বসিয়া রহিলাম। মানুষের মন নিষ্ঠুরতার যে অতলতায় পৌঁছিলে মানুষ খুন করিতে পারে—জগতের জঘন্যতম কার্য্যে পশ্চাৎপদ হয় না, আমার তখনকার মনের অবস্থা ঠিক সেইখানে ছিল।

রমণী ধীরে ধীরে উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

আমিও তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম।

সে রাত্রে একটুও ঘুমাইতে পারি নাই। সারা রাত বারান্দায় পায়চারি করিয়াছি। কেবলই চোখের সামনে দেখিয়াছি চারিদিকে অসংখ্য রমণী যেন সমস্ত রাত ধরিয়া সমুদ্রতীরে বালুকার কণাগুলি পর্য্যন্ত খুঁটিয়া খুঁটিয়া খুঁজিয়া দেখিতেছে। সে খোঁজার আর অন্ত নাই!

তাঁহাকেও একবার স্পষ্ট—জাজ্জ্বল্য দেখিয়াছিলাম। তখন অনেক রাত্রি। চারিদিক নিশুথী। কেহ কোথাও নাই—তিনি একা ছায়ার মতো ঘুরিয়া ঘুরিয়া সমস্ত সমুদ্রতীরটা খুঁজিয়া খুঁজিয়া দেখিতেছেন .....হঠাৎ যেন মনে হইল, তিনি হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেলেন......

কেমন করিয়া কখন গিয়া ঘরে শুইয়াছি ঠিক মনে নাই। যখন শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিলাম তখন বেশ বেলা হইয়াছে;—বালির উপর সূর্য্যালোক এত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে যে ভালো করিয়া চোখ মেলিয়া চাওয়া যায় না।

ঘুম ভাঙিয়া অবধি নিজেকে অনেকটা প্রকৃতিস্থ বোধ করিতেছিলাম। মনে হইতেছিল, রাত্রের ঘটনাটা যেন একটা দুঃস্বপ্ন মাত্র! তাহার উগ্রতা আর তেমন করিয়া মনের মধ্যে বিঁধিতেছিল না;—রাত্রের অস্পষ্টতায় কাল যাহাকে ভয়ানক করিয়া দেখিয়াছি, দিনের আলোয় তাহা যেন সহজ হইয়া আসিতেছিল;—তাহার ভীষণতাটাকে মনে মনে ফুৎকারে উড়াইয়া দিতেছিলাম।

আমি ধীরে সুস্থে খবরের কাগজখানা খুলিয়া চা পান করিবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় আমার চাকর নিধিরাম আসিয়া

খবর দিল—"একটা মেয়ে-লোককে বাবু, কাল রাত্রে ঐ সমুদ্রের ধারে কে খুন করেছে !"

আমি ব্যগ্র হইয়া বলিয়া উঠিলাম—"কি রকম মেয়ে লোক ?"

—"বিধবা !"

চায়ের পেয়ালা আমার হাত হইতে ঝন্ ঝন্ করিয়া পড়িয়া গেল।

…খুন !…খুনই বটে ! আমার অন্তরাত্মা চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—"শুধু চোর নোস্ তুই ! তুই খুনে !"

আমিই তো এ নারীহত্যা করিয়াছি। স্বার্থের জন্য—ফাঁকি দিয়া কবিত্ব-যশ অর্জ্জন করিবার জন্য—তাঁহার বুকের ধন কাড়িয়া লইয়া আমিই তো তাঁহার প্রাণনাশ করিয়াছি !

আমি স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলাম ;—অনেকক্ষণ ধরিয়া আমার সমস্ত দেহ যেন অসাড় হইয়া রহিল।

কী করি !

একটা তীব্র বেদনা—একটা আকুল চঞ্চলতা, আমাকে পাগল করিয়া তুলিতেছিল। মনের উদ্বেগে আমি সমুদ্রের ধারে ছুটিয়া গেলাম। সেখানে কোথাও কোনো চিহ্ন নাই—কোনো পরিবর্ত্তন নাই ;—সেই একই ভাবে সমুদ্রের জল বার বার কূলের উপর আসিয়া আছড়াইয়া পড়িয়া ফিরিয়া যাইতেছে ;—সেই একই ভাবে, একই শব্দে বাতাস বহিতেছে। তাহাদের চোখের সামনে তীরের উপর কোথায় কি হয়, সে খবর তাহারা কেহই রাখে না ;—একেবারে উদাস !

আকাশে বাতাসে কোনোখানেই তাঁহার কোনো সম্বাদ আমি পাইলাম না ! আমি হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িলাম। কবিতার খাতাখানা তখনও আমার বুকের পকেটে ছিল। তাহার জ্বলন্ত আগুন আমার বুকের পঞ্জর অবধি যেন দগ্ধ করিতেছিল। আমি আর সহ্য করিতে না পারিয়া টান মারিয়া সেখানা একবার ফেলিয়া দিলাম। অমনি চোখের সম্মুখে ধূ ধূ অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল ;—দেখিতে দেখিতে চারিদিক অগ্নিময় হইয়া গেল। কেবল আগুন !—আকাশ জ্বলিতেছে, বাতাস জ্বলিতেছে ; স্থলেও আগুন, জলেও আগুন ;—অগ্নির এ কী বিশ্বব্যাপী ভীষণ তাণ্ডব লীলা !……দেখিলাম, সমস্ত ভস্মসাৎ হইয়া যায়, সেই জন্য ভয়ে ভয়ে তাড়াতাড়ি খাতাখানা উঠাইয়া লইয়া আমার বুকের আগুন আমার বুকেই চাপিয়া রাখিলাম !

পুরীর চতুর্দ্দিকে তাঁহারই মৃত্যুর কথা। যাহার সহিত দেখা হয় সেই কেবল সেই কথা তোলে। 'ওরে বাপু, আমি শুনেছি ! শুনেছি !' তবুও কেহ নিষ্কৃতি দেয় না। হত্যাপরাধী বিচারকের মুখে একবার মাত্র ফাঁসির হুকুম শোনে—কিন্তু এ যে আমাকে পলে পলে ফাঁসির হুকুম শোনানো !……

সবাই বলিতেছে হৃদ্‌রোগে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। রাত্রে প্রায়ই তিনি লুকাইয়া একা সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে বাহির হইতেন। হঠাৎ কোনো উত্তেজনাই তাঁহার মৃত্যুর কারণ !……

কিন্তু আমি জানি… …কথাটা নিজমুখে উচ্চারণ করিতে পারিলাম কৈ !

সে দিন সমস্ত দিন আমার মনের কোনো ঠিক ছিল না। সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ খেয়াল হইল

তাঁহাদের খবরটা একবার লই। কিন্তু খোঁজ করিতে গিয়া শুনিলাম, সেই দিনই বৈকাল-বেলা তাঁহার আত্মীয়েরা কাঁদিতে কাঁদিতে পুরী হইতে চলিয়া গেছেন। তাঁহাদের সহিত কোনো পুরুষ অভিভাবক ছিলেন না, মেয়েরা বাড়ির ভিতরই থাকিতেন;—কাজেই তাঁহারা কোথা হইতে আসিয়াছিলেন, কোথায় গেলেন, কোথায় থাকেন এ সম্বাদ কেহই পায় নাই। কবিতার খাতাতেও নাম ধাম কিছুই লেখা নাই। আমি হতাশ হইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম—"তবে কী করি!"

সেইদিন হইতে কত অনুসন্ধান করিয়াছি, কত লোককে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কত দেশবিদেশে ঘুরিয়াছি কিন্তু তাঁহার আত্মীয়দের কোনো সম্বাদ সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

তবে এ খাতাখানা লইয়া কী করি! কাহাকে দি এ যে ফেলিতেও পারি না—রাখিতেও পারি না; দিবারাত্রি রাবণের চিতা বুকে লইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরিতেছি!"

....

জমীদারবাবুর আত্ম-কাহিনী শেষ করিয়া আমি কবিতার খাতাখানির সন্ধান করিতে লাগিয়া গেলাম;—সেখানা দেখিবার জন্য ভারি কৌতূহল হইতেছিল! কিন্তু সমস্ত কাগজ পত্র উল্টাইয়া, সমস্ত বাক্স দেরাজ হাৎড়াইয়া তাহার কোনো খোঁজ পাইলাম না। জমীদারবাবু হঠাৎ কাশীধামে মারা যান—সে সময় সেখানে তাঁহার নিকট-আত্মীয় বড় কেহ ছিলেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীরা তাঁহার জিনিসপত্র একরকম লুট করিয়াই লইয়াছিল;—বোধ হয় সেই হট্টগোলে খাতাখানি নষ্ট হইয়া থাকিবে।

একটা কথা ধাঁ করিয়া আমার মনে হইল। আমি ভাবিতেছি, জমীদারবাবুর সেটা মাথায় আসে নাই কেন! কে জানে, কেন!

সেই দিনই কাগজে কাগজে ৩০২৫ নং ঠিকানা দিয়া একটা বিজ্ঞাপন পাঠাইয়া দিলাম। দেখি, ইহাতে সেই বিধবার কোনো সন্ধান পাই কি না।

আমি অধীর ভাবে বিজ্ঞাপনের উত্তরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

সন্ধ্যাবেলা আমার চেম্বরে বসিয়া চুরুট ফুঁকিতেছি, এমন সময় দেখি, আমার বৃদ্ধ মাতুল উপস্থিত। তিনি কখনো এদিকে আসেন না—হঠাৎ তাঁহাকে দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়া গেলাম। আমি তাড়াতাড়ি চুরুট ফেলিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

তিনি স্থান গ্রহণ করিলেন। ধীরে ধীরে পকেট হইতে চশমাটি বাহির করিয়া চাদরের খুঁটে কাচ দুখানা বারকতক ঘসিয়া চোখের উপর ঠিক করিয়া লইলেন। তারপর একখানা খবরের কাগজের পাতা এদিক-ওদিক-চারিদিক বহুবার উল্টাইয়া, লাল কালীতে দাগ দেওয়া একটা অংশ বাহির করিয়া আমার চোখের সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন—"দেখ দেখি! এ বিজ্ঞাপনটা দেখেচ?"

আমি দেখিলাম, সে আমারই প্রদত্ত বিজ্ঞাপন।

আমি ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলাম—"এর কোনো সংবাদ আপনি জানেন না কি!"

—"খুব জানি! সে কি ভোলবার কথা বাবা!"

বলিয়া তিনি চোখ হইতে চশমাখানি খুলিয়া লইলেন;—ধীরেসুস্থে খাপের মধ্যে পুরিয়া রাখিতে লাগিলেন। আমি অধীর ভাবে উত্তরের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

তিনি বলিলেন—"এ বিধবাটি কে জান?"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—"কেমন করে জানব!"

—"তা বটে! তুমি ছেলেমানুষ—এ সব কথা কেমন করেই বা জানবে!"

আমি অবাক হইয়া রহিলাম।

তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"বিধবাটি তোমারই জননী!"

আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

ঘটনাচক্রের কী আশ্চর্য্য গতি!

বৃদ্ধ আমার দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—"তা হলে এ পঞ্চাশ হাজার টাকা তোমারই প্রাপ্য!"

আমি সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিয়া উঠিলাম—"কিন্তু কবিতার খাতা! সে কার?"

বৃদ্ধ আমার পানে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

আমি তাড়াতাড়ি সেই লাল ফিতা-বাঁধা কাগজের তাড়াটা তাঁহার সম্মুখে ধরিয়া বলিলাম—"এই পড়ে দেখুন!"

তিনি বিস্মিত নয়নে অনেকক্ষণ আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তার পর ধীরে ধীরে পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

পড়া শেষ হইলে কাগজগুলা আমার দিকে ঠেলিয়া দিয়া একটা রুদ্ধশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন—"এ খাতাখানি তোমার পিতাঠাকুরের! তিনি অল্প বয়সে মারা যান;—আহা! বেঁচে থাকলে তিনি একজন বড় কবি হতেন।"

বৃদ্ধ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তার পর বলিয়া উঠিলেন—"দেখি, খাতাখানা একবার!"

আমি বলিলাম—"সেই খাতাখানাই তো খুঁজছি—কিন্তু পাচ্ছিনা যে!"

আমার মামা বলিয়া যাইতে লাগিলেন—"ঐ খাতাখানি আমি অনেকবার দেখেছি। আহা! তোমার মা ঐখানি নিজের সন্তানের মতো দিনরাত বুকে করে করে বেড়াতেন,—ঐ খাতা নিয়েই তিনি স্বামীশোক ভুলেছিলেন! ঐ খানি তোমার বাবা, মারা যাবার দিন, তাঁকে উপহার দিয়ে যান!

আমার জ্ঞান হইবার পূর্ব্বেই আমার পিতামাতা আমাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন;—তাঁহাদের কাহাকেও আমার মনে পড়ে না। আজ তাঁহাদের স্মৃতি নূতন করিয়া জাগিয়া আমার চিত্তকে ব্যথিত করিয়া তুলিল। আজ আমি এই প্রথম পিতৃমাতৃ-বিয়োগের শোক হৃদয়ে অনুভব করিলাম।

ভারি ইচ্ছা হইতেছিল, সেই কবিতার খাতা খানা যদি কোনো রকমে খুঁজিয়া পাই। কিন্তু ভাবিলাম, কাজ নাই সে রাবণের চিতায়! সে আমার বাপকে খাইয়াছে, মাকে খাইয়াছে, জগদীশপুরের জমীদারকে ধ্বংস করিয়াছে; শেষে কি আমাকেও ভস্মসাৎ করিবে!

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

জাপানের ঝরণা

জাপানের প্রকৃতি-শ্রীকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে জাপানের ঝরণাগুলি। সেখানকার পাহাড়ের কোলে কোলে যেখানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রূপার তুবড়ির মতো শুভ্র ঝরণাগুলি ঝরিয়া পড়িতেছে, সে স্থানগুলি এমনি চমৎকার ও মনোরম যে মনে হয়, যে লোকে যে বলে ইহা দেবতার লীলাভূমি তাহা নিতান্ত মিথ্যা নহে। জাপানের সৃষ্টির দিন হইতে—অর্থাৎ যে দিন দেবী ইজানামি ও দেব ইজানাগি তাঁহাদের মণিমাণিক্যমণ্ডিত শূলের দ্বারা সমুদ্রের জল আলোড়ন করিতে করিতে শূলের উজ্জ্বল অগ্রভাগ হইতে গড়াইয়া পড়িয়া এই জাপান দেশটি সমুদ্রের বুকের উপরে একটি পদ্মের মতো ফুটিয়া উঠিয়াছিল—সেই দিন হইতেই জাপানের ঝরণা এক অসীম ক্ষমতাশালী দেবতার বাসস্থানরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে। এই দেবতারই অনুগ্রহে জাপানের

নাচির ঝরণা

আকাশে আলো ফোটে, বাতাস ছোটে ও মেঘ জলদান করে ; ইঁহারই ক্রোধে, ঝড় উঠিয়া দেশ লণ্ডভণ্ড হয়, প্লাবনে সব ভাসিয়া যায়, আগুনে ভস্মসাৎ হয়।

জাপানীরা চিরদিনই প্রকৃতির উপাসক ;—শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভয়ে তাহারা প্রকৃতির উপাসনা করিয়া আসিতেছে। সেই জন্য প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ আভরণ এই ঝরণাগুলি সম্বন্ধে জাপানে প্রবাদের অন্ত নাই। তাহা ছাড়া, ঝরণার এই পবিত্র জল লইয়া কত অভিষেক হইয়াছে, কত পাপীর পাপক্ষালন হইয়াছে, কত তপস্বী ইহার কোলে বসিয়া তপস্যা করিয়াছে, কত অনুতপ্ত পাপী তাহাদের পাপতাপের জ্বালা জুড়াইয়াছে, কত ব্যর্থজীবন ইহাতে বিসর্জ্জিত হইয়াছে—সেই সমস্ত স্মৃতি বহন করিয়া এই শুভ্রোজ্জ্বল ঝরণাগুলি মানবের ভয়বিস্ময়মুগ্ধ চোখের সম্মুখে এখনও জীবন্ত হইয়া আছে।

সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ঝরণাগুলি কী প্রদেশের অন্তর্গত নাচীর মধ্যে বিরাজিত। এইখানে একটি বিখ্যাত বৌদ্ধমন্দির আছে। 'কানন' সম্প্রদায়ের যে তেত্রিশটি পবিত্র তীর্থমন্দির আছে তাহার মধ্যে এই মন্দিরটি প্রথম।

শিরাইতো ঝরণা পরিবার

এই ঝরণাগুলির নাম ঈচি, নী, সান্-নো-তাকি অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ঝরণা। এই নামগুলি ঝরণাসমূহের সংখ্যা ও পর্য্যায় অনুসারে প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম যেটি সেইটিই সব চেয়ে বড়—২৭৫ ফুট তাহার উচ্চতা।

ইহারই জলের ধারে বসিয়া বহুদিনের তপস্যার পর সম্রাট কোয়াজান মোক্ষ লাভ করিয়াছিলেন। মোংগাকুর হত্যাপরাধের পাপক্ষালন এইখানেই হইয়াছিল; এইখানে বসিয়াই অবশেষে সে ঋষিত্ব লাভ করে।

মোংগাকু, কেসা-গোজেন নামে এক রমণীকে ভালোবাসিত। কিন্তু রমণী ছিল বিবাহিত;—স্বামীর প্রণয়ে ছিল সে মুগ্ধ। সেই জন্য মোংগাকু এমনই ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল যে কেসা-গোজেনকে না পাইলে সে যেন পৃথিবীকে রসাতলে দিবে। তাহার হাতে কেসা গোজেনের জননীর লাঞ্ছনার অন্ত ছিল না;—তাঁহার কাছে মোংগাকু দাবী করিয়া বসিয়াছিল যে যেমন করিয়াই হৌক্ তাঁহার কন্যাকে তাহাকে দিতে হইবে,—নইলে সে তাঁহাকে খুন করিবে!

মায়ের বিপদ দেখিয়া কেসা-গোজেন ভীত হইয়া উঠে এবং মোংগাকুর প্রস্তাবে সম্মত হয়। সে মোংগাকুকে গোপনে বলে যে যদি তাহার স্বামীকে সে হত্যা করিতে পারে তাহা হইলে তাহার পত্নী হইতে কেসা-গোজেনের কোনো আপত্তি থাকিবে না।

মোংগাকু ইহাতে আনন্দের সহিত সম্মতি দান করিল। সমস্ত ঠিক হইল;—কখন্, কোন্ সময়ে কেমন করিয়া আসিয়া মোংগাকু স্বকার্য্য সাধন করিবে তাহা কেসা-গোজেন তাহাকে ভালো করিয়া বুঝাইয়া দিল;—এবং তাহার স্বামী রাত্রে কোন্ বিছানায় শয়ন করে তাহা মোংগাকুকে ভালো করিয়া চিনাইয়া দিল।

যথাসময়ে মোংগাকু আসিয়া তাহার প্রণয়িনীর স্বামীর আপাদমস্তকাবৃত দেহের উপর সুতীক্ষ্ণ তরবারি বসাইয়া দিল।

কেগোন

কিরিফুরি

কিন্তু এ কি! আর্ত্তনাদের স্বর এমন মিহি কেন। এ তো পুরুষের কণ্ঠ নয়। মোংগাকু তাড়াতাড়ি আবরণ খুলিয়া ফেলিল; দেখিল, পুরুষ-বেশে সজ্জিত তাহারই প্রণয়িনীর বুকে তাহার হাতের সুতীক্ষ্ণ তরবারি বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

মোংগাকু অনুতাপে বিদ্ধ হইয়া তখনই বিবাগী হইয়া গেল।

যেখানে ঝরণা জোড়া জোড়া আছে সেখানে তাহাদের স্ত্রী পুরুষ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। নুনোবিকির ঝরণা—মি-দাকি—স্ত্রী এবং ওদাকি—পুরুষ - কোবে সহর হইতে খুব কাছে। যাঁহারা কোবে সহরে যান তাঁহাদের কাছে ইহা বিশেষ আকর্ষণের সামগ্রী। এখানে অনেক চায়ের আড্ডা আছে—দর্শকের ভিড়ে সেগুলি সর্ব্বদাই গুলজার।

শোজি হ্রদের সন্নিকটে—ফুজি পর্ব্বতের পাদদেশে শিরোইতো ঝরণা-পরিবার। সত্যই যেন একটি পরিবার। দুইটি বড় বড় ঝরণা যেন স্বামী ও স্ত্রী; এবং আশে পাশে অনেকগুলি ছোট ছোট—যেন ছেলেমেয়ে, নাতিনাত্নিরা ঘেরিয়া আছে। ইহাদেরই কাছে আর একটি বিপুল উচ্ছ্বাসময় ঝরণা আছে, সকলে তাহাকে বলে "ওতো-দেমে"—অর্থাৎ চুপ!

দুই ভাই তাহাদের পিতৃহন্তাকে দুই দিক হইতে খুঁজিতে খুঁজিতে এই ঝরণার নিকটে আসিয়া পৌঁছে —একজন উপরে, একজন নীচে। দুই জন দুই জনের মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছে কিন্তু জলের গর্জ্জনের জন্য পরস্পরের কথা শুনিবার উপায় নাই। অনেক দিনের পর দুই ভাইয়ের দেখা—কথা কহিবার জন্য তাহারা আকুলিব্যাকুলি করিতেছে, কিন্তু পারিতেছে না। তাহাদের এই ব্যাকুলতা দেখিয়া হঠাৎ ঝরণা তাহার গর্জ্জন থামাইয়া লইল। দুই ভাইয়ের কথা শেষ হইলে আবার প্রপাতের শব্দ আরম্ভ হইল। এইজন্যই ইহার নাম হইয়াছে "চুপ"।

মিনো প্রদেশে ওঙাকি-সন্নিকটে একটি জলপ্রপাত আছে। ইহা বহুদিন ধরিয়া সুরার ফোয়ারা খুলিয়া রাখিয়াছিল।

এক ছিল বৃদ্ধ কৃষক, তাহার ছিল এক পুত্র। তাহাদের মতো এমন গরীবদুঃখী দেশের মধ্যে আর একটি ছিল কি না সন্দেহ। পিতা স্থবির—কোনো কাজ কর্ম্ম করিবার সামর্থ্য তাহার নাই; পুত্র সমস্ত দিন ধরিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া কোনো রকমে বাপের মুখে দুই মুঠা দিয়া নিজের মুখে এক মুঠা তোলে। বাপের ভারি ইচ্ছা হইল, সুরা পান করতে। পিতা বুড়ো, কবে মরিয়া যাইবে ঠিক নাই— তাহার এই শেষ-বয়সের শেষ সাধ মিটাইতে না পারিলে চিরদিন অনুতাপ থাকিয়া যাইবে—এই ভাবিয়া পুত্র ম্রিয়মাণ হইয়া রহিল। কিন্তু উপায় কি? পুত্র অনেক ভাবিয়া স্থির করিল যে নিজের এক মুঠা অন্ন হইতে কমাইয়া আধ মুঠা করিয়া, কখনো বা অনাহারে থাকিয়া, তাহার বিনিময়ে বাপের জন্য সুরা সংগ্রহ করিবে। শেষে অনাহারে অনাহারে পুত্র একেবারে জীর্ণশীর্ণ হইয়া পড়িল—নড়িতে পর্য্যন্ত পারে না; কিন্তু তবুও বাপের জন্য সে কাজে যাইত— নইলে বাপ যে না-খাইয়া মারা যাইবে। পিতার তুষ্টির জন্য এত কষ্ট স্বীকার—এমন পিতৃভক্তি- দেখিয়া দেবতারা সন্তুষ্ট হইয়া এই ঝরণার মুখে সুরার উৎস খুলিয়া দিলেন। বাপ যত দিন জীবিত ছিল, এইখান হইতে পুত্র তাহার জন্য সুরা লইয়া যাইত।

নিক্কোর সন্নিকটবর্ত্তী কেগোন-প্রপাত জাপানের ঝরণার মধ্যে উচ্চতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহার জল আড়াই শত ফুট উচ্চ হইতে ঠিক ঋজু ভাবে মাটিতে আসিয়া পড়িতেছে। তাহাতে চতুর্দ্দিকে কী চমৎকার শীকর-নির্ম্মিত-মায়াজাল রচিত হইয়া উঠিতেছে! শোভায় ও সৌন্দর্য্যে এই ঝরণাটি শ্রেষ্ঠ;—জাপানীরা এটিকে বড়ই ভালোবাসে, কিন্তু কয়েক বৎসর হইতে ইহার উপরে একটি শোকের কালিমা আসিয়া পড়িয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে এক বিফলমনোরথ ছাত্র ইহারই বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল। তাহার দেখাদেখি আরো কয়েকটি সমাবস্থার ছাত্র পরে পরে তাহার গতি অনুসরণ করে। এই স্থানে আসিয়া আত্মহত্যা করাটা ছেলেদের মধ্যে যেন চলিত হইয়া পড়িতেছিল। সেই জন্য এই স্থান এখন প্রহরী-বেষ্টিত। নিক্কোর নিকটবর্ত্তী আরো একটি ঝরণার নাম কিরিফুরি অর্থাৎ কুহেলি-প্রপাত!

ইহা ছাড়া আরো কতকগুলি বিখ্যাত ঝরণা আছে তাহার মধ্যে দুই একখানির ছবি এইখানে প্রদত্ত হইল।

সেৎসু প্রদেশের মিনোয়া পর্ব্বতের উপরে মিনোয়া নামেই একটি প্রকাণ্ড ঝরণা আছে। ৯৬২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইহা তীর্থস্থানরূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে।

শোনাই

ওশিমা

সেই সময় রাজসরকার হইতে এই ঝরণার অধিষ্ঠাতা দেবতার জন্য বিপুল সম্ভারে পূজা গিয়াছিল। তাহাতেই না কি বহুদিনের অজন্মা ও অনাবৃষ্টি দূর হইয়া দেশে সুখ শান্তি ফিরিয়া আসে।

এমনি করিয়া নানা প্রকারে জাপানের ঝরণাগুলি বহুদিন হইতে পূজা পাইয়া আসিতেছে;—কত কবি ইহার সৌন্দর্য্য-গান গাহিয়াছেন, কত চিত্রকর ইহার প্রাণের কথা আঁকিয়াছেন, কত পুণ্য স্মৃতির সহিত, কত বিখ্যাত চিত্রের সহিত, কত গীত-গাথার সহিত জড়িত হইয়া ইহাদের নাম জীবন্ত হইয়া রহিয়াছে।

অন্তিমে

(কোনও রুশ নাটিকার ভাবানুবাদ)

সময় রাত্রিকাল, স্থান নাগরিক রঙ্গালয়; অভিনয় সমাপ্ত। ডাইনে মোটা কাঠের ভারী ভারী দরজায় সারি, সবগুলিই সাজঘরে যাইবার পথ, বাঁয়ে, দূরে রঙ্গমঞ্চ, বহু অনাবশ্যকীয় আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ—মধ্যে একখানি কাঠের টুল উল্টাইয়া পড়িয়া আছে।

পাত্র-অভিনেতা বৃদ্ধ পরমানন্দ—বয়স, আটষট্টি বৎসর এবং ভৃত্য জগাই।—

সাজঘর হইতে হাতে একটি জ্বলন্ত মোমবাতি লইয়া অভিনেতা পরমানন্দের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ এবং উচ্চ হাস্য করিয়া—

সত্যি বড় মজা, এমন আমোদ আর কখনো হয়নি, অভিনয়ের পরে আমি সাজ ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সবাই চলে গিয়েছে, আর আমি কিনা এখনো সেখানে পড়ে নাক ডাকাচ্ছি। আর ভাই বুড়ো হয়ে গিয়েছি, বাহাত্তুরে পেয়েছে। বদঅভ্যেস গুলোও তো ছেড়ে গেল না, আজ ধান্যেশ্বরীর পূজাটা বিধিমত হয়েছিল, তাই শুতে আর হয়নি, বসে বসেই স্বপ্ন প্রয়াণ, এটা কি কম বুদ্ধির পরিচয়! শোবার শ্রমটুকুও করতে হ'ল না একেবারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই দিব্য গতি। আরে জগা, আরে মেধো কোথা গেলিরে? দাঁড়ানা, সাড়া দেওয়া নেই? একেবারে মেরে ভূত ভাগিয়ে দিচ্ছি। হতভাগারা ঘুমিয়েছে, মাতা বসুমতীর অপস্মার রোগে কাঁপতে কাঁপতে কাশীপ্রাপ্তি হ'লেও কুম্ভকর্ণদের নিদ্রা ভঙ্গ হচ্ছে না। আরে একেবারে নিঃশব্দ, শুধু প্রতিধ্বনি ভয়ে ভয়ে "কু" দিচ্ছে, পাছে চোর ধরা পড়ে! জগাই জগরাম (টুলটা উঠিয়ে নিয়ে তার উপর বসে), আমি জগাকে আর মেধোকে কিছু বকশিষ দিয়েছিলাম, তাই একেবারে বেমালুম অদৃশ্য। বদমায়েস দুটো পলাতকা, আমাকে বুঝি বা বন্ধ করেই রেখে গেছে —নাটমন্দিরের সব পথই দেখছি যে রুদ্ধ। (চারিদিকে দেখে) এখনও নেশাটা আছে যেন। রাম রাম, আজকের অভিনয় আমার উপকারের জন্যেই হয়েছিল, তারি সম্মান রক্ষা করে গলার এই চোঙটার মধ্যে দয়ে কত মদই যে উদরজাত করেছি এখন মনে করে ঘৃণা হচ্ছে! মা দুর্গে, শরীরে যে বাড়বানল প্রবেশ করেছে, মুখের মধ্যে শুধু একখানি জিহ্বাই দিয়েছিলে, এখন যে লোলায়মান, উর্দ্ধমুখী সহস্র শিখায় সে আমার প্রাণান্ত করছে। কি ভয়ানক কি বিবেচনা রহিত। এ নরাধম আবার একেবারে মদিরা-বিহ্বল, একেবারে বাহ্যজ্ঞান শূন্য, সে জানেও না, কে তাকে আজ সম্মান করে গেল। মাথাটা ফেটে পড়ছে, শরীরে ভূমি-কম্প ধরেছে রসাতলের নাগিনী সবাই মিলে কামড় দিচ্ছে। অন্তরে বাহিরে অন্ধকার, শীতার্ত্ত আমি যেন কোন ব্যবসাদারের মদের বোতল জমায়েৎ করবার মাটীর নীচেকার চোর কুঠরি। শরীরটা তো গেছে, এতদিন তার কথা ভাবিনি, আজ ভাবলেও ফল হবে না, তবে বয়স যে হয়েছে, তাতো আর ভুলে থাকবার যো নেই। বুড়ে

বেল্লিক আমি, ভেবেই বা কোন উপায় হবে? ভাঁড়ামি করলেই কি আর যৌবন ফিরবে, তুমকি হামকি কর, আর বাপু বাছাই বল, সে যাদুধন আর ফিরেও চাইবে না! তবে রীতিমত কুর্ণিশ করে, আটষট্টি বছরের কাছে বিদায় নাও—আর তাদের দেখা পাবে না! যাওয়াও তো ক্ষণিকের অদর্শন নয়, এ যে একেবারে কাল সাগরে লীন; আর আর আসবে না, আর কখনোই আসবে না, বুদ্বুদ হয়েও দেখা দেবে না যে। বোতলটি নিঃশেষ করে পান করেছি —তলানি দু'এক ফোঁটা ছাড়া কিছুই পড়ে নেই পরমানন্দ গোঁসাই, সত্যিকে ভয় করে পার পাবে না! নেই, নেই কিছুই নেই। এখন তোমায় বোবা হতে হবে। উগ্ররসে জরান জারক নেবুটির মত; নিঃশব্দে বোতলজাত হয়ে থাক আর কি! জড়ের অভিনয় কর, চলা বলা সব বন্ধ। যমরাজা আর বড় দূরে নেই। (সম্মুখে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে) বল্লে প্রত্যয় যাবে না, আজ ৪৫ বৎসর রঙ্গমঞ্চের উপরেই জীবন যাপন করলাম, তবু দীপ নির্ব্বাণের পর, আজকের রাতে এই প্রথম আমি নাট্যশালাখানি চক্ষু চেয়ে দেখলাম। এই প্রথম, মহামায়া, চারিদিক কি অন্ধকার! (ফুট লাইটের কাছে গিয়ে) একেবারে কিছুই দৃষ্টি গোচর হচ্ছে না, না, না, অস্পষ্ট ভাবে প্রম্পটারের ছোট্ট কুঠুরিটি আর তার ডেস্ক দেখতে পাচ্ছি। তাছাড়া আর সব আলকাতরার মত নিবিড় জমাট কালো! অতল গহ্বর—কবরের মত, মৃত্যু বুঝি বা ঐখেনেই লুকিয়ে আছে। হরি, হরি, কি ভয়ানক শীত; রঙ্গালয়ের মধ্যে দিয়ে বাতাস চলা-ফেরা করছে, ঠিক যেন সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে বরফের তীর সব ছুটে চলেছে; যেখানে ছুঁচ্চে একেবারে অসাড় মৃতপ্রায় করে দিয়ে যাচ্ছে। ভূত, প্রেত, আর কোথায়, এইখানেই সব বাসা বেঁধেছে! শীতে আমার বুকের পাঁজরা, পিঠের দাঁড় ধরে সজোরে নাড়া দিচ্ছে।—জগা, মেধো দুজনে তোরা কোথায় গেলিরে? মনের মধ্যে বড্ড ভয় লাগছে, কত বিভীষিকাই দেখছি। মদটা না ছাড়লে চলছে না দেখছি। বুড়ো হয়েছি আর তো বেশী দিন নেই। আটষট্টি বৎসর, এখন পরপারের জন্যে প্রস্তুত হতে হয়—পূজার্চ্চনা, ধ্যান ধারণা, দান দক্ষিণার এই ত সময়, আর শিবশম্ভো, আমি কি করছি—মদের ভাঁড় হাতে, গায়ে দুর্গন্ধ, টলমল করে, আবোল তাবোল বকে, উঠে পড়ে রীতিমত ভাঁড়ামি করেই চলেছি! হায়, আমার দিকে চেয়ে দেখলেও অন্যের পাপ স্পর্শে! এখুনি বদল করতে হবে, দেরী নয়, আর দেরী নয়; এই বেশে, এই দেশে, এই ভাবে আর বেশীক্ষণ থাক্‌তে হলে, ভয়েই মারা যাব। (সাজ ঘরের দিকে অগ্রসর হতে, ঠিক সেই সময়ে দূরে রঙ্গমঞ্চের অপর দিকে আলবাল্লা হাতে ভৃত্য জগাকে দেখে ভয় খেয়ে, বেজায় চীৎকার করে পিছিয়ে গিয়ে) আরে কে তুই, কে তুই বল্ না, কি চাস, বল কি চাস্? (পা দাপিয়ে আবার) কে তুই রে কে তুই?

জগা।—বাবুজি আমি যে জগা!

পরমানন্দ।—কে তুই, বল না কে?

জগা।—(আস্তে সমুখে এগিয়ে গিয়ে) আমি জগা, বাবুজি রোজ অভিনয়ের সময়

পাঠ ভুলে গেলে, আমিই যে তোমায় মনে করিয়ে দি, আর তুমি আমায় একেবারে বিস্মরণ হলে!

পরমানন্দ।—(নিতান্ত নাচার ভাবে টুলের উপর বসে, ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে ও হাঁসফাঁস করে নিশ্বাস ফেল্‌তে ফেল্‌তে) ত্রাহি মধুসূদন! কে তুই বল না। (নিরীক্ষণ করে দেখে) মাভৈঃ মাভৈঃ ওরে বুঝেছি, তুই হচ্ছিস জগাইনাথ! আচ্ছা জগ পরামাণিক এখানে কি করা হচ্ছে?

জগাই। বাবুজি, এই সাজঘরে আমি রাত কাটাই, দোহাই তোমার, কথাটি কাবো কাছে ফাঁস ক'রো না! আমি আর কোথায় যাব বল? ঘর বাড়ী তো কিছুই নেই—এই আমার আস্তানা, আমার একমাত্র আশ্রয়।

পরমানন্দ।—জগাই এ যে তুই বটে, সে কথা এতক্ষণে বুঝলুম। একবার ভেবে দেখ দেখ, আজকের দর্শক মণ্ডলী আমাকে Encore করে, বার বার ষোল বার ডেকে নিয়ে গিয়েছিল, আমাকে দেখে তাদের আশ যেন আর মিটছিল না, কতগুলো গড়ে মালা চারিদিকে ছড়াছড়ি গড়াগড়ি যাচ্ছিল, কত ফুল, কত কি, তার কি গোণাগুন্তি ছিল? উৎসাহে তারা ক্ষেপে উঠেছিল বল্লেও বেশী বলা হয় না! কিন্তু যখন সব হয়ে গেল, শেষ হ'ল, তখন কি একটি প্রাণীও আমায় জাগালে না, বুড় অসমর্থ মাতালটাকে বাড়ী এগিয়ে দেবার জন্যে এলো না! জগাই, বুড় হয়ে গেছি, একেবারেই বুড়, আটষট্টি বৎসরের অক্ষম রুগ্ন বুড়ো! আবার যে পথ চলি, আবার যে এগিয়ে যাই, সে সামর্থ্য আর কোথায়? (জগাইএর গলা ধরে কান্না) জগু, তুমি আমায় ছেড়ে যেও না, আমি বুড়ো, আমি অথব্ব, মরণ এগিয়ে আস্‌ছে বেশ জান্‌তে পারছি। হায় হায় কি হবে? কি ভয়ানক পরিণাম!

জগা।—(মমতা ও সম্মানের সঙ্গে) বাবুজি এস, বাড়ী চল—রাত অনেক হয়েছে, বাড়ী যাবার সময় হল যে!

পরমানন্দ।—বাড়ী যাব? ওরে আমার বাড়ী কোথায় যে যাব? বাড়ী নেই, ঘর নেই, কিছু নেই, কেউ যে নেই!

জগা—বাবুজি, তোমার বাসা কি ভুলে গেলে?

পরমানন্দ।—না। আমি সেখানে যাব না, কখনই না, কে আমার সেখানে আছে? ওরে আমার কেউ নেই, কেউ নেই. স্ত্রী নেই পুত্তুর নেই! আমি পতিত মাঠের উপরকার হঠাৎ বয়ে যাওয়া হাওয়া। চলে গেলে কেউ আর মনে রাখে না। ওরে একার মত দুঃখু নেই, কেউ যারে চায় না, হেসে কথা কয় না, আদর করে না, ঝুঁকে পড়লেও তুলে ধরে না, টলে পড়লে গড়িয়ে গেলেও হাতে ধরে নেয় না। আমি কার রে জগা? কে আমারে চায়, হায় কে ভাল বাসে! কেউ নারে কেউ না!

জগা।—(কাঁদতে কাঁদতে) বাবুজি থিয়েটার দেখতে দলে দলে যারা আসে, তারা সবাই যে তোমায় কত ভালবাসে।

পরমানন্দ।—তারা সবাই তো ঘরে ফিরে গেছে, সবাই তো আরামে ঘুমিয়ে পড়েছে, এ বুড় বাঁদরকে আর কে মনে রেখেছে বল? ডুগডুগির তালে যতক্ষণ নেচেছিলাম ততক্ষণই ছিল আদর! আমাকে সত্যি কারো দরকার

নেই, কারো মমতা আমায় অনুসরণ করে না, না আছে আমার স্ত্রী পৃথিবী ভরা এত মানুষ জন, আর আমার একটি ছোট্ট ছেলেও নেই!

জগা।—বাবুজি দিন থাক্‌তে কাউকে ঘরে আনলে না, এখন ছেলে আসবে কোথা থেকে—এখন এ সব কান্নাই বৃথা!

পরমানন্দ।—তবু আমি মানুষ তো বটি, এখনও বেঁচে আছি যে! তাজা গরম রাঙা রক্ত আমার শিরায় ছুটে চলেছে, যার তার রক্ত নয়, একেবারে নিছক রাজ-বংশের—বঙ্গদেশের রাজতম বংশে আমার জন্ম, আমার আভিজাত্যের পরিচয় কি আর কাউকে বলে দিতে হয় জগাই? এমন জাহান্নমে যাবার আগে আমি যে আর একটা মানুষ ছিলাম—তীরের মত সোজা, দেবদারু গাছের মত সুশ্রী আর বাতাসের মত উৎসাহী! সে অতীত সুখের দিনগুলো গেল কোথায়? এই অন্ধকূপ, এই রসাতল পুরীইতো তাকে গ্রাস করে বসে আছে—আজ মুখে কথাটি নেই, স্নেহের এতটুকু ইঙ্গিতও কোথাও প্রকাশ পাচ্ছে না। সব যে একে একে মনে উদয় হচ্ছে—পঁয়তাল্লিশ বৎসর অর্দ্ধশতাব্দি ঐখানে কবর দিয়েছি। সে কি জীবন জগা? আমি তোর মুখের মত তার প্রতি রেখা, প্রত্যেক বিন্দুটি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। যৌবনের সেই নিরুপম উল্লাস, সেই আশা সেই উচ্ছ্বাস, সেই মোহ আর সেই ভালবাসা -রমণীর রমণীয় ভালবাসা!

জগা।—এখন শুতে গেলে, হ'ত না? রাত যে ভোর হয়!

পরমানন্দ।—সেই যে সময় রঙ্গমঞ্চের রাজা হয়েছিলাম, যৌবনের সব সৌন্দর্য্য চারিদিকে উৎসারিত হয়ে উঠেছিল, মনে পড়ছে তখন একজন নারী আমার অভিনয়ের জন্যে আমায় ভালবেসেছিল। সে কি সুন্দরী, সুকুমার দেহযষ্টিখানি তরুণ তরুর মত নম্র কোমল, কিশোরীবালা, নির্দ্দোষ নিষ্কলঙ্ক, স্বর্গ সুষমা অবিরত তার মনে বাস করত, তারি ছায়ায় তার চোখ দুটি আচ্ছন্ন থাকৃত, চৈত্র প্রভাতের মত সে বিচিত্র লীলাময়ী সুশোভনা ছিল, তার হাসির জ্যোৎস্নায় জীবনের অন্ধতম রাত্রিও উজ্জ্বল হয়ে উঠত। আজ তোর সামনে যেমন দাঁড়িয়ে আছি, একদিন এমনি নিকটে তার সম্মুখে দাঁড়িয়েছিলাম। সেদিনের মত অমন সুন্দর আর তাকে কখনো দেখিনি। সে একটিবার আমার সঙ্গে কথা কয়েছিল, ওরে মুখের কথা নয়, চোখের অকৃত্রিম ভাষা, মরমের মমতা-বারতা! সে দৃষ্টি কে সৃষ্টি করে-ছিল? কখনো সে চাহনি ভুলিনি, কখনো ভুলতে পারব না, চিতাশয়নেও না, পরলোকেও না! স্নিগ্ধ, সুকোমল, সুগভীর উজ্জ্বল তরুণ দৃষ্টি। অনুপম আনন্দে অভিষিক্ত হয়ে, অমৃত মুগ্ধের মত, আমি জানু পেতে, করজোড়ে তার কাছে, আমার জীবনদেবতার কাছে, সুখের বরভিক্ষা করলাম—"সে শুধু বল্লে, রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে চলে এস, নটের ব্যবসা ত্যাগ কর।" রঙ্গমঞ্চ ছাড়তে হবে? ওরে বুঝলিনে, সে নটকে ভালবাস্‌তে পারে, বিয়ে করতে কখনো পারে না, আত্মসমর্পণ করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। সেদিন যার চরিত্র অভিনয় করেছিলাম, সে একজন বিদূষক, তরলমতি চঞ্চল যুবক।

অভিনয় কর্ত্তে কর্ত্তে আমার চোখের

উপর হ'তে একটা পর্দ্দা যেন খসে গেল—আমি বুঝলাম, যে শিল্পকলাকে আমি পূজা করেছি, যাকে আমি দেব আরাধনার মত পুণ্যসাধনা মনে করেছি, সেটা কিছুই নয়, সে শুধু মায়া-ভ্রান্তি, নিষ্ফল স্বপ্নমোহ! আর আমি? সাধক নই, ভক্ত নই, পুরোহিত নই, আমি শুধু অপরের পদানত ক্রীতদাস, অপরের আমোদের উপায়মাত্র, অজানিত মমতা-রহিত জনতার ক্রীড়াপুত্তলি। আমি সেই মুহূর্ত্তেই আমার দর্শকদেব বুঝতে পারলাম, তারপর হতে আর কখনো তাদের প্রশংসাবাদে আস্থা স্থাপন করিনি, তাদের পুষ্প-উপঢৌকন, উৎসাহের জয়ধ্বনি আমার মনে আনন্দ সঞ্চার করতে পারেনি! সত্যি কথা জগাই, তাদের জয় জয়কারে আকাশ ভেঙ্গে পড়ে, আমার ছবি কিনে তারা ঘরে সাজিয়ে রাখে, তবুও আমি তাদের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, অপরিচিত! তারা আমায় জানেনা, পদদলিত ধূলিরাশির মত সম্পূর্ণ অবজ্ঞাত। আমার সঙ্গে বসে, দু'দণ্ড হাসি মস্করা করতে তাদের সবাই উৎসুক, তাই বলে, তাদের বোন কি মেয়েকে আমার সঙ্গে জীবন সম্বন্ধ পাতাতে দেবে, এমন কথা স্বপ্নেও কল্পনা করে না! সমাজগণ্ডীর বাইরে পরিত্যক্ত, প্রত্যাখ্যাত জাতিচ্যুত আমি গৃহ-সীমায় স্থান পাবার যোগ্য নই। তাদের আমি বিশ্বাস করিনে, তাদের সহৃদয় ব্যবহারেও আমার মনে স্নেহের প্রত্যয় আনে না!

জগা।—বাবুজি, তোমার মুখ যে বড্ড ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে—আমাকে একেবারে ভয় খাইয়ে দিলে যে, দোহাই তোমার পায়ে ধরি, এবার বাড়ী চল!

পরমানন্দ। সেই দিনই আমি সব চাতুরী বুঝতে পেরেছিলাম, শ্যামা শিবমোহিনী, মাগো, বড় বেদনার মধ্যেই জ্ঞানের জন্মলাভ হয়েছিল, জগা সেই দিন, যেদিন সেই মেয়েটি, তারপর; যাক তার কথা! তখন হতে আমার জীবনের লক্ষ্য চলে গেল, প্রত্যেক দিনই আমার অতীত বর্ত্তমান আর ভবিষ্যতের কেন্দ্র হয়ে উঠল, ক্ষণিক আমার অনন্তকে গ্রাস করলে! আজকে ছেড়ে কা'লকের কথা আর আমার মনে স্থান পেত না! সেই সময় হতে আমি, বিদূষক আর অতি হীনচরিত্র সকলের অভিনয় করতে আরম্ভ করলাম; আমার মনের, আমার শক্তির ক্রমে ক্রমে বিনাশসাধন হ'ল। তবুও, একদিন আমি অতি প্রতিভাশালী অভিনেতা ছিলাম, অল্পে অল্পে আমার প্রকাশের শক্তি ক্ষীণ হয়ে গেল, আমার সৌন্দর্য্য গেল, স্বাস্থ্য গেল, মনুষ্যত্ব গেল, বাকী রইল শুধু ধার করা অস্তিত্ব, যাত্রার সং, নাটকের বিদূষক, রাজসভার বিট! সম্মুখের ঐ অন্ধকার অতল গহ্বরই রাক্ষসীর মত মুখব্যাদান করে আমার সমস্ত জীবনটা শুধু গ্রাস করেনি, পরিপাক করে বসে আছে! আজকের আগে সেকথা, আমি এমন ভাল করে বুঝতে পারিনি। কিন্তু আজ ঘুম ভেঙে উঠে সব কথা আমার মনে যেমন স্পষ্ট হয়ে উঠল, এমন আর কখনো হয়নি! ফিরে চেয়ে, আমি যেন আমার সেই অতীত আটষট্টি বৎসরকে একে একে সুস্পষ্ট দেখতে পেলাম। বুড় হয়ে যাওয়ার যে কি কষ্ট, বার্দ্ধক্য, জরা কি ভয়ানক! এই মুহূর্ত্তে বুঝলাম—সব গিয়েছে—আর বাকী কিছু নেই—

(কাঁদতে কাঁদতে) ওরে আর কিছুই নেই।

জগা।—বাবুজি থাক্, থাক্ কেঁদনা, কেঁদনা, দয়া কর, শান্ত হও। মেধো হরা এদিকে আয়!

পরমানন্দ।—কি শক্তি আমি ধরতাম, বিধিদত্ত সে ধন সাধনায়ও মেলে না। সে সৌভাগ্যের অর্জ্জন, অযাচিতে আসে, অমূল্য বলেই তার সমাদর আমরা জানিনে! আরে জগা, তুই কি জানবি ভাষা কি হিল্লোলে অবাধে ভেসে চল্‌ত—কি করুণ কল্লোলে, কি সুমধুর ধ্বনিতে (বুকে হাত দিয়ে) প্রাণের তন্ত্রী কত অভিনব রাগিণীতে ঝঙ্কৃত হত। মনে করতেও আমার নিশ্বাস আটকে আসে, শোন্ জগা, দাঁড়া একটু দম্ নিয়েনি। এইবার শোন দেখি—

দারা শেকো, সেই তার রক্ত-প্লুত ছায়া
ফিরে এসে, বিদ্রোহের দুরন্ত নিশ্বাসে
ছড়াইছে দাব দাহ! মৃত সাহাজাদা
জীবনের সিংহাসনে যাচে অভিষেক—
ব্যর্থ হবে আবেদন তার? বন্দীসম
সে কি কভু যাচিবে করুণা? যুবরাজ,
রাজ্যলোভে অপরের করিবে সাধনা?

বল্ তো রে কেমন বলেছি? দাঁড়া এবারে আর কিছু বল্‌ব—বর্ষার দুর্য্যোগ, ঘনঘোর তমিস্রা, বৃষ্টির আর অন্ত নেই, বজ্রনাদে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কম্পান্বিত, বিদ্যুৎ আকাশের আচ্ছাদনখানা ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করছে—তারি মাঝে পান্থ কে? কোন্ হতভাগ্য—রাজ্যচ্যুত রাজা!

প্রভঞ্জন, রুদ্র শঙ্খে পূরিতে নিশ্বাস
স্ফীত গণ্ড আজি তোর কেটে পড়ে যাক্,
প্রলয়ের প্রচণ্ড পিণাক বজ্রনাদ
করুক প্রচার, বন্যার বাধাহীন
উদ্দাম প্লাবনে মগ্ন হোক বসুন্ধরা,
লুপ্ত হোক দেবতার নিকেতন যত;
গৃহ পারাবত সবে চলুক ভাসিয়া।
লৌহ-তন্তু চিন্তা জাল ছিন্ন করে-দেওয়া
বিদ্যুতের দীপ্ত করবাল সুশাণিত
হোক আরো, বারম্বার নির্ম্মম আঘাতে,
বাসবের ঐরাবত দৃপ্ত শুণ্ড ভরি
অবিরাম ঢালুক প্রপাত, পল্লবিত
অশ্বত্থের, মন্দিরের মণ্ডপের মত
প্রকাণ্ড শিখরে, পড়ুক ইন্দ্রের বজ্র,
বিজুলি শিখায় তারি দগ্ধ হোক মম
পলিত মস্তক, বিশ্বে অপস্মার আনা
ভীম বজ্রনাদে ধরণীর পূর্ণ গর্ভ
হোক ধরাশায়ী, লীলাময়ী প্রকৃতির
সব সৃষ্টি চূর্ণ হোক, অণু পরমাণু
যা দিয়ে গঠিত অকৃতজ্ঞ মানবের
সুন্দর শরীর, প্রতি পরমাণু তার
মিশাক ধূলার সনে চরণের তলে।

শুনলি ত জগচন্দ্র, কেমন শুনলি বল?

এবারে, এক মুখ হেসে একটু ভাঁড়ামি করা যাক্, দেখবি তাও কেমন যুৎ করে পারি।

"ওগো খুড়ো, শুকনো বাড়ীতে রাজসভার পতিতপাবন সলিল, পথে ঢলান এ নালার জলের চেয়ে ঢের ভাল। খুড়ো মশাই, অন্তঃপুরে ঢুকে কল্যাণী পুত্রবধূর আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করে আন, এ যে রাত—পণ্ডিত কি গণ্ডমূর্খ, কাউকে খাতির কর্ব্বে না।"

পেট যদি করে গড় গড়, আগুন উল্কার তোল,
কুলকুচো কর বৃষ্টিধারা, ক্ষিতি, অপ তেজ আর
মরুৎ, আকাশ পুত্র কিম্বা কন্যা রত্ন নহে মোর
তাদের কৃতজ্ঞ হতে বলিব কেমনে? কোন জোরে?
রাজ্য ধন দিইনি তাদের,—বাছা বলে কোলে টেনে।

(হেসে জগাকে কোলের মধ্যে টেনে), বাহবা, বাহবা, Encore Encore—এর মধ্যে বৃদ্ধাবস্থা কোথা? কে বল্লে আমি বুড়? কখ্খনই না, কখ্খনো হব না।

বোকায় বুড় হয়! শক্তির প্লাবন আমার শিরায় শিরায় ছুটেছে, আরে এই ত জীবন, এই যৌবনের অনুপম উল্লাস। বার্দ্ধক্য আর ধীশক্তি একত্রে বসবাস করতে পারে না। জগা তুই যে একেবারে বোবা হলিরে! আচ্ছা সবুর কর, বুদ্ধিটাকে একটু ঘুরিয়ে আনি হরি বল, হরি বল, মধুময় রামনাম বল, গৌড়ানন্দ অদ্বৈত নিতাইকে স্মরণ কর!

আরে আর একবার শোন্—এমন ললিত সুকুমার, মন কেড়ে নেওয়া মধুকথা আর কখনো শুনেছিস? মরমের এমন মীড়, এমন দরদ-ভরা অশ্রুতে অভিষিক্ত বেহাগ?

অতি মৃদু ভাবে—

পাণ্ডু চন্দ্র অস্ত গেছে, কোথাও আলোক নাহি আর,
শুধু জাগে, নিবু নিবু নক্ষত্রের অগণিত দীপ
আকাশের প্রান্ত পথে, বনানীর নিভৃত আঁধারে
খদ্যোত শিহরি যেরে, কম্পমান কিরণে তাহার
অশোকের নূতন অরুণ ধীরে অবারিত হয়,
চম্পকের বাসন্তী বাহার ফুল্ল হয়ে ওঠে আরো,
শুধু যার বুকের আলোক, তারি শান্তি নাহি আর,
ভীরু প্রেমিকের মত লাজ ভয়ে সারা হয়ে যায়।

দরজা খুলিবার আওয়াজ পেয়ে, ও কি শব্দ, ও কী শব্দ?

জগা।—বাবুজি হরি আর মাধু এল, তোমার যে দৈবী শক্তি আছে, সে কথা কে অস্বীকার কর্ব্বে? সেত সবাই জানে বল্‌তেও কসুর করে না।

পরমানন্দ।—(দরজার দিকে মুখ করে)—ওরে মেধো, ওরে হরা, আয় এদিকে, শুনবি আয়! (জগাইএর দিকে ফিরে), চল্ এবার সাজসজ্জা করা যাক্— আমি বুঝি বুড়? বলুক ত বুড় কার সাধ্যি বলুক তো আমায় দেখি। (উচ্চ হাস্যে) আরে জগা, কাঁদিস কেন? বুড়ি থুড়থুড়ি ঠান্‌দিদির চোখের জলের সাধনা তোরে সাজেনারে! কান্না আবার কিসের? দুঃখ মিছে, কান্না মিছে, দুদিন আগে দুদিন পিছে বইত নয়—তবে আর পরোয়া কি! জগাই কেঁদনা, কেঁদনা দোহাই তোমার! আরে হাবা, অমন করে অবাক হয়ে চেয়ে রইলি কেন? ফিরিয়ে নে তোর চোখ, ফিরিয়ে নে! (জগাকে কোলাকুলি করে চোখের জলে) আরে ভাই কাঁদিস কেন? যেখানে ভাস্কর্য্য, চারুচিত্র, কাব্য প্রতিভার বসতি, সেখানে জরা, মৃত্যু, রোগ, শোক, স্থান পায় না। যমরাজাকেও ভয়ে ভয়ে এগোতো হয়, মনীষার সতীতেজে সত্যবানের মত প্রতিভাবান চিরমৃত্যুহীন। (আবার কাঁদতে কাঁদতে) নারে জগা, মন যে মানছে না, সেত কেবলি বলছে, গেল, গেল, সব গেল। ইহলোকের সম্বলহীন যে, পরলোকের পাথেয় তার কোথায় সংগ্রহ হবে? আমার প্রতিভা, মেধা, মনীষা! হায় কতটুকুর আমি অধিকারী? কি ছিল, কি আছে আজ আমার? আমি নিঙড়োন নেবুর মত, ফাটা বোতলের মত অকেজো! আর তুই জগাই, থিয়েটারের প্রাচীন মূষিক, কুটুর কুটুর করে প্রম্প্‌ট করা তোর কাজ! চল এখন, (দুজনের প্রস্থান) ওরে আমি প্রতিভাশালী নই, রাজার বিদূষক, সে পদ রাখবার মত পদার্থও আর আমার নেই। অমর কবির সেই ছত্রগুলো মনে পড়ে জগু?—

বিদায় প্রশান্ত চিত্ত, চিত্তের অভয়,
বিদায় সমর অশ্ব, নিত্য যুদ্ধ জয়,
দুরাশা যাহার আশে দৃপ্ত বলীয়ান,

"দিন যে যায় না কি করি !"

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত চিত্র হইতে

বিদায় অশ্বের হ্রেষা, উল্লাস উদ্দাম,
বিদায় মৃদঙ্গ মন্দ্র, দুন্দুভি আরাবে,
কর্ণে পশি, উচ্ছ্বসিত যাহার প্রভাবে
প্রত্যেক ধমনী মত্ত রুধির ধারায়
আলোড়িত, নেত্র জাগে উদ্দীপ্ত প্রভায়।
রাজেন্দ্রের বৈজয়ন্তী সুবর্ণ কেতন
বিদায়, বীরের গর্ব্ব আনন্দ মরণ।

জগা।—তুমি দেবতার অবতার, বাণীর বরপুত্র!

পরমানন্দ। আবার শোন—

যাও তবে, অম্বরে চন্দ্রমা, তবু প্রান্তর আঁধার,
পলাতক ক্ষিপ্রমেঘ পান করি সুবর্ণ কিরণ,
আসন্ন ঝটিকা ডাকে তিমিরের তরঙ্গ অপার,
নিশীথের যবনিকা আবরিল তারা অগণন!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

বিরহতপের শেষে

সেদিন বসন্তে যবে মদকল-পিকরবে
কানন কেলিল জাগি' মলয়ের শ্বাস,
রসাল মুকুল-মূলে, চম্পক বকুল ফুলে
কবরী কপোলে ছুটে মদিরা উচ্ছ্বাস।
সেদিন এলে না বঁধু সুগন্ধ পরাগ মধু
ঝরিয়া পড়িল উড়ি ধরণীর বুকে,
বসন্তের বিম্বাধরে প্রকৃতির গণ্ড পরে
চুম্বন উঠিল ফুটি অশোকে কিংশুকে।
তোমা'র আশায় নাথ, জাগিনু চাঁদিনীরাত,
করি অঙ্গে দোললীলা লাবণ্যের ফাগে,
পরিয়া রতন টিপ, যতনে জ্বালিয়া দীপ,
অধর করিনু রাঙা তাম্বুলের রাগে।
কপোলে গোলাপী ভাতি, কুসুম শয়ন পাতি,
রাখিনু মালিকা গাঁথি, কাঁচুলী আঁচলে,
পর্ণপুষ্পভারনতা যেন পল্লবিনী-লতা,
তনুর বাহুটি খসি পড়িয়া ভূতলে।
যৌবনের তট টুটি' লাবণ্য পড়িছে ছুটি
তনু রোমাঞ্চিত স্ফুট কদম্বের প্রায়,
সেদিন এলে না প্রিয়, সব কান্তি কমনীয়
জ্বলন্ত গরল হয়ে দহিল আমায়।

সহসা আসিলে যবে, দগ্ধ করি মনোভবে
তখন হরের কোপ দহেছে কানন।
শুষ্ক পত্র মরমরে প্রখর তপন করে
ঝলসি মলিন শীর্ণ ধরার আনন।
অশ্রুসিক্ত ছিন্নবাস, ধূসর চিকুর রাশ
উড়ে যেন গৃধিনীর হেয় পক্ষজল,
ধূ-ধূ বেলা বালুকায় নিদাঘ তটিনীপ্রায়
নাহি রস কান্তি, সার ক রাটি কঙ্কাল।
তোমার দরশ লাগি' বিরহ যামিনী জাগি
মলিন কোটরগত অরুণ নয়ন,
নাহি ভূষা নাহি রূপ যেন দগ্ধপ্রায় ধূপ,
অনশনে তনু ক্ষীণ ভূতলে শয়ন।
সহসা আসিলে বঁধু নাহি সুধা, নাহি মধু,
নাহি কোনো আয়োজন, ভাষায়, ভূষণে।
গৃহে নাহি দীপ জ্বালা, গাঁথা নাহি বনমালা,
নাই লাবণ্যের থালা—বরিব কেমনে?
বিরহ তপের শেষ। এসো এসো হৃদয়েশ!
এস নীলকণ্ঠ মোর, মানস-মোহন!
অনলে দহিলে প্রভু তাই ভস্মমাখা, তবু,
তার মাঝে আছে হৃদি-হেম সিংহাসন।

শ্রীকালিদাস রায়।

সৌধ-রহস্য

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গেব্রিয়েল ও আমার মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়া বাড়ীর দিকে অঙ্গুলি হেলাইয়া দৃঢ় অনুজ্ঞা-ব্যঞ্জক স্বরে তিনি কন্যাকে আদেশ করিলেন, "ঘরে যাও।" কন্যা চলিয়া গেল। গাছের ফাঁকের ভিতর দিয়া যতক্ষণ তাহার শ্বেতবস্ত্রের প্রান্তটুকু দেখা গেল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি বদ্ধ দৃষ্টিতে সেই দিকেই চাহিয়া রহিলেন। গেব্রিয়েলের ছায়ার চিহ্ন অবধি যখন আমাদের দৃষ্টির বাহিরে মিলাইয়া গেল, তখন সহসা তিনি এমনভাবে আমার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিলেন যে, ভয়ে আমি দুই পা পিছু হটিয়া হস্তস্থিত লাঠিটাকে দৃঢ় মুষ্টিতে ধারণ করিলাম। ক্রোধে তাঁহার গলার শিরগুলা পর্য্যন্ত স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল, স্বর বদ্ধ হইয়া যাইতেছিল, কম্পিত স্বরে তিনি কহিলেন, "কি সাহসে তুমি আমার বাড়ীর মধ্যে এসেছ? তুমি কি ভেবেছ যে, এই এত বড় বেড়াটা আমি দিয়ে রেখেচি, এ শুধু বাইরের কতকগুলো নিষ্কর্ম্মা হতভাগা—ছোট লোককে জড় করবার জন্য? এখনি তোমায় রীতিমত শিক্ষা দিতাম, কিন্তু দিলাম না। মানে মানে বাড়ী যাও—খবরদার—আমার বাড়ীর দিকে আর এক পা বাড়িয়ো না। দেখেছ—"কথা শেষ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পকেটের ভিতর হইতে একটা পিস্তল টানিয়া বাহির করিলেন, কহিলেন, "যদি তুমি বেড়ার ফাঁক দিয়া আমার জমির ভিতর এতটুকু পা বাড়াতে, তাহলে এই যে পিস্তল দেখচ, এর গুলিতে আজ তোমার মাথার খুলি উড়িয়ে দিতাম। এটা বদমায়েসের আড্ডা নয়—চামড়া কালো হো'ক আর সাদাই হো'ক—তোমার মত ভদ্রলোকদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতে হয়, তা আমার দস্তুরমত জানা আছে!"

সে অবস্থায় যতখানি সম্ভব, শান্ত ভাব দেখাইয়া সংযত স্বরে আমি বলিলাম, "আমি আপনার কোন অনিষ্ট করতে আসি নি, করিও নি—কি জন্য যে আপনি আমায় এমন গালি গালাজ করছেন, তাও জানি না। যাই হোক, মশায়ের হাত যে রকম কাঁপচে আর বন্দুকটা আমার বুকের উপর যেভাবে ধরে আছেন, তাতে হঠাৎ আওয়াজ হয়ে যাওয়াটা আশ্চর্য্য নয়। বন্দুকটি সরিয়ে নিন্। না হলে এই লাঠিটা আপনার হাতে পড়তে দেরী হবে না।"

অপেক্ষাকৃত শান্ত ভাবে বৃদ্ধ তখন প্রশ্ন করিলেন, "কি জন্য তাহলে—তুমি এখানে এসেচ? বোধ হয়, সহরে যাবার রাস্তা ভুল করে—এখানে আসনি? তোমাদের জ্বালায় ভদ্রলোক কি নিশ্চিন্ত হয়ে আপনার বাড়ীতেও বাস করতে পাবে না? পরের বাড়ীতে উঁকি ঝুঁকি দেওয়াটাই বা কি রকম ভদ্রতা!"

গম্ভীরভাবে আমি উত্তর দিলাম, "না, না, আমি উঁকি ঝুঁকি দিতে এখানে আসিনি। আপনার কন্যা গেব্রিয়েলের সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই এসেছিলাম,—আরও অনেকবার আমাদের মধ্যে দেখা-শোনা হয়েছে। তাঁর অসাধারণ সদ্‌গুণে আমি মুগ্ধ হয়েচি। তিনি আমার বাগ্‌দত্তা—"

যে আসন্ন ভয়ানক ঝটিকাঘাত সহ্য করিবার জন্য আমি আপনাকে প্রস্তুত করিয়া লইতেছিলাম, তাহার কোন লক্ষণ না দেখাইয়া তিনি যেন অনেকটা অবাক হইয়াই আমার পানে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বেড়ার গায়ে ভর দিয়া আমার দিকে চাহিয়া ঈষৎ ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "ইংলিস্ টেরিয়ার কুকুরগুলো কেঁচো খুঁড়তে ভারী ভালবাসে, যখন তাদের আমরা ভারতবর্ষে নিয়ে গেছলাম, তখন তারা সেখানে গর্ত্ত দেখ্‌লেই কেঁচোর গর্ত্ত মনে করে খুঁড়তে যেত—একদিন ঐ রকম একটা গর্ত্ত খুড়তে গিয়ে সাপ্ বেরুল। সেইদিন থেকে বেচারারা আর সে-মুখো হত না। আমার বোধ হয় তোমার অবস্থা তাদেরই মত, কোন তফাত নেই!"

অত্যন্ত ঘৃণার স্বরে আমি উত্তর দিলাম, "অকারণে আপনার কন্যার নিন্দা করবেন না।"

তাচ্ছল্যের সহিত আমার দিকে চাহিয়া পিস্তলটা পকেটে রাখিতে রাখিতে জেনারেল উত্তর দিলেন, "না, গেব্রিয়েল ঠিকই আছে, তাকে আমি কিছু বল্‌চি না,—কিন্তু আমাদের বংশ এমন নয়—যে, যে সে কোন যুবা পুরুষকে বিয়ে কর্‌তে পারে।—আচ্ছা বাপু, নিজেদের সম্বন্ধে তোমরা যে মনে মনে এমন একটা সুবন্দোবস্ত করে ফেলেচ, আর সে সম্বন্ধে আমায় এতটুকুও জান্‌তে দাওনি—এর মানেটাই বা কি শুনি?"

উপস্থিত ক্ষেত্রে সকল কথা খুলিয়া বলাই ভাল ভাবিয়া আমি তাঁহাকে ধীর ভাবে কহিলাম, "তার কারণ, শুধু ভয়। আমরা ভয় করেছিলাম আপনাকে সব কথা জানাতে গেলে, হয়ত বিপরীত ফল হবে। আপনি আমাদের দুজনকে তফাৎ করে দেবেন—হতে পারে, আমরা ভুল বুঝেছিলাম। কিন্তু এখন আমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন বিষয় স্থির করবার আগে আমার এইটুকু অনুরোধ যে আপনি শুধু এইটুকু দেখবেন, আপনার বিচারের উপর আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখই নির্ভর করচে। আমাদের দেহকে আপনি পৃথক্ করতে পারেন, কিন্তু হৃদয়কে পার্‌বেন না।"

ঈষৎ নম্রস্বরে জেনারেল উত্তর দিলেন, "থাম, বাপু থাম।—তুমি পাগল,—কি যে বল্‌চ, তা তুমি নিজেই জান না! হিথারষ্টণ বংশের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করা, তুমি কেন,—সকলের পক্ষেই অসম্ভব। তাতে যে প্রতিবন্ধকতা আছে, সে প্রতিবন্ধকতা কখনই দূর হবার নয়।"

জেনারেলের মুখ হইতে রাগের ভাব একেবারেই অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল, তৎপরিবর্ত্তে একটু ঘৃণা-মিশ্রিত আনন্দের ক্ষীণ হাসি তাঁহার কুঞ্চিত ওষ্ঠ-প্রান্তে ফুটিয়া উঠিল। তাঁহার সে বাক্যে ও ভাবে তৎক্ষণাৎ আমার আহত বংশ-মর্য্যাদা অন্তর-মধ্যে জাগিয়া উঠিল। তাহার মতই কঠিন স্বরে আমি উত্তর দিলাম, "যে প্রতিবন্ধক আপনি মনে করচেন—তার জন্য ভাবনা নেই,—যদিও নির্জ্জন পল্লীতে এসে আমরা বাস করচি, তবুও খুব সম্মানিত উচ্চবংশেই আমার জন্ম,—আর আমার মা? বুদাণের বুকাণদের মেয়ে তিনি। না বুঝে আমি অন্যায় প্রস্তাব আপনার কাছে করিনি।"

"তুমি বুঝ্‌তে পারনি, মিঃ জন্, বুঝ্‌তে

পারনি, প্রতিবন্ধকটা তোমার তরফ থেকে নয়, সেটা আমার তরফ্ থেকে। আমাদের বংশে এমন কোন প্রতিবন্ধক আছে, যাতে আমার মেয়েকে চিরকুমারী হয়েই থাক্‌তে হবে। তাকে বিয়ে কর্‌লে তোমার কোন সুবিধা হবে না—" বাধা দিয়া সবেগে আমি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলাম, "কিন্তু—আমার ভাল-মন্দর বিচার বোধ হয় আমিই ভাল করতে জানি। আমি জোর করে বল্‌চি—ওকে বিয়ে করবার অনুমতি পাওয়ার কাছে পৃথিবীর অপর কোন সুবিধা-অসুবিধাকেই আমি গ্রাহ্য করি না। গেব্রিয়েলকে বিয়ে কর্‌তে পেলে আমি কোন অভাব, কোন কষ্ট বিপদকেও ভয় কর্‌ব না। শুধু আপনার কাছে আমার এই মিনতি—এই প্রার্থনা, যে, আপনি আদেশ দিন।" অবিশ্বাসের মৃদু হাসি হাসিয়া জেনারেল বলিলেন, "তুমি যে ভারী সাহসী দেখ্‌চি হে বাপু! বিপদকে তুচ্ছ করাটা খুবই সহজ—যতক্ষণ না জানা যায় যে, সে বিপদটি কি?"

"আপনি আমায় পরীক্ষা করে দেখুন। বলুন, সে কি বিপদ! গেব্রিয়েলের জন্য সহ্য করতে পারব না, এমন বিপদ আমি ত কিছু কল্পনাও করতে পারি না।"

"না! না—তা হয় না!" বলিয়া বৃদ্ধ যেন কতকটা অন্যমনস্কভাবে আত্মগত বলিলেন, "ছেলেটি দেখ্‌চি বুদ্ধিমান—আর নেহাৎ ছেলে মানুষও নয়—সাহসও আছে দেখ্‌চি, একে আমাদের সঙ্গে না রাখ্‌লে খারাপই হবে!"

পরে অপেক্ষাকৃত শান্ত ভাব ধারণ করিয়া আমার দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "ওয়েষ্ট,—আমি যদি তোমায় ইতিপূর্ব্বে কোন রূঢ় কথা বলে থাকি ত আমায় ক্ষমা কর। এই দ্বিতীয় বার আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি—আমার বিশ্বাস, এ রকম ঘটনা আর হবে না। কি জান, আমি সকল জিনিষেরই ভিতর অবধি তলিয়ে দেখ্‌তে চাই। তার কারণ, আমি নির্জ্জনতাটার কিছু বেশী পক্ষপাতী। আর এ স্বভাব—বা ইচ্ছা—আমি কখনও বোধ হয় ত্যাগ করতে পারব না। সত্য হোক, আর মিথ্যাই হোক,—আমার মাথায় একটা খেয়াল ঢুকেচে এই যে, আমার জমির উপর এক দিন একটা বড় রকম ডাকাতী হবে আর যদি বাস্তবিকই তা হয়—আমি কি সে সময় তোমার সাহায্য পাবার আশা রাখতে পারি?"

বর্ষায় ঝটিকা জল ও মেঘের মিলনে যেমন একটা দারুণ বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, আমার মনের মধ্যেও তেমনি অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের একটা দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল। এই বৃদ্ধ,—কয়েক মিনিট পূর্ব্বে—যাঁহার ক্রুদ্ধ মুখ, রুদ্র রোষানল—বজ্রের ন্যায় আমায় ভস্ম করিতে চাহিতেছিল, বর্ষার ঘন ঘোর মেঘ সঞ্চিত জল ধারার মতই এখন তাহা এমন শীতল হইয়া গেল! তিনি আমারই সাহায্যপ্রার্থী! এ এক দারুণ সমস্যা! তাহা অমীমাংসিত রাখিয়া দিয়া অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া আমি উত্তর দিলাম, "নিশ্চয়—সর্ব্বান্তঃকরণে।"

"আচ্ছা! মনে কর,—যদি এমন হয়—কোন দিন মাঝ রাতে আমি খবর পাঠাই যে, "ওয়েষ্ট" অথবা "ক্রুমবার"—তাহলে তুমি আস্‌বে কি?"

"নিশ্চয়ই আস্‌ব! কিন্তু আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে চাই—কি রকম বিপদের আপনি আশঙ্কা করচেন?"

"না, না, সে সব জেনে তোমার কোন লাভ নেই। আর যদি আমি সব কথা তোমায় বলি,—তাহলেও তুমি কিছু বুঝতে পার্‌বে না, বেশ,—এখন তাহলে বিদায়—অনেকক্ষণ আমি তোমার কাছে এসেচি,—মনে রেখ, ওয়েষ্ট, তোমায় আমি আজ থেকে ক্রুমবারের একজন রক্ষী বলেই মনে করব।"

বাড়ীর দিকে তাঁহাকে গমনোদ্যত দেখিয়া আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম, "আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য। কিন্তু আমারও একটি প্রার্থনা,—আমার জন্য বাধ্য হয়ে আপনার কন্যা আপনার কাছে যে গোপনতা করেছে, তার সে অপরাধ মার্জ্জনা করবেন।"

মর্ম্মস্পর্শী মৃদু সকরুণ হাসি হাসিয়া অত্যন্ত ধীরভাবে কোমল স্বরে জেনারেল উত্তর দিলেন, "আমার সংসারে আমি অবশ্য একজন ভয়ানক দৈত্য-টৈত্যর মত কিছু নই। দেখ বাপু, তোমায় আমি বন্ধুভাবে সৎপরামর্শ দিচ্চি, এই অসম্ভব দুরাশার তুমি এখানেই শেষ কর।—আর যদি একান্ত তাতে অক্ষম হও—তাহলে অন্ততঃ—এখন, এখন একেবারেই এ ইচ্ছা চেপে রাখ। ঘটনা-চক্র কোন্ দিকে যাবে, সে কথা ত কিছুই বলা বলা যায় না, তবে বিদায়—।"

জেনারেল চলিয়া গেলেন। আমার মনের মধ্যে পাষাণ-খণ্ডের মত চিন্তার যে দারুণ ভার চাপিয়া বসিয়াছিল—তাহার তীব্র বেদনায় আমার যেন নিশ্বাস অবধি রোধ হইবার উপক্রম করিতেছিল। জেনারেলের এ আকস্মিক ভাব-পরিবর্ত্তনে আমার মনে তখন যে ভাব হইয়াছিল আমি নিজেই তাহা ঠিক্ বুঝিতে পারিতেছিলাম না,—এই যে বেদনা, ইহা সুখের, না দুঃখের? এই ঘটনার পর গেব্রিয়েলের সহিত সাক্ষাতের আশা—একান্তই দুরাশা! তবু তিনি আমায় আশা রাখিতে বলিয়া গিয়াছেন! প্রেমের স্বপ্ন সুখের বটে, কিন্তু স্বপ্ন বাস্তব নহে! তাহা সুখের ছলনামাত্র। জীবনে স্বপ্নাপেক্ষা বাস্তবই মানবের প্রিয়। এত দিন আমরা স্বপ্ন-জগতে ছিলাম, সে স্বপ্নে সুখ ছিল, কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহা বিমান-প্রাসাদের মত পতনোন্মুখ! জাগ্রতে সুখ-স্বপ্ন টুটিয়া গেলেও এখন একটা অবলম্বন মিলিয়াছে,—মোটের উপর অবস্থাটা ভালই বলিতে হইবে।

কিন্তু এই যে বিপদ?—ছায়ার মত আধার-হীন—অব্যক্ত বিপদ? জেনারেল বলিয়াছেন, "যদি সব কথা তোমায় খুলিয়া বলি তথাপি বিপদটা যে কি তাহা তুমি বুঝিতে পারিবে না!" ঠিক! প্রথম আলাপে মরডণ্টও এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছিল।—কিন্তু কি-এ-বিপদ,—যাহা ভাষায় ব্যক্ত হয় না? এই বচনাতীত, অব্যক্ত বিপদ,—কি সে?

রাত্রে নিদ্রার জন্য শয়ন করিলাম—তখনও সেই চিন্তা। সম্মুখে আমারই অন্তরের অন্ধকারের মত দিগন্ত-প্রসারিত অসীম অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে যে নক্ষত্রের ক্ষীণ জ্যোতি দৃষ্টি হইতেছিল, আমার হৃদয়ে তেমনি আশার ক্ষীণ আলোক আছে কি? বুঝি, আছে! আশা নহিলে মানুষ বাঁচিতে পারে না,—অন্ধকারের দিকে হস্ত ক্ষেপ করিয়া মনে মনে বলিলাম, গেব্রিয়েল! আমার গেব্রিয়েল! মানুষিক, অমানুষিক, এমন কোন শক্তি নাই, যাহা আমার হৃদয় হইতে তোমার ঐ পবিত্র দিব্য মূর্ত্তি টানিয়া ফেলিতে পারে! (ক্রমশঃ)

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।

মানুষের স্বাভাবিক খাদ্য কি?

খাদ্যের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে, স্তন্যপায়ী জীবসমূহকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে :—(১ম) মাংসাশী; (২য়) নিরামিষাশী, ইহার মধ্যে আবার দুইটি উপশ্রেণী আছে—(অ) তৃণভোজী; (আ) ফলভোজী। তৃণভোজী জন্তুদের মধ্যে হাতী, ঘোড়া, গরু, মহিষ, মেষ, মৃগ, শশক প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহারা তৃণপত্র, বৃক্ষের বল্কল, লতা প্রভৃতি খাইয়া জীবন ধারণ করে। ইহাদের খাদ্যে সারাংশ খুব কম আছে বলিয়া ইহাদের খুব বেশী না খাইলে চলে না। এই কারণে ইহাদের পাকাশয় অন্যান্য জন্তুদের তুলনায় বৃহৎ এবং অধিক ধারণক্ষম। ফলভোজী জন্তুরা, যেমন কাঠবিড়াল, বাঁদর প্রভৃতি, শস্য ও ফল খাইয়া জীবন ধারণ করে। শস্য ও ফলে তৃণপত্রাদির অপেক্ষা অধিক সারভাগ থাকায় ইহাদের খাদ্য পরিমাণে খুব অধিক আবশ্যক করে না এবং সেই কারণে ইহাদের পাকাশয়াদি তৃণভোজীদের তুলনায় খুব বেশী বড় নহে। গরু মহিষাদির অপেক্ষা ইহাদের বুদ্ধির ভাগ বেশী হওয়ায় এবং হাত দিয়া ধরিবার সামর্থ্য থাকায় ইহারা তৃণভোজী পশুদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত সহজে আপনাদের খাদ্য সংগ্রহ করিতে সক্ষম হয়। মিশ্রভোজী জীবগণ (কতকগুলি ফলভোজীও ইহাদের অন্তর্গত) বিশেষ বুদ্ধিশালী এবং হস্তবিশিষ্ট হওয়ায়, নিরামিষ ব্যতীত কিয়ৎপরিমাণে আমিষ খাদ্যও সংগ্রহ করিতে পারে। কাঠবিড়াল প্রধানতঃ শস্যজীবী হইলেও সময় বিশেষে পোকাটা মাকড়টা যে না খায় এমন নহে। মর্কটদিগের মধ্যেও এমন কয়েকটি শ্রেণী আছে, যাহারা মর্কটের স্বাভাবিক খাদ্য ফলমূলাদি ছাড়া, পোকা মাকড়, ছোট ছোট পাখী, বোলতা, ভীমরুল প্রভৃতির ডিম পর্য্যন্ত খাইয়া থাকে।

এখন প্রশ্ন এই যে, স্তন্যপায়ী জীবদের যে তিনটি শ্রেণীর কথা বলা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে মানুষ কোন শ্রেণীর অন্তর্গত? প্রকৃতির নির্দ্দেশানুসারে, মানুষকে মাংসাশী, না নিরামিষাশী না আমিষ-নিরামিষাশী বলা সঙ্গত? অন্যকথায়, কোন্ খাদ্য মানুষের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী বলিয়া মনে হয়? প্রকৃতি মানুষকে যে ভাবে সৃজন করিয়াছে, তাহাতে মিশ্রখাদ্যই মানুষের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী বলিয়া মনে হয়। কেন হয়, তাহা বুঝিতে গেলে, মানুষের অভিব্যক্তির ইতিহাসটা একবার আলোচনা করা আবশ্যক। মর্কট হইতে মানুষের উদ্ভব হইয়াছে; দার্ব্বিন (Darwin) ওয়ালেস্ (Wallace) প্রভৃতির কৃপায় তাহা সকলেই অবগত আছেন। শুধু তাহা নয়, যে মর্কটবংশে মানুষের জন্ম, তাহার সহিত বর্ত্তমানকালের গোরিলা, ওরাং, সিম্প্যান্জি, গিবন্ প্রভৃতি মর্কটদিগের যে খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, ইহাও বোধ করি কাহারও অবিদিত নাই। এরূপ স্থলে কেহ যদি এমন অনুমান করেন যে, বর্ত্তমান ওরাং,

সিবন্ প্রভৃতির যাহা স্বাভাবিক খাদ্য, মানুষের পূর্ব্বগামী মর্কটদিগের খাদ্যও অনেকটা সেইরূপ ছিল, তাহা হইলে অনুমানটা যে একবারে অসঙ্গত, বোধ করি, জোর করিয়া এমন কথা কেহই বলিতে পারেন না। এই অনুমানের অনুকূলে আরও একটি প্রবল যুক্তি আছে। সে যুক্তিটি হইতেছে এই যে মানুষের পাকাশয়, অন্ত্র প্রভৃতি পাক-যন্ত্রে আর একটা গিবনের পাক-যন্ত্রে বড় বেশি পার্থক্য থাকিতে দেখা যায় না—অনেকটা এক রকম বলিয়াই বোধ হয়। ওরাং, গিবন্, সিম্প্যাঞ্জি প্রভৃতি বানরগণ স্বাভাবিক স্বাধীন অবস্থায় কি খায়, না খায়, তাহা জানা খুবই আবশ্যক, একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাহা জানা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। কারণ ইহারা এত লজ্জাশীল ও সন্দিগ্ধমনা যে মানুষ দেখিলেই তাহাদের স্বাভাবিক আচরণের ব্যতিক্রম না ঘটিয়া যায় না। এ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি-দিগের নিকট হইতে যতটা জানা গিয়াছে, তাহাতে ইহাদিগকে প্রধানতঃ শস্য ও ফল মূলভোজী বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু সময় বিশেষে ইহারা কচিপাতা, টিক্‌টিকি, পাখী পতঙ্গ প্রভৃতিও যে না খায় এমন নহে। তাহা যদি হয়, তবে আমরা অবাধে একথা বলিতে পারি যে, মানুষ যে মর্কটবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা প্রধানতঃ নিরামিষাশী হইলেও, আমিষ যে একবারে স্পর্শ করিত না, এমন নহে।

বনমানুষ হইতে মানুষের উৎপত্তি হইতে কত লক্ষ লক্ষ বৎসর লাগিয়াছে, তাহার ঠিক নাই; তথাপি বর্ত্তমানকালে আমরা যে সব আদিম বর্ব্বর জাতি দেখিতে পাই, তাহাদের খাদ্য আর একটা গোরিলা কি সিম্প্যান্‌জির খাদ্যে খুব যে বেশি তফাৎ আছে বলিয়া মনে হয় না। এই সব আদিম বর্ব্বর মনুষ্য বনমানুষেরই মত বনজাত ফলমূল, শস্যপত্র প্রভৃতি এবং শিকারলব্ধ পশুপক্ষীর মাংস দ্বারা জীবন ধারণ করিয়া থাকে। ইহারা কৃষিকার্য্যও জানে না এবং গো, মহিষাদি পশুপালনও করে না। ইহারা এমন দুর্গম স্থানে বসবাস করে যেখানে সভ্যজাতির গমনাগমনের অল্পই সম্ভাবনা। সুতরাং সভ্যজাতির সংস্পর্শে তাহাদের ব্যবহারাদির যে কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা বলিবার কোন উপায় নাই। ইহারা এতকাল পর্য্যন্ত তাহাদের আদিম মৌলিক বর্ব্বরত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। যে বানর-কুলে মানুষের জন্ম, আজ আর তাহার কোনই অস্তিত্ব নাই সত্য, তথাপি, বানর হইতে উৎপন্ন হইয়া মানুষের অবস্থাটা কিরূপ ছিল, আজকালকার বর্ব্বর জাতিদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, তাহার কতকটা আভাষ যে না পাওয়া যায় এমন নয়। ইহাদের খাদ্য কিরূপ, তাহা জানিতে পারিলে মানুষের স্বাভাবিক খাদ্য বিষয়ে বিচার করা, অনেকটা সহজ হইবার কথা। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে, আদিম বর্ব্বর জাতি-দের খাদ্যের অর্দ্ধেকটা আমিষ, বাকিটা নিরামিষ। অবশ্য এমন অনেক বর্ব্বর জাতি আছে, যাহাদের খাদ্যে নিরামিষ অপেক্ষা আমিষেরই ভাগ অধিক থকিতে দেখা যায়। এস্‌কুইনোক্‌স্ (Esquinoax) নামক অসভ্য জাতি প্রধানতঃ আমিষ খাইয়াই জীবন

ধারণ করে, তাহার কারণ, তাহারা যেখানে বাস করে, সেখানে উদ্ভিদ্ জন্মাইতেই পারে না। আবার ক্যালিফোর্ণিয়া দেশে এমন অনেক আদিম জাতি আছে, যাহাদের খাদ্যের ⅓ ভাগ নিরামিষ, বাকিটা আমিষ। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে আদিম বর্ব্বর অবস্থায় মানুষ কোন কালেই খাঁটি নিরামিষাশী ছিল না। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, কেবল নিরামিষ আহার মানুষের পক্ষে যেন স্বাভাবিক হইতে পারে না। প্রকৃতি মানুষকে মিশ্রভোজী করিয়া তুলিবার জন্য বিশেষ প্রকারই চেষ্টা করিয়াছে।

মানব-ইতিহাসের প্রথম যুগে যে সময় মানুষ চাষবাস জানিত না, সে সময় কেবল ফলমূলাদির উপর নির্ভর করিয়া, মানুষের একদিনও বাঁচিয়া থাকা সম্ভব হয় নাই। অরণ্যজাত ফলমূলাদির অধিকাংশই সে সময় খাদ্যরূপে গ্রহণ করিবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিল। ইহারা হয় বিষাক্ত, নয় এত কটু, তিক্ত কষায় দোষবিশিষ্ট কিম্বা এত দৃঢ়তন্তু-বিশিষ্ট ছিল যে স্বাভাবিক অবস্থায় কেহই তাহা গ্রহণ করিতে পারে না। এই কারণে খাদ্যের জন্য মানুষকে জীব-জগতের উপর বড় কম নির্ভর করিতে হয় নাই। ইহার পর মানুষ যখন আর একটু সভ্য হইল—অথচ এত সভ্য হয় নাই যে, চাষ করিতে শিখিয়াছে,—সে সময়, সে বিষাক্ত কঠিন-তন্তু উদ্ভিজ্জ খাদ্যকে নানা কৌশলে পরিশোধিত করিয়া গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। জলে ভিজাইয়া, রৌদ্রে শুকাইয়া, আগুনে ঝলসাইয়া, এইরূপ বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া, সে অখাদ্য উদ্ভিজ্জ পদার্থকে খাদ্য করিয়া তুলিল বটে, কিন্তু তবুও তাহা যথেষ্ট হইল না—পশু শিকার করিয়া ও মৎস্য ধরিয়া, তাহাকে খাদ্যের অভাব পূর্ণ করিতে হইত। চাষ আবাদ প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে শুধু নিরামিষের উপর নির্ভর করিয়া মানুষের পক্ষে জীবন ধারণ করা একেবারেই সম্ভব ছিল না; সে সময় মানুষের খাদ্যে আমিষের ভাগই অধিক ছিল এবং তাহার জন্য শিকার ও মৎস্য ধরাই তাহাদের জীবনের প্রধান অবলম্বন ছিল। আগুনের ব্যবহার ও রন্ধন-কৌশল শিক্ষা করার পর হইতেই তাহাদের খাদ্যের মধ্যে ধীরে ধীরে উদ্ভিজ্জ পদার্থ প্রবেশ করিতেছিল সত্য কিন্তু তখনও তাহার প্রধান খাদ্য ছিল আমিষ, নিরামিষ নহে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মানুষের পূর্ব্বগামী বানর-গণের প্রধান খাদ্য ছিল ফলমূল। তাহা হইলে দাঁড়াইল কি? এই দাঁড়াইল যে, আদিমতম বর্ব্বর অবস্থায় মানুষ প্রধানতঃ নিরামিষাশী ছিল; তাহার পর তাহার খাদ্যের মধ্যে ধীরে ধীরে আমিষের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে।—যে দিন হইতে মানুষ অগ্নির ব্যবহার শিখিল সে দিন হইতে তাহার খাদ্যের মধ্যে আমিষ আর বাড়ে নাই বটে, কিন্তু তখনও পশু শিকারই তাহার প্রধান জীবিকা ছিল; তারপর যেদিন হইতে সে চাষ করিতে শিখিল, সে দিন হইতেই আর তাহাকে শিকারী মূর্ত্তিতে দেখিতে পাওয়া যায় না; তখন হইতে সে বনে বনে বিচরণ করিয়া না বেড়াইয়া, নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসবাস করিয়া, দস্তুর মত চাষী হইয়া পড়িল।

সচকিতা

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি, আই, ই অঙ্কিত চিত্র হইতে ।

তাহা হইলে আমরা এই দেখিলাম যে যে সময় মানুষ কোন একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ না থাকিয়া বনে বনে ছুটিয়া বেড়াইত, তখন আমিষই তাহার প্রধান খাদ্য ছিল—এবং সে সময় আমিষই তাহার উপযুক্ত খাদ্য ছিল। কেননা খাদ্যের জন্য যে সময় নিয়ত ছুটাছুটি ও দৌড়াদৌড়ি করিতে হয় অধিক শ্রম-বশতঃ সে সময় আমিষ জীর্ণ করা ও দেহজাত করা খুবই সহজ ও স্বাভাবিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইত। মাংসাশী পশুরা যে অবাধে অত মাংস হজম করিতে পারে, তাহার প্রধান কারণ, খাদ্যের জন্য তাহাদের অনেকটা ছুটাছুটি করিতে হয় বলিয়া। একটা বিড়ালকে নড়িতে চড়িতে না দিয়া এক স্থানে বদ্ধ করিয়া রাখিয়া যদি সুধু মাংস দিয়া রাখা যায় তাহা হইলে, এই দেখা যায় যে বিড়ালটির মোটেই মাংস সহ্য হয় না। অথচ স্বাধীন অবস্থায় সে ততখানি মাংস অনায়াসে জীর্ণ করিতে পারে। এখন প্রশ্ন এই—মানুষের প্রকৃত খাদ্য কি? কেবল আমিষ, না কেবল নিরামিষ, না উভয়ই? মিশ্র খাদ্যই যে মানুষের স্বাভাবিক খাদ্য সে বিষয়ে সন্দেহই নাই,—তবে কতটা আমিষ, কতটা নিরামিষ খাওয়া উচিত—তাহা অনেক গুলি অবস্থার উপর নির্ভর করে। সে সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইবে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ বাগচী।

"চিঠি কই"

আজি এ বাদল দিনে হেন আশা নাই
আসিবে পথিক কেহ, কোন যে অতিথি,
তবু দুরু দুরু বুক ফিরে ফিরে চাই,
যদি আসে চিঠিখানি পরবাসী-প্রীতি!

গুঁড়ি গুঁড়ি ঝরে জল, বাতাস শিহরে,
ঘুরিতে ছাড়ে না তবু আঁধার কাননে,
পাখীর নাহিক সাড়া, হরিণী কাতরে
উদার মাঠের লাগি ডাকে ক্ষুণ্ণ মনে!

খাকি-বেশ হরকরা ভিজে ভিজে আসে,
সহসা পড়ে না চোখে, আশা-দুখে-মেশা
কালো লালে বাধা তার পাগড়ি বিকাশে
দুরাশা আঁধারে রাঙা বাসনার নেশা!

চিঠি আসে, চিঠি আসে! ওঠে আর পড়ে
হিয়ার শোণিত, দৃষ্টি কেন ছুট নেয়?
নিশ্বাস পড়ে না, হায় কোন ক্লান্তি ভরে
নিতে গিয়ে ব্যগ্র হাত সব ফেলে দেয়?

কোথা তার হাতের আখর? ভারে ভারে
মাসিকে দৈনিকে এল দুনিয়ার কথা!
আকাশে আলোর আশা গেল একেবারে,
ভাঙিয়া নামিল মেঘ, মুক্ত আকুলতা!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

বাঙ্গলা ব্যাকরণ

(A Practical Bengali Grammar by W. S. Milne I. C. S.)

বাঙ্গালীতে বাঙ্গলা ব্যাকরণ লেখেন না, লেখেন শুধু ইংরাজে। কথাটা হঠাৎ শুনতে একটু খট্‌কা লাগলেও মিছে নয়। বাঙ্গলার নবপ্রকাশিত মাসিকপত্র "ভারতবর্ষে" প্রকাশ যে "ব্রেসি হালহেডের প্রথম বাঙ্গলা ব্যাকরণ, বাঙ্গলাদেশে বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত পুস্তকের মধ্যে সর্ব্বপ্রাচীন।" ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তক হুগলিতে মুদ্রিত হয়। সম্প্রতি W. S. Milne আর একখানি বাঙ্গলা ব্যাকরণ রচনা করেছেন। ইতিমধ্যে বাঙ্গালীর হাত থেকে অবশ্য অসংখ্য শিশুবোধ ব্যাকরণ বেরিয়েছে, কিন্তু যতদূর আমার জানা আছে তার একখানিও বঙ্গভাষার ব্যাকরণ নয়। সে সকল বইয়ের উদ্দেশ্য আমাদের ভাষাকে যতদূর সম্ভব সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মাধীন করা। কারণ এই শ্রেণীর বঙ্গ-বৈয়াকরণিকদিগের বিশ্বাস যে "যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে বঙ্গভাষা শুদ্ধ করিয়া লিখিতে এবং কহিতে পারা যায় তাহার নাম ব্যাকরণ।" বাঙ্গালী ছেলের পক্ষে যে বাঙ্গলাভাষায় কথা কইবার জন্য কোনরূপ "শাস্ত্রমার্গে ক্লেশ" করতে হয় না—এ সহজ সত্যটি আমরা সহজে স্বীকার করতে চাই নে। কাযেই ব্যাকরণ-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য যে পদ এবং বাক্যের গঠনের নিয়ম, "বৈলক্ষণ্যের প্রণালী ও অন্বয়ের রীতি নির্দ্ধারণ" করা, এ ধারণা আমাদের জন্মায় না।

আমাদের পক্ষে চলাফেরা কর্‌বার জন্য যেমন নিজ নিজ দেহযন্ত্রটির গঠন জানবার কোনরূপ আবশ্যকতা নেই, তেমনি মাতৃভাষা লেখবার এবং বলবার জন্য সেই ভাষাযন্ত্রটির গঠন জানা আবশ্যক নয়। ঐ যন্ত্রটি বিগড়ে গেলে তার মেরামত কর্‌বার জন্য ব্যাকরণশাস্ত্র কাজে লাগে। আমরা যে ভাষায় কথা কই, সেই ভাষাই বিশুদ্ধ বাঙ্গলাভাষা। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে, সংস্কৃত শব্দের সাহায্যে, পণ্ডিতদের হাতে-গড়া কোনও ভাষা তার চেয়ে বেশি শুদ্ধ হতে পারে, সাধু হতে পারে, কিন্তু সে ভাষা বঙ্গভাষা নয়। লিখিত ভাষা সম্বন্ধে এই কৃত্রিম শুদ্ধাচারের প্রতি অতিভক্তি-বশতঃ, দেশাচার লোকাচার এবং কুলাচারের জ্ঞান আমরা হারাতে বসেছি। বাঙ্গলা যে প্রায়-সংস্কৃত ভাষা নয়, কিন্তু একটি বিশেষ স্বতন্ত্র ভাষা, এ জ্ঞান না থাক্‌লে বাঙ্গলা ব্যাকরণ লেখবার প্রবৃত্তিও হয় না, লেখাও যায় না। এই কারণে আমরা বাঙ্গলা ব্যাকরণ লিখিও না, পড়িও না।

কিন্তু বিদেশীর পক্ষে আমাদের ভাষা আয়ত্ত কর্‌তে হলে, তার মূল প্রকৃতি এবং গঠনের নিয়ম জানা দরকার। ব্যাকরণের সাহায্য ব্যতীত বিদেশীর পক্ষে ভাষাজ্ঞান বিষয়ে বেশিদূর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব।

হালহেড সাহেব যে ঐ কারণে সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গলা ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন, তা তাঁর

ভারতবর্ষ-ধৃত বচন থেকেই জানা যায়। সে বচন এই :—

"বোধপ্রকাশং শব্দশাস্ত্রং ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং ক্রিয়তে হালেদংগ্রেজি"।

তারপর অবশ্য স্কুলপাঠ্য বহুতর বাঙ্গলা ব্যাকরণ রচিত হয়েছে। কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুকরণে লিখিত সেই সকল বই থেকে লিখিত ভাষার জ্ঞান কতকটা জন্মালেও, খাঁটি বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষার পক্ষে কোনরূপ সাহায্য পাওয়া যায় না।

পূর্ব্বোক্ত কারণেই Milne সাহেব এই নূতন ব্যাকরণ রচনা করেছেন। তিনি ভূমিকায় বলেছেন যে"—When studying Bengali I found myself greatly hampered by the want of a Grammar dealing with the colloquial idioms of the modern language. In this book an effort has been made to present to the English student those peculiarities of idiom which are likely to cause difficulties"

যদিচ মুখ্যতঃ ইংরাজের জন্যই এই ব্যাকরণ লেখা হয়েছে, তবুও প্রত্যেক বাঙ্গালীর এই বইখানি পড়া উচিত। বাঙ্গলা ভাষার বিশেষত্বের দিকে দৃষ্টি রেখে বাঙ্গলা ব্যাকরণ যে রচনা করা উচিত, এ ধারণা আজকাল বহুলোকের মনে জন্মেছে। কেউ কেউ আংশিক ভাবে বাঙ্গলা ভাষার গঠনের নিয়ম আবিষ্কার করবার চেষ্টাও করেছেন, কিন্তু মিল্‌ন্ সাহেবই সর্ব্বপ্রথমে একখানি পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রচনা করেছেন। ইতিপূর্ব্বে রাজা রামমোহন রায় ব্যতীত, অপর কোনও বঙ্গলেখক এরূপ ব্যাকরণ লেখবার চেষ্টামাত্রও করেছেন বলে আমার জানা নেই।

রামমোহন রায়ের "গৌড়ীয় ভাষা-ব্যাকরণ" স্কুলবুক সোসাইটির অনুরোধে লিখিত হয়। "পরন্তু তাঁহার ইংলণ্ড গমন সময়ের নৈকট্য হওয়াতে ব্যস্ততা ও সময়ের অল্পতা প্রযুক্ত কেবল পাণ্ডুলিপি মাত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, পুনর্দৃষ্টির সাবকাশ পান নাই।" ফলে "গৌড়ীয় ভাষা ব্যাকরণে" যদিচ রচয়িতার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পত্রে পত্রে পাওয়া যায়, তবুও সাধারণ শিক্ষার্থীদের তা বিশেষ কাজে লাগে না। কারণ তা প্রথমতঃ উপক্রমণিকা মাত্র, দ্বিতীয়তঃ তাঁর ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দসকল, একালের বাঙ্গালীদের নিকট অপরিচিত। রামমোহন রায় কেবলমাত্র সত্তরখানি পাতায় বাঙ্গলা ব্যাকরণের মূল সূত্রগুলি ধরিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলেন,—মিল্‌ন্ সাহেব প্রায় ছয়শ' পাতায় বাঙ্গলা ব্যাকরণের নিয়মগুলি বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেছেন। সম্ভবতঃ রামমোহন রায়ের ব্যাকরণ মিল্‌ন্ সাহেবের হাতে কখন পড়ে নি, অথচ অনেক বিষয়ে উভয়ের সম্পূর্ণ মিল আছে।

সন্ধি এবং সমাস যে বাঙ্গলা ভাষার প্রকৃতিগত নয়—এ কথাটা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। এমন কি, সংস্কৃতের অনুকরণে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও নানারূপ শব্দের মধ্যে যে অবৈধ সন্ধি স্থাপন করেছিলেন, পরবর্ত্তী লেখকদের হাতে আবার তার বিচ্ছেদ ঘটেছে। রামমোহন রায় তাঁর ব্যাকরণে সন্ধির বিষয় যে কেন কিছু লেখেন নি, তার কারণ দেখিয়ে বলেছেন যে "এ সকল জানিবার রীতি সংস্কৃত

সন্ধি প্রকরণে আছে এবং ভাষায় সেই রীতিক্রমে ওই শব্দসকল ব্যবহার্য্য হইয়াছে; অতএব সংস্কৃত সন্ধি প্রকরণ ভাষায় উপস্থিতি করিলে, তাবং গুণদায়ক না হইয়া বরং আক্ষেপের কারণ হয়।"—তাঁহার পরবর্ত্তী বঙ্গ-বৈয়াকরণিকগণ এই কথাটি মনে রাখলে, স্কুলের ছাত্রদের অনেক কষ্টের লাঘব হত। "অনেক পদের এক পদের ন্যায় রূপ হওয়ার নাম সমাস।" ঐরূপ কথার জড়াপট্‌কি বেধে যাওয়াটা বাঙ্গলা ভাষায় স্বাভাবিক নয়। বাঙ্গলা ভাষায় দুটি মাত্র পদ ঐরূপ সমাসবন্ধনে আবদ্ধ হয়। গাছপাকা, বর্ণচোরা ইত্যাদি পদ, খাঁটি বাঙ্গলা সমাসের নমুনা। (এ স্থলে বলে' রাখা আবশ্যক যে, সংস্কৃত ভাষায় পদ মানে word, এবং বাক্য মানে sentence,—আমরা আজকাল ঐ দুটি শব্দ ঠিক উল্‌টো উল্‌টো অর্থে ব্যবহার করি। এ প্রবন্ধে আমি পদ এবং বাক্য সংস্কৃত অর্থেই ব্যবহার করব।)

তারপর রামমোহন রায় বলেন যে "সংস্কৃত ভাষাতে স্ত্রীত্ব বোধের যে নিয়মসকল, তাহা বাঙ্গলা ভাষা ব্যাকরণে উপস্থিত করা কেবল চিত্তের বিক্ষেপ করা হয়, অথচ সংস্কৃত না জানিলে তাহার দ্বারা বিশেষ উপকার জন্মে না। গৌড়ীয় ভাষাতে কি ক্রিয়াপদে, কি প্রতিসংজ্ঞায় (সর্ব্বনাম), কি বিশেষণ পদে, লিঙ্গ জ্ঞাপনের কোন চিহ্ন নাই।" মিল্‌ন্ সাহেবের মতও তাই। এই সত্যটি মনে রাখ্‌লে বাঙ্গলা ব্যাকরণ আমাদের কাছে বিভীষিকা হয়ে ওঠে না।

Milne সাহেবের বইতে, কারক এবং ক্রিয়া সম্বন্ধে প্রকরণ দুটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি এই দুটি বিষয়ের আলোচনাতে বাঙ্গলাভাষা সম্বন্ধে অপূর্ব্ব জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। আমি বাঙ্গালী পাঠক মাত্রকেই মনোযোগ সহকারে এই দুটি প্রকরণ পড়্‌তে অনুরোধ করি। রামমোহন রায়ের সঙ্গে মিল্‌ন্ সাহেবের কারক এবং ক্রিয়া সম্বন্ধে সামান্য মতভেদ লক্ষিত হয়। সংস্কৃত ভাষার ন্যায় মিল্‌ন্ সাহেব বাঙ্গলা ভাষাতেও সাতটি কারকের অস্তিত্ব মানেন। কিন্তু রামমোহন রায় কেবলমাত্র কর্ত্তা, কর্ম্ম, সম্বন্ধ এবং অধিকরণ, এই চারটি কারকের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। অন্য তিনটিতে শব্দের কোনও রূপান্তর হয় না বলে' তিনি,—সেগুলি কারক শ্রেণীভুক্ত করেন নি। বাঙ্গলায় সম্প্রদান, কর্ম্মের রূপ ধারণ করে বলে', তিনি তাকে গৌণ কর্ম্ম স্বরূপ মনে করেন। করণ এবং অপাদান,—দ্বারা, দিয়া, কর্ত্তৃক, এবং হইতে, থেকে, প্রভৃতি অপর একটি শব্দের সাহায্যে সিদ্ধ হয় বলে', তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে সেগুলিকে বিভিন্ন কারক হিসেবে দেখেন না। আমার বিবেচনায় রামমোহন রায়ের মত অনুসারে, পদগঠনের বিভিন্নতার দরুণ কর্ম্ম, সম্বন্ধ এবং অধিকরণ যে এক শ্রেণীর কারক, ও করণ, সম্প্রদান এবং অপাদান যে আর এক শ্রেণীর কারক, এ বিষয়ে বৈয়াকরণিকদের লক্ষ্য থাকা দরকার।

মিল্‌ন্ সাহেবের মতে—

Bengalee verbs may be divided into three classes, according to their infinitive endings.

		Infinitive	Radical.
।	আ	করা	কর
॥	আন	দাঁড়ান	দাঁড়া
॥	ওয়া	যাওয়া	যা

কিন্তু রামমোহন রায়ের মত স্বতন্ত্র। তিনি বলেন—

"ক্রিয়াবাচক শব্দ, যাহার সহিত প্রত্যয়ের সংযোগ দ্বারা নানাবিধ পদ সিদ্ধ হয়, তাহাকে তিন প্রকারে বিভাগ করা যাইতে পারে :— অর্থাৎ "অন" যাহার অন্তে থাকে, যথা "মারণ"। "ওন" যাহার অন্তে থাকে সে দ্বিতীয় প্রকার হয়, যথা "যাওন"। আর "আন" অন্তে যাহার হয় সে তৃতীয় প্রকার, যেমন "বেড়ান"।

আমি রামমোহন রায়ের কৃত শ্রেণী বিভাগের পক্ষপাতী। কারণ যদিচ এই দুই প্রকার শ্রেণীবিভাগের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয় না, তথাপি একটি বিশেষ কারণে রামমোহন রায়ের মতই সমীচীন বলে' মনে হয়। ক্রিয়াকে ণিজন্ত করবার নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখলেই দেখতে পাওয়া যায় যে, রামমোহন রায় কৃত শ্রেণীবিভাগই সঙ্গত।

মিল্‌ন্‌ সাহেব বলেন যে—

"Causal verbs are formed by adding ন after the final আ of the first and third classes, e.g. করান to cause to do, বসান to cause to sit, খাওয়ান to cause to eat.

Causal verbs of the second class are formed by adding another verb.

দাঁড়ান to stand ; দাঁড় করান to cause to stand. There is also a double causal form with the verb দেওয়া to give, খাইয়ে দেওয়া &c.

রামমোহন রায়ের মতে—

ক্রিয়াকে ণিজন্ত অর্থাৎ প্রেরণার্থে প্রয়োগ করিবার প্রকার এই যে,—প্রথম প্রকার ক্রিয়ার নকারের পূর্ব্বে "আ" দিতে হয়, যেমন "দেখন" হইতে "দেখান", করণ হইতে "করান" ইত্যাদি।

দ্বিতীয় প্রকার ক্রিয়াতে নকারের পূর্ব্বে "য়া" দিতে হয়—যেমন "খাওয়ান।"

আর তৃতীয় প্রকার ক্রিয়া ণিজন্ত হয় না। ক্রিয়ার ণিজন্ত কর্‌তে অপর একটি ব্যঞ্জনবর্ণ বাইরে থেকে টেনে আনবার কোনও আবশ্যক নেই - স্বরবর্ণের গুণবৃদ্ধির দ্বারাই তা সিদ্ধ হয়। এই কারণে রামমোহন রায়ের মতই গ্রাহ্য।

একটি ছোট প্রবন্ধে মিল্‌ন্‌ সাহেবের ব্যাকরণের আদ্যোপান্ত সমালোচনা করা সম্ভব নয়, এবং আমার মত অশাস্ত্রীয় লোকের পক্ষে সেরূপ চেষ্টা করাটাও অনধিকার চর্চ্চা। তবে একথা নির্ভয়ে বলা যায়, যে এই ব্যাকরণ বাঙ্গলাভাষার একমাত্র পূর্ণাবয়ব ব্যাকরণ। এ বইয়ের প্রতি অধ্যায়ে লেখকের অসাধারণ পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। কোনও বিদেশী লোকের দ্বারা যে বাঙ্গলা ভাষার এরূপ ব্যাকরণ লেখা হতে পারে, এ বিশ্বাস আমার ছিল না। মিল্‌ন্‌ সাহেবের বইয়ের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, এক হিসাবে এখানিকে বাঙ্গলা ভাষার Dictionary of Idioms বলা যেতে পারে। বাঙ্গালী মাত্রেরই এ জ্ঞানটুকু আছে যে যতক্ষণ আমরা ইংরাজি ভাষার idiom না আয়ত্ত কর্‌তে পারি, ততক্ষণ ইংরাজি ভাষা শিখি নে, এবং যতক্ষণ আমরা idiomatic ইংরাজি লিখ্‌তে না পারি,

ততক্ষণ ইংরাজি লিখ্‌তে শিখিনে। কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের আর একটি বিশ্বাস আছে যে, যতক্ষণ আমরা বাঙ্গলা ভাষার idiom না ভুলে যাই, ততক্ষণ বঙ্গভাষা আমাদের আয়ত্ত হয় না, এবং idiomatic বাঙ্গলা লিখ্‌তে না ভুলে গেলে আমরা লেখক বলে অহঙ্কার করবার অধিকারী হইনে। কিন্তু যে দুচার জন লোক আজও idiomatic বাঙ্গলাকেই বাঙ্গলা ভাষা বলে জানেন, তাঁদের কাছে মিল্‌ন্‌ সাহেবের এই বইটি অতি উপাদেয় গ্রন্থ।

ব্যাকরণ লেখা শক্ত হলেও, তা পড়া আরও শক্ত। ব্যাকরণের নাম শুন্‌লে যে লোকে আঁতকে ওঠে—তার কারণ সচরাচর যেরূপ ফর্দ্দওয়ারি ভাবে এ শাস্ত্র লেখা হয়ে থাকে, তার চাইতে নীরস লেখা সাহিত্যে পাওয়া দুষ্কর। মিল্‌ন্‌ সাহেবের বইয়ের এই একটি প্রধান গুণ যে, বইখানি আগাগোড়া সরস। উদাহরণ সংগ্রহের চাতুরির গুণে, এই ছয়শ' পাতার বইও এক নিঃশ্বাসে পড়া যায়।

লেখক গ্রন্থের ভূমিকায় বিনয় করে বলেছেন, যে বিদেশী ভাষার ব্যাকরণ লিখ্‌তে গিয়ে তিনি নিশ্চয়ই অনেক ভুল ভ্রান্তি করেছেন। দুটি চারটি ছোটখাট ভুলভ্রান্তি যে এখানে ওখানে দেখা যায় না, এমন নয়; কিন্তু সে সব ভুল এত সামান্য যে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। তবে গ্রন্থকার একটি মহাভুল করেছেন—সে হচ্চে গ্রন্থের মূল্য সম্বন্ধে। একে ব্যাকরণ, তা আবার যদি দশ টাকা দাম দিয়ে কিন্‌তে হয়, তাহলে এ বই সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের ভোগে কখন আস্‌বে না। মিল্‌ন্‌ সাহেব বাঙ্গলাভাষা যেরূপ জানেন, বাঙ্গলা ভাষার বাজার দর যদি তার সিকির সিকিও জান্‌তেন তাহলে ঐ দামের অঙ্কের শেষ শূন্যটা মুছে দিতেন।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

যোগীবেশ

দুঃখ সুখের উপবটিতে বাঁধব আমি ঘর,
সেথায় গিয়ে তোমার সাথে মিলব যোগীবর।
আমার মনের এই আশাটি বিফল হবার নয়;
যতই কঠিন হোক্ না কেন দুঃখ সুখের জয়।

তুমি যোগী, তোমার মনে নাইক কোন আশা,
তাইতে সেথা দুঃখ সুখে বাঁধতে নারে বাসা।
তোমার মনের সঙ্গে আমার মনটি করি লয়,
অনায়াসে করব আমি দুঃখ সুখে জয়।

সকল-ত্যাগী তোমার লাগি দুঃখের ভাগী হব,
এই কথাটি মনে আমার রয় গো যদি ধ্রুব,
তবেই আমার মনের আশা বিফল হবার নয়
যতই কঠিন হোক্ না কেন দুঃখ সুখের জয়।

তোমার সাথে মনটি আমার ধরবে যোগীবেশ
সুখে দিয়ে জলাঞ্জলি দুখের পর্ব্ব শেষ।
ওহে যোগি, তোমায় মাগি—শুধু তোমায় চাই
দুঃখ সুখের বালাই আমার ত্রিসীমানায় নাই।

শ্রীহেমলতা দেবী।

"বাজাও রে মোহন বাঁশী।
সারা দিবসক বিরহ-দহন-দুখ,
মরমক তিয়াষ নাশি।"

—ভানুসিংহ

শ্রীমতী সুনয়নী দেবী অঙ্কিত রেখা-চিত্র হইতে

ভুক্ত-ভোগীর পত্র*

তোমরা যে "ভাই-বোন্-সমিতি" স্থাপন করেছ, তা-থেকে নানান্ কথা আমার মনে আস্‌ছে—সে কথাগুলি তোমাদের বলা ভাল—তাতে কতকটা তোমাদের উপকার হ'তে পারে।

কৈ—তোমাদের এই বয়সে, "ভাই-বোন্ সমিতি"র মত কোনও উচ্চতর কল্পনা তো আমাদের মাথায় আসে নি। সব ভাই বোন্ মিলে জ্ঞানের চর্চ্চা করা—বড় ভাই ছোট ভাইয়ের শিক্ষার ভার স্বেচ্ছাক্রমে গ্রহণ করা—পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব বর্দ্ধন করবার চেষ্টা করা—জ্ঞান চর্চ্চা ও কর্ত্তব্য-সাধনের উচ্চতর আনন্দ এবং বিশুদ্ধ সঙ্গীতের বিশুদ্ধ আমোদ বিশুদ্ধ-ভাবে উপভোগ করা—এ প্রকার ভাব, সেকালে আমাদের মনে তো উদয় হয় নি—এর কারণ কি? এর কারণ নির্ণয় করতে গেলে আমাদের পারিবারিক ইতিহাসের কতকটা সমালোচনা করতে হয়—তখনকার সমাজের সহিত এখনকার সমাজের তুলনা করতে হয়।

ভাল হোক্, মন্দ হোক্ কতকগুলি বিশেষ ভাব নিয়ে আমরা জন্মগ্রহণ করি—আবার কতকগুলি ভাব আমরা আমাদের চারিদিক থেকে কতকটা জ্ঞাতসারে এবং কতকটা অজ্ঞাতসারে আত্মসাৎ করি। ছেলেবেলায় যখন মন নরম থাকে তখন বাহিরের ছাঁচ সহজেই তাতে পড়ে—যা দেখি তাই অজ্ঞাতসারে শিখি; চোখের সাম্‌নে ভাল দৃষ্টান্ত থাকে তো ভাল শিখি, মন্দ দৃষ্টান্ত থাকে তো মন্দ শিখি। ছেলেবেলায় আস্তে আস্তে যে সকল সংস্কার বদ্ধমূল হয়, বেশী বয়সে ইচ্ছা করলেও তা' সহজে উন্মূলিত করা যায় না। অল্প অল্প পলি পড়ে' পদ্মানদীর গর্ভ থেকে যেমন বিস্তীর্ণ চড়ার উদ্ভব হয়—সেইরূপ ছেলেবেলা থেকে নানাপ্রকার সংস্কার ক্রমশ জমে' জমে' ও অভ্যাসে পরিণত হয়ে মানুষের চরিত্র গড়ে ওঠে—একবার গড়ে উঠ্‌লে তা সহজে ভাঙ্গা যায় না। অতএব ছেলেবেলায় আমরা কিরূপ দৃষ্টান্ত চারিদিকে দেখ্‌তে পাই—কিরূপ শিক্ষা লাভ করি তারই উপর আমাদের ভবিষ্যৎ-জীবনের গতি অনেকটা নির্ভর করে।

তখন আমাদের বাড়ীতে দুর্গা পূজার বড়ই ধূম হত। ইন্দ্রিয়মুগ্ধকর চাকচিক্য-শালী—বিচিত্র সজ্জায় সজ্জিত, বিবিধ ভূষণে ভূষিত প্রতিমা আমাদের মনকে প্রবলরূপে আকর্ষণ করত। ইস্কুল থেকে তাড়াতাড়ি এসে আমরা প্রতিমা গড়া দেখ্‌তে বস্‌তেম—তাতে বড়ই আমাদের আমোদ হত। পূজার তিন দিন উঠানে যাত্রা হত—এবং বৈঠকখানায় বাই-নাচ হত। যাত্রা শোন্‌বার আশায় আমরা দিনের বেলায় নিদ্রা যেতেম এবং আমাদের

* আমাদের যোড়াসাঁকোর বাড়ীর ছেলেরা 'ভাই-বোন্-সমিতি' নামে এক সম্মিলনী-সভা স্থাপন করিয়াছে শুনিয়া বাড়ীর এক ছেলেকে এই পত্রখানি লেখা হয়। ভা-সঃ

চাকররা কতকরাত্তির পর্য্যন্ত জোর করে' আমাদের বিছানায় শুইয়ে রাখ্‌ত— কিন্তু আমাদের ঘুম হবে কেন?—ঢোলে যেই চাঁটি পড়ত অমনি তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেমে একছুটে আমরা খড়খড়ের বারাণ্ডায় হাজির হতেম।

উঠানে কোন কিছু ব্যাপার হলে, খড়খড়ের বারাণ্ডাই মেয়ে-মহলের আড্ডা হয়ে থাকে—সেইখানে মেয়েদের সঙ্গে বসে যেতেম; তার পর আমাদের খানসামা প্রভুরা এসে—জরির কাজ-করা ফুলকাটা সাটিনের চাপকান পায়জামা, জরির কোমরবন্ধ—জরির টুপি, হাতে ঝোলাবার জন্য রেশমের একটা রুমাল,—এইরূপ সেকালের খোকাবাবুর সজ্জায় সজ্জিত করে' চণ্ডিমণ্ডপের দালানের রোয়াকে আমাদের বসিয়ে দিত। যাত্রার মধ্যে সং-ই আমাদের ভাল লাগত—কোন কোন মুখস-ওয়ালা সং দেখে আমরা বড়ই ভয় পেতেম—আমার মনে পড়ে, নিমাই দাসের দলের ধূম্রলোচনকে দেখ্‌লে আমরা আঁৎকে উঠে চীৎকার করে কেঁদে উঠ্‌তেম। পূজার কয়দিন চারিদিকে মদের ছড়াছড়ি—যে ঘরে যাও সেইখানেই মদের গন্ধ। এই পূজার সময় পিতৃদেব প্রতি বৎসরেই কোথাও না কোথাও ভ্রমণে বাহির হতেন, বাড়ী থাকতেন না।

* * * * * *

আমাদের সময়ে ছেলেদের উপর খুব কড়া শাসন ছিল—সঙ্গে সঙ্গে চাকর লেগেই আছে--অভিভাবকদের না বলে' এবাড়ি থেকে ওবাড়ি যাবার জো নেই—পাছে ছেলে খারাপ হয়ে যায়; একেই বলে "গোড়া কেটে আগায় জল"। তখনকার ছেলেরা শাসনের চাপে একেবারে পিষে' থাকৃত। অভিভাবকের শাসন—গুরুমহাশয়ের শাসন—আবার চাকরের শাসন, অভিভাবকের ধম্‌কানি—গুরুমহাশয়ের বেত, চাকরের গুঁতো;—ছেলে-বেচারা কদিক সাম্‌লাবে? এইরূপ শাসনে শাসনে যখন সে স্ফূর্ত্তিহীন নির্জীব হয়ে পড়েছে, তখন তার আবার ইস্কুলে ভর্ত্তি হবার সময় হয়ে এল। ইস্কুলে আবার মাষ্টারের শাসন—তার উপর দুষ্ট সহপাঠীদের অত্যাচার—ইস্কুলকে তাই আমাদের যমপুরী বলে মনে হত, পড়াশুনা কর্‌তে আদবেই মন যেত না। কিন্তু বাড়ি এসেও নিস্তার নেই—বাড়িতে এসেই দু-চারখানা লুচি খেয়েই আবার ঘাড় গুঁজে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পড়তে হত—একটু যে খেলা-ধূলা করা যাবে তার জো নেই; শরীর শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন—ঘুম পাচ্চে—ঢুলে ঢুলে পড়চি, অভিভাবকের পায়ের শব্দ শুন্‌বামাত্রই—সজোরে "বি এ টি ব্যাট্—সি এ টি ক্যাট" আওড়াচ্চি। তার পরেই আবার বাড়ির মাষ্টার—"স্যার" (Sir); তিনি খুব ভাল মানুষ ছিলেন, তিনি আমাদের প্রতি কোন অত্যাচার করতেন না। বাঙ্গলা ইস্কুল দুর্নীতি শিক্ষার একটি প্রধান স্থান--কুসঙ্গ যতদূর হতে পারে তা সেইখানে হয়। এখন বাঙ্গালা ইস্কুলের সেইরূপ অবস্থা আছে কিনা বল্‌তে পারি নে—যদি থাকে, তা হলে সে সকল ইস্কুলে শিক্ষার জন্য

বালকদের পাঠানোর চেয়ে তাদের বাড়িতে রেখে শিক্ষা দেওয়া ভাল। ইংরাজি ইস্কুলে অতটা দুর্নীতিশিক্ষার ভয় নেই; তোমরাও বোধ হয় তোমাদের নিজের পরীক্ষায় তা দেখেছ। ইংরাজি ইস্কুলে মারামারি ঘুসা-ঘুসির প্রাদুর্ভাব থাক্‌তে পারে, কিন্তু বাঙ্গালা ইস্কুলের ছাত্রদের মত ওরূপ অভদ্র আচরণ খৃষ্টীয় বালকদিগের মধ্যে দেখা যায় না। তার কারণ বোধ হয় ইংরাজ বালকেরা এক-ধর্ম্মাধীন বলে' তাদের মধ্যে নীতিগত বৈষম্য ততটা নেই—কিন্তু আমাদের মধ্যে বর্ণভেদ থাকায়, প্রত্যেক বর্ণের পুরুষপরম্পরাগত সামাজিক অবস্থা ও শিক্ষাদীক্ষাভেদে—আমাদের মধ্যে নীতিগত অনেকটা বৈষম্য হয়ে পড়েছে, সভ্যতারও যেন বিভিন্ন স্তর পড়ে গেছে। ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য গরীব হলেও তাদের মধ্যে একটা স্বাভাবিক ভদ্রতা ও সভ্যতার ভাব দেখা যায়—কিন্তু নিম্নতর শ্রেণীর বালকেরা ধনীর সন্তান হলেও তারা সভ্যতার যেন একটা নিম্ন স্তরে আছে বলে' মনে হয়। তাদের মুখে সর্ব্বদাই অশ্লীল কথা শোনা যেত। (১) ইস্কুলে আমি এইরূপ কতকগুলা ছেলের পাল্লায় পড়েছিলেম। ক্লাসের মধ্যে তাদের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। কেউ যদি তাদের মতের বিরুদ্ধে যেত তাহলে তাকে তারা এক ঘরে করে' জব্দ করত। একদিন মাষ্টার-মশায় ক্লাসে আস্‌বার পূর্ব্বে ঐ সকল দুষ্ট ছেলে পরামর্শ করে' তাঁর চৌকিতে কালি ঢেলে দিয়েছিল—মাষ্টারমহাশয় যেমন চেয়ারে বস্‌বেন, তাঁর কাপড়-চোপড় কালিতে প্লাবিত হয়ে গেল—তিনি ক্রোধান্ধ হয়ে কে এ কাজ করেছে, প্রত্যেক ছাত্রকে একে একে জিজ্ঞাসা করলেন; কেউ তার নাম বল্‌লে না—শেষে আমাকে যখন জিজ্ঞাসা করলেন, আমি সত্য কথা বল্লেম। সেই অবধি আমার উপর তাদের বিশেষ আক্রোশ হল—আমাকে একঘ'রে করলে—আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করে' দিলে—আমার পড়বার বই চুরি করে' এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখত যে আমি কোথাও খুঁজে পেতেম না—রোজ রোজ বই হারিয়ে বাড়ীতে ধম্‌কানি খেতে হত—এমন মুস্কিলে পড়েছিলেম কি আর বলব। এই সকল কারণে ইস্কুলের নামে জ্বর আসত—পড়াশুনার উপর বিতৃষ্ণা জন্মে গিয়েছিল। কোনপ্রকারে এন্‌ট্রান্‌সটা পাশ করেছিলেম। তার পর, কালেজে Second year ক্লাসে পড়তে পড়তেই, মেজদাদা আমাকে সঙ্গে করে' বোম্বাই নিয়ে গেলেন—সেইখানে স্বাধীনতার মুক্ত বাতাসে আমার জ্ঞানস্পৃহা আবার অল্পেঅল্পে ফুটে উঠ্‌ল—তখন থেকে প্রকৃতপক্ষে আমার শিক্ষা আরম্ভ হল বলতে হবে। ছেলেদের রাশিরাশি জ্ঞান অল্পসময়ের মধ্যে জোর করে' গিলিয়ে দেওয়ার চেয়ে যাতে তাদের স্বাভাবিক জ্ঞানস্পৃহা উদ্বোধিত হয় তারই উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা ও তার উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। অতিশাসনে ও অতিশিক্ষায় হিতে বিপরীত হয়ে পড়ে। জ্ঞানস্পৃহা একবার উদ্বোধিত হলে, পড়া

(১) শিক্ষার প্রসারে এখন বোধ হয় এরূপ বর্ণগত নীতি-বৈষম্য আর নাই। অবশ্য তখনও নিম্নবর্ণের ছেলের মধ্যে সুশীল সজ্জন না দেখিয়াছি এমন নয়। তবে সাধারণ ভাবটা ঐরূপ ছিল। জ্যো

শুনায় মন দেবার জন্য অন্যের শাসন ও পীড়াপীড়ির অপেক্ষা করে না। তোমাদের গোড়ার শিক্ষা এই প্রণালীতে হয়েছিল বলে' বই পড়বার জন্য তোমাদের কখন পীড়াপীড়ি করতে হয় নি—বরং কখন কখন বই থেকে তোমাদিগকে তফাৎ রাখবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে হত।

তার পর আমাদের পরিবারের মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন ঘট্‌ল—পৌত্তলিক ক্রিয়াকর্ম্ম উঠে গিয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান হতে লাগল—আমাদের সাবেক চণ্ডীমণ্ডপ ব্রহ্মমণ্ডপে পরিণত হল। এখন থেকে অশরীরী উচ্চ ভাবের কথা, গভীর সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কথা আমাদের কাণে প্রবিষ্ট হতে লাগল। এই থেকেই আমরা মানুষ হয়ে উঠলেম। তবে তোমাদের মধ্যে এখন যেরূপ জ্ঞানের আলোচনা হচ্চে, আমাদের-মধ্যে তখনো ততটা হয়নি। তোমাদের মত আমাদেরও মধ্যে একটা সভা ছিল; কিন্তু তার বেশি বর্ণনা করতে হবে না—তার নামটি বলবামাত্রই তার পেটের কথা আপনিই বের হয়ে পড়্‌বে—তার নাম ছিল “eating club”। এই সভার প্রত্যেক সভ্যকে পালা করে' খাওয়াতে হত। আহারের ব্যাপারটা যে দূষ্য তা আমি বল্‌চি নে; শারীরিকের সঙ্গে যদি মানসিক খাদ্যের কিছু যোগাড় থাকৃত তা হলেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হত!

আমাদের সময়ে কিন্তু অনেকগুলি মহৎ কল্পনার আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল - আশা হচ্ছে, আজ তোমরা সেগুলি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে কার্য্যে পরিণত করতে পারবে। আমাদের বাড়ীর সাহায্যে নবগোপাল বাবু (২) হিন্দু মেলা স্থাপন করেন—সেই অবধি জাতীয় ভাবের আন্দোলন আমাদের দেশে আরম্ভ হয়েছে; বাঙ্গালীদের মধ্যে জীম্‌ন্যাস্‌টিক্ সর্কস্ সেই আন্দোলনের ফল। তখন ঐ মেলায় জাতীয় ভাবের উদ্দীপক কবিতা সকল পাঠ হত। আমার সঙ্গে নবগোপাল বাবুর যখনই দেখা হত তিনি ঐরূপ উত্তেজনার কবিতা আমাকে লিখ্‌তে অনুরোধ করতেন; আমার কবিতা লেখা কখনও অভ্যাস ছিল না—কিন্তু এইরূপ দায়ে পড়ে' একটা কবিতা লিখেছিলেম। সেবারকার মেলায় শিবনাথ বাবুর, (শাস্ত্রী), অক্ষয়ের (অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী) ও আমার কবিতা পাঠ হয়—সেই অবধি জাতীয়ভাবউদ্দীপক বিষয়সকল লিখতে আমার প্রবৃত্তি হল। সাহিত্যচর্চ্চায় আমার মন গেল। ছোটখাট ঘটনা থেকে অনেক সময়ে জীবনের গতি কেমন অলক্ষিতভাবে ফিরে যায়! ব্রাহ্মধর্ম্মের সঙ্গেসঙ্গে আমাদের বাড়িতে একটা জ্ঞানের ঢেউ এসেছিল; পিতৃদেবের জ্বলন্ত ব্যাখ্যান—মেজদাদার মনোহর ব্রহ্মসঙ্গীত—বড়দাদার গভীর তত্ত্ববিদ্যা ও অনুপম স্বপ্নপ্রয়াণ—জ্ঞানধর্ম্মের আলোক বিস্তার করছিল; ওদিকে আবার আর একটি “নব ভানু” আমাদের পারিবারিক সাহিত্য-আকাশে উদয় হয়েছিল - সেই ভানু এখন পূর্ণ মহিমায় বিরাজ করচে এবং তার প্রদীপ্ত কিরণ এখন আমাদের

(২) এত লোকের এত স্মৃতিচিহ্ন হচ্চে, নবগোপাল বাবু যে অমন একটা কাজ করেছিলেন, এখন কেহ তাঁহার একবার নামও করে না। কি দুঃখের বিষয়। শ্রীজ্যো

পারিবারিক গগনকে অতিক্রম করে' সমস্ত বঙ্গভূমিকে আলোকিত করচে।

"ভারতী পত্রিকা" এই পারিবারিক সাহিত্য-আন্দোলনের আর একটি ফল। এই পত্রিকা আমাদের জ্ঞানচর্চ্চার একটি উর্ব্বর ক্ষেত্রস্বরূপ। উহাতে যে সকল সাহিত্য-বীজ রোপণ করা হয়েছিল, তা রবির কিরণে, সতেজ ও পরিপুষ্ট বৃক্ষে পরিণত হয়ে এখন স্বর্ণফল প্রসব করচে!

আমাদের পারিবারিক উন্নতির আর একটি প্রধান নায়ক হচ্চেন মেজদাদা। তিনিই স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রধান প্রবর্ত্তক। আমাদের মেয়েরা যে অন্তঃপুরের কারাগার হতে মুক্তি লাভ করেছেন—শোভন পরিচ্ছদ পরিধান করচেন—মহৎকল্পনাসকলের আন্দোলনে পুরুষদের সঙ্গে যোগ দিতে পারচেন সে কেবল মেজদাদার প্রসাদে। তিনি যদি প্রথম স্ত্রী-স্বাধীনতার ভাব আমাদের মধ্যে প্রবর্ত্তন না করতেন, তাহলে ভাই-বোন মিলে যে কোন-সভা করা যেতে পারে এ কল্পনা তোমাদের মনে কখনই আস্‌তে পারত না। এখন যে মেয়েরা গাড়ী করে বাহিরে যাচ্চেন, পুরুষদের সঙ্গে মেলা মেশা করচেন—তোমাদের কাছে এ সমস্ত ভারি সহজ ও স্বাভাবিক বলে মনে হতে পারে—কিন্তু বাস্তবিক ধরতে গেলে, এ সমস্ত বড় সহজে হয় নি—এই নিয়ে অনেক নিন্দাবাদ সহ্য করতে হয়েছে—আপনাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ও মনান্তর হবার উপক্রম হয়েছে—অনেক মনঃকষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। অল্পে অল্পে একটু একটু করে'—একপা-একপা অগ্রসর হয়ে এতদূর এসে পড়া গেছে। আমার মনে পড়ে, প্রথমে যখন মেয়েরা গাড়ি করে বেড়াতে আরম্ভ করেন—গাড়ির দরজা খুলতে আমি কিছুতেই দিতেম না—ক্রমশঃ একটু একটু খুলে দিতে আরম্ভ করলেম—সিকিখানা—আধখানা—ক্রমে ষোল আনা। তখন বাহিরের কোন পুরুষ আমাদের মেয়েদের মুখ দেখলে আমার যেন মাথা কাটা যেত; প্রথমে দরজা-বন্ধ ঢাকা গাড়ি, পরে দরজা-খোলা ঢাকা গাড়ি, পরে টপ-ফেলা ফিটেন গাড়ি—ক্রমে একেবারে খোলা ফিটেন গাড়ি ধরা গেল—গুটিপোকা ক্রমে প্রজাপতিতে পরিণত হ'ল। অভ্যাসের এমনি গুণ—এখন আর কিছুই মনে হয় না। এ স্ত্রী-স্বাধীনতায় যে ভাল ফল হয়েছে তার সন্দেহ নাই। কোন জাতির মধ্যে কিম্বা কোন পরিবারের মধ্যে স্ত্রী-পদবীর উন্নতি না হলে কখনই সেই জাতির কিম্বা সেই পরিবারের সমগ্র উন্নতি হয় না। স্ত্রী জাতির সুশিক্ষা না হলে পুরুষের শিক্ষা কখনই সম্পূর্ণ হতে পারে না। ছেলে মানুষ-করা মায়ের কাজ—শুধু বড় করে' তোলাকে যদি মানুষ করা বলে, তাহলে গাধাও মানুষ হচ্চে, ঘোড়াও মানুষ হচ্চে—তাকে আমি "মানুষ করা" বলি নে। যাতে ছেলে বড় হলে মনুষ্য নামের যোগ্য হয়—তার মনুষ্যত্ব জন্মে, এরূপ করে' তাকে লালনপালন করা, তার শিক্ষা দেওয়া মায়ের কর্ত্তব্য। মা নিজে সুশিক্ষিতা না হলে এরূপ গুরুতর ভার কি করে' গ্রহণ করবেন? স্ত্রীলোকদের কতকটা স্বাধীনতা না থাকলে চরিত্রের বল কিরূপে সঞ্চয় হবে?—অন্তঃপুর থেকে

বাহিরে গিয়ে জ্ঞাতব্য পদার্থ সকল স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ না করলেই বা কিরূপে তাদের শিক্ষার পূর্ণতা হবে?—পরিবারের মধ্যে যদি পুরুষেরা সুশিক্ষিত হয়, আর মেয়েরা অশিক্ষিতা থাকে তাহলে বড়ই গোল বাধে। পুরুষেরা ভাল বলে' যা করতে যায়, মেয়েরা বুঝ্‌তে না পেরে তার বাধা দেয়—স্পষ্ট বাধাও যদি না দেয়—পুরুষের সঙ্গে সে সকল বিষয়ে তারা সহানুভূতি করতে পারে না—কাজেই পরিবারের মধ্যে একটী অশান্তি ও কষ্টের কারণ হয়ে ওঠে। তাই বল্‌চি, তোমরা শুধু আপনার উন্নতির চেষ্টা না করে', সেই সঙ্গে তোমাদিগের বোন্‌দিগেরও উন্নতির চেষ্টা করচ এ বড়ই আহ্লাদের বিষয়। যদি কোন পরিবারে পুরুষদের মধ্যে জ্ঞানের চর্চ্চা থাকে—তা হলে সাক্ষাৎভাবে না হোক্‌ অন্ততঃ অসাক্ষাৎভাবে কতকটা সেই আন্দোলনের ফল স্ত্রীলোকদের মধ্যেও এসে পড়ে—তাতে আবার যদি সেই পরিবারে স্ত্রীপুরুষদের মধ্যে মেলা-মেশা ও দেখাশুনা কথাবার্ত্তার বিশেষ সুযোগ থাকে তাহলে ভাবের আদানপ্রদানে সেই শিক্ষার আরও বিস্তার হয়।

আমরাই আমাদের অন্তঃপুরের মধ্যে কত পরিবর্ত্তন দেখেছি। এখন আমাদের মেয়েরা স্বাস্থ্যের নিয়ম যেরূপ বোঝেন, সেরূপ পূর্ব্বে আমাদের বাড়ির মধ্যে দেখা যেত না। এখন কোথায় একটু অপরিষ্কার হল—দুর্গন্ধ হল—অমনি, সকলে ব্যতিব্যস্ত, তার প্রতিবিধানের চেষ্টা করেন। ছেলেরা যাতে ভাল হাওয়ায় থাকে—পুষ্টিকর খাদ্য খেতে পায়—তার প্রতি সকলের এখন বিশেষ দৃষ্টি। ছেলেদের নীতিশিক্ষার বিষয়েও এখন মায়েরা মনোযোগী। চাকর দাসীরা ছেলেদের ভূতের ভয় না শেখায়—ছেলে ভোলাবার জন্য মিথ্যা কথা না বলা হয় ইত্যাদির প্রতি তাঁদের লক্ষ্য আছে। ছেলের মঙ্গলের জন্য শুধু শান্তি স্বস্ত্যয়নের উপর এখন তাঁরা নির্ভর করেন না। আর একটি শিক্ষার ফল এই দেখা যায়—ছেলে মেয়েদের বিবাহের বয়স হলেই যে তাদের বিবাহ দিতে হবে এরূপ সংস্কার আমাদের মেয়েদের মধ্যে এখন আর নেই। এখন বিবাহ দেবার পূর্ব্বে ছেলের জীবিকার উপায় আছে কি না, শিক্ষার ব্যাঘাত হবে কি না ইত্যাদি সাত পাঁচ অনেক ভাবেন; তাছাড়া যার সঙ্গে বিবাহ হবে তার ধন আছে কি না, বিদ্যা আছে কি না—তার শরীর নীরোগ কি না—তার পিতামাতার স্বভাবচরিত্র কিরূপ—তাঁদের শরীরে কোন সংক্রামক রোগ আছে কি না ইত্যাদি। এমন কি ফ্রেনলজির মতে পাত্রের মাথায় কোন্‌ ঢিবি বেশি ফুলো আছে তার পর্য্যন্ত সন্ধান লওয়া হয়। (ফ্রেনলজি আমাদের বাড়ির মধ্যে এমন প্রচার হয়ে পড়েছে যে, আমাদের দিদিমা বুড়িও দুই একটা ঢিবি হাত্‌ড়ে বল্‌তে পারেন)। এর থেকে বুঝ্‌তে পারবে বাড়ির পুরুষদের জ্ঞানানুশীলনের ফল মেয়েদের মধ্যে কত দূর পর্য্যন্ত পৌঁছোয়।

আমাদের পালা প্রায় একরকম শেষ হয়ে এসেছে এখন তোমাদের পালা; তোমরা এখন আসরে নেবেছ—দেখা যাক তোমরা কি করে ওঠো। যে রকম লক্ষণ

দেখা যাচ্ছে, তাতে তো খুব ভালই বোধ হচ্ছে। তোমাদের মধ্যে সাহিত্যের চর্চ্চা, বিজ্ঞানের চর্চ্চা, সঙ্গীতের চর্চ্চা—সদ্ভাবের চর্চ্চা দেখতে পাওয়া যাচ্চে। কিন্তু আমার বোধ হয় একটার প্রতি তোমাদের তেমন দৃষ্টি নেই—সে হচ্চে ব্যায়াম-চর্চ্চা। প্রদীপে পূর্ণমাত্রায় তেল না থাকলে প্রদীপ যেরূপ সমানভাবে ভাল করে জ্বলে না—এক এক-বার দপ্ করে জ্বলে পরক্ষণেই নিবে যায়, সেইরূপ শরীরের উন্নতি না হলে—মানসিকই বল, আধ্যাত্মিকই বল, কোন উন্নতিই স্থায়ী হয় না, কোন বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করা যায় না। ইংরাজদের মত' আমরা এখনও ব্যায়ামের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা সেরূপ সর্ব্বান্তঃকরণে হৃদয়ঙ্গম করতে পারি নি;—তা যদি পারতেম তা হলে যেরূপ এখন আমরা সবাই নিয়মিত আহার করি, স্নানাদি করি, সেইরূপ প্রত্যহ ব্যায়ামও করতেম। ব্যায়াম না হলে চলে না—এরূপ আমরা মনে করি না, ওটাকে আমরা সখের জিনিস বলে' মনে করি। তাই কেউ সখ করে ব্যায়াম চর্চ্চা করে—কেউ বা করে না। কিন্তু তা তো ঠিক্ নয়—নিয়মিত ব্যায়াম না করলে কিছুতেই আমাদের শরীর বলিষ্ঠ ও সুস্থ থাকতে পারে না। যেমন তোমাদের মধ্যে কেহ বা বিজ্ঞানশিক্ষা—কেহ বা সঙ্গীত শিক্ষা দেবার ভার নিয়েছ—সেইরূপ কেহ যদি ব্যায়াম শিক্ষা দেবার ভার গ্রহণ কর তো ভাল হয়।

* * *

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২৯ জ্যৈষ্ঠ সন ১২৯৭

সাজাদপুর জমিদারী কাছারী।

স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

(জন্ম ৭ই কার্ত্তিক ১২৫১, মৃত্যু ৩১ জৈষ্ঠ ১৩২০)

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী ও অন্য বহু গ্রন্থপ্রণেতা, অসামান্য বাগ্মী ও সমাজ সংস্কারক, ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ও নারীসুহৃদ্ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষদিনে আমাদের এই মর্ত্ত্যধাম ত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। নগেন্দ্রনাথের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ পণ্ডিত রামশরণ তর্কবাচস্পতি বাঁশবাড়িয়ার রাজা নৃসিংহদেব রায়ের সনির্ব্বন্ধ আগ্রহ ও অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্ববঙ্গের বরিশাল-বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক গঙ্গার পশ্চিমকূলে বাঁশবাড়িয়া গ্রামে বাসস্থান পরিবর্ত্তন করেন।

নগেন্দ্রনাথের পিতৃকুলের কুলমর্য্যাদার সঙ্গে অসাধারণ বিদ্যাবত্তা, শাস্ত্রজ্ঞান, ও উদারতা দর্শনে রাজা নৃসিংহ অত্যধিক আকৃষ্ট হন। বহু গুণের আধার পণ্ডিত রামশরণের চরিত্রসৌরভ কস্তুরীর ন্যায় রাজার হৃদয়মন মাতাইয়াছিল, তাই তিনি

বহু বিত্ত দানে রামশরণকে বাঁশবাড়িয়াতে বাস করাইয়াছিলেন, সে আজ দুইশত বৎসরেরও অধিক পূর্ব্বের কাহিনী। নগেন্দ্রনাথের পিতামহ দেবনাথ তর্কসিদ্ধান্ত যেমন পণ্ডিত তেমনি উদারহৃদয় ছিলেন। ভারতবর্ষের নানাস্থানের ছাত্র তাঁহার আশ্রয়ে বাস করিয়া বিদ্যাধ্যয়ন করিতেন। তিনি বিদ্যা ও সঙ্গে সঙ্গে অন্নদানে কল্পতরুসদৃশ ছিলেন। ইহার সম্বন্ধে কথিত আছে, একদা কোনস্থানে যাইবার সময়ে পথ হারাইয়া তিনি বড়ই বিপদে পড়িয়াছিলেন। এক চণ্ডাল-কৃষক তাহার কার্য্য ফেলিয়া রাখিয়া তাঁহার সঙ্গ লইয়া তাঁহাকে যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিলে, তিনি তাহাকে নমস্কার করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, এই ব্যাপারে সেই কৃষক কুণ্ঠিত ও কাতর হয়, এবং সমাজেও একটু আন্দোলন হয়, কিন্তু দেবনাথ

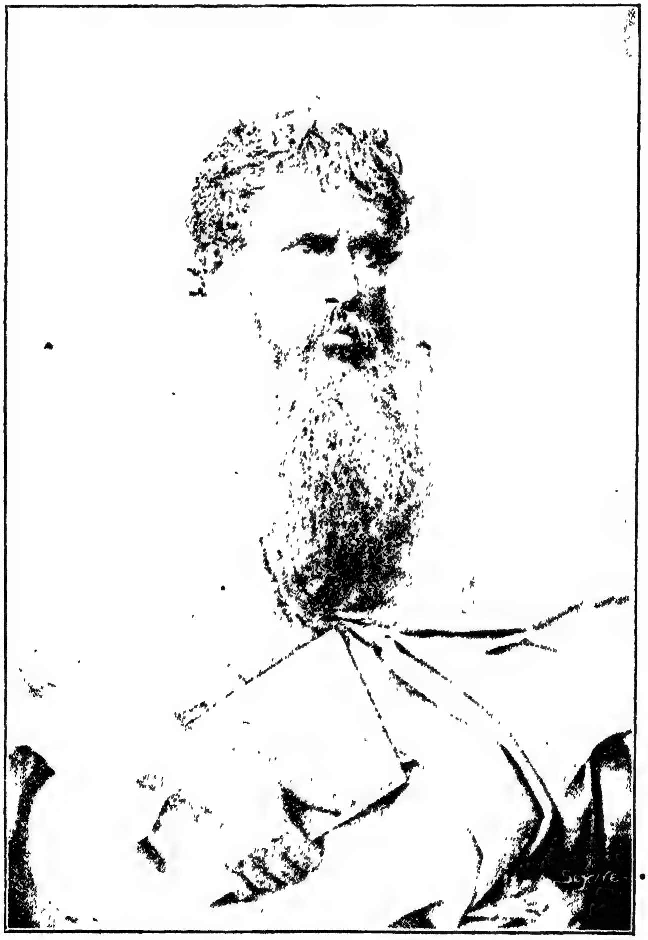

স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

সর্ব্বসমক্ষে তাহাকে পথপ্রদর্শক গুরু বলিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। এইরূপ উচ্চ উদারতার ফলেই পৌত্র নগেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য্য, প্রচারক ও দীনবৎসল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিলেন।

দেবনাথের একপুত্র ও নগেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠতাত পণ্ডিত রমানাথ তর্কবাগীশ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নির্ব্বাচিত চারিজন বেদাধ্যয়ন-কারীর অন্যতম। বাঁশবাড়িয়া যে মহর্ষির বিশেষভাবে নির্ব্বাচিত প্রিয়স্থান হইয়াছিল, তাহার মূলে পণ্ডিত রমানাথের আকর্ষণ যে বিশেষ শক্তিসঞ্চার করিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মহর্ষি প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা কলিকাতা হইতে বাঁশবাড়িয়াতে স্থানান্তরিত হওয়ার মূলেও নগেন্দ্রনাথের পিতৃকুলের সম্পর্ক বিদ্যমান।

নগেন্দ্রনাথের পিতা পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যারত্নও উদারহৃদয়ের লোক ছিলেন। মাতা তারাশঙ্করী লোকের দুঃখকষ্ট সহ্য করিতে পারিতেন না, লোকের অভাবমোচনে সর্ব্বদাই মুক্তহস্ত ছিলেন। তবেই এখন দেখা যাইতেছে যে নগেন্দ্রনাথের উচ্চ বুদ্ধিবৃত্তি ও জ্ঞান, সহৃদয়তা ও উদারতার মূলে তাঁহার পিতৃমাতৃ বংশগত আচার আচরণ, ভাবভঙ্গী ও ধাতটুকু বেশ স্থান পাইয়াছিল, এবং পরে বিস্তৃত আকারে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আচার্য্য নগেন্দ্র-নাথের জীবন যাপন হইতে বেশ অনুভূত হইতেছে যে শোণিতমর্য্যাদা একেবারে অবজ্ঞার বিষয় নহে। এরূপ পিতৃপিতামহের বংশধর না হইয়াও যে, কেহ উচ্চ কৃতিত্ব জীবনে ফুটাইয়া তুলিতে পারিবেন না, একথা বলি না, কিন্তু এরূপ পিতৃমাতৃকুল প্রাপ্তি যে সৌভাগ্যের বিষয় তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনগত বিবিধ উপকরণগুলি ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছে।

নগেন্দ্রনাথ পিতামাতার একমাত্র পুত্র। ইঁহাকে রাখিয়া পিতামাতার লোকান্তর হইলে, খুল্লতাত হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় ইঁহার লালনপালনভার গ্রহণ করিয়া পুত্রাধিক স্নেহে রক্ষা করিতেন। উপনয়নের পর নগেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মণজনোচিত নিত্যকর্ম্মগুলি শ্রদ্ধার সহিত সম্পন্ন করিতেন। কখনও সে সকল অনুষ্ঠানে তাঁহার দ্বিধা বা সন্দেহের উদয় হয় নাই।

পিতামাতার অবর্ত্তমানে বালক নগেন্দ্রনাথ ও একমাত্র কনিষ্ঠা সহোদরা অনুপমা হরি-নাথের আশ্রয়ে রহিলেন। হরিনাথ মহীশূর নবাব প্রতিষ্ঠিত রসা বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক ছিলেন, নগেন্দ্রনাথ রসা ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া বিদ্যার্জ্জনে মনোনিবেশ করেন। ইহার পরেই খুল্লতাত হরিনাথ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়া কৃষ্ণনগর যাত্রা করিলে, ভগ্নীসহ নগেন্দ্রনাথও কৃষ্ণনগর গমন করেন, এবং সেখানে লেখা পড়া শিখিতে থাকেন। এই স্থানেই শিক্ষার উন্নতি ও পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে নগেন্দ্রনাথের শোণিতগত স্বভাবসিদ্ধ উদারভাব আর এক মহৎ ও উদার হৃদয়ের সংস্পর্শ পাইয়া জাগিয়া উঠিল। ইনিই বঙ্গের সর্ব্বজনপূজ্য আদর্শ শিক্ষক স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী। এই প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ যখন যেখানে শিক্ষকরূপে গমন করিয়াছেন, সেখানে তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রশোভা সকল লোকের, বিশেষ

ভাবে ছাত্রমণ্ডলীর হৃদয়মন আকৃষ্ট করিয়াছে। তাঁহার নীরব প্রভাব ও আচার আচরণই সে সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য করিয়াছে। এই কৃষ্ণনগরেই গুরু শিষ্যের হৃদয় বিনিময় ও ভাবের আদান প্রদানে নগেন্দ্রনাথ নূতন পথের পথিক হইলেন। খুল্লতাত হুগলীতে বদ্‌লী হইবার সময়ে নগেন্দ্রনাথকে সেখানে লইয়া যাইবেন, কিন্তু নগেন্দ্রনাথ তাহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক কৃষ্ণনগরেই রহিলেন। হরিনাথের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। এই পুত্র-স্থানীয় ভ্রাতুষ্পুত্রেই তিনি তাঁহার ভবিষ্যৎ আশা ভরসা স্থাপন পূর্ব্বক সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। নগেন্দ্রনাথ তাঁহার সেই আশাভরসার মস্তকে বজ্রাঘাত করিয়া উপবীত ত্যাগ করিলেন, এবং প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান দিলেন। হরিনাথ পৈতৃক সম্পত্তি ও তাঁহার অর্জ্জিত অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া বহুবিধ প্রকারে নগেন্দ্র নাথকে আপনার নিকট রাখিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু নগেন্দ্রনাথ রামতনুর সঙ্গত্যাগে সম্মত হইলেন না।

নিঃসন্তান হরিনাথ নগেন্দ্রনাথ ও অনুপমাকে পুত্রকন্যারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইতি-পূর্ব্বেই নগেন্দ্রনাথের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বহু অর্থব্যয় করিয়া নগেন্দ্রনাথের উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এক্ষণে পিণ্ডদানের পাত্রাভাব বশতঃ নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। বলিয়া পাঠাইলেন, ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিতে হয় দাও, জাতিচ্যুত হইও না। উপবীত ত্যাগ করিও না। কে সে কথা শুনিবে? নগেন্দ্রনাথ নবোদ্যমসম্পন্ন যুবা-পুরুষ। পৈতৃকগুণে সবল ও স্বাধীনচিত্ত, নগেন্দ্রনাথ কি সমানভাবে মানবের প্রতি প্রেমানুভবে বিরত হইতে পারেন? তাঁহার অর্জ্জিত বিদ্যা, স্বাভাবিক তীক্ষ্ণবুদ্ধি, ও উদার হৃদয় রামতনু বাবুতে মানবজীবনের উচ্চ আদর্শ পরিস্ফুট দেখিয়া চুম্বকের ন্যায় তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইল এবং উভয়ে মণি-জড়িত কাঞ্চনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। হরিনাথ বহুচেষ্টা করিয়া যখন তাঁহাকে ফিরাইতে পারিলেন না, তখন সাহায্যদান বন্ধ করিলেন। নির্য্যাতন আরম্ভ হইল। বাঁশবাড়িয়ার বাটীর সকলেই তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, নগেন্দ্রনাথের এই পরিবর্ত্তনে বাঁশবাড়িয়ার বাটীতে মৃত্যু-ক্রন্দন ধ্বনিত হইয়াছিল। হাহাকারে ও আর্ত্তনাদে সে গৃহ কম্পিত হইয়াছিল।

এই যে কৃষ্ণনগরে অবস্থানকালে অর্থা-ভাবের সূত্রপাত হইল, এই যে অভাবের আগুন জ্বলিল, এই যে নিজের পৈতৃক সম্পত্তি হইতে দীর্ঘকাল বঞ্চিত রহিলেন, এই যে জীবন সংগ্রাম সূচিত হইল, সে দিন নিমতলার ঘাটে নগেন্দ্রনাথের শ্মশান-সমাধিতে সেই যাতনা ও ক্লেশ, কল্পনায় অননুভূত সেই দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ শান্তিলাভ করিয়াছে। তাঁহার দীর্ঘ জীবনে যে শোক তাপ, দুঃখ কষ্ট ও শতবিধ অভাবের দাবানল নিত্য প্রজ্বলিত দেখিয়াছি, এ যন্ত্রণা অনেকেরই আছে বটে, কিন্তু আর কোথাও কোন ব্যক্তিতে তাহার তুলনা হয় বলিয়া এখনও অনুভব করিতে পারি নাই।

নগেন্দ্রনাথ এই দারিদ্র্যের বোঝা মাথায় লইয়া আত্মীয় স্বজনের স্নেহমমতায় বঞ্চিত

হইয়া ও তাঁহাদের প্রদত্ত বিবিধ নির্যাতন ভোগ করিয়া, প্রসন্ন চিত্তে ও শান্ত মনে ব্রহ্মসাধনায় ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে অগ্রসর হইলেন। তাই অনেক সময়েই নগেন্দ্রনাথে বিধাতার বিচিত্র বিধান অনুভব করিয়া, তাঁহার শান্ত ও সমাহিতচিত্ত দর্শন করিয়া, তাঁহার আশ্চর্য্য কর্ম্মপটুতা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মনে হইয়াছে, বর্ত্তমান যুগের অর্থসম্পদবহুল জনগণের মধ্যস্থলে তিনিই কৃপা করিয়া এক বিরাট আদর্শ দেখাইবার জন্য নগেন্দ্রনাথকে ব্রাহ্মসমাজে আনিয়াছিলেন।

এই সকল কারণে নগেন্দ্রনাথের উচ্চ শিক্ষা লাভে বিঘ্ন ঘটিলেও এবং ছাত্র জীবনের মধ্য পথেই অর্থোপার্জ্জন ও উদরান্নের জন্য ব্যস্ত হইতে হইলেও, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহার জ্ঞানোপার্জ্জন বাসনা প্রবল ছিল। তিনি ইংরাজী সাহিত্যে উত্তম ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইউরোপীয় দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন তাঁহার বিশেষ প্রীতি উৎপাদন করিত। কৃষ্ণনগরে অবস্থান সময়েই তিনি কর্ম্মগ্রহণ করেন এবং পত্নীকে নিজের নিকটে আনয়ন করেন। তাঁহার অল্প বয়স্কা ও প্রায় অপরিচিতা পত্নীকে বাঁশবাড়িয়ার বাটীর সকলে—বিশেষভাবে পুরমহিলাগণ অনেক বুঝাইয়া নগেন্দ্র বাবুর সহযাত্রী হইতে নিষেধ করিলেও সেই বালিকাবধূ তাহাতে সায় দেন নাই। বলিয়াছিলেন, যে অবস্থাতেই থাকিনা কেন, তাঁহারই নিকট যাইব, আর তাঁহারই সঙ্গে ভাল থাকিব। এই মহিলাকে আমরা দীর্ঘকাল দেখিয়াছি। তাঁহার অটল ধর্ম্ম বিশ্বাসের, তাঁহার বিধাতার কৃপার উপর অকৃত্রিম নির্ভরের ভাব দেখিয়া অনেক সময়ে কৃতার্থ হইয়াছি। তিনি বিধাতার বীরপুত্র নগেন্দ্রনাথের উপযুক্ত ধর্ম্মপত্নীরূপে দীর্ঘ জীবন যাপন করিয়া স্বামীর লোকান্তর গমনের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এক পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া লোকান্তর গমন করিয়াছেন।

নগেন্দ্র বাবু ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরের কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক দলভুক্ত হইবার জন্য কলিকাতায় আগমন করেন। কিন্তু তত্ত্বানুসন্ধানপ্রিয় নগেন্দ্রনাথের ধর্ম্মবুদ্ধির সমগ্রভাগটা ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে কোনও দিন আবদ্ধ ছিল না। অনন্ত জ্ঞানপারাবার কোথাও কোনও মতে সীমাবদ্ধ হইতে পারে না, তাই তিনি তদানিন্তন থিওজফিক্যাল সোসাইটির সভ্য হইয়া তাঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মতত্ত্ব অন্বেষণে নিযুক্ত হইলেন। ব্রাহ্মসমাজে নানাবিধ মতভেদ নিবন্ধন তখনই প্রচারক পদ গ্রহণ করা হইল না। এই সময়ে তিনি পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী-মহাশয়ের সহিত পরিচিত ও সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। সুতরাং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের যুগে তাঁহার আর প্রচারক-পদ গ্রহণ ঘটে নাই। পরবর্ত্তী কালে থিওজফিক্যাল সোসাইটির কার্য্যকলাপে যখন তাঁহার চিত্তে সন্দেহের সঞ্চার হয় তখন তিনি ঐ সভার সংশ্রব ত্যাগ করিলে পর, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতেই প্রচারক-পদে বরিত হন।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আচার্য্য-পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। যে দিন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্ব প্রথম চারিজন প্রচারক নিযুক্ত হয়েন,

সেই দিনের অনুষ্ঠান ভার—অর্থাৎ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে আচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ও অপর দুই জনকে নিয়োগপত্র দান, উপাসনা ও সেদিনকার অনুষ্ঠানের গুরুতর দায়িত্ব বুঝাইবার ভার আচার্য্য নগেন্দ্রনাথের উপরই অর্পিত হইয়াছিল। তিনি সাধারণ সমাজের আচার্য্য-পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও কয়েক বৎসর প্রচারক-পদ গ্রহণ করিতে পারেন নাই কিংবা পান নাই। পরে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ঐ কার্য্যে ব্রতী হন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজা রামমোহন রায়ের কথঞ্চিৎ বিস্মৃতপ্রায় স্মৃতি ব্রাহ্মগণের হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। এই জাগরণের মূলে নগেন্দ্রনাথ প্রবল-শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। আজ যে বাঙ্গালা সাহিত্যের সর্ব্ববিধ আলোচনাক্ষেত্রে রাজার নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, বাঙ্গালী জাতি—বিশেষ ভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যসেবীদল নগেন্দ্রনাথের নিকট সে জন্য চিরঋণে আবদ্ধ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ চিরদিনই সর্ব্ববিধ সদনুষ্ঠানের সহায় ও পৃষ্ঠপোষক, নগেন্দ্রনাথপ্রমুখ ব্রাহ্মগণ যখন মহর্ষি সদনে উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে রামমোহন রায় স্মৃতিরক্ষা অনুষ্ঠান একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন, মহর্ষি তৎক্ষণাৎ সেই অনুষ্ঠানের জন্য নিজ ভবনের সদর বাটীর বিস্তৃত প্রাঙ্গণ উপযুক্ত স্থান বলিয়া নিদর্শন করিলেন এবং অনুষ্ঠানের ব্যয়ভার গ্রহণ করিলেন। তদনুসারে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের উৎসবের সময় মহর্ষি ভবনে তিন সমাজ মিলিত হইয়া রামমোহন রায় স্মৃতিসভার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। সভায় ব্রাহ্মগণ জানিতে পারিলেন যে নগেন্দ্রবাবু এক দীর্ঘ উপেক্ষিত বৃহদনুষ্ঠানে লিপ্ত হইয়াছেন। সেই সভায় নগেন্দ্রবাবু তাঁহার রচিত রাজার জীবনচরিতের ফাইল হইতে নানাস্থান পাঠ করিয়া শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ানন্দ বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। তাঁহারই গভীর অনুরাগ ও অক্লান্ত শ্রমের ফলে রাজার সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন জীবনচরিত মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। অন্য কোনও কারণ বর্ত্তমান না থাকিলেও এই এক সুবৃহৎ সদনুষ্ঠানের জন্য তাঁহার নাম বাঙ্গলা সাহিত্যে অক্ষয় মর্য্যাদা অর্জ্জন করিয়াছে। কিন্তু সুবৃহৎ হইলেও, ইহাই তাঁহার একমাত্র কার্য্য নহে। তিনি দীর্ঘজীবন তপস্যানিরত হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিচর্য্যা করিয়া নিজ লেখনী ধন্য করিয়া গিয়াছেন। তিনি বঙ্গদর্শনের লেখকরূপে বঙ্কিমচন্দ্রের সহযাত্রী। তাঁহার বিশুদ্ধ বাঙ্গালারচনা বঙ্কিমচন্দ্রের এতই আনন্দ উৎপাদন করিত যে প্রয়োজন হইলেই তিনি নবীন লেখকগণকে নগেন্দ্রবাবুর বাঙ্গলা রচনা পাঠ করিতে বলিতেন। তাঁহার রচিত থিওডোর পার্কারের জীবনচরিত এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ।

তিনি পাশ্চাত্য দর্শনে পাণ্ডিত্য অর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালাভাষায় ব্রহ্মতত্ত্ববিষয়ক বক্তৃতাদান ও প্রবন্ধ রচনা করিয়া মাতৃভাষার আলোচনাশক্তি বৃদ্ধি করিয়াছেন। সেই সকল প্রবন্ধ অবলম্বনে "ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" নামে দুই ভাগ গ্রন্থ তাঁহার অসামান্য কৃতিত্বের সাক্ষ্য দান করিতেছে।

বাঙ্গালাভাষার যে প্রাণ আছে, এই ভাষায় বক্তৃতা করিয়া লোককে মাতাইয়া তোলা

যায়, ইহার পথপ্রদর্শকও তিনি। জানি না আজ সকলের স্মরণ আছে কি না,—যে সময়ে সুরেন্দ্রনাথের কারাবাস আদেশ হয়, যে সময়ে জাতীয় ধনভাণ্ডার স্থাপনের প্রস্তাব হয়, সে সময়ের সভায় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়মহাশয় জাতীয় কর্ত্তব্য-সাধনে বাঙ্গালীজাতিকে আহ্বান করিয়া যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, সে ভাষার শক্তিসম্পদ আজও আমাদের প্রীতি বৃদ্ধি করিয়া থাকে, সেই এক বক্তৃতার ফলে সেদিন অনেক অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল। সে আজ ত্রয়োবিংশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। যেদিন কৃষ্ণদাস পাল মহাশয় লোকান্তর গমন করেন, সেইদিন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের "জাতিভেদ" শীর্ষক এক বক্তৃতা শুনিতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দির লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল, এবং শাস্ত্রী মহাশয়ও সেদিন যে আগ্নেয়পর্ব্বতের অগ্ন্যুদ্গীরণ করিয়াছিলেন, যে দাবানলে, জাতিভেদরূপ রাক্ষসীকে নিপাত করিতে বদ্ধপরিকর দেখিয়াছিলাম, সে দৃশ্য যে না দেখিয়াছে, যে সে বক্তৃতা না শুনিয়াছে, শত বর্ণনাতে তাহা আমি তাহাকে বুঝাইতে পারিব না। সেইদিন সেই সভাক্ষেত্রে বক্তৃতার পর নগেন্দ্রনাথ হাসিতে হাসিতে অতি উচ্চ উদারতার পরিচয় দিয়া বলিয়াছিলেন "আজ আমি আমার ফার্ষ্ট প্লেস্ হারাইলাম, এতদিন আমিই প্রথম ছিলাম, আজ সেকেণ্ড প্লেস্ হইল, আজ তুমি আমাকে হারাইয়াছ আজ তুমিই ফার্ষ্ট।" কেমন ঈর্ষাহীন সরলস্বভাব! যিনি তাঁহাকে ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করিয়াছেন, তিনিই জানেন যে তিনি গুণগ্রহণে আত্মপর, স্বজাতি ও বিদেশী, এ ধর্ম্ম ও সে ধর্ম্ম বিচার করিতেন না। গুণের সমাদর সর্ব্বদা সর্ব্বত্র তাঁহার মহাচ্চরিত্রের শোভাবর্দ্ধন করিত।

তাঁহার স্বভাবসৌন্দর্য্যে তিনি সর্ব্বত্র অজাতশত্রু ছিলেন। দুইদিন তাঁহার সঙ্গে কেহ বাস করিলে তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিতেন না। তিনি মানুষের দোষ-ভাগ ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা গুণগ্রহণে আগ্রহ প্রদর্শন করিতেন। কোথাও কাহারও সম্বন্ধে আলোচনায় নিন্দার গন্ধ পাইলেই তাহার গুণের উল্লেখ করিয়া নিন্দাকারীকে লজ্জা দিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। তাঁহার কথাবার্ত্তায় মধু ক্ষরিত, তিনি সুরসিক লোক ছিলেন। তাঁহার মজলিস জমাইয়া তুলিবারও অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। যে নিমন্ত্রণক্ষেত্রে নগেন্দ্রবাবু ও শাস্ত্রীমহাশয়ের মিলন হইত, সেখানে কর্ম্মকর্ত্তার সর্ব্বনাশ সুনিশ্চিত। নগেন্দ্রবাবুর গল্পের ফোয়ারা ছুটিলে সমবেত জনমণ্ডলীর আনন্দের সীমা থাকিত না। সে অট্টহাসির প্রবল তরঙ্গে চারিদিক নিনাদিত হইত, সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মকর্ত্তার হৃদয়ও কাঁপিয়া উঠিত, পাছে তাঁহার আয়োজনে অকুলান হইয়া পড়ে। দুঃখ এই যে, আর সে আনন্দপ্রবাহে ভাসিবার সুযোগ পাইব না।

প্রায় ত্রিশ বৎসর হইতে চলিল, পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি ও শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের প্রাচীন পদ্ধতির পক্ষ সমর্থন জন্য বঙ্গের নানা স্থানে, বিশেষ ভাবে কলিকাতায় আন্দোলন আরম্ভ করিয়া বঙ্গবাসীজনগণের মার্জ্জিত জ্ঞানের খর্ব্বতা সাধনে প্রাণপণ

প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সে সময়ে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উচ্চ উদার যুক্তি-মার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহাদের প্রচারিত পন্থার ভ্রমপ্রমাদ প্রদর্শনে কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছিলেন। সহস্র সহস্র শ্রোতার সমক্ষে প্রতিপক্ষের পরাজয় প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার সে সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনার প্রবল চাপে, শশধর প্রমুখ দলের চেষ্টা যে বিফল হইয়াছিল, তাহা সর্ব্বজন বিদিত। এমন একটি সরল হৃদয় সুহৃদ আমরা আমাদের বহুপুণ্য ফলে লাভ করিয়াছিলাম। আজ লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে সুযুক্তি সহকারে বিষয়বিশেষের আলোচনার প্রয়োজন হইলেই তাঁহার অভাব আমাদের হৃদয়ের বেদনাভার বৃদ্ধি করিবে।

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কৃষ্ণনগর অবস্থান কাল হইতে প্রেততত্ত্বে আস্থাবান্ ছিলেন। পরলোকবাসী আত্মার অস্তিত্বে আবছায়ার ন্যায় বিশ্বাস অল্পাধিক সকল মানুষেরই আছে, কিন্তু পরলোক, পরলোকের ব্যাপার ও আত্মার অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাস অতি অল্পলোকেরই দেখিতে পাওয়া যায়। পরলোকতত্ত্বে নগেন্দ্রনাথের বিশ্বাস দৃঢ় থাকায় তিনি জীবনের প্রথম অবস্থা হইতেই ঐ বিষয়ের চর্চ্চা করিতেন। তিনি নব্যভারত পত্রিকায় প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন, সাধনার দ্বারা মানুষের দিব্যদৃষ্টি ও দিব্য শ্রুতির ন্যায় একটা উচ্চ শক্তি লাভ হইয়া থাকে। পরলোকবাসী আত্মারা এরূপ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন। তিনি শেষ জীবনে মধ্যবর্ত্তী হইয়া ঐরূপ আত্মাদের উক্তি সকল লিপিবদ্ধ করিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ের ঠিক তাৎপর্য্য আমরা বুঝি না, তাই এ সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ নিরাপদ নহে। সত্যের সেবক নগেন্দ্রনাথ যাহা সত্য বলিয়া অনুভব করিয়াছেন, তাহাই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তবে,—মুক্ত আত্মা পুনরায় এই লোকে মনুষ্যাত্মার সংস্পর্শে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিলেও, সাধু নগেন্দ্রনাথের পবিত্র আত্মা যে পবিত্রতম স্বর্গধামে স্থান লাভ করিয়াছে তাহাতে আমাদের সন্দেহ মাত্র নাই।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সমালোচনা

তপতী। (নাট্যকাব্য) শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল প্রণীত। নব্যভারত প্রেসে মুদ্রিত। এই নাটকখানি পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। ইহার ভাব উচ্চ, ভাষাও ভাবের অনুসরণ করিয়াছে। গিরিশচন্দ্র-প্রবর্ত্তিত ছন্দে নাটকখানি রচিত। ছন্দে বেশ তেজ আছে—তাহা শান্ত ও গম্ভীর। নাটকখানি হস্তিনা-নৃপতি সম্বরণের সহিত সূর্য্য-কন্যা তপতীর বিবাহ অবলম্বনে রচিত। রূপক ব্যাখ্যাতেও গ্রন্থকার কোথাও লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই। প্রাচীন ভারতের গৌরব-চিত্রটুকুও সঙ্গে সঙ্গে দিব্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। লেখকের কবিত্ব-শক্তির পরিচয়ও বহুস্থলে প্রকটিত হইয়াছে।

কারবালা। শ্রীআবদুল বারি প্রণীত। নোয়াখালি, মাইজ্‌দী হইতে গ্রন্থকার-কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মেটকাফ্‌ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা, কাপড়ে বাঁধা পাঁচ সিকা। এখানি কাব্য। মহরমের করুণ কাহিনী অবলম্বনে রচিত। ইহার পরিকল্পনাটুকু ঐতিহাসিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং লেখককে একটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকিতে হইয়াছে। কাব্যখানি পড়িয়া মোটের উপর আমরা সন্তোষ লাভ করিয়াছি। লেখকের ভাষা ভাল, ছন্দও স্নিগ্ধ-গম্ভীর। কাব্যের মধ্যে মধ্যে মুসলমান-সমাজ-প্রচলিত কথা থাকাতে রসের কিঞ্চিৎ হানি হইয়াছে। পঞ্চম সর্গে যখন এনাম শিবিরে মন্ত্রণা-মজলিস জমিয়া উঠিয়াছে; একজন বলিলেন, "হবে যে লায়েক না ভাবিয়া অন্য, মানিবে সকলে তাঁহাকে সর্দ্দার।" এখানে এই 'লায়েক' কথাটি ভাবের প্রবাহে একটু বাধা দিয়াছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। যে উচ্চ বিষয় লইয়া লেখা হইতেছে, তাহাতে ভাব-সম্পদও সেইরূপ উজ্জ্বল হওয়া প্রয়োজন। বৃত্রসংহার ও মেঘনাদ বধ বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য। সে কাব্যের কবি কোথাও একটা গ্রাম্য বা চলিত কথার ব্যবহার করেন নাই। বিষয়োপযোগী ভাষা ও ভাব ব্যবহার না করিলে কোন রচনাই পরিপূর্ণতা লাভ করে না, সুন্দর হয় না। এই কথাগুলি মনে রাখিয়া ও ভাবিয়া দেখিয়া দ্বিতীয় সংস্করণে ত্রুটিগুলি সারিয়া লইলে 'কারবালা' বঙ্গসাহিত্যে স্বকীয় বিশেষত্বে উচ্চ স্থান অধিকার করিবে, আমাদিগের এমন আশা বিলক্ষণই আছে।

ঢাকার ইতিহাস। প্রথম খণ্ড। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় প্রণীত। কলিকাতা, শ্রীযামিনীমোহন রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কমলা প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য ৩৷৽ মাত্র। সাল তারিখ বা যুদ্ধ-বিগ্রহের কাহিনীই ইতিহাস নহে। এ সকল ইতিহাসের বাহ্য বস্তু, কঙ্কাল। কিন্তু তাই বলিয়া যে এ সকলের কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই, এমন নহে। ঐতিহাসিক সাল-তারিখের মূল্য আছে, প্রয়োজনও আছে, কিন্তু তাহাই ইতিহাস নহে। রাষ্ট্রীয় ইতিহাস দেশের ইতিহাস নহে, ইতিহাসের কঙ্কাল (Constitutional history) ইতিহাসের আভ্যন্তরিক প্রাণটুকুর পরিচয় লইতে হইলে আমাদিগকে ছুটিতে হইবে, দেশের লোকের হৃদয় যেখানে, সেইখানে তাহাদের উৎসব-আনন্দ-শোক-অভাব অনুযোগের মধ্য দিয়া কি করিয়া জাতীয় জীবন গঠিত হইয়া উঠিল, তাহার সন্ধানে। বাঙ্গলার নদ-নদী খাল-বিল মেলা মঠ-মসজিদের ধ্বংসাবশেষের মধ্যেই বাঙ্গলার ইতিহাস নিহিত—নানা প্রদেশ হইতে বিক্ষিপ্ত বিচিত্র বিবরণীসমূহ সংগৃহীত হইলে তবেই সমগ্র বাঙ্গালার ইতিহাস উদ্ধার পাইবে। সৌভাগ্য-ক্রমে এ কথা আমরা বুঝিয়াছি এবং এদিকে আমাদিগের দৃষ্টিও খুলিয়াছে। এবং বহু লেখক বিপুল শ্রম ও অধ্যবসায় লইয়া বাঙ্গলার ধ্বংস-স্তূপের ধূলি-জঞ্জাল হইতে দেশের ইতিহাস সংগ্রহে মন দিয়াছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থের লেখক যতীন্দ্রবাবু অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে ঢাকার অন্তরের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছেন। ঢাকার প্রাচীন খাল বিল, ঢাকার সূক্ষ্ম চারু শিল্প, কৃষি, ভেষজ, ঢাকার তীর্থ দেবালয়, ঢাকার প্রাচীন কাহিনীর সারোদ্ধার করিয়া তিনি প্রথম খণ্ড ঢাকার ইতিহাস প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থখানির প্রতি পৃষ্ঠা যেমন বিপুল তথ্যে পরিপূর্ণ, বিষয় সন্নিবেশেও তেমনি সুশৃঙ্খল পর্য্যায় দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি! উপন্যাস বা নাটকও বোধ করি এতটা ধৈর্য্য-সহকারে পড়া যায় না,—বইখানি এমন সরস। ভাষা ও রচনার ভঙ্গী সরল। এ গ্রন্থ বঙ্গের গৃহে গৃহে বিরাজ করুক। দ্বিতীয় খণ্ড দেখিবার জন্য আমরা আশা-পথ চাহিয়া রহিলাম।

উজানি। শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি, এ প্রণীত। ইণ্ডিয়া প্রেসে মুদ্রিত। চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জী কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য লিখিত দেখিলাম না। এখানি কবিতা-গ্রন্থ। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "অনেক গুলিই সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। ইহা আমাদের ক্ষুদ্র গ্রামের ক্ষুদ্র ইতিহাস। সামান্য জীবনের সামান্য চিত্র।" গ্রন্থে ৩২টি খণ্ড কবিতা আছে। কবিতাগুলি সরল ও সহজ, ছন্দ মধুর, ভাষা মর্ম্মস্পর্শিনী ভাবও স্বচ্ছ, লঘু। লেখকের আন্তরিকতার গুণে কবিতাগুলি পল্লী-হৃদয়ের সুখ-দুঃখের ক্ষুদ্র কাহিনীর মধ্য দিয়া বেশ দীপ্ত অনাড়ম্বর মাধুর্য্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সকল কবিতা সুস্নিগ্ধ,

উপভোগ্য সেগুলি এতটুকু চমক লাগায় না, একেবারে প্রাণের কোমল তারে ঘা দেয়। বহিখানির ছাপা কাগজও রমণীয় হইয়াছে।

ডালি। শ্রীমতী শরৎশশী মিত্র প্রণীত। শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বি প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। কাপড়ে বাঁধাই ১।০। ডালি কবিতা পুস্তক। কবিতাগুলি বালিকার রচনা। ছন্দে যে একটি আধ-আধ সুর আছে, সেটুকু মিষ্ট। বালিকার হৃদয়ের আন্তরিক সরল উচ্ছ্বাসে 'ডালির' বহু পৃষ্ঠা জ্বল জ্বল করিতেছে।

খুকুরাণীর ডায়েরি। শ্রীমতী বিনোদিনী দেবী প্রণীত। কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য বারো আনা। লেখিকা মুখবন্ধে বলিয়াছেন, "ইহা একখানি শিশু জীবনী মাত্র। কৃত্রিম বা অতিরঞ্জিত কথা ইহাতে নাই।" লেখিকার ভাষা সরল, তবে রচনায় কোন লিপি-চাতুর্য্য নাই।

পরিণাম। শ্রীমতী সরলাবালা দেবী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীপ্রফুল্লনাথ মজুমদার। চেরি প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এখানি নাটক,—পড়িয়া তৃপ্তি হইল না।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে

'ওগো আষাঢ়ের প্রথম দিবস, মুক্তির মায়াপুরী—
সঙ্গোপন আজ রহিল না কিছু, নিখিল ভুবন জুড়ি'—
জলধির মনে লুকায়ে যে ছিল বাষ্প রহস্য ময়,
ভরি ওঠে মেঘে, উরস চিরিয়া ঢালে বারি বিন্দু চয়!
ধরণীর বুকে নীরবে লুকান কোন বীজ কবেকার,
অঙ্কুরে জাগে, রোমাঞ্চে কহে মর্ম্ম বারতা তার!
কালো নীরদের আনত নয়ানে কে জানিত ছিল ঢাকা!
বিদ্যুৎ শাণিত দীপ্ত কটাক্ষ অসির মতন বাঁকা!
সহসা হানিয়া হাসিয়া কাটিল অজানার সব জাল,
ব্যক্ত নভের মুক্ত কবাটে অবারিত মহাকাল!
গুহা কন্দরে, ফাটলের ফাঁকে, কাননে তরুর মূলে
লতায় পাতায় গাঁথা ছিল গান সেকথা আছিনু ভুলে!
শুধু ঝর ঝর বরষা বীণার শুনি মল্লার তান
কাকলি জাগিল কল সঙ্গীতে, ভুবনে ভরিল গান!
পরাণ উতলা আজিকে ভাঙিতে কায়ার এ কারাগার,
আকাশে বাতাসে ছায়ায় মিলাতে মুক্ত মানস তার!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

সনেট পঞ্চাশৎ*

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ফরাসী দেশে বসিয়া, বাংলা ভাষায় প্রথম সনেট রচনা করেন। যে শক্তিমান পুরুষ বাংলা পয়ারের পায়ের বেড়ী ভাঙিয়া অমিত্রাক্ষরের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন তিনিই আবার আষ্টে-পৃষ্ঠে মিল-বিশিষ্ট সনেট চালাইলেন। যিনি পুরাণো আইন ভাঙিয়া বিদ্রোহের নিশান উড়াইয়াছিলেন, 'গদি' পাইয়া, মস্নদে বসিয়া, তিনি স্বয়ং যে আইন প্রণয়ন করিলেন তাহাতে কড়াকড়ির বেজায় বাড়াবাড়ি। মাইকেলের পর, বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে যাঁহারা বাংলা ভাষায় সনেট লিখিয়াছেন তাঁহারা প্রায় সকলেই সনেটের মূল চেহারা বিগড়াইয়া ফেলিয়াছেন। কেবল শ্রীমতী কামিনী রায়ের কয়েকটি সনেট গঠন হিসাবে নিখুঁৎ। সম্প্রতি সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার, নানা ভাষায় সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় "সনেটের কঠিন বন্ধন" বজায় রাখিয়া "সনেট পঞ্চাশৎ" নামে একখানি বহি বাহির করিয়াছেন। পুস্তকখানির পরিচয় দিবার পূর্ব্বে, সনেটের ঠিক পরিচয় দেওয়া আবশ্যক মনে করি। কারণ সাধারণতঃ যাহা সনেট নামে চলে তাহা সনেটের বিকৃতি। এই অবসরে সনেটের যথার্থ আকৃতিটার সহিত পরিচিত হওয়া মন্দ নয়।

সনেটের আকৃতি

'সনেট' মানে শব্দ-শিল্পাত্মক সঙ্গীত। সনেটে মোট চৌদ্দটা পংক্তি, তাহা মধু-প্রদত্ত 'চতুর্দ্দশ পদী' নামেই প্রকাশ। ইহার মধ্যে আবার দুইটা ভাগ আছে। প্রথম আটটা পংক্তিকে বলে Octave; ইহাকে আমরা বাংলায় বলিব অষ্টপংক্তিক বা অষ্টদল পদ্ম। শেষ ছয়টা পংক্তির নাম sestet; বাংলায় ষট্পদক। অষ্টদলের প্রথম পংক্তির সঙ্গে চতুর্থ, পঞ্চম ও অষ্টম পংক্তির মিল থাকা নিয়ম; এবং দ্বিতীয় পংক্তির সঙ্গে তৃতীয়, ষষ্ঠ ও সপ্তম পংক্তির মিল থাকাই রীতি।

ষট্পদকের ছয়টা পংক্তির বিন্যাস সম্বন্ধে নানামুনির নানা মত। সনেটের আদিজন্মভূমি ইতালিতেই এই অংশের তিন চার রকম মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন—

(১) প্রথম ও চতুর্থ পংক্তিতে মিল, দ্বিতীয় ও পঞ্চমে মিল এবং তৃতীয় ও ষষ্ঠে মিল। (২) প্রথমে পঞ্চমে, দ্বিতীয়ে চতুর্থে এবং তৃতীয়ে ষষ্ঠে মিল। (৩) প্রথমে তৃতীয়ে পঞ্চমে মিল এবং দ্বিতীয়ে চতুর্থে ষষ্ঠে মিল। (৪) প্রথমে তৃতীয়ে চতুর্থে ষষ্ঠে মিল এবং দ্বিতীয়ে ও পঞ্চমে মিল। ষট্পদকের এই চারিটি মূর্ত্তিই স্বয়ং পেত্রার্কার মূল রচনার মধ্যে দেখিয়াছি।

এইখানে 'সোনেত্তো' বা সনেটের প্রথম প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। এ দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের বিশ্বাস পেত্রার্কা সনেটের জন্মদাতা। কিন্তু পেত্রার্কার জন্মের অন্ততঃ অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে যে সনেটের জন্ম সে বিষয়ে কিছুমাত্র

* শ্রীপ্রমথ চৌধুরী প্রণীত এবং শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য আট আনা সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

সন্দেহ নাই। দান্তে (খৃঃ ১২৬৫-১৩২১) দারেৎসো (১২৩০—৯৪), রুস্তিকো দি ফিলিপ্পো (১২৩৫—৯৭) এবং গুইদো কাভাল্‌কান্তির (১২৫৫—১৩০১) রচনাবলীর মধ্যে অনেকগুলি করিয়া সনেট আছে। এক দান্তে ভিন্ন এই তিনজনই পেত্রার্কার জন্মের (১৩০৪ খৃষ্টাব্দের) পূর্ব্বে মানবলীলা সংবরণ করেন। সুতরাং পেত্রার্কার দাবী টিঁকিতেছে না। তবে কবিত্ব হিসাবে যে পূর্ব্বজ কবিগণের সনেট অপেক্ষা পেত্রার্কার সনেট উচ্চ সে বিষয়ে কোনো ভুল নাই। তদ্ভিন্ন, পেত্রার্কা ও তাঁহার আরাধনার সামগ্রী সুন্দরী লরার দিব্য-প্রণয়ের অবদান—যাহা তাঁহার সনেটের প্রাণ—সেই অপূর্ব্ব রোম্যাণ্টিক্ কাহিনী কবিকে এবং তাহার সঙ্গে তৎকালে-অখ্যাত সনেট-রচনা পদ্ধতিকে য়ুরোপের সাহিত্য-জগতে প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছিল। সেইজন্যই সাধারণের বিশ্বাস, পেত্রার্কা সনেটের স্থষ্টিকর্ত্তা। অদৃষ্টবাদী হইলে বলিতাম লোকটার যশোভাগ্য খুব। কলম্বস্ যে মহাদেশের আবিষ্কার করিলেন তাহার নাম হইল পরবর্ত্তী পর্য্যটক আমেরিগো ভেস্‌পুচ্চির নামের অনুসারে—আমেরিকা!

পেত্রার্কার পরবর্ত্তী ইতালীয় কবিদিগের মধ্যে বোয়ার্দ্দো, বোক্কাচ্চিয়ো, লোরেঞ্জো দে মেদিচি, আরিয়োস্তো, তাস্‌সো, ফিলিকায়া এবং মেতাস্তাসিয়ো যে সমস্ত সনেট রচনা করেন তাহা ছন্দ-হিসাবে পেত্রার্কার সনেটের অনুরূপ। আল্‌ফিয়েরির সনেট একটু স্বতন্ত্র। আমাদের মাইকেল মধুসূদনের কতকগুলি সনেট আল্‌ফিয়েরির ছন্দের দৃষ্টান্তে রচিত বলিয়া বোধ হয়। গত দেড়শত বৎসরের মধ্যে নিজ্ ইতালীতেই উগো ফোস্কোলো, কার্দ্দুচ্চি প্রভৃতি কয়েকজন আধুনিক কবি আল্‌ফিয়েরির পন্থা অনুসরণ করিয়াছেন।

ইংলণ্ডে সনেটের প্রবর্ত্তক স্যার টমাস্ উইয়্যাট্। তাহার পর হইতে সারে, স্পেন্‌সার, সেক্সপীয়ার, মিল্টন, কাউপার, ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ, বায়রন, শেলি, কীট্‌স্, ব্যারেট্ ব্রাউনিং, ম্যাথু আর্ণল্‌ড প্রভৃতি অনেকেই সনেট লিখিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে মিল্টনের এবং কীট্‌সের অধিকাংশ সনেট ছন্দ হিসাবে খাঁটি, অর্থাৎ ইতালীয় আদর্শের অনুরূপ। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কতকগুলি নিখুঁৎ, কতকগুলি অদ্ভুত। সেক্সপীয়রের সনেট কবিতা হিসাবে চমৎকার হইলেও ছন্দের হিসাবে ইতালীয়ের ধার দিয়াও যায় না।

স্পেনের সুপ্রসিদ্ধ কবি ও নাট্যকার লোপে দে-ভেগা সনেটের উপর একটা কৌতুকজনক সনেট লিখিয়াছিলেন। ইহার রচনাপদ্ধতি ইতালীয় আদর্শের অনুরূপ। আদিম সনেটের প্রকৃত মূর্ত্তি দেখাইবার জন্য ছন্দ বজায় রাখিয়া নিম্নে উহার অনুবাদ দেওয়া গেল ;—

"সনেটের উপর সনেট"

সনেট লিখিতে প্রিয়া হাস্যমুখে ফর্ম্মাইল মোরে ;
সনেট লেখার মতো জ্বালা কিন্তু ত্রিভুবনে নাই।
সনেটে চৌদ্দটা মাত্র চোখা চোখা পংক্তি থাকা চাই ;—
এরি মধ্যে দেখি তার তিনটা ফেলেছি ব্যয় করে।

ভেবেছিনু মিল্ দিতে আজি মোর যাবে মাথা ধ'রে,
এবে দেখি—আরে একি! পৌঁছেছি দ্বিতীয় শ্লোকে, ভাই
'ষট্-পদের' আদ্যপদে একবার যদ্যপি পৌঁছাই,—
এ 'অষ্ট-পংক্তির' চিন্তা—স্পষ্ট দেখি—যাবে দূরে স'রে।

সদ্য পৌঁছিলাম, দেখ, ষট্ পদের আদ্য ত্রিপংক্তিতে ;
আহ্লাদী লেখনী মোর বেগে ধায় মুখে মাখি' মসী ;
প্রথম ত্রিপংক্তি শেষ। তা-তা-ধিন্। ধিন্-তা। তা ধিনা।

অন্ত্য-ত্রিপংক্তিতে এনু—ডগমগ হরষিত চিতে,
নাচিতে নাচিতে নেমে—এই এল পংক্তি ত্রয়োদশী ;
এই তো কাবার! ধর! গুণে দেখ—চৌদ্দ হল কি না।

পেত্রার্কার অধিকাংশ সনেটের আকার ঠিক এইরূপ।

ইংলণ্ডের মতো ফরাসীদেশেও বহুদিন হইতে ইতালীয় সনেট-পদ্ধতি অনুকৃত হইয়া আসিতেছে। বোধ হয় রঁসার্দের সময় হইতে ফরাসীভাষায় সনেটের চাষ সুরু হইয়াছে। সেখানে সনেটের পূর্ব্বার্দ্ধ অর্থাৎ প্রথম আট পংক্তির বিন্যাস অবিকল ঠিক ইতালীয় সনেটের মত। কিন্তু শেষ ছয় পংক্তির বিন্যাস ঈষৎ বিকৃত হইয়াছে। ফরাসী কবিরা সনেটের নবম ও দশম লাইনে মিল দিয়া সেটিকে আলাদা করিয়াছেন এবং ভাববিকাশের সুবিধার অনুসারে ওই দুইটা লাইন কখনো বা পূর্ব্বার্দ্ধের সঙ্গে জুড়িয়া দেন, কখনো বা উত্তরার্দ্ধের স্কন্ধে চাপান। কখনো সাতনরের ধুক্‌ধুকি, কখনো চন্দ্রহারের থামি। ফরাসী আলঙ্কারিকদের মতে এইরূপ করাই সমীচীন। ইহাতে, পড়িতেও বোধ হয় মধুরতর শোনায়। জর্ম্মানীর হায়েন্, ইংলণ্ডের সুইন্‌বার্ন্ এবং আলোচ্য "সনেট পঞ্চাশতের" কবি শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় এই ফরাসী পদ্ধতির অনুসারেই সনেট রচনা করিয়াছেন।

মাইকেলের "চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী" প্রকাশিত হওয়া অবধি, বাংলাদেশের অনেক কবিই সনেট লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের "চৈতালি" "নৈবেদ্য" ও অন্যান্য নানা গ্রন্থে প্রকাশিত সনেটগুলিই যে শ্রেষ্ঠ তাহা বলা বাহুল্য। তবে সেগুলি ছন্দহিসাবে ইতালীয় সনেটের মত নয়। "কড়ি ও কোমলের" কতকগুলি সনেট সেক্সপীয়রের সনেটের মত; আবার কতক-গুলি অনেকটা স্পেন্‌সারের মত। "নৈবেদ্যের" এবং "চৈতালির" সনেট গুলি ভাবগত ঐক্যে ও কেন্দ্রানুগতায় শ্রেষ্ঠতম সনেটের সমকক্ষ হইলেও "Vers Libre" বা মুক্তছন্দে রচিত চতুর্দ্দশ পংক্তির সমষ্টি। সনেটের আকৃতিগত বিশিষ্টতা উহার মধ্যে নাই; সনেটের প্রকৃতিগত বিশিষ্টতা অবশ্য যথেষ্ট আছে।

সনেটের প্রকৃতি

প্রাচ্যদেশীয় কোনো কবিতা-রচনা-পদ্ধতির সঙ্গে সনেটের আকৃতিগত মিল নাই। সনেট সামগ্রীটা জোর করিয়া সংস্কৃত অলঙ্কারের শাসনে আনিতে হইলে, অবশ্য, উহাকে গীতি কাব্যের কোঠায় ফেলা যাইতে পারে এবং কোষ কাব্যের অন্তর্গত "অকারাদি হকারান্তাদ্যক্ষর" সূত্রানুযায়ী (অর্থাৎ বর্ণমালানুসারে সাজাইয়া) সনেট সমষ্টিকে গ্রন্থবদ্ধ করিয়া "ব্রজ্যা" নামে অভিহিত করিলেও হয়। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। Strophe এবং Ante-strophe বিশিষ্ট Greek Ode এর সঙ্গে চিতেন্ পর-চিতেন্-ওয়ালা কবির গানের সুদূর সাদৃশ্য থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু Sonnet এর সঙ্গে সংস্কৃত 'যুগ্মক' প্রভৃতির কোনোখানে কোনো মিলই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। "জাপানী সনেট" তান্‌কার সঙ্গেও প্রকৃত ইতালীয় সনেটের কোনো মিল নাই; মালয় উপদ্বীপের "পান্তুমের" সঙ্গেও না।

যদি কাহারও সঙ্গে কিছু সাদৃশ্য থাকে, তবে সে ইরাণের 'তর্জ্জী বন্দ্' 'মুসাম্মাৎ' এবং বিশেষ করিয়া 'মুরব্বা'র সঙ্গে আছে। মুরব্বা চারি শ্লোকের কবিতা, উহার প্রথম শ্লোকের প্রথম ও শেষ চরণে মিল থাকে এবং দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোকের শেষ চরণ প্রথম শ্লোকের শেষ চরণের সঙ্গে মেলে।

আকৃতিগত সাদৃশ্য তো নাইই, প্রাচ্যদেশীয় কোনো রচনা-রীতির সঙ্গে সনেটের প্রকৃতিগত সাদৃশ্যও নাই। সাদৃশ্য আছে জ্যামিতির প্রতিজ্ঞার সঙ্গে। তামাসা নহে, প্রকৃতই তাই। ইহার পূর্ব্বাংশের অর্থাৎ অষ্টদলের প্রথম চারি চরণে ভাব-বস্তু নিবেদিত হয়; বাকী চারি চরণে উদাহৃত হয়। শেষাংশের অর্থাৎ ষট্‌পদকের প্রথম ত্রিপংক্তিতে (tercet) ভাব-বস্তু সংলগ্নীকৃত হয় এবং বাকী ত্রিপংক্তিতে উপসংহৃত হয়। জ্যামিতির আর বাকী কি? ইহাতে কবিতার একদিকে যেমন কোমলতার হানি হয়, অন্যদিকে উহা তেম্নি মর্ম্মর-প্রতিমার মত স্থির সৌন্দর্য্য লাভ করে। সনেটে বাক্যকে পল্লবিত করিবার উপায় নাই; বাচালতার অবসর নাই। যাহাদের ভাষা ভারে কাটে, ধারে কাটে না, তাহারা কখনো ভালো সনেট লিখিতে পারে না। যাহারা ফেনাইতে ভালবাসে, রস-সংযমে (reticence) অক্ষম, তাহারা সনেট লিখিলে তাহা কাঁচা থাকিয়া যায়। যাহাদের ওজনজ্ঞান প্রবল তাহারাই এই পাকা ছাঁচে ছাঁচ তুলিতে পারে। যে প্রকৃত গুণী সে বাঁশীর সাতটা ছিদ্র দিয়া হৃদয়ের হাজার-দরজা খুলিয়া দিতে পারে; যে বাস্তবিক নিপুণ শিল্পী সে সনেটের এই কঠিন বন্ধনের ভিতরেই মুক্তির আনন্দ লাভ করিয়া ধন্য হয়। সনেট সঙ্গীত-বিজ্ঞানের প্রকৃষ্ট নিয়মানুসারে পরিকল্পিত, সংগঠিত ও পরিবর্দ্ধিত। উহা ক্ষুদ্র আয়তনে বৃহতের আভাস।

স্বর্গবন্ধ মহাকাব্যের এবং পঞ্চ-লক্ষণসংযুক্ত দৃশ্যকাব্যের যেমন নিজস্ব নিয়ম আছে, সনেটেরও তেমনি বীজ হইতে বিকাশের স্বতন্ত্র নিজস্ব নিয়ম বর্ত্তমান। সনেট মাত্রেরই বিশেষ একটি ভাব, কিংবা বিশেষ কোনো হৃদয়াবেগ অথবা কবিজনের মনঃপূত বিশেষ কোনো প্রাকৃতিক ব্যাপার বা লৌকিক কোনো ঘটনা অবলম্বন করিয়া অভিব্যক্ত হওয়া বিধি।

প্রথমেই অষ্টদল (octave) পদ্মের চারিটী দল খুলিয়া যাইবে ও ভাব-বস্তু উন্মেষিত হইবে; তারপর আর চারিটী পাপড়ি প্রস্ফুরিত হইয়া উহাকে সৌষ্ঠব-সম্পন্ন করিয়া তুলিবে। সর্ব্বশেষে ষট্ পদের মত ষট্‌পদক (sestet) আসিয়া উহাতে সংলগ্ন হইবে এবং উহাকে সার্থক করিবে। ইহাই সনেটের বিকাশ-বিধি।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা নাট্য-রচনা-পদ্ধতিকে গো-পুচ্ছের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন; আরম্ভে ও অবসানে উহা সূক্ষ্মাগতিসূক্ষ্ম; মধ্যে স্থূল। আমার মনে হয় সনেট সম্বন্ধেও ঐ উপমা ব্যবহার করিলে খুব বেশী দোষের হয় না।

সনেটের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এইখানে শেষ করিয়া "সনেট-পঞ্চাশতে" চৌধুরী মহাশয়ের কৃতিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করা যাক।

নিজের মানসিক বিশিষ্টতা বজায় রাখিয়া, অথচ তাল-জ্ঞান ও ওজন জ্ঞান না হারাইয়া,

নব নব সৌন্দর্য্যের প্রতিমা-নির্ম্মাণ করাই যথার্থ কাব্য-শিল্পীর কাজ। পঞ্চাশটি সনেটের নাতিবৃহৎ এই সংগ্রহ-গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতায় আমরা এই বিশিষ্টতা এই সৌন্দর্য্যানুভূতি ও ভাব-স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করিয়াছি। পাকা হাতের এবং পরিণত মনের ছাপ ইহার ছত্রে ছত্রে।

কবিতাগুলি প্রথম হেমন্তের শান্ত সন্ধ্যার মত "সুবর্ণে গৈরিকে" চিত্রিত। হেমন্তের হেম-সম্ভার ফলে ও ফসলে পলে পলে আত্ম-প্রকাশ করিয়া ফেলিতেছে; কুবেরের ঐশ্বর্য্যের মত পিণ্ডীভূত সূর্য্যতেজ, কৌৎস ঋষির কৌষেয় উত্তরীয়ের মত সন্ধ্যার আকাশ রঙীন করিয়া তুলিতেছে। হেমন্তের হাওয়া উঠিয়াছে; ভরা ক্ষেতের মাঝখানে দাঁড়াইয়া মাঝে মাঝে অজ্ঞাতসারে মন উদাস হইয়া আসিতেছে। পুরবী রাগিণীর সুরে সুর মিলাইয়া কবি বলিতেছেন:—

"উদাসিনি! তব মন্ত্রে হ'য়েছি উদাস।"

পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের মধ্যে অবগাহন করিয়াও কেমন যেন ক্ষুণ্ণহৃদয়ে বলিতেছেন:—

"তব প্রাণে ভালবাসা রয়েছে ঘুমিয়ে
জাগাতে পারিনি আমি হাজার চুমিয়ে।"

তখনি আবার পথিকের কলরব কানে আসিতেছে, কাঁঠালি চাঁপার গন্ধ, পাপিয়ার গান,—পৃথিবীর চিরনবীনতার কথা হাজার রকম করিয়া দিকে দিকে ঘোষণা করিয়া বেড়াইতেছে, কবির মন আবার সুবর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিতেছে, তাই তিনি বলিতেছেন:—

"কে বলে পৃথিবী এবে হয়েছেপ্রাচীন?"
"আজিও প্রকৃতি আছে সবুজে সৌখীন;
নরনারী আজো ধরে পরস্পরে বক্ষে,—
অমানুষে পরে শুধু ডোর ও কৌপীন্!"

আবার পর মুহূর্ত্তেই বলিতেছেন:—

"—অন্তরে মোর গভীর বিরাগ
হেমন্তের রাত্রি হেন থাকে গো জড়িয়ে।—
যাহার সর্ব্বাঙ্গে যায় নীরবে ছড়িয়ে
কামিনী ফুলের শুভ্র অতনু পরাগ।"

এই রকম করিয়া কবি বৈরাগ্যের গেরুয়া রঙের সূতার সঙ্গে অনুরাগের জরির সূতা মিলাইয়া সরস্বতীর অঙ্গে নূতন জড়োয়া চেলি জড়াইয়া দিয়াছেন।

সনেট পঞ্চাশৎ পদে পদে আমাদিগকে চকিত-চমৎকৃত করে, আমাদের চিত্তবৃত্তিকে উদ্বোধিত করে, চিন্তাশক্তিকে উদ্দীপিত—উত্তেজিত—এমন কি প্রকুপিত করিয়া তোলে বলিলেও ভুল বলা হয় না। অন্তঃকরণের মধ্যে জীবনের ও জাগরণের সাড়া পড়িয়া যায়। এ গুলিকে লইয়া খুসী হইতে পারা যায়, তর্ক করিতে পারা যায়, ঝগড়া করিতে পারা যায়, আর রসান্বেষী রসিক হইলে ইহার দ্বৈত ভাবের দ্বন্দ্বের মধ্যে জীবনের ছন্দ আবিষ্কার করিয়া আনন্দিত হইতে পারা যায়।

"কভু টানি, কভু ছাড়ি, মনের নিশ্বাস
পক্ষে পক্ষে ফিরে আসে সংশয় বিশ্বাস।"

এমন সহজ সত্য কথা এমন সুন্দরভাবে ফুটিয়া বলিতে অনেকদিন শোনা যায় নাই। ইহা আমাদের মত সাধারণ মানুষের অন্তরের কথা; সাধকের বা সাধুর মুখে ইহা শোভন না হইতে পারে; ধর্ম্মসংহিতায় ইহার স্থান না থাকিতে পারে, তবুও ইহা প্রকৃত সাহিত্য, কারণ সাধারণ মানুষের মনের কথা লইয়া ইহার কারবার।

সম্প্রতি দেশে একটা ধুয়া উঠিয়াছে যে, বর্ত্তমানযুগের বাংলা সাহিত্য টিকিবে না,

তাহার কারণ, দেশের ধর্ম্মে উহার ভিত্তি নাই। আমাদের দেশে পুরাতন ঘেঁটুর পাঁচালি এবং মাকাল-মঙ্গল যে আজও বাঁচিয়া আছে তাহা কেবল ধর্ম্মের দোহাই দিয়া। ভারতচন্দ্র দেশের ধাতু বুঝিতেন তাই বিদ্যাসুন্দরের বুকে পিঠে কালীনামের নামাবলী বাঁধিয়া দিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের মাথার ভিতর এমন কোনো মৎলব ছিল কিনা তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই, তা' বাংলাভাষার হঠাৎ-মুরুব্বিরা যাহাই বলুন। আর তেমন মৎলব থাকিলেও বড় আসে যায় না। কারণ ভারতচন্দ্রের রচনা যে লোকে এখনো পড়ে, সে কেবল তাঁহার ভাষার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া। ভারতচন্দ্র প্রকৃত সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়াই এখনো টিঁকিয়া আছেন। নহিলে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী লইয়া আরো অনেকেই তো কাব্য লিখিয়াছিলেন, আর তাহাতে কালীনামের জোড়া-তালিও তো যথেষ্ট ছিল, তবে সে সব কাব্য স্থায়ী হইল না কেন? এমন কি রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরও টিঁকিল না কেন? উত্তর সহজ—সাহিত্য হয় নাই বলিয়া। নূতন সৌন্দর্য্যসৃষ্টির পরিচয় ছিল না বলিয়া। কান্তার মত মানুষের মন হরণ করিবে, তবেই না কাব্য; সেই মনই যখন বশ করিতে পারিল না, তখন বাঁচিবে কি করিয়া? কি লইয়া? কাহার জোরে?

বিশ্বাসও যেমন মনের ধর্ম্ম সংশয়ও তেম্নি; ইহার মধ্যে যে কোনো একটিকে একঘ'রে করিয়া রাখা সাহিত্যের পক্ষে ক্ষতিকর। উহাতে আত্মার প্রকাশ সম্পূর্ণ হইতে পায় না।

"দু'মনা করাই" হয় তো সাধারণ মানুষের "দুর্গতির মূল" কিন্তু, উহাই মানুষের মনের ধর্ম্ম। অবস্থায় পড়িয়া আমরা কখনো নিতান্ত জড়বাদীর মত বলিঃ—

"নাহি জানি অশরীরি মনের স্পন্দন
আমার হৃদয় যাচে বাহুর বন্ধন।"

আবার পর মুহূর্ত্তেই মুগ্ধচিত্তে বলিতে হয়—

"রূপের মাঝারে চাহি অরূপ দর্শন
অঙ্গের মাঝারে মাগি অনঙ্গ স্পর্শন।"

এই পরিবর্ত্তনই মানুষের ধর্ম্ম; এই পরিবর্ত্তনে, এই ভাব হইতে ভাবান্তরে পর্য্যটনেই মানুষের চিত্ত বিহঙ্গ ডানায় বল সঞ্চয় করে। গেটে যাহাকে Duration in change বলিয়াছেন, অর্থাৎ ভাব-সন্ধির অন্তর্দশা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন অবশ্য সেটুকুরও অস্তিত্ব থাকা চাই; নহিলে সমস্তই খাম্খেয়ালি হইয়া উঠে, পাগলামি হইয়া উঠে। মানুষের মতামত সম্বন্ধেও একথা খাটে! গালিই দাও আর অভিশাপই দাও পরিবর্ত্তনই মানব মনের বিশেষত্ব; তাই একই মানুষ "নাস্তিকের শিরোমণি" হইয়াও "আস্তিকের রাজা।" হইতে পারে—

তার "ধর্ম্ম মনোরাজ্যে বহুরূপী সাজা।"

সনেট পঞ্চাশতের কবি আমাদের এই বহুরূপী মূর্ত্তিটী ধরিয়া দিয়াছেন; ভাষায় ভাব-জীবনের অপূর্ব্বছবি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন; সেজন্য আমরা তাঁহার কাছে ঋণী।

আমরা বহুরূপী, কাজেই আমাদের সাহিত্য বহুরূপী, আমাদের দর্শন বহুরূপী, আমাদের শিল্প বহুরূপী। আমরা শূন্যপুরাণ লিখিয়াছি, আমরা মনসার ভাসান লিখিয়াছি, আমরা অন্নদামঙ্গল লিখিয়াছি। আবার আমরাই মেঘনাদ রচিয়াছি, পদাবলী রচিয়াছি,

গীতাঞ্জলি গাহিয়াছি। আমরাই স্বভাবের নকল করিয়া কৃষ্ণনগরের পুতুল গড়ি, আবার আমরাই ভাবপ্রধান ভারতীয় চিত্র কলায় নবজীবন সঞ্চারিত করি। আমরাই প্রখর বুদ্ধির খেলা দেখাইয়া নব্য ন্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছি এবং তর্ক-বিলাসিতার চূড়ান্ত করিয়াছি; আবার আমরাই ভক্তি-ধর্ম্মের প্রচারক শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে হরিধ্বনি করিয়া উন্মাদের মত দেশে দেশে উদ্দাম নৃত্য করিয়া ফিরিয়াছি। আমরা যখন খৃষ্টান হইয়াছি তখন একেবারে প্রোটেষ্টাণ্ট হইয়াছি; সাক্ষী কৃষ্ণ বন্দ্যো, লাল বিহারী, কালিচরণ প্রভৃতি। যখন মুসলমান হইয়াছি তখন একেবারে সুন্নি; সাক্ষী বাখরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম। কিন্তু যতক্ষণ পুরাতন ধর্ম্মে আছি, ততক্ষণ কেবল নিত্য-নূতন অবতারের স্বপ্ন দেখিতেছি।

এই বহুরূপীর নিজস্ব মূর্ত্তি কোনটি তাহা ভগবানই জানেন। ইহার শক্তি অনুসারে, শক্তির বৈচিত্র্য অনুসারে ইহার কর্ম্মক্ষেত্র যে বহুবিস্তৃত হইবে তাহ নিঃসন্দেহ। চৌধুরী মহাশয় এই বহুরূপীর বহুলরূপের পঞ্চাশখানা ফোটো তুলিয়া তাহার উপর পঞ্চাশটা সনেট না লিখুন, তবু তিনি যে আমাদের মানস-জীবনের বিচিত্র মূর্ত্তির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন সেজন্য আমরা কৃতজ্ঞ। তাহা ছাড়া ফোটো তোলা তো কবির কাজ নয়, উহা তো যন্ত্রের কাজ বা যন্ত্রবৎ জড়-ভক্তের কাজ। উহাতে মানুষের পরিচয় কোথায়? অন্তঃকরণের পরিচয় কোথায়? কবির কাজ হইল উদ্বোধিত করা। সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির দ্বারা অভিনবতার সমাবেশ দ্বারা চিত্তবৃত্তিকে সজীব রাখা। কবি দৈত্যপুরীর সকল দিকের সকল কুঠারীর চাবিই খুলিয়া দিবেন; তাহাতে, যে খুসী হয় হোক্, যে ভয় পায় পাক। কঙ্কাল সঞ্চিত আছে বলিয়া কোনো প্রকোষ্ঠ চিরকালের জন্য বন্ধ রাখা চলে না।

* * *

কথায় বলে "Criticism is a mode of auto-biography" সমালোচক কবির সৃষ্ট সামগ্রী নিজের চোখ দিয়াই পরখ করেন; অন্য উপায় নাই। সুতরাং বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমি যে ভাবে সনেট পঞ্চাশতের বিশেষত্ব ব্যাখ্যা করিলাম, তাহা কবির মতের সঙ্গে নাও মিলিতে পারে।

চৌধুরী মহাশয়ের ভাষা সম্বন্ধে কিছু বলিতে যাওয়া বাহুল্য। যাঁহারা তাঁহার গদ্য-রচনা 'তেল-নুন্ লক্ড়ি' প্রভৃতি পড়িয়াছেন তাঁহাদের কাছে সনেট পঞ্চাশতের খাঁটি, অনাড়ম্বর স্বচ্ছ সবল ভাষার গুণ বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। ভারতচন্দ্র যদি রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক হইতেন তাহা হইলে বোধ হয় এম্নি ভাষাতেই কাব্য লিখিতেন। ইহা অপেক্ষা বেশী কিছু বলিয়া সনেট-পঞ্চাশতের ভাষার বিশেষত্ব বুঝাইতে আমি অক্ষম।

সনেট পঞ্চাশতে "জোর করা" ভাব আর "ধার-করা" ভাষার নাম গন্ধ নাই। স্থানে স্থানে হাল্কা ভাব আছে কিন্তু জোর-করা ভাব নাই; জায়গায় জায়গায় ভাষা হয় তো গদ্যের গা ঘেঁষিয়া গিয়াছে কিন্তু তাহা নিজস্ব, মার্কা-মারা; ধার-করা নয় এদিকেও কবির স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ!

বিখ্যাত সমালোচক ওয়াল্‌টার পেটার যাহাকে "Gem like flame" বলিয়াছেন চৌধুরী মহাশয়ের মধ্যে চিত্তপ্রসাধনের সেই চিরন্তন চিহ্ন সেই রত্নকল্প-স্থির-দীপ্তি বিদ্যমান। তাঁহার অধিকাংশ সনেট এই রত্ন-কল্প-স্থির দীপ্তির আলোকে সমুজ্জ্বল।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

হাসি

জননীর অঙ্কে শুয়ে
হেসেছিল, সে যখন
সে হাসিতে দেখেছিনু
ঊষালোক সুশোভন।
যখন বালিকা ক্ষুদ্র
হেরেছি তাহার হাসি,
তাহাতে ছড়ান ছিল
যুঁই ফুল রাশি রাশি।
সলজ্জ মধুর হাসি
দেখেছি যৌবনে তা'র,
সে হাসিতে ছিল মাখা
লুকোচুরি চন্দ্রমার।

পুত্রমুখ চুমি' চুমি'
হেসেছিল সে যখন,
হেরেছি সে হাসি হ'তে
সুধাধারা বরিষণ।
যে হাসি হাসিয়া, আহা!
সে গেল ত্যজিয়া ধরা,
দেখিয়াছি সে হাসিও
সন্ধ্যার করুণা ভরা।
সাঙ্গ সে হাসির খেলা;—
আজি ভাবি অনিবার,—
সব চেয়ে সুমধুর
কোন্ সে হাসিটি তা'র?

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

আজ

(১)

প্রথম স্বপনে যবে এসেছিলে হেসে,
—ছিলে মোর আরাধ্য রতন;
তোমার হৃদয়ে ছিল প্রাণভরা প্রেম,
ছিল কিবা আনন্দ স্পন্দন!

থেমে গেছে সে পুলক লীলা;
—বিজলীর জ্যোতি ম্লান! গতি সুমন্থর!
চরণে শিকল, বুকে শিলা!

(২)

আজ তুমি পুরাতন, অন্তর তোমার
জাগে শুধু—জীর্ণ প্রাণ লয়ে।
জগত সেই ত হাসে চাঁদের কিরণে
ভরা প্রাণে নদী যায় বয়ে!
চিরন্তন প্রীতিটুকু তার প্রাণে আছে
পুরাতনে তাই সে নূতন!
দুদিন এসেছ এই—এরি মধ্যে হায়
তুমি হ'য়ে গেলে পুরাতন!

শ্রীসুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ১, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

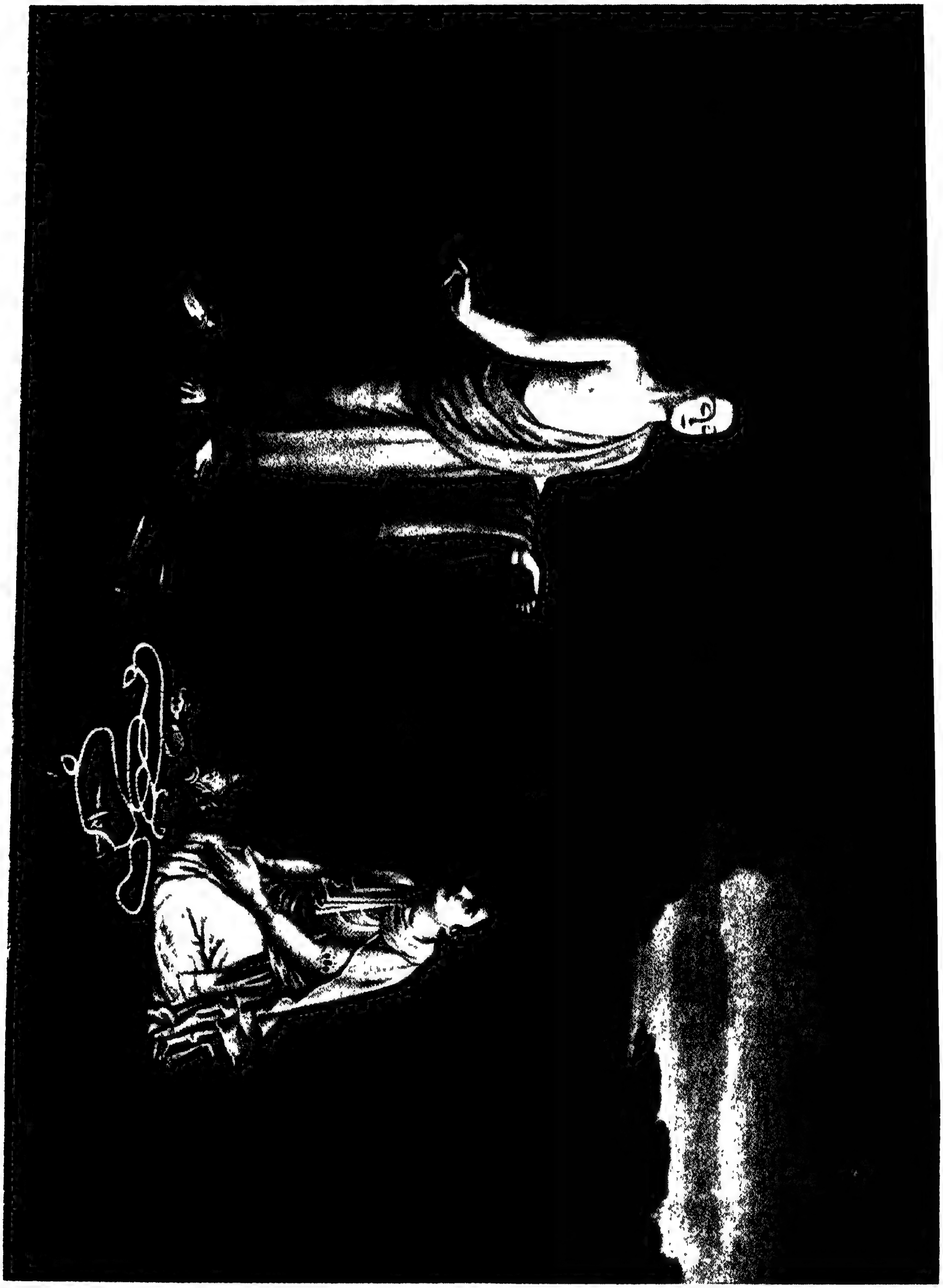

ভারতী

৩৭শ বর্ষ] ভাদ্র, ১৩২০ [৫ম সংখ্যা

হোলাকা বা হোলির প্রকৃততত্ত্ব

(ভারতীয় আর্য্যদিগের উত্তরকুরুবাসের অন্যতম প্রমাণ)

হোলি বা দোলোৎসবের নাম হিন্দুমাত্রেই অবগত আছেন। দুর্গোৎসব যেমন হিন্দুর শারদীয় মহোৎসব, দোলযাত্রা বা দোলোৎসব তেমনই হিন্দুর বসন্তমহোৎসব। এই হোলি সংস্কৃত হোলাকা বা হোলিকা নামেরই অপভ্রংশ। হোলাকা বা হোলিকা সংস্কৃত নাম হইলেও ইহার মূলার্থ অবধারণ করা তেমন সহজ নহে। কিন্তু ইহার অস্পষ্ট অর্থই ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে অন্যতর বলবত্তর প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে। বাস্তবিক ইহার প্রকৃতার্থের উদ্ধার হইলে ইহাতে কিরূপ কৌতুকাবহ পুরাতত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায় তাহা আমরা দেখিতে পাইব। ইহার প্রকৃতার্থের উদ্ঘাটন জন্য আমরা প্রথম ভারত ইতিহাসে অনুসন্ধান করিব না কিন্তু ভারতীয় আর্য্যদিগের আদিজ্ঞাতি পাশ্চাত্য আর্য্যদিগের ইতিহাস অনুসন্ধান করিব। কর্ণেল টডের লিখিত বৃত্তান্ত হইতে আমরা জানিতে পারি যে বসন্তসমাগমে প্রাচ্যজাতিদিগের মধ্যে যেমন অশ্বমেধরূপ আনন্দোৎসব হইত পাশ্চাত্যদিগের মধ্যেও তদনুরূপ আনন্দোৎসব হইত। স্কন্দনভীয়দিগের মধ্যে ইহার নাম ছিল "হ্যয়েল" বা "হায়ুল"। Cyclopædia of India * (ভারতকল্পদ্রুম)

* Col. Tod surmises that at the grand solstitial festival, the Aswa Medha or sacrifice of the horse (The type of the sun), which was practised by the children of Vaivaswata the 'Sun-born' was most probably simultaneously introduced from Scythia into the plains of India, and west by the sons of Odin, Woden, or Boodha into Scandinavia where it became the Hiel or Hi-ul, the festival of the winter solstice the grand jubilee of northern nations and in the first ages of Christianity, being so near the epoch of its rise, gladly used by the first fathers of the Church to perpetuate that event." Cyclopœdia of India by Balfour p. 196.

নামক গ্রন্থে এতৎ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে নিম্নে তাহার অনুবাদ উদ্ধৃত হইল :—

"কর্ণেল টড্ অনুমান করেন যে শীত-সংক্রান্তির মহোৎসব সময়ে বৈবস্বত মনুর সন্ততিবর্গ কর্তৃক যে অশ্বোৎসর্গ বা অশ্বমেধ অনুষ্ঠিত হইত তাহা সম্ভবতঃ শক্‌দিগের দেশ হইতে ভারতবর্ষের সমতলক্ষেত্রে যেমন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তেমনই প্রতীচ্যদেশে ওডিন্ (বুধ) সন্তানকর্ত্তৃক স্কন্দনভীয়াতেও একই সময়ে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তথায় ইহা 'হায়েল' বা 'হায়ুল' এই নাম প্রাপ্ত হয়। ইহা উদীচ্য জাতিদিগের সুমহান্ প্রমোদোৎসব। খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রথম উৎপত্তি সময়ের সন্নিকটবর্ত্তী বলিয়া ইহার আদি-বৃত্তান্ত চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তৎকালের যাজকগণকর্ত্তৃক এই মহোৎসবটী অনুসৃত হয়।"

খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের উপরি উল্লিখিত বসন্তোৎসব—ইষ্টার রবিবার (Easter Sunday) শ্বেত রবিবার (White Sunday) প্রভৃতি পর্ব্ব বলিয়াই আমাদের নিকট বোধ হয়। ইষ্টার নামের উৎপত্তির ইতিহাস Chambers's Twentieth Century Dictionaryতে যেরূপ প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে আমাদের মন্তব্যের যথেষ্ট সমর্থনই পাওয়া যায়—যথা "Bede derives the word from Eastre, a goddess whose festival was held at the spring equinox." ইহার অর্থ এই যে বিড্ (সাহেব) ইষ্টার নামক দেবী হইতেই ইষ্টার শব্দটী উৎপন্ন বলিয়া মনে করেন; বসন্তকালে সূর্য্যের বিষুবরেখায় আগমন সময়েই ইহার উৎসব অনুষ্ঠিত হইত।

কর্ণেল টড্ পূর্ব্বোক্ত হায়ুল নামটি 'হয়' ও 'উল' শব্দযোগে নিষ্পন্ন করিয়া ইহার অর্থ অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিয়াছেন। এখানে আমরা যজ্ঞেশ্বরবাবুর "রাজস্থানে"র অনুবাদ হইতে কর্ণেল টডের মতের মর্ম্ম প্রদান করিতেছি।

"শীত সংক্রান্তিতে এই অশ্বমেধোৎসব সমাহিত হইত। রাজপুত, স্কন্দনভীয়, অশ্ব ও জিৎ সকলেই এক সময়ে এই মহোৎসব সম্পাদন করিতেন। বাল্‌টিক সাগরোপকূলবর্ত্তী প্রাচীন জর্ম্মন্‌গণ এই যজ্ঞকে হয়োল আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। হয় (অশ্ব) এবং উল (দাহ করা) এই শব্দদ্বয়ের মিশ্রণে হয়োল শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং এই শব্দটী যে জর্ম্মন্‌গণ সংস্কৃত হইতে গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।" (সচিত্র "রাজস্থান" বসুমতীর ছাপা ৫পৃঃ।)

উপরি উদ্ধৃত মন্তব্য হইতে দোলোৎসব যে অশ্বমেধরূপে প্রথম অনুষ্ঠিত হইত তাহা আমরা দেখিতে পাইলাম। বর্ত্তমানে দোলোৎসবের পূর্ব্ব দিবসের সায়ং সময়ে যে বহ্ন্যুৎসব হয় এবং তাহাতে যে তণ্ডুলের গুড়িকানির্ম্মিত মেষ বলিরূপে প্রদত্ত হইয়া থাকে তাহা পূর্ব্বোক্ত অশ্বমেধেরই নিদর্শন বলিয়া বোধ হয়।

কর্ণেল টডের মতানুসরণ করিলে আমরা 'হয়োল' শব্দকেই হোলিকা শব্দের মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। কিন্তু কর্ণেল টডের অনুমানটিতে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য প্রকটিত হইলেও, ইহাতে আমরা সম্পূর্ণরূপে নিঃসংশয় হইতে পারি না, কারণ তাঁহার অনুমিত 'হয়োল' শব্দের নিদর্শন সংস্কৃত ভাষার অভিধানে দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা স্কন্দনভীয়-

দিগের হায়েল বা হায়ুল এবং ভারতীয় হিন্দুদিগের 'হোলাকা' 'হেলিকা' বা 'হোলি' উভয়েরই সূর্য্যবাচক সংস্কৃত 'হেলি' শব্দটীকেই মূল বলিয়া মনে করি। স্কন্দনভীয়দিগের মধ্যে আমরা হোলি শব্দের অপভ্রংশমাত্র দেখিতে পাইলেও, গ্রীকদিগের সূর্য্যবাচক Helios শব্দে ইহার অধিক অবিকৃত রূপ দেখিতে পাই।

দক্ষিণায়নের ছয় মাস অদর্শনের পরে উত্তরকুরুবাসী আর্য্যগণ যখন সূর্য্যকে উত্তরায়ণে প্রথম উদিত দেখিতে পাইতেন তখন তাঁহাদের মনে যে অপার আনন্দের আবেগ উপস্থিত হইত হোলি উৎসবের দ্বারাই তাঁহারা ইহার পূর্ণ পরিতৃপ্তি সাধন করিতেন। শীতের নির্জীব ভাবের পর সূর্য্যের উত্তরায়ণ গতিতে বিষুবরেখায় প্রত্যাবর্ত্তনের দ্বারা উত্তর কুরুর প্রকৃতি-জগতে যে নবজীবন ও নবস্ফূর্ত্তির সঞ্চার হইত, হোলিকা উৎসবে তাহাই পূর্ণ প্রকাশ পাইত; সুতরাং এই উৎসবটী যে কিরূপ হৃদয়মনউন্মাদনকারী হইত তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

অশ্বমেধ ও হায়োল উৎসব যে সূর্য্যের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইত তাহা আমরা উপরে দেখাইলাম কিন্তু হোলিকা উৎসব আমরা বিষ্ণুর উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হইতে দেখি। ইহার সামঞ্জস্য কিরূপে করিতে হইবে এসম্বন্ধে স্বতঃই আমাদের মনে জিজ্ঞাসার উদয় হয়। এতৎ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য এই যে, বেদে বিষ্ণু সূর্য্যেরই বিকাশরূপে বর্ণিত হইয়াছে। বিষ্ণুর ধ্যানেও আমরা ইহারই স্পষ্ট নিদর্শন দেখিতে পাই যথা:—"ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ ইত্যাদি।" এখানে সূর্য্যমণ্ডলকে বিষ্ণুর স্থানরূপে নির্দ্দেশ করায় বিষ্ণু ও সূর্য্য যে অভিন্ন তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে।

হোলিকা উৎসবের অপর নাম "ফল্গূৎসব"ও পাওয়া যায়। আমরা অভিধানে এই ফল্গু শব্দের রেণু ও বসন্তঋতু এই উভয় অর্থই দেখিতে পাই। বসন্তঋতু ও রেণু অর্থের একত্র যোগের দ্বারা এখানে রেণু আমরা পুষ্পরেণু বলিয়াই মনে করি। এস্থলে বলা আবশ্যক যে ফল্গু শব্দের অপভ্রংশে ফাগু শব্দই সাধারণতঃ প্রসিদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়।

সূর্য্যের দ্বারা বসন্তঋতু প্রবর্ত্তিত হইয়া চিত্রবিচিত্র পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইলে সুখোষ্ণ বসন্ত পবনদ্বারা ঐ সমস্ত পুষ্প হইতে পরাগ সকল চতুর্দ্দিকে উৎক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া প্রকৃতিতে যে চিত্ত-বিমোহন ক্রীড়াময় স্ফূর্ত্তিময় উদ্দামভাব ব্যাপ্ত করে ফল্গূৎসবে তাহারই চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ফল্গূৎসব যে হোলিকা উৎসবেরই ন্যায় আর্য্যজীবনের আদিকালের উৎসব তাহার প্রমাণ আমরা গ্রীক্‌দিগের বাসন্তীদেবীর (Phagesia) নাম হইতেই পাইতে পারি।

আমরা উপরে ফল্গুর অপভ্রংশ যে ফাগু শব্দের উল্লেখ করিয়াছি ফাগেসিয়া নামেতে আমরা তাহার প্রায় অবিকলরূপই বিদ্যমান দেখিতে পাই।

উপরে আমরা প্রাচ্য হোলিকা বা হোলি এবং ফল্গুর সহিত পাশ্চাত্য হায়েল বা হায়ুল এবং ফাগেসিয়ার তুলনা দ্বারা যে সৌসাদৃশ্যের প্রমাণ প্রাপ্ত হইলাম তাহা হইতে আমরা

সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে আর্য্যগণের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যশাখার একত্র বাসের সময়েই তাহাদের মধ্যে হোলিকা বা হোলি উৎসব প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তাহাদের একত্র বাস যে উত্তর কুরুতে হইয়াছিল হোলিকা উৎসবের মূল বর্ণনা হইতে আমরা তাহাও বুঝিতে পারিতেছি। হোলিকা শব্দটী সূর্য্যের হেলি নাম হইতে উৎপন্ন বলিয়া সূর্য্যের সহিত যে হোলিকা উৎসবের বিশেষ যোগ তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় এবং এই যোগ যে কেবল বসন্তকালের যোগ নহে কিন্তু দক্ষিণায়ণের ছয় মাস অদর্শনের পর উত্তরায়ণে সূর্য্যের প্রথম প্রকাশের সহিত যোগ তাহাও স্পষ্ট বুঝা যায়।

যে সমস্ত স্থানে সর্ব্বদা সূর্য্য দৃষ্ট হইয়া থাকে তথায় বসন্তকালের সূর্য্য তেমন বিশেষভাবে লক্ষিত হওয়ার কথা নয়; কিন্তু যে সমস্ত স্থানে সূর্য্য দীর্ঘকালের জন্য অদৃষ্ট থাকে সেইখানেই দীর্ঘকাল অদর্শনের পর ইহার প্রথম দর্শন বিশেষভাবে লক্ষিত হওয়ার ও তাহাতে লোকের মনে বিশেষ প্রমোদভাব সঞ্চারিত হইবার কথা। উত্তর কুরু ও তৎসমসূত্রবর্ত্তী স্থানসকলেই সূর্য্য দক্ষিণায়নের ছয় মাস অদৃষ্ট থাকিয়া পুনরায় উত্তরায়ণ গতিতে বসন্তকালে বিষুবরেখায় আসিয়া প্রথম প্রকাশিত হইয়া থাকে। সুতরাং উত্তরমেরুমণ্ডলের সন্নিহিত স্থানসকলে সূর্য্যের এবম্প্রকার নব-প্রকাশের দ্বারা যে লোকের মধ্যে নবজীবনের নবোৎসব জাগরিত হইবে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এইজন্যই আমরা প্রাচ্য উত্তরকুরুবাসী এবং জার্ম্মেন ও স্কন্দনভীয় প্রভৃতি পাশ্চাত্য উত্তরদিগ্‌বর্ত্তী জাতিদিগের মধ্যেই বসন্তোৎসবের বিকাশ সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ দেখিতে পাই।

মুসলমানগণ ইদ্ পর্ব্বের সময় কৃষ্ণপক্ষের ক্ষয়ের পর কিরূপ ঐকান্তিক আগ্রহ ও আনন্দের সহিত পরস্পরে মিলিত হইয়া শুক্লপক্ষের নবোদিত ইন্দুকলা (যে ইন্দু হইতে তাহাদের ইদের নাম হইয়াছে) সন্দর্শন করে তাহা সকলেরই সুবিদিত। উত্তরকুরুতে ছয় মাসের পর উত্তরায়ণের প্রথম সূর্য্য দর্শনে লোকের মনে যে তদপেক্ষা কত গুণ অধিক আনন্দ ভাব উচ্ছলিত হইত তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। ছয় মাসের সোৎকণ্ঠ প্রতীক্ষার পর উত্তরকুরুবাসী আর্য্যগণ যখন সূর্য্যকে প্রথম দেখিতে পাইতেন তখন আনন্দভাবে বিহ্বল হইয়া সূর্য্যের "হেলি" নাম লইয়া "ঐ হেলি" (সূর্য্য); "ঐ হেলি" (সূর্য্য) বলিয়া যে ইহাকে অভিনন্দিত করিতেন এবং অন্যকে এই সংবাদ প্রদান করিয়া অভিনন্দনের জন্য সাদর আহ্বান করিতেন আমরা এইরূপ কল্পনা করিলে বোধহয় অসঙ্গত হইবে না। বরঞ্চ এইরূপ কল্পনা হইতে ইহা আমরা পরিষ্কার রূপে উপলব্ধি করিতে পারিব যে মুসলমান-দিগের চন্দ্র দর্শনের উৎসব যেমন চন্দ্রের 'ইন্দু' নাম হইতে ইদ্ নামে আখ্যাত হইয়াছে—হিন্দুদিগের সূর্য্যদর্শনের উৎসবও তেমনই সূর্য্যের হেলি নাম হইতে হোলিকা নামে আখ্যাত হইয়াছে। খ্রীষ্ট ধর্ম্মের বসন্ত পর্ব্ব সকল যে উত্তর-ইউরোপের বসন্তোৎবেরই অনুকরণে পরিকল্পিত তাহা আমরা পূর্ব্বেই

বলিয়াছি। ইষ্টার সান্‌ডে, হোয়াইট সান্‌ডে প্রভৃতি খ্রীষ্টধর্ম্মের বসন্ত-পর্ব্বসকলে আমরা যে সূর্য্যবাচক সান্ (Sun) শব্দের স্পষ্ট যোগ দেখিতে পাই তাহাতেও সূর্য্যের সহিত বসন্তোৎসবের সম্পর্ক সম্বন্ধে আমরা নিঃসংশয় নিদর্শন পাই। ইষ্টার নামটী পর্য্যন্ত যে বসন্তকালের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ইষ্টার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহার প্রমাণ আমরা পূর্ব্বে প্রদান করিয়াছি। এই ইষ্টার (Eastre) দেবী আমাদের নিকট গ্রীক্ ইয়োস্ (Eos) দেবীর নামেরই রূপান্তর বলিয়া মনে হয়। গ্রীক্ ইয়োস্ দেবী আমাদের ঊষা দেবীরই নামান্তর মাত্র। বসন্তকালে উত্তরায়ণ গতিতে সূর্য্য বিষুবরেখায় প্রথম যে প্রভাতে উদিত হইতেন—সেই অপূর্ব্ব নব সৌন্দর্য্য-শালিনী প্রথম বসন্তঊষাই—ইষ্টারদেবী এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া আমরা মনে করি।

এই সমস্ত পর্য্যালোচনা হইতে আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি যে আমাদের উত্তর কুরুবাসী আর্য্য পূর্ব্বপুরুষদিগের উত্তরায়ণের প্রথম সূর্য্য দর্শনের অনির্ব্বচনীয় আনন্দ হইতেই বর্ত্তমান হোলি উৎসবের উৎপত্তি এবং সূর্য্যের নামানুসারে হেলি উৎসব বা সূর্য্য উৎসব ইহাই ইহার নামের প্রকৃত মূলার্থ।*

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

রেলযাত্রী

(গল্প)

একটি ট্রাঙ্ক ও বিছানা লইয়া যখন হাওড়া ষ্টেশনে পৌছিলাম তখন এক্সপ্রেস ট্রেণ্ প্ল্যাটফর্মে আসিয়া গিয়াছে। আমার একে থার্ড ক্লাসের টিকিট তাহার উপর আবার যখন দেখিলাম যে আসিতে দেরী হইয়া গিয়াছে, তখনই বুঝিলাম যে কপালে বহু কষ্ট আছে। যে গাড়ীতে উঁকি দিয়া দেখি, সেই গাড়ীই ভর্ত্তি। বাঙ্গালী আরোহী থার্ডক্লাসে ত দেখিতে পাইলাম না; ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসের জানালা হইতে চসমামণ্ডিত-চক্ষু এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক উঁকি দিতেছেন দেখিলাম। থার্ড ক্লাসের সকল গাড়ীগুলিই হিন্দুস্থানি স্ত্রীপুরুষে পরিপূর্ণ। এক একটি কামরায় ঢুকিতে যাই, অমনি তাহাদের দারুণ কলরব। মহা মুস্কিল হইয়া পড়িল, গলদ্‌ঘর্ম্মকলেবরে এ গাড়ি হইতে ও গাড়ি ছুটাছুটি করিতেছি এমন সময় থার্ডক্লাসের একটি গাড়ির জানালা হইতে একজন মুখ বাড়াইয়া বলিলেন "মহাশয় কোথায় যাবেন?" রেলগাড়িতে সকলেই স্বার্থপর। পাছে অপর কেহ উঠে এই ভয়ে বড় একটা কেহ যাচিয়া আলাপ করেন না। তাই ইঁহার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। তৎক্ষণাৎ মুটিয়াটিকে পিছনে

* চট্টগ্রাম সাহিত্য-সম্মিলনে পরিগৃহীত।

লইয়া সেই গাড়ীর দ্বারে গিয়া বলিলাম "আসানসোল। একটু জায়গা হবে কি?" "আসুন না" বলিয়া ভদ্রলোকটি দরজা খুলিয়া দিলেন। কুলির মাথা হইতে তোরঙ্গ গাড়ীতে উঠাইয়া লইয়া তাহাকে পয়সা দিলাম। বক্‌সিসের জন্য কিছুক্ষণ গোলমাল করিয়া সে চলিয়া গেলে তোরঙ্গটিকে একটি বেঞ্চের নীচে ঠেলিয়া দিয়া ও বিছানাটি উপরকার ঝোলান তক্তাখানির উপর রাখিয়া হাঁফ্ ছাড়িয়া বসিলাম। দেখিলাম গাড়ীর মধ্যে আর দুই জন বাঙ্গালী রহিয়াছেন। তাঁহারা প্ল্যাটফর্মের দিকের বেঞ্চে বসেন নাই বলিয়া ছুটোছুটি করিবার সময় দেখিতে পাই নাই। একজন শীর্ণকায়, তাঁহার গায়ে একটি কাল কোট, গলায় কম্ফর্টার জড়ান, কোটের উপর একখানি সবুজ আলোয়ান, থান ধুতি পরিধান, পায়ে ক্যান্‌ভাসের জুতা। তিনি একটি ব্যাগের উপর হেলান দিয়া এক কোণে বসিয়াছিলেন। আর একজন বেশ বাবুগোছের,—তাঁহার গায়ে আলষ্টার, মাথায় নাইট ক্যাপ্। সিগারেট ধরাইয়া নিশ্চিন্ত মনে তিনি ধূমপান করিতেছিলেন। যে ভদ্রলোকটি আমাকে সেই গাড়ীতে ডাকিয়া লইলেন, তিনি স্থূলকায়; তাঁহার গোঁফ, দাড়ি কামানো; গায়ে একখানি বালাপোষ, পায়ে চটিজুতা। তাঁহাকে দেখিয়া ব্রাহ্মণপণ্ডিত বলিয়া মনে হইল!

আমি বসিয়া বলিলাম "ওঃ, আজ দেরীতে এসে যে বিপদে পড়েছিলুম। কোনও গাড়ীতে আর জায়গা পাই না। আর ভীড়ও কি অসম্ভব হইয়াছে।"

স্থূলকায় ভদ্রলোকটি বলিলেন "এই শীত, তবু গাড়ীর ভিতরে বসে কি রকম গরম বোধ হচ্ছে! যেন হাঁফ ধরবার যোগাড়।" তিনি একে স্থূলকায়—তার উপর আমাকে বসিবার স্থান দিয়া আমার ও একজন বলিষ্ঠ হিন্দুস্থানীর চাপে পিষ্ট হইতেছিলেন। কাজেই হাঁফ লাগিবার কথা।

শীর্ণকায় ভদ্রলোকটি ব্যাগ হইতে ভর তুলিয়া লইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলেন "গরম! তা হবেই ত'। আমি এ গাড়ীতে রয়েছি। গরম হবে না? শীতের দিনে ভালই ত!"

আমরা সবিস্ময়ে তাঁহার দিকে চাহিলাম। প্রথমে মনে করিলাম তিনি ব্যঙ্গ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার মুখের ভাবে কৌতুকের কোনও লক্ষণ বোঝা গেল না। আলষ্টারপরা বাবুটি মুখ হইতে এক রাশ সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন "কি রকম?"

শীর্ণকায় ভদ্রলোকটি বলিলেন "এই দেখুন না কেন সূর্য্য আমার কাছে কাছেই থাকেন। যেখানে থাকি সেখানে কাজেই রোদ হয়। গরম বেশ পড়ে।"

স্থূলকায় ভদ্রলোকটি এই কথায় উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। আমরাও সে হাসিতে যোগ দিলাম। শীর্ণকায় ভদ্রলোকটি বলিলেন "আপনারা কি ঠাট্টা মনে করলেন না কি? আমি ঠাট্টা কচ্ছিনে। বিলাতে এত ঠাণ্ডা কেন জানেন? সেখানে আমি যাইনা। আমি থাকলে সূর্য্য আমার কাছেই উঠ্‌ত। সে দেশটাও গরম হ'ত।"

বাবুটি সহাস্যে বলিলেন "তবে সাহারা মরুভূমি এত গরম কেন? মহাশয় ত আর সেখানে থাকেন না।" উত্তর হইল, "সাহারায় বালি আছে, শীঘ্রই গরম হয়। সেই তার

কারণ।" আমরা সকলেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলাম।

তিনি অতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন "হাস্‌ছেন যে? আমি কি তামাসা কচ্ছি? আমি কে জানেন? বিলাসপুর স্কুলের হেড্‌মাষ্টার কিরণচন্দ্র বসুর নাম শুনেছেন? আমিই সেই কিরণচন্দ্র বসু।" কথাগুলি এরূপ ভাবে উচ্চারিত হইল, যেন তিনি কোন ছদ্মবেশী সম্রাট আত্মপ্রকাশ করিলেন। গাড়ী তখন ছাড়িয়া দিয়াছে।

আমি অতি কষ্টে হাসি চাপিয়া রাখিয়া বলিলাম "সূর্য্য আপনার কাছে থাকেন কি রকম?" তিনি তখন ব্যাগ খুলিয়া একতাড়া কাগজ বাহির করিলেন। সেগুলি হাতে করিয়া বলিলেন "আপনারা ত সকলে জানেন পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। কিন্তু ইহা ভ্রম। বিষম ভ্রম। পৃথিবী স্থির। সূর্য্যই ঘুরিতেছে। আমিও আগে আপনাদের মত ভুল শিখিয়াছিলাম। কিন্তু সে ভুল আর নাই। আমি প্রমাণ করিতে পারি যে সূর্য্য ঘুরিতেছে। এই প্রবন্ধটি পড়িয়া দেখুন।" এই বলিয়া সেই কাগজ তাড়াটি আমার হাতে দিলেন। খুলিয়া দেখি এক সুবৃহৎ প্রবন্ধ। ভাষার খুব বাঁধুনি। "আজ পর্য্যন্ত পাণ্ডিত্যাভিমানী বহু মনীষিগণের বিশ্বাস যে নিউটন, গ্যালিলিও প্রভৃতির প্রচারিত মত অভ্রান্ত। কিন্তু ধীরভাবে প্রমাণের অনুসন্ধান করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে যে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত অমূলক।..." ইত্যাদি। স্থূলকায় ভদ্রলোকটি আমার কাণে কাণে বলিলেন, "ও পাগল।" আমিও তখন তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি।

আমি তখন বলিলাম "মহাশয় এ গূঢ় সত্য কতদিন জানিতে পারিয়াছেন?"

"শুন্‌বেন? সে অনেক কথা। আপনাদের সব খুলিয়া বলিতেছি।" এই বলিয়া তিনি গল্প আরম্ভ করিলেন।

"আমার প্রথম চাকরি এতনাদপুর গ্রামে। তখন সবে বি,এ পাশ করিয়াছি। বেঙ্গলীতে এক চাকরীর বিজ্ঞাপন দেখিয়া দরখাস্ত করিয়া দিয়াছিলাম। ষ্টেশনের নিকট ক্ষুদ্র গ্রাম। সেখানে একটি ছোটখাট স্কুল। সেই স্কুলে ইংরাজী পড়াইতে হইবে।

প্রথম যেদিন আমার কর্ম্মস্থলে পৌঁছিলাম, সেদিন রবিবার। স্কুল বন্ধ। স্কুলের সেক্রেটারী মহাশয়ের বাসায় উঠিলাম। তাঁহার নাম—লালা রামকিশোর। তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া ছোট স্কুলবাড়ীটিতে লইয়া গেলেন। সেইখানেই আমার বাসের জন্য একটি ছোট ঘর পাইলাম। বেতন অধিক নয়, নিজেই রাঁধিয়া খাইবার বন্দোবস্ত করিলাম। বাসন মাজিবার জন্য গ্রামস্থ একটি রমণী নিযুক্ত হইল। তাহার নাম জানকী।

প্রথম যেদিন সে কাজ করিতে আসিল, তাহার সঙ্গে নয় দশ বছরের একটি ছোট ছেলে ছিল। ছেলেটি অতি সুন্দর। বড় বড় চোখ, কালো গোছা গোছা চুল অযত্নে মুখের আশে পাশে পড়িয়াছে, আমি জানকীকে জিজ্ঞাসা করিলাম "এ কে?"

জানকী এক করুণ কাহিনী শুনাইল। বালকের পিতামাতা উভয়েই মৃত। বালক যখন দুই বৎসরের তখন তাহার ভার লইবার আর কেহ ছিল না। বৃদ্ধা জানকীরও

আর কেহ আত্মীয় নাই। তাই সে পরমযত্নে বালকটিকে লালনপালন করিয়াছে। জানকীর শেষ বয়সে এই বালকটিকে পাইয়া তাহার চিরসঞ্চিত মাতৃত্বের ক্ষুধা মিটাইয়া তাহাকে সে স্নেহযত্ন করিয়া আসিতেছে।

এরূপ অপরিসীম আদব পাইলে স্বভাবতঃ বালক দুরন্ত হয়, কিন্তু এ ছেলেটি সেরূপ ছিল না। প্রথম পরিচয়েই বুঝিলাম—বালকটি অতি ধীর ও শান্ত,—এই শ্রেণীর অন্যান্য বালক হইতে ইহার প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। গ্রামের বালকেরা স্কুলের ছুটির পর বাড়ী যাইবার সময় পথে কত ঝগড়া, মারামারি করিতে করিতে ছুটিয়া চলিত; এই বালকটি বড় বড় চোখ দুটি তুলিয়া তাহা দেখিত ও একপাশ দিয়া ধীরভাবে নীরবে চলিয়া যাইত। জানকীর নিকট কখনও কোন আবদার করিত না। জানকী যখন আমার বাসন মাজিত সে একপাশে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত।

বাঙ্গলা দেশ ছাড়িয়া হিন্দুস্থানের একখানি ছোট গ্রামে আসিয়া পড়িয়াছি। কথা কহিবারই বা তেমন লোক কোথায়? আমি আবার ছোট ছোট ছেলেদের সহিত কথা কহিতে বড় ভালবাসিতাম। কাজেই জানকীর পালিত পুত্র কিষণলালের সহিত ভাব করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। বালকটি আমাদের স্কুলেই পড়িত। প্রধান শিক্ষক বলিয়া ভয়ে প্রথমে সে ভাল করিয়া আলাপ জমাইবার সুবিধা করিতে পারে নাই, কিন্তু ক্রমশঃ আমাদের দুজনের মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব হইয়া গেল।

অপরাহ্নে স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমি খাটিয়াখানির উপর যখন গা ঢালিয়া দিয়া একটু বিশ্রাম করিতাম, তখন কিষণলাল খানদুই জীর্ণ বই ও শ্লেট লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইত। কিছুক্ষণ পড়াইতাম। তারপর গল্প হইতে থাকিত। আমাদের দেশের ছেলেরা কেমন, আমাদের দেশের পল্লীজীবনের বিবরণ, তথাকার গুরুমহাশয় ও পাঠশালার ইতিহাস প্রভৃতি তাহার মনে ফুটাইবার চেষ্টা করিতাম। সেও নিশ্বাস বন্ধ করিয়া তাহা শুনিত।

সব চেয়ে তাহার ভাল লাগিত আমার নিজের বাল্য-জীবনের বর্ণনা। আমি যখন ছোট ছেলে ছিলাম, তখন পাততাড়ি বগলে করিয়া কিরূপে পাঠশালায় যাইতাম, গুরুমহাশয় কিরূপ ছিলেন, কি রকম করিয়া এত লেখাপড়া শিখিলাম প্রভৃতি কথা সে খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিত। তাহার বর্ত্তমান অবস্থার সহিত "মাষ্টারজীর" বাল্যাবস্থার বোধহয় তুলনা করিত। নিজেও বোধহয় কল্পনা করিত একদিন "মাষ্টারজী"র মতই পণ্ডিত হইয়া সকলের প্রশংসাভাজন হইবে।

এইরূপে বেশ সুখে আমাদের দিনগুলি কাটিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে রামলীলার উৎসব নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়িল।

একদিন সকালে মুখ হাত ধুইয়া একখানি বই খুলিয়া পড়িতে বসিবার উদ্যোগ করিতেছি এমন সময় দুইজন বলিষ্ঠ হিন্দুস্থানী আসিয়া অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের কপালে চন্দনরেখা, মাথায় পাগড়ী, বেশভূষায় বোধ হইল যেন পুরোহিত।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "ব্যাপার কি?" তাহারা অনেক কথা বলিতে লাগিল।

তাহার সার মর্ম্ম এই—রামলীলার উৎসব আসিতেছে। এই উৎসবে রাম, রাবণ, লক্ষ্মণ, সীতা প্রভৃতির চরিত্র অভিনয়ের জন্য তাহারা লোক সংগ্রহ করিতেছে। রামের চরিত্রে তাহারা কিষণলালকে চায়। কিছুদিনের জন্য তাহাকে ছুটি দিতে হইবে।

আমি শুনিয়াছিলাম পশ্চিমে রামলীলার খুব ধূম। রামায়ণের ঘটনা সকল অঙ্গভঙ্গী সহকারে অভিনীত হইয়া থাকে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কিষণলাল রাজি ত?" তাহারা বলিল "হাঁ, তাহাকে রাজি করিয়াছি।"

আমি বলিলাম "আচ্ছা, তাহার ছুটি মঞ্জুর।" তাহারা অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় জানকী কাঁদিয়া আসিয়া পড়িল, সে কিষণলালকে কিছুতেই রাম সাজিতে দিবে না। যে ছেলে দেবতা সাজে সে কিছুতেই বাঁচে না। সে অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইতে লাগিল। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস কিষণলাল রাম সাজিলে তাহার নিশ্চয়ই অমঙ্গল ঘটিবে।

আমি তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু সে কোনও কথা শুনিল না। বলিতে লাগিল "গরীব ব'লে এত জুলুম। কিষণলালের বাপ মা নেই ব'লে কি তাকে দেখ্‌বার কেউ নেই? পুরুতদের নিজের ছেলেদের সাজাক্ না। আমার ছেলেকে আমি কখনও ছাড়্‌ব না।"

তাহার পরদিন সকালে কিষণলালকে লইয়া পুরোহিত দুইজন আসিয়া উপস্থিত। কিষণলালকে নূতন কাপড়, নূতন জামা ও টুপি কিনিয়া দিয়াছে। তাহার আনন্দ দেখে কে? সে বলিতে লাগিল "মাষ্টারজী, আমার একটা ধনুক আছে। সেই ধনুকে তীর দিয়া রাবণবধ করিব।" কিন্তু তাহার স্ফূর্ত্তি হইলে হইবে কি? জানকী তাহাকে কিছুতেই ছাড়িতে রাজি নয়। পুরোহিতেরা আমাকে ধরিয়া বসিল,—"হুজুর যা করেন। জানকীকে বুঝাইয়া বলুন। সে আমাদের কথা মানে না। আপনি বলিলে নিশ্চয়ই শুনিবে।"

তাহাদের কাতর প্রার্থনায় আমি জানকীকে ডাকাইলাম। সে পুরোহিতদের দেখিয়াই গালি দিতে আরম্ভ করিল। বহুকষ্টে তাহাকে থামাইয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। প্রায় দুই ঘণ্টা তর্কের পর সে আমায় বলিল "মাষ্টারজী, আপনি আমার ছেলেকে ফিরাইয় দিবেন?"

আমি বলিলাম "হাঁ! তোর কোনও ভয় নাই। আমি শপথ করিতেছি তোর ছেলের কোনও বিপদ্ ঘটবে না!"

জানকী বলিল "ভগবান্ সূর্য্য সাক্ষী রইলেন।" সে চলিয়া গেল।

রামলীলার মহা ধূম আরম্ভ হইল। আমি তাহার পরদিন হইতে ঘোর জ্বরে আক্রান্ত হইলাম। জ্বর ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল। সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলাম। কতদিন কাটিয়া গেল তাহা কিছুই জানি না।

সজ্ঞান হইয়া দেখিলাম,—আমার দাদা বিছানার পাশে বসিয়া রহিয়াছেন। বৌদিদি এককোণে ঔষধের শিশিগুলি সাজাইয়া রাখিতেছেন। বুঝিলাম তাঁহাদের সংবাদ দিয়া আনান হইয়াছে। আমি বলিলাম "আজ কত

তারিখ ?" দাদা বলিলেন "কথা কয়ো না। চুপ্ করে শুয়ে থাক।" বৌদিদি আমার কথা শুনিয়া তাড়াতাড়ি আমার বিছানার কাছে আসিলেন। দুই ফোঁটা চোখের জল তাঁহার গাল বহিয়া ঝরিয়া পড়িল।

এই সময় বাহিরে একটা গোল উঠিল। বেগে উন্মাদিনীর মত জানকী সে কক্ষে প্রবেশ করিল। চীৎকার করিয়া বলিল "মাষ্টারজী, আমার কিষণকে ফিরে দাও। সূর্য্য সাক্ষী আছেন। আমার কিষণকে ফিরে দও। তোমার শপথ রাখ।" দুই তিনজনে ধরিয়া তাহাকে বাহিরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

কিষণলাল তাহা হইলে মারা গেছে! কতদিন আমি পড়ে আছি! আমি অসহ্য বেদনায় অধীর হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলাম, মাথার মধ্যে শত সূর্য্য দীপ্তিমান হইয়া উঠিল।

আকুলব্যাকুল চিত্তে পুনরায় চোখ খুলিলাম—সমস্ত প্রকৃতি সূর্য্যময় দেখিলাম—কর্ণে শুনিতে পাইলাম সূর্য্য সাক্ষী! সূর্য্য সাক্ষী! সেই অবধি সূর্য্য আমার সঙ্গ লইয়াছেন—জাগরণে সূর্য্য—স্বপ্নেও সূর্য্য। যেখানে যাই—সেখানেই সূর্য্য—ঠিক বলছি আমি,—অবিশ্বাস—

"আসানসোল! আসানসোল!" কুলিরা হাঁকাহাঁকি করিতে লাগিল। গাড়ী আসানসোলে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আমি তাড়াতাড়ি জিনিষপত্র লইয়া নামিয়া পড়িলাম। কিরণবাবুর কথার শেষটুকু আর শুনিতে পাইলাম না।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

লক্ষ্ণৌয়ের রেসিডেন্সী

লক্ষ্ণৌয়ের রেসিডেন্সী ভবনের সহিত রাজ্যধ্বংসকারী সিপাহী বিদ্রোহের যে গভীর বিষাদ-স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে তাহা কল্পনাপথে আনিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। বহুদিন অবধি আমি এই প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গৃহ দেখিবার ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম।

গোমতীর উপর এক উচ্চ স্থানে রেসিডেন্সীর এই রমণীয় অট্টালিকা অযোধ্যার তৎকালীন নবাব সাদৎ আলি কর্তৃক ১৮০০ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হয়। কিন্তু, কালক্রমে অযোধ্যায় ইংরাজের শাসনদণ্ড পরিচালনের ভার আসিলে ইহা তাঁহাদিগের দুর্গ এবং রেসিডেন্সী ভবনে পরিণত হইয়াছে। "কর্ণেল বেলী (Col. Bailey) যখন অযোধ্যার রেসিডেণ্ট হ'ন তখন সর্ব্বপ্রথমে দুর্গের বহির্দ্বারে তিনি প্রহরী রক্ষা করেন। একজন সুবাদার উহাদের অধ্যক্ষ হয়।" তদবধি ইহা সাধারণের নিকট 'বেলিগার্ড' বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছে। গোমতীর তীরে এই বিরাট 'বেলিগার্ড'ভবন ১৮২০০ বর্গফুট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

পথ প্রদর্শক (Guide) দ্বারা পরিচালিত হইয়া যখন আমি এই বিষাদ-স্মৃতি-জড়িত রেসিডেন্সী ভবনের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য

'বেলিগার্ড গেট' মধ্যে প্রবেশ করিলাম, তখন ইহার চূর্ণ-বিচূর্ণ, ক্ষত-বিক্ষত, দেওয়াল-গুলি দেখিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলাম না। চিরস্মরণীয় ১৮৬৭ সালের জুন মাসে যখন ভীষণ বিপ্লব বহ্নিস্রোত, ক্ষুব্ধ সাগর-তরঙ্গের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া, অযোধ্যার সমৃদ্ধিশালী জনপদসমূহকে নিমেষে হতশ্রী করিয়া সুন্দর সৌধমালাসুসজ্জিতা গোমতী তীরস্থ লক্ষ্ণৌ নগরীর দ্বারদেশে উপনীত হইয়া, বিদ্রোহের বিজয়ভেরী বাজাইল,—হায়! তখন অসংখ্য ইংরাজ নরনারীগণ নিজেদের সম্মুখ মৃত্যুর সুস্পষ্ট করালছায়া দর্শন করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। ভীত, আতঙ্কগ্রস্ত, অসহায় ইংরাজগণ প্রাণভয়ে দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইলেন। সশব্দে দুর্গদ্বার বন্ধ হইয়া গেল। ত্রিশ সহস্র যোদ্ধা এবং সাধারণ লোক

লক্ষ্ণৌয়ের রেসিডেন্সী।

আত্মরক্ষার উপায়ের জন্য ইহার মধ্যে স্বেচ্ছায় আবদ্ধ হইল। তন্মধ্যে ১৭০০ জন বীরপুরুষ এবং রীতিমত যোদ্ধা। ইহার মধ্যে কেবলমাত্র ১০০০ জন গোরা সৈন্য। অবশিষ্ট ১৩০০ জনের মধ্যে ৭০০ জন দেশীয় লোক এবং ৬০০ জন ইংরাজ স্ত্রী এবং শিশুসন্তান। এদিকে ইতিমধ্যে ক্ষিপ্তপ্রায় অসংখ্য বিদ্রোহীগণ সহরের রাজপথ বহিয়া দীর্ঘ কামানশ্রেণী টানিয়া আনিয়া বেলিগার্ডের চতুর্দ্দিকের উন্নত স্থানগুলি অধিকার করিয়া বসিল। তাহাদের সেই শত শত ভীষণ কামান-সকল দিবারাত্র অনলোদ্গীরণ করিতে লাগিল। সে ভয়াবহ অগ্নিবৃষ্টির বর্ণনা হয় না। গোলাগুলির প্রভাবে 'বেলিগার্ড'টি একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। 'বেলিগার্ড গেট' উত্তীর্ণ হইয়া দক্ষিণদিকে ছাদশূন্য অসংখ্য

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষসংবলিত ‘বেলিগার্ড হাউস্’ দেখিলাম। একপার্শ্বে ‘বেগম কুঠি’ এবং তাহার সঙ্গে ডাক্তার ফ্রেয়ারের আবাস (Dr. Frayer's House)। এই স্থানেই যুদ্ধের দ্বিতীয় দিবসে ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষ সদাশয় সার হেন্‌রী লরেন্স (Sir Henry Lawrence) সিপাহীর গুলির দ্বারা নিহত হ'ন। ঠিক মধ্যস্থলে অপেক্ষাকৃত উন্নতভূমিতে খাস রেসিডেন্সীভবন এখনও সগর্ব্বে দণ্ডায়মান। যদিও বিদ্রোহীদিগের অবিশ্রান্ত গোলাগুলিবৃষ্টিতে তাহার সুন্দর দেওয়ালগুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ এবং শ্রীহীন হইয়া গিয়াছে, যদিও তাহার অধিকাংশ কক্ষের ছাদ অনলবর্ষণে উড়িয়া গিয়াছে, যদিও তাহার গগনস্পর্শী চূড়াবলী ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়াছে, যদিও বারুদের ধূমে তাহার সমস্ত কক্ষ মলিনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি অতীতের সাক্ষ্য দিবার জন্য, সেই শোধ প্রতিশোধের জীবন্ত ছবিখানি—সেই জীবনমরণের বাস্তব লীলাভূমি রেসিডেন্সীভবন এখনও দর্শকগণের কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টির সম্মুখে নীরবে দণ্ডায়মান। প্রায় তিন মাস ধরিয়া কি ভীষণ যুদ্ধই হইয়াছিল। দুর্গের গড়খাইএর বাহিরে সিপাহীগণ মুহুর্মুহুঃ রক্তগোলক সকল নিক্ষেপ করিয়া প্রতিশোধের বিষবহ্নি উদ্গীরণ করিতেছিল। অধুনা রেসিডেন্সী ভবনের চারিপার্শ্বে চারিটি বিরাট কামান স্থাপিত করা হইয়াছে। বারাণ্ডার নীচে একপার্শ্বে কতকগুলি কামান এবং অসংখ্য গোলা স্তূপীকৃত রহিয়াছে। রেসিডেন্সীর সম্মুখে তাঁহাদের প্রিয় সেনাপতি হেন্‌রী লরেন্সের শ্বেতমর্ম্মর মনুমেণ্ট-রূপ (Monument) স্মৃতিচিহ্ন দেখিলে হৃদয়ে কি এক করুণ, বিষাদ ভাব জাগিয়া উঠে। সেই অনাবশ্যক অনাড়ম্বর স্মৃতিচিহ্নের উপর একটি প্রস্তর-ফলকে এই কয়েকটি কথা—

Here Lies
Henry Lawrance
Who tried to do his duty.
May The Lord have mercy
Upon his soul.
Born 28th June, 1806. Died 4th July, 1857.

আমার ‘গাইড’ (Guide) চতুর্দ্দিক ঘুরাইয়া ফিরাইয়া অবশেষে আমাকে তয়খানার (ভূমধ্যস্থ কুঠরী) মধ্যে লইয়া চলিল। সেই ঘূর্ণায়মান ধাপের সাহায্যে ক্রমাগত নীচে চলিতে চলিতে বোধ হইল যেন পাতালেই যাইতেছি। যাইয়া কি দেখিলাম! দেখিলাম—সেই অন্ধকার গৃহগুলিতে, যেস্থানে নিরীহ শ্বেতমহিলা এবং শিশুগণ আশ্রয় লইয়াছিল, যে স্থানে, সূর্য্যের রশ্মি এখনও অতি মৃদুভাবে প্রবেশ করে, সে স্থানে, সেই অতীত দিনের স্মৃতি আজও সুস্পষ্টভাবে জাগরূক রহিয়াছে। সেই স্থানে কামানের গোলা সকল পড়িয়া কি সর্ব্বনাশই করিয়াছিল! এখনও সেই শোণিতের চিহ্ন বিদ্যমান! কি মর্ম্মভেদী দৃশ্য! আমাদের নিজেদের কথাগুলি দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হইয়া আমাদের ভীতি উৎপাদন করিতে লাগিল। আমার বোধ হইল যেন এখনও অশরীরীর অট্টহাস্য এই অন্ধকার কক্ষগুলিতে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। আমি ত্বরায় সে স্থান হইতে

প্রস্থান করিলাম। উপরে উঠিয়া রেসিডেন্সী মিউজিয়াম গৃহে (Residency Museum) গমন করিলাম। একটি প্রকাণ্ড হল্ (Hall) চতুর্দ্দিকে সিপাহীবিদ্রোহের নানারূপ ছবি ঘরের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। একপার্শ্বে বর্ত্তমান সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর স্বহস্তে লিখিত নিজ নিজ নাম একখণ্ড কাগজে বাঁধাইয়া অতি যত্নপূর্ব্বক রাখা হইয়াছে। মধ্যস্থলে একটি কাচের আলমারিতে (Show Case) কাপ্তেন মোরে (Capt. Moray) কর্ত্তৃক লক্ষ্ণৌ অবরোধের একটি প্রকাণ্ড ম্যাপ। তাহাতে অবরোধকারী এবং অবরুদ্ধ দল—এই উভয় পক্ষেরই স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বেলিগার্ড এবং বাহিরের যুদ্ধস্থলের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগের একটি সুন্দর প্রতিলিপি অঙ্কিত করা রহিয়াছে। সেখানি এত সুন্দর যে দেখিলে সজীব যুদ্ধক্ষেত্রের চিত্র দেখিতেছি বলিয়াই মনে হয়। একপার্শ্বে

বেলিগার্ড গেট।

যুদ্ধে ব্যবহৃত তলোয়ার প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র স্তূপীকৃত রহিয়াছে।

অদূরে যুদ্ধে নিহত ইংরাজের নীরব শোকস্তম্ভগুলি, শ্যামচ্ছায়াস্নিগ্ধ লতাপুষ্পমণ্ডিত সমাধিউদ্যানের মধ্যে দাঁড়াইয়া দর্শকগণকে সেই অতীত যুদ্ধের চিরস্মরণীয় দিনগুলি এক মুহূর্ত্তে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। কিন্তু হায়! সেগুলি আমাদিগের (Natives) পক্ষে Forbidden Area অর্থাৎ সে স্থানে আমাদের যাইবার অধিকার নাই। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, আমার গাইডকে যথাসম্ভব সন্তুষ্ট করিয়া বেলিগার্ডের নিকট হইতে বিদায় লইলাম। তখন প্রায় সন্ধ্যা। নিম্নে গোমতীর তীরস্থিত দীপগুলি একে একে জ্বলিয়া উঠিতেছিল আর পরপার হইতে মৃদুমন্দ সান্ধ্য সমীরণে ইমন কল্যাণের মধুর গম্ভীর সুর ভাসিয়া আসিতেছিল।

শ্রীঅমলচন্দ্র দত্ত।

মিরজা ইটেসাম্ উদ্দিনের ইংলণ্ড ভ্রমণ

(খৃঃ ১৭৬৫-৬৮)

১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদের সন্ধি স্থাপিত হইল। শাহ আলম তখন দিল্লীর অধীশ্বর। এই সন্ধির ফলে লর্ড ক্লাইব দিল্লীশ্বরের নিকট ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জন্য বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানীপদ আদায় করিয়া লইলেন। দিল্লীর চতুর্দ্দিকে তখন শত্রু। দিল্লীশ্বরের ক্ষমতাও তখন মুষ্টিমেয় হইয়া আসিয়াছে—শীতের বৃক্ষপত্রের ন্যায় তাহা প্রাণহীন জীর্ণ, সামান্য বাতাসেই ঝরিয়া পড়িবার মত। এদিকে আবার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দেওয়ানীপদ দেওয়াতে দিল্লীশ্বরের অবস্থা আরো সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। ক্লাইব যখন দেওয়ানীপদ লইয়া বাংলায় ফিরিবার জন্য সম্রাটের কাছে বিদায় লইতে আসিলেন তখন শাহ আলম প্রমাদ গণিলেন। তিনি অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে ক্লাইবকে বলিলেন, "আপনার সমস্ত সৈন্য লইয়া আপনি ফিরিয়া চলিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে শত্রুরা এখনি আমার উপর আসিয়া পড়িবে। আপনার সৈন্যগণ কাছে ছিল বলিয়াই তাহারা এতদিন আমাকে কিছু বলে নাই। এ অবস্থায় কি করিয়া দিল্লীতে রাজত্ব করিব?"

ক্লাইব তখন বলিলেন, "ইংলণ্ডের রাজা ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অনুমতি ব্যতীত আপনার সাহায্যের জন্য আপনার কাছে ইংরেজ সৈন্য রাখা আমার পক্ষে অসম্ভব। আপনি যদি ইচ্ছা করেন তাহা হইলে সমস্ত ঘটনা আমাদের রাজার কাছে উপস্থিত করিতে পারি, তিনি যেরূপ আদেশ করিবেন পরে তাহাই করিব।"

দিল্লীশ্বর অগত্যা ইহাতে স্বীকৃত হইলেন। তাঁহার সাহায্যার্থ একদল ইংরেজ সৈন্য দিল্লীতে রাখিবার জন্য ইংলণ্ডরাজের অনুমতি চাহিয়া শীঘ্রই এক সুদীর্ঘ আবেদন পত্র লিখিত হইল। কাপ্তান এস্ এই পত্র লইয়া ইংলণ্ড রওনা হইলেন এবং তাঁহার মুন্সী বা কেরাণী মিরজা ইটেসাম উদ্দিনও তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। এই মিরজা সাহেব ডায়েরীতে তাঁহার যে ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের তৎকালীন অবস্থার কিঞ্চিৎ ইতিহাস আমরা পাই।

মরিশসে মিরজা সাহেব কতকগুলি ভারতীয় ক্রীতদাস দেখিতে পাইলেন। সেই সময় ইহাদের প্রত্যেককে সেখানে ৬০ টাকা মূল্যে বিক্রয় করা হইত। সেই স্থানের ধনী অধিবাসীরা বঙ্গদেশ হইতে আনীত চাল ও গম খাইয়া প্রাণধারণ করিত। বাজারে আম, তরমুজ, শসা, ইত্যাদি বঙ্গদেশের নানা প্রকার ফল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত। এই দ্বীপ সম্বন্ধে তিনি এক অদ্ভুত গল্প শুনিতে পান। মরিশস্ প্রথমে পর্ত্তুগীজদিগের অধিকৃত ছিল কিন্তু এই দ্বীপ সর্পপূর্ণ থাকায় তাহারা বাস করিতে না পারিয়া ফরাসীদিগকে ইহা দিয়া ফেলে। ফরাসী সাপুড়িয়াগণ এক প্রকার আশ্চর্য্য মোহিনী শক্তি দ্বারা এই সাপগুলি একত্রিত

করে ও অবশেষে একটি নৌকায় তুলিয়া ছয় মাইল দূরবর্ত্তী এক ছোট দ্বীপে ফেলিয়া আসে। সেই অবধি মরিশস দ্বীপ মনুষ্যবাসের উপযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রবাদটি আমাদের মিরজা সাহেব বিশ্বাস করিতে পারেন নাই।

অতঃপর তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ টাউনে অবতরণ করেন। সেখানে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, হটেন্‌টট্‌গণ শীকারে অতিশয় পটু এবং তাহারা এত দ্রুত চলিতে পারে যে বন্য শূকর ইত্যাদি শীকার করাও তাহাদের পক্ষে অতি সহজসাধ্য। এক অদ্ভুত উপায়ে তাহারা হাতী ধরিত। যেখান দিয়া হাতী চলাফেরা করিত সেই সব জায়গায় তাহারা বড় বড় গর্ত্ত করিয়া রাখিত এবং হাতীর দল দেখিলেই উহাদিগকে সেই দিকে তাড়াইয়া আনিত। কাজেই উহারা ঐ সকল গর্ত্ত মধ্যে পড়িয়া যাইত এবং কয়েকদিন অনাহারে থাকিয়া প্রাণত্যাগ করিত। তখন উহাদের দন্ত ও অস্থি তুলিয়া লইয়া বণিকদের কাছে বিক্রয় করা হইত।

যে কালের কথা লেখা হইতেছে তখন পর্ত্তুগীজ জলদস্যুরা বঙ্গদেশ হইতে বহু নরনারী ও শিশু চুরি করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় বিক্রয় করিত। মিরজা সাহেব ইহাদের অনেকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহারা মাতৃ ভাষা ভুলিয়া যাওয়াতে নানা প্রকার সঙ্কেত দ্বারা তাঁহাকে ইহাদের সহিত কথা বলিতে হইয়াছিল।

সেখান হইতে প্রায় একমাস পরে তাঁহারা এসেন্‌সন্ দ্বীপে উপস্থিত হন। এখানে তিনি এত বড় বড় কচ্ছপ দেখিতে পান যে তাহার ওজন কুড়িমনেরও অধিক।

তৎপর প্রায় এক পক্ষকাল ফ্রান্সে থাকিয়া, ডোভার অতিক্রম করিয়া লণ্ডনে উপনীত হন। লণ্ডন দেখিয়া তিনি একবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। লণ্ডন সম্বন্ধে তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন; "লণ্ডনের প্রশংসা আমি কিরূপে করিব? কারণ পৃথিবীর উপর এত বৃহৎ ও সুন্দর আর কিছুই নাই।"

যে উদ্দেশ্যে তিনি ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে তিনি কিছুই লিখিয়া যান নাই। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, হয়, সে সব বিষয় এত গোপনীয় যে তাহার বিবরণ কিছু লিখিয়া যাওয়া উচিত মনে করেন নাই, না হয়, এ সব বিষয়ে তাঁহার কোনো কিছু করিবারই ছিল না। তিনি যে সব বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাও অতি সাধারণ লোকের মত, পড়িলেই বুঝা যায়, লেখকের জ্ঞান ও শিক্ষা সামান্য। রাজপ্রাসাদ দেখিয়া তাঁহার মোটেই ভাল লাগে নাই। কিন্তু সেণ্ট জেম্‌স্ পার্ক্ নামক উদ্যান সম্বন্ধে তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন! "চতুর্দ্দিকে রৌপ্যকান্তি রমণীগণ ভ্রমণ করিতেছে এবং কোণে কোণে চিত্তহারিণীগণ নানা প্রকার মনোহর ভাবভঙ্গী করিয়া ঘুরিতেছে। তাহাদের সৌন্দর্য্যে ধরাকে স্বর্গে পরিণত করিয়াছে। স্বর্গও বুঝিবা এখানকার প্রেমিকদের সুখ ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া যায়। প্রেমিকগণ কোতোয়ালের কোনো ভয় রাখে না এবং তাহাদের ইচ্ছামত প্রণয়ীদের সহিত মিশিতেছে—ইত্যাদি।"

ইংরেজ চিত্রকরের সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া তিনি একটি গল্পের অবতারণা করিয়াছেন। বহুকাল পূর্ব্বে কোনো এক বিখ্যাত চিত্রকর

মানবের নানা অবস্থার ভাবভঙ্গিমা চিত্রে হুবহু অঙ্কিত করিতে পারিতেন বলিয়া যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। মানুষকে কষ্ট দিয়া মারিলে তাহার মুখে কিরূপ ভীষণ ভাব ফুটিয়া উঠে তাহা অঙ্কিত করিবার জন্য তিনি একদা এক দরিদ্র ব্যক্তিকে তাঁহার গোপন কুঠরীর ভিতর লইয়া গেলেন। সেখানে তাহাকে মদ দিয়া অজ্ঞান করিয়া দেয়ালের উপর স্থাপন পূর্ব্বক পেরেক দিয়া তাহার হাত পা দেয়ালের সহিত লাগাইয়া দিলেন। তারপর এক তীক্ষ্ণধার ছুরিকা দ্বারা তাহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। এই অবস্থায় মৃত্যুর কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে তাহার মুখে যে কষ্টের ভীষণ ভাব ও ভঙ্গিমা ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা তিনি অতি যথাযথ ভাবে অঙ্কিত করিয়া ফেলিলেন। সকলেই এই চিত্রের খুব প্রশংসা করিতে লাগিলেন কিন্তু কিছুদিন পরে এই হত্যার কথা প্রচার হইয়া পড়িল এবং বিচারে তাঁহার মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা হইল। ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলাইবার কিছু পূর্ব্বে তিনি এই বলিয়া তাহা সেদিনের জন্য স্থগিত রাখিতে অনুরোধ করিলেন যে, চিত্রটি এখনো সম্পূর্ণ হয় নাই, উহাতে আরো কিছু কিছু রঙ ফলাইতে হইবে। তৎপরে চিত্রটি তাঁহার কাছে আনীত হইলে তিনি উহার উপর কালি ঢালিয়া দিয়া সমস্ত নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। পার্শ্বস্থ লোকেরা চীৎকার করিয়া উঠিল, "হায়, হায়! কি সুন্দর জিনিষটাকে নষ্ট করিয়া ফেলিল।" তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে রাজার নিকট লইয়া যাওয়া হইল। রাজা ক্রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কেন এই সুন্দর চিত্রটি নষ্ট করিলে?" চিত্রকর উত্তর করিলেন, বহুকষ্টে ও পরিশ্রমে আমি এই চিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছিলাম; এখন ইহার জন্য যদি আমাকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয় তবে ইহা রক্ষা করিয়া আমার কি লাভ!" রাজা বলিলেন, "আমি যদি তোমাকে মৃত্যুদণ্ড হইতে রক্ষা করি তবে তুমি কি আবার চিত্রখানির পূর্ব্বের অবস্থা ফিরাইয়া আনিতে পারিবে?" চিত্রকর উত্তর করিল "নিশ্চয়ই।" চিত্রকর শীঘ্রই তাঁহার কথার সত্যতা প্রমাণ করিয়া দিলেন; রাজাও তাঁহার কথা পালন করিলেন।

মির্জ্জা সাহেব এই গল্পটি লিখিয়া এইরূপ টীকা করিয়াছেন;—'শিল্প, বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিদ্যা শিক্ষার যেখানে সমাদর ও উৎসাহদাতা আছে সেখানে এ সকল বিদ্যার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী; এবং সেখানে একটি চিত্রের জন্য লক্ষটাকা দান বা নরহন্তাকে মুক্তিদান একটুকও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু ভারতবর্ষে যদি কেহ শিক্ষা ও দীক্ষা দ্বারা সমস্ত মানব জাতিকেও অতিক্রম করিয়া উঠে তথাপি লোকে তাঁহার মর্য্যাদা বুঝিবে না; সে সম্মান বা খ্যাতি লাভ করিবে না এবং অবশেষে দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে তাহার জীবন লীলা সাঙ্গ করিতে হইবে।

ইংলণ্ড ও ভারতের সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তিদের সম্বন্ধে তিনি এইরূপ লিখিয়াছেনঃ—ভারতবর্ষের মত এখানকার পদস্থ ব্যক্তিগণ,—এমন কি রাজপুত্রগণও এক বা দুই মাইল হাঁটিয়া যাওয়া মোটেই অপমানের কাজ বলিয়া মনে করেন না। হাতে একখানা ছড়ি লইয়া সাধারণ পোষাকে তাঁহারা রাজপথে বা

বাজারে স্বচ্ছন্দচিত্তে হাঁটিয়া বেড়ান। এ বিষয়ে তাঁহারা আমাদের দেশের রাজা বা ধনীব্যক্তিগণ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। নকীব, চোপদার, সওয়ার প্রভৃতি দ্বারা পরিবৃত হইয়া রাস্তায় বাহির হওয়াকে তাঁহারা লজ্জাস্কর ও নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ বলিয়া মনে করেন। আমাদের দেশের ধনী লোকেরা এরূপ আড়ম্বরপ্রিয় নির্ব্বোধ বলিয়া ইহাঁরা আমাকে বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, যদি তাঁহাদের দেশের কেহ এইরূপ জাঁকজমক কবিয়া পথে বাহির হয় তাহা হইলে বালকেরা হাতাতালি দিয়া তাহাদিগকে ঠাট্টা করিবে ও তাঁহাদের উপর ঢিল ছুড়িবে।

ইংলণ্ডের শুল্কবিভাগের কার্য্যতৎপরতা দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন; ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানির জাহাজ যখন ইংলণ্ডে আসিয়া পৌঁছে তখন তাহাদিগকে কোন শুল্ক দিতে হয় না। কিন্তু যাত্রীদিগের প্রত্যেক জিনিস তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজা হয়। ভারতবর্ষ হইতে আনীত বস্ত্র, পশম, বা আফিম প্রভৃতি কোন জিনিষই বিনাশুল্কে জাহাজ হইতে উপরে তুলিতে দেওয়া হয় না। সে শুল্কও আবার নেহাৎ কম নয়। এমন কি, যাত্রীদিগের মধ্যে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ট্রাঙ্কেও যদি একখানা রেশমী রুমাল বা এক তোলা আফিম পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার সমস্ত জিনিষপত্রতো বাজেয়াপ্ত হইবেই, এ ছাড়া তাহাকে হয়তো চারি কি পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ড দিতে হইবে। আমার ট্রাঙ্কের ভিতর কয়েকখানা রুমাল ছিল এবং আমার সহযাত্রী মিসেস্ পীককের ট্রাঙ্কে একখানা মূল্যবান কাপড় ছিল। এই জন্য তাঁহার, কাপ্তান এসের ও আমার সমস্ত জিনিষপত্র বাজেয়াপ্ত হইল। আদালতে ইহার বিচার হইয়া মাসাধিক কাল পরে প্রমাণীত হইল যে শুল্ক বিভাগের জনৈক কর্ম্মচারী মদের নেশায় মিসেস্ পীককের প্রতি অভদ্রোচিত ব্যবহার করিয়াছিলেন। এই জন্য ক্ষতিপূরণস্বরূপ তাঁহদের সমস্ত জিনিষপত্র ফেরত দেওয়া হইল। এবং আমার রুমালগুলি সম্বন্ধে এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইলাম যে, "ইহা অতি সামান্য দ্রব্য এবং এগুলি এখানে বিক্রয়ের জন্য আনীত হয় নাই। এই মুন্সী একজন হিন্দুস্থানী ব্যক্তি তিনি কখনো ইংলণ্ডে আসেন নাই, কাজেই এখানকার রীতিনীতিও তাঁহার জানা নাই। সুতরাং আমরা তাঁহাব অপরাধ ক্ষমা করিলাম।"

ইংলণ্ডে তিনি নানাপ্রকার ভারতীয় ও পাবস্যদেশীয় ফুল দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি বলেন, ইংলণ্ডের গোলাপ অন্যান্য দেশের গোলাপের চেয়ে অনেক বড়। তিনি ইংলণ্ডের সমস্ত ভূমিতেই শস্যাদি উৎপন্ন হইতে দেখিয়াছেন; এমন কি তাঁহার ভ্রমণকালে একখানাও অকর্ষিত ভূমি দেখিতে পান নাই।

শ্রীহেমচন্দ্র বক্সী।

(৩৪)

কলিকাতার এক বড় রাস্তার উপরে একটি ত্রিতল অট্টালিকার দ্বিতীয় তলস্থ সুসজ্জিত কক্ষে গৃহস্বামীর কন্যা শিক্ষকের নিকটে পাঠাভ্যাস করিতেছিল। সুকেশী সুবেণী বালিকাটি গঠন সৌকুমার্য্যে, বর্ণ উজ্জ্বলতায়, সর্ব্বোপরি একটি কমনীয় সরলশ্রীতে সকলেরই নয়ন মন আকর্ষণ করে। মাষ্টার বই খুলিয়া আজিকাব পাঠ্য পাঠ করিতে আদেশ করিলেন,—ছাত্রী পড়িল "কতোকগুলি বৃক্ষের ছালে আমাদের অনেক উপকার হয়। স্পেনদেশে কর্ক নামে একপ্রকার বৃক্ষ জন্মে। তাহার বল্কল এরূপ স্থুল,'—হ্যাঁ মাষ্টারমশাই বল্কল কি রকম? গাছের ছাল যে বল্লেন, তাহলে রাম, লক্ষ্মণ কেমন করে বাকল পরেছিলেন? মানুষে কক্ষণো গাছের ছাল পরতে পারে না।"

"কোন কোন গাছের ছাল নরমও হয় কিনা; আচ্ছা বল দেখি স্পেনদেশ কোথায়?"

"কেন আফ্রিকায়? সেইখানেই তো খুব বীর একটা জাত (স্পার্টান্ বুঝি?) জন্মেছিল, তারা—"

"নাঃ, স্পার্টান্‌রা তো স্পেন দেশে জন্মায় নাই, তারা গ্রীসদেশের অধিবাসী ছিল। কাল যে ম্যাপে ভাল করেই দেখিয়ে দিলুম স্পেনদেশ ইউরোপে। বৃক্ষ কাকে বলে?"

"তা বলে এটা আর ভুল হবেনা,—বৃক্ষ মানে গাছ।"

"ঠিক! আচ্ছা স্থূল মানে কি?"

"গোলমাল"। "গোলমাল?"

"হ্যাঁ, লোকে যে বলে হুলস্থূল! হলোনা?"

মাষ্টার ইন্দুভূষণ হাসিল, "এতটা কল্পনা শক্তি না যোগকরে শুধু একটু মনোযোগ দিয়ে শুনলেই যে আমি বাঁচি। আচ্ছা তৈমুরলঙ্গ কোন দেশ থেকে ভারতবর্ষে এসেছিলেন বল দেখি?" "তুরস্ক"।

"না, ভেবে বলো"।

"আফ্‌গানিস্থান? তবে আমি জানিনে, মাগো মা অত কি মনে করে রাখা যায়?"

"কেন যাবে না সবাই তো রাখে, মন দিলে তুমিও পারো, বই দেখে নাও ভাল করে।" ছাত্রী পুস্তকে বারেক দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া পরক্ষণেই তাহা মুড়িয়া বলিল,—

"বাবাকে বলবো আমি আর পড়তে পারব না, কত আর শিখব। কক্ষণো পড়ব না।"

"কেন গৌরী পড়বে না?"

"আমার ভাল পড়া হয় না, মনে থাকে না।"

"নাই থাক, এমনই করে পড়ো।"

"তাতে আপনি রাগ করেন যে!"

"আমি কি কখনও তোমায় এর জন্য বকেছি?" ছাত্রী একটু চিন্তা করিয়া কহিল "না, কিন্তু আপনার মনে মনে রাগ হয় আমি বুঝতে পারি, সেদিন যে "ফল," না না "ফুল" বলতে বলতে চুপ করে গেলেন, "ফুল" মানে কি মাষ্টার মশাই?"

অনুশোচনার লজ্জায় মাষ্টার মুখ নত করিলেন, ঈষৎ মৃদু স্বরে উত্তর করিলেন "নির্ব্বোধ। তোমার সকল সময় তো বেশ বুদ্ধি, পড়ার সময় মনে থাকে না কেন?"

"আচ্ছা নির্ব্বোধকে 'ফুল' কেন বলে? ফুলের মত নড়তে চড়তে পারে না? আহা আমার চন্দ্রমল্লিকা গুলি সব মরে গ্যাছে, ঝুমকালতাটাও মরমর।"

"ইন্দুভূষণ! তোমার কাজ শেষ হলে আমার সঙ্গে একবার লাইব্রেরি ঘরে দেখা করে যেও।"

এই বলিয়া গৃহস্বামী কন্যার পাঠাগারের দ্বারের নিকট দাঁড়াইলেন। বলা বাহুল্য এই বালিকা ছাত্রী গৌরী এবং এগৃহের অধিস্বামী তাহার পিতা নন্দকিশোর। পিতার সাড়া পাইয়া গৌরী বই ফেলিয়া উঠিয়া ডাকিল "বাবা!" নন্দকিশোর গৃহে প্রবেশ করিলেন। "আজ বাগানে বেড়াতে যাবে? আমি আর পড়তে পারিনে বাবা, আজ ছুটী দিতে বলে দাও।"

গৌরী তাহার পৃষ্ঠলম্বিত বেণী দুলাইয়া গোলাপ অধর ঈষৎ ফুলাইয়া পিতার মুখের দিকে আব্দারের সহিত চাহিল, পিতা কহিলেন "ইন্দুভূষণ আজ ওর ছুটী হোক্।" শিক্ষক বিষণ্ণমুখে মস্তক সঞ্চালন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এ ঘটনা আকস্মিক নহে, নিত্যকার, তবু মনে একটা ব্যথা লাগে। ছাইভস্ম যাহাই কেন ছাত্রী পড়িয়া যান্ দুইঘণ্টা তিনচার ঘণ্টায় পরিণত হইলেও সম্মুখস্থ ঘড়িটার উপর শিক্ষকের নজর পড়ে না। জগতে যত মানুষ তাহাদের খেয়ালও তেমনই বিভিন্ন। এই এম এ ক্লাশের দরিদ্র ছাত্রটি প্রথম যখন গৃহশিক্ষকের পদগ্রহণ করে তখন সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই যে প্রথম দিন তাহাকে যাহার সঙ্গ সঙ্কোচে পীড়িত করিয়া তুলিয়াছিল, দুদিন না যাইতে তাহারই শিশুর মত সরল, ফুলের মত কোমল মধুর ভাবটুকু মায়াযষ্টির মত তাহার চিত্তকে এমন অভিভূত করিয়া ফেলিবে। এখন ছুটীর দিন ইন্দুভূষণের শাস্তি বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু এই যে সে নিজের হৃদয়ে এই ধনী দুহিতার প্রতি একটা প্রবল আকর্ষণের বেগ অনুভব করিতেছিল, মাধ্যাকর্ষণের মত নিজের কক্ষেই তাহা স্থির থাকে সীমাতিক্রম করে না। সে মাঝে মাঝে ছাত্রীর নবরবিকিরণ-মণ্ডিত ঝলমলে, শিশির বিন্দুটির মত কৈশোর মাধুর্য্যে মণ্ডিত মুখখানির উপরে তাহার চোখের সশঙ্কিত দৃষ্টি রাখিয়া একটি মধুরবুলি তোতাপাখীকে ভালবাসিয়া বালকের যে সুখ সেইরূপ একটা আনন্দ লাভ করিত মাত্র।

ছুটী শুনিয়া গৌরী প্রায় লাফাইয়া কেদারা ত্যাগ করিল "বাঁচাগেল, বাবা এসো,—তোমায় আমার সাদা খরগোষের বাচ্চাগুলি দেখাই গে, এই সেদিন কিনে দিয়েছ এরই মধ্যে কত বড় হয়ে গেল দেখবে এসোনা। মাগো, মাষ্টার মশাইকে নাম ধরে বলা হয়নি অমনি চলে যাচ্ছেন, আপনিও আসুন না—"

পিতার হাত ধরিয়া সে তাঁহাকে প্রায় টানিয়া লইয়া চলিল, অগত্যা ইন্দুভূষণও তাহাদের অনুসরণ করিল।

যে বাড়ী এক সময় পরিত্যক্ত পুরীর মত

নিস্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, আজ এই একটি বালিকার আগমনে বসন্তাগমে পক্ষীকলকুজনের ন্যায় ইহার প্রতিগৃহ থাকিয়া থাকিয়া কলহাস্য নূপুরনিক্কনে, উচ্চ কণ্ঠস্বরে মুখরিত হইয়া উঠিতেছিল। আবার চারুবনস্থলী ঋতুরাজ পদস্পর্শে অভিনবশ্রী ধারণ করিয়াই শুধু নিশ্চিন্ত ছিল না পুষ্পে মধু সঞ্চারের ন্যায় অলক্ষ্যে ইহার মধ্যে বসন্তবিভবও প্রদান করিতেছিল। নন্দকিশোরের শুষ্কচিত্ত বর্ষার বন্যার ন্যায় কূলবিপ্লবী সলিলস্রোতপ্রান্তে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে, যৌবনের আশাহত নিরানন্দচিত্ত অপরাহ্ণের দিকে জগদানন্দ আলোকের সন্ধান পাইয়াছিল। তাঁহার সুখের সীমা নাই।

সময়ের চেয়ে পরিবর্ত্তনকারী জগতে আর কাহাকেও দেখা যায় না। গৌরীর ক্ষুদ্র হৃদয়মধ্যেও ইহার কার্য্য স্থগিদ ছিল না। আকর্ষণ প্রত্যাকর্ষণ না করিয়া স্থির থাকিতে অক্ষম, তাই—আর বোধহয় সম্বন্ধগুণেও সে তাহার পূর্ব্ব বিদ্রোহ পরিত্যাগ করিয়া পিতাকে অনেকখানি ভালবাসা প্রদান করিয়াছিল। তাহার চিত্তসমুদ্রের অতল তলে এখনও তাহার পূর্ব্বস্মৃতির রত্নসম্ভার আদরে সঞ্চিত থাকিলেও উপরে নীলাম্বুরাশি সলিলবর্ষণকারী মেঘেরই ছায়া ধারণ করিয়াছে। সে যতই বালিকা হোক্ অনভিজ্ঞা হোক পিতৃহৃদয়ের বেগব্যাকুল স্নেহধারার গভীরতা প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্ময় বোধ না করিয়া থাকিতে পারে নাই, তাই ইহার একটা সূক্ষ্মযোগ তাহারও চিত্তকে নির্ঝরের সবেগধারার মত এইখানে বহিয়া আনিয়াছিল। সে তাঁহার কণ্ঠলগ্ন হইয়া তাঁহার সকল শরীরে সুখানুভূতির তাড়িৎ-প্রবাহ ছুটাইয়া কহিয়াছিল "বাবা, আমি তোমার খুব ভালবেসেছি।"

দিন সুখেই কাটিতেছিল। গৌরীর মনের উপর হইতে আজকাল বলিতে গেলে দুঃখের ছায়াখানা একেবারেই সরিয়া গিয়া তাহার পূর্ব্বস্বভাব ফিরাইয়া আনিয়াছে। গল্পে, ভ্রমণে, দুজনকে অবলম্বন করিয়া দুইজনার জীবন আশ্রয়তরু ও আশ্রিতলতার মত একসঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল। নন্দকিশোর ইদানীং তাহাকে 'সত্যদা'র উপরে অনেকখানি উদাসীন দেখিয়া মনের মধ্যে একপ্রকার স্বস্তি বোধ করিতেছিলেন। কন্যার মুখের চিন্তারেখাহীন সরলহাস্য তাঁহার চিত্তে আশ্বস্ত আনন্দ ছড়াইয়া দিয়াছিল, সে তাঁহারই, একমাত্র তাঁহার বক্ষনীড়েই সে বাসা বাঁধিয়াছে ;—কেন বাঁধিবে না? অন্য কাহারও তাহার উপর কিসের অধিকার?

কিন্তু বেশিদিন এ স্বার্থসজ্ঘাতে নিজের দিকটাকে বাঁচাইয়া রাখা চলিল না, দেশাচার, লোকাচার শতমুখে তিরস্কার করিয়া স্মরণ করাইয়া দিল ত্রয়োদশ উত্তীর্ণা কন্যাকে শীঘ্র পাত্রস্থ না করিলে চতুর্দ্দশ পুরুষের ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নাবতরণ অনিবার্য্য। অনেক ভাবিয়া, খুঁজিয়া, একটি মনের মত পাত্র পাওয়া গেল, ছেলেটির দারিদ্র্যখ্যাতি তাহার বিদ্যাবুদ্ধি যশঃসৌরভেরও ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছিল। বলাবাহুল্য এই নির্ব্বাচিত পাত্রটিই আমাদের পরিচিত গৃহশিক্ষক ইন্দুভূষণ।

সেদিন ইন্দু গৃহস্বামীর আদেশমত

বিদায়ের পূর্ব্বে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। ছাত্রীর টবের গাছের মাটি নিড়াইয়া দিতে অনুরুদ্ধ হওয়ায় নন্দকিশোরের সহিত ইতিপূর্ব্বে সে বিদায় লইতে পারে নাই।

গ্রীষ্ম অপরাহ্নের রৌদ্র তখনও বেশ উজ্জ্বল রহিয়াছে, জানালার সার্সির উপর দিয়া ক্রমে ছায়া ঘরের মধ্যে অবতরণ করিতেছিল, কিন্তু ছাদের কার্ণিসের উপর অংশে কাচের প্রতিবিম্ব ইন্দ্রধনুর বর্ণ সমাবেশ করিয়াছে। ইন্দুভূষণ গিয়া দেখিলেন, একখানা আরাম কেদারার উপর হেলিয়া নন্দকিশোর একখানা চিকিৎসা গ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন, পুস্তক রাখিয়া উঠিয়া বসিলেন, চোখ হইতে চশমা খুলিতে খুলিতে হস্ত দ্বারা নিকটস্থ চৌকিখানা নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন "বসো"।

ইন্দ্রভূষণ নীরবে আদেশ প্রতীক্ষা করিয়া মনে মনে উদ্বিগ্ন হইতে লাগিল। সে আজ তাঁহার ব্যবহারে কিছু বিস্মিত হইয়াছে, তাহা স্বাভাবিক অপেক্ষাও কোমল, সমধিক স্নেহপূর্ণ! ইহা কি কোন দুঃসংবাদের সূচনা!

নন্দকিশোর কহিলেন "তোমার অবস্থাও ভাল নয়, এবং অভিভাবক সেরূপ কেহই নাই, এ অবস্থায় বি-এল, পাশ না করে তুমি ডাক্তারি পড় নাই কেন? কিছু সুবিধা হতে পারত তো?"

ইন্দু বুঝিল এটা কথা পাড়িবার একটা অবান্তর সূত্র—মূলের সহিত সংশ্লিষ্ট নয়, সবিনয়ে কহিল "ডাক্তারি পড়ায় খরচ বেশি তাই সাহস করি নাই, স্কলারশিপের টাকা কয়টিই ভরসা ছিল।"

"পাশ করে কি করবে স্থির করেছ? ওকালতি?"

"আমাদের মত অবস্থার লোকের পক্ষে ওকালতি—"

"যদি তোমার এ অবস্থা পরিবর্ত্তিত হয়, তাহলে?"

ইন্দুভূষণ কিছু না বুঝিয়া প্রশ্নকর্ত্তার মুখের দিকে চাহিল, বিস্ময়ের কারণ বুঝিয়া নন্দকিশোর কথাটা একটু ফিরাইয়া লইলেন "গৌরীকে তোমার কেমন মনে হয়? লোকে তাকে পাগল বলে সেটা—"

ইন্দুভূষণের সব দ্বিধা ঘুচিয়া গেল সে সবেগে কহিয়া উঠিল "না না, পাগল কেন, অত্যন্ত, অতি চমৎকার মেয়ে।"

নন্দকিশোর ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া পরে সোৎসুক্যে তাহার ঈষদুত্তেজিত মুখের দিকে চাহিয়া কহিয়া উঠিলেন "তুমি তাকে নিয়ে আমার পুত্র স্থানীয় হও, আমার কাছে থাক, এই আমার ইচ্ছা। এই জন্যই আমি তোমায় তাকে চেনবার ভার দিয়েছিলাম, হঠাৎ একদিন দেখে তাকে না বুঝে পাছে তার প্রতি অবিচার করো এই ভয়। তোমার আপত্তি নাই?"

চাঁদ যদি নিজে পৃথিবীর বক্ষে নামিয়া আসেন, পৃথিবী কি তাঁহার আতিথ্যকুণ্ঠিত হইবেন?

(৩৫)

পরদিন নিয়মিত সময়ে পড়াইতে আসিয়া মাষ্টার দেখিলেন ছাত্রী তখনও পাঠ গৃহে অনুপস্থিত, পড়িবার টেবিলের উপর মোটা খাতায় বড় বড় আঁকাবাঁকা বিবিধ ছাঁদের অক্ষরে তাহার দৈনিক হস্ত লিপিগুলা শুধু পড়িয়া আছে। পুস্তকগুলা মসিলিপ্ত, ছিন্নার্দ্ধ মূর্ত্তি লইয়া শুভ্র আস্তরণের উপর

বিচিত্র শোভা বিস্তার করিয়া অধিকারিণীর প্রতীক্ষা করিতেছে। ইন্দুভূষণ একবার জানালার নিকট গিয়া কর্ম্মকোলাহলক্লান্ত রাজপথে চাহিয়া দেখিল তার পর ফিরিয়া টেবিলের নিকট স্বস্থান গ্রহণ-পূর্ব্বক ভাবিতে লাগিল। সহসা গৌরী গৃহে আগমনপূর্ব্বক সহাস্যে কহিল,—

"আপনি এসেছেন? আমি জান্‌তে পারিনি তো। আজ একটা চন্ননা কিনেছি কি না সেইটেকে খাওয়াচ্ছিলাম, অনেকক্ষণ এসেছেন? ডাকেন নি কেন?

ইন্দুভূষণের মনে হইল এ কণ্ঠ অন্য দিনাপেক্ষা যেন অনেক কোমল, মধুর রসসিক্ত। সে কহিল, "হ্যাঁ,—না অনেকক্ষণ তেমন নয়।" ছাত্রী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল "হাঁ, না কি মাষ্টার মশাই?—আপনার ছাতাটা বুঝি চুরি গেছে? তাই এই নূতন ছাতাখানা কিনেচেন বেশ হাতলটি তো? মাষ্টারমশাই জুতোটা, ওতো নতুন? ও-মা, সবই যে দেখ্‌চি নতুন জিনিষ! কেন মাষ্টার মশাই? নেমন্তন্ন খেতে যাবেন?" মাষ্টার ছাত্রীর এই সকল পর্য্যবেক্ষণের ফলে অকস্মাৎ আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন,—তবে কি তাঁহার সাজসজ্জাটা এমনই লক্ষ্যের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে! সহসা এই চারিমাস পরে আজই যে প্রথমে নিজের ছিন্ন মলিন বেশ তাহাকে একান্ত ব্যথিত ক্লিষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল সে কি করিবে? ইন্দুভূষণ বিব্রত ভাবে কথা চাপা দিবার অভিপ্রায়ে বলিয়া উঠিল "আজ তবে তুমি পড়বে না?"

"বাঃ আমি যেন তাই বলেচি? ঘরে পাখা চলচে তবু আপনি কত ঘামচেন, মুখটা রাঙ্গা হয়ে গ্যাছে, বুঝিছি বুঝিছি আপনাদের আজ ম্যাচ আছে এখনি যেতে হবে না?"

"না। তোমার ইতিহাস মুখস্ত দাও।"

"১৬১৮ খৃষ্টাব্দে ইব্রাহিম খাঁ বাঙ্গলার সুবাদার ছিলেন। তাঁহার শাসনকালে বঙ্গদেশে—ইংরাজেরা—যাঃ ভুলে গেছি। কতদিন আর পড়তে হবে মাষ্টার মশাই"?

"গৌরি!"

"কি মাষ্টার মশাই?"

"আমি যদি বলি আর তোমাকে পড়তে হবে না?"

"তা কি বাবা শুন্‌বেন? বাবা বলেন লেখাপড়া শেখা বড় ভাল'।"

"যদি শোনেন?"

"তাহলে আমার বড় আহ্লাদ হবে।"

"শুধুই আহ্লাদ হলে তো হবে না, কি দেবে বলো?"

"আপনাকে?"—গৌরী ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া অবশেষে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "পুষুমণিকে দোব আর-এক খাঁচা মুনিয়া পাখী দোব।"

ইন্দুভূষণ মৃদু হাসিল "তাতে হবে না।" "আচ্ছা টিমি কুকুরটা তো নেবেন? ওটা কেমন সুন্দর, চোর টোরও তাড়াতে পারে, কত ভাল!"

মাষ্টার এই উত্তম পুরস্কারটির লোভও সম্বরণে সমর্থ হইলেন, পরে বলিলেন "গৌরি?" গৌরী হাসিয়া ফেলিল "আজ কেবলই আমায় ডাকচেন কেন? আমি কি কালা হয়েচি? কি চাই বলুন, না বলুন তা হবে না।"

ইন্দু অপ্রতিভ ভাবে মুখ নীচু করিল, তার পর সহসা মাথা তুলিয়া দ্রুত কণ্ঠে কহিয়া গেল "আমি এই টুকু শুনতে চাই গরীব বলে আমায় তুমি ভবিষ্যতে ঘৃণা অবহেলা করবে না ?"

গৌরী এই কথা শুনিয়া উচ্চ কণ্ঠে হাসিয়া উঠিল "ও মাগো এ কি কথা ? ঘৃণা কি করব ? গরীবকে বুঝি ঘৃণা করে ? দাদু বলেন তিনি গরীব, তাঁকে কেউ না কি ঘৃণা করে !"

"গৌরি, তোমার মত শিশুকে যে এসব ক্ষুদ্র আলোচনার মধ্যে জড়াতে চায় সে নিতান্ত পাষণ্ড ! না তোমার কাছে এ সব ছোট জিনিষ ঘেঁষতে পারে না, আমায় ক্ষমা করো। কত তপস্যায় আমি এ রত্নের অধিকারী হচ্চি ! তুমি যাতে সুখী হও আমি প্রাণপণে তাই করবো, অনাবিল শান্তি সুখে জীবন কেটে যাবে।"

কথাগুলা যেন হেঁয়ালির মত শুনাইল অর্থ বোধ হইল না, সে বিস্ময়ের সহিত দুই স্বচ্ছ সরল নেত্র বিস্তৃত করিয়া কহিল "কি বলচেন, কেতাবের কথা কি ?"

"কেতাব তো মানুষেই তৈরি করে। তোমার বাবা তোমায় কিছু বলেন নি ?" হঠাৎ একটা কথা বিদ্যুতের মত বিস্মরণের মধ্য হইতে জাগিয়া উঠিল, "ধেৎ" বলিয়া সবেগে বেণী দুলাইয়া সে মুখ লুকাইল। পিতা পূর্ব্ব রজনীতে একবারটি বলিয়া ছিলেন বটে "আচ্ছা ইন্দুর সঙ্গে যদি তোর বিয়ে দিই ?" সে সেখানেও যে উত্তর করিয়া ছিল এখানেও তাহাপেক্ষা কোন প্রভেদ দেখাইল না। টেবিলের সহিত মাথাটাকে এক করিয়া ফেলিয়া মুখখানা তাহারই অন্তরালে লুকাইয়া রাখিল। ইন্দুভূষণ স্মিত প্রসন্ন দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন।

"কিরে গৌরি, তোর পড়া হলো ?" বলিতে বলিতে তাহার অভিভাবিকা বৃদ্ধা গৃহে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার সাড়া পাইয়াই শিক্ষক ছাত্রী উভয়ে তটস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। মাষ্টার সন্মুখের পুস্তক খানার পাতা উল্‌টাইয়া প্রশ্ন করিলেন "প্রভঞ্জন কথাটার মানে কি ?" বলিতে বলিতে চকিতের মধ্যে একবার তাহার মুখের পানে চাহিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু কি ম্লান সে মুখ ! একি হাস্যময়ী গৌরী ! তাহার বক্ষে একটা অজ্ঞাত বেদনা বাজিল, কেন সে সহসা এরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল ?

অভিভাবিকা দূর সম্পর্কে গৌরীর পিতার পিতৃস্বসা সম্পর্কে ঠান্‌ দিদি, তিনি কহিলেন "ইন্দু তুমি তো ওকে এত করেও পড়াশোনায় তেমন উন্নতি করাতে পারলে না কাল থেকে একজন শিক্ষয়িত্রী স্থির করা হয়েচে ; তোমার ভাই চাকরীটি এবার গেল, তা যে নতুন কাজ পাচ্চো, ডবল প্রমোসন পেয়ে গেলে ;—তোমার ক্ষতি কিছু হবেনা—ওকি উঠে দাঁড়ালে কেন ? বসো বসো—"।

ইন্দুভূষণ মনের প্রফুল্লতা গোপন করিতে অক্ষম হইয়া আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল "না আর বসবোনা একটু কাজ আছে—" বলিতে বলিতে ছাতাটার দিকে লক্ষ্য না করিয়াই পলাইয়া গেল। গৌরী নতনেত্রে নিজের চরণাঙ্গুলি নিরীক্ষণ করিতেছিল। ইন্দুভূষণ চলিয়া গেলে

সহসা মুখ তুলিয়া ঠান্‌দির দিকে চাহিল; তিনি তাহাকে একটা ব্যঙ্গরসসিক্ত মধুর সম্ভাষণে ভাষিত করিতে যাইতেছিলেন, বাধা দিয়া মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে কহিয়া উঠিল "বাবাকে বলুন না আমি বিয়ে করবো না!"

ঠান্‌দিদি হাসিলেন "পাগল! আমি বল্লেই বা এমন অদ্ভুত কথা তিনি রাখবেন কেন? কেন বিয়ে করবিনে?"

"আমি জানিনা।"

"ইস্‌ বিয়ে কর্ব্বেন না, ন্যাকা মেয়ে! বিয়ে সবাই করে মেয়েমানুষ কি আইবড় থাকে।"

"তাহোক না—উনি মাষ্টারমশাই যে, ও কি রকম?"

"তাতে কি! স্বামীও তো গুরু,—ভালই হবে।" মুহূর্ত্তে হাসির কলতানে কক্ষ মুখর করিয়া বিষণ্ণা গৌরী ঠানদির কোলে লুটাইয়া পড়িল "গুরু, স্বামী গুরু! তাহলে আমাকে পা ধুইয়ে দিতে হবে? প্রণামী দিতে হবে, মাগো মা, এমন কথাও শুনিনি!"

নন্দকিশোরের কন্যার বিবাহসংবাদ দুদিনেই সুপ্রচারিত হইয়া পড়িল। সেকরা ও দোকানীপসারীর আনাগোনার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দুভূষণ বেচারার এ গৃহে আগমন বন্ধ হইল, আর তা ভাল দেখায় না। পাড়ার মেয়েরা জানালার পাখী তুলিয়া কাণাকানি করে। গৌরী যখন দেখিল বিবাহের দিন ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতেছে তখন সে একদিন স্থির করিয়া বসিল নিজেই সে পিতাকে বলিবে যে বিবাহ করিবে না। সে সেদিন স্কুলে গিয়া দেখিয়া আসিয়াছে সেখানে কত বড় বড় মেয়েরা আইবড় রহিয়াছে।

সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে সে দেখিল বাড়ীর সরকার একখানা বোঝাই গাড়ি হইতে নামাইয়া বড় বড় দুইটা ষ্টীল ট্রাঙ্ক, কতকগুলা রেশমী ও সুতী সাড়ি বাড়ীর ভিতর পাঠাইয়া দিতেছে। এদিকে ঠান্‌দিদি দশরথ চাকরকে ডাকিয়া আদেশ করিতেছেন "ওরে মালীকে টোপর সিঁথি ময়ূরের জন্য আজই বলে দে, ভুলটুল হলেই শেষে মুস্কিলে পড়তে হবে।" কন্যা গিয়া ডাকিল "বাবা!"

"মা!" নন্দকিশোর টেবিলের উপর হইতে একটা ভেলভেটের বাক্স তুলিয়া লইয়া তাহার আবরণ মোচনপূর্ব্বক কন্যার সম্মুখে ধরিলেন "তোমার হার পছন্দ হয়?" "বেশত! কত মুক্তো! ওগুলো কি হীরা? কি রকম চকচকে! একে কি বলে চুনি? বাবা?"

"কি মা? পর, আমি একবার দেখি মাকে আমার কেমন দেখায়।" গৌরী অগত্যা হার পরিল কিন্তু কিসের জন্য এ অলঙ্কার ইহা স্মরণে তাহার মনে উৎসাহ জন্মিতেছিল না। "বাবা আমি বিয়ে করব না"।

"সেকি কেন মা?" নন্দকিশোর চমকিয়া উঠিলেন "তা জানিনা, এমনি করবো না।" গৌরী নিজের মধ্যে একটা দুর্ব্বলতা অনুভব করিতেছিল কথা জড়াইয়া কান্না আসিল, কিন্তু জোর জুলুম আসিল না। পিতা সন্দিগ্ধচক্ষে দেখিতে দেখিতে স্নেহস্বরে কহিলেন "তাকি হয়, কেন তোমায়তো কোথাও যেতে হবেনা, তুমি সর্ব্বদা আমার কাছেই থাকবে।"

গৌরী নিরুত্তর হইয়া পড়িল।

(৩৬)

বিবাহ বাড়ীতে উৎসবের আয়োজন যতই অধিক আনন্দ সমারোহ জাগাইতেছিল পিতা পুত্রী উভয়ের মনের মধ্যে বেদনা ও উদ্বেগ ততই বর্দ্ধিত হইতেছিল। নন্দকিশোর এই বিবাহ উপলক্ষ্যে মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতেছিলেন, সামাজিক বিতরণ, দরিদ্র ভোজন, সৎকার্য্যের সহায়তায় দান হইতে আরম্ভ করিয়া দাসদাসীর মধ্যে বস্ত্রালঙ্কার বিতরণ, ভোক্ষ্য ভোজ্যের অপর্য্যাপ্তি আয়োজনে পাড়াপ্রতিবেশীর সন্তোষ বিধান—কিছুরই তিনি ক্রটি করেন নাই, তথাচ মনে একটা দুঃখের ভাব চাপিয়া তাঁহাকে ম্রিয়মাণ করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার চিত্তে পিতৃমাতৃহৃদয়ের স্বাভাবিক সূক্ষ্ম বেদনা, পরহস্তে সমর্পণের সুখজড়িত ব্যথা তো ছিলই, ইহার উপর গৌরীর পরিবর্ত্তন তাঁহার চিত্তে একটা প্রধান ভার হইয়া পড়িয়াছিল। সে যে সহসা এমন বদলাইয়া কেন গেল, এই সন্দেহ যেন তাঁহার প্রাণটাকে পাক দিয়া মোচড়াইতেছিল। হাসি নাই, স্ফূর্ত্তি নাই বীতস্পৃহ-বর্ষীয়সীর মত স্তব্ধ হইয়া থাকে, এ কি? একদিন মুখ ফুটিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার কি হয়েচে?"

"কিছু তো হয়নি—" বলিয়াই সে মুখ নত করিল, "আমার আবার হবে কি, বাবা?" বলিয়া তো তেমনি কলঝঙ্কারে হাসিয়া উঠিল না! কেন এমন হইল?

একদিন সন্ধ্যাকালে মধুর সুরে সানাই বাজিয়া পাড়াশুদ্ধ লোককে জানাইয়া দিল বিবাহ নিকটবর্ত্তী। রঙ্গীন কাপড়পরা দাসদাসীগণ কর্ম্মবাড়ী কোলাহলে সরগরম করিয়া তুলিল।

দক্ষিণের বারান্দায় রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া বিবাহের কনে নীচের উঠানে লোকজনের যাতায়াত দেখিতেছিল। অদূরে শকটচক্রমথিত, জনসঙ্ঘর্ষিত রাজপথ, তাহাতে বহুবিধ লোক জন, গাড়িঘোড়া; এবং টুং টাং শব্দে ঘণ্টা বাজাইয়া বিসর্পিতগতি ট্রামগুলা ঘড় ঘড় শব্দে কর্ণবধীর করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

গৌরী হস্তস্থিত বিলাতি ফুলটির রক্ত-পাপড়িগুলি নখরছিন্ন করিতে করিতে গ্যাসালোকে উদ্ভাসিত সাগরোর্ম্মিমালাতুল্য প্রসাদময়ী নগরীর পানে অনিমেষে চাহিয়াছিল। যে দিন এই দৃশ্য তাহার সরলনেত্রে বিস্ময়ের ছবি ফুটাইয়া তুলিয়াছিল আজ আর সেদিন নাই, আজ তাহারা তাহার এই স্বচ্ছ নেত্রদর্পণে ভাসিতেছে ভিতরে প্রতিফলিত হয় নাই, সে বস্তুর কিছুই দেখিতেছিল না, চাহিয়াছিল মাত্র। এমন সময় নন্দকিশোর চারিদিকে তাহার অনুসন্ধান করিয়া শেষে এইখানে আসিয়া ডাকিলেন "গৌরি?" গৌরী যেন একটু চমকিয়া উঠিল, তারপর কবরীবদ্ধ চুলের মধ্য হইতে যে গুচ্ছটা শিথিল হইয়া মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল সেটাকে বামহস্তে সরাইয়া মুখ ফিরাইল। নন্দকিশোর নিকটে আসিয়া তাহার মস্তকে একখানি হাত রাখিয়া সস্নেহে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি করচো মা! একলা কেন? একি কাঁদচো?" তিনি তাহার গণ্ডের অশ্রু বিন্দুটি দেখিতে

পাইয়াছিলেন। ব্যথিত হইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন মা ?"

গৌরী কথা কহিল না, কেবল একবার ছলছল চোখ তুলিয়া পিতার দিকে চাহিল, ক্ষুদ্র বুকখানা হইতে একটা আকুল নিশ্বাস বাহিরের ধূমভারাতুর বায়ুর মধ্যে মিলিত হইল, পুনশ্চ নতমুখে সে একটু দ্রুতহস্তে ঝালর দীর্ণ করিতে লাগিল। নন্দকিশোর অল্পক্ষণ তাহার বিষাদপূর্ণ মুখের উপর স্থিরচক্ষে চাহিয়া থাকিয়া পরে জোর করিয়া যেন দুর্ভাবনাটাকে পরিত্যাগের চেষ্টায় কহিলেন "দুজন কে কে এসেছেন বলো দেখি ?"

গৌরী জিজ্ঞাসার ভাবে চাহিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া প্রশ্ন করিল না যে কে ? তখন নন্দকিশোর আপনা হইতেই কহিলেন "তোমার মাসিমা আর সত্যেন্দ্র।"

"সত্যদা এসেছে ? এতদিন পরে এসেছে—"গভীর হর্ষোচ্ছাসের মাঝখানেই অকস্মাৎ বালিকা থামিয়া গেল। "কোথা যাচ্চো গৌরি, এসো সে নীচে আছে, দেখা করবে এসো, এখনি সে ফিরে যাবে।"

দেড় বৎসর পরে দুইজন বাল্য সঙ্গীর সাক্ষাৎ হইল। দুজনেই দুজনকে দেখিয়া মনে মনে যথেষ্ট বিস্ময় অনুভব করিল, দুজনেই ভাবিল 'চেনা যায় না, কি বদলে গেছে!' বহুক্ষণ নীরব পর্য্যবেক্ষণের পরে সত্যই প্রথম বাল্যসখীকে সম্বোধন করিল "ভাল আছ গৌরি ?"

"গৌরী, ভাল আছ ?" যেন কেতাবের ভদ্রতার কথা! তথাপি গৌরী হাসিবার এত বড় সুযোগ প্রত্যাখ্যান করিয়া নীরবে কেবল ঘাড় নাড়িল, কথা কহিতে পারিল না। চোখে কেবলই একটা জলের ঝাপ্সা রেখা আপনাকে ব্যক্ত করিতে চাহিতেছিল।

সত্য দেখিল, তাহার সখী শুধু মাথাতেই বাড়িয়া উঠে নাই সে স্বভাবেও অনেকখানি বড় হইয়া গিয়াছে। সে যে গাড়িতে বসিয়া এতক্ষণ ধরিয়া স্থির করিয়াছিল ছিপ বঁড়সি, আমচুরি লইয়া তাহার সহিত কি কি আলোচনা করিবে—সে সব কথা এই সুসজ্জিতা, সুন্দরী কিশোরীর সম্মুখে উত্থাপন করা আর সম্ভবপর হইল না। গৌরী আর সে গৌরী নাই। এত সুন্দরই বা সে কি করিয়া হইল! কই সে ত—"সত্যদা" বলিয়া ছুটিয়া কাছে আসিল না, গচ্ছিত দ্রব্য গুলার দাবী করিল না,—সেগুলা যে তাহারই অনবধানতায় খোয়া গিয়াছে ইহা জানাইয়া তাহাকে একটুকু তিরস্কারও করিল না। গৌরী এখন এত পর হইয়া গিয়াছে! তাহার সমস্ত হৃদয় বিদ্রোহিতার তাপে তাতিয়া উঠিল, চৌকীর নিকট দাঁড়াইয়া সেও পূর্ণ অবহেলার ভানে গৃহসজ্জা পরিদর্শনে মন দিল। ঈস্ মেয়ের বিয়ে হইতেছে সেইজন্য কিছুই গ্রাহ্য নাই।

গৌরী তাহার অভিমান বুঝিল না, সে যে তাহার প্রতি এত বড় অবিচার করিতেছে এ সম্বন্ধেও সে পূর্ণ অনভিজ্ঞ রহিয়া স্বেদ জলে অহেতুক ভিজিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু সেই ঘরেরই অপর প্রান্তে যিনি আলোকাধারের সম্মুখে বই খুলিয়া একজোড়া চশমার পরকলার মধ্য হইতে তাহাদের দিকে স্থির নেত্রে চাহিয়া ছিলেন

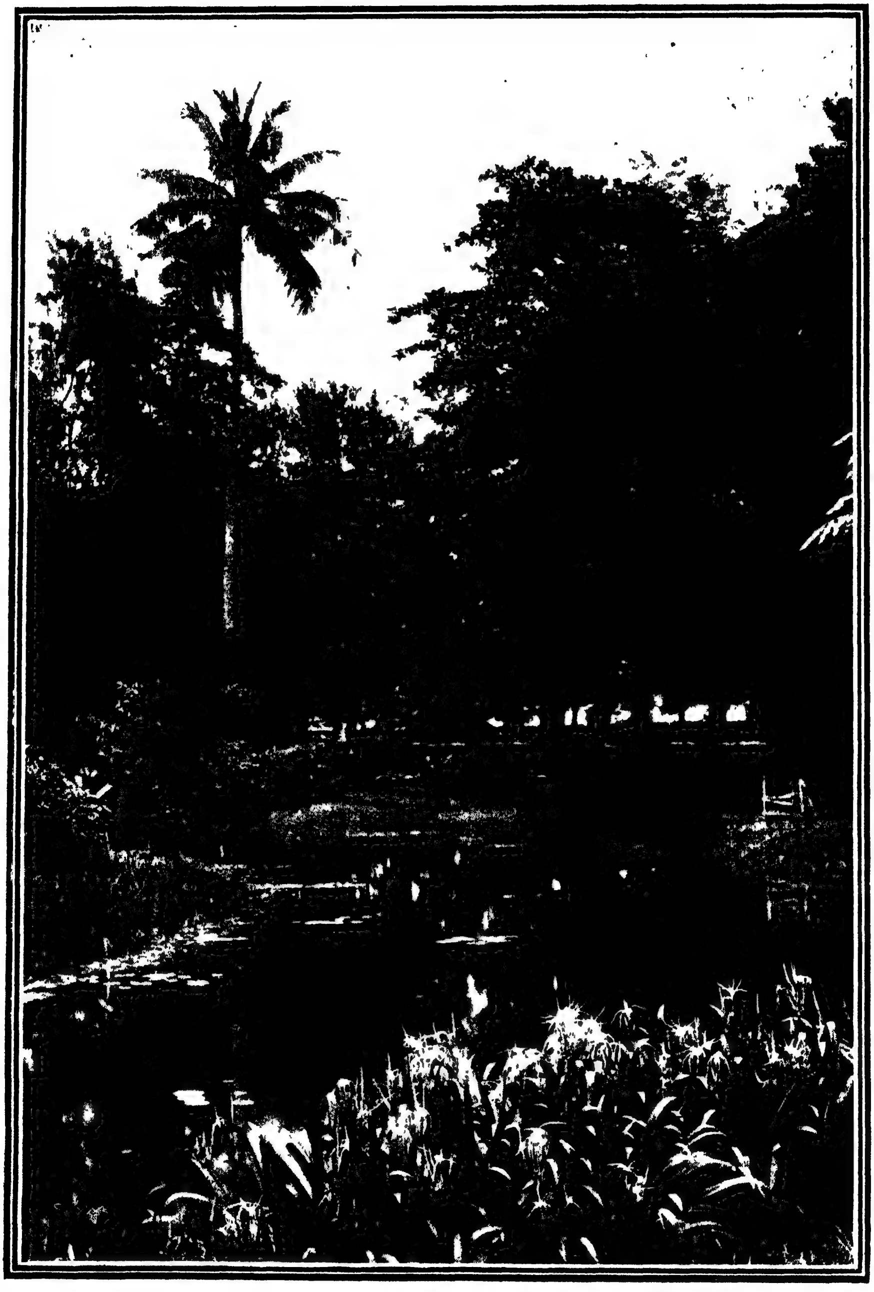

তুষার অমল বক্ষ যেথায় কমল নীরবে খোলে

শ্রীযুক্ত আর্য্যকুমার চৌধুরী গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে

তিনি বোধ হয় তাহাদের তুজনকেই বুঝিতে ছিলেন, কারণ তিনি তাহাদের মত অনভিজ্ঞ বা বালক নহেন।

নন্দকিশোর কহিলেন "সত্যেন্দ্রবাবুকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে গৌরি?" গৌরী উত্তর না দিয়া সত্যেন্দ্রের মুখের দিকে কোন মতে চাহিল, সত্যও সেই সময় তাহার দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়াছিল, চোখে চোখে মিলিতেই সে হাসিয়া ফেলিল। এমনি করিয়া পূর্ব্বে তাহাদের সহস্র বিবাদ মিটিয়া গিয়াছে, বুঝি সেই কথা তাহার স্মরণ হইয়া থাকিবে। কিন্তু আজ আর তাহা হইল না, সে হাসির বিদ্যুৎ গৌরীর মেঘাচ্ছন্ন নেত্র হইতে ঝর ঝর করিয়া জলের ঝরণা ঝরাইয়া ফেলিল, গৌরী অকস্মাৎ ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াই চলিয়া গেল।

নন্দকিশোর ডাকিলেন "গৌরি! গৌরি?" সে ফিরিল না।

বিন্ধ্যবাসিনী অনুসন্ধান দ্বারা সংবাদ বাহির করিয়া যখন তাহার শয়ন গৃহে প্রবেশ করিলেন তখন কে জানে কেমন করিয়া সে ঘরের আলো নিভিয়া গিয়াছিল, নীরব-কক্ষে থাকিয়া থাকিয়া একটা রুদ্ধবেদনার অর্দ্ধব্যক্ত ফোঁপানির শব্দ আপনাকে যেন আর চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিল না।

ত্রিমূর্ত্তি

১

উষায় হেরি গো তোরে ফুলরাণী-সাজে,
বিকশিত পুষ্পে ঢাকা কমনীয় কায়,—
ললাটে বালার্কভূষা কি মধুর রাজে
সোনালি অঞ্চল তোর, অনিলে দোলায়!

গাহ গো বিহগকণ্ঠে আনন্দের গান,
অভিষেক করি ধরা আনন্দ ধারায়,—
সঞ্চারি শকতি হৃদে নাচাইয়া প্রাণ,—
প্রদানি' চেতনা নব সুপ্ত বসুধায়।

২

মধ্যাহ্নে হেরি গো তোরে উদাসিনী বেশে,
ম্লান সে পুষ্পের সাজ, স্তব্ধ সেই গান
বিতৃষ্ণ ধরায় যেন তুঃখের নিষ্পেষে
কিম্বা তীব্র যাতনায় মৃদু বেপমান!

৩

প্রদোষে গৈরিকবাসে যোগিনী নবীনা
আবৃত সোনার তনু তমঃ পাংশুজালে
বিষাদের গান এবে গায় স্বর্ণ বীণা
রক্ত চন্দনের ফোঁটা রব শোভে ভালে।

বুঝি প্রতারিত হ'য়ে ছেড়েছ সংসার,
লভিয়া যাতনা চির, শান্তির বিহনে—
গাহিয়া বেড়াও তাই তুঃখ আপনার,
পীড়নে যাহার, তুমি যোগিনী যৌবনে।

শ্রীমুনীন্দ্রকুমার ঘোষ।

ফোটোগ্রাফির সাহায্যে সৌন্দর্য্য আবিষ্কার

ফোটোগ্রাফারকে নাকি যন্ত্রের সাহায্যে, আপনার আদর্শ এবং জীবনের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিতে হয়, সেই কারণে, অল্প বয়স হইতেই এই যন্ত্রের সাধনা আরম্ভ করা আবশ্যক। সঙ্গীত কিম্বা ভাষা আয়ত্ত করিতে হইলে, যেমন শিশুকাল হইতেই তাহাতে মনোনিবেশ করিতে হয়, ফোটোগ্রাফি সম্বন্ধেও ভিন্ন নিয়ম নাই। কোনও বিষয় বিশেষে পারদর্শী হইতে হইলে, যে পরিমাণ যত্ন, চেষ্টা, অধ্যবসায়, একান্ত নিষ্ঠা, এবং চিত্তের একাগ্রতা আবশ্যক, এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় না। ক্যামেরা এইরূপে, ফোটোগ্রাফারের জীবনের অঙ্গস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। ব্যবহার কালে কোনও দ্বিধা কিম্বা নৈপুণ্যের অভাব থাকিলে চলিবে না, যাহা করিতে হইবে, সে বিষয়ে জ্ঞান যেমন সম্পূর্ণ, প্রয়োগ-প্রণালী তেমনি সুশিক্ষিত এবং ক্ষিপ্র সুচতুর হওয়া আবশ্যক। তবেই শিল্পীর মন স্বাধীন থাকিয়া, প্রকৃতি তাহাতে যে ভাবাবেগ সঞ্চার করিবে, তাহা সহজে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবে। ক্যামেরার শক্তি সীমাবদ্ধ; বিশেষ রূপেই সীমাবদ্ধ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, তাহা অস্বীকার করিলে চলিবে না। কিন্তু হায়, প্রকাশের অবাধ অসীম উপায় কোন বিষয়েই বা আছে, আর কেইবা তাহার বশীকরণ মন্ত্র জানে?

ক্যামেরা আর কিছুই করিতে না পারুক, একটি কাজ করে, সে আমাদের চারিদিকের এই সুন্দরী পৃথিবীর সহিত পরিচয়টা ঘনিষ্ঠ করিয়া দেয়, আমাদের দৃষ্টি-শক্তি প্রসারিত করে। অতি ছোট একটি ক্যামেরা আর অত্যধিক অনভিজ্ঞতাও এ ব্যাপারে বাধা দিতে পারে না; আর ধৈর্য্য যদি তোমার অবিচলিত থাকে, তবে অবশেষে একদিন, হৃদয়ের ভাব সকল সৌন্দর্য্যে প্রকাশ করিবার যে নির্ম্মল অনুপম আনন্দ তাহা হইতে কখনই বঞ্চিত হইবে না। স্থানীয় কোন প্রকার বিশেষত্ব প্রকাশ করা অপেক্ষা, মনের ভাববিশেষকে চিত্রে ব্যক্ত করিবার চেষ্টাই আমি করিয়া থাকি। ক্যামেরার দ্বারা এ চেষ্টা কার্য্যে পরিণত করা, বড় সহজ নয়, কেন না যন্ত্রটিকে স্বাধীনতা দিলে, স্থূল যাহা সে সহজে ধরিতে পারে, তাহাই প্রচার করে—সূক্ষ্ম ভাব-সৌন্দর্য্যের ধার ধারে না। যদি বল ক্যামেরা আবার কেমন করিয়া ভাবের অতীন্দ্রিয় মাধুরী বিকাশ করিবে? তবে আমি বলিব, ভাল ফোটোগ্রাফ তুলিবার, ভাবের বিকাশ সাধন করিবার, একমাত্র এবং শ্রেষ্ঠতম উপায় ধৈর্য্য, শুভ মুহূর্ত্তের জন্য সতর্ক ভাবে প্রতীক্ষা করিয়া থাকা; আর সৌভাগ্যবশতঃ সে সহসা যখন আসিয়া আবির্ভাব হয়, তখন তাহাকে চিনিয়া লওয়া। আত্মসংযম ইহার আর একটি প্রধান উপকরণ, অনেক দৃশ্য, যাহা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, চক্ষে সুন্দর লাগে, আপনার মনের আদর্শ মনে রাখিয়া, তাহার উপযোগী হইবে না জানিলে, রমণীয়

চিত্র সাধনা

শ্রীযুক্ত আর্য্যকুমার চৌধুরী গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে

হইলেও তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে হয়। যে ফোটোগ্রাফারের সৌন্দর্য্যবোধ আছে, সে কেবলি, সেই নিরুপম মুহূর্ত্তের জন্য, উৎসুক চিত্তে সচেতন ভাবে প্রতীক্ষা করিয়া থাকে,—সেই অপূর্ব্ব অবসর, যখন বহুর সমাবেশে বিচিত্র প্রকৃতির দৃশ্য-জনতার মধ্য হইতে, একটি নিরতিশয় সুন্দর নিমেষ, আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া, একাকী সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীর মধুরহাস্তের মত, তাঁহার নেত্রের সকরুণ দৃষ্টির মত, আপনাকে বিকশিত করিয়া তোলে। আলোকের লীলায়, মেঘের ছায়ায়, কুহেলিকার রহস্তে, দেবতার অকস্মাৎ আবির্ভাবের মত, ক্ষণিকের মধ্যে অনন্তকে প্রকাশ করিয়া চলিয়া যায়।

ফোটোগ্রাফি সম্বন্ধে কম্পোজিশান অর্থাৎ বহু এবং বিবিধের সংমিশ্রণ, কথাটি একেবারেই খাটে না—বরং (Isolation), বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়া, এককতা সাধন বলিলে ভাব তবুও কতকটা ব্যক্ত হয়। অধিকাংশ স্থলে কার্য্যতঃ তাহাই করিতে হয়। চিত্রকরের মত ফোটোগ্রাফারের বিপুল ক্ষমতা নাই সত্য, মহাবীরের মত গন্ধমাদন উৎপাটন করিয়া আনা তাহার সাধ্যায়ত্ত নয়, তবুও ছোট্ট ক্যামেরাটি নড়াইয়া সরাইয়া অল্প পরিসর ও স্বল্প সময়ের মধ্যে ভানুমতির মায়া খেলার মত সেও যাহা ফুটাইয়া তুলিতে পারে, তাহাও বড় কম কৌতুকাবহ নয়। দুএক যব এদিকে ওদিকে, দৃশ্যের দর্শনীয়তায়, ভাবের লালিত্যে কত যে পরিবর্ত্তন ঘটে তাহা পরীক্ষা করিয়া না দেখিলে বোঝা কঠিন। এইরূপে কাচের উপর যে ছবিখানি ছাপিয়া যায়, তাহাকে তুলিকা কিম্বা লেখনীর সাহায্যে সংশোধন করার আমি একেবারেই পক্ষপাতী নই। ছবিখানিতে সৌকুমার্য্যের অভাব হয় হউক, আলোক-পাত যদি অত্যুজ্জ্বল, ছায়া যদি নিবিড় কালিমায় পরিণত হয় সেও ভাল, আর কিছু না হউক, যাহা সত্য যাহা প্রকৃত, তাহারি প্রতিকৃতি সেখানে আমরা দেখিতে পাইব। আর ধুইয়া, মুছিয়া প্রলেপ লাগাইয়া যাহা দাঁড় করাইব, তাহাতে যেমন সৌন্দর্য্যের হানি ঘটিবে, তেমনি তাহা সত্যের গৌরব ভ্রষ্ট হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। পুরাণ কালে ফোটোগ্রাফ যে প্রথায় লওয়া হইত, এই জন্যই আমি তাহার পক্ষপাতী—যে, তাহার প্রকাশ সত্যের অভিব্যক্তি। তাহা কতক ফোটোগ্রাফি আর কতক দোষ-বহুল অঙ্কনবিদ্যা নয়, তাহার বংশ পরিচয়ে তাঁতিকুল, বৈষ্ণবকুল দুইই নষ্ট হয় নাই, কুল যেমনই হউক না সে তাহার বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়াছে। আজকালকার প্রদর্শনী-গৃহের প্রাচীর সকল, যে ফোটোগ্রাফ সমূহে সজ্জিত হয়, তাহার অধিকাংশই কোন্ কুলের বোঝা কঠিন। অনুকরণ সহজেই করা যাইতে পারে, হয়ত বা এমনি পরিপাটী ভাবে করা সম্ভব নকল কিছুই ধরা পড়িবে না,—তবে তাহাতে গৌরব কতটা বৃদ্ধি হয় তাহাই বিবেচ্য। তাই মনে হয়, ফোটোগ্রাফিকে আপন সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করাই বিজ্ঞের কাজ, চিত্রের অবাধ বিচিত্র ক্ষেত্রে চরিবার স্বাধীনতা দান যুক্তিযুক্ত নয়। এই সকল জাতিগোত্রহীন ফোটোগ্রাফের দ্বারা ফটোগ্রাফির যত অধিক ক্ষতি হওয়া সম্ভব এমন আর কিছুতে নয়। ছোট্ট ক্যামেরা

দ্বারা যে সমুদায় সামান্য ফোটোগ্রাফ (Snap Shot) আমরা সহজেই লইতে পারি, তাহার মধ্যে অধিক কারুকার্য্য না থাকিলেও তাহা খাঁটি জিনিস, নির্দ্দোষ আমোদ, ক্ষণিকের সুখময় আত্মবিস্মৃতি। কাহারো উপকার, কোন কিছুর উন্নতি তাহার দ্বারা হয় কিনা জানিনা, তবে তাহাতে কোন চারুশিল্পের হানি যে হয় না তাহা নিঃসন্দেহ। এসংসারে যশস্বী ও কৃতকার্য্য হইবার কোন বিশেষ ধারাবাহিক বিধিবদ্ধ প্রণালী আছে কিনা বলিতে পারি না, তাহা যেমন কতক ক্ষমতা, কতক চেষ্টা, কতক বিধিদত্ত বুদ্ধি ও অনুকূল অবস্থার সাহায্যে হস্তগত করিতে হয়, ফোটোগ্রাফি সম্বন্ধে সফলকাম হইতে হইলেও নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়!

শ্রীআর্য্যকুমার চৌধুরী।

সুজার মৃত্যু

সম্রাট শাজাহান-সুত সুলতান মহম্মদ সুজার মৃত্যু এক গভীর তমসায় আচ্ছন্ন। এবিষয়ে অধিকাংশ ঐতিহাসিকই বলেন,—ঔরঙ্গজেব কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ হইতে তাড়িত হইয়া তিনি আরাকানরাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এবং তথায় বর্ব্বরদিগের হস্তে বহু কষ্ট সহ্য করিয়া অবশেষে প্রাণত্যাগ করেন (১)

কেহ কেহ বলেন, সুজা সপরিবারে আরাকানরাজকর্ত্তৃক নিহত হন।(২)

মহামতি রমেশচন্দ্র দত্তও এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মার্সম্যান সাহেবের সহিত একমত হইয়া তাঁহার উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

আরাকানরাজের সহিত সুজার বিবাদ সংঘটিত হয় এবং আরাকানরাজ সুজাকে সপরিবারে নিহত করেন।(৩)

Stewart ও সুপ্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী Bernier বলেন যে, মিরজুমলাকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া সুজা ঢাকা হইতে চট্টগ্রামে পলায়ন করিলেন, কিন্তু তথায় আসিয়া দেখিলেন সমুদ্রতীরে কোন জাহাজ নাই, তাই আপনার সৈন্য প্রভৃতিকে বিদায় দিয়া কেবলমাত্র চল্লিশজন বিশ্বস্ত অনুচরসহ সপরিবারে পদব্রজেই সমুদ্রতীর ধরিয়া আরাকানের প্রান্তরস্থিত "নাফ" নদীর তীরে

---

(১) After another twelve month's struggle he (ঔরঙ্গজেব) drove out of India his second brother, the self indulgent Shuja (1660), who perished miserably among the insolent savages of Arakan.—W. W. Hunter's Brief History of Indian People. p. 132.

(২) He took refuge at length, with the King of Arracan, by whom he and his whole family were barbarously murdered.—E F. Catron's General History of the Mogul Empire.

(৩) It is certain that dissensions arose between Suja and the Raja of Arracan and the former with all his family, were cut off.…History of India by Marshman. p. 147.

মালা গাঁথা

আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুজা স্বীয় জ্যেষ্ঠ-পুত্র সুলতান বঙ্ককে আরাকানরাজ সমীপে আশ্রয় যাচ্ঞার্থ প্রেরণ করিলেন, আরাকান-রাজও অতি সমাদরে তাঁহাদিগকে স্বপুরে আশ্রয় দিলেন।

তৎপর কিছুকাল আরাকানগৃহে অবস্থান করিয়া সুজা একখানি জাহাজের নিমিত্ত রাজার নিকট আবেদন করিলেন। পিশাচের মায়ামূর্ত্তি কতক্ষণ স্থায়ী? সুজার আবেদনের কোন উত্তর আসিল না, তৎপরিবর্ত্তে আরা-কানরাজ লিখিলেন যে, তাঁহার কোন একটী কন্যাকে রাজহস্তে সমর্পণ করিতে হইবে।

সুজার অন্তঃকরণ নিরাশার তীব্র দংশনে জর্জ্জরিত হইল। মরুভূমে মরীচিকা দ্বারা আকৃষ্ট নিরীহ পথিকের মতন তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল।

আরাকানরাজ পৌত্তলিক হইলেও তাঁহার রাজ্যে বহু মুসলমানের বাস ছিল। সুজা মৃত্যুকালে 'মরিয়া' হইয়া উঠিলেন, তিনি স্থির করিলেন ঐ সমস্ত মুসলমানকে অর্থে বশীভূত করিয়া, একদিন অতর্কিতভাবে আরাকান রাজপুরী আক্রমণ করিলেন। সুলতান বঙ্কের উত্তেজনায় আরাকানের মুসলমানগণ সুজার অধীন হইল। কিন্তু পুরী আক্রমণের পূর্ব্বদিবস এই অভিসন্ধি প্রকাশিত হওয়ায়, আরাকানরাজ ক্রোধে সুজার পরিবারদিগকে আক্রমণ করিলেন। একদিকে সুজা অপরদিকে বঙ্ক সিংহবিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বর্ব্বর আরাকান-সৈন্যগণ মস্তকোপরি প্রস্তররাশি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। সুলতান বঙ্ক অবশেষে তাঁহার দুইটী শিশুভ্রাতা, ভগিনীগণ ও মাতা পিয়ারা-বানুর সহিত বন্দী হইলেন। (৪)

এই পর্য্যন্ত বার্নিয়ারের সহিত ষ্টুয়ার্টের মিল। কিন্তু পরক্ষণেই অসামঞ্জস্য।

ষ্টুয়ার্ট বলিতেছেন, সুজা যুদ্ধ করিতে করিতে অবসন্ন হইয়া পড়িলে, শত্রু আসিয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া তাঁহার পরিবারগণ-সহ তাঁহাকে "নাফ" নদীর মধ্যভাগে আনয়ন করিল। সুজা নদীতে ঝম্পদ্বারা পলায়ন করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে ধৃত করিয়া রজ্জু-বদ্ধভাবে নদীমধ্যে নিমজ্জিত করা হইল। তাঁহার দুইটী অনুচর সন্তরণ দ্বারা পলায়ন করিতে সচেষ্ট হইলে, তীরে আসিতে না আসিতেই শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল।(৫)

কিন্তু বার্ণিয়ের বলিতেছেন,—সুজা একজন রমণী, একজন হাজি, এবং দুইজন অনুচরসহ একটী পর্ব্বতোপরি আরোহণের সময় প্রস্তর দ্বারা আহত হইতে হইতে পর্ব্বত-পাদস্থিত অরণ্যমধ্যে অন্তর্হিত হইলেন। (৬)

(৪) Bernier's Travel, (translation by Ouldinburgh,) Bangabasi report, p. 104 and Stewart, Same Edition p. 307.

(৫) See Syme's Embassy to Ava. Stewart's History of Bengal Bangabasi reprint. p. 310.

(৬) Bernier's Travels in Hindustan, p. 104.

এই কথা আর একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সমর্থন করিয়াছেন। (৭)

কিন্তু সুজা ইহার পরও জীবিত ছিলেন বলিয়া শ্রুত হয়। (৮)

তাঁহার সমাধি Darleymple নামক কোন সাহেবকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াছিল। (৯)

এসম্বন্ধে বার্ণিয়ের বলেন,—ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের প্রারম্ভে জনরব উঠিল, গোলকণ্ড ও বিজাপুরের রাজার সহিত যোগ দিবার জন্য সুজা মসলিপত্তনে পৌঁছিয়াছেন। আর একবার শ্রুত হইল যে পেগুরাজদত্ত রক্তপতাকা হস্তে সুলতান সুজাকে সুরাটে দুইটী অর্ণবপোতের সহিত দেখা গিয়াছে। ক্রমে তিনি নাকি পারস্য দেশে সিরাজ নগরে ও তৎপরে গান্ধারে (Candahar) ও অবশেষে কাবুল রাজ্যে আগমন করেন। ঔরঙ্গজেব এই সমস্ত বার্ত্তা অবগত হইয়া হাস্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "অবশেষে সুলতান সুজা আগি (তীর্থযাত্রী) হয়ে পড়লেন।" শেষ প্রবাদ এই যে, তিনি Constantinople (রুম) হইতে বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া পারস্যদেশে অবস্থান করিতেছেন। (১০)

১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে শিবাজী যখন সুরাট আক্রমণ করেন তখন তিনি ঔরঙ্গজেবকে বলিয়াছিলেন যে, সুলতান সুজা তাঁহার শিবিরে আছেন, এবং শাজাহানের প্রকৃত উত্তরাধিকারীভাবে তিনি তাঁহাকে সুরাট দান করিয়াছেন। (১১)

বার্ণিয়ের এই সকল বিষয় উল্লেখ করিয়া ইহাদিগকে ভিত্তিহীন জনপ্রবাদ বলিয়া গিয়াছেন।

তিনি বলেন যে, যদিও তিনি আরাকানরাজকর্ত্তৃক হত হন নাই তবুও সেই অরণ্যসঙ্কুল বনপ্রদেশের কোন নিভৃত স্থানে দস্যু কিম্বা ব্যাঘ্রের হস্তে পড়িয়া তাঁহার জীবনের

(৭) He was overcome by Aurangzeb's able lieutenant Mirjumla, and ultimately driven into Arakan, where, according to some accounts, he was at last seen fleeing over the mountains, accompanied by three faithful men and one woman—Vincent A. Smith's History of India, p. 137.

(৮) He had eseaped which is belived, as we are informed, in the island of Soolo, far from Arracan and Bengal, where his tomb is shown at this day. This uncertainty of his fate, furnished credulity and intrigue with pretentions to assert, that he continued alive in Indostan, concealed now here, now there; but ready to appear on any favourable opportunity of asserting his right to the throne.—Orme's Historical Fragments. Bangabasi reprint p. 63.

(৯) Ibid. see Note xxx. p. 60.

(১০) Bernier's travels. p. 104.

(১১) Orme—see Note xxxII. p. 60.

অবসান হইয়াছিল। সুজার মৃত্যুর পর তাঁহার অসি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক Elphinstone সাহেব ষ্টুয়ার্টের বাক্য সমর্থন করিয়া সুজা ও তাঁহার অনুচরবর্গ সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

তাঁহাদের সম্বন্ধে জনপ্রবাদ যাহাই বলুক না কেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের আর খোঁজ পাওয়া যায় নাই। * *

সুজার সন্ধান না পাইয়া কিছুদিন ঔরঙ্গজেব একটু ভয়ে ভয়ে ছিলেন, কিন্তু বৎসর না যাইতেই তিনি বেশ নিশ্চিন্ত বোধ করিলেন। (১২)

শ্রীতারানাথ রায়।

আমার বোম্বাই প্রবাস

(৮)

বিজাপুর ইতিহাস

বিজাপুর-রাজ্য সংস্থাপক য়ুসফ আদিল সা তুরস্ক সুলতান মুরাদের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। ১৪৪৩ সালে তাঁহার জন্ম। সুলতান রাজবংশে একটিমাত্র পুত্রসন্তান জীবিত রাখিয়া অবশিষ্টগুলিকে বিনষ্ট করিবার এক নৃশংস রীতি ছিল। এই প্রথানুসারে সুলতান মহম্মদ সিংহাসনারূঢ় হইবামাত্র তাঁহার অবশিষ্ট ভ্রাতৃগণের নিধন সাধনের আদেশ জারী করেন—য়ুসফ তাহাদের মধ্যে একজন। য়ুসফের মাতা সন্তানের প্রাণরক্ষার অনেক চেষ্টা দেখিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। নিতান্ত নিরুপায় দেখিয়া তিনি এক কৌশল করিলেন। ইমামুদ্দীন নামক জনৈক পারস্য বণিক স্তাম্বুল সহরে বাস করিতেন; তাঁহার সাহায্যে আপন পুত্রের স্থানে অপর একটি বালককে সাজাইয়া দিয়া য়ুসফকে বণিকের হস্তে সমর্পণ করিলেন। বণিক তাঁহার জীবন রক্ষার্থে প্রতিশ্রুত হইয়া য়ুসফকে পারস্য দেশে লইয়া যান ও তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার সুব্যবস্থা করিয়া দেন। সেখানে তাঁহার জীবন-রহস্য প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে ঘোর বিপদে পড়িতে হয়। অবশেষে অনেক ফাঁড়া কাটাইবার পর য়ুসফের স্বপ্ন হয় যে ভারতবর্ষ প্রয়াণেই তাঁর কল্যাণ, সেই স্বপ্নানুসারে ১৪৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি পারস্য দেশ পরিত্যাগ করিয়া দাভোলে (রত্নগিরি) উত্তীর্ণ হইলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ১৭ বৎসর—তিনি রূপবান্ বিদ্যাবিনয় সম্পন্ন পুরুষ। জনৈক পারস্য বণিকের আমন্ত্রণে তিনি দাভোল হইতে বাহমন-রাজধানী বিদুরে গমন করেন। তথায় রাজমন্ত্রী মহম্মদ গওয়ানের অনুগ্রহে সৈনিক পদে নিযুক্ত হয়েন। সত্বর

(১২) Though there were many rumours regarding them,—were never heard of again. * * *

His ingnorance of Shuja's fate left Aurangzib in some uneasiness for a time but all his other grounds of anxiety were removed before the end of the next year.—Elphinstone's History of Indla. p. 611.

বিজাপুরের অষ্ট বাদ্সা।

তাঁহার পদোন্নতি হইল। বিদুর হইতে বম্নাডে গিয়া তিনি ১৫০০ অশ্বের অশ্বপতি ও আদিল খাঁ আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর মহম্মদ গওয়ান তাঁহাকে দৌলতাবাদের গবর্ণর নিযুক্ত করেন। মহম্মদের মৃত্যুর পর বিজাপুরে বহমণী রাজার অধীনে তাঁহার কর্ম্ম হয়। ১৪৮৯ অব্দে তিনি অধীনতা-বসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজপদবী গ্রহণ ও বিজাপুরে স্বীয় রাজ্য স্থাপন করিলেন। ১৪৯৮ অব্দে দক্ষিণ সুলতানেরা বাহমণী রাজ্য আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লন, তখন গোওয়া ও তৎসমীপবর্ত্তী প্রদেশ য়ুসফের ভাগ্যে আইসে। যখন ভাস্কো ডি-গামা ভারতবর্ষের নূতন পথ আবিষ্কার পূর্ব্বক কর্ণাটকতীরে আবির্ভূত হন, তখন য়ুসফ বিজাপুরের অধীশ্বর। পোর্ত্তুগীসদের সঙ্গে গোওয়া লইয়া তাঁহার অনেক যুদ্ধ হয়। ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে পোর্ত্তুগীসদের রাজ প্রতিনিধি আলবুকর্ক বিজাপুর বিপক্ষে বিজয়নগর রাজার সহিত সন্ধি-বন্ধন করেন। পর বৎসরে আলবুকর্কের হস্তে বিজাপুর সৈন্যের পরাভব হওয়ায় গোওয়ায় পোর্ত্তুগীস রাজ্য সংস্থাপিত হয়।

বিজাপুরে দুই শত বৎসরের মধ্যে নয়জন রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট হন কিন্তু তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে রাজ্যভোগ করিতে পারেন নাই। সে কাল সুখশান্তিভোগের কালই নহে। ঘোর উপদ্রব—তুমুল বিপ্লব - গভীর অশান্তির মধ্যে তাঁহাদের রাজত্ব করিতে হইত। হয় বৈরী নির্যাতনের চেষ্টা, নয় শত্রু হইতে আত্মরক্ষার উপায় চিন্তন—ইহাতেই তাঁহাদের দিন কাটিয়া যাইত। সিয়া ও সুন্নী মুসলমানে যুদ্ধ, —প্রতিবাসী সুলতানের সহিত যুদ্ধ—বিজয় নগরের হিন্দু রাজাদের সহিত যুদ্ধ—মোগলের সহিত যুদ্ধ—এই সকল যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যে বিজাপুর রাজারা কখন্ যে রাজ্যশাসনে রাজ্যের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনের অবকাশ পাইতেন তাহা ভাবিয়া ওঠা যায় না।

য়ুসফ আদিল সা পারস্যে বাস ও শিক্ষালাভ করিয়া সিয়া ধর্ম্মে অনুরক্ত হইয়াছিলেন। স্বীয় রাজ্যে সিয়া মত সংস্থাপন করিতে গিয়া দেখিলেন যে ব্যাপারটা নিতান্ত সহজ নয়· তাঁহার সেনাদের মধ্যে তুর্কজাতীয় অনেক সুন্নী মুসলমান ছিল, আর প্রতিবাসী সুলতানেরাও এই নূতন মতের প্রতিপোষক ছিলেন না। এই সূত্রে যে যুদ্ধ ঘটনা হয় তাহা দাক্ষিণাত্যের ধর্ম্মযুদ্ধ নামে অভিহিত। আহমদনগর, গোলকুণ্ড, বিদূরের সুলতানগণ তাঁহার বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলে পর য়ুসফ অনেক কষ্টে এই ষড়যন্ত্র ভেদ করিয়া পার পাইলেন। ভাগ্যক্রমে তিনি তেমন গোঁড়া সিয়া ছিলেন না—স্বরাজ্যে সিয়া মত সংস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে সুন্নীদের ধর্ম্মানুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ নিষেধ করিলেন। ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহার উদার মত ছিল। তিনি বলিতেন "যেমন স্বর্গের নানা নিকেতন তেমনি ইসলামের নানা সম্প্রদায়।" হিন্দুদের উপর তাঁহার বিশেষ মমতা ছিল, তিনি একজন মারাঠী রমণী বিবাহ করিয়া হিন্দু জাতির সহিত সহানুভূতির পরিচয় দিলেন।

মারাঠী মহিষীর গর্ভে তাঁহার এক পুত্র জন্মে—নাম ইস্মায়েল। য়ুসফের মৃত্যুর পর ইস্মায়েল আদিল সা সিংহাসনে অধিরূঢ় হয়েন। রাজ্যাভিষেক কালে তিনি সিয়া, তাঁহার মন্ত্রী কমাল খাঁ সুন্নী। রাজা ও মন্ত্রীর মধ্যে বিষম

গোলযোগ উপস্থিত। মন্ত্রীর মতলব স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করিয়া বিজাপুরে সুন্নীধর্ম্ম প্রত্যানয়ন করেন।

বালক সুলতান ও তাঁহার মাতা, কমাল খাঁ কর্ত্তৃক প্রাসাদে বন্দীকৃত হইলেন। মন্ত্রী স্বয়ং বলপূর্ব্বক রাজ্যলাভের অভিলাষী ছিলেন কিন্তু গণৎকারেরা গণিয়া বলিল এখনো সময় হয় নাই, তাই তিনি নিজগৃহে শুভলগ্ন প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

রাজ্ঞী তাঁহার পুত্রের সমূহ শঙ্কট উপস্থিত দেখিয়া একজন বিশ্বাসী তুর্ককে কমাল খাঁ বধে নিযুক্ত করিলেন। তুর্ক মক্কাযাত্রীর ভান করিয়া মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায়। মন্ত্রী তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। মন্ত্রীবর যেমন তুর্কের হাতে পান দিতে হাত বাড়াইলেন, অমনি সে তড়িতের ন্যায় ত্বরিতে লুক্কায়িত খড়্গ বাহির করিয়া মন্ত্রীর বুকে বসাইয়া দিল; মন্ত্রীর অনুচরেরা সেই দণ্ডে তুর্ককে কাটিয়া ফেলিল। মন্ত্রীও তাঁহার হন্তা দুজনেই এক সঙ্গে প্রাণ হারাইলেন।

মন্ত্রীর মাতাও সুলতানা সদৃশী সাহসিকা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি পুত্র হারাইয়া আপন পৌত্রকে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার মানস করিলেন। প্রচার করিয়া দিলেন যে তাঁহার পুত্র কমাল খাঁ মরেন নাই, আহত হইয়াছেন মাত্র। মৃতদেহ বসনভূষণে সাজাইয়া বারান্দায় পালঙ্কের উপর শোয়াইয়া রাখিলেন যেন লোকেদের অভিবাদন গ্রহণ করিতে রীতিমত বসিয়া আছেন। এদিকে সফদর খাঁ একদল সৈন্য লইয়া সুলতানের প্রাসাদ আক্রমণ করিতে চলিলেন।

রাজ্ঞীও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। দিলসদ নামক রমণী তাঁর সখী এবং তিনি নিজে যুদ্ধ-বেশ ধারণ করিয়া গৃহপালদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। ঘরে লোকজন বড় বেশী ছিল না, ভাগ্যবশতঃ বাহির হইতে একদল সিয়া-পক্ষপাতী সৈন্যের প্রবেশ লাভে তাঁহাদের বলবৃদ্ধি হইল। সফদর খাঁ তাঁহার সুন্নীদের লইয়া যেমন প্রাসাদ আক্রমণ করিলেন, অমনি উপর হইতে তাহাদের উপর গোলাগুলি প্রস্তর বর্ষণ আরম্ভ হইল। সিয়া সুন্নীদের ঘোরতর সংগ্রাম। অনেকে হত ও আহত হইয়া পড়িল, পরিশেষে সফদর খাঁ দ্বার ভেদ করিয়া অঙ্গনে প্রবেশ করিলেন। এই সময়ে একবাণে তাঁর নয়ন বিদ্ধ হইল, তিনি এক প্রাচীরের আড়ালে গিয়া আত্মরক্ষণে তৎপর হইলেন। সেই প্রাচীরের উপর বালক সুলতান উপবিষ্ট। শত্রুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া ইস্মায়েল এক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড উপর হইতে নিক্ষেপ করিলেন, তাহা সফদার খাঁর মাথায় পড়িয়া তাঁহাকে শমন সদনে প্রেরণ করিল। এই বিদ্রোহ নিবারণের পর ইস্মায়েল নির্ব্বিঘ্নে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

ইস্মায়েলের রাজত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লিখিবার নাই। তিনি সিয়া ছিলেন, পারস্য-রাজা তাঁহার সম্মানার্থে বিজাপুরে দূত প্রেরণ করেন।

ইস্মায়লের পুত্র মল্লু তাঁহার উত্তরাধিকারী। মল্লু উগ্রচণ্ড দুরন্ত নরপতি ছিলেন। রাজ্য উচ্ছন্ন যায় দেখিয়া স্বয়ং তাঁহার মাতামহী তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিবার পরামর্শ দেন। ছয় মাস রাজত্বের পর মল্লু অন্ধীকৃত বন্দীকৃত হইয়া তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা ইব্রাহিমকে সিংহাসন ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

ইব্রাহিম সুন্নী ছিলেন। সুন্নীদের মানবর্দ্ধন সিয়াদের নির্য্যাতন ও অপদস্থ করা, এই তাঁহার কাজ; এমন কি, অনেক সিয়া মুসল মান তাঁহার রাজ্য ছাড়িয়া বিজয়নগর রাজার অধীনতা স্বীকার করেন। ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। অমিতাচারই তাঁহার মৃত্যুর কারণ। তাঁহার রোগ প্রতীকারে অক্ষম বলিয়া অনেক রাজচিকিৎসকের মুণ্ডচ্ছেদ ও হস্তী পদমর্দ্দনে প্রাণদণ্ড হয়।

ইব্রাহিম বাদসাহের রাজত্বকালে বিজয়নগরে ঘোরতর রাজ্যবিপ্লব সংঘটন হয়। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর ত্রিংশবৎসর পরে হক্কা ও বুক্কা দুই ভাই শৃঙ্গিরি মঠাধিপতির সাহায্যে দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগর পত্তন করেন। ১৩৩৫এ হক্কা হরিহর রায় নামে বিজয়নগরের রাজা হইয়া মুকুট ধারণ করেন। ঐ সময়ে আবার হসন গাঙ্গু নামক জনৈক পাঠান আল্লাউদ্দীন নাম ধারণ পুর্ব্বক দক্ষিণে এক বিস্তীর্ণ মুসলমান রাজ্যের সূত্রপাত করেন। হসন গাঙ্গু একজন ব্রাহ্মণ গণক ঠাকুরের উপকার ঋণে আবদ্ধ ছিলেন, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন মানসে তিনি "বামণ" পদবী গ্রহণ করিলেন। তাঁহার বংশ "বাহমণী" বলিয়া বিখ্যাত। বিজয়নগর ও বাহমণী সুলতানদের মধ্যে অনবরত যুদ্ধ বিগ্রহ চলিত। বিজাপুর স্বতন্ত্র রাজ্য হইয়া দাঁড়াইলে সেও বিজয়নগরের বিষম প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিল। ইব্রাহিম বাদসাহের সময় দেবরায় বিজয়নগরের রাজা। তিম্মা নামে তাঁহার মন্ত্রী ছিল। দেবরায়ের মৃত্যু কালে তাঁহার কোন প্রৌঢ়বয়স্ক পুত্র ছিল না। তিম্মা একজন বালক রাজাকে সিংহাসনে বসাইয়া আপনি রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। রাজা যৌবনপ্রাপ্ত হইবামাত্র তাঁহাকে বধ করিয়া আর একটি বালকের মাথায় মুকুট দেওয়া হয়;—এইরূপ উপর্য্যুপরি তিনজন বালক রাজার অভিষেক ও মৃত্যু হয়। অবশেষে তিম্মা দেবরায়ের এক পৌত্রীর সহিত আপন পুত্র রামরায়ের বিবাহ দিয়া রামরায়কে সিংহাসনে স্থাপন করেন। রাজকুল সমূলে নির্ম্মূল করা তিম্মার অভিপ্রায়। সে অভিপ্রায় সম্পূর্ণ না হউক অনেকাংশে সিদ্ধ হইল। কেবল তির্ম্মল নামক একজন আধপাগলা জানোয়ার আর কন্যাকুলের একটি রাজকুমার এই দুই রাজ-বংশধর অবশিষ্ট রহিল।

রামরায় অবাধে রাজ্য লাভ করিলেন কিন্তু নিষ্কণ্টক রাজ্যভোগ তাঁর ভাগ্যে ছিলনা। রাজপদ পাইয়া তিনি প্রগল্ভ ও গর্ব্বিত হইয়া উঠিলেন। প্রজারা তাঁহার উপর চটিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিল—তাহারা বলিতে লাগিল, ইনি কোথাকার জালরাজা আমরা একজন খাঁটি রাজা চাই। রামরায় বেগতিক দেখিয়া অবশিষ্ট রাজকুমারটিকে সিংহাসনে বসাইয়া মন্ত্রী হইলেন। ক্রমে তাঁহার অরিকুল ধ্বংস করিয়া রাজাকে সরাইয়া পুনর্ব্বার স্বয়ং রাজ্য ভার গ্রহণ করিলেন।

ইহাতেও রাজ্যের শান্তি হইল না। এ দিকে আবার আধপাগলা তির্ম্মল গোলযোগ আরম্ভ করিল, তাহারও রাজা হইবার চেষ্টা। তির্ম্মল ও রামরায়ের মধ্যে বিষম দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল। অনেকে রামরায়ের পক্ষ হইয়া তির্ম্মলের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ

করিল। তির্ম্মল এই শঙ্কটে বিজাপুর সুলতান ইব্রাহিমকে অনেক ধনরত্ন উপহার পাঠাইয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।

ইব্রাহিম আহ্লাদের সহিত আমন্ত্রণ স্বীকার পূর্ব্বক সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে বিজয়নগরে উপস্থিত হইলেন, তির্ম্মল তাঁহাকে স্বাগত বলিয়া বহু সমাদবে অভ্যর্থনা করিলেন।

হিন্দুদের মধ্যে হুলস্থূল বাধিয়া গেল। হিন্দুরাজ্যে এইরূপে যবনরাজের হস্তক্ষেপ সকলেরই অসহ্য হইল। রামরায় ও তৎপক্ষীয় লোকেরা তির্ম্মলকে সুলতান বিসর্জ্জনে অনুরোধ করিল—বলিল আমাদের কথামত কাজ করিলে আমরা চিরকাল আপনার অনুগত ভৃত্য হইয়া থাকিব। তির্ম্মল আশ্বাস পাইয়া লক্ষ লক্ষ টাকা দক্ষিণা দিয়া অনেক কষ্টে ইব্রাহিমকে বিদায় করিলেন। মুসলমানেরা যেমন কৃষ্ণা পার হইল প্রজারাও আপনাদের বচন ভুলিয়া দাঁত দেখাইতে আরম্ভ করিল। জনরব উঠিল প্রজারা ক্ষেপিয়া উঠিয়া তির্ম্মলকে ধরিতে আসিতেছে। এই সংবাদে তির্ম্মল একেবারে অধৈর্য্য ও কাণ্ডাকাণ্ড বিবেচনা শূন্য হইয়া পড়িলেন। অশ্বগজের চক্ষু উৎপাটন, রাজবাটীর গহনাপত্র জাঁতায় পিশিয়া চূর্ণীকরণ, এইরূপ ক্ষিপ্তের ন্যায় ব্যবহার আরম্ভ করিলেন। পরে শত্রুরা রাজভবনে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিতেছে এমন সময় তিনি আত্মহত্যায় বিপদ-রাশি হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।

রামরায় এখন নির্ব্বিঘ্নে রাজত্ব করিতে লাগিলেন—তাঁহার শাসনে রাজ্যের পূর্ব্ব সমৃদ্ধি ফিরিয়া আসিল। মুসলমানদের মধ্যে ঈর্ষা ও ভয়ের সঞ্চার হইল।

এদিকে ইব্রাহিমের পশ্চাৎ আলি আদিল খাঁ বিজাপুরের সিংহাসন আরোহণ করিলেন। তিনি প্রথমতঃ রামরায়ের সহিত মিত্রতা বন্ধন করেন। হিন্দু মুসলমানদের এরূপ মিলন আর কখনও শুনা যায় নাই। রামরায়ের পুত্রশোক ঘটনায় আলি বিজয়নগরের রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। বিজয়নগরের রাজা ও রাণী আলিকে পুত্ররূপে বরণ করেন। আহমদনগরের সহিত আলির যখন যুদ্ধ হয় তখন রামরায় বিজাপুর সুলতানের সহায়তা করেন।

হিন্দুদের গুমর বাড়িয়া উঠিল। যুদ্ধাবসানের পর রামরায় অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া যবনরাজ্য তৃণবৎ দেখিতে লাগিলেন—মনে করিলেন ভারতে আমার সমান রাজা আর নাই। মুসলমানদের উপর দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিলেন। মসজিদে ঘোড়ার আস্তাবল, তাহাদের ধর্ম্মের অপমান। তখন সুলতানেরা চটিয়া উঠিয়া প্রগল্‌ভ হিন্দুরাজাকে দমন করিতে কটিবদ্ধ হইলেন। তাঁহারা পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ বিসর্জ্জন দিয়া বিদুর ও আহমদনগর, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা—এই চতুঃ সুলতান বিজাপুরে আসিয়া একত্র হইলেন। তথা হইতে চারি সুলতান বিজয়নগরের উপর হল্লা করিতে কৃষ্ণানদী পার হইলেন। নদীতীরে আসিয়া দেখেন রামরায়ের সৈন্যদল পরপারে সম্মিলিত। নদীর ঘাট সুরক্ষিত, পারাপার বন্ধ। সুলতানেরা এক ফন্দী করিলেন। তাঁহারা নদীর কিনারা দিয়া কতকদূর চলিয়া গেলেন, যেন পার হইবার অপর স্থান অন্বেষণ করিতেছেন। তদ্দর্শনে রামরায়ের সেনাপতি স্বস্থান ছাড়িয়া পরপারে শত্রুর সঙ্গে সঙ্গে

যাত্রা করিতে লাগিলেন। তিন দিন এইরূপ চলিল। তৃতীয় রাত্রে সুলতানেরা সত্বর প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক পূর্ব্বস্থানে আসিয়া নির্ব্বিঘ্নে নদীপার হইলেন। পর দিন সন্ধ্যার সময় মুসলমানেরা রামরায়ের সৈন্যের পাঁচ ক্রোশ দূরে আসিয়া বিশ্রাম করিল।

প্রভাতে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দল পরস্পর সম্মুখীন হইল। উভয়েই বন্দুক কামান ও নানা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। হিন্দুরা মহারোষে আক্রমণ করিয়া মুসলমান সৈন্যের বাহুদ্বয় ভাঙ্গিয়া ফেলিল কিন্তু মধ্যভাগ অটল। মধ্য-ভাগের নেতা আহমদনগরের 'দিওয়ানা' সুল-তান হুসেন নিজামসা শীঘ্রই রামরায়ের সৈন্যদলের উপর আসিয়া পড়িলেন। তাঁহার সঙ্গে যে কামান ছিল তাহাতে পয়সা পুরিয়া হিন্দুদের উপর বর্ষণ করিতে লাগিলেন—সেই মারাত্মক অর্থপাতে হিন্দুসৈন্যের মধ্যে মহা অনর্থপাত ঘটিল। ক্রমে হিন্দুগণ অবসন্ন হইয়া পড়িল। রামরায় তাহার পাল্কীতে উঠিয়া বেহারাদের দূরে যাইতে আদেশ করিলেন। বেহারাগণ খানিক দূরে গিয়া পালকী রাখিয়া পলায়ন করিল। রামরায় অশ্বারোহণে পলায়নোদ্যত, এমন সময়ে ধৃত হইয়া হুসেন সার সমক্ষে আনীত হইলেন। হুসেন সা তাঁহার 'দিওয়ানা' পদবীর উপযুক্ত রূপ কার্য্য করত মুণ্ডচ্ছেদের হুকুম দিলেন—তৎক্ষণাৎ সে আজ্ঞা পালিত হইল। সুল-তানের অনুচরেরা রামরায়ের ছিন্নমুণ্ড বর্ষাবিদ্ধ করিয়া সৈন্যের সম্মুখে তুলিয়া ধরিল। রাজার এই দশা দেখিয়া হতাশ্বাসে পলায়ন পরায়ণ হিন্দুসৈন্যগণের পশ্চাতে মুসলমানেরা ধাবমান হইয়া তাঁহাদের ছিন্নভিন্ন করিয়া দিল। এই তালিকোটের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে দুপক্ষের লোক মিলিয়া সমরক্ষেত্রে ন্যূনাধিক দুই লক্ষ সেনার সম্মিলন হয়। হিন্দু সৈন্য বিস্তর মারা পড়ে এবং বিজয়ীদের লুণ্ঠন-জাত প্রচুর ধনরত্ন লাভ হয়। অতঃপর বিজয়ী সেনাগণ বিজয়নগরে প্রবেশ পূর্ব্বক নগরমধ্যে জয়পতাকা উড্ডীন করিল। সেখানকার লুটপাটের ব্যাপার বর্ণনাতীত। নগরের বাড়ী-ঘর দুয়ার লণ্ডভণ্ড—হিন্দু কীর্ত্তির চিহ্ন-সকল চকিতের মধ্যে বিলুপ্ত হইল। রাম-রায়ের ছিন্নমুণ্ড জয়স্তম্ভ স্বরূপ আহমদনগরে প্রেরিত ও তাহার এক প্রস্তর প্রতিমা বিজাপুরে স্থাপিত হয় এই প্রস্তর মুণ্ড আর্ক কেল্লায় সেদিন পর্য্যন্ত অনেকে দেখিয়াছেন। তালিকোটের যুদ্ধেই বিজয়নগরের ধ্বংস। এই যে তাহার পতন হইল আর তাহার উত্থান শক্তি রহিল না। দক্ষিণের স্বাধীন হিন্দুরাজ্য চিরকালের মত প্রলয়সাগরে ডুবিয়া গেল।

১৫৮০ অব্দে আলির মৃত্যু হয়। ইমারত নির্ম্মাণে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। জুম্মা মসজিদ, তাজ বাউড়ী, সহরের প্রাচীর, জলপ্রণালী প্রভৃতি অনেক জিনিস তাঁহার সময়কার। তাঁহার রাজত্বের শেষভাগে দিল্লীশ্বর আকবর প্রেরিত কয়েকজন দূত বিজাপুরে আগমন করেন, তাঁহাদের কি গূঢ় অভিপ্রায় ছিল প্রকাশ পায় নাই। মোগলের গুপ্তচরেরা বিজাপুরের উপর সেই যে শনির দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গেল, অচিরাৎ তাহার গরল ফল ফলিত হইল।

আলির উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় ইব্রাহিম। পিতৃব্যের মৃত্যু কালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৯ বৎসর মাত্র। তাঁহার নাবালক অবস্থায়

আলির মহিষী চাঁদবিবি রাজ্যভার গ্রহণ করেন। কমাল খাঁ সচিব প্রধান, কমাল খাঁর বিদ্রোহ চেষ্টা প্রকাশিত হওয়াতে চাঁদবিবি তাঁহার প্রাণদণ্ড আদেশ করেন। তাঁহাব পরে কিশোর খাঁ প্রধান পদে আরূঢ় হইয়া চাঁদবিবির শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন ও ছলে বলে কৌশলে রাজ্ঞীকে সাতারার দুর্গে নির্ব্বাসিত করিলেন। মন্ত্রীকে শীঘ্রই এই অত্যাচারের ফলভোগ করিতে হইল। চাঁদবিবি স্বপক্ষীয় সৈন্য সাহায্যে বন্ধনমুক্ত হইলেন, কিশোর খাঁ প্রাণভয়ে পলায়নানন্তর গোলকুণ্ডার একজন হন্তারকের হস্তে মারা পড়িলেন। অন্তঃপর মন্ত্রী দিলাবব খাঁ দক্ষতা ও বিজ্ঞতার সহিত কয়েক বৎসর রাজ্য শাসন করেন। তাঁহার সুশাসনে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন হইল। তিনি আহ্মদ-নগর ও গোলকুণ্ডার সুলতানের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন ও গোলকুণ্ডা-সুলতানের ভগিনী চাঁদ সুলতানার সহিত ইব্রাহিমের বিবাহ দিয়া দিলেন। দিলাবর খাঁ ইব্রাহিম বাদসাহের প্রিয়পাত্র ছিলেন না। মন্ত্রীর অধীনতা সহ্য করিতে না পারিয়া রাজা তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন এবং তাঁহাকে পদচ্যুত ও নির্ব্বাসিত করিয়া স্বয়ং রাজ্যভাব গ্রহণ পূর্ব্বক রাজ্য বিস্তাবে ব্রতী হইলেন। ১৫৯৪ সালে তাঁহার ভ্রাতা ইস্মায়েল বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। এই গোলযোগে আহমদনগর সুলতান বহ্রান নিজাম সা বিজাপুর আক্রমণ করিলেন কিন্তু যুদ্ধে জয়লাভ হইল না; প্রত্যুত এই যুদ্ধই তাঁহার রাজ্যনাশের মুল। যুদ্ধা-রম্ভের অনতিকাল পরে বহ্রানের মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্রও রণক্ষেত্রে বিজাপুর সৈন্য হস্তে নিহত হন; আহমদনগরে ঘোর বিপ্লব বাধে।

বহ্রান নিজাম খাঁর মৃত্যুর পর আহমদনগর দুই দলে বিভক্ত হয়, চাঁদবিবি তন্মধ্যে এক দলের অধিনায়িকা ছিলেন। অপর দলের দলপতি মোগল সম্রাটের শরণাপন্ন হইয়া আকবরের পুত্র যুবরাজ মোরাদকে পত্র লেখেন। মোরাদ তখন গুজরাটে ছিলেন। মোগলেরা দাক্ষিণাত্যে হস্তক্ষেপ করিবার অবসর অনেককাল অন্বেষণ করিতেছিল, তাহাবা এই সুযোগ ছাড়িবার পাত্র নয়। সম্রাটেব আবেদনে ক্রমে মোরাদ আহমদ-নগরের সম্মুখে সসৈন্য উপনীত হইলেন। মোগল আক্রমণ হইতে স্বদেশ রক্ষার একজন প্রধান উদ্যোগী চাঁদবিবি। তিনি কবচ ধারণ পূর্ব্বক তরবার হস্তে স্বয়ং দুর্গপালদের মধ্যে উপস্থিত থাকিয়া তাহাদের উৎসাহদান ও দুর্গ-রক্ষণের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। তিনি আপন ভ্রাতুষ্পুত্র বিজাপুর সুলতান ইব্রাহিমকে ডাকিয়া পাঠাইলেন; ইব্রাহিম আসিলেন বটে কিন্তু সময়মত আসিতে পারেন নাই। যখন আসিলেন তখন যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে। চাঁদবিবির যত্ন ও চেষ্টায় মোগলেরা প্রথমবার অল্পে তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া যায়। যুবরাজ প্রস্তাব করিলেন যদি বহ্রাড় প্রান্ত (Berar) ছাড়িয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে তিনি যুদ্ধে ক্ষান্ত দিবেন। চাঁদবিবি বিজাপুরের সাহায্য লাভে হতাশ হইয়া এই প্রস্তাবে অগত্যা সম্মত হইলেন। এবারকার মত যেন কোন প্রকারে নিস্তার পাইলেন, কিন্তু দুই বৎসর পরে আবার যখন মোগলেরা দেশ আক্রমণ করিলেন তখন আর শত্রু হস্ত এড়াইতে

পারিলেন না। রাজ্ঞী দেশরক্ষণে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু তাঁহার সমুদায় চেষ্টা ব্যর্থ হইল। এদিকে বাহিরের শত্রু, তাহার উপর আবার গৃহবিচ্ছেদ; উপায়ান্তর না দেখিয়া মোগলদের সহিত সন্ধি সাধনের উদ্যোগ দেখিতেছেন এমন সময় সৈন্যেরা ক্ষেপিয়া উঠিল। একজন বিদ্রোহী সৈনিকের খড়্গাঘাতে রাণী প্রাণ হারাইলেন; তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আহমদনগর শত্রু হস্তে নিপতিত হইল। চাঁদবিবি ভারত বীরনারীদের মধ্যে একটি রত্ন; দাক্ষিণাত্যে তাঁহার নাম ও যশ চিরস্মরণীয়।

দ্বিতীয় ইব্রাহিম শিল্পবিদ্যাবিশারদ সুশিক্ষিত সুযোগ্য নরপতি ছিলেন। মহারাষ্ট্রী ও পারস্য ভাষামিশ্রিত ব্রজভাষা সদৃশ ভাষার রচয়িতা বলিয়া তিনি প্রসিদ্ধ। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিশেষ আসক্তি ছিল। জগদ্‌গুরু তাঁহার আখ্যা—লোকে তাঁহাকে ইব্রাহিম জগদ্‌গুরু বলিয়া মানে। বিজাপুর মুসলমানের বিশ্বাস এই যে, তিনি ইসলাম পরিত্যাগ করিয়া প্রকাশ্যরূপে হিন্দুধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন। তাঁহার সময়কার কোন কোন দলিলের উপর "শ্রীসরস্বতী প্রসন্ন" শিরোনামা দৃষ্ট হয়। ইব্রাহিমের মৃত্যুকালে বিজাপুরের পূর্ণ সৌভাগ্যের অবস্থা—রাজ-ভাণ্ডারপূর্ণ—প্রজাগণ সুখসমৃদ্ধিসম্পন্ন—দুই লক্ষ পদাতিক ৮০০০০ অশ্বারোহী সৈন্যবল।

ইব্রাহিমের পর মাহমুদ আদিল সা। মাহমুদের রাজত্বকাল ৪০ বৎসর। ইনি যুদ্ধে অনুরক্ত ছিলেন না, রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে তৎপর ছিলেন। তাঁহার সময়ে বাপী, সরোবর, জলপ্রণালী সমস্ত রচিত হইয়া সহরের জলসৌকর্য্য সম্পাদিত হয়। জুম্মা-মসজিদের সুবর্ণরঞ্জিত ভজনালয় তাঁহার রচিত। বিপুল কাষ্ঠস্তম্ভাবলম্বিত উচ্চছাদ, চিত্রিত প্রকোষ্ঠসমন্বিত আসার মহল তাঁহারই কীর্ত্তি-স্তম্ভ। আর বিজাপুরের বিশেষ ভূষণাস্পদ যে গোলগুম্বজ তাহা তাঁহারি সুযোগ্য সমাধি মন্দির।

শিবাজী

মহামুদের রাজত্বকালে মহারাষ্ট্রীয় বীর শিবাজী আবির্ভূত হন। তাঁহার পিতা সাহাজী বিজাপুর সুলতানের অধীনে কর্ম্ম করিতেন। পিতার সর্ব্ববাদিসম্মত রাজভক্তির আড়ালে ও মাতার উৎসাহবাক্যতলে তিনি এক একটি করিয়া পাহাড় দুর্গ অধিকার পূর্ব্বক বিস্তীর্ণ রাজ্যের পত্তন করিলেন। লোকে ভাবে যেন বিজাপুর রাজার হইয়া কার্য্য করিতেছেন। তাঁহার নিগূঢ় অভিসন্ধি কেহ সন্দেহ করিতে না করিতেই তিনি বিস্তৃত প্রদেশ আত্মসাৎ করিয়া লইলেন। ১৬৪৩ সালে পুনার নিকটবর্ত্তী তোরণা দুর্গের অধিকার ও তন্নিহিত গুপ্তধন আবিষ্কার করিয়া অবধি তিনি বিজাপুর রাজ্যের বিরুদ্ধে স্পষ্ট বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। কোকনস্থ কল্যাণ হইতে বিজাপুরে রাজস্ব লইয়া এক দল লোক আসিতেছিল শিবাজী সে ধন লুণ্ঠন করিলেন ও ক্রমে অন্যান্য দুর্গ দখল করিয়া রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। এই সকল কাণ্ড দেখিয়া রাজা তাঁহাকে রাজবিদ্রোহী বলিয়া স্থির করিলেন। সাহাজী তখন কর্ণাটকে—তাঁহাকে বিজাপুরে আনাইয়া জেলখানায় বদ্ধ করিয়া বলা

হইল যে তাঁহার পুত্র যতদিন ধরা না দেন ততদিন তাঁহার মুক্তিলাভ নাই। শিবাজী মোগল সম্রাটের নিকট আবেদন করিয়া অনেক কষ্টে পিতার মুক্তিসাধনে কৃতকার্য্য হয়েন ও আবার পূর্ব্ববৎ লুটপাটে রাজ্যবৃদ্ধি করিবার সন্ধি লাভ করেন। মাহামুদের রাজত্বকালে শিবাজীর এই কাণ্ড। —দ্বিতীয় আলি আদিল সার সময়ে তাঁর দৌরাত্ম্য ক্রমিক বৃদ্ধি হইতে লাগিল। মোগল ও মহারাষ্ট্রীদের উপদ্রবে বিজাপুরের মুহূর্ত্তের জন্য সুস্থির হওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিল। ১৬৫৪ অব্দের পূর্ব্বে শিবাজী বিজাপুরের অধীনস্থ অনেক প্রদেশ অধিকার করিয়া বসেন ও মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের নিকট হইতে সনদ আনাইয়া আপন অধিকার বৈধ ও কায়েম করিয়া লন। পরিশেষে শিবাজীকে দমন করিবার ভার বিজাপুর সেনাপতি আফজুল খাঁর হস্তে সংন্যস্ত হয়।

আফজুল খাঁ।

আফজুল খাঁর যুদ্ধযাত্রার পরিণাম জানাই আছে। ঘটনাটি গ্রাণ্ট ডকের মারাঠী ইতিহাসে এইরূপ বর্ণিত ঃ—

আফজুল শিবাজীর বিরুদ্ধে ৭০০০ পদাতিক ৫০০০ ঘোড়সওয়ার ও কামান অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়া মহা আড়ম্বরে কুচ করত প্রতাপগড় পাহাড়ের ক্রোড়ে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। শিবাজী দেখাইলেন যেন তিনি প্রাণভয়ে সেনাপতির হস্তে আত্মসমর্পণে প্রস্তুত, প্রতাপগড়ে তাঁহাদের সাক্ষাৎকার ধার্য্য হইল। শিবাজীর অনুরোধ এই যে তাঁহাদের সম্মিলনে অন্য লোকজন উপস্থিত না থাকে। নবাবসাহেব তাহাতেই সম্মত হইয়া সৈন্য সামন্ত পাহাড়ের নীচে রাখিয়া একটি মাত্র সহচর সঙ্গে শিবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। শিবাজীকে ভয়ে ভয়ে সন্তর্পণে পা ফেলিতে দেখিয়া নবাব সাহেব তাঁহাকে আগ্রহের সহিত আলিঙ্গন দিতে অগ্রসর হইলেন। শিবাজীর হাতে বাঘনখ প্রচ্ছন্ন ছিল, কোলাকুলির সময় সেই গুপ্তাস্ত্রে তিনি আফজুলের বক্ষ বিদারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে ধরাশায়ী করেন ও ভবানী খড়্গাঘাতে কর্ম্ম শেষ করিয়া ফেলেন। এদিকে তাঁহার সৈন্যগণ ঝোপ ঝাপ অন্তরাল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নবাবসৈন্যের উপর পড়িয়া তাহাদের ছারখার করিয়া চলিয়া যায়। এইরূপ ছলে বলে কার্য্যোদ্ধার করিয়া শিবাজী মহারাষ্ট্র রাজ্যের মূলপত্তন করিলেন। তাঁহার যশোরব চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইল। ইহার পরেও বিজাপুরের সহিত তাঁহার অনেক যুদ্ধ হয় কিন্তু যুদ্ধে হারাইয়াও তাঁহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ নাই। একস্থানে যদি পরাজিত হন, অমনি অপর স্থানে ফুঁড়িয়া উঠিয়া পূর্ব্ববৎ উপদ্রব আচরণ করিতে থাকেন। ১৬৬২ পর্য্যন্ত এইরূপ চলিল, অবশেষে বিজাপুর রাজা হার মানিয়া তাঁহার সহিত সন্ধিবন্ধনে কৃতনিশ্চয় হইলেন। শিবাজী যে সকল স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারই হইল। সে রাজ্যের আয়তন কল্যাণ হইতে গোওয়া পর্য্যন্ত সমুদায় কোঙ্কনতীর ও ভীমা হইতে বর্ণানদী পর্য্যন্ত ১৩০ মাইল দীর্ঘ ও ১০০ মাইল প্রস্থ সহ্যাদ্রির উত্তরস্থ ভূমিখণ্ড। শুদ্ধ তাহা নহে, শেষে এমন হইল যে শিবাজীর বর্গী নিষ্পীড়িত

চৌথাইকর হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য বিজাপুর তাঁহাকে বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকা ঘুস দিতে প্রতিশ্রুত হইল। মারাঠীগণের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াও বিজাপুরের শান্তি নাই। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট ঔরঙ্গজেব বিজাপুর বিজয় মানসে রাজা জয়সিংহকে দক্ষিণে প্রেরণ করেন। আলি যদিও এই মোগল আক্রমণ অনেক কষ্টে প্রতিরোধ করিলেন কিন্তু দেখিলেন যে দুর্দ্দান্ত দুদ্ধর্ষ মোগলদের হস্ত হইতে তাঁর রাজ্যরক্ষা করা সুকঠিন। দুইবৎসর পরে মোগল সম্রাটের সহিত তাঁহার এক সন্ধি হয় তাহাতে তিনি বিজাপুর রাজ্যের অনেক ভাগ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। ছাঁটিয়া ছুঁটিয়া ভীমা নদী রাজ্যের উত্তর সীমা নিরূপিত হইল। ১৬৭২ অব্দে ১৬ বৎসর বিচিত্র ঘটনাপূর্ণ রাজত্বের পর দ্বিতীয় আলি আদিল সা ইহলোক হইতে অবসৃত হইলেন।

আলির মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্র সেকন্দরের বয়ঃক্রম ৫ বৎসর। সেকন্দর আদিল সা বিজাপুরের শেষ সুলতান, ইহার রাজত্ব কালে মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেব বিজাপুর আক্রমণ করেন।

অনেক দিন হইতে বিজাপুর বিজয়ে তাঁহার সাধ। যদিও এ পর্য্যন্ত আশানুরূপ ফললাভ হয় নাই, তাঁহার সেনাপতিগণ বারম্বার বিফল-প্রযত্নে বিজাপুরের দ্বার হইতে শূন্য হস্তে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছেন, তথাপি সে চিরপোষিত রাজ্যলোভ নিরস্ত হইবার নহে। ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি দক্ষিণ বিজয় উদ্দেশে অসীম সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে দিল্লী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন—সেই যে দিল্লী ছাড়িলেন আর ফিরিবার অবকাশ পাইলেন না। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ৬৩ বৎসর—তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট ভাগ পথে পথে তাম্বুতে তাম্বুতে অতিবাহিত হইল। অনেক যুদ্ধে তিনি দক্ষিণের মুসলমান রাজ্য সকল জয় করিলেন বটে কিন্তু মারাঠীদের দমন চেষ্টায় তাঁহার সমস্ত বলহানি, সমস্ত আয়ুক্ষয় হইল। পরিশেষে প্রায় ৯০ বৎসর বয়সে ৬৯ বৎসর রাজত্বের পর অশেষ বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে তিনি দেহত্যাগ করিলেন। তখন তাঁহার কি শোচনীয় অবস্থা! অতীতের দৃশ্য কি ভয়ঙ্কর, ভবিষ্যৎও অন্ধকারময়। পুত্রেরা বিদ্রোহী, উৎপীড়িত হিন্দুরাজগণ প্রতিপীড়নে সমুদ্যত। তিনি যদি দক্ষিণ সুলতানদের সহিত মিলিয়া মহারাষ্ট্রীদের দমনে সচেষ্ট হইতেন তাহা হইলে হয়ত কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন কিন্তু দক্ষিণের মুসলমান রাজ্য সকল গ্রাস করিয়া সে পথ বন্ধ করিয়াছিলেন। তিনি স্বহস্তে প্রলয়ের বীজ বপন করিয়া গেলেন—অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার রচিত প্রকাণ্ড রাজ্য ভগ্নচূর্ণ হইয়া ধূলিসাৎ হইল।

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে কারেরি নামক ইতালিয়ন পরিব্রাজক ঔরঙ্গজেবের ক্যাম্প দেখিতে যান, তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে মোগল সম্রাটের চালচলন ও যুদ্ধপ্রবাসের কতক আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। কারেরি রাজদরবারে সম্রাটের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। ঔরঙ্গজেব কৃশাঙ্গ, খর্ব্বকায়, বৃহন্নাসা, বয়োভারে অবনত, শুভ্রবেশ পরিহিত ও মুক্তাজড়িত জরির কিরীট বিভূষিত তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্রাট। তাঁহার শ্যামমুখে

শুভ্র দাড়ী ফুটিয়া উঠিয়াছে। দরবার-তাম্বুর মধ্যে সুরঞ্জিত উচ্চ সিংহাসন—চারি কোণে চারিটি রজত স্তম্ভ—উঠিবার একটি রূপার পাদপীঠ। সম্রাট এই সিংহাসনে উপবিষ্ট, আমীর সভাসদেরা তাঁহার আশে পাশে বিনম্রভাবে উপবিষ্ট—দুইজন ভৃত্য চামর ব্যজন করিতেছে, একজন ছত্র ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান। সম্রাট সহাস্যবদনে নিজহস্তে প্রজাদের আর্জী সকল গ্রহণ করিতেছেন—বিনা চসমায় পাঠ করিয়া আপন হাতে হুকুম লিখিতেছেন। কারেরি বলেন সম্রাটের সঙ্গে সৈন্যবল দশলক্ষ পদাতিক—অশ্ব ৬০,০০০, মালবহনের জন্য ৫০,০০০ উষ্ট্র, আর হস্তী ৩০০০; সেনানিবাস ৩০ মাইল বিস্তৃত। এতদ্ভিন্ন ব্যাপারী দোকানদার কারিগর কর্ম্মচারী প্রভৃতি লোক মিলিয়া জনসংখ্যা

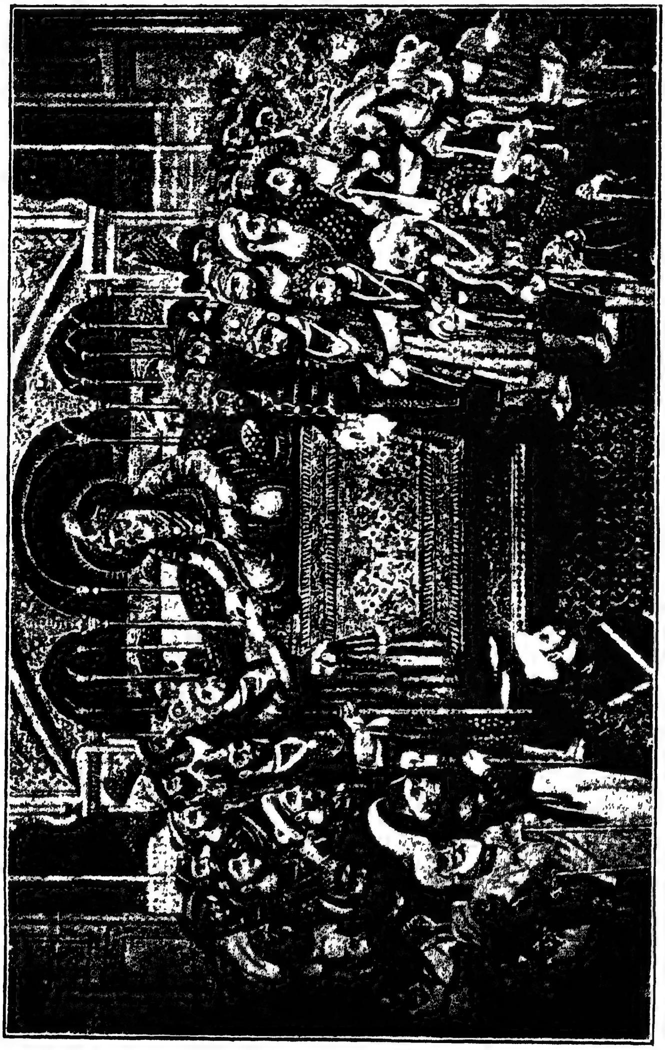

সম্রাট ঔরঙ্গজেবের রাজদরবার।

সর্ব্বশুদ্ধ ৫০ লক্ষ হইবে; নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য সকল প্রকার সামগ্রীসমাকীর্ণ সম্রাটের ক্যাম্প এক প্রকাণ্ড জঙ্গম পুরী বলিলেই হয়। হাট বাজার দোকানে ছয়লাপ। আপন আপন অনুচরবর্গের জন্য প্রত্যেক আমীরের আলাদা আলাদা হাট বাজার। সম্রাট ও রাজাদের তাম্বু প্রায় ৩ মাইল স্থান জুড়িয়া অবস্থিত ও বিহিত উপায়ে সুরক্ষিত; তীর ধনুক বর্ষা তরবার পিস্তল বন্দুক—গুরু ও লঘু কামান এই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র। গুরু কামানের উপর পোর্ত্তুগীস ওলন্দাজ জর্ম্মন্ ফরাসিস্ প্রভৃতি ইউরোপীয় অধ্যক্ষ সকল নিযুক্ত। বিদেশীগণ একবার মোগলের চাকরী গ্রহণ করিলে আর ছাড়িবার পথ পায় না—পলায়ন ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

এই এক দৃশ্য আর মারাঠী সেনাদের ধরণ দেখ। সহস্র সহস্র অশ্বারোহী সেনা—তাহাদের কোন নিয়ম নাই, বন্দেজ নাই—পূর্ব্ব সঙ্কেত অনুসারে হয়ত কোন বিজন প্রদেশে সম্মিলিত। সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ খোরাক; ঘোড়ার জিনের উপর এক একটি কম্বল মাত্র সম্বল, আর লুটের মাল পুরিবার জন্য এক একটি থলি। রাত্রে কোথাও বিশ্রাম করিতে হইলে ঘোড়ার লাগাম হাতে ধরিয়াই নিদ্রিত—দিবসে গাছতলায় কিম্বা কম্বলের আড়ালেই তাহার যথেষ্ট বিশ্রাম—রৌদ্রের উত্তাপে ভ্রূক্ষেপ নাই, কোমরে তরবার বাঁধা ও অশ্বের সামনে ভূমিখনক এক একটি বল্লম। এই সব সামান্য সরঞ্জাম লইয়া মারাঠী বীরেরা যুদ্ধ যাত্রায় বাহির হইতেন, মোগলদের অচল দলবল কিছুতেই তাহাদের সঙ্গে পারিয়া উঠিত না। অনেক বৎসর যুদ্ধ সংগ্রামের পর মোগল সম্রাট আপনার ক্যাম্পেই বন্দী হইয়া পড়িলেন, মহারাষ্ট্রী সেনাগণ মুমূর্ষু সম্রাটের চতুর্দ্দিকে বীরদর্পে নৃত্য করিতে করিতে মোগলদের নাজেহাল পিশেহাল করিয়া তুলিল।

১৬৮৯ সালে রাজকুমার আজম সোলাপুর আক্রমণ করিয়া বিজাপুরবিজয় যুদ্ধ আরম্ভ করেন। সোলাপুর হস্তগত হইলে তিনি বিজাপুরের উপর গিয়া পড়েন কিন্তু সে আক্রমণে বিলক্ষণ বাধা পড়িল। মোগলদের আগমনে বিজাপুরের লোকেরা কলহ বিবাদ দলাদলি সব ভুলিয়া ঐক্যবন্ধনে মিলিত হইল। বিজাপুর সৈন্যের প্রতিঘাতে মোগলেরা বিপদগ্রস্ত হইয়া ভীমা নদীর উত্তরে হটিয়া গেল। বর্ষ শেষে আজম পুনর্ব্বার সৈন্যসহ প্রত্যাগত হইলেন। এবার বিজাপুর সেনাগণ আর এক কৌশল অবলম্বন করিল। তাহারা সীমান্তে মোগলদের প্রতিরোধ না করিয়া রাজধানী মধ্যেই বল সঞ্চিত রাখিয়া তাহাদের প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। এইরূপ আচরণের সুফল আপনা হইতেই ফলিল। বিজাপুরের উত্তরাঞ্চলে ধান্য শস্য জলের অভাব—অতবড় মোগল সৈন্যের আহার যোগানো বিষম দায়। সোলাপুর হইতে তাহাদের সকল আহার সামগ্রী সংগ্রহ করিতে হইত—এদিকে বিজাপুরের অশ্বারোহীদল অন্নবাহক লোকদের কাটিয়া ফেলে—মহা উৎপাত! অবশেষে আহমদনগর হইতে অনেক কষ্টে এক বোঝাই ধান্য আমদানী হওয়ায় মোগল সৈন্য রক্ষা পায়। ইত্যবসরে সম্রাট স্বয়ং রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। তখন হাইদ্রাবাদের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধের আয়োজন করিয়াছিলেন

তাহা কোনমতে তালিতুলি দিয়া শেষ করিয়া সসৈন্য যুদ্ধ যাত্রার বাহির হইলেন। আসিয়া দেখেন তাঁহার পুত্র আজমের সৈন্য বিজাপুর একপ্রকার ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে - সে সৈন্যের যে সমস্ত অভাব ছিল তাঁহার আগমনে তাহা দূর হইল। সহরের দক্ষিণে প্রাচীর-ভেদ-যোগ্য কামানসজ্জা প্রস্তুত হইল ও তাহার বলপ্রয়োগে প্রাচীর স্থানে স্থানে শীঘ্রই ক্ষত বিক্ষত হইয়া পড়িল। তিনি দেখিলেন সম্মুখযুদ্ধের প্রয়োজন নাই—ভিতরে অন্নকষ্টেই কার্য্যোদ্ধার হইবার সম্ভাবনা। 'সবুরে মেওয়া ফলে' এই বাক্য স্মরণ করত পরিণাম প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহাব মনোরথ অবিলম্বে সিদ্ধ হইল। অন্নাভাব যেমন দিন দিন বাড়িতে লাগিল বাধা দিবার ক্ষমতাও সেই পরিমাণে কমিয়া আসিল। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে ১৫ই অক্টোবরে নগরপালেরা হার মানিয়া সম্রাটের চরণে আত্মসমর্পণ করিল। ঔরঙ্গজেব তাঁহার আমীর উমরাও ও প্রধান প্রধান সৈনিক সহচরে পরিবৃত হইয়া মহাসমারোহে বিজিত বিজাপুরে প্রবেশ করিলেন। প্রজাবর্গেব বিলাপধ্বনির মধ্যে আর্ক কেল্লার গগনমহলে উপনীত হইয়া প্রধান প্রধান সর্দ্দারদের নজরানা গ্রহণ করিলেন। অভাগা সেকন্দর বিজিত রাজার ন্যায় সম্মানিত হওয়া দূরে থাকুক, বন্দীকৃত বিদ্রোহীর ন্যায় রজত শৃঙ্খলে সম্রাট সমক্ষে সমানীত হইলে সম্রাট তাঁহাকে বসিবার আসন ও অভয় বচনে সান্ত্বনা দিয়া তাঁহার একলক্ষ টাকা বার্ষিকী বাঁধিয়া দিলেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে সেকন্দর লোকান্তরে গমন করেন। তাঁহার ইচ্ছামতে সহরের উত্তর পূর্ব্বে আপন গুরুর গোরের সন্নিকটে এক সামান্য গোরস্থানে তাঁহার সমাধিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। জীবদ্দশার অনুরূপই তাঁহার চরমগতি। তাঁহার প্রবলপ্রতাপ পূর্ব্বপুরুষদের সমুন্নত সমাধি মন্দিরসকল সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান, আর আদিলসাহী বংশের শেষ রাজা হতভাগ্য সেকন্দরের মৃতদেহোপরি অন্ত্যেষ্টির চিহ্নস্বরূপ একটি প্রস্তরখণ্ডও দৃষ্ট হয় না।

এই সময় হইতে স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া বিজাপুরের নাম ইতিহাসেব পৃষ্ঠা হইতে অপনোদিত হইল, এই যে তাহার ভাগ্যলক্ষ্মী ছাড়িয়া গেল আর ফিরিল না। ঔরঙ্গজেব তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করিতে বিস্তব প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বিজাপুব সৈনিকদের আশ্রয় দান, আমীর ওমরাওদের মানমর্য্যাদা রক্ষণ, ভূমি সম্পত্তি ও বিবিধ ইনাম দানে প্রজাদের মনোরঞ্জন, বসতি বিস্তারের উত্তেজন ইত্যাদি নানা উপায় অবলম্বিত হইল কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ভাঙ্গা যেমন সহজ গড়া তেমন সহজ নয়। স্বাধীনতা নষ্ট হইয়া অবধি সহরেব জীবন বিনষ্ট হইল, তাহার শ্রীসম্পদ চলিয়া গেল। মনুষের অত্যাচারের উপর আবার প্রকৃতিব উপদ্রব। ঔরঙ্গজেব থাকিতে থাকিতেই এমন এক ভয়ঙ্কর মহামাবী উপস্থিত হইল যে তাহাতে লক্ষাধিক লোক মারা পড়ে ও অনেকে সহর ছাড়িয়া পালায়। ঔরঙ্গজেবের মহিষীও এই মড়কের গ্রাসে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার গোরের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। মড়ক থামিয়া গেলে সম্রাটের আদেশে জনসংখ্যা গণনা করিয়া দেখা গেল যে লোকসংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ১০ লাখের কিছু কম;

মাহমুদ আদিলসার রাজত্বকালে বিজাপুর ও তৎপ্রান্তবর্ত্তী সাহাপুর মিলিয়া যে লোক সংখ্যা নির্ণীত হয় তদপেক্ষা প্রায় ১০ লক্ষ ১৬ হাজার লোক কমিয়া গিয়াছে। মোগল হইতে মারাঠিদের হস্তে পড়িয়া বিজাপুর দিন দিন আরো অবসাদ হিমে ম্লান হইতে লাগিল। মোগলদের সময় তাহার শ্রীসৌভাগ্যের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল বর্গীদের অত্যাচারে তাহাও ক্রমে লোপ পাইল। পেশওয়ার অধিকার গিয়া সাতারা রাজাদের আমল আরম্ভ। সাতারার শেষ রাজা সাহাজী। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে সাহাজী অপুত্রক মরণানন্তর ইংরাজেরা সাতারা আত্মসাৎ করেন, সেই সঙ্গে বিজাপুরও ইংরাজরাজ্যে মিলিত হইল।

এই বিখ্যাত প্রাচীন সহর এইক্ষণে নব্য ইংরাজ মহলে পরিণত হইয়াছে। জিলার রাজধানী হইয়া বিজাপুরের শ্রী ফিরিয়াছে, তাহার পাশ দিয়া লৌহপথ মুক্ত হওয়াতে বাণিজ্য ব্যবসার উত্তেজনা হইয়াছে, তাহার ভগ্ন জার্ণ গৃহাবলী, কতক বাসোপযোগী কতক বা সরকারী কার্য্যালয় রূপে রূপান্তরিত হইয়াছে, মুসলমান রাজভবনগুলি জজ কলেক্টর মাজিষ্ট্রেট পুলিসাধ্যক্ষ প্রভৃতি কর্ম্মচারীদের বাসগৃহ, জেলখানা পোষ্ট আফিস এই সকলের জন্য পুরাতন গৃহ নূতন করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে, ভজনালয় গোরমন্দির পর্য্যন্ত অবৈধ ব্যবহারে কলঙ্কিত। ভূতপূর্ব্ব বড়লাট Lord Curzon এইরূপ অত্যাচার নিবারণে বিশেষ মনোযোগ দান করেন, তাঁহার শাসনে ইমারত গুলির অপব্যবহার কিয়ৎপরিমাণে বন্ধ হইয়াছে। সে যাহা হউক, এই সকল উপায়ে এই শবপুরীতে কি প্রাণ সঞ্চার হইবে? এ আশা দুরাশা মাত্র। লোকদের সে জীবন্ত ভাব, সে স্বাধীন স্ফূর্ত্তি কোথায়? এই পুরীর ভগ্নগৃহের উপর কারিগিরি মৃতদেহে পুষ্পসজ্জার মত বিসঙ্গত বোধ হয়। আর আধুনিক কারিগরেরা স্বীয় কারুকার্য্যের বাহার যতই বাহির করুক না কেন, কল্পনা এ সকল ছাড়িয়া ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভগ্নস্তূপের উপরেই অতীতের সহিত ক্রীড়ামোদে মত্ত হয়।*

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আসন্ন সন্ধ্যা

আমার আসিছে সন্ধ্যা গোধূলির ছায়া
পড়িছে প্রান্তরে,
নিঃশব্দ ব্যাপিয়া যায়, কায়াহীন মায়া
জাগিছে অন্তরে।
রক্ত রবি অস্ত গেল, পাণ্ডু চন্দ্রালোক
তারো দেখা নাই,
মেঘের অঞ্চলাবাতে নিবিল সহসা
তারকা সবাই!
বুকের স্পন্দন মন্দ, আলোকের লীলা
নয়নে লুটায়,
সম্মোহন বাণাহত সব স্বপ্ন পাখী,
সঙ্গীত ঘুমায়।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

* Bombay Gazetter Vol. 23, Bijapur Wheeler's History of India, Vol. 4 Part I.

রাজকুমার

(সিংহলের প্রাচীন ইতিহাস অবলম্বনে)

১

যুবরাজপত্নী ইলা। দেখচ না, ও—পাগল!—ছেড়ে দাও!

পাগল। না-না-না আমি পাগল নই!—আমি যুবরাজ · আমায় আমায় চেনো না? তোমার বুঝি ছেলে নেই? সে বুঝি বাঁশী বাজিয়ে আজো ফাঁসি যায় নি?

রাজকুমার। পাগল? দারুণ ধূর্ত্ত—এ!! পাগলের ছল করে আমায় তিরস্কার করতে এসেচে! রাজপ্রশ্রয়ে প্রজার স্পর্দ্ধা এত বেড়ে উঠেছে যে, সে আমার প্রমোদ উদ্যানে প্রবেশ করে আমায় র্ভৎসনা করতে সাহস করে! এ স্পর্দ্ধা রাখতে দেব না—দেব না! বাঁশী বাজানর দরুণ তোর ছেলেকে ফাঁসি দিয়েছি, তোকে—কুকুর দিয়ে খাওয়াব!

পাগল। হাঃ-হাঃ! মড়কের কাছে চালাকি? কেমন এখন বিশ্বাস হোল—যে আমি রাজকুমার? যে সে নই—আমি রাজকুমার!—কাউকে রাখব না-ছেলে বুড়ো মানব না—একধার থেকে সাফ্ করে যাব! হাঃ হাঃ-হাঃ!

ইলা। (স্বামীর প্রতি) তুমি এ দিন-দিন হচ্চ কি? কি অতৃপ্তি অশান্তি তোমার প্রাণে যে, অভিসম্পাতের মত দিনরাত দেশের বুকের উপর এমনি করে হাহাকার ছড়িয়ে বেড়াচ্ছ! তুমি চাও—কি?

পাগল। হাঃ-হাঃ মড়ক আবার চায় কি? শোকের ঝড়—আর অশ্রুর বন্যা! দেশের মাটি—দেশের নদী—লালে লাল করে দেবো! হাঃ-হাঃ-হাঃ।

ইলা। ছেড়ে দাও পাগলকে—...! অনর্থক অত্যাচার করে রাজ্যের দীর্ঘনিশ্বাস কুড়িয়ো না ..বড় জ্বালা তার!

পাগল। ছেলের শোকের চেয়ে?-ওঃ-।

ইলা। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও!—পুত্রশোকাতুর পাগল—ও।

রাজকুমার। ইলা, যমের মুঠো বরং একদিন শিথিল হতে পারে—

পাগল। কিন্তু আমার হবে না—আমি যে মড়ক! হাঃ-হাঃ।

(পাগলকে লইয়া রাজকুমারের প্রস্থান)

ইলা। কি ভীষণ অত্যাচার—কি জঘন্য রক্ত পিপাসা! পিশাচে অসম্ভব যা মানুষে তা সম্ভব কেমন করে হয়?...মানুষ কি তবে পিশাচেরও অধম? অথবা মানুষের চামড়া-ঢাকা পিশাচের বাড়া একটা নতুন সৃষ্টি—ও! সৃষ্টি? কার? ভগবানের? যিনি এ বিশ্ব সংসার এমন সুন্দর করে গড়েচেন—তাঁর? বিশ্বাস হয় না!—অসম্ভব! ভগবান! আমার স্বামীর এ জঘন্য রক্তপিপাসা নিবারণ কর!

২

রাজা। না, মন্ত্রি, আমাকে তোমরা নামিয়ে দাও—এ রাজতক্ত হ'তে।—আমি রাজা হবার উপযুক্ত নই।

মন্ত্রী। এমন সর্ব্বগুণাধার রাজা কোন দেশের প্রজার ভাগ্যে ঘটে মহারাজ!

রাজা। বল্ছ কি মন্ত্রী। যে রাজা স্নেহের পায় দাসখৎ লিখে দিয়ে ছেলেকে তার শাসন করতে পারে না, দুর্বৃত্ত ছেলের অত্যাচার থেকে প্রাণের অধিক প্রজাদের রক্ষা করতে যার শক্তি নেই, সে আবার—রাজা? সর্ব্বগুণাধার রাজা? (ক্ষণকাল নীরব রহিয়া) ভাল, মন্ত্রি!—যাও সে শয়তানকে জিজ্ঞাসা করে এস,—সে কি চায়, আমি তাই দেব সে যেন আর আমার প্রজার ঘরে ঘরে হাহাকার ছড়িয়ে না বেড়ায়।

(সহসা ঝড়ের মত রাজকুমারের আবির্ভাব)

রাজকুমার। কি, চাই আমি? আমি চাই—আমাদের নারা রাজার বিপুল স্নেহাঞ্চল খানা শোণিতের রঙে রাঙিয়ে তুল্‌তে!

(রাজা পুত্রের মুখের দিকে বারেক চাহিয়া মুখ নত করিলেন)

রাজকুমার। মহারাজ! চেয়ে দেখুন, আপনার ওই বিপুল স্নেহাঞ্চলের তলে কি দারুণ প্রশ্রয় দিন দিন বেড়ে উঠ্‌চে! এখনো সময় আছে, স্নেহাঞ্চল গুটিয়ে নিন,—নয়তো এমন রাঙিয়ে তুলব ও স্নেহাঞ্চল যে, দিনান্তের সূর্য্যও তার কাছে ফিকে হয়ে যাবে!

(সদর্পে রাজকুমারের প্রস্থান)

রাজা। (মৃত পত্নীর উদ্দেশে অৰ্দ্ধস্ফুট ভাবে) কল্যাণি, আজ তুমি বেঁচে থাকলে হয়ত এমন স্নেহদুর্ব্বল হয়ে পড়তুম না—নিশ্চয় এ দুরন্ত উদ্ধত সন্তানকে, শাসনের স্বাদ কত মধুর বোঝাতে পারতুম!—ওঃ—!

৩

রাজকুমার। মড়ক আমি! মড়ক—মন্দ বলেনি, বেশ কথাটি! ঠিক খাটে! ইলা আবার একটা নতুন কথা বলেছে—অভিসম্পাত! সেটাও নেহাৎ মন্দ নয়!—অভিসম্পাৎ আমি!—অতৃপ্তিতে অশান্তিতে ভরা! কিন্তু কিসের অতৃপ্তি আমার?—কি চাই,—পাই না? রাজসিংহাসন?—সেই করুণায় স্যাঁৎসেতে রাজসিংহাসন? যেখানে বসলে পুরুষের পৌরুষ নিভে যায়, পুরুষ একটি স্নেহময়ী নারীতে রূপান্তরিত হয়—সেই সিংহাসন? যার সংস্পর্শে দুর্বৃত্তকে দমন করবার শক্তি লোপ পায়, যেখানে বসলে কেবল চোখের জলের আর দয়ার চর্চ্চা করতে হয়—সেই রাজতক্ত! না, না, তা আমি চাই না। পুরুষ আমি—তেজে গড়া!—কোমলতা আমার ব্যবসা নয়! আমি আগ্নেয় গিরির মত সর্ব্বদা দেশের প্রাণে আশঙ্কা, উদ্বেগ, আতঙ্ক জাগিয়ে রাখব,—আর মাঝে মাঝে ভূকম্পের মত সারা দেশটাকে কাঁপিয়ে তুলে গৈরিকস্রাবের মতন সর্ব্বনাশ আর হাহাকার ঢেলে দেবো! সেই সর্ব্বনাশ হাহাকারের কণ্ঠে কণ্ঠে যে একটা বিরাট গান আকাশে প্রতিধ্বনি তুলে বেজে উঠ্‌বে তার কাছে কোন্ সঙ্গীতের মাধুর্য্য পাল্লা দেবে? মাধুর্য্য নেই তাতে?—ভীষণতায় ভরা? আমি নারী নই পুরুষ আমি—ভীষণতাই আমার মাধুর্য্য,—ঝঞ্ঝাই আমার শান্তি···বিপদই আমার আশীর্ব্বাদ! সেই ভীষণ শান্তি, সেই হাহাকারে ভরা আশীর্ব্বাদ শ্রাবণের বর্ষার মত অজস্র-ধারে এ রাজ্যের উপর যেদিন ঢেলে দিতে

পারব, সেইদিন-·সেইদিন—সেইদিন, কি ? তৃপ্তি পাব ? না, না পুরুষ আমি—তৃপ্তি আমার জন্যে হয় নি, না.—তৃপ্তির স্বাদ আমি চাই না।...অতৃপ্তিই আমার বাসনা অতৃপ্তিই আমার সাধনা।—এ অতৃপ্তি যেদিন আমার ঘুচবে - সেইদিন আমারো শেষ।

(সহসা ইলার প্রবেশ)

ইলা। উন্মত্তের মত—এ কি বক্‌চ। একবার নিজের দিকে চেয়ে দেখ—দিন-দিন কি হচ্চ তুমি! কল্পনার অতীত অত্যাচারকে কেন এ বাস্তব মর্ত্ত্যে ছেড়ে দিয়েচ.. শৃঙ্খলিত কর তাকে! মানুষ তুমি, মানুষকে হিংসা করো না! - মনুষ্যত্বকে লজ্জা দিও না।

রাজকুমার। ইলা, ঝড় যখন উঠেচে, তখন সে বইবেই—কারুর কথা মান্‌বে না। তবে যদি একান্ত থামাতে চাও, তবে ঝড়ের চেয়ে প্রবল হও!—অত্যাচারে অবিচারে নৃশংসতায় আমাকে ছাপিয়ে ওঠো,—আমি তলিয়ে যাই! তারপর যা হয় কোরো! কেন এমন কচ্চি ? মাতালে কেন মদ খায়। কি সুখে ? শুধু নেশা। আমারো তাই।

ইলা। প্রজার জীবন-মরণ নিয়ে খেলা। কি ভীষণ!

রাজকুমার। কেন ? জীবন মরণের কোনটা দুর্লভ ? মরণ ? তার চেয়ে জগতে সুলভ কি ? জীবন ? প্রজার জীবন এত দামী যে রাজপুত্র তা নিয়ে খেলা করতে পারে না ?

ইলা। আর বোলো না—বোলো না ও কথা!—জগতের শান্তি শিউরে উঠ্‌বে!

রাজকুমার। বলেছি ত, শান্তি চাও যদি,—আমাকে ছাপিয়ে ওঠো!

ইলা। বলো, কি কর্‌তে হবে!—তাই করবো। শিখিয়ে দাও কেমন করে তোমায় ছাপিয়ে উঠ্‌তে হয়।।

রাজকুমার। রাজার স্নেহান্ধ চোখে রক্তের কাজল পরাতে হবে—পাগলকে রাজার নিজের হাতে বধ কর্‌তে হবে!— পারবে ?

ইলা। উঃ!!

৪

রাজা। হা ঈশ্বর! কি পাপ করলে দুর্ব্বল হৃদয় নিয়ে মানুষ রাজা হয়! প্রজার চোখের জল যে সিংহাসন ছাপিয়ে ওঠে! এখনো অসাড় আমি যেন জমে গেছি! নিজের ছেলেকে শাসন করবার ক্ষমতা নেই যখন, আমি কেন রাজা হলুম ?—কে আমায় রাজ-তক্তে বসালে ? প্রজারা কেন বিদ্রোহী হয় না ? (ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া) না—না· আমি দুর্ব্বল নই—আমি রাজা!—প্রজার মঙ্গলের জন্য আমি সব বলি দিতে বাধ্য—পুত্র-স্নেহকেও! আমি আজই তার প্রাণ-দণ্ডের আদেশ দেবো— কর্ত্তব্যের কাছে কিছু মান্‌ব না। (পুত্রের প্রাণদণ্ডের আদেশ লিখিতে গিয়া) এ কি!—হাত যে নড়ে না!—অক্ষর জড়িয়ে যায় যে। না...না থাম্‌লে চলবে না...থাম্‌তে পারব না!—প্রজার হাহাকারে আকাশ ফেটে চৌচির হয়ে পড়বার উপক্রম করেচে...তার প্রাণদণ্ড চাই, তার প্রাণদণ্ড চাই·· দুনিয়ার দুষমণ হয়ে পৃথিবীতে তার বেঁচে থাকা হতে পারে না! দুনিয়ার দুষমণ সে। দুনিয়ার ? না..না...না, আমার যে সে বুকের হাড়! অই স্বর্গ থেকে আজো যে একজন অশ্রান্তধারে তাকে ভালবাসা

ঢেলে দিচ্চে! এ জল্লাদ পিতাকে নৃশংস আদেশ লিখতে দেখে জীবনের পরপার থেকে হয়ত সে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠবে...সেই সঙ্গে আমারো এ তালি দেওয়া বুকটা কেটে খানখান হবে...কিন্তু কি করব? তবু—তবু সে কাটা বুক চেপে ধরে এ রক্তের দাগ এঁকে যেতে হবে!

[মন্ত্রীর প্রবেশ]

মন্ত্রি—মন্ত্রি রটিয়ে দাও রাজ্যময়—আজ তাদের রাজা পুত্রস্নেহকে বলি দিয়ে সেই রক্তে ছেলের প্রাণদণ্ডের আদেশ লিপি লিখে দিয়েছে!—পুত্রের রক্তে রাজ্যের হাহাকার নিভে যাক্—প্রজার কল্যাণ ফিরে আসুক!

মন্ত্রী। মহারাজ!

রাজা। মন্ত্রি! চুপ কর। অনেক কষ্টে ঘুম পাড়িয়েছি—হৃদয়ের সে সুপ্তটারে ঘা দিয়ো না—বড় দুর্ব্বল আমি—হেরে যাব—রাজার কর্ত্তব্য করে উঠ্‌তে পারব না!

মন্ত্রী। মহারাজ! সুসংবাদ আছে।

রাজা। কি, প্রজারা বিদ্রোহী হয়েছে? সন্তান বলিদান থেকে রক্ষে পেয়েছি?—ছিঁড়ে ফেলি এ রক্তলোলুপ আদেশ পত্র?

মন্ত্রী। ও ভীষণ আদেশের কোন প্রয়োজন নাই মহারাজ! যুবরাজ জানিয়েছেন—প্রজার শাসনের ভার গ্রহণ কর্‌তে যদি আপনি সম্মত হন তবে তিনি আর কোনরূপ অশান্তি উৎপাদন করবেন না। আর—

রাজা। থাম্‌লে যে মন্ত্রি?

মন্ত্রী। আর—

রাজা। বড় ভীষণ কথা কোনো? জিব্ জড়িয়ে যাচ্চে? কি করবে? বল্‌তে হবে!

মন্ত্রী। আর সেই পাগলকে আপনার নিজের হাতে বধ—

রাজা। মন্ত্রি! একি হল! এ যে শুধু শান্তির মরীচিকা দেখালে—আসল জিনিস তো পেলুম না। রক্তের স্রোত তো কই থামল না? ছেলের রক্ত ভেবে শিউরে উঠেছিলুম—এ যে প্রজার রক্ত—অসহায় পাগল প্রজার—ছেলের চেয়ে কম দরদের নয়! না, না পারব না—পুত্রস্নেহে অন্ধ হতে পারব না—!

৫

১ম প্রজা। কি করা যায়!

২য় প্রজা। কেন?...চট্‌পট মরো!

১ম প্রজা। শুধু শুধু মরব?

২য় প্রজা। সময় পাও—একটু তবলা বাজিয়ে নিয়ো।

১ম প্রজা। মরবো?—কোন অপরাধ?

৩য় প্রজা। যে অপরাধে পোকা মাকড় মরে!

১ম প্রজা। আমাদের কি কোন শক্তি নেই?

২য় প্রজা। আজ্ঞে বৈকি শক্তি—মরতে!

৩য় প্রজা। না,—তা নেই। বুক ফুলিয়ে মরবার শক্তি থাক্‌লে মানুষ মরে না!

২য় প্রজা। আমরা না হয়, মরবার আগে না ফুলে, মরবার পরে ফুলি—এই যা!

৪র্থ প্রজা। চলো—দল বেঁধে রাজার কাছে গিয়ে কেঁদে পড়ি!

৩য় প্রজা। রাজার কাছে কেঁদে ফল? শুধু পাল্টা কান্না শুনতে?

৪র্থ প্রজা। তবে কি করতে বল?

৩য় প্রজা। মরতে!

২য় প্রজা। সেটার জন্যে আর বিশেষ উপদেশ কেন? যুবরাজের একবার খেয়াল হলেই হোল!

৩য় প্রজা। না,—পরের খেয়ালে নয় — নিজের সাহসে মরতে হবে।

(জনৈক প্রজার প্রবেশ)

আগন্তুক। শুনেছ?—সর্ব্বনাশ! রাজাও আমাদের যুবরাজের সঙ্গে রক্তের খেলায় যোগ দিয়েছেন।

সকলে। (উৎকণ্ঠিত ভাবে) এ্যা—এ্যাঁ ···কি?···কি?

৫ম প্রজা। রাজা ছেলের কথায় স্বহস্তে সেই সেই পুত্রশোকপাগল বেচারার মুণ্ডচ্ছেদ করেচেন!

সকলে। এ্যাঁ এ্যাঁ এ্যাঁ।

৩য় প্রজা। ওঁক?—শিউরে উঠছ কেন? ···রাজভক্তিতে তর্-র্ হয়ে থাকো!

১ম প্রজা। কি কর্‌তে বলো?—বিদ্রোহ?

৪র্থ প্রজা। ছিঃ—ছিঃ সে যে মহাপাপ!

[প্রস্থান]

৬

রাজকুমার। কি রকম হল—এ! আমার প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ল?- আমার? বজ্রে শিশির ঝরল? তবু আমার সামনে তার হত্যা হয়নি—শুধু রাজার হাতে রক্তঝরা খড়্গ আর পদতলে হতভাগ্যের ছিন্নশির দেহ··· এই দেখে এমন হলুম?···কেন? প্রজার রক্তে নদী বইয়েছি—কই একদিনো ত মন কেঁদে ওঠেনি? আজ একি হলো? ইলাকে —বলেছিলুম আমায় থামাতে চাও তো আমায় ছাপিয়ে ওঠো!—একি—তাই হোল? ঐ একটা হত্যায়? না, না, না—তা নয়! হত্যায় আমায় কেউ ছাপিয়ে ওঠেনি, ঘটনার ঢেউ আমায় তলিয়ে দিয়েচে! কালোর উপর শত কালো দাগ ফোটে না—কিন্তু সাদার বুকে একটা ক্ষীণ কালো রেখাও জ্বঃ জ্বল করে উঠে!—নৃশংস আমি,— আমার হাতের হত্যায় ভীষণতা ফুটে ওঠেনি ·· কিন্তু রাজা করুণায় গড়া তাই তাঁর হাতে হত্যা দেখে আমারো পাষাণ প্রাণ কেঁপে উঠেছে! এ তো রাজা হত্যা করেন নি— জগতের করুণা নিজের হাতে খড়্গ তুলেছে ·· তাই তলিয়ে গেছি!

জনৈক দুর্বৃত্ত অনুচরের প্রবেশ)

অনুচর। যুবরাজ!—একি! চারিদিকে ষড়যন্ত্র। আপনি এখনো নিশ্চিন্ত।

রাজকুমার। কেন? আর কি চাও? রাজাকে রঙের খেলায় নামিয়েছি!—আরো কি বাকি?—সুধাকে বিষ করেছি···করুণাকে নৃশংস করে তুলেছি···আমার কাজ তো ফুরিয়েচে!

অনুচর। যুবরাজ! প্রতারিত হয়েচেন আপনি! রাজপদতলে সেই রক্তাক্ত ছিন্ন মুণ্ড—পাগলের নয়!—সেটা একটা অপরের শবদেহ! কৃত্রিমরক্তে রঞ্জিত করে আপনাকে শান্ত করা হয়েচে!

রাজকুমার। কি বল্লে!

অনুচর। অবিশ্বাস করচেন?

রাজকুমার। না·· না অবিশ্বাস করচি

না।—করুণা সত্যই নৃশংস হতে পারে না। (ক্ষণকাল চিন্তার পর) কিন্তু করুণা যদি নৃশংস হতে না পারে, মড়ক আমি,—আমি কেমন করে মধুর হবো? ভুল ধারণায় নিবে আসছিলুম—ভ্রম কেটে গেছে—ভাল হয়েছে·· এবার দ্বিগুণ জ্বলে উঠবো! চলো—এবার হত্যায় আকাশ রাঙিয়ে তুলবো!

৭

রাজা। মন্ত্রি! ধন্য তোমার বুদ্ধি। তুমি আমাকে ছেলের হত্যা থেকে রক্ষা করেছ—তুমি আমার প্রজাকে বাঁচিয়েছ। তোমার এ বুদ্ধি না এলে কি হতো—কি করতুম··· উঃ ভাবতে প্রাণ কেঁপে উঠে! কিন্তু মন্ত্রি, প্রাণ কেন তবু নিশ্চিন্ত হতে পারচে না? ··

মন্ত্রী। মহারাজ! কোন আশঙ্কা নেই···নিশ্চিন্ত হ'ন—যুবরাজ এখন শান্ত এবং বরং নিজের পূর্ব্ব আচরণে সন্তপ্ত!

রাজা। সন্তপ্ত! আঃ—তাই হোক্—তাই হোক্। প্রজার ব্যথা বুঝতে শিখুক! বুঝেছি, বাইরে সে কঠোর হলেও অন্তর তার কোমলতায় ভরা! দেখেচ তো সেদিন—আমার সেই নৃশংসতার অভিনয় দেখে কেমন শাদা হয়ে গেছল? আহা, হবে না—আমার ছেলে সে!

মন্ত্রী। কেবল দুর্বৃত্তদের উত্তেজনাই যুবরাজকে বিচলিত করে তুলেছিল।

রাজা। ঠিক বলেচ মন্ত্রি! কেবল পরের পরামর্শে সে আমার, অমন হয়ে উঠেছিল। ভগবান তাদেরও যেন সুমতি দেন।

(সহসা ত্রস্তভাবে দূতের প্রবেশ)

দূত। মহারাজ সর্ব্বনাশ! যুবরাজ জান্‌তে পেরেছেন—পাগল নিহত হয়নি! এবার দ্বিগুণ ভীষণ হয়ে পাগলের সন্ধানে ধাবিত হয়েছেন।

রাজা। মন্ত্রি। সব ব্যর্থ হল! ওঃ—

[রাজা মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া পড়িলেন]

৮

রাজকুমার। তোর স্বামী কোথায়—বল্!

পাগলের পত্নী। জানি না যুবরাজ স্বামী কোথায় ইহলোকে না পরলোকে?

দুর্ব্বৃত্ত অনুচরগণ। যুবরাজ! সব জানে এ নারী!

রাজকুমার। আমার জিঘাংসা থেকে তোর স্বামীকে লুকিয়ে রাখবি?—কতক্ষণ? জানিস্ তার জন্য কি ভয়ানক দাম দিতে হবে?...আচ্ছা, তোর স্বামী কোথায় বলাতে পারি কিনা দেখি!—জল্লাদ!—ওর সামনে ওর দুটো ছেলেকে বধ কর!

ছেলে। (ভয়ে মাতাকে জড়াইয়া ধরিয়া) মা!—মা!

পাগলের পত্নী। বাবা আমার—বাবা আমার! কোথায় লুকোবো তোকে!

(মাতা আতঙ্কে ছেলেকে বুকের মাঝে জড়াইয়া ধরিল)

রাজকুমার। জল্লাদ!—মায়ের বুক থেকে টেনে আন ওকে!

পাগলের ছোট ছেলে। দাদা—দাদা! মরতে ভয় করিস? মার গায় জল্লাদে হাত দেবে তবু তুই মরতে ভয় করিস? যুবরাজ!

…জল্লাদ!…এই আমি—আমায় আগে বধ কর।

ভীত সন্তান। (মাতার বক্ষ হইতে আপনাকে ছিনাইয়া লইয়া) না—না ভাই মরতে আর ভয় করব না…এই এসেছি! কই যুবরাজ! কই জল্লাদ!…খুন কর আমাকে!

(মাতা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন)

রাজকুমার। জল্লাদ!—এখন নয়!—মূর্চ্ছা ভঙ্গ হোক্ ওর মার,—তখন তার সামনে জোড়া ছেলে এক সঙ্গে বলি দেবো!

ছেলে। মা! তোর ও মূর্চ্ছা আর যেন না ভাঙ্গে—তুই মরে যা মা! (সহসা যুবরাজের সম্মুখে নত জানু হইয়া) যুবরাজ! আর যা করো—সব সইবে!—শুধু মার চোখের ওপর সন্তান হত্যা কোরো না! যুবরাজ তোমার কি মা নেই?

পাগলের পত্নী। (মূর্চ্ছা ভঙ্গে) কই! বাছারা আমার কই?……এঁ্যা—এঁ্যা!

ছেলে। মা কেঁপে উঠিস্ নে। তুই যে আমাদের মা, তা খানিক ক্ষণের জন্যে ভুলে যা—এমন কি ভুলে যা—যে তুই নারী!

ছোট ছেলে। কাঁদিস নে ও মা। বুকের জ্বালা নিবে যাবে—আর এ অত্যাচার পুড়ে ছাই হবে না!—কাঁদিস নে মা!

রাজকুমার! জল্লাদ!

[আদেশ মাত্র ঘাতকের খড়্গ ঊর্দ্ধে ঝলসিয়া উঠিল! এমন সময় বিদ্যুদ্বেগে কে আসিয়া সেই খড়্গতলে পতিত হইল… খড়্গাঘাতে দেহত্রয় এক সঙ্গে ছিন্নশির হইয়া পড়িল!]

রাজকুমার। এঁ্যা!—একি!—পিতা! উঃ! প্রজা এমন ভালবাসার জিনিস? ওঃ!—আগে বুঝ্‌লুম্ না কেন!

শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ।

প্রোষিত ভর্ত্তৃকা

নিদ্রা নাই, নিদ্রা নাই নয়নে আমার,
হে প্রবাসি! তোমা লাগি, হায় অচেনার
বেদনা জনমে, পরিচিত গৃহদ্বারে
বাতায়ন আশঙ্কায় কাঁপে বারে বারে,
কেঁদে ওঠে সৌধছাদ, নিভৃত পিঞ্জরে
জাগে পিক,—ভগ্নতন্দ্রাবিজড়িত স্বরে,
ভুলিয়া কাকলি গাথা কি গাহে প্রলাপ!
নিঃশব্দে প্রাঙ্গণে ডরি' কার অভিশাপ
চঞ্চলা হরিণী; অন্ধকার করি দূর
খণ্ড কৃষ্ণপক্ষ চাঁদ, বিরহ বিধুর
আসে ক্ষীণ যক্ষের মতন; স্বপ্নেকার
ভগ্নতট পঞ্জরের মাঝে একবার
গঙ্গাহাসে ম্লানহাসি; প্রিয় সে কোথায়?
নিরুদ্দেশ বহুদূর—কোন্ অজানায়!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

“কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা।”

শারীর স্বাস্থ্য-বিধান

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(১৬)

সংক্রামক রোগের শুশ্রূষার ব্যবস্থা

বাটীর মধ্যে কাহারও কোন সংক্রামক রোগ উপস্থিত হইলে, যেরূপে তাহার শুশ্রূষা করিলে ঐ রোগের পরিব্যাপ্তি নিবারিত হইতে পারে, এক্ষণে তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে এ বিষয়ের যথোচিত অভিজ্ঞতার অভাবে আমরা অনেক সময় নানাবিধ অসুবিধা, ক্লেশ, অর্থনাশ ও মনস্তাপ সহ্য করিতে বাধ্য হইয়া থাকি।

সকল দেশেই রোগীর শুশ্রূষা করিবার ভার প্রধানতঃ রমণীদিগের হস্তে ন্যস্ত থাকিতে দেখা যায়। স্ত্রীলোকদিগের প্রকৃতি স্বভাবতই ধীর, মধুর ও স্নেহ-প্রবণ; শ্রমশীলতা ও সহিষ্ণুতা তাহাদের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম। অবস্থা-বৈগুণ্যে তাঁহাদিগকে পুরুষ অপেক্ষা অধিক-তর শারীরিক ক্লেশ অকাতরে সহ্য করিতে দেখা যায়। রোগীর যিনি সেবা করিবেন, তাঁহার এই সকল গুণ থাকা বিশেষ আবশ্যক এবং বোধ হয় সর্ব্বত্র রোগীর সেবার ভার রমণীদিগের হস্তে যে অর্পিত থাকিতে দেখা যায়, তাহা এক প্রকার প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফল বলিয়া মনে করা অসঙ্গত হয় না।

ইউরোপে শুশ্রূষা শিক্ষা করিবার সুব্যবস্থা সর্ব্বত্রই প্রচলিত আছে। তথায় বহুসংখ্যক রমণী যথারীতি শিক্ষা লাভ করিয়া শুশ্রূষা-ব্যবসা দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতেছেন। ইঁহারা নার্স্‌ (Nurse) নামে পরিচিত এবং ইঁহারাই যাবতীয় সাধারণ চিকিৎসালয়ে (Hospital) এবং ভদ্রলোকের বাটীতে রোগীর সেবার জন্য নিযুক্ত হইয়া থাকেন। আমাদের দেশে কিছু দিন পূর্ব্বে এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকের দ্বারা রোগীর সেবা করিবার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল না। তখন সাধারণ চিকিৎসালয়সমূহেও পুরুষদিগের দ্বারাই সেবার কার্য্য সম্পন্ন হইত। এক্ষণে আমাদের দেশের বড় বড় সহরে, বিদেশীয় ও স্বদেশীয়, অনেক স্ত্রীলোক এই বিষয়ে সুশিক্ষা লাভ করিয়া নার্সে্‌র ব্যবসা করিতেছেন। কিন্তু অনেক সময়ে হিন্দু-পরিবারের মধ্যে ইঁহাদিগের দ্বারা রোগীর সেবা-কার্য্য সুবিধাজনক হয় না। নার্সে্‌র জাতি ও ধর্ম্ম লইয়া অনেকস্থলেই গোলযোগ উপস্থিত হয়; তাঁহাদের হস্তে ঔষধ ও পথ্য গ্রহণ করিতে অনেকেই (বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা) সম্মত হন না। অপরন্তু ব্যয়-বাহুল্যবশতঃ অধিকাংশ গৃহস্থলোকেই রোগীর সেবার নিমিত্ত নার্স্‌ নিযুক্ত করিতে অসমর্থ হইয়া থাকেন। আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে নার্সে্‌র নিয়োগ-ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়া এখনও বহুসময়-সাপেক্ষ। যাঁহারা নার্স্‌ নিয়োগ করিতে সমর্থ,

তাঁহাদিগের বাটীতেও দেখা যায় যে নার্স্ নিযুক্ত থাকিলেও তাঁহাদের পরিবারস্থ স্ত্রীলোকগণ হৃদয়ের আবেগবশতঃ স্বেচ্ছায় এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, নার্স্‌কে বড় কিছু করিতে দেন না। সুতরাং যখন এখনও অনেক দিন পর্য্যন্ত আমাদিগের পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগের হস্তে রোগীর শুশ্রূষার ভার অর্পিত থাকিবে, তখন এ বিষয়ের প্রকৃত শিক্ষা তাঁহাদিগের মধ্যে যাহাতে বিস্তার লাভ করে, তজ্জন্য এদেশীয় চিকিৎসকমাত্রেরই সবিশেষ চেষ্টা করা উচিত। রোগ আরোগ্য হওয়া সুচিকিৎসা ও শুশ্রূষা, এই উভয় ব্যবস্থার উপর সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করে; একের অভাব হইলে রোগ-উপশমের সবিশেষ ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। চিকিৎসক যদি সেবা-কার্য্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তির সহায়তা প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে রোগীর চিকিৎসা সম্বন্ধে তাঁহার ভাবনা অনেক পরিমাণে কমিয়া যায় এবং তিনি শীঘ্র তাঁহার চিকিৎসার সুফলের পরিচয় প্রাপ্ত হন। এই জন্য বলিয়াছি যে যাহাতে শুশ্রূষা সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান বিস্তারিত ভাবে আমাদিগের সমাজে প্রচারিত হয়, তদ্বিষয়ে প্রত্যেক চিকিৎসকেরই সবিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত।

অনেক সময়ে যাঁহারা সেবা করেন, তাঁহাদিগের অজ্ঞতাবশতঃ পরিবারের মধ্যে সংক্রামক রোগের পরিব্যাপ্তি ঘটিয়া থাকে। এই অনভিজ্ঞতা হেতু কত আশাপ্রদ জীবন-প্রদীপ অকালে নির্ব্বাপিত হইয়া যাইতেছে, কত পরিবারের সুখ শান্তি চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইতেছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। সুতরাং সেবা সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান আমাদের দেশে বিস্তৃতভাবে প্রচারিত হইলে যে অশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

প্রথমতঃ আমরা সংক্রামক রোগের শুশ্রূষার সাধারণ ব্যবস্থাগুলির বিষয় আলোচনা করিব। পরে রোগ-বিশেষে যে সকল বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়, তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই চারিটী কথার উল্লেখ করিব।

সাধারণ ব্যবস্থা।—যে কোন সংক্রামক রোগে রোগীর সহিত সুস্থ ব্যক্তির মেশামিশি যত কম হয়, ততই রোগের পরিব্যাপ্তি হইবার সম্ভাবনা অল্প হইয়া থাকে। এ কারণ সংক্রামক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে সুস্থ ব্যক্তি হইতে যতদূর সম্ভব, পৃথক্ করিয়া রাখা উচিত। এ বিষয়ে আমরা যথোচিত সাবধান হই না বলিয়া অনেক সময় আমাদিগকে গুরুতর বিপদ ভোগ করিতে হয়। রোগীর জন্য এরূপ একটী স্বতন্ত্র গৃহ নির্ব্বাচন করিতে হইবে, যাহার মধ্যে পরিবারস্থ অপর কাহারও সর্ব্বদা যাইবার আবশ্যকতা হয় না। এই গৃহের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ আলোক ও বায়ু প্রবেশের সুবিধা থাকা উচিত। যথোচিত বায়ু ও আলোকের অভাবে গৃহ সর্ব্বদা আর্দ্র ও দুর্গন্ধযুক্ত থাকিবার সম্ভাবনা; এরূপ গৃহে রোগী বাস করিলে, রোগ ও রোগের সংক্রামক-গুণ, উভয়ই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং রোগীর চিত্তও সর্ব্বদা অপ্রফুল্ল থাকে। যদি বাসগৃহ দ্বিতল বা ত্রিতল হয়, তাহা হইলে রোগীর গৃহ সর্ব্বোচ্চতলে অবস্থিত হওয়া শ্রেয়স্কর। গৃহটী এক পার্শ্বে ও সাধারণের গমনাগমনের পথ হইতে দূরে অবস্থিত হওয়া উচিত, কারণ ঐ গৃহের নিকট দিয়া সর্ব্বদা লোক যাতায়াত করিলে

রোগীর বিশ্রামের যে সবিশেষ ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে, শুধু তাহাই নহে, এতদ্বারা নানা কারণে ঐ রোগ সুস্থ ব্যক্তির শরীরে সংক্রামিত হইবার সম্ভাবনা।

রোগীর মলমূত্রত্যাগের ব্যবস্থা তাহার গৃহের সন্নিকটে কোন স্থানে হওয়ার নিতান্ত প্রয়োজন। যে স্থান বাটীর অপর সকলে মলমূত্রত্যাগের জন্য ব্যবহার করিয়া থাকেন, তথায় রোগীর গমন করা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নহে। অধিকাংশ সংক্রামক রোগে মলমূত্রের সহিত রোগোৎপাদক বীজাণু দেহ হইতে নির্গত হইয়া যায়, সুতরাং এরূপ ব্যবস্থা দ্বারা পরিজনবর্গের মধ্যে রোগের পরিব্যাপ্তি সহজেই সংঘটিত হইয়া থাকে। অতএব সংক্রামকরোগগ্রস্ত ব্যক্তির মলমূত্রত্যাগের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র স্থানে হওয়া আবশ্যক। ঐস্থানে স্বতন্ত্র পাত্র রাখিয়া মলমূত্র ত্যাগের পর উহার সহিত কোন বিশোধক ঔষধ (Disinfectant) মিশ্রিত করিয়া উহাকে বাটী হইতে স্থানান্তরিত করিয়া দিলে রোগের পরিব্যাপ্তি বিশেষভাবে নিবারণ করা যাইতে পারে।

যে গৃহ রোগীর অবস্থানের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়, তন্মধ্যে গৃহসজ্জা যত কম থাকে, ততই রোগীর পক্ষে শুভজনক। রোগীর গৃহে যথেষ্ট পরিমাণ বায়ুস্থান (Air-space) থাকা কর্ত্তব্য। গৃহসজ্জার পরিমাণ যত অধিক হইবে, গৃহের বায়ুস্থান ততই কমিয়া যাইবে, সুতরাং ইহা দ্বারা রোগ উপশমের ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। যাঁহারা রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করিবেন, তাঁহাদের আহার, বিশ্রাম ও শয়নের জন্য রোগীর গৃহের পার্শ্বে আর একটী ঘর থাকা আবশ্যক। অভাবপক্ষে রোগীর গৃহে রোগীর বিছানা ব্যতীত, যিনি তাঁহার সেবা করিবেন তাঁহার শয়নের জন্য, একটী স্বতন্ত্র বিছানার বন্দোবস্ত থাকা উচিত। যিনি শুশ্রূষা করিবেন, রাত্রিকালে রোগীর সহিত তাঁহার এক বিছানায় শয়ন করা নিতান্ত দোষাবহ। মশার উপদ্রবের জন্য রাত্রিকালে মশারি খাটাইবার আবশ্যক হয়; রোগীর সহিত এক মশারির মধ্যে শয়ন করিলে সুস্থ ব্যক্তির ঐ রোগে আক্রান্ত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। অনেকস্থলে স্বামী হইতে স্ত্রীর অথবা স্ত্রী হইতে স্বামীর দেহে ক্ষয়কাশ এইরূপে বিস্তার লাভ করিতে দেখা গিয়াছে। এই দুইটী বিছানা ব্যতীত ঔষধ ও পথ্যাদি রাখিবার জন্য একখানি চৌকি বা একটী টেবিল্, একটী ফুলদানি একখানি চেয়ার্ বা টুল্, রোগীর বস্ত্র, তোয়ালিয়া, গামছা প্রভৃতি রাখিবার জন্য একটী আল্না, একটী পিক্দানি, একটী জলের কুঁজা ও গেলাস এবং একটী ঘড়ী উক্ত গৃহে রাখিবার আবশ্যক হয়। গৃহ বিস্তৃত হইলে তন্মধ্যে একখানি আরামচৌকি রাখা যাইতে পারে; যিনি রোগীর সেবায় নিযুক্ত থাকিবেন, প্রয়োজন মত তিনি উহা ব্যবহার করিতে পারিবেন। সাধারণতঃ রোগীর গৃহে অপর কোনরূপ গৃহসজ্জার আবশ্যক হয় না। সুতরাং অনাবশ্যক গৃহসজ্জা যত শীঘ্র স্থানান্তরিত করা যায়, ততই রোগীর সত্বর আরোগ্য লাভের সুবিধা হইয়া থাকে। অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে আলমারি, সিন্দুক, তোরঙ্গ, বাক্স, বোঝাকরা ময়লা কাপড় ও বিছানার দ্বারা

রোগীর গৃহ পরিপূর্ণ থাকে। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, সংক্রামক রোগের বীজাণু, বস্ত্র বা শয্যাদির সহিত একবার সংলগ্ন হইলে, উহাকে সহজে দূরীকৃত করিতে পারা যায় না এবং উহা এইরূপে বস্ত্র বা শয্যাদির সাহায্যে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হইয়া সংক্রামক রোগের পরিব্যাপ্তি সংঘটন করে। সুতরাং অপ্রয়োজনীয় শয্যা ও বস্ত্রাদি, যত দূর সম্ভব, রোগীর গৃহ হইতে দূরে রাখিয়া দিবে। যদিও অনেকস্থলে আমাদিগের অর্থাভাব এবং বাসগৃহে যথোচিত স্থানের অসদ্ভাব হেতু এইরূপ অব্যবস্থা ঘটিতে দেখা যায়, তথাপি ইহার সমূহ অনিষ্টকারিতা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিলে সকলেই যথাসাধ্য এবিষয়ে সাবধান হইতে চেষ্টা করিবেন।

যিনি শুশ্রূষা করিবেন, রোগীর গৃহের বাহিরে তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রাদি রাখিবার জন্য একটী স্বতন্ত্র আল্‌না রাখা কর্ত্তব্য। যে বস্ত্র পরিয়া রোগীর শুশ্রূষা করা যায়, তাহা লইয়া বাটীর অন্য কোন স্থানে গমন করা কদাচ উচিত নহে। কিন্তু এই নিয়মের পালন সম্বন্ধে আমাদিগের পরিবারস্থ স্ত্রীলোকেরা নিতান্ত ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। রোগীর সেবা করিতে করিতে অন্য কোন গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিতে যাওয়া তাঁহাদের সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে। রন্ধন বা ভাণ্ডার গৃহে যোগাড় দিবার জন্য, পরিজনদিগের আহারাদির বন্দোবস্ত করিবার জন্য, অথবা রোগীর পথ্যাদি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত তাঁহারা সর্ব্বদাই রোগীর গৃহ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, কিন্তু বিশোধক ঔষধ ও সাবান দ্বারা হস্ত পদ ধৌত করিয়া এবং বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য বস্ত্র পরিধান করিয়া গৃহকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে যে অনেক বিপদের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেও তাহার পালন সম্বন্ধে তাঁহাদের যে বিশেষ কোন দায়িত্ব আছে তাহা তাঁহারা উপলব্ধি করেন না। এই অনবধানতা বশতঃ পরিবারস্থ একের অধিক লোকের কলেরা, টাইফয়েড্ জ্বর, হাম, রক্তআমাশয় প্রভৃতি সংক্রামক রোগ সংঘটিত হইয়া থাকে। অবশ্য রোগ সংক্রামক না হইলে ইহা তত দোষের হয় না বটে, কিন্তু অনেক স্থলে রোগ সংক্রামক কিনা, তাহা প্রথম অবস্থায় নির্দ্ধারণ করা বড়ই সুকঠিন; এমন কি, চিকিৎসকেরাও এ বিষয়ে অনেক সময়ে নিশ্চয় করিয়া কোন কথা বলিতে সমর্থ হন না। সুতরাং রোগীর স্পৃষ্ট বস্ত্র পরিধান করিয়া বাটীর অন্যত্র না যাওয়াই সুবিবেচনার কার্য্য। ইহাতে অসুবিধা কিছুমাত্র নাই অথচ ইহা পালন করিলে অনেক ভবিষ্যৎ বিপদের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। আমাদিগের পরিবারস্থ রমণীরা প্রাণ উৎসর্গ করিয়া রোগীর সেবা করিয়া থাকেন, তজ্জন্য তাঁহারা আমাদিগের নমস্যা। তাঁহাদিগের নিকট আমার নিবেদন এই যে তাঁহারা যেন শুশ্রূষা সম্বন্ধে এই সহজ নিয়মগুলি পালন করিয়া তাঁহাদের কার্য্য একেবারে নির্দ্দোষ করিতে যত্নবতী হয়েন।

রোগীর গৃহের বাহিরে তাহার মলমূত্র ত্যাগ করিবার পাত্র, জল সাবান, বিশোধক ঔষধাদি সর্ব্বদা ব্যবহারের উপযোগী করিয়া রাখা উচিত। এই সকল দ্রব্য যথাস্থানে রক্ষিত হইলে দরকারের সময় উহাদিগকে সংগ্রহ করিবার জন্য ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি

করিবার আবশ্যক হয় না, সুতরাং রোগী বা যিনি তাহার সেবা করেন, কাহাকেও কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না।

যাহাদের অবস্থা স্বচ্ছল নহে, যাহাদের বাটীতে দুই একটির অধিক ঘর নাই অথচ পরিজনবর্গের সংখ্যা অধিক, যাহাদের বাস গৃহ ও তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ স্থানের অবস্থা স্বাস্থ্যকর নহে এবং যাহাদের লোকবল কম, এরূপ পরিবারের মধ্যে সংক্রামক রোগ উপস্থিত হইলে রোগীকে সাধারণ চিকিৎসালয়ে প্রেরণ করাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ব্যবস্থা। আমাদের দেশের লোকের, সাধারণ চিকিৎসালয়ের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার উপর, বিশেষ শ্রদ্ধা দেখিতে পাওয়া যায় না। তদুপরি জাতিনাশ, শবব্যবচ্ছেদ প্রভৃতি নানাবিধ অমূলক আশঙ্কার বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা সাধারণ চিকিৎসালয়ে গমন করিতে আপত্তি করিয়া থাকে। আজ কাল সাধারণ চিকিৎসালয় সমূহে সুচিকিৎসা ও শুশ্রূষার যেরূপ সুব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে, সাধারণ লোকের বাটীতে তাহা ঘটিয়া উঠা একেবারেই সম্ভবপর নহে। যে একবার হস্‌পিটালে থাকিয়া আসিয়াছে, তাহার মুখে তথাকার প্রশংসা ব্যতীত নিন্দা কখনই শুনা যায় না। যাহারা এ সম্বন্ধে কিছু জানে না বা কিছু দেখে নাই, তাহাদেরই মুখে হস্‌পিটালের নিন্দা শুনিতে পাওয়া যায়। আমাদের গরীব দেশে যত অধিক লোক হস্‌পিটালে যাইয়া চিকিৎসা করাইবে, ততই সঞ্চয় ও আরোগ্য উভয় বিষয়েই তাহারা সুফল লাভ করিবে এবং সংক্রামক রোগের পরিব্যাপ্তিও সবিশেষ কমিয়া যাইবে। বোম্বাই সহরে যখন প্লেগের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব, তখন তথাকার একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার বলিয়াছিলেন যে, প্লেগের সময় সাধারণ চিকিৎসালয় সমূহই প্লেগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ্‌ স্থান। ইহা সাধারণ চিকিৎসালয়-গুলির পক্ষে সামান্য প্রশংসার কথা নহে। যাঁহারা শিক্ষিত এবং যাঁহাদের হস্‌পিটালের কার্য্য ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া সাধারণ লোকের মনে হস্‌পিটাল্‌ সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কার আছে, তাহা যদি অপনোদন করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে দেশের একটী প্রকৃত উপকার সাধন করা হয়।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যাঁহারা রোগীর সেবা করিবেন, পরিবারস্থ অপর কাহারও সহিত তাঁহাদের মেশামিশি না হইলেই ভাল হয়। একারণ যাঁহাদের শিশু সন্তান পালন করিতে হয়, তাঁহাদের উপর রোগীর সেবার ভার ন্যস্ত হওয়া কোন মতেই উচিত নহে।

দুই তিনজন লোকের উপর "পালা" করিয়া রোগীর সেবার ভার অর্পণ করা উচিত। অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্নেহাধিক্যবশতঃ ৩৪ জন লোক একত্রে রোগীর কাছে দিবারাত্রি বসিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা তাঁহাদের সকলেরই শরীর শীঘ্র অপটু হইয়া পড়ে এবং এরূপ ব্যবস্থায় আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে পূর্ণমাত্রায় সেবার কার্য্য প্রাপ্ত হই না। "পালা" করিয়া কার্য্য করিলে অল্প পরিশ্রমেই কার্য্যের সুশৃঙ্খলা হইয়া থাকে।

রোগীর গৃহে যাঁহারা সেবা করিবেন, তাঁহারা ব্যতীত অপর কাহাকেও প্রবেশ

করিতে দেওয়া সঙ্গত নহে। এই ব্যবস্থা যদি দৃঢ়ভাবে পালন করা যায়, তাহা হইলে অনেক সময়ে যাহার সংক্রামক রোগ হইয়াছে, রোগ তাহারই মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া যায়, পরিবারের মধ্যে বা পল্লীর মধ্যে পরিব্যাপ্তি লাভ করিবার অবকাশ পায় না। আমরা কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত কার্য্য করিয়া থাকি। রোগ যতই সঙ্কট হয়, রোগীর গৃহ ততই একটী "হাটে" পরিণত হইতে থাকে। আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব সকলেই, প্রয়োজন সত্বে বা প্রয়োজনের অভাবে, তথায় সমাগত হইয়া গৃহের বায়ু দূষিত করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কলরবে রোগীর বিশ্রামের ব্যাঘাত হয় এবং তাহার বিশুদ্ধ বায়ু সেবনেরও (যাহা তাহার পক্ষে ঔষধ অপেক্ষাও অধিক প্রয়োজনীয়) সবিশেষ অসুবিধা উপস্থিত হয়। একেত আমরা রোগীর ঘরের তাবং বায়ু-পথ রুদ্ধ করিয়া রাখা শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া থাকি, তাহার উপর গৃহের মধ্যে জনতা হইলে উক্ত গৃহের বায়ুর কিরূপ দুরবস্থা হয়, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। আমরা মনে করি যে বাহির হইতে রোগীর সংবাদ লইলে প্রকৃত আত্মীয়তা প্রদর্শন করা হয় না, রোগীর গৃহে যাইয়া তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিলে পর, তবে আপনার লোকের কায করা হয়। রোগী অনেক সময়ে এই ভালবাসার উপদ্রবে নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়ে; পরিবারবর্গ অবশেষে চিকিৎসকের সাহায্য লইয়া এই অত্যাচার নিবারণ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের ভালবাসা এতই বেগবান্ যে অনেকস্থলে চিকিৎসকের অনুজ্ঞায়ও কোন সুফল দর্শিতে দেখা যায় না। বাস্তবিক, এ বিষয়ে আমাদিগের অবিবেচনার কথা মনে করিয়া বড়ই লজ্জিত হইতে হয়। আমি আশা করি যে উপরোক্ত কয়েক ছত্র যাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে, তাঁহারা যেন এরূপ আচরণের অবৈধতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ইহা হইতে নিবৃত্ত থাকিবার জন্য সকলকে সদুপদেশ প্রদান করেন। বিশেষতঃ এ কথা যেন সকলে মনে রাখেন যে অধিকাংশ স্থলে রোগীর গৃহে লোক-সমাগমহেতু সংক্রামক রোগের বিস্তৃতি সাধিত হইয়া থাকে। ক্রমশঃ

শ্রীচুনীলাল বসু।

প্রাণের কথা

এ প্রাণ আমার পাঠিয়ে দেব
তোমার দিকে,
তোমার কথা প্রাণের পাতে
আনব লিখে,
পড়ব খুলি যখন আমার
ইচ্ছা হবে,
আমার প্রাণে তোমার কথা
নিত্য র'বে।

যখন তোমায় পাব না হায়
জ্ঞানে ধরি,
মনের মাঝে পাব না কো
মনন্ করি,
তখন তুমি থাকবে আমার
প্রাণে আঁকা,
অচেতনে র'ব আমি
চেতন মাখা।

শ্রীহেমলতা দেবী।

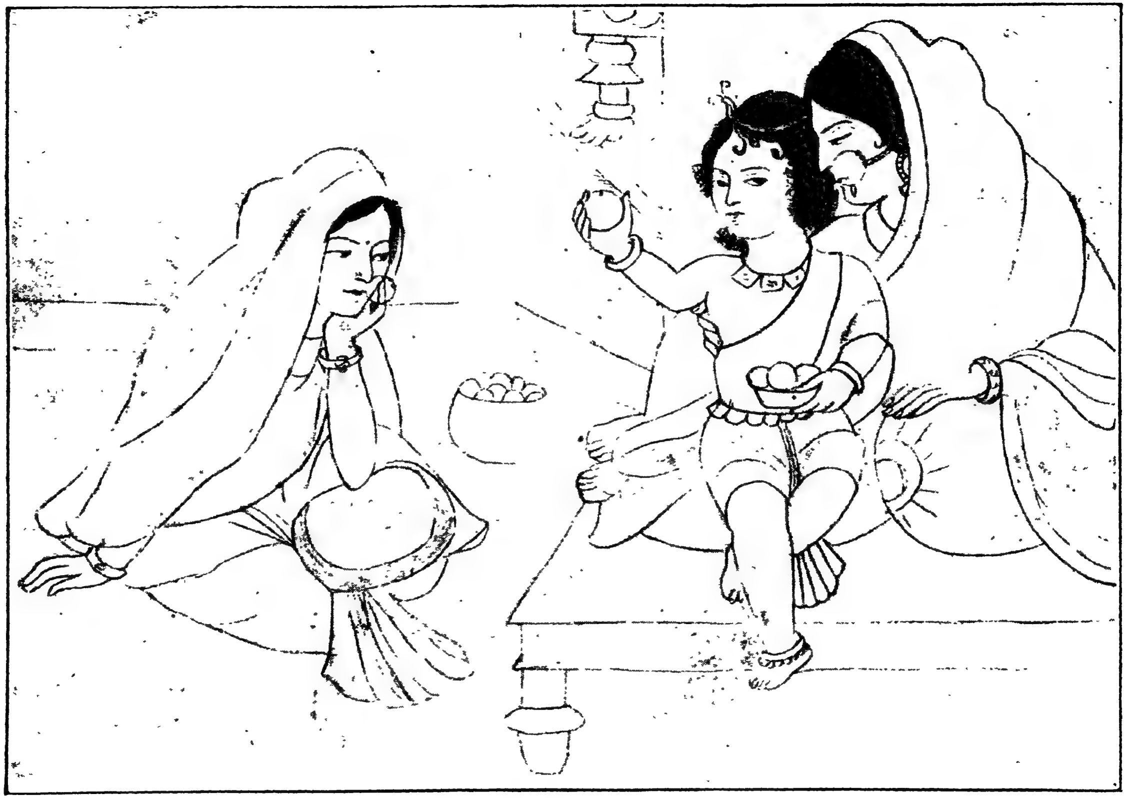

মা যশোদা

(শ্রীমতী সুনয়নী দেবী অঙ্কিত চিত্র হইতে)

নিরুদ্দেশ

প্রান্তর হতে একে একে গাভীগুলি
পৃষ্ঠে বুলায়ে পুচ্ছ, উড়ায়ে ধূলি,
মন্থর পদে গোয়ালে আইয়া ফিরে',
লেহিছে আলসে কান্ত বৎসটিরে।

তপন তখন পশ্চিমে গেছে ডুবে'।
পাণ্ডু চন্দ্র ফুটিতে চাহিছে পূবে।
ভরিয়া গিয়াছে রঙীন রশ্মি লেগে'
অম্বরতল উজল খণ্ড মেঘে।

সন্ধ্যা-আঁধারে কুহেলির কালি মাখা
মন্দ পবনে কাঁপিছে পাদপ শাখা ;—
নিবিড় তিমির সাপটি' বিরাট ডানা
যেন বারবার আলোরে দিতেছে হানা!

বেদনা-বিবশ, স্তব্ধ, মৌন সাঁঝে
একা পড়ে' আছি শূন্য কক্ষ মাঝে,
সমুচ্ছ্বসিত শ্রান্তি ও অবসাদে
গুণ্ঠিত হ'য়ে গুমরি' এ হিয়া কাঁদে!

মুক্ত করিয়া ধীরে বাতায়ন খানি,
তাপিত এ ভাল থুইনু তথায় আনি'।
গগনে চাহিয়া দেখিনু—বর্ণরাশি
আঁধার-দৈত্য ফেলিতেছে ধীরে গ্রাসি'।

* * *

হেন কালে তুই—কেরে তুই ছোট পাখী
ক্ষিপ্র গতিতে ছুটে যাস্ ডাকি' ডাকি'?
একা, একা, একা, এ ঘোর আঁধারে ঠেলি
কোথা যাস্ ওরে, ক্ষুদ্র পক্ষ মেলি'!

ওরে পাখি, ওরে অসহায় ছোট পাখি,
কুলায় যে তোর কোথায় জানিস্ না কি?
এ ঘন আঁধারে ও দু'টি পক্ষ দিয়ে
আলোড়ি' এমন, কোথায় পড়িবি গিয়ে।
ওরে, তুই আর এখন যাবিরে কোথা?
(মরি, ওই বুকে এ কি তোর আকুলতা!)
মূর্চ্ছিত হ'য়ে মহা ক্লান্তির ভরে
উলটি পড়িবি যখন পাথার 'পরে,
কে তোরে তখন বাঁচাবে বক্ষে তুলি?
—থাম্, থাম্! আহা যাস্‌নেরে পথ ভুলি'!

ছুটে যায় তবু। কহিনু তাহারে হাঁকি'—
কোথা যাবি আর অসীমের পোষা পাখি!
আঁধার মথিয়া কোথায় যাস্‌রে চলি'?
—থাম্, থাম্, ওরে, শোন দুটো কথা বলি।

চলে' গেল ; মরি—মিলাল তিমির তলে!
ধাইনু তাহার উদ্দেশে আঁখি-জলে।
আঁধারে বারেক শুনিনু মাঠের পরে
দূরে—অতি দূরে ক্ষীণতর সেই স্বরে!

* * *

আঁধারের ভাষা উঠিল তখনি ফুটে',—
জলদ-মন্দ্রে জলধি গর্জ্জি উঠে!
বুঝিলাম ;—হায়, এ জীবনো অসহায়
এমনি তো ধীরে তিমিরে মিলায়ে যায়!

শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী।

দৈত্যের স্বর্গ

(Oscar Wilde লিখিত গল্প অবলম্বনে)

প্রতিদিন পাঠশালার ছুটির পর ছেলে মেয়েরা দৈত্যের প্রমোদ কাননে খেলিতে আসে।

দৈত্যের ভারি সখ, স্বর্গে যেমন নন্দন কানন, তেমনি মর্ত্যে একটি নন্দন কানন সে তৈরি করিয়া তুলিবে;—সেই জন্য যেখানে যে ভালো জিনিসটি দেখিত, জোগাড় করিয়া আনিয়া, তাহার বাগানে সাজাইয়া রাখিত।

কাননটি যেমন প্রকাণ্ড—শেষ দেখা যায় না, তেমনি চমৎকার—যেন ছবিখানি! সমস্ত বাগানখানির বুক জুড়িয়া নবীন তৃণপুঞ্জের কোমল শ্যামলতায় চোখ জুড়াইয়া যায়; মাঝে মাঝে সাদা সাদা ফুলগুলি যেন তারা ছড়াইয়া গিয়াছে। এই বাগানে প্রবেশ করিয়া ছেলেমেয়েরা মোহিত হইয়া যায়। স্তরে স্তরে সাজানো কত যে ফুল! তাহাদের বর্ণে, গন্ধে, বিচিত্রতায় শিশুদের চক্ষু উল্লসিত হইয়া উঠে, মন মাতোয়ারা হইয়া যায়। আবার যখন পাখীর কাকলী চারিদিকে সুরের ফোয়ারা খুলিয়া দিত, তখন কোথায় পড়িয়া থাকিত তাহাদের খেলাধূলা! তাহারা সব ভুলিয়া তন্ময় হইয়া সেই গান শুনিত। এমন আনন্দের মেলা শিশুরা আর কোথাও পাইত না।

হঠাৎ একদিন দৈত্য ফিরিয়া আসিল। সে গিয়াছিল তাহার এক বন্ধুর কাছে কি-একটা কথা বলিতে। কথা বেশী ছিল না; —সাত বৎসরের মধ্যেই তাহার বলিবার কথাটুকু ফুরাইয়া গেল। কাজেই সে চট করিয়া কাজ সারিয়া নিজের আস্তানায় ফিরিয়া আসিল।

আসিয়া দেখে এই ব্যাপার! তাহার বাগান জুড়িয়া ছেলেমেয়েরা হট্টগোল জুড়িয়াছে, —জিনিস পত্র সব তচনচ করিয়া ফেলিতেছে! এমন করিয়া উৎপাত করিলে তাহার নন্দন কানন কেমন করিয়া তৈরি হইবে! সে চটিয়া আগুন হইয়া উঠিল; চোখ দুটা পাকাইয়া এক একটা করিয়া ছেলের টুঁটি চাপিয়া ধরিয়া বাগান হইতে বাহির করিয়া দিল। বলিল—"দূর হ! খবরদার আর আসিসনে!" তারপর, আর কেহ আসিয়া যাহাতে বাগান নষ্ট করিতে না পারে তাহার জন্য সমস্ত বাগান বেড়িয়া আকাশ প্রমাণ এক প্রকাণ্ড পাঁচিল গাঁথিয়া দিল, এবং পাঁচিলের গায়ে একখানা কাঠ মারিয়া তাহার উপর বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া দিল—

প্রবেশ নিষেধ।

ছেলেদের খেলা ঘুচিয়া গেল। কোথায় আর তাহারা খেলে? পথের ধূলা-কাঁকরের উপরে বসিয়া তো আর খেলা যায় না। কাজেই তাহারা দৈত্যের প্রমোদ কাননের বাহিরে বাহিরে ম্লান মুখে ঘুরিয়া বেড়ায়,— বাগানের সেই খেলার কথা মনে পড়িয়া তাহাদের দীর্ঘনিশ্বাস উঠে।

দেখিতে দেখিতে শীত গিয়া দেশের চারিদিকে বসন্ত আসিবার সাড়া পড়িয়া গেল; —তাহার রথের ধ্বজা শীতের কুয়াশা ভেদ করিয়া দেখা দিল;—ফুলের গন্ধে, পাখীর গানে, আকাশের নীলিমায় বসন্তের আবির্ভাব ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! দেশের সর্ব্বত্র বসন্তের হিল্লোল লাগিল—লাগিল না শুধু প্রাচীর-ঘেরা এই স্বার্থপর দৈত্যের প্রমোদ কাননে। সেখানে জাগিয়া রহিল তখনও জমাট শীত। ছেলেদের সাড়া না পাইয়া ফুল ভাবিল বুঝি তাহার এখনো ফুটিয়া উঠিবার সময় হয় নাই; পাখী বলিল—গান গাহি আর কাহার জন্য? সবাই চুপ করিয়া ঘুমাইয়া রহিল। কোনোদিন কোনো-এক পুষ্পশিশু বাহিরে কি হইতেছে জানিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া যদি বা ঘাসের ভিতর হইতে মাথা তুলিয়া একবার উঁকি মারিয়াছিল কিন্তু যখন দেখিল কেহ কোথাও নাই, কাহারও আসিবার সাধ্যও নাই, সম্মুখে আকাশ-প্রমাণ প্রাচীর, তাহার গায়ে বড় বড় করিয়া লেখা "প্রবেশ নিষেধ!" তখন সে মুখখানি মলিন করিয়া ঘাসের মধ্যে আবার ঘুমাইয়া পড়িল। ফুল আর ফুটিল না, পাখীও আর ডাকিল না; বসন্তের বাতাসও তবে বহিল না।

দৈত্য দারুণ শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে ভাবিতে লাগিল - এবার ব্যাপার কি! শীত যে যাইতে চাহে না, ক্রমেই বরফের স্তূপ মাটি চাপিয়া বসিতেছে, উত্তরে বাতাসের তীক্ষ্ণতা ক্রমেই বাড়িতেছে, তাহার উপর শিলাবৃষ্টিও দেখা দিয়াছে—প্রাণ যায়।

দৈত্য প্রতিদিন সকালে লেপের ভিতর হইতে একটুখানি মুখ বাহির করিয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া দেখিত, বসন্ত আসিয়াছে কি, না, উৎকর্ণ হইয়া শুনিত, বসন্তের কোনো সাড়া পাওয়া যায় কি না। কিন্তু হায়, কোথায় বসন্ত! শীতের বাতাস কেবলই হুঙ্কার দিয়া ফিরিতেছে—সমস্ত বিশ্বের প্রাণ যেন তাহারই তলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে! এই সব দেখিয়া জড়সড় হইয়া সে লেপের ভিতর আবার মুখ লুকাইয়া ফেলিত।

এমনি করিয়া, দিনের পর দিন গেল, মাসের পর মাস গেল, কিন্তু হায়, বসন্ত আসিল কৈ! দৈত্য ক্রমেই অস্থির হইয়া উঠিতেছিল। প্রকৃতির শ্যামলতা নাই, ফুলের সৌরভ নাই, পাখীর গান নাই; - দৈত্যের কানন যেন শ্মশান! এত যত্ন করিয়া সে যে নন্দন কানন সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছিল তাহা আজ কাহার অভিশাপে এমন শ্মশান হইয়া যাইতেছে! কোথায় আমোদ, কোথায় প্রমোদ, কোথায় আনন্দ! চতুর্দ্দিকেই কেবল বিভীষিকা। বরফের স্তূপ জমিয়া জমিয়া দৈত্যের চেয়েও ভয়ঙ্কর দৈত্য-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উঠিতেছে; বাতাসের হুঙ্কারে বুক কাঁপিয়া উঠে। দৈত্য আকুল হইয়া প্রার্থনা করিল—"হে ভগবান! দূর কর এ বিভীষিকা। দাও বসন্তের হিল্লোল, জীবনের কল্লোল, নন্দন-কাননের শোভা! নইলে যে আর বাঁচি না!"

সেই দিনই ভোরবেলা দৈত্য শুনিল, যুগযুগান্তের বিস্মৃতি ভেদ করিয়া কোথা হইতে একটি চমৎকার সুখের লহরী ভাসিয়া আসিতেছে। দৈত্য এক-মনে শুনিতে লাগিল;

—তাহার সমস্ত শরীরের উপর পুলকের রোমাঞ্চ ফুটিয়া উঠিল;—এত কালের সঞ্চিত অবসাদ মুহূর্ত্তের মধ্যে দূর হইয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি শয্যা ছাড়িয়া উঠিতেই বুঝিতে পারিল, তাহারই রুদ্ধ জানালার বাহিরে বসিয়া পাখী গান ধরিয়াছে। সে যেন গাহিতেছে—"ওগো জাগো, জাগো! রুদ্ধ দুয়ার আজ খুলে দাও—অতিথি তোমার দুয়ারে!"

দৈত্য তখনই ঘরের দরজা, জানালা সব খুলিয়া দিল;—অমনি বসন্তের বাতাস-পুষ্প-সৌরভের বরণ-ডালা লইয়া তাহাকে অভিবাদন করিল! দৈত্য দেখিল, ভোর না হইতেই তাহার বাগানে আজ আনন্দের মেলা বসিয়া গিয়াছে,—কে যেন রূপের হাট খুলিয়া বসিয়াছে! গন্ধে, বর্ণে, গানে মাতামাতি চলিতেছে! কে এমন করিল রে! কোথা হইতে এ আনন্দের বন্যা আজ দেখা দিল রে! দৈত্য জানালায় দাঁড়াইয়া অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল।

হঠাৎ দেখিল, তাহার বাগানের সেই প্রকাণ্ড পাঁচিলের গায়ে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্রের ভিতর দিয়া পিল্ পিল্ করিয়া দলে দলে চঞ্চল শিশুরা নৃত্য করিতে করিতে প্রবেশ করিতেছে;—তাহাদেরই সঙ্গে সঙ্গে সেই ছিদ্রটুকুর মধ্য দিয়া বসন্তের বাতাস আসিয়া বাগানের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতেছে।—যেখানে শিশুরা যাইতেছে সেই খানেই ফুল ঘুম ভাঙিয়া জাগিয়া উঠিতেছে। ছেলেরা বসিয়া গিয়াছে গাছের ডালে ডালে;—তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া ফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে থরে বিথরে; তাহাদের সাড়া পাইয়া পাখীরা গাহিয়া উঠিয়াছে মহা আনন্দে! শিশুদের চরণ স্পর্শে তৃণ জাগিয়া উঠিতেছে, তাহাদের নিশ্বাসে পুষ্প বিকশিত হইয়া উঠিতেছে, তাহাদের কলস্বরে পাখী গাহিয়া উঠিতেছে এ যেন মায়ার খেলা!

দৈত্য অবাক হইয়া দেখিত লাগিল। দেখিতে দেখিতে সে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। জানালার ধারে বসিয়া পাখীটা তখনও চীৎকার করিয়া গাহিতেছিল—"ওগো অতিথি তোমার দুয়ারে!—দেখ, অতিথি তোমার দুয়ারে!"

এমনি করিয়া পাখীর ডাক বার বার তাহার কঠিন হৃদয় দুয়ারে আঘাত দিতে লাগিল। দৈত্য খানিকক্ষণ চুপ করিয়াছিল, কিন্তু তার পর আর ঘরে থাকিতে পারিল না। সে ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল। অমনি মুক্ত আকাশের তল হইতে বসন্তের হিল্লোল আসিয়া তাহাকে একেবারে বন্দী করিয়া ফেলিল। তখন আর কোনো দিকে তাহার দৃকপাত রহিল না;—ছেলেরা কে কোথায় ফুল ছিঁড়িতেছে, গাছ ভাঙিতেছে, বাগান নষ্ট করিতেছে সে দিকে তাহার মনই গেল না;—সে কেবল অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল, তাহার কানন যে আজ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে! এত দিন ধরিয়া, এত জিনিস দিয়া সাজাইয়া সে যাহার সৌন্দর্য্যকে শেষ করিয়া তুলিতে পারে নাই—আজ এক নিমেষে তাহা সম্পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে;—বাগানের যেন আর-কিছু অভাব নাই—আর কিছু বাকি নাই। দৈত্য অবাক হইয়া ভাবিতেছিল, ইহা কেমন করিয়া হইল—কোন্ মায়াবীর মায়াবলে এ অসাধ্য সাধন হইয়া গেল!

দৈত্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল।

হঠাৎ দূর হইতে দেখিল, একটি ছোট্ট ছেলে গাছের একটি শাখা ধরিয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে; শাখা তাহার বুকের কাছ অবধি নুইয়া আসিয়া বলিতেছে—"ওঠ! ওঠ!" কিন্তু তবুও সে উঠিতে পারিতেছে না বলিয়া কাঁদিতেছে। সে বলিতেছে—"আমি যে বড্ড ছোটো—তুমি আর একটু নীচু হও, নইলে যে পারছি না উঠতে!" কিন্তু শাখা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও আর নত হইতে পারিতেছে না। শিশু আকুল হইয়া কাঁদিতেছে। সবাই গাছের ডালে গিয়া বসিয়াছে, কেবল সে-ই মাটিতে দাঁড়াইয়া। এ দুঃখ সে রাখে কোথায়। চোখ দিয়া তাহার দরদরধারে অশ্রু বহিতেছিল! এমন সুন্দর মুখখানি, আহা, অশ্রুতে মলিন! দৈত্যের মনটা কেমন করিতে লাগিল, সে তাহারই দিকে ছুটিয়া গেল।

দৈত্যকে দেখিয়া ভয়ে আর-সব ছেলেমেয়েরা সেই গর্ত্তটির ভিতর দিয়া পালাইয়া গেল, কেবল এই ছেলেটি চোখের জলে দৈত্যকে দেখিতে পায় নাই বলিয়া পালাইল না। দৈত্য তাহাকে কোলে করিয়া তুলিয়া গাছের ডালে বসাইয়া দিল,—ছেলেটি আনন্দে আত্মহারা হইয়া দৈত্যের গলা জড়াইয়া তাহার মুখ চুম্বন করিল। অমনি দৈত্য যেন কেমনতর হইয়া গেল;—তাহার মূর্ত্তির সে ভীষণতা দেখিতে দেখিতে নিমেষের মধ্যে যেন ঝরিয়া পড়িয়া গেল। যে ছেলেরা ভয়ে পালাইয়াছিল তাহারা অমনি ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল;—কেহ তাহার কাপড় ধরিয়া টানে, কেহ তাহার হাত ধরিয়া টানে, কেহ তাহার কাঁধে উঠিয়া পড়ে, কেহ তাহার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়ে। এমনি করিয়া শিশুরা তাহাদের উচ্ছ্বসিত স্নেহের চিহ্ন আষ্টে পৃষ্ঠে দাগিয়া দিয়া দৈত্যের রূপ একেবারে বদলাইয়া দিল।

চারিদিকে আনন্দের স্রোত বহিতে লাগিল; ক্রমেই সে স্রোত ফুলিয়া ফুলিয়া দুলিয়া দুলিয়া উঠিয়া কাননের সেই পাষাণ প্রাচীরের গায়ে সজোরে আঘাত দিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে অত বড় প্রাচীর মুহূর্ত্তের মধ্যে ভূমিসাৎ হইয়া গেল;—তখন বাহিরে ও ভিতরের সে কোলাকুলি গলাগলি দেখে কে!

সেইদিন হইতে ছেলেমেয়েদের দৈত্যের প্রমোদ কাননে খেলিতে আসিবার আর কোনো বাধা রহিল না।

তাহারা প্রতিদিন যখন-খুসী আসিয়া এইখানে জমায়েৎ হইত;—দৈত্যও তাহাদের সহিত খেলায় যোগ দিত।

ছেলের দল যখন এই প্রমোদ কাননে পুষ্পকুঞ্জের ভিতরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ছুটিয়া ছুটিয়া খেলিয়া বেড়াইত তখন দৈত্যের মনে হইত যেন একটা প্রকাণ্ড ফুলের সমুদ্র দুলিয়া উঠিয়াছে! সে আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া, বিস্ময়ে মুগ্ধ হইয়া, চাহিয়া থাকিত।

সবাই আসে, কিন্তু সে আসে না কেন? দৈত্য যে ছোট্ট ছেলেটিকে কোলে করিয়া গাছে চড়াইয়া দিয়াছিল তাহাকে তো আর দেখা যায় না! দৈত্য প্রতিদিন ব্যাকুলভাবে তাহার কথা সকল ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিত কিন্তু কেহ তাহার কোনো খবর দিতে পারিত না। সকলেই বলিত—"কৈ তাহাকে তো চিনি না!"

তাহার জন্য দৈত্যের এত আনন্দের মধ্যেও যেন একটা বিষাদ জাগিয়া ছিল। সব ছেলেকেই তাহার লাগিত ভালো—কিন্তু বিশেষ করিয়া এই ছেলেটির সেইদিনকার সেই কোমল বাহুস্পর্শ, সেই আলিঙ্গন, সেই চুম্বন সে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না;—এত দিন ধরিয়া এত ছেলের এত আদর, এত চুম্বন সে উপভোগ করিয়া আসিতেছে, কিন্তু তেমনটি কৈ! সে তৃপ্তি কোথায়!—তাই তাহার প্রাণ কেবলই হায় হায় করিয়া বলিত—হায়, সে আসে না কেন? সে আসিবে কবে?

বহু বৎসর কাটিয়া গেছে—দৈত্য বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। সে আর দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলিতে পারে না, কাজেই চুপটি করিয়া ঘাসের উপর পড়িয়া থাকে;—ছেলেমেয়েরা তাহার চারি পাশে খেলিয়া বেড়ায়, সে দেখে। তাহাতেই তাহার আনন্দ।

এমনি করিয়া দৈত্যের দিন যাইতে লাগিল। দিন তো যায়—জীবন তো ফুরায়! তাহার চিরজীবনের সাধনার ধন সেই ছেলেটির দেখা এই অন্তিম সময়েও কি মিলিবে না? হে প্রভু, তাহাকে কি একবার ক্ষণেকের জন্যও আনিয়া দিবে না।—দৈত্য একান্ত মনে এই কথাই ভাবিতে লাগিল।

সে দিন শীত জমাট হইয়া পড়িয়াছে। দৈত্যের মনে হইতেছিল, তাহার দেহ যেন জমিয়া আসিতেছে, নিশ্বাস যেন আর বহিতে চাহে না—প্রাণ যেন ঘুমাইয়া পড়িতে চাহিতেছে। দৈত্য জানালার পানে চাহিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া ছিল। হঠাৎ দেখিল বাগানের একটি কোণ কুয়াসার জাল ছিঁড়িয়া এক অপূর্ব্ব আলোকে আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। সেখানকার শীতার্ত্ত গাছটি আর অবসন্ন হইয়া নাই;—তাহার পুলকিত দেহ ফুলে ফুলে একেবারে ভরিয়া উঠিয়াছে! তাহারই তলে দাঁড়াইয়া—ফুলের মধ্যে লুকাইয়া সেই ছোট্ট ছেলেটি!

দৈত্য অবাক!

তাহার এতদিনের সাধনার ধন কি আজ সত্যই ফিরিয়া আসিয়াছে!

ছুটিয়া গিয়া ছেলেটিকে বুকে তুলিয়া লইবার জন্য তাহার প্রাণ আকুলি ব্যাকুলি করিতে লাগিল, কিন্তু দেহ যে আর ছুটিতে পারে না! সে তাহার ঘুমন্ত শক্তিকে জাগাইয়া তুলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিল, কিন্তু হায়, তাহার জীবনের এই শুভ মুহূর্ত্তটিতে সে সাড়া দিল কৈ! চিরজীবন সে যে জাগিয়াছিল সে তো বৃথায়—এখনই তো তার জাগিবার সময়! এই তো তার স্ফূর্ত্তির সময়—দৈত্য হতাশ হইয়া এই কথাই ভাবিতেছিল।

কিন্তু আর হতাশ হইয়া পড়িয়া থাকিলে তো চলিবে না—এমন সুযোগ ইহ-জীবনে কি আর আসিবে!—দৈত্য কাঁপিতে কাঁপিতে বৃক্ষতলে গিয়া উপস্থিত হইল।

কিন্তু এ কী! কোন্ নিষ্ঠুর এই কোমল অঙ্গ এমন করিয়া কঠিন শৃঙ্খলে বাঁধিয়াছে! দৈত্য রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিল। সে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—"বল, কে তোমায় এমন করে বেঁধেছে!—আমি তার সমুচিত শাস্তি দেব!"

দৈত্যের স্বর্গ

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত চিত্র হইতে

ছেলেটি হাসিয়া বলিল—"এ যে তুমিই বেঁধেছ আমায়!"

দৈত্য অবাক হইয়া ছেলেটির মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

তাহার মনে হইতেছিল, এ কোন্ দেবতা আজ তাহাকে ছলনা করিতে আসিয়াছে! সে ভিতরে ভিতরে কেমন একটা আতঙ্ক অনুভব করিতে লাগিল—তাহারই তাড়নায় নতজানু হইয়া সে বলিয়া উঠিল—"ওগো, বল তুমি কে! কোন্ দেবতা!"

ছেলেটি সে কথায় কর্ণপাত করিল না। সে দৈত্যের হাত দুখানি ধরিয়া শুধু বলিল—"ভাই, একদিন তোমার এই প্রমোদ কাননে আমায় খেলতে দিয়ে ছিলে, আজ চল আমার কাননে তুমি খেলবে।"

দৈত্য বিস্মিত হইয়া বলিল—"তোমার কানন! সে কোথায়!"

ছেলেটি বলিল—"নন্দন বন।"

নন্দন বন! তাহার আরাধনার সামগ্রী, স্বপ্নের ধন, সেই নন্দন কানন! দৈত্য আনন্দে অবশ হইয়া পড়িয়া গেল।

* * * *

সেই দিন সন্ধ্যাবেলা ছেলের দল খেলিতে আসিয়া দেখিল, প্রমোদ কাননের ভিতর, গাছের তলায়, ঝরা ফুলের মধ্যে ঝরিয়া পড়িয়া আছে তাহাদের খেলার সঙ্গী সেই দৈত্য!

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

মরীচিকা

প্রকৃতির অবগুণ্ঠনের মধ্যে যে কত প্রকারই অভিনব ব্যাপার প্রতিনিয়ত সংঘটিত হইতেছে তাহার সংখ্যা নির্দ্ধারণ করা যায় না। আমাদের প্রতিদিনের অভ্যস্ত ব্যাপার ছাড়া আর যাহা কিছু কখনও দেখিতে পাই তাহাই আমাদের নিকট অলৌকিক ভৌতিক বলিয়া মনে হয়। আপনারই কণ্ঠ স্বরের প্রতিধ্বনি শুনিয়া মানুষ এক দিন ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়াছিল। মেরু প্রদেশের উদীচ্যালোক (Aurora Boreales) মানুষকে একদিন অত্যন্ত বিস্ময়-বিভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। আলেয়া যে একটা ভৌতিক পদার্থ এ বিশ্বাস এখনো অনেকেরই আছে। মানব সভ্যতার অতি আদিমকালে বজ্র, বিদ্যুৎ, ঝড় বৃষ্টি ও ঊষার অভিনবত্বে বিস্মিত হইয়া উহাদের উদ্দেশে শত শত স্তোত্র রচনা করিয়া গিয়াছে।

প্রকৃতির এই সকল অভিনব-সংঘটনের মধ্যে মানুষকে সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছে ও বিপদে ফেলিয়াছে মরীচিকা। মানুষ কত সময় এই মায়া মরীচিকার মোহিনী মূর্ত্তিতে ভুলিয়া—এই স্বর্ণ মৃগের পশ্চাতে উধাও হইয়া ছুটিয়া অবশেষে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

বিস্তীর্ণ বালুকাময় উত্তপ্ত মরুভূমিতে ও শান্ত প্রশস্ত সমুদ্রবক্ষেই এইরূপ অভিনব দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। মিশর দেশের বালুকাময় প্রান্তরে নিরন্তর এই প্রকার

মরীচিকার খেলা চলিতেছে। মরীচিকা নানারূপ ছলনাপূর্ণ দৃশ্য মরুযাত্রীর চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া স্বচ্ছ শীতল সলিলা দীর্ঘিকার আশায় ভুলাইয়া তাহাকে মধ্য মরুতে টানিয়া কত সময় যে তাহার মৃত্যু ঘটাইয়াছে তাহার ঠিক নাই।

এই মরীচিকা প্রকৃতির যে একটি সাধারণ ও নিত্যকার জিনিষ, বিজ্ঞান এ যুগে সে খবর বাহির করিয়া ফেলিয়াছে। একটা জলপূর্ণ কাচের গ্লাসে একটি পেন্সিল অর্দ্ধেকটা ডুবাইলে মনে হয় যে, জলের মধ্যে পেন্সিলের নিমজ্জিত অংশটা বাঁকিয়া গিয়াছে। তাহার কারণ, যখন একটা স্বচ্ছ পদার্থ হইতে কোন দ্রব্য অপর একটা পৃথক্ প্রকৃতির স্বচ্ছ পদার্থের মধ্যে প্রবেশ করে তখন তাহার স্বাভাবিক গতি বক্রভাবাপন্ন দেখায়। বায়ু ও জল উভয়ই স্বচ্ছ পদার্থ এবং উভয়ের ঘনতা অসমান সুতরাং বায়ু হইতে যদি একটি পেন্সিল জলে প্রবেশ করে তাহা হইলে জল ও বায়ুর বিচ্ছেদ-সমতল হইতে পেন্সিলটি দৃশ্যতঃ বাঁকিয়া যায়। যে স্বচ্ছ পদার্থের ঘনতা যত অধিক, তাহার বক্রীকরণ শক্তিও তত অধিক।

বায়ু স্বচ্ছ পদার্থ এবং তাহার ঘনতা স্থান বিশেষে ও স্তর বিশেষে বিভিন্ন। এই জন্য বায়ুর মধ্যেই বিভিন্ন ঘনতার স্তরের ভিতর দিয়া বস্তুসকল সময়ে সময়ে বক্রভাবাপন্ন দেখায়। কোনো প্রদেশের তাপের আকস্মিক হ্রাস বা আধিক্য বশতঃ বায়ুস্তরের ঘনতা ও তাহার ফলে সঙ্গে সঙ্গে বায়ুর বক্রীকরণ বৈষম্য ঘটিয়া মরীচিকার সৃষ্টি হয়। এইরূপ তাপের আকস্মিক পরিবর্ত্তন প্রধানতঃ মরুভূমিতে বা সমুদ্র বক্ষেই ঘটিয়া থাকে। অপর কোথাও এরূপ প্রায় ঘটে না। সেই কারণে মরুপ্রান্তর ও সাগরবক্ষই মরীচিকার লীলাভূমি।

বায়ুস্তরের ঘনতা-বৈষম্যের প্রকৃতি-ভেদে, নানা প্রকার মরীচিকা দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে। কখনো মরুভূমির দিগন্ত প্রান্তে বালুকাতটের উপর, কখনো আকাশ মার্গে, কখনো সোজাভাবে কখনো উল্‌টাভাবে কখনো বা আলেখ্যের ন্যায় স্থির আবার কখনো বা বায়স্কোপের ছবির মত পরিবর্ত্তনশীল নব নব দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়!

সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে মরুভূমির বালুকা রাশি অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হইয়া উঠে ও তাহার অসামান্য দীপ্তিতে মরুভূমির বালুকাতট মুকুরের মত ঝক্ ঝক্ করিতে থাকে। সেই উত্তপ্ত বালুকার সংস্পর্শে সর্ব্বনিম্নস্তরের বায়ু বিস্ফারিত হয় ও ঘনতার হ্রস্বতা ঘটে, তদূর্দ্ধ স্তর বালুকার সংস্পর্শে না থাকায় ততটা বিস্ফারিত হয় না। এইরূপে বিভিন্ন স্তরের বায়ু বিভিন্ন ঘনতা বিশিষ্ট হয়। দূরে হয়ত একটি খেজুর গাছ আছে। খেজুর গাছের দৃশ্যটি বিষম ঘন বায়ুস্তরসমূহের মধ্য দিয়া দর্শকের চক্ষে পড়িয়া প্রতিফলিত হয়। তাহার ফলে খেজুর গাছটির নিম্নদিকে উল্‌টাভাবে তাহারই আর একটি প্রতিচ্ছবি দর্শকের দৃষ্টিগোচর হয়। তাহাতে খেজুর গাছটির নিম্নস্থিত সরোবরে তাহার প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইয়াছে বলিয়াই ধারণা জন্মে। অথচ বৃক্ষনিম্নে জলাশয়ের চিহ্নমাত্র নাই। দূর হইতে সূর্য্যালোক-দীপ্ত বালুকাতটের উপর ঐরূপ মায়া মরীচিকার বিভ্রমে দৃষ্টিভ্রান্ত হইয়া, সরোবর তীরবর্ত্তী

খেজুর গাছের ছবি তাঁহার স্বচ্ছ সলিলের উপর প্রতিবিম্বিত দেখিয়া তৃষ্ণার্ত্ত পথিক প্রাণপণ-শক্তি সহকারে তাহার অভিমুখে আপনার অবসাদখিন্ন দেহ টানিয়া চলিতে থাকে; কিন্তু যখন সেই বিশুষ্ক বালুকা সমুদ্রের মধ্যস্থিত অর্দ্ধমুণ্ডিতমস্তক, রৌদ্রদগ্ধ খেজুর গাছটির নিকট উপস্থিত হয় তখন নিদারুণ নৈরাশ্যপূর্ণ ক্লান্তিভরে মরুভূমির অনলতপ্ত বালুকা বিস্তারে লুটাইয়া পড়ে।

মরীচিকা মানুষকে অনেক বিপদে ফেলিয়াছে এবং অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছে বটে, কিন্তু যাহারা ঐরূপ মরুপথে অনেকবার

মরুভূমিতে খেজুর গাছের মিথ্যা প্রতিবিম্ব।

যাতায়াত করিয়াছে, এরূপ দৃশ্য অনেক দেখিয়াছে তাহারা ইহাকে আর বড় একটা বিস্ময়ের চক্ষে দেখে না। শত মরীচিকার সাধ্য নাই একজন আরব বেদুইনকে অথবা মিসর মরুর সুর্য্যাংক যাত্রীদিগকে মরীচিকা তাহাদের গন্তব্যপথ হইতে সামান্য মাত্র বিচ্যুত করে। শুধু অর্ব্বাচীন মরুযাত্রীদিগের পক্ষেই এরূপ দৃশ্য বিশেষভয়ের কারণ। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে মহাবীর নেপোলিয়ানের মিশর বিজয়কালে—মিশরের মরুভূমির মধ্যে ঐরূপ মরীচিকা তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয়। সকলেই জানেন সম্রাট নেপোলিয়ান বিজ্ঞান প্রভৃতি উচ্চ

জ্ঞানের একজন প্রধান পরিপোষক ছিলেন; স্বয়ং একজন প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন এবং নানা বিষয়ে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। প্রায় সকল সময়েই তাঁহার সহিত বৈজ্ঞানিক ও জ্যোতিষী পণ্ডিতগণ থাকিতেন। তিনি তাহাদিগকে উক্ত মরীচিকার উৎপত্তির কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত মাঙ্গ প্রথমে ইহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যান দ্বারা সম্রাটকে পরিতুষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনিই জগতের সমক্ষে সর্ব্ব প্রথম প্রচার করেন যে বায়ুর ঘনতা-বৈষম্যই মরীচিকা উৎপত্তির কারণ।

কখনো কখনো মরুভূমির মধ্যে দিক্‌চক্রের সন্নিকটে কুঞ্জছায়াচ্ছন্ন স্বচ্ছসলিলা নদীবেষ্টিত জলপূর্ণ গ্রাম দৃষ্টিগোচর হয়। কখনো আকাশ মার্গে উল্টাভাবে স্থাপিত—সমুদ্র অর্ণবপোত প্রভৃতির দৃশ্য মরুযাত্রীদিগের দৃষ্টি গোচর হয় বলিয়া শুনা গিয়াছে।

ইটালীর নেপল্‌স উপসাগরে ও সিসিলির উপকূলে বায়স্কোপের ছবির মত সচল অসংবদ্ধ দৃশ্যসমূহ বহুল পরিমাণে দেখা যায়। এই প্রকার মরীচিকাকে Fata Morgara কহে। সময়ে সময়ে দূরে স্তম্ভ, প্রাসাদ, গির্জ্জা, গম্বুজ, কেল্লা, বড় বড় নগরের ধ্বংসাবশেষ প্রভৃতি সহসা দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ সকল জিনিষ এক সঙ্গে গুচ্ছবদ্ধ-ভাবে এরূপ পরিবর্ত্তনশীলতা ও অপূর্ব্ব ভঙ্গির সহিত বায়স্কোপের ছবির মত চক্ষের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যায় যে দর্শককে তাহাতে বিস্ময়মুগ্ধ করিয়া তোলে। বিষমঘন বায়ুস্তর যখন সচল অবস্থায় থাকে তখন দূরাবস্থিত নগর গ্রাম প্রভৃতির দৃশ্যই ঐরূপ ভাবে চোখের সম্মুখ দিয়া দ্রুত চলিয়া যায়। প্রকৃত পক্ষে যে স্তম্ভটা অভগ্ন তাহাকে ভগ্ন দেখায়—এইরূপে সমস্ত জিনিষই বক্রভগ্ন বিকৃত অবস্থায় পরিদৃশ্যমান হয়। কখনো দেখা যায় যে আকাশ মার্গে উল্টাভাবে অবস্থিত একটি জাহাজের উপর আর একটি জাহাজ সোজা ভাবে বসানো আছে। কখনো কখনো ঐ দ্বিতীয় জাহাজখানির উপর উল্টাভাবে অবস্থিত একখানি তৃতীয় জাহাজও দৃষ্টি গোচর হইয়াছে। তিনটি প্রতিবিম্বই একরূপ বা একটি জাহাজের। দূরে দিক্‌-চক্রের পরপারে কোন জাহাজ আছে তাহারই দৃশ্য বিষম-ঘন বায়ুস্তরের ভিতর দিয়া আসিয়া আকাশ মার্গে ঐরূপ দৃশ্য রচনা করে।

অনেক দিন পূর্ব্বে ইতালীর বৃন্দিসি বন্দর হইতে সমুদ্রের ঠিক পরপারে অবস্থিত আফ্রিকার কাইরো নগরের পিরামিড ও অন্যান্য সৌধমালার ভগ্ন স্তম্ভগুলি অতি স্পষ্ট ভাবেই দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল।

মরীচিকা সুবিধা পাইলে কোনো দিনই মানুষকে বিপদে ফেলিতে ছাড়ে নাই বটে, কিন্তু সে যে সর্ব্বথা আমাদের শত্রুতা সাধন করিতেছে এরূপ বলিলে তাহার উপর নিতান্তই অবিচার করা হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বায়ু প্রভৃতি স্বচ্ছ পদার্থের বক্রীকরণ শক্তির ভিতর দিয়া যে দৃশ্য আমরা দেখিতে পাই তাহাই মরীচিকা। যদিও মরীচিকা বলিতে সাধারণতঃ আমরা একটু পৃথক্ জিনিষই বুঝিয়া থাকি, তথাপি সকল মরীচিকাই এই একই কারণ হইতে উদ্ভূত। অনন্ত শূন্যের মধ্য দিয়া দূর

দূরান্তর-অবস্থিত চন্দ্র সূর্য্য তারকাদির রশ্মি যখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে তখন বায়ুর বক্রীকরণ শক্তির প্রভাবে উক্ত জ্যোতিষ্কের গতি তাহার মৌলিক পথভ্রষ্ট হয়। বায়ুস্তরের ভিতর দিয়া বক্রভাব ধারণ করিয়া যে রশ্মি আমাদের চক্ষে পতিত হয় সেই বক্রাংশকে প্রসারিত করিলে তাহা উক্ত জ্যোতিষ্কের প্রকৃত অবস্থান-বিন্দুতে আসিয়া পড়ে না—বহুল পরিমাণে দূরেই পড়িয়া থাকে। এবং আমরা সেই কারণে গ্রহনক্ষত্রাদি কিছুই তাহাদের স্বস্থানে দেখিতে পাই না—তাহাদের প্রকৃত অবস্থান হইতে অনেকটা বিচ্যুত অবস্থায় দেখি। সেই জন্য সূর্য্য বা চন্দ্র প্রকৃত পক্ষে চক্রবালের নিম্নে থাকিতেই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বক্রীকরণ শক্তির প্রভাবে তাহাদিগকে দিগন্তোপরি

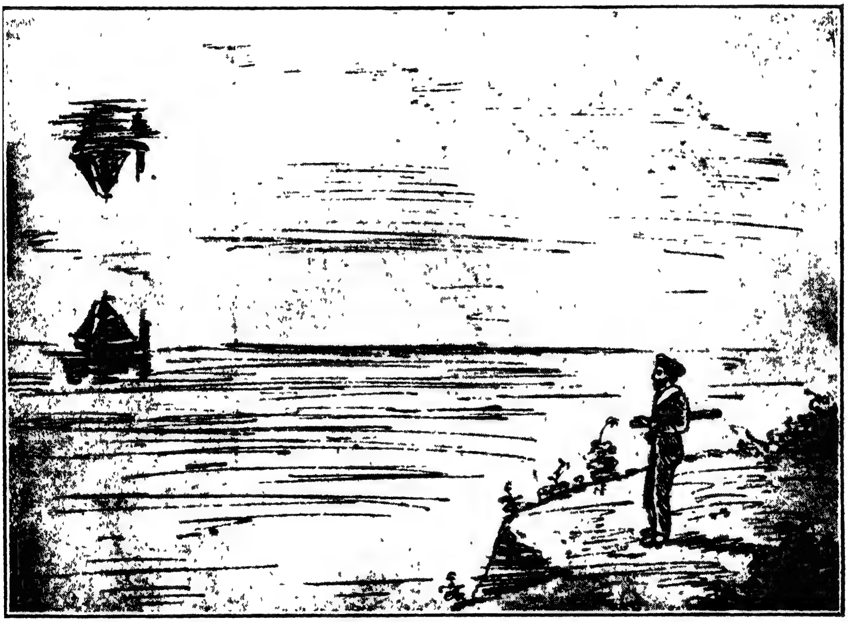

আকাশে জাহাজের প্রতিবিম্ব।

বিরাজিত দেখি। সূর্য্য অস্তগত হইয়া দিগন্ত-নিম্নে খানিকটা নামিয়া গেলেও ঐ একই কারণে আমরা তাহাকে দিগন্তের উপরেই কিছুক্ষণ দেখিতে পাই। সুতরাং বায়ুমণ্ডলের বক্রীকরণ শক্তি থাকায় প্রকৃত পক্ষে যখন অপরাহ্নে অন্ধকার হওয়া উচিত ছিল তখনও আমরা আলোক পাই আবার রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই সূর্য্যকে উদিত দেখি। আবার সূর্য্য একেবারে দিগন্ত নিম্নে নামিয়া গেলেও তাহার বিক্ষিপ্ত রশ্মিমালা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ভিতর প্রবেশ করিয়া বক্রভাবে পৃথিবীর উপর পতিত হয় ও কিছুক্ষণ তাহাকে আলোকিত করিয়া রাখে। এই অবস্থাতেই পৃথিবীতে উষা ও গোধূলিসন্ধ্যার উৎপত্তি হয়। এইরূপে আমাদের দিনের বিস্তৃতি প্রকৃত পক্ষে যতটুকু

পাওয়া উচিত ছিল আমরা তদপেক্ষা অনেক বেশী ভোগ করিয়া লই। ইহার উপর আর একটা বড় রকমের লাভ এই যে, বায়ুর বক্রীকরণ শক্তি থাকায় আমরা ঊষা ও সন্ধ্যা এই দুইটি কবিপ্রিয় ক্ষণকে কাব্যলক্ষ্মীর আদরণীয় রূপে ও প্রকৃতির ভূষণরূপে লাভ করিয়াছি। অন্যথা এরূপ একটা মহালাভ হইতে আমরা সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইতাম।

শ্রীক্ষীরোদকুমার রায়।

বিক্রমোর্ব্বশী

(ফেলিসিয়ঁা লেভির ফরাসী হইতে)

পূর্ণতার উচ্চশিখরে নীত হইয়া, ভারতীয় নাট্যকলা আবার নিম্নে নামিয়া আসিল এবং তাহার স্বাভাবিক অভ্যস্ত পথের অনুসরণ করিল। "বিক্রমোর্ব্বশীর" সঙ্গে সঙ্গে কালিদাস নিজেই এই অধোগতির সূত্রপাত করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই নাটকটি কালিদাসের শেষ রচনা এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে অবশ্য ইহার অভিনয় হয়। বসন্তোৎসবে যেরূপ "শকুন্তলা" ও "মালবিকার" অভিনয় হইয়াছিল, বিক্রমোর্ব্বশীর প্রস্তাবনায়, অভিনয়ের ঐরূপ কোন কাল বা উপলক্ষ্য সূচিত হয় নাই। তাছাড়া এই নাট্যরচনাটি ক্ষুদ্র, সাদাসিদা ধরণের, ও তেমন সুগঠিত নহে। বিক্রমোর্ব্বশী—নাটক নহে;—উহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট শ্রেণীর নাট্যরচনা—উহা তোটক। তোটকের লক্ষণগুলি এই:—উহাতে কোন বীরের এবং কোন দেবীর প্রেমলীলা বর্ণিত হইবে। সকল অঙ্কেই বিদূষকের প্রবেশ থাকিবে (এই শেষোক্ত নিয়মটি যে একান্তই অপরিহার্য্য তাহা নহে;—আদিরসের প্রাধান্য সূচিত করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য)। বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের নায়ক—পুরূরবা;—অতি প্রাচীন কালের চন্দ্রবংশীয় এক রাজা। নায়িকা—উর্ব্বশীনাম্নী এক অপ্সরা। ভারতের প্রাচীনতম পৌরাণিক আখ্যানে উহাদের প্রেমকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ঋগ্বেদে সংবাদের আকারে একটি সূক্তি আছে, ঐ সূক্তিতে উভয়ের মধ্যে বাকালাপ চলিতেছে। ঋগ্বেদের এই সূক্তিটা যারপর নাই কঠিন ও দুর্ব্বোধ। স্বর্গের সঙ্গিনীদের সহিত মিলিত হইবার জন্য উর্ব্বশী পুরূরবাকে ত্যাগ করিল; হতাশ নায়ক, প্রত্যাগমনের জন্য তাহাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন; কিন্তু অপ্সরা তাহার অসম্মতি স্পষ্টরূপে জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত ব্যথিত করিয়া তুলিল; উর্ব্বশী, পুরূরবাকে কেবল এই কঠোর শিক্ষাটি দিয়া গেলেন:—"রমণীদিগের উপর প্রেমস্থাপন করিতে নাই; উহাদের হৃদয় তরক্ষুর হৃদয়।" এই "সংবাদের" অন্তর্ভূত শ্লোকগুলি, মনে হয়,—কোন এক পৌরাণিক আখ্যানের বিচ্ছিন্ন অংশ মাত্র। সমস্ত আখ্যানটি বহুপূর্ব্বেই বিলোপ প্রাপ্ত হয়। ইহার পরিবর্ত্তে শতপথ-ব্রাহ্মণে আর একটি আখ্যান সন্নিবেশিত

হইয়াছে—মনে হয়, গূঢ় অর্থের ব্যাখ্যা করাই যেন উহার উদ্দেশ্য :—যজ্ঞানুষ্ঠানে যে সকল ক্রিয়াকলাপ ও মন্ত্রাদি আছে তাহার সমর্থনার্থেই যেন এই উর্ব্বশী-পুরুরবা-ইতিহাসের অবতারণা করা হইয়াছে। যেন উহার আর কোন সার্থকতা নাই।

পরবর্ত্তী কালের রচনাদিতে, আবার এই উর্ব্বশী-পুরুরবার কাহিনীটি দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য কালসহকারে ইহা রূপান্তরিত ও ঈষৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ভাগবত-পুরাণে দেখা যায়,—মিত্র ও বরুণের শাপে উর্ব্বশী স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে পতিত হইয়াছে। এই আখ্যানের অবশিষ্ট অংশ শতপথ-ব্রাহ্মণোক্ত ইতিহাসেরই পুনরুক্তি। এই বিষয়ে ভাগবতের সহিত বিষ্ণুপুরাণের মিল আছে। কিন্তু বৃহৎকথার আখ্যানটি ইহা হইতে অনেক ভিন্ন। পুরুরবা বিষ্ণুর একজন ভক্ত; তাঁহার নিকট, স্বর্গলোক ও মর্ত্ত্যলোক উভয়ই সুপরিচিত। ইন্দ্রের স্বর্গে তিনি অপ্সরা উর্ব্বশীকে দেখিতে পাইলেন এবং দেখিবামাত্র উর্ব্বশীর প্রেমে মুগ্ধ হইলেন, উর্ব্বশীও তাঁহার প্রেমে মুগ্ধ হইল। উভয়ের মধ্যে প্রেমের সঞ্চার হইয়াছে দেখিয়া বিষ্ণু, নায়কের সহিত অপ্সরাকে যাইতে দেওয়া হউক, এই বলিয়া ইন্দ্রকে আদেশ করিলেন। এমন সময়ে, দেবাসুরের মধ্যে যুদ্ধ বাধিল। অসুরেরা পরাভূত হইল। ইন্দ্র এই বিজয়োৎসব উপলক্ষে, একটি বৃহৎ নাট্যাভিনয়ের উদ্যোগ করিলেন। অপ্সরা রম্ভা এই নাট্যাভিনয়ে "চলিত" নামক নৃত্যভঙ্গী প্রদর্শন করিলেন। পুরুরবা গর্ব্বভরে অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া বলিলেন :—উর্ব্বশী ইতিপূর্ব্বে তাঁহাকে উহা অপেক্ষা ভাল-ভাল নৃত্য দেখাইয়াছে। গন্ধর্ব্বরাজ তুম্বুরু পুরুরবার এইরূপ অবজ্ঞাদর্শনে ব্যথিত হইয়া এই অভিসম্পাৎ করিলেন,—যাবৎ না কৃষ্ণ এই শাপ মোচন করেন তাবৎ পুরুরবার সহিত অপ্সরার বিচ্ছেদ ঘটিবে! গন্ধর্ব্বগণ উর্ব্বশীকে হরণ করিয়া লইয়া গেল এবং পুরুরবা বিষ্ণুকে লাভ করিবার জন্য বদরিকাশ্রমে কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। পরে বিষ্ণুর প্রসাদে, উভয়ের পুনর্ম্মিলন হইল।

অবশ্য এই পৌরাণিক আখ্যানের উপরি-বর্ণিত রূপটিই কালিদাসের সময়ে খুব লোক-প্রিয় ছিল;—বৃহৎকথার সঙ্কলনকর্ত্তা গুণাধ্যায়, হাল বা শতবাহনের সমসাময়িক বলিয়া প্রসিদ্ধ (পূঃ খৃষ্টাব্দ তৃতীয় শতাব্দী)। এই আখ্যানটিকে রঙ্গপীঠে প্রত্যারোপণ করিবার জন্য কবিবরকে এই গল্পের কতকগুলি মুখ্য অংশের পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। নরের প্রেমে অমর মুগ্ধ—এই কথা সমর্থনার্থ গোড়া-তেই একটা সুবিধাজনক ঘটনার আশ্রয় লওয়া হইল। পুরুরবা এক অসুরের হস্ত হইতে উর্ব্বশীকে উদ্ধার করিলেন। ঔৎসুক্য ও চিত্ত-চাঞ্চল্য আরও বাড়াইবার জন্য প্রণয়ীযুগলের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো হইল।—এবং এই বিচ্ছেদ হইতেই উহাদের প্রেমানল অতিমাত্রায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। যে ব্যক্তি প্রেমবিহ্বল, স্বভাবতই সে অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে; অপ্সরা-কেও এই অন্যমনস্কতার জন্য শাস্তিভোগ করিতে হইল। স্বর্গের কোন নাট্যাভিনয়ে উর্ব্বশী লক্ষ্মীর ভূমিকা গ্রহণ করে, কিন্তু পুরুষোত্তমের নাম উচ্চারণ না করিয়া তাহার স্থলে সে পুরুরবার নাম উচ্চারণ করিল। এই অপরাধে, নাট্যাচার্য্য ভরতমুনি উর্ব্বশীকে

শাপ দিলেন। কিন্তু ইন্দ্র মধ্যস্থ হইয়া তাহার শাস্তিকালের একটা সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। ধরায় অবতীর্ণ হইয়া উর্ব্বশী দেখিল, পুরুরবা অন্যাসক্ত। ঈর্ষ্যায় আত্মহারা হইয়া,—যে বনে কার্ত্তিকেয় স্ত্রীলোকদের প্রবেশ নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন—উর্ব্বশী সেই নিষেধ-আজ্ঞা না মানিয়া ঐ বনে প্রবেশ করিল এবং তৎক্ষণাৎ একটি লতারূপে রূপান্তরিত হইল। এক "সঙ্গম-মণি" ভিন্ন তাহার নিজ রূপ ফিরিয়া পাইবার আর অন্য উপায় রহিল না। পার্ব্বতীর সৃষ্ট এই সঙ্গম-মণি। পুরুরবা প্রণয়িনী-বিরহে উন্মত্তপ্রায় হইয়া যখন বনে বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন একস্থানে হঠাৎ এই সঙ্গম-মণিটি প্রাপ্ত হইলেন। প্রণয়ি-যুগলের আবার মিলন হইল। যেদিন পুত্র মুখ দর্শন করিবেন সেই দিনই উর্ব্বশী স্বর্গে প্রস্থান করিবেন এইরূপ কথা ছিল। কিন্তু এই বিষয় সম্বন্ধেও কালিদাসের চিত্তসৌকুমার্য্য লক্ষিত হয়। পৌরাণিক আখ্যানে আছে, উর্ব্বশী একটি পুত্র প্রসব করে এবং পুত্রটি ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্রই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। কবি এই প্রচলিত আখ্যানের মর্ম্মানুসরণ না করিয়া দেখাইলেন যে, দাম্পত্য-প্রেমের আতিশয্যবশতই পুত্র "আয়ু"কে জননী পরিত্যাগ করিয়াছিল। আয়ু এক আশ্রমে প্রতিপালিত হইল। তাহার অকাল-বিকশিত বীরত্বের একটি কার্য্যে তাহার বংশ প্রকাশ হইয়া পড়িল। আয়ু রাজার নিকট নীত হইল। রাজা আয়ুকে যৌবরাজ্যে অধিষ্ঠিত করিয়া নিজে বন গমন করিতে অভিলাষী হইলেন। কিন্তু নারদ, ইন্দ্রের নিকট হইতে এক সন্দেশ লইয়া এই সময়ে উপনীত হইলেন। পুরুরবার কৃত বহুল উপকার স্মরণ করিয়া দেবরাজ উর্ব্বশীকে আমৃত্যু পুরুরবার সহিত থাকিতে অনুমতি দিলেন।

এই নাটকের অনেকগুলি কার্য্যপ্রকরণ শকুন্তলানাটকের কার্য্যপ্রকরণকে স্মরণ করাইয়া দেয়। একই প্রকারে, একজন তাপসের অভিসম্পাতের সূত্রাবলম্বনে নাট্যগ্রন্থি বন্ধন করা হইয়াছে এবং হঠাৎ একটি শিশুর অবতারণা করিয়া একই প্রকারে ঐ গ্রন্থিটী মোচন করা হইয়াছে। আবার উভয় নাটকেই একটি মণি-রত্নের সাহায্যে প্রণয়িযুগলের পুনর্মিলন ঘটিয়াছে। অনেক ছোটখাটো বিষয়েও এই দুই নাটকের মধ্যে মিল দেখা যায়। উর্ব্বশী যখন রাজাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে, একটা মালার বাধা পাইয়া সেই ছুতায় থমকিয়া দাঁড়াইল; শকুন্তলাও এইরূপ পায়ে কাঁটা বিঁধিবার ও গাছে কাপড় আটকাইবার অছিলা করিয়া একটু থামিয়াছিল। শকুন্তলার ন্যায় উর্ব্বশীও একটা ভূর্জ্জপত্রে লিপি লিখিয়া পাঠাইয়াছিল; শকুন্তলায়, মাতলী যেমন বিদূষককে উঠাইয়া লইয়া গিয়াছিল—সেইরূপ বিক্রমোর্ব্বশীতে, একটা পাখী মণিটী উঠাইয়া লইয়া যায়। বালক ভরতের ন্যায়, বালক আয়ুও খেলা করিবার জন্য তাহার খেলনা-ময়ূর চাহিয়াছিল।

রাজা বিমানে চড়িয়া যখন যাত্রা করিতেছেন, সেই সময় কবি যে বর্ণনার বিষয় পাইয়াছেন, উহার অনুরূপ বর্ণনার বিষয় শকুন্তলা নাটকেও আছে। কিন্তু বিক্রমোর্ব্বশীর আখ্যানবস্তুটি শকুন্তলার আখ্যানবস্তু অপেক্ষা স্বভাবতই নিকৃষ্ট। বিক্রমোর্ব্বশীতে বিস্ময়রস অথবা অতিমানুষিক ব্যাপারই প্রাধান্য লাভ

করিয়াছে। নায়িকা স্বর্গের অপ্সরা,—দৈবশক্তিসম্পন্না। তাই তিনি অদৃশ্য থাকিয়া বিদূষকের সহিত রাজার বিশ্রম্ভালাপ শুনিতে পাইতেছেন, রাজার নিকট সহসা আসিয়া উপস্থিত হইতেছেন, আকাশ-পথ দিয়া তাঁহার সম্মুখে অবতরণ করিতেছেন। দৈবশক্তি থাকায় তাঁহার পদমর্য্যাদা রাজারও উপরে। সুতরাং রাজা নাটকের নায়ক হইলেও, প্রধান স্থান নায়িকাই অধিকার করিয়াছে। উর্ব্বশীই বেশী অগ্রসর, উর্ব্বশীই নায়কের অন্বেষণ করিতেছেন, উর্ব্বশীই নায়ককে কুপিত করিয়া তুলিতেছেন। এই নাটকে নায়কের ব্যক্তি-গৌরব একটু খর্ব্ব হইয়াছে; এবং এই দুর্ব্বলতার ক্ষতিপূরণের পক্ষে উর্ব্বশীর চরিত্রও পর্য্যাপ্ত নহে। জননী স্বীয় শিশুপুত্র আয়ুকে ফেলিয়া যে পলায়ন করিল,—অতিমাত্র দাম্পত্যপ্রেমও এই আচরণের দোষক্ষালণ পক্ষে যথেষ্ট নহে। নাটকের অন্য পাত্রগণেরও কোন বিশেষত্ব নাই, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য নাই—অলঙ্কারশাস্ত্রের লক্ষণানুরূপ চরিত্র রচিত হইয়াছে মাত্র। বিদূষক আহার-বিলাসী অপেক্ষা বেশী ঔদরিক, হাস্যরস অপেক্ষা তাহার উদ্ভটভঙ্গিমাই বেশী, সূক্ষ্ম-রসিকতা অপেক্ষা সে স্থূলধরণের রসিকতাতেই বেশী অভ্যস্ত। উর্ব্বশীর সখী চিত্রলেখা সেই মামুলী আদর্শের চরিত্র—কোন বিশেষত্ব নাই। অন্যান্য অপ্সরা ও রাণী ঔশিনরী—ইহারা অস্ফুট রেখাচিত্রমাত্র। তুম্বুরু, নারদ, চিত্ররথ, ভরতের শিষ্যগণ ইহাদেরও কোন নিজস্ব নাই।

নাটকের আখ্যানবস্তুটিও শীর্ণকায়,—পঞ্চাঙ্ক পূর্ণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে; চতুর্থ অঙ্ক—দুইটি ক্ষুদ্র কথোপকথনের মধ্যে সন্নিবেশিত একটা দীর্ঘ স্বগতোক্তি বই আর কিছুই নহে। পুরুরবা স্বীয় প্রিয়তমার অন্বেষণে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন এবং ময়ুর, কোকিল, হংস, ভ্রমর, হস্তী, পর্ব্বত, নদী, হরিণ—ইহাদিগকে গীতি-কবিতার ভাষায় প্রিয়ার বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। এই দৃশ্যসংস্থানটি নাটক অপেক্ষা গীতিকাব্যের অধিক উপযোগী। কিন্তু এই দোষটি কালিদাসের উত্তরবর্ত্তী নাট্যকবিগণের চিত্ত হরণ করিয়াছিল। তাহারা সাধারণতঃ আখ্যানবস্তু অপেক্ষা শ্লোকরচনায় বেশী দক্ষ। ইহার পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, ভবভূতির "মালতী মাধবে" (৯ অঙ্ক), রাজশেখরের "বাল-রামায়ণে" (৫ অঙ্ক), জয়দেবের "প্রসন্ন রাঘবে" (৬ অঙ্ক), ভাস্করের "উন্মত্ত-রাঘবে," বিশ্বনাথের "প্রভাবতী পরিণয়ে" (সাহিত্য দর্পণ দ্রষ্টব্য)। এই নাটকে নাটকীয় ঔৎসুক্য অপেক্ষা দৃশ্যের ঔৎসুক্য উৎপাদনের প্রতিই কবির বেশী লক্ষ্য দেখিতে পাওয়া যায়। নাট্যরস অপেক্ষা, নাট্যকলার গৌণ উপাদান যে নৃত্যগীত সেই নৃত্যগীতই ইহাতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এইজন্যই আলঙ্কারিকগণ,—দ্বিতীয় শ্রেণীর নাট্যরচনা যে "তোটক", এই নাটকটিকে সেই তোটক-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। এই নাটকটি অন্তরিন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করিতে না পারিলেও, প্রেক্ষকগণের দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয়কে বিমোহিত করে। হিমালয় শিখরে সমবেত ভয়-কম্পিতা অপ্সরাগণের আশ্রয় যাচ্ঞা, বিমানে আরোহণ করিয়া রাজার প্রবেশ, চিত্রলেখার হস্তাবলম্বন-পূর্ব্বক উর্ব্বশীর প্রত্যাগমন, অপ্সরাদিগের

আনন্দ,—এই সমস্ত চিত্তবিমোহন চিত্র নাটকের আরম্ভ হইতেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এবং শেষ অঙ্কে আয়ুর রাজ্যাভিষেক দৃশ্যেও পরিচ্ছদাদির জাঁকজমক ও রাজবিভব প্রদর্শন করিবার বেশ সুযোগ হইয়াছে। চতুর্থ অঙ্কে, বিবিধ সুরসংযোগে যে কবিত্ব-পূর্ণ পদাবলী গীত হইয়া থাকে এবং তৎসহকৃত যে অপূর্ব্ব ঐকতান-সঙ্গীত বাদিত হয় তাহা ইন্দ্রিয় ও কল্পনা উভয়কেই পরিতৃপ্ত করে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সৌধ-রহস্য

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অশ্বত্থ বৃক্ষের মূল যেমন নিকটস্থ সমুদয় ভূমিকে আপনার অধিকারে টানিয়া লয়, তেমনি এই ক্রুমবার হলের বিপদ-সম্ভাবনা আমার হৃদয়ের সমস্ত চিন্তাকে জুড়িয়া বসিল। এই চিন্তা-কাতর উত্তেজিত উদ্‌ব্যস্ত চিত্ত লইয়া কেমন করিয়া আমি আমার দৈনিক কাজের হিসাব-নিকাশ করিব? জমিদারীর কার্য্যাবলী-পরিদর্শন আমার পক্ষে একরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল! আহা, সরল প্রভুভক্ত কৃষকের দল! তাহাদের ছোট-খাট অভাব-অভিযোগের প্রতিকার করিবার কথা আর আমার মনেও পড়িত না। সন্ধ্যার সময় সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে যাই, পাল তুলিয়া ছোট ছোট নৌকাগুলি সামুদ্রিক পাখীর মতই ডানা মেলিয়া ঢেউয়ের বুক বহিয়া ভাসিয়া যায়, নীল সমুদ্রের মাঝখান দিয়া দুই ধারে চন্দ্রালোকিত ফেনরাশি কাটিয়া সুদূরগামী বড় বড় জাহাজ চলিয়া যায়, সূর্য্য শীত প্রভাতের কুয়াশা-জাল ছিন্ন করিয়া অপূর্ব্ব শোভায় জাগিয়া উঠে, আমার লক্ষ্যহীন আঁখি শুধু যে সাগর-পানে চাহিয়া থাকে,—কিছুই উপলব্ধি করিতে পারে না। ইহার মধ্যে যেটুকু মধুরতা ছিল, তাহার উপভোগ শক্তি আমার শান্তিহীন চিত্ত হইতে যেন একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে!

প্রকৃতির যে নিভৃত সৌন্দর্য্য, কর্ম্মের যে সুগভীর আনন্দ আমার তরুণ জীবনকে দারিদ্র্যের অভাবে, বা দুঃখে কোনদিন নিষ্পেষিত হইতে দেয় নাই, একমাত্র ঐ শ্বেত প্রাসাদের অজ্ঞাত রহস্য, সেই-আমাকেই সম্পূর্ণ অভিভূত পদানত করিয়া ফেলিয়াছিল। মুক্তির ইচ্ছা আর মনে আসে না,—কেমন করিয়াই বা আসিবে? আমার প্রাণাধিকা, প্রিয়তমা গেব্রিয়েল, সে-ও যে ঐ প্রাচীর-বেষ্টিত বিরাট রহস্য-নিকেতনের সহিত চির আবদ্ধ! উদ্বেলিত অশান্ত চিত্ত শুধু ঘটনা-পরম্পরার স্রোতে ভাসিয়া এই অতল বিপদ সাগরের তল দেখিবার জন্য ঝুঁকিয়া রহিয়াছে!

কোথায় যাইব? গৃহের বাহিরে? পল্লীর মধ্যে? সমুদ্র-তীরে? যেখানে যাই, সেখানেই সেই অত্যুচ্চ শ্বেত অট্টালিকার চূড়া

বৃক্ষান্তরাল ভেদ করিয়া নেত্র-পথে ফুটিয়া উঠে। ব্যাকুল চিত্ত মুহুর্মুহুঃ বলিতে থাকে, "অভাগা পরিবার, ঐ গৃহে দিবারাত্রি এক অনির্দ্দেশ্য অব্যক্ত বিপদের প্রতীক্ষায় শুধু চাহিয়া আছে!" পূর্ব্বে যখন আমরা দর্শকের আসনে বসিয়া এই অদ্ভুত-প্রকৃতি পরিবারের কার্য্য-কলাপ লক্ষ্য করিতাম, তখন শুধু একটু করুণার "আহা" শব্দ উচ্চারণ করিয়াই সকল কর্ত্তব্য সকল দায়িত্বের হাত হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছি। কিন্তু এখন—? কেমন করিয়া বুঝাই, এখন আমার মনের অবস্থা কিরূপ!

আমার মনের ভাব যখন এমনি-ধারা, সেই সময় সহসা একদিন নেপ্‌ল্‌স্ হইতে কাকার এক পত্র আসিল। কাকা বাবাকে লিখিয়াছেন, বায়ু-পরিবর্ত্তনে আশাতিরিক্ত উপকার পাওয়ায় আরও কিছুকাল তিনি স্কট্‌ল্যাণ্ডের বাহিরে থাকিতে চাহেন; বাবা আরও কিছুকাল এইখানে থাকিলে ভাল হয়। এ সংবাদে আমরা সকলেই অত্যন্ত সুখী হইলাম। বাবা এই কোলাহল-হীন বাধা-বিপত্তি-বিহীন স্থানে সাহিত্যালোচনার যে শুভ সুযোগ লাভ করিয়াছেন, এমন সৌভাগ্য তাঁহার জীবনে আর পূর্ব্বে কখনও ঘটে নাই! অন্ততঃ তাঁহার বিশ্বাস এমনই! আর আমরা উইগটাউনের জলাভূমিতে যে অপূর্ব্ব আনন্দ সঞ্চিত দেখিতাম, তাহার কথা খুলিয়া বলার প্রয়োজন দেখি না।

জেনারেলের সহিত সাক্ষাতের দিন হইতে প্রতিদিনই প্রায় সকালে-সন্ধ্যায় একবার করিয়া আমি "ক্লুমবারে" বেড়াইতে যাইতাম। অবশ্য বাড়ীটার বাহিরের চতুর্দ্দিক পর্য্যবেক্ষণ করা ছাড়া আমার বুভুক্ষু দৃষ্টির অপর কোন দুরাশাই পূর্ণ হইত না। তথাপি কর্ত্তব্য-বোধেই আমি নিত্য একবার করিয়া বাড়ীটা দেখিয়া আসিতাম।

যে অসামান্য যোদ্ধা একদিন সহস্র ভয়ার্ত্তকে আশ্রয় দিয়াছেন—তিনিই আজ ভীত শিশুর মত আমার ন্যায় সামান্য লোকের সাহায্য-প্রার্থী! নিয়তির নির্ম্মম পরিহাস! ইহাতে আমার আনন্দ হয় নাই, সুগভীর সমবেদনাতেই সারা চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল!

পূর্ব্বে তাঁহাকে যে চক্ষে দেখিতাম, এখন আর সেভাবে দেখি না। কি ভ্রান্ত ধারণাই না এতদিন তাঁহার বিরুদ্ধে পোষণ করিয়া আসিয়াছি! সে কথা ভাবিতেও এখন কেমন লজ্জা হইত।

একদিন ক্লুমবারের নিকট বেড়াইতে বেড়াইতে সহসা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাকে দেখিয়াই আমার মনে হইল, তাঁহার মন যেন স্নায়বিক উত্তেজনার চরম সীমায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! অত্যন্ত ভীত-চকিত দৃষ্টিতে ডাহিনে-বামে লক্ষ্য করিতে করিতে তিনি পথ চলিতেছিলেন। গেব্রিয়েলের কথা স্মরণ হইল,—৫ই অক্টোবর যতই কাছে আসে, বাবার ভয়ও তত সীমা ছাড়াইয়া যায়! সত্য! কোটর-প্রবিষ্ট চক্ষে জ্বালাময়ী দৃষ্টি, হস্তে অকারণ কম্পন, মুখে অস্বাভাবিক উত্তেজনার চিহ্ন স্পষ্ট দীপ্যমান,—এরূপ উত্তেজনা মানুষ কয়দিন সহ্য করিতে পারে? তাঁহার বয়স যেন সহসা দশ বৎসর বাড়িয়া গিয়াছে বলিয়া আমার মনে হইল।

আমার সহিত অত্যন্ত ভদ্রভাবেই তিনি

দুই-চারিটি কথা কহিলেন। পূর্ব্ব-কথার কোনই আলোচনা হইল না।

জেনারেল চলিয়া গেলে আমি একবার বেশ করিয়া কাঠের বেড়াটার চারিধার পরীক্ষা করিয়া লইলাম। যে তক্তাগুলা আলগা ছিল, এবং যে কয়খানা আমরা চেষ্টা করিয়াই খুলিয়া রাখিয়া ছিলাম, সেগুলা আবার পেরেক ঠুকিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। দ্বারে দিবারাত্রিই তালা সংলগ্ন থাকে। এক কথায়, এখন আর বাটীর মধ্যে ক্ষুদ্র একটি বিড়াল-প্রবেশেরও পথ রাখা হয় নাই।

এখানে, সেখানে, গাছের ফাঁক দিয়া, বেড়ার ফুটা-ফাটার মধ্য দিয়া, দরজার সূক্ষ্ম রেলিংয়ের ছিদ্র-মধ্যে চক্ষু সংলগ্ন করিয়া, ভিতরকার সংবাদ লইবার নিষ্ফল চেষ্টায় ক্লান্ত হইয়া অনেকবার ফিরিয়া আসিতাম। এইরূপ অনুসন্ধান-কালে, একদিন নীচেকার একটা জানালার তলায় আমি একজন লোককে দেখিতে পাইলাম। তাহার আকার ও পরিচ্ছদ দেখিয়া অনুমান করিলাম, বুঝি সে জেনারেলের কোচম্যান ইজরেল টেক্স। মরডণ্ট বা গেব্রিয়েলের কোনও চিহ্নই নাই! ভিত্তি-গাত্রেও তাহাদের ছায়াটুকু পড়ে না! বাহিরে অনেক সময় কান খাড়া করিয়া থাকি, কিন্তু কোথায় সে সুললিত প্রিয় কণ্ঠস্বর! নিশ্চয়ই তাহাদের তবে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে! খোলা থাকিলে যে কোন উপায়ে হোক, নিশ্চয় তাহারা এতদিনে একটা কিছু সংবাদ দিত।

পৃথিবীর অসংখ্য সুখ-দুঃখের কাহিনী বক্ষে ধরিয়া জলস্রোতের মতই কাল-প্রবাহ ছুটিয়া চলিয়াছিল। আমার ভয় ও ভাবনার মাত্রা এতদূর বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়া ছিল, যে সময় সময় মনে হইত, আমিও না ঐ রহস্য-নিকেতনের অধিবাসীদের মত একদিন ক্ষেপিয়া যাই!

২রা অক্টোবর। কুয়াশা-মণ্ডিত ক্ষীণ আলোক-বিচ্ছুরিত পথ দিয়া, যখন আমি প্রতিদিনের মতই প্রিয়তমার নিষ্ফল উদ্দেশে ক্রুমবারের অভিমুখে যাইতেছিলাম, সহসা তখন পথের ধারে একটা উইলো গাছের তলায় আমার দৃষ্টি পড়িল। একখানা পাথরের উপর একজন অপরিচিত বিদেশী লোক বসিয়া ছিল। এখানকার সকলকেই আমি জানি। লোকটির পরিচ্ছদের দুর্দ্দশা এবং জুতার মলিনতা দেখিয়া সহজেই অনুমান হয়, সে বহু দূর হইতে আসিয়াছে। হাঁটুর নিকট একটা খোলা ছুরি ও অর্দ্ধখণ্ড পাঁউরুটি পড়িয়া আছে! আপনার ক্রোড় হইতে রুটির গুঁড়া-গুলা সে ঝাড়িয়া ফেলিতেছিল। সম্ভবতঃ এইমাত্র সে প্রাতরাশ সমাধা করিয়াছে।

দ্বিতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি অনুভব করিবা-মাত্র লোকটা সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল।

তাহার আকারের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ এবং হস্তস্থ ছুরিকার তীক্ষ্ণতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আমি ধীরে ধীরে পথের অপর প্রান্তে সরিয়া আসিলাম। আমার বিশ্বাস, অভাবই মানুষকে মরিয়া করিয়া তোলে। হয়ত আমার ওয়েষ্ট-কোটের পকেটে যে সুবর্ণ শৃঙ্খলযুক্ত ঘটিকাযন্ত্র আমার বক্ষ-স্পন্দন-শব্দেরই অনুকরণ করিতে ছিল, তাহার লোভ সম্বরণ করা বেচারার পক্ষে কঠিন হইতে পারে। আর এই জনহীন কুয়াশাচ্ছন্ন, আধো-অন্ধকার পথে—সে কাজ

খুবই সহজ-সাধ্য ছিল। আমার বিশ্বাসকে ঘনাইয়া তুলিবার জন্যই যেন সে নিমেষে আমার গন্তব্য পথে আসিয়া দাঁড়াইল।

মন যদিও তাহার বিরুদ্ধে যথেষ্ট যুক্তি-তর্কের অবতারণায় উত্তেজিত হইয়া উঠিতে-ছিল, তথাপি যথাসাধ্য শান্ত ভাব ধরিয়া সংযত কণ্ঠস্বরে যথা-সম্ভব মৃদুতা রক্ষা করিয়া আমি কহিলাম, "কি চাই তোমার? আমি তোমার কোন উপকার করতে পারি কি?"

রৌদ্রে পুড়িয়া লোকটার মুখের রং একেবারে পাকা মেহগ্নি কাঠের বর্ণে পরিণত হইয়া ছিল। গালে প্রকাণ্ড একটা কাটা দাগ, ইহা তাহার শ্রীর বিশেষ উন্নতি সাধন করে নাই। মাথায় একটা ডগা-উল্টানো টুপী, দেখিলে মনে হয়, কখনো সে সৈন্য বিভাগে কাজ করিত! মুখখানা কদাকার। এক কথায় লোকটাকে দেখিয়া তাহার প্রতি আমার মনে কোনরূপ অনুকূল ভাব জন্মানো দূরে থাক্, বরং তাহাকে একটা বদ্‌মায়েস গুণ্ডা বলিয়াই ধারণা হইয়া ছিল।

বর্ব্বরটা কোন কথা না কহিয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া জ্বলন্ত আরক্ত দৃষ্টিতে আমার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া ধীরে ধীরে হস্তস্থ ছুরিকাখানা বন্ধ করিয়া ফেলিল। তাহার পর কহিল, "আমার বোধ হয়, তুমি পুলিসের লোক নও? তোমার বয়স খুব কাঁচা বলেই মনে হচ্চে। পাজী,—অকর্ম্মণ্য, পুলিসের লোকগুলো, একবার আমায় পেস্‌লীতে আর একবার উইগটাউনে ধরেছিল, কিন্তু ফের যদি কেউ সে চেষ্টা করে ত, তাকে অনেক কাল করপোর‍্যাল স্মিথের নাম মনে করিয়ে রাখাব? মজার দেশ যা হোক, কাজ দেবার বেলা খোঁজ নেই,—কি করে খাই? কি সম্পত্তি,—তা বল্‌তে না পারলেই শ্রীঘর? জাহান্নমে যাক্ সব!"

আমি ধীরভাবে উত্তর দিলাম, "একজন সৈনিক পুরুষের এ রকম অবস্থা-বিপর্য্যয় হয়েচে, শুনে আমি ভারী দুঃখিত হলুম। তুমি কোন্ পল্টনে কাজ করতে?"

"এইচ্ ব্যাটারী; রাজকীয় অশ্বারোহী সৈন্যবিভাগ। উচ্ছন্ন যাক্ তারা,—আমার এই ষাট বছর বয়স হল, ভিক্ষের মত পেনসন্ পেলুম কি না, আটত্রিশ্ পাউণ্ড দশ সিলিং—এতে ত আমার বিয়ার আর তামাকের খরচও কুলোয় না!"

আমি বলিলাম, "কিন্তু আমার বিশ্বাস, আটত্রিশ পাউণ্ড দশ সিলিংয়ে তোমার এ বুড়ো বয়সে ভাল রকমই দিন কাটতে পারে!"

বিকট মুখখানা খিঁচাইয়া লোকটা সহসা আমার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিল, ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, "তোমার হলে হত, সত্যি না কি,—তুমি কি তাই মনে কর?" তাহার পর ললাটের উপর হইতে রুক্ষ কর্কশ বিশৃঙ্খল চুলগুলা বাম হস্তে সরাইয়া দিয়া, ঘৃণা ও তাচ্ছল্যের দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া, পুনরায় কহিল, "তলোয়ারের এই যে চোট্‌টি দেখ্‌চ, এর দাম কত? দিন নেই,—রাত নেই, জল, ঝড়, বজ্রাঘাত মাথা পেতে নিয়ে আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গ ছেড়ে এই যে হাড়ের বোঝা বয়ে বয়ে কামান-বন্দুকের মুখে মুখে ঘুরে বেড়ানো,—কেন? জীবনটা কি ফ্যাল্‌না, না কি? এই যে পুবে বাতাস বইলেই কোঁ-কোঁ-কোঁ-কাঁপুনি, জ্বর, পিলে-লিবারে পেট ফুলে জয়ঢাক, ভারতবর্ষের

আগুনে বাতাসে, রোদে পুড়ে ঝল্‌সে ওঠা —বনে-জঙ্গলে জানোয়ারের মত ওৎ পেতে বসে থাকা—এ সব কিসের জন্যে? ছেঁড়া ন্যাকড়ার এই আটত্রিশ পাউণ্ড! ছোঃ—! এ সব জিনিষের বাজার-দর কত? কি বল গো মশাই?" লোকটার স্বরে বিদ্রূপের সুর ধ্বনিয়া উঠিল।

শান্ত স্বরেই আমি উত্তর দিলাম, "এটা গরীবদের দেশ—এ অঞ্চলে যার আয় তোমার মত, তাকে লোকে অবস্থাপন্নই বলে থাকে।"

পকেট হইতে একটা প্রকাণ্ড পাইপ টানিয়া বাহির করিয়া তাহাতে তামাক ভরিতে ভরিতে সে উত্তর দিল, "তোমরা ভারী বোকা,—আর তোমাদের মতি-গতিও বোকার মত। হ্যাঁ! সুখে স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকৃতে হয় কেমন করে, তা আমরা বেশই জানি। আমার হাতে যতক্ষণ অবধি একটি সিলিং থাকে,—কি করে তার সদ্ব্যয় করতে হয়, তা আমার বেশ জানা আছে। দেশের কথা বলচ? দেশের জন্যেই আমি লড়াই করেচি,—দেশ আমার জন্যে কল্লে কি?—আমরা এইবার রুসিয়ানদের সঙ্গে মিলে তাদের দেখিয়ে দেব যে, কত সহজে হিমালয় পার হতে হয়! তখন ইংরেজ আর আফগান কারো সাধ্য হবে না যে তাদের প্রবেশ নিষেধ করেন! সেণ্ট পাটার্স্‌বার্গে এ সব খপরের দাম কত, মশায়, তার কিছু খবর রাখেন কি?"

অত্যন্ত ঘৃণার সহিত আমি উত্তর দিলাম, "একজন বৃদ্ধ সৈনিকের মুখে তামাসাতেও এমন কথা শুনতে আমার লজ্জা হয়।"

"তামাসা?" একটা অকথ্য শপথ গ্রহণ করিয়া চীৎকার-স্বরে সে উত্তর দিল, "তামাসা? অনেক দিন আগেই আমি এ কাজ করতুম, যদি রুশিয়ানরা আমার পরামর্শ নিত! স্কোবিলফ্‌ লোকটা তাদের দলের মধ্যে সব চাইতে ভাল, গুণীর সে কদর বোঝে, কিন্তু দলে তাকে আমোলই দিলে না যে। ছোট লোকের দল!—যাক্‌, সে এখানকার কথাও নয়—সেখানকার কথাও নয়। এখন বল দেখি মশায়, হিথারষ্টন বলে এ দেশে কেউ বাস কচ্ছে কি না? একচল্লিশ নম্বর বাঙ্গালী সৈন্যের দলে যে ছিল। উইগটাউনে খবর পেলুম, লোকটা এইখানেই কোথা থাকে।"

"ঐ দেখছ, উইলো গাছের ঝোপের পাশ দিয়ে একটা সরু রাস্তা দক্ষিণ দিকে সোজা চলে গেছে, ঐটে ধরে যাও—সামনেই দেখবে, মস্ত সাদা বাড়ী! কিন্তু বাড়ী পেলেই যে বিশেষ কিছু কাজ হবে, তা নয়—তিনি কারো সঙ্গে দেখা করেন না।" ক্লুমবারের দিকে চাহিয়া আমি উত্তরচ্ছলে তাহাকে আমার মন্তব্যটিও জানাইয়া দিলাম।

আমার কথার শেষ অংশটুকু শ্রুতিগোচর হইবার পূর্ব্বেই সে অত্যন্ত দ্রুত পদক্ষেপে ক্লুমবারের দিকে চলিতে আরম্ভ করিল। লোকটার চলনে কিছু বৈচিত্র্য ছিল। দক্ষিণ পদটি এক হাত অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই বাম পদটি ছয় হস্ত অগ্রসর হইয়া যায়। সম্ভবতঃ যে কোন কারণে হোক দক্ষিণ পদের জোর কম থাকায় বাম পদের শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আমি বিস্মিত নেত্রে তাহার সেই অপূর্ব্ব গতি ভঙ্গী পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম

সেই কুৎসিত অপ্রিয়-দর্শন লোকটার পানে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে প্রথমেই আমার

চিন্তা হইল যে, ইহার সহিত কোপন-স্বভাব জেনারেলের সাক্ষাতের ফল কিরূপ হইবার সম্ভাবনা! কথাটা স্মরণ হইবামাত্র কাল-বিলম্ব না করিয়া আমি তাহার অনুসরণ করিলাম। দুই ধারের ঘন-সন্নিবিষ্ট উইলো ও ঝাউগাছের ছায়া-স্নিগ্ধ পথ ধরিয়া অত্যন্ত দ্রুত পদে ক্লুমবারের দিকে অগ্রসর হইলাম।

কুয়াশা কাটিয়া তখন সূর্য্যালোক তরুণীর লজ্জাবগুণ্ঠনের মত সবেমাত্র ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতেছে। গাছের ছায়ার ফাঁকে ফাঁকে ঝিকৃমিকে রৌদ্রের ছায়া, পথের উপর আলোকের গোলক-বিন্দু অঙ্কিত করিতেছিল। সমুদ্রের বুকের উপর দিয়া বায়ু-প্রবাহ হু-হু-স্বরে বহিয়া আসিয়া বৃক্ষ-শাখা কম্পিত করিতেছিল। সৈকতে জলের উচ্ছ্বাস-শব্দ অস্পষ্ট সোহাগের মতই মনে হইতেছিল। পথের ধারে একটা তন্দ্রাতুর কুকুর পড়িয়া ঝিমাইতেছিল, আমার দ্রুত-গমন-শব্দে, নিদ্রালস চক্ষু অর্দ্ধ-নিমীলিত করিয়া একবার সে চাহিয়া দেখিল।

ফটকের ধারেই লোকটার সাক্ষাৎ মিলিল। সে তখন বেড়ার ফাঁকের ভিতর দিয়া তাহার কৌতূহলী চক্ষুর দৃষ্টি ভিতরে প্রেরণ করিতেছিল। আমাকে দেখিয়া একটু ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া সে বলিল, "লোকটা কি ভয়ানক চালাক! ঐ গাছের আড়ালে যে প্রকাণ্ড কোঠাখানা দেখা যাচ্ছে, ঐটেতেই বুঝি সে থাকে!"

"হাঁ, বাড়ী ঐ-ই বটে, কিন্তু আমার পরামর্শ যদি শোন, তাহলে তাঁর সঙ্গে একটু সাবধানে কথা-বার্ত্তা কবার চেষ্টা করো, অমন আবোল-তাবোল শোন্‌বার লোক তিনি নন্।"

মাথা দুলাইয়া সে উত্তর দিল, "সে কথা মিছে নয়। লোকটি বড় সহজ নয়, কিন্তু ঐ যে সে আস্‌চে! নয় কি?"

দরজার ছিদ্রাংশে চক্ষু রাখিয়া আমি ভিতর-পানে দেখিয়া লইলাম,—লোকটার অনুমান মিথ্যা নহে। আমাদের কথোপ-কথনের শব্দে অথবা আমাদের দেখিতে পাইয়া, যে কারণেই হউক, জেনারেল এই পথেই আসিতেছিলেন। চলিতে চলিতে মধ্যে মধ্যে থমকিয়া দাঁড়াইতে ছিলেন, নয়নের চকিত দৃষ্টিপাতে চিন্তা ও ভয়ের ছায়া সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছিল।

ঈষৎ শ্লেষ-মিশ্রিত ঘৃণার সুরে রুফাস-স্মিথ কহিল, "ভয় পেয়েচে কি না,—তাই এত তদারক করা হচ্চে! কেন যে ভয়, তাও ত আমার জান্‌তে বাকী নেই! ওর মতলব, কোন রকমে না ফাঁদে পড়ে! তোমার দিব্য, এমন লোক আমি আমার জন্মে কখনো আর দুটি দেখিনি!" কথা শেষ করিয়া রেলিংয়ের উপর পদাঙ্গুষ্ঠের ভর রাখিয়া হাত দুইখানা উচ্চে তুলিয়া কর্কশ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া সে বলিয়া উঠিল, "চলে এস! সাহসী কমাণ্ডার সাহেব, চলে এস!—পথ সাফ্ হয়ে গেছে। চোখের সাম্‌নে শত্রু কেউ নেই,—চলে এস।"

আমার মনে হইল, তাহার কথা শুনিয়া জেনারেলের মুখের সে ভয়ের ভাবটা যেন অনেকখানি কমিয়া গেল। কিন্তু দারুণ রোষে তাঁহার কৃশ শরীর বায়ু-তাড়িত বংশ-পত্রের মতই কম্পিত হইতেছিল। উচ্ছলিত

রক্তরাগে পাণ্ডু মুখখানা একেবারে রাঙ্গিয়া উঠিল। আমার উপর দৃষ্টি পতিত হইবামাত্র, যেন অতিমাত্র বিস্ময়ের সহিত জেনারেল বলিয়া উঠিলেন, "এ, কে, ওয়েষ্ট! তুমি? তুমি এখন কি মনে করে? এটাকেই বা সঙ্গে করে আন্‌লে কেন?"

তাঁহার মুখ ও ললাটের ঘন-অন্ধকার ছায়ার দিকে লক্ষ্য করিয়া আত্ম-সমর্থনের জন্য কতকটা বিরক্তির সহিতই আমি উত্তর দিলাম, "আমি একে নিয়ে আসিনি,—লোকটা পথের ধারে বসেছিল, আপনার ঠিকানা খুঁজছিল, তাই তাকে বাড়ী দেখিয়ে দিয়েছি।"

আমার সঙ্গীর প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া, দৃঢ় অনুজ্ঞাব্যঞ্জকস্বরে জেনারেল জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার কাছে তোমার কি দরকার?"

আগন্তুক টুপি স্পর্শ করিয়া, অত্যন্ত সকরুণ মিনতিপূর্ণ স্বরে উত্তর দিল, "আমি মহারাণীর একজন পুরোন চাকর। ভারতবর্ষে আপনার মস্ত নাম শুনেছিলুম, তাই দুঃখের দশায় পড়ে, মনে হল, যদি আপনার সহিস্ কিম্বা মালীর দরকার হয়—"

গম্ভীর মুখে ঔদাসীন্যের সহিত জেনারেল উত্তর দিলেন, "দুঃখের বিষয়, আমি তোমার কোন সাহায্যই কর্‌তে পাচ্ছি না।" চোখে, মুখে, যথাসাধ্য দীনতার ছবি ফুটাইয়া তুলিয়া, ভিক্ষুকের প্রার্থনার সুরে, সে কহিল, "যদি তা না পারেন, ত কোন রকমে কিছু সাহায্য—আমায় করুন? আপনার একজন পুরোনো সঙ্গী, না খেতে পেয়ে মর্‌বে, এ কি সত্যই চোখে দেখ্‌তে পারবেন? দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধে আমি সঙ্গে গিয়েছি,—গিরি-পথেও সৈন্যের সঙ্গে থেকে'চি—"

জেনারেল স্থিরনিষ্ঠ তীক্ষ্ণ কঠোর অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন,—কোন উত্তর দিলেন না। তাঁহার মুখে বিস্ময়, বিষাদ ও ক্রোধ, এই পরস্পর বিরোধীভাবগুলা নিমেষে ফুটিয়া উঠিল।

তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া লোকটা পুনরায় আরম্ভ করিল, "গজনীতে যখন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দেওয়ালগুলো ভেঙে পড়ছিল, তখনও আমি আপনার পাশে, চল্লিশ হাজার আফ্‌গান আমাদের কামানের মুখে বল্লেই হয়! আমার কথা মিথ্যে কি না—পরীক্ষা করুন। আপনার কাঁচা বয়সের সময় আপনার সঙ্গেই আমি এই সব কাজ করেচি, এখন আমরা বুড় হলুম,—মরণ তার বরফের মত সাদা ঠাণ্ডা আঙ্গুল দিয়ে, চুলের উপর ছাপ মেরে দিয়ে গেছে, এখন কি আমি আপনার এই এতবড় বাড়ীখানা থাকৃতে, রাস্তার ধারে হ্যাংলা কুকুরের মত না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মর্‌ব?"

জেনারেলের ভাব-গম্ভীর মুখে ঘৃণা-মিশ্রিত দৃঢ়তার ছায়া ফুটিয়া উঠিল, "তুমি পাকা বদমাস্,—তুমি যদি সৎ সৈনিকের ন্যায় থাকৃতে, আজ তাহলে কখনও পরের কাছে ভিখিরীর মত হাত্ পাততে হত না। আমি তোমায় একটি পয়সাও দেব না।"

জেনারেলকে বাটীর অভিমুখে ফিরিতে দেখিয়া লোকটা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "আর একটা কথা, মশায়, আমি তারাদা গিরিপথেও গেছ্‌লুম।"

বৃদ্ধ জেনারেল যেন সহসা বন্দুকের

গুলিতে আহত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। মুখখানা মুহূর্ত্তে মৃত মুখের মতই বিবর্ণ হইয়া গেল। রুদ্ধ কণ্ঠ হইতে স্বর বাহির হইল না,—কেবল অক্ষমতা-জনিত মানসিক আবেগে বুকটা ফেনোচ্ছ্সিত সমুদ্র-বক্ষের মত ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল, পলক-হীন নেত্রে তিনি আগন্তুকের পানে চাহিয়া রহিলেন। কি একটা স্মৃতির তরঙ্গ যেন তাঁহার মনের মধ্যে উত্তাল হইয়া উঠিতে চাহিতেছিল! দুই হস্ত বক্ষ চাপিয়া, আগন্তুকের প্রতি অর্থহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া কম্পিত, জড়িত স্বরে জেনারেল ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি, কি বল্‌চ তুমি?"

"আমি বলছিলুম মশায়,—যে, আমি গোলাপ সিং বলে একজনকে জানতুম।" নিষ্পেষিত দন্তের মধ্য দিয়া অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী মৃদু স্বরে কথা কয়টি উচ্চারিত হইবার সময় বক্তার মুখে ঈর্ষার যে বীভৎস ছায়া স্পষ্টতর রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা অবর্ণনীয়!

এই কথা কয়টির ফল ফলিল কিন্তু আশ্চর্য্য রূপ! বক্তা যদি জেনারেলকে বিচলিত করিবার জন্য, অথবা ভয়-প্রদর্শনের জন্য উপরি-উক্ত কথা কয়টি বলিয়া থাকে, তাহা হইলে সে অভীষ্ট-সাধনে সে সম্পূর্ণরূপেই কৃতকার্য্য হইয়াছিল। জেনারেল দুই হস্তে ফটকের লৌহ রেইল ধরিয়া কোনরূপে আপনার পতনোন্মুখ দেহভার রক্ষা করিলেন। তাঁহার শীর্ণ পাণ্ডুর মুখ মুহূর্ত্তে যেন সর্পদষ্টের মত নীল মাড়িয়া গেল! কিছুক্ষণের জন্য বাক্‌শক্তিও যেন একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে হাঁফাইতে হাঁফাইতে উদ্বেগ-পীড়িত স্বরে তিনি প্রশ্ন করিলেন, "গোলাপসিং? কি করে তাঁকে জান্‌লে,—কে তুমি?" স্থির অকম্পিত কণ্ঠে আগন্তুক কহিল, "আমার মুখের পানে বেশ করে তাকান্ দেখি,—চল্লিশ বছর আগে আপনার চোখের যে জলুষ ছিল—অবশ্য এখন তা নেই!"

জেনারেল সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া একাগ্র দৃষ্টিতে সেই অপরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদধারী অশুভ-দর্শন ভিক্ষুকটার পানে চাহিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে ধীরে ধীরে তাঁহার মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। পাণ্ডু মুখে আবার ঈষৎ রক্ত-সঞ্চালনের লালিমা দেখা দিল। বর্ষার বর্ষণ-ক্লান্ত মেঘের স্তর ভেদ করিয়া অস্তমান্ সূর্য্যের রাঙ্গা আলোটুকু যেন আকাশের গায় ছড়াইয়া পড়িল। ভাবহীন চক্ষের দৃষ্টি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! করপোর্যাল রুফাস্ স্মিথ তুমি?"

"হাঁ,—এতক্ষণে আপনি আমায় ঠিক্ চিন্‌তে পেরেচেন! আমি তাই ভাবছিলুম, বলি, চেনা লোককে চিন্‌তে মানুষের কত সময় লাগে! এখন আস্তে আস্তে দরজাটি খুলে ফেলুন,—ভেতরে ঢুকি।"

সস্মিত মুখে কম্পিত হস্তে জেনারেল ধীরে ধীরে ফটক খুলিয়া দিলেন।

আমার মনে হইল, রুফাস স্মিথকে চিনিতে পারিয়া জেনারেল আশ্বস্ত হইলেও সন্তুষ্ট হন নাই। ফটক খুলিয়া দিয়া জেনারেল কহিলেন, "করপোর্যাল, আমি অনেক সময় তোমার কথা ভাবতুম,—তুমি বেঁচে আছ কি না? কিন্তু তোমার সঙ্গে আবার কখনো যে দেখা হবে, এ সম্ভাবনার কথা কখনো কিন্তু আমার মনে ওঠে নি। এখন

বল দেখি, এই দীর্ঘ বছরগুলো কি করে কাটালে?"

"কি করে কাটালুম? মদ খেয়ে! পেন্‌সনের টাকাটি যতদিন হাতে থাকে তোফা ভরপুর খাই, তার পর শেষ সিলিংটিও যখন কর্পূরের মত উবে যায়, তখনন ভিক্ষের ঝুলি ঘাড়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি,—দু-এক গ্রাস যা যোগাড় হয়! এ ছাড়া আমি আপনার খবরও সর্ব্বদা নিয়ে থাকি!"

এ সকল অবান্তর কথায় তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি অনভিপ্রেত ভাবিয়া আমি অগ্রসর হইয়া জেনারেলকে বিদায় অভিবাদন করিয়া ফিরিতেছিলাম, সহসা চিন্তিত মুখে বিষণ্ণ ভাবে জেনারেল কহিলেন, "যেয়োনা ওয়েট! দাঁড়াও, একটু কথা আছে তোমার সঙ্গে। আমাদের এ সব ঘরাও কথার জন্য কিছু মনে করো না। এ সব ব্যাপারের কতকটা তুমি জানও,—আর হয়ত শীঘ্রই এর সঙ্গে তোমাকেও জড়িয়ে পড়তে হবে।"

করপোর‍্যাল অত্যন্ত বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমাদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়বে,—তার মানে? এ আবার এসে জুট্‌ল কেমন করে?"

কণ্ঠস্বরের মৃদুতা-রক্ষার দিকে যথেষ্ট লক্ষ্য রাখিয়া জেনারেল উত্তর দিলেন, "স্বেচ্ছায়! স্বেচ্ছায়! ইনি আমাদের প্রতিবাসী, আর আবশ্যক হলে আমাদের বিপদে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুত হয়েছেন।" ব্যাখ্যানটা স্মিথের কৌতূহলকে পূর্ণ না করিয়া বর্দ্ধিতই করিয়া তুলিল। আমার প্রতি তাহার গোলাকার চক্ষুর প্রশংসমান্ দৃষ্টি নিহিত করিয়া সে কহিল, "এটা যেন ঠিক্ মুরগীর লড়াই! আমি এমন অদ্ভুত কথা ত কখনো শুনিনি?

কথা ফিরাইবার অভিপ্রায়ে বাধা দিয়া জেনারেল বলিলেন, "তুমি ত আমায় খুঁজে বার করেচ, এখন বল দেখি, আমার কাছে চাও কি?"

"চাই কি?—মাথা গুঁজে থাকবার জন্য বাড়ী,—পেটের জন্য খাবার, লজ্জা নিবারণের জন্য কাপড়, আর সব চেয়ে—প্রধান, বেঁচে থাক্‌বার জন্য কিছু মদ্।"

"বেশ, আমি রাজী! কিন্তু আমারও কথা আছে,—এখানে নিয়মে থাকতে হবে। মনে থাকে যেন, আমি জেনারেল—আর তুমি করপোর‍্যাল—তোমায়-আমায় প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ,—দ্বিতীয় বার এ কথা যেন তোমায় স্মরণ করিয়ে দিতে না হয়।"

করপোর‍্যাল সরলভাবে দণ্ডায়মান হইয়া দক্ষিণ হস্তে মস্তক স্পর্শ করিয়া মিলিটারী নিয়মে জেনারেলকে অভিবাদন করিল।

জেনারেল কহিলেন, "আমি ভাবচি, পুরোনো মালীটাকে জবাব দিয়ে—তোমায় মালীর কাজ দেব। আর ব্রাণ্ডি—তা কিছু-কিছু পাবে, তবে পরিমিত! এখানে মাতাল কেউ নেই।"

করপোর‍্যাল সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, "আপনি কি মদ, তামাক—আফিং কিছুই খান্ না?" দৃঢ় কণ্ঠে জেনারেল উত্তর দিলেন, "না, কিছুই না।"

"তাহলে আমি বল্‌চি মশায়, আপনার শরীর—আর স্নায়ু, দুই-ই পাথরের চেয়ে শক্ত।

মিউটিনির সময় ভিক্টোরিয়া ক্রশ লাভ করা কেন যে আপনার পক্ষে আশ্চর্য্য হয় নি, তা এখন আমি বুঝ্তে পার্‌চি। আমি যদি দু চার ফোঁটা মদ না খেতুম, তা হলে কক্ষণো রাত্তিরের পর রাত্তির সেই সব কথা শুন্‌তে সাহসও পেতুম না। শুন্‌লে—পাগল হয়ে যেতুম।"

সে কথা কানে না তুলিয়া জেনরেল আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "ওয়েষ্ট! এই লোকটিকে আমার বাড়ী দেখিয়ে দেওয়ায় আমি কৃতজ্ঞ হলুম। যেমনই গরীব হোক না,—আমি আমার কোন পুরোণো সঙ্গীকে ত্যাগ কর্‌তে ইচ্ছে করি না। ও বাস্তবিকই সেই কি না, পরীক্ষা কর্‌বার জন্যেই আমি প্রথমে ওর কথায় কান দিইনি। করপোর‍্যাল, তুমি হলের ভিতর যাও,— আমিও এখনি যাচ্ছি।"

একটা সুগভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া জেনারেল কহিলেন, "আহা, বেচারা! একটা লড়াইয়ের সময় গুলি লেগে লোকটার পায়ের হাড় গুঁড়ো হয়ে যায়, ডাক্তার অপারেশন্ করে গুলি বার কর্‌তে চাইলে,— কিন্তু এমন বোকা আর একগুঁয়ে লোক ও, যে কিছুতেই সে গুলি বার কর্‌তে দিলে না। সেই আফগানিস্থানের বন্ধুর পার্ব্বত্য পথের সাহসী যুবা সৈনিককে আমি যেন এখনও স্পষ্ট চোখের উপর দেখ্‌তে পাচ্ছি। ওর সঙ্গে এমন কতকগুলো ঘটনায় আমি এক সঙ্গে জড়িয়ে আছি,—সময়ে সবই তুমি শুন্‌তে পাবে। এখন স্বভাবতঃই ওর উপর সহানুভূতি হচ্চে, সে জন্য ওর কিছু উপকারও কর্‌তে ইচ্ছে করছি। ও তোমাকে আমি এখানে আস্‌বার আগে কিছু বলেছিল?"

"কোন কথাই না।" তাচ্ছল্যভাবে জেনারেল বলিলেন, "ওঃ!" বাহিরে তাচ্ছল্য ভাব প্রকাশ করিলেও তাঁহার চোখে মুখে নিশ্চিন্ততার যে অভাব ব্যক্ত হইয়াছিল, তাহা আমার চক্ষু এড়াইল না।

জেনারেল কহিলেন, "আমি ভেবেছিলুম, সে হয় ত তোমার কাছে আমাদের পুরাকালের সব গল্পই করেচে। যাই হোক, তার আগমন আমার ক্ষুদ্র সংসারে বড় সহজ বিপ্লব বাধাবে না, চেহারাটি ত আর সুন্দর নয়! বাড়ীর লোকেরা হয় ত ভয় পেয়ে গোলমাল লাগিয়ে দেবে! দেখি, আমি ওর বন্দোবস্ত করে দি,—এখন তা হলে বিদায়—।" হাত নাড়িয়া আমায় বিদায় দিয়া, চিন্তা-মন্থর গতিতে জেনারেল ফটক বন্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন।

জেনারেলের সুদীর্ঘ অবয়ব একেবারে দৃষ্টি পথের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেলে, আমি একবার মূক কাষ্ঠময় প্রাচীরটার চারিদিক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়া লইলাম! ভাষা-হীন জীবন হীন দারুময় আবরণ! মরডণ্ট বা প্রিয়তমার কোন উদ্দেশই সে প্রদান করিতে পারিল না। হায় মানবের দুরাশা! চলিতে চলিতেও আমি ফিরিয়া চাহিতে ছিলাম, যদি ফটকের ফাঁকের ভিতর দিয়া দুইটি সুনীল নেত্রের মধুর দৃষ্টি মুহূর্ত্তের জন্যও চোখে পড়ে!

ক্রমশঃ।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।

সিন্ধু-তাণ্ডব

('পঞ্চচামর' ছন্দের অনুসরণে)

মহৎ ভয়ের মুরৎ সাগর
বরণ তোমার তমঃশ্যামল ;
মহেশ্বরের প্রলয় পিনাক
শোনাও আমায় শোনাও কেবল।

বাজাও পিনাক বাজাও মাদল
আকাশ পাতাল কাঁপাও হেলায়,
মেঘের ধ্বজায় সাজাও দ্যুলোক
সাজাও ভূলোক ঢেউয়ের মেলায়।

ধবল ফেনায় ফুটুক তোমার
পাগল হাসির আভাস ফেনিল,
আলাপ তোমার প্রলাপ তোমার
বিলাপ তোমার শোনাও, হে নীল!

কিসের কারণ আকাশ ভাষণ ?
কিসের তৃষায় হৃদয় অধীর ?
পরাণ তোমার জুড়ায় না হায়
অধর সুধায় অযুত নদীর ?

বেদের অধিক প্রাচীন নিবিদ্
নিবিদ্ হ'তেও প্রাচীন ভাষায়,—
মরম তোমার নিতুই জানাও
হে সিন্ধু! কোন্ সুদূর আশায় ?

সুধার আধার চাঁদের শোকেই
তোমার কি এই পাগল ধরণ ?—
মথন দিনের গভীর ব্যথায়
মরণ-সমান আঁধার বরণ!

গলায় তোমার নাগের নিবীত
ঢেউয়ের মেলায় সাপের সাপট ;
চাঁদের তরাস রাহুর গরাস,
রাহুর তরাস তোমার দাপট।

হাজার যোজন বিথার তোমার
বিপুল তোমার হৃদয় বিজন ;
তোমার ক্ষোভের নিশাস মলিন
করুক প্রাবৃট্ মেঘের সৃজন।

রবির কিরণ ছড়ায় তরল
গোমেদ মাণিক মনঃশিলায়,—
মুনাল পাখীর সুনীল পাখায়
কুনাল পাখীর আঁখির নীলায়।

বিষের নিধান যে নীল্-লোহিত
নিদান বিষের বিষম দহন
তাঁহার ছায়ায় রহুক নিলীন
মায়ায় যে জন গভীর গহন।

বাজাও মাদল, বিভোল্ পাগল!
উঠুক্ হে জয়জয়ন্তী তান ;
বাজের আওয়াজ তোমার কাছেই
শিখুক্ নবীন মেঘের বিতান।

ঢেউয়ের ঘোড়ার কে হয় সওয়ার
কে হয় জোয়ার হাতীর মাহুত ?
ডাকাও সবায়, মিলাও সবায়,
পাঠাও তোমার প্রগল্ভ দূত।

প্রাচীন জগৎ গুঁড়াও এবং
নূতন ভুবন গড়াও হেলায়,
উঠুক্ কেবল 'ববম্' 'ববম্'
চতুঃসীমার বেলায় বেলায়।

জতুর পুতুল বসুন্ধরায়
ও নীল মুঠার জানাও পেষণ!
জানাও সোহাগ কী ভীম ভাষায়!
প্রেমের ক্ষুধায় কী অন্বেষণ!

জগন্নাথের শীতল শয়ান
তুমিই কি সেই অনন্ত নাগ?
ফণায় ফণায় মাণিক তোমার
পাথার হিয়ায় অতুল সোহাগ।

তিমির পাঁজর তুফান তোমার,
খেলার জিনিস হাঙর মকর,
সগর-কুলের স্বখাত্-সলিল
নিধির নিধান হে রত্নাকর!

ভুবন-ভ্রূণের দোলার শিকল
তুমিই দোলাও, নীলাব্জ-নীল!
আকাশ একক তোমার দোসর,
সোদর তোমার অনল অনিল।

ঝামর ঢেউয়ের ঝালর হেলায়
অলখ্ বেতাল দিনের আলোয়,
রভস তোমার আসব সমান
দিবস নিশায় আলোয় কালোয়।

বাসব যাগায় করেন পীড়ন
সহায় শরণ তুমিই তাহার,
রাজার রোষের আশঙ্কা নেই
ঢেউয়ের তলায় লুকাও পাহাড়!

আগম নিগম গোপন তোমার
কখন কী ভাব,—বোঝায় কে সেই?
এসেই—"অয়ম্ অহম্ ভো"—এই
বলেই তফাৎ রোষের বেশেই!

বিরাগ তোমার যেমন বিষম,—
সোহাগ তেমন, তেমন শাসন;
ঢেউয়ের দোলেই ভুবন দোলাও,
ভূমার কোলেই তোমার আসন।

সুধার সাথেই গরল উগার!—
পাগল! তোমার কী এই ধরণ?
জগৎ-জয়ের মুরৎ সাগর!
মহৎ-ভয়ের মহৎ শরণ!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

পাট ও পাত

আমার 'পাত ও পলু' শীর্ষক প্রবন্ধে রেশম পোকার সহিত পাতের কিরূপ সম্বন্ধ ও ঘনিষ্ঠতা তাহা দেখাইয়াছি। পাতের অপর নাম তুঁত। মালদহ, রাজসাহী বীরভূম মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি রেশমপ্রধান জেলাসমূহে প্রায় বার আনা ডাঙ্গার জমিতেই তুঁতের চাষ হয় কারণ তুঁত পাতা না খাইলে রেশম কীট (পলু) বাঁচে না। পূর্ব্বে প্রতি বিঘা তুঁতের জমিতে খরচখরচা বাদে মোটের উপর ২০০ শত টাকা কৃষাণের লাভ থাকিত। কিন্তু সে দিন এখন চলিয়া গিয়াছে।

রেশম হইতে এই সমস্ত জেলার চারি পাঁচ সম্প্রদায় প্রতিপালিত হইতেছে, কেহ পলুপোকার খাদ্য তুঁতগাছের আবাদ করে, কেহ রেশম পোকা প্রতিপালন করিয়া কোয়া তৈয়ার করে, কেহ রেশমের কোয়া খরিদ করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে, আবার কেহ বা রেশমের

সূতার ব্যবসা করে। এইরূপে অনেক সম্প্রদায় ইহা হইতে অন্নের সংস্থান করিয়া লয়। এতদ্ভিন্ন এই চারি জেলায় ৫।৬টী বড় বড় সাহেব কোম্পানীর কুঠী ছিল, এই সমস্ত কুঠীয়াল সাহেবগণের অত্যাচার ও জবরদস্তির অংশটা বাদ দিয়া উপকারের দিকটা আলোচনা করিলে জানা যায় যে, প্রত্যেক কোম্পানীর কুঠিগুলিতে গড়ে প্রায় ১০০ শত করিয়া লোক প্রতিপালিত হইত, এবং কোম্পানীর নিকট হইতে কৃষাণগণ সময়ে অসময়ে আবশ্যক মতন যথেষ্ট টাকা দাদন পাইয়া নির্ব্বিঘ্নে পাত ও পলুর চাষ করিতে পারিত এবং জমিদারেরও খাজনা পরিশোধ করিত। এই সমস্ত কোম্পানী ছাড়া গবর্ণমেণ্টেরও স্বতন্ত্র কৃষিবিভাগ আছে। ফাবগুসন্ সাহেবের কুঠী ফেল হইলে রাইট এণ্ড এণ্ডারসন কোম্পানীর কুঠী চলিল, এই কোম্পানীর ব্যবসা মন্দা পড়ায় বেঙ্গল সিল্ক কোম্পানীর অভ্যুদয় হইল; বেঙ্গল সিল্ক কোম্পানীর কুঠী উঠিয়া গেলে লুইপ্যান কোম্পানী সেই স্থান দখল করিলেন, বিদেশী বণিকদিগের সর্ব্বাপেক্ষা বড় ধনী এই লুইপ্যান কোম্পানীও সম্প্রতি ফেল হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা তাঁহাদের প্রভূত জমিদারী ও আসবাব পত্র বিক্রয় করিয়া গৃহে ফিরিতেছেন। বিদেশী বণিকগণ যখন অগ্রে দাদন দিয়া, পৃথক্ পাহারা বসাইয়া, পাতের আবাদ করাইয়া, পলু পুষিয়া সর্ব্বশেষে চড়া দরে কোয়া খরিদ করিয়াও ব্যবসা চালাইতে পারিলেন না তখন অন্যান্য ছোট ছোট স্বদেশী কারখানাগুলি যে ২।৪ বৎসরের মধ্যেই লয় প্রাপ্ত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

বৈদেশিক রেশমই যে ভারতীয় রেশম নষ্ট করার একমাত্র কারণ তাহাও ঠিক নহে, কুঠিয়াল সাহেবগণ রেশম ব্যবসাটী একচেটিয়া করিয়া, দাদন দিয়া, জবরদস্তি করিয়া কৃষাণকে পাতের চাষ করাইতে লাগিলেন, আপন ইচ্ছামত রেশম গুটির দর কম বেশী করিয়া দিতে আরম্ভ করিলেন, প্রজা উৎপীড়িত হইয়া ক্রমশঃ পাত ও পলুর আবাদ কৌশলে পরিত্যাগ করিয়া অন্য পন্থা অবলম্বন করিতে লাগিল। এই জন্যই ত লুইপ্যান কোম্পানীর বড় সাহেবকে, ভারত পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সময় দুঃখ করিয়া বলিয়া যাইতে হইতেছে—"আমাদের ফ্রান্সে ধনীর ঘরে ২।৩ হাজার তাঁত চলে। আমি গত বৎসর হইতে বহু চেষ্টা করিয়াও সেই সকল তাঁত চলিবার উপযুক্ত পরিমাণ রেশম বাঙ্গালা হইতে সরবরাহ করিতে পারিলাম না, এত দর বেশী দিয়াও কোয়া সংগ্রহ হইল না,—কাজে কাজেই আমাকে কোম্পানী তুলিয়া দিতে হইল,—কুঠিয়াল সাহেবের ম্যানেজার সাহেবগণ যদি পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়া একটু সাবধান হইতেন তাহা হইলে এক্ষণে আর বেশী দর দিয়াও রেশম কোয়া মিলান তাঁহাদের পক্ষে এত কষ্টকর হইয়া পড়িত না।"

কেবল কুঠিয়াল সাহেবগণের উৎপীড়নেই অনেক রেশমচাষী ক্রমেই পাতের জমি ভাঙ্গিয়া ধানের জমি করিয়া ফেলিয়াছে; কাজে কাজেই উৎপন্ন গড়পড়তাতেও কম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে দরে সে সময় কোয়া খরিদ করিলে কোম্পানীর কোন লোকসানের সম্ভাবনা ছিল না তাঁহারা নিজেদের খেয়াল বশতঃই সে সময় পাত ও পলুর চাষকে পাকে

ফেলিয়া অনেক স্থলে অত্যন্ত অল্প মূল্যে কোয়া খরিদ করিয়াছেন! প্রজাদিগের অবস্থা তত সচ্ছল নহে যে তাহারা এক বৎসর কোয়া ঘরে বাঁধিয়া রাখিতে পারে বিশেষতঃ অধিকাংশ হিন্দু কৃষাণই পলু পোকার জীবন ধ্বংস করিয়া রেশম গুটী ঘরে বাঁধিয়া রাখা ধর্ম্ম বিগর্হিত বলিয়া মনে করে, আবার রেশম কীট উত্তাপে মারিয়া না রাখিলেও কোয়া ভাল থাকে না কোয়া কাটিয়া পোকা পাখাসমেত বাহির হইয়া পড়ে।

ভাগীরথীর পশ্চিমতীর মুর্শিদাবাদে বা পূর্ব্ব রাঢ়ের পাতের জমী এখন কি করিয়া পাট অধিকার করিয়া বসিয়াছে এইবার তাহাই বলিব। মুর্শিদাবাদ লাইন্ খোলার পর হইতে গঙ্গার পূর্ব্বধারে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাট জন্মাইতেছে। কিন্তু গঙ্গার পশ্চিম ধারে পশ্চিম মুর্শিদাবাদে পাটের চাষ আদৌ ছিল না, কি করিয়া পাট বুনিতে হয় তাহাও কৃষাণেরা ভাল জানিত না। ক্বচিৎ কোথাও কেহ সামান্য এক আধকাটা পাট বুনিত বটে কিন্তু কাচিতে না জানায় তাহা নষ্ট হইয়া যাইত। রাঢ়ের দক্ষিণভাগে কোন কোন চাষা শন কাচার ন্যায় পাট পচাইয়া ঘরে তুলিয়া আনিয়া এক একটি করিয়া বাছিয়া লইত। একজনে একদিনে যে পাট কাচিয়া ১॥০ টাকা হইতে ২৲ টাকা পর্য্যন্ত উপায় করিতে পারে একথা তাহাদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

গঙ্গার পশ্চিম ধারকেই আমি রাঢ় কহিতেছি, প্রকৃত রাঢ়ের মাটী অত্যন্ত কর্কশ ও এঁটেল। অতিরিক্ত পরিমাণ গোবরসার দিয়া দোআঁশ করিতে না পারিলে মধ্যরাঢ়ে পাটের গাছ লম্বা হয় না। কিন্তু পূর্ব্ব রাঢ় বা পশ্চিম মুর্শিদাবাদের ডাঙ্গার মাটী মধ্যবঙ্গের মৃত্তিকার ন্যায় বেলে ও সরস। গঙ্গার বালি ও পলিতে অবশ্য এইরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। এই পূর্ব্বরাঢ়ের মধ্য দিয়াই এবার B. A. R. Railway line প্রস্তুত হইল এবং রেল রাস্তার দুই পার্শ্বে পাট-পচার উপযুক্ত সুন্দর সুন্দর খাদও প্রস্তুত হইয়া আসিল।

এদিকে সাহেব দিগের কুঠী ফেল হওয়ায় কৃষাণগণ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতেছে কি করিয়া তাহাদের জীবিকা অর্জ্জন হইবে। যে পাতে বিঘা-প্রতি বৎসরে প্রায় দুইশত টাকা আয় হইত সেই পাত এক্ষণে গরু ও ছাগল দিয়া খাওয়াইতে হইতেছে। এখানকার এক এক কৃষকের আবাদের অর্দ্ধেকই প্রায় তুঁতের জমি, তাহারা এই সমস্ত আয়কর-ডাঙ্গায় কিরূপ ফসল উৎপন্ন করিয়া দিন গুজরান করিবে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছে না। এখনও যে সমস্ত ছোট ছোট কারখানা আছে সেখানকার প্রস্তুত রেশম মাড়োয়ারি মহাজনে খুব কমমূল্যে খরিদ করিতে আরম্ভ করায় সেগুলিও দিন দিন ফেল হইয়া যাইতেছে। গঙ্গার পূর্ব্ব ধারে পাটের আবাদ দেখিয়া পশ্চিম ধারের রাঢ়ের কৃষাণ পাতের জমিতে পাটের আবাদ হয় কি না তাহাই পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। গত বৎসর কেহ কেহ পাতের জমি ভাঙ্গিয়া তাহাতে পাট বুনিয়া বিস্তর ফসল পাইয়াছে। এক্ষণে গ্রামের মধ্য দিয়া রেল চলিল, মৃত্তিকাও পাটের উপযুক্ত, আবার এদিকে তাহাদের চিরগৌরবের

পাতপলুর চাষও দিন দিন লোপ পাইতে চ'লল, কাজেই রাঢ়ের কৃষাণ যে, পাটই জীবনের একমাত্র সম্বল ভাবিয়া পাটের চাষেই জীবন উৎসর্গ করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! তাই তাহারা আজ মধ্যবঙ্গের কৃষাণের ন্যায় আপাতঃ মধুর জীবননাশক পাটের আবাদ দিন দিন বাড়াইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে। বিদেশীর চক্রে নীলের ন্যায় পাটও বাঙ্গালা হইতে হয় ত একদিন অবসর গ্রহণ করিবে কিন্তু পাটছালভোজী মশকবাহিনী ম্যালেরিয়া চিরদিনের জন্য রাঢ়ের সুস্থ জীবন ধ্বংস করিতে তিল মাত্রও পরাঙ্মুখ থাকিবে না।

জমি সাধারণতঃ গরু ছাগল হইতে রক্ষা করিবার জন্য অনেক উঁচু পগার দিয়া পাতের ডাঙ্গা তৈয়ার করা হয়। এই সমস্ত ডাঙ্গার যেরূপ মাটী তাহাতে উত্তমরূপ পাট জন্মাইতে পারিবে এবং গঙ্গার বানেও এই সকল ডাঙ্গা ডুবিয়া যাইবে না।

আমি সম্প্রতি প্রাচীন গুপ্তরাজাদিগের রাজধানী কর্ণসুবর্ণের রাক্ষসীডাঙ্গা, রাজবাড়ীডাঙ্গা প্রভৃতি দেখিতে চাঁদপাড়া রাঙ্গামাটী আসিয়াছিলাম। গঙ্গার শাদা চরের মধ্যে চাঁদপাড়া রাঙ্গামাটীর তুঙ্গ গোলাপী মৃত্তিকা স্তূপ দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। রাজবাড়ীর ডাঙ্গা লইয়া সম্প্রতি মুর্শিদাবাদের নবাববাহাদুর ও জেমোরাজাদিগের সহিত বিশেষ বিবাদ চলিতেছে। প্রভূত ধন সম্পত্তি রাজবাটীর ডাঙ্গায় নিহিত আছে সন্দেহে কেহই নিজেদের অংশ ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত নহেন।

এই পূর্ব্বরাঢ় রাঙ্গামাটী আসিয়া শুনিতে পাইলাম রেশমকুঠীর বড় কোম্পানী লুইপ্যান কোম্পানীও এবার ফেল হওয়ায় পাতের কৃষাণগণ আগামী সন হইতে সকলেই পাটের চাষ আরম্ভ করিবে এইরূপ কল্পনা করিতেছে।

বেহার পৃথক্ হইয়াছে, বাঙ্গলা প্রদেশের মধ্যে পূর্ব্ব রাঢ়ের এই কান্দী মহকুমাই রাজকর্ম্মচারিদিগের একটী স্বাস্থ্যকর সব-ডিবিসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। রাঢ়ের পূর্ব্বাংশে যদি শীঘ্রই পাটের আবাদ বিস্তৃত হইয়া পড়ে তাহা হইলে এ অঞ্চলও যে, ম্যালেরিয়ার আকর ভূমি হইয়া পড়িবে কান্দীর 'non-malarial subdivision' নাম ঘুচিয়া যাইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে কান্দীর অনেক স্থানে ম্যালেরিয়া দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে পাট আসিলে যশোহরকেও রাঢ়ের নিকট হার মানিতে হইবে।

মশকবাহিনী ম্যালেরিয়ার সহচর পাট এইরূপে রাঢ়ের পাতের জমিতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে। এ অঞ্চলে পাতের জমিতে সুন্দর কার্পাস আবাদ হইতে পারে। এজন্য কাশিমবাজারের প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজ যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। যদি স্থানীয় অন্যান্য জমিদারগণ এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে তাঁহার সহিত যোগদান করেন তাহা হইলে তুলার চাষটা এদিকে সহজেই বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে।

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

ফলাফল

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত চিত্র হইতে

সতী-স্মৃতি

বিজন পল্লীর প্রান্তে ভাগীরথী তটে
লভিছ বিরাম কে গো তরুতল ছায় ?
জলন্ত অনলজ্বালা হাসিমুখে সহি
সঁপিয়াছ দিব্যতনু স্বামীর চিতায় !
অলক্তক রাগে তব, সিঁথির সিঁদুরে—
এখনো ভূষিত যেন হেরি চারিধার
মনে হয় তব জ্যোতি শতবর্ষ ধরি
প্রভাতে, প্রদোষ-রাগে জাগে অনিবার।

হে দেবি, তোমার গাথা লোকমুখে শুনি,
মুগ্ধচিত্ত ; বাখানিয়া কি কহিব আর ?
সুমহান্ পতি প্রেম—আত্মবিসর্জ্জন—
চিরদীপ্ত পুণ্যশ্লোক কাহিনী তোমার !
যতদিন এই বিশ্বে রবে রবিশশি
যতদিন সতীত্বের রহিবে আদর
যতদিন ফুটিবেক পুণ্য ফুলরাশি
ততদিন স্মৃতি তব—অমর সুন্দর।

শ্রীঅসিতকুমার হালদার।

সতী-স্মৃতি

* কবিকঙ্কণচণ্ডী বর্ণিত যে জগদ্দলগ্রামের নিকট দিয়া ভাগীরথী বক্ষে শ্রীমন্ত সওদাগর তাঁহার বাণিজ্য-পোত লইয়া যাত্রা করিয়াছিলেন, সেই গ্রামের শস্যশ্যামলা ভাগীরথী তীরে প্রাচীন হালদার বংশের পূর্ব্ব-পুরুষ ৺বেচারাম হালদার কর্ত্তৃক তাঁহার মাতৃকুলের স্মৃতি-সম্মানার্থ ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে এই সতীবেদীটি স্থাপিত হয়।

সনেট কেন চতুর্দ্দশপদী ?

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন গত মাসের "সাহিত্য" পত্রিকায় "সনেট-পঞ্চাশৎ" নামক পুস্তিকার সমালোচনা সূত্রে, সনেটের আকৃতি এবং প্রকৃতির বিশেষ পরিচয় দিয়ে এই মত প্রকাশ করেছেন যে—"খুব সম্ভব, কলাপ্রবীণ ইতালীয় ও অপরদেশীয় কবিরা পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়াছেন যে, পূর্ণরসাভিব্যক্তির পক্ষে চতুর্দ্দশপদই সমীচীন, এবং তাহাই সাহিত্য-সংসারে চলিয়া আসিয়াছে।"

নানা যুগে নানা দেশে নানা কবির হাতে ফিরেও সনেট যে নিজের আকৃতি ও রূপ বজায় রাখতে পেরেছে, তার থেকে এই মাত্র প্রমাণ হয় যে, সনেটের ছাঁচে নানারূপ ভাবের মূর্ত্তি ঢালাই করা চলে, এবং সে ছাঁচ এতই টেঁকসই যে বড় বড় কবিদেরও ভাবের জোরে সেটি ভেঙ্গেচূরে যায় নি। কিন্তু সনেট যে কেন চতুর্দ্দশপদ গ্রহণ করে' জন্মলাভ কর্‌লে সে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল না। অথচ অস্বীকার করা যায় না, যে বারো কিম্বা ষোলো না হয়ে, সনেটের পদসংখ্যা যে কেন চোদ্দ হ'ল, তা জানবার ইচ্ছে মানুষের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়।

কি কারণে সনেট চতুর্দ্দশপদী হয়েছে সে সম্বন্ধে আমার একটি মত আছে, এবং সে মত কেবলমাত্র অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত, তার স্বপক্ষে কোনরূপ অকাট্য প্রমাণ দিতে আমি অপারগ। স্বদেশী কিম্বা বিদেশী কোনরূপ ছন্দশাস্ত্রের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই,—পিঙ্গল কিম্বা গৌর কোন আচার্য্যের পদসেবা আমি কখনও করিনি! সুতরাং আমার আবিষ্কৃত সনেটের "চতুর্দ্দশীতত্ত্ব" শাস্ত্রীয় কিম্বা অশাস্ত্রীয়, তা শুধু বিশেষজ্ঞেরাই বল্‌তে পার্‌বেন।

চোদ্দ কেন?—এ প্রশ্ন সনেটের মত বাঙ্গলা পয়ার সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে। এর একটি সমস্যার মীমাংসা কর্‌তে পারলে অপরটির মীমাংসার পথে আমরা অনেকটা অগ্রসর হতে পার্‌ব।

আমার বিশ্বাস, বাঙ্গলা পয়ারের প্রতি চরণে অক্ষরের সংখ্যা চতুর্দ্দশ হবার একমাত্র কারণ এই যে, বাঙ্গলা ভাষায় প্রচলিত অধিকাংশ শব্দ হয় তিন অক্ষরের নয় চার অক্ষরের। পাঁচ ছয় অক্ষরের শব্দ প্রায়ই হয় সংস্কৃত নয় বিদেশী। সুতরাং সাত অক্ষরের কমে সকল সময়ে দুটি শব্দের সমাবেশের সুবিধে হয় না। সেই সাতকে দ্বিগুণ করে' নিলেই শ্লোকের প্রতি চরণ যথেষ্ট প্রশস্ত হয়, এবং অধিকাংশ প্রচলিত শব্দই ঐ চোদ্দ অক্ষরের মধ্যেই খাপ্ খেয়ে যায়। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, আমাদের ভাষায় দু'অক্ষরের শব্দের সংখ্যাও কিছু কম নয়। কিন্তু সে সকল শব্দকে চার অক্ষরের শব্দের সামিল ধরে নেওয়া যেতে পারে—যেহেতু দুই স্বভাবতই চারের অন্তর্ভূত।

এই চোদ্দ অক্ষর থাক্‌বার দরুণই বাঙ্গলা ভাষায় কবিতা লেখবার পক্ষে পয়ারই

সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। একটানা লম্বা কিছু লিখ্‌তে হ'লে, অর্থাৎ যাতে অনেক কথা বল্‌তে হবে এমন কোন রচনা কর্‌তে গেলে, বাঙ্গালী কবিদের পয়ারের আশ্রয় অবলম্বন ছাড়া উপায়ান্তর নেই। কৃত্তিবাস থেকে আরম্ভ করে' শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্য্যন্ত, বাঙ্গলার কাব্য নাটক রচয়িতা মাত্রই, পূর্ব্বোক্ত কারণে, অসংখ্য পয়ার লিখ্‌তে বাধ্য হয়েছেন, এবং চিরদিনের জন্য বাঙ্গালীর প্রতিভা ঐ পয়ারের চরণের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে।

পয়ারে চতুর্দ্দশ অক্ষরের মত, সনেটে চতুর্দ্দশ পদের একত্র সঙ্ঘটন, আমার বিশ্বাস, অনেকটা একই কারণে একই রকমের যোগাযোগে সিদ্ধ হয়েছে।

বোধহয় সকলেই অবগত আছেন যে জীবজগৎ এবং কাব্যজগতের ক্রমোন্নতির নিয়ম পরস্পরবিরুদ্ধ। জীব উন্নতির সোপানে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই তার ক্রমিক পদলোপ হয়, কিন্তু কবিতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পদবৃদ্ধি হয়। পদ্য দুটি চরণ নিয়েই জন্মগ্রহণ করে; দ্বিপদীই হচ্চে সকল দেশে সকল ভাষার আদিচ্ছন্দ। কলিযুগের ধর্ম্মের মত, অর্থাৎ বকের মত, কবিতা একপায়ে দাঁড়াতে পারে না।

এই দ্বিপদী হতেই কাব্য জগতের উন্নতির দ্বিতীয় স্তরে ত্রিপদীর আবির্ভাব হয়, এবং ত্রিপদী কালক্রমে চতুষ্পদীতে পরিণত হয়। কবিতার পদবৃদ্ধির এই শেষ সীমা। কেন? সে কথাটা একটু বুঝিয়ে বলা আবশ্যক। আমরা যখন মিল-প্রধান সনেটের গঠন-রহস্য উদ্ঘাটন কর্‌তে বসেছি, তখন মিত্রাক্ষরযুক্ত দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চতুষ্পদীর আকৃতির আলোচনা করাটাই আমাদের পক্ষে সঙ্গত হবে। অমিত্রাক্ষর কবিতা কামচারী, চরণের সংখ্যা-বিশেষের উপর তার কোন নির্ভর নেই, তাই কোনরূপ অঙ্কের ভিতর তাকে আবদ্ধ রাখ্‌বার যো নেই।

দ্বিপদীর চরণ দুটি পাশাপাশি মিলে যায়। ত্রিপদীর প্রথম দুটি চরণ দ্বিপদীর মত পাশাপাশি মেলে, তৃতীয় চরণটি অপর একটি চরণের অভাবে আলগাভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, এবং অপর একটি ত্রিপদীর সান্নিধ্যলাভ কর্‌লে তার তৃতীয় চরণের সঙ্গে মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হয়। বাঙ্গলা সংস্কৃত ইংরাজী এবং ফরাসী ভাষার ত্রিপদীর আকৃতি ও প্রকৃতি এইরূপ; কিন্তু ইতালীয় ত্রিপদীর গঠন স্বতন্ত্র।

ইতালীয় ত্রিপদীর প্রথম চরণের সহিত তৃতীয় চরণের মিল হয়, এবং দ্বিতীয় চরণ মিলের জন্য পরবর্ত্তী ত্রিপদীর প্রথম চরণের অপেক্ষা রাখে। ইতালীর ত্রিপদী তিন চরণেই সম্পূর্ণ। ভাব এবং অর্থ বিষয়ে একটির সহিত অপরটি পৃথক এবং বিচ্ছিন্ন। পূর্ব্বাপরযোগ কেবল মাত্র মিল-সূত্রে রক্ষিত হয়। একটি কবিতার ভিতর, তা যতই বড় হোক্ না কেন, সে যোগের কোথাও বিচ্ছেদ নেই। প্রথম হতে শেষ পর্য্যন্ত, একটি কবিতার অন্তর্ভুক্ত ত্রিপদী গুলি এই মিলনসূত্রে গ্রথিত, এবং ইস্ক্রুর (Screw) পাকের ন্যায় পরস্পরযুক্ত। নিম্নে Robert Browning রচিত, "The Statue and the Bust" নামক কবিতা হতে, ইতালীয় ত্রিপদীর নমুনাস্বরূপ ছয়টি

চরণ উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।* পাঠক দেখতে পাবেন, যে প্রথম ত্রিপদীর মধ্যম চরণটি মিলের জন্য দ্বিতীয় ত্রিপদীর প্রথম চরণের অপেক্ষা রাখে।

অর্থাৎ ত্রিপদীর বিশেষত্ব হচ্ছে দুটি চরণ পাশাপাশি না মিলে, মধ্যস্থ একটি কিম্বা দুটি চরণ ডিঙ্গিয়ে মেলে। ত্রিপদীর এই মিলের ক্ষণিক বিচ্ছেদ রক্ষে করে,' চার্টি চরণের মধ্যে দুজোড়া মিলকে স্থান দেবার ইচ্ছে থেকেই চতুষ্পদীর জন্ম! দুটি দ্বিপদী পাশাপাশি বসিয়ে দিলে চতুষ্পদী হয় না। চতুষ্পদীতে প্রথম চরণ হয় তৃতীয় চরণের সঙ্গে নয় চতুর্থ চরণের সঙ্গে মেলে, আর দ্বিতীয় চরণ হয় তৃতীয় নয় চতুর্থের সঙ্গে মেলে। এক কথায় চতুষ্পদীর আকৃতি দ্বিপদীর এবং প্রকৃতি ত্রিপদীর।

আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চতুষ্পদীই পদ্যের মূল উপাদান। বাদবাকী যতপ্রকার পদ্যের আকার দেখতে পাওয়া যায়, সে সবই দ্বিপদী ত্রিপদী এবং চতুষ্পদীকে হয় ভাঙ্গচুর করে' নয় যোড়াতাড়া দিয়ে গড়া;—এ সত্য প্রমাণ করবার জন্য বোধ হয় উদাহরণ দেবার আবশ্যক নেই।

কবিতার পূর্ব্ববর্ণিত ত্রিমূর্ত্তির সমন্বয়ে একমূর্ত্তি গড়বার ইচ্ছে থেকেই সনেটের সৃষ্টি—সেই কারণেই সনেট আকৃতি হিসাবে "সমগ্রতা একাগ্রতা" এবং সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। ত্রিপদীর সঙ্গে চতুষ্পদীর যোগ করলে সপ্তপদ পাওয়া যায়, এবং সেই সপ্তপদকে দ্বিগুণিত করে নেওয়াতেই সনেট চতুর্দ্দশপদ লাভ করেছে। এই চতুর্দ্দশ পদের ভিতর দ্বিপদী ত্রিপদী এবং চতুষ্পদী তিনটিরই স্থান আছে, এবং তিনটিই সমান খাপ খেয়ে যায়।

পেত্রার্কার সনেটের অষ্টক পরস্পর মিলিত এবং একাঙ্গীভূত দুটি যমজ চতুষ্পদীর সমষ্টি; এবং প্রতি চতুষ্পদীর অভ্যন্তরে একটি করে' আস্ত দ্বিপদী বিদ্যমান। ষষ্ঠকও ঐরূপ দুটি ত্রিপদীর সমষ্টি। ফরাসী সনেটও ঐ একই নিয়মে গঠিত, উভয়ের ভিতর পার্থক্য শুধু ষষ্ঠকের মিলের বিশিষ্টতায়। ফরাসী ভাষায় ইতালীয় ভাষার ন্যায় পদে পদে ছত্র-ব্যবধান দিয়ে চরণে চরণে মিলন সাধন করা স্বাভাবিক নয়; সেই জন্য ফরাসী সনেটে ষষ্ঠকের প্রথম দুই চরণ দ্বিপদীর আকার ধারণ করে।

সনেট ত্রিপদী ও চতুষ্পদীর যোগে ও গুণে নিষ্পন্ন হয়েছে বলে' চতুর্দ্দশপদী হতে বাধ্য।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

---

* There's a palace in Florence, the world knows well,
And a statue watches it from the square,
And this story of both do our townsmen tell.

Ages ago, a lady there,
At the farthest window facing the East,
Asked, "Who rides by with the royal air?"

তুকারাম

১। ইক্ষুপ্রহার

ভক্ত তুকারাম সারাদিন ক্ষেতে ক্ষেতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কেবলমাত্র এক আঁটি ইক্ষু সংগ্রহ করিলেন; দীর্ঘ দিনটা যে কি করিয়া কাটিয়া গেল তাহার কোনো খেয়ালই রহিল না।

ইক্ষুর আঁটি মাথায় লইয়া আপন মনে কত কি গাহিতে গাহিতে ক্ষেতের সরু আলি বাহিয়া গৃহের উদ্দেশ্যে চলিলেন। সন্ধ্যা হইয়াছে। রাখাল ছেলেরা ধেনু লইয়া গোঠে ফিরিতেছে। পক্ষীরা নীড়ের সন্ধানে সান্ধ্য আকাশ মুখর করিয়া উড়িয়া চলিয়াছে।

"ওগো তুমি ইক্ষু লইয়া কোথায় চলিয়াছ? আমাদের দিবে না?"

ছেলের দল তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল।

"এই যে, তোমাদের জন্যই আনিয়াছি, এই লও।"

'আমাকে একখানা', 'আমাকে একখানা'—

এমনি করিয়া সব ফুরাইয়া গেল।

বোঝা যতই হাল্কা হইতে চলিল, তুকারামের মুখে হাসির রেখা ততই ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। পত্নী জীজাবাইয়ের কথা আর মনে রহিল না।

সন্ধ্যাশেষে একখানি মাত্র ইক্ষু লইয়া কুটীরের দ্বারে দাঁড়াইয়া তুকারাম ডাকিলেন,

"ওগো, ইক্ষু পাইয়াছ?"

কথা শুনিয়াই স্ত্রীর শরীর জ্বলিয়া গেল। সারাদিনের পর মাত্র একখানা ইক্ষু, তার উপর আবার পরিহাস! অনেক দিন তিনি সহিয়াছেন, আজ আর তিনি সহিবেন না।

"দেখি" বলিয়া ইক্ষুখানি কাড়িয়া লইলেন। সেই ইক্ষুখণ্ড দ্বারা ভক্ত তুকারামের পৃষ্ঠে পত্নী জীজাবাই প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। আঘাত বড় জোরে জোরে বাজিতেছিল। ইক্ষু দুইখণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল।

তুকারাম হাসিয়া বলিলেন,

"তুমিই আমার যথার্থ সাধ্বীপত্নী, তোমার কি প্রেম, আমি একখানিমাত্র ইক্ষু তোমাকে দিলাম, তুমি একা নিলে না, তাকে আবার দুইখণ্ড করিয়া একখণ্ড আমাকে দিলে?"

২। ক্ষেতের পাহারা

ক্ষেত্রস্বামী বলিলেন,

"তুকারাম, তুমি আমাদের এই ক্ষেতে পাহারা দিবে, তোমায় কিছু কিছু দিব।"

তুকারাম আনন্দে মাথা নাড়িয়া বলিলেন;

"আচ্ছা, বেশত!"

"এই লও ঘাটি।"

ক্ষেত্রস্বামী তুকারামকে ঘাটি ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত মনে গৃহে ফিরিলেন।

প্রভাতে পাখীরা—কত রঙ বেরঙের, দলে দলে নাচিতে নাচিতে, কল কল ভাষে কত কথা কহিতে কহিতে ক্ষেতে আসিয়া পড়ে, শস্য খুঁটিয়া খায়। তুকারাম ভাবেন—

"আজ আমার ঘরে কত না অতিথি আসিয়াছেন!"

তুকারাম টোঙে বসিয়া ডাকিয়া বলেন,

"ওগো, আমার অতিথি সব, তোমরা যত পার আহার কর। আহা, তোমাদের ক্ষুধা পাইয়াছে!"

যখন পাখীরা শস্য খুঁটিতে খুঁটিতে দুপুর বেলা ক্লান্ত হইয়া পড়ে, ক্ষুদ্র উদরও পূর্ণ হইয়া আসে—তুকারাম তখন ডাকিয়া বলেন,

"আহা, তোমরা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছ। তোমাদের পিপাসা পাইয়াছে! আমার সঙ্গে চল, ক্ষেতের পাশে কূপ হইতে জল তুলিয়া দিতেছি।"

সাঁঝের বেলা গোধূলির গেরুয়া বসন যখন সোনার ক্ষেতের উপর আরও সোনালি ছড়াইয়া দেয়, পাখীরা কলরব করিয়া উঠে, তুকারাম দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ডাকিয়া বলেন,

"ওগো, দেখ রাত আসিয়াছে, এখন আর তোমরা চক্ষে দেখিবে না, তোমরা পথ হারাইয়া ফেলিবে, যাও এখন নীড়ে ফিরিয়া যাও, কল্য প্রভাত না হইতে হইতেই আসিবে, আমি সারারাত তোমাদের জন্য পাহারা দিব।"

* * *

বিশ্ব যাঁহার কুটুম্ব, সমস্ত বসুধা যাঁহার আপন, পৃথিবীর রত্নদ্বার পাহারা দেওয়া ত তাঁহারই সাজে।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত।

সনেট-সুন্দরী

বিগাঢ়যৌবনা তন্বী, আকারে বালিকা,
পরিণত দেহখানি আঁটসাঁট ক্ষুদ্র।
শিশির ঋতুর স্নিগ্ধ মসৃণ রউদ্র
ঘনীভূত করে গড়া স্বর্ণ পাঞ্চালিকা॥
দৃঢ়বন্ধে সুসংযত করে কঞ্চুলিকা
পরিপূর্ণ হৃদয়ের অশান্ত সমুদ্র।
কলার শাসনে দান্ত মন তার রুদ্র।
মন্ত্রদেহ ষোড়শীর ধরেছে কালিকা॥
সন্তর্পণে করি তার অঙ্গে হস্তক্ষেপ,
ভয় হয় অনিপুণ অঙ্গুলি পরশে,
ছিন্ন ভিন্ন হয়ে তার কাঁচুলির ডোর,
ব্যক্ত হয়ে পড়ে বুকে সংরুদ্ধ আক্ষেপ!
নির্গ্রন্থ হৃদয়মুক্ত উদ্বেলিত রসে,
সে রূপ মলিন করে, নয়নের লোর॥

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

সমালোচনা

সোণায় অরুচি। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মৈত্র প্রণীত। প্রকাশক, সান্যাল এণ্ড কোং, ২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ভারত মিহির যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এখানি উপন্যাস। রচনায় কোন বিশেষত্ব নাই, উপাখ্যানও নিতান্ত মামুলি।

দেবব্রত। শ্রীযুক্ত কালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা, প্যারাগণ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দশ আনা মাত্র। এখানি নাটক। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, ইহার বর্ণনীয় বিষয়। নাটকখানি গিরিশচন্দ্র-প্রবর্ত্তিত ছন্দে রচিত। ছন্দ দুর্ব্বল, নাটকত্বও প্রস্ফুট হয় নাই।

চিত্রকূট পর্ব্বতে শ্রীরামচন্দ্রের আশ্রম

সদ্ভাব-কুসুম। ৺রজনীকান্ত সেন প্রণীত। এস, কে, লাহিড়ী এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কটন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা। এখানি কবিতা-পুস্তক, কান্ত কবির রচনা। বালকবালিকাগণকে নীতি-শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে কবিতাগুলি রচিত। অনাড়ম্বর বাঙ্গালী জীবনের কয়েকটি মিষ্ট সরল কাহিনীই কবিতা-গুলির প্রাণ, সে গুলি সদ্ভাবোদ্দীপক। ছেলেদের জন্য বলিয়া কাব্যরসকে কোথাও ক্ষুণ্ণ করা বা রসের স্থানে জল দেওয়া হয় নাই। কাহিনীগুলি কাব্যে সমুজ্জ্বল, উপদেশে স্নিগ্ধ, প্রাণারাম, কাজেই বালক-বালিকাগণের অবশ্য-পাঠ্য।

ফরাসী বীরাঙ্গনা। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার গুহ রায় প্রণীত। কলিকাতা, চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জী কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মেটকাফ্ প্রিন্টিং ওয়াকসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। ফরাসী বীরাঙ্গনা জোয়ান্ দার্কের জীবনী ও কার্য্য-কলাপ-অবলম্বনে গ্রন্থখানি রচিত। জোয়ানের জীবনের ধারাবাহিক কাহিনীটি লেখক বেশ সুশৃঙ্খল-ভাবে গুছাইয়া বলিয়াছেন। ভাষা সতেজ, সরল, রচনা-ভঙ্গীতেও প্রাণ আছে। কাহিনীটিও তেমন নির্জ্জীব বা নীরস হয় নাই—কৌতূহল আগাগোড়াই উদ্রিক্ত থাকে। গ্রন্থের ছাপা-কাগজ পরিপাটী, বাঁধাইও চমৎকার। গ্রন্থে অনেকগুলি ছবি আছে, সেগুলির ছাপা সুন্দর। ত্রিবর্ণে রঞ্জিত ছবিখানি বাঁধাইয়া রাখিবার মত হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থের সঙ্কলনে জাতীয় সাহিত্যে একটা স্বাস্থ্যকর আব-হাওয়ার সঞ্চার হয়, কাজেই লেখকের উদ্যমের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

শ্রীধর্ম্মমঙ্গল। শ্রীযুক্ত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ সঙ্কলিত। শিলচর, এরিয়েন ট্রেডিং এণ্ড ইন্সিওরেন্স কোম্পানি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। শিলচর এরিয়েন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। কবি ঘনরাম প্রণীত শ্রীধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের উপাখ্যান-ভাগ এই গ্রন্থে বেশ সরল মিঠা ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। রচনা-ভঙ্গীটি সহজ, হৃদয়-গ্রাহী, কোথাও পণ্ডিতী হুঙ্কার নাই। আবাল-বৃদ্ধবনিতা এ গ্রন্থ-পাঠে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিবেন। ঘনরামের 'মধুরকান্ত পদাবলীর'সহিত বঙ্গীয় পাঠকবৃন্দের তেমন পরিচয় আছে বলিয়া মনে হয় না অথচ ঘনরাম বঙ্গীয় আদি-কবিগণের অন্যতম। সম্প্রতি দেশের হাওয়া ফিরিয়াছে, বাঙ্গালী প্রাচীন কাব্যাদির সমাদর করিতে শিখিয়াছেন, তাই আশা হয়, নাটক-নভেল-প্লাবিত বঙ্গদেশে এ গ্রন্থের এক্ষণে সম্যক আদর হইবে। এ গ্রন্থে সঙ্কলক স্থানে স্থানে ঘনরামের মূল কবিতা-পংক্তিও উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা হইতে পাঠক ঘনরামের কবিতার মাধুর্য্য, সরলতা ও স্বাভাবিকতার পরিচয় ত পাইবেনই, তদ্ভিন্ন অনুপ্রাস অলঙ্কারে 'শ্রীধর্ম্মমঙ্গল' কাব্য কতখানি সমুজ্জ্বল, তাহারও যথেষ্ট আভাস মিলিবে। গ্রন্থের ভূমিকায় ঘনরামের জীবন চরিত ও কাব্য-বিষয়ে যে সংক্ষিপ্ত আলোচনাটুকু আছে, সাহিত্য-হিসাবে সেটুকুর মূল্যও সামান্য নহে। গ্রন্থের ছাপা-কাগজ ও বাঁধাই মনোহর হইয়াছে। আশা করি, এ গ্রন্থ প্রত্যেক বাঙ্গালীর গৃহে বিরাজ করিবে।

স্নেহ-উপহার। কুমারী স্নেহলতার শুভ-পরিণয়ে। শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী বিরচিত।

সুভদ্রা। শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বসু প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা। ভিক্টোরিয়া প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দশ আনা, বাঁধাই এক টাকা। সুভদ্রা আর্য্যনারীর উজ্জ্বল আদর্শ, মহাভারত-কাব্যের চরিত্রমুকুটমণিসমূহের অন্যতম। সুভদ্রার কাহিনী পুণ্যে সমুজ্জ্বল, তেজে মহীয়ান্, মমতায় সুমধুর, কাব্যে সুললিত। এই গ্রন্থে গ্রন্থকার সুভদ্রা-চরিত্রের বিশেষত্ব ফুটাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন; তাঁহার উদ্যম প্রশংসার্হ,—সুভদ্রা-জীবনের একটা ধারাবাহিক সুশৃঙ্খল কাহিনী বঙ্গীয় পাঠক-সমাজের সম্মুখে ধরিয়া তিনি বাঙ্গালীর বিশেষতঃ বঙ্গীয় নারী-সমাজের সবিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। চরিত্র গঠনে আদর্শ-সংগ্রহের জন্য আমাদের অন্য দেশে যাইবার কোন প্রয়োজন নাই,—ভারতের প্রাচীন কাব্যসমূহ বিবিধ চরিত্রের ব্যঞ্জনার মধ্যে যে সুনিপুণ ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছে, তাহার সন্ধান লইলে কোন আদর্শেরই অভাব হইবে না। এ গ্রন্থ পাঠ করিয়া সুভদ্রার উজ্জ্বল আদর্শে বঙ্গরমণী অনুপ্রাণিত হউন, ইহাই আমাদিগের

কামনা। গ্রন্থে দুইখানি ছবি আছে, পরিকল্পনার সুখ্যাতি করিতে পারিলাম না।

তপোবন। শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত প্রণীত। কলিকাতা, ভারত-মিহির যন্ত্রে মুদ্রিত। প্রকাশক, সান্যাল এণ্ড কোং, কলিকাতা। মূল্য বারো আনা। এখানি কবিতা-পুস্তক। প্রায় পঞ্চাশতাধিক খণ্ড কবিতা এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অধিকাংশ কবিতারই ভাব উচ্চ, গম্ভীর, ভাষাও শুদ্ধ, সংযত। চটুলতা বা আবিলতা-দোষ কোনটিতেই নাই। বহু কবিতাতেই লেখকের স্ফুটনোন্মুখ কবি-শক্তির পরিচয় পাইলাম। কিন্তু বহু স্থলেই ভাব ঈষৎ উদ্দামভাবে ছুটিয়াছে। ভাবের রাশটি কবিকে আরও সংযত করিতে হইবে। তাহা করিতে পারিলে এই নবীন কবির ভবিষ্যৎ যে সমুজ্জ্বল, এ কথা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি।

ধ্যানলোক। শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত প্রণীত। কলিকাতা, নব্যভারত প্রেসে মুদ্রিত ও শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য কাগজে বাঁধা বারো আনা, কাপড়ে এক টাকা। এখানিও কবিতা-গ্রন্থ। তপোবন-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, এ গ্রন্থ-সম্বন্ধেও সেই একই কথা প্রযুজ্য।

নদীয়া-কাহিনী। শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ মল্লিক প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রকাশক, শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মল্লিক, রাণাঘাট, নদীয়া। কলিকাতা, ঘোষ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আড়াই টাকা। এ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়, ১৩১৭ সালের ভাদ্র মাসে; ১৩১৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। সুতরাং 'নদীয়া কাহিনীর' সহিত যে বাঙ্গালীর কলঙ্ক-মুক্তির কাহিনী জড়িত হইল, ইহা বড় অল্প আনন্দের বিষয় নহে। গ্রন্থখানি বঙ্গসাহিত্যে প্রকৃতই রত্নস্বরূপ হইয়াছে। চারিশত পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া লেখকের সুগভীর অধ্যবসায় ও পরিশ্রম, সুনিয়ন্ত্রিত বর্ণনা শৃঙ্খলা যে কৌতূহল জাগাইয়া রাখিয়াছে, কোথাও তাহার এতটুকু ব্যত্যয় ঘটে নাই। মহারাজ আদিশূরের যুগ হইতে বর্ত্তমান কাল অবধি নদীয়ার যে কাহিনী—সামাজিক, রাজনৈতিক, সাহিত্যিক ও ধর্ম্মনৈতিক, ইতিহাস—ধারাবাহিকভাবে এ গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ, তাহা বিস্তৃত। বিষয়-সন্নিবেশেও লেখকের শক্তির পরিচয় পাইলাম। রচনার গুণে গ্রন্থখানি আগাগোড়া সরস হইয়াছে। বহু কাহিনীর মধ্য দিয়া বাঙ্গালার অভ্যন্তরটুকু ফুটিয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থখানিকে য়ুরোপীয় ধারা-মতে ঠিক ইতিহাস বলা যায় না; তবে ইতিহাসের মাল-মশলা ইহাতে প্রচুর সন্নিবিষ্ট আছে—গ্রন্থখানি Gazetteerএর অনুরূপ। গ্রন্থখানি যেন নদীয়ার পরিপূর্ণ মান-চিত্র, শুধু ভৌগোলিক স্থান নির্দ্দেশ করিয়াই লেখক ক্ষান্ত হন নাই, সেকাল হইতে এ-কালের নদীয়ার বিবিধ পরিবর্ত্তনাদিও তুলির রেখায় সুস্পষ্ট আঁকিয়া সকলের সম্মুখে ধরিয়াছেন। এ রত্ন সঙ্কলন করিয়া লেখক বঙ্গবাসীমাত্রেরই কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন, সন্দেহ নাই।

শ্রীকণ্ঠ। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত। কলিকাতা, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী হইতে প্রকাশিত। বহুবাজার কলেজ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এই গ্রন্থে পণ্ডিত মহাশয় মহাকবি ভবভূতির উত্তরচরিত, বীরচরিত, এবং মালতীমাধবের সমালোচনা করিয়াছেন। সমালোচনার অর্থ সম্যক আলোচনা। কবির বহু ভাব, বহু কথা সাধারণ পাঠকে অবশ্য বুঝিতে পারে না। সমালোচকের কর্ত্তব্য সেই সকল ভাব ও কথার সম্যক আলোচনা করিয়া তাহার বিচিত্র সৌন্দর্য্যের সহিত পাঠকের পরিচয় সাধন করিয়া দেওয়া। এ বিষয়ে পণ্ডিত মহাশয়ের চেষ্টা সফল হইয়াছে। সুশৃঙ্খল পর্য্যায়ে তিনি ভবভূতি রচিত নাটকাদির সংস্থান-বিন্যাসের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ১, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

ভারতী

৩৭শ বর্ষ]　　আশ্বিন, ১৩২০　　[৬ষ্ঠ সংখ্যা

শারদোদয়

শরতের রমণীয় ঊষা, নভনীল নেত্রোৎপল হ'তে
অশ্রুসব গিয়াছে ঝরিয়া, দীপ্ত স্বর্ণ কিরণের স্রোতে
মুক্ত প্রসারিত দলগুলি তার সীমা হতে অসীমায়
বিস্তীর্ণ নিলীন ; অজ্ঞাত উত্তর হতে নিশ্বাসের প্রায়
আসিতেছে হিমাণীর নব হিমবায়ু, কোন অজানার
বারতা বহিয়া, বক্ষোমাঝে সৃজন করিয়া বারম্বার
অপূর্ব্ব বেদনা, কামনা নূতন আশার অতীত লাগি !
মায়া স্পর্শে যায় মনের আড়াল, পায় প্রাণ অনুরাগী
আকাশের বুকের পরশ, হেরে ইন্দ্রজাল আলোকের,
বাতাসের মুগ্ধ আকর্ষণে নিত্য শোভা পূর্ণ ত্রিলোকের।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

প্রাণ প্রতিষ্ঠা

বিশ্বকর্ম্মার সৃষ্টি বলিয়া একটা ন্যায়ের ফাঁকি আমরা আমাদের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য দুইটারই উপরে অন্যায় ভাবে বহুকাল ধরিয়া প্রয়োগ করিয়া আসিতেছি;—এবং সেই ফাঁকির বলে ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য এ দুইটার মধ্যে একটাও যে রক্ষা করা অথবা উন্নীত করা আমাদের মত সুশিক্ষিত জনের কর্ত্তব্য সেটা আমরা মন হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত আছি। আমাদের মূর্ত্তি-অনুসন্ধান এবং আমাদের মূর্ত্তি-ভবন-স্থাপন এ দুটারই পশ্চাতে যদি স্থাপত্যের ও ভাস্কর্য্যের উন্নতি বা রক্ষা কল্পটা না থাকে, যদি সাহেবদের মত মূর্ত্তি সংগ্রহেরই বাতিক আমাদের সম্পূর্ণ চাগিয়া ওঠে অথচ মূর্ত্তি পূজার বা মন্দির প্রতিষ্ঠার ইচ্ছাটা সম্পূর্ণ লোপ পায় তবে সবই ব্যর্থ। দেশে একলক্ষ মূর্ত্তি সংগ্রহের সংবাদ আমরা পাইতে পারি—কিন্তু সেই সঙ্গে যদি স্থাপত্যের এবং ভাস্কর্য্যের অপূর্ব্ব সৃষ্টি একটিও মন্দির প্রতিষ্ঠার সংবাদ আর না পাওয়া যায় তবে কাহার না ভয় হয়! স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য্য এ দুইটাই মিটিং করিয়া বিশ্বকর্ম্মার স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশে উৎসর্গ দিয়া আমরা যদি ভাবি আমাদের কাজ করিলাম, তবে এই উৎসর্গের ফলে আমাদের নিজের স্মৃতিটা যে উৎসন্ন দিবার জোগাড় করিয়া রাখিলাম সেটা নিশ্চয়। মানুষ আদিম বা অসভ্য অবস্থায় এবং চরম ও আমাদের মত অত্যধিক সভ্য অবস্থায় প্রায় একইরূপ ব্যবহার করে, অর্থাৎ সে সঞ্চয় করে, সঞ্চিতটা লইয়া খেলা করে, কিন্তু সেটিকে কাজে খাটায় না—অথবা যেটা যেমন কাজের উপযোগী সেটা দিয়া সেই কাজটা করাইয়া না লইয়া উল্টা কাজেই লাগায়; ভবিষ্যতের দিকে তাহার দৃষ্টি থাকে না, ভূতটার দিকে সে সসঙ্কোচে—বিশ্বকর্ম্মার অপূর্ব্ব সৃষ্টি বলিয়া—দৃষ্টিপাত করে এবং বর্ত্তমানের মধ্যেই কোনো-রকমে নিশ্চিন্তে বর্ত্তিয়া থাকিতে পারিলেই বাঁচে।

আমরা যে আমাদের স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য্য উভয়কেই ভূতের মধ্যে আর দুই ভূত বলিয়া ধরিয়া লইয়া তাহাদের বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎটা অতিশয় পরিষ্কার করিয়া রাখিতেছি, ইহার ফল যেদিন ফলিবে সেদিন আমাদের স্মৃতিটুকু আমাদের অনুসন্ধান অনুশাসনের জীর্ণ মাসপঞ্জীর ভিতরে কীটদষ্ট অবস্থায় ঘুণাক্ষর মাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়া বিরাজ করিবে;—কোন দেব-মন্দির আমাদের কীর্ত্তি-ধ্বজা, কোন রাজপ্রাসাদ আমাদের পঞ্চ অঙ্গুলির রাজ টীকাঙ্ক বহন করিবে না। মূর্ত্তি যাহারা সৃজন করে, মন্দির যাহারা গড়িয়া তোলে তাহাদের উভয়কেই বাদ দিয়া মূর্ত্তি সম্বন্ধে গবেষণা ও মন্দির সম্বন্ধে তথৈবচতে বাহবা পাওয়া যায়, কিন্তু হইবার মত প্রয়োজনীয় যেটা সেটা একেবারেই হইয়া উঠিবার সুবিধা পায় না।

আমরা সগর-সন্তানদিগের মত পাতাল খুঁড়িয়া মূর্ত্তি উদ্ধার করিতে খুবই উৎসাহ দেখাইতেছি, দেশের স্থাপত্যটাকে কলমের

জোরে অজর অমর বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া দিতে বড়ই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি কিন্তু হায়, যাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ঐ সকল মূর্ত্তি গড়িয়াছে এবং এই সকল কীর্ত্তিস্তম্ভ জগতের বক্ষে সুদৃঢ় করিয়া প্রোথিত করিয়া গিয়াছে তাহাদের জন্য কি করিতেছি! যে দীঘির জল হইতে মূর্ত্তি উদ্ধার করিতেছি সেই দীঘির ধারেই হয় ত মূর্ত্তি-রচয়িতার কোন বংশধর উপবাসে মরিতেছে, তাহার দিকে কি আমাদের দৃষ্টি কোনো দিন পড়িয়াছে? ভাঙা পাথর উঠাইয়া তাহাতে পাঁচ কিল দিলেই যে খুব আমাদের লাভ তা নয়, যে পাঁচ আঙুলে পাথর দেবতা হইয়া উঠে সেই পাঁচটি আঙুলের সন্ধান করিয়া দেখাতেই আমাদের ভাবী মঙ্গল। বিষ্ণুর চার হাতের পরিচয় ততটা প্রয়োজনীয় নয় যতটা বিষ্ণু মূর্ত্তি-রচয়িতার দুই হাতের বরাভয়। বিশ্বকর্ম্মার মাথায় ফুল চড়াইয়া পরকালের কোন কাজ হইবে না, যতদিন না কর্ম্মীর হাতের হাতুড়ি কালের ঘণ্টায় ঘা দিতেছে দেখি। আমরা মাটিই চষিতেছি, ফসল ফলাইবার দিকে দৃক্‌পাত মাত্র না করিয়া। একদিন হঠাৎ দেখিব, সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেছে; আমরা পিতৃপুরুষের জমীর উত্তরাধিকারী আছি, কিন্তু জমীতে আর ফসল ফলাইবার ক্ষমতাও আমাদের নাই, উপায়ও দেখি না।

নিরর্থক এই যে মাটি খোঁড়া এটার অন্তরালে কপিলমুনির রোষাগ্নির মত যে একটা ভীষণ অভিসম্পাত লুকাইয়া আছে সেটা যেদিন আমাদের উপর আসিয়া পড়িবে সেদিন সহস্র চেষ্টাতেও আমাদের রক্ষা হইবে না; এবং আমাদের বহু অনুসন্ধানের কাগজের বর্ম্ম ও যাদুঘরের তন্ত্রমন্ত্রের ফুৎকার কোনোই ফল দিবেনা। সময় থাকিতে সাবধান হওয়া বুদ্ধিমানের কর্ম্ম। E. B Havell মহোদয় তাঁহার নবপ্রকাশিত Indian Architecture (ভারতের স্থাপত্য) নামক পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়া যথাসময়ে সাবধান হইবার জন্যই যেন আমাদের আহ্বান করিয়াছেন। এই সুবৃহৎ পুস্তকে তিনি ভারতের তাবৎ মন্দির, প্রাসাদ, মঠ ও মসজিদ প্রভৃতির নির্ম্মাণ-কৌশল এবং গঠন-ভঙ্গির ভিতর দিয়া ভারতীয় ভাব কেমন সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে তাহাই প্রচার করিয়াছেন।

ফার্গুসন প্রভৃতি পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ যে-সকল ভারতীয় ইমারতগুলিকে আরব্য, নহে ত, পারস্য বলিয়া আমাদের ধোঁকা দিয়া বোকা বুঝাইয়া গিয়াছেন সেগুলা যে সম্পূর্ণ—কি নির্ম্মাণ-কৌশলে, কি ভাবে ভঙ্গিতে— আমাদের, এটা আজ আমরা প্রথম Havell সাহেবের নিকট হইতে লাভ করিলাম।

স্থাপত্য-শিল্পের অদ্বিতীয় মুকুটমণি আগ্রার তাজ। তাহাতে ভারত শিল্পীর যে কোনো অধিকার আছে এটা ফার্গুসণ প্রমুখ দেশী এবং বিদেশী কেহই স্বীকার করেন না; অথচ সেটি ভারত-ভাবসাগরে ডুব দিয়া আমাদেরই শিল্পীগণ একদিন উঠাইয়া আনিয়াছে। এটার সহস্র প্রমাণ Havell সাহেবের নিকট হইতে আমরা পাইতেছি। শুধু কথার প্রমাণ নয়, নির্ম্মাণ-কৌশলের এবং স্থাপন-বিধির তন্ন তন্ন চাক্ষুস প্রমাণ। আরব দেশীয় গুম্বজের সঙ্গে তাজের গুম্বজের যে কোনো সম্পর্ক নাই এবং তাজের বহুশত

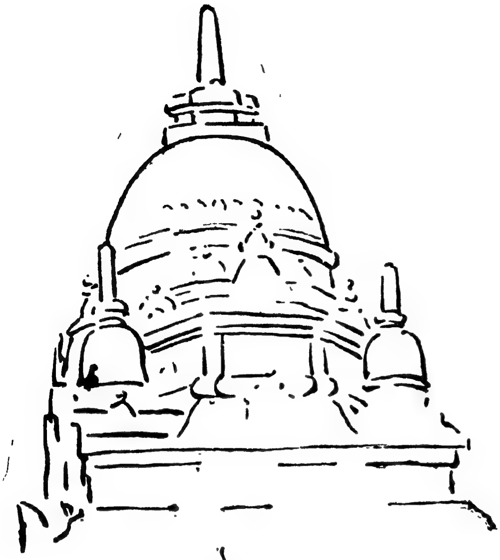

১

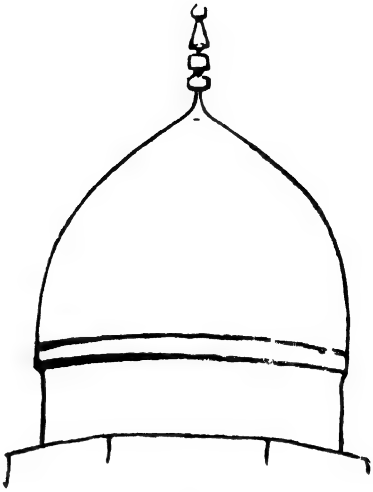

৪

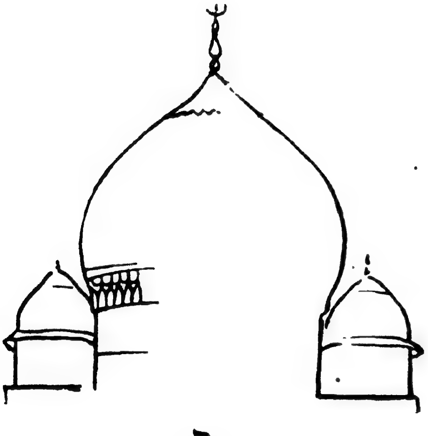

২

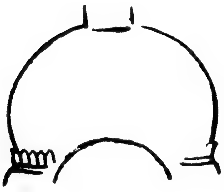

৩

খাঁটি আরব্য গুম্বজ, (৪নং চিত্র) গ্রীবার ন্যায় যে অংশ তাহার উপরে, সরলভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে; তাহার গঠনে বৈচিত্র্য নাই বলিলেই চলে। তাজের গুম্বজের (২নং চিত্র) যে টলটলায়মান ভাব তাহা আরব্য গুম্বজে নাই; সে সরলভাবে গ্রীবা হইতে উর্দ্ধে উঠিয়া আকাশ বিদ্ধ করে।

জল বিন্দুর মত টলায়মান সুডৌল গুম্বজের আদর্শ অজন্তাগুহায় (৩নং চিত্রে) প্রথম দেখা যায় এবং গুম্বজটিকে একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের উপরে স্থাপন করার প্রথাও অজন্তার হিন্দু স্থপতিগণ প্রথম প্রচলিত করেন এবং তাজের গুম্বজ নির্ম্মাণের সময় যে এই পদ্মদলে শিশির বিন্দুর (মণি পদ্মে হুং) ভাব সম্পূর্ণ অনুসরণ করা হইয়াছিল তাহা ২নং চিত্রে সুস্পষ্ট দেখা যায়। পদ্মদলের উপরে গুম্বজ স্থাপন কেবল ভারতেই দৃষ্ট হয়, অন্য কোথাও নহে। ইহা ছাড়া বড় গুম্বজের চারি কোণে ছোট চারিটি গুম্বজ স্থাপনের

বৎসর পূর্ব্বের রচিত পঞ্চ রত্ন মন্দিরের সহিত তাহার যে নিগূঢ় সম্পর্ক সেটা তিনটি মাত্র চিত্র দিয়া Havell সাহেব অভ্রান্তরূপে প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছেন। কি সুন্দর করিয়া Havell সাহেব আমাদের বুঝাইয়াছেন যে তাজ, আরব্য উপন্যাসের স্বপ্ন দিয়া গড়া নয়, কিন্তু আমাদের বহু শিল্পীর বহু সাধনার চরম সার্থকতা; এবং তাহার আদ্যন্ত সমস্তটা "ওঁ মণি পদ্মে হুঁম্" এই মহা মন্ত্রের উপরে প্রতিষ্ঠিত। ভারতের তাজ ভারতকে ফিরাইয়া দিয়া Havell সাহেব নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই; তাঁহার পুস্তকের শেষ কয়েক পরিচ্ছেদ ভারত স্থাপত্য ও স্থপতি যে এখনও জীবিত এটা আমাদের স্মরণ করাইয়া দিতেছে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে Havell সাহেবের Indian Architecture নামক বৃহৎ পুস্তকের সমালোচনা অসম্ভব এবং আমার উদ্দেশ্যও তাহা নয়। কিন্তু মূর্ত্তি-ভবন-স্থাপন এবং যাদুমন্ত্রের অনুসন্ধান করিয়া বেড়ানোতে যে আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে না সেই কথাই বলিতে চাহি।

ভারতবর্ষের স্থপতিগণের বুকে পা দিয়া দাঁড়াইয়া মূর্ত্তি পরিচয়, স্থাপত্য পাণ্ডিত্যাভিনয়, এবং যাদুঘরের ভেল্কি বাজি আমাদের আসল কাজ নয়। আসল—কাজ যাহাকে পদতলে রাখিয়াছি তাহাকে উঠাইয়া লই, যেটা ছিল সেটা এখন কোথায় আছে অনুসন্ধান করি। বঙ্গভূমির যথার্থ গৌরবের দিন সেদিন আসিবে যেদিন আজ যেটা ভূমিসাৎ রহিয়াছে তাহার উপরে আবার ভারত স্থাপত্য ভাস্কর্য্য মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিবে। ভাঙা মূর্ত্তির ধূলা ঝাড়িয়া তত লাভ নাই, যত লাভ যাহারা মূর্ত্তিকে গঠন করে তাহাদের জীর্ণ দেহের ধূলা, শীর্ণ মুখের মলিনতা ঘুচাইয়া দেওয়াতে। যতদিন তাহা না করি ততদিন আমাদের মূর্ত্তি-ভবন ভগ্নমূর্ত্তির অকেজো গুদাম ঘর ছাড়া আর কিছু নয়। ঔরঙ্গজেব বাদশাহ নিজের উপাসনা গৃহের সোপান-তলে ভারতের দেবমূর্ত্তিগুলা সযত্নে রক্ষা করিয়া ভারত শিল্পের জন্য যতটা করিয়াছিলেন আমরা তাহার অধিক কিছু করিব না গুদাম ঘরে ভগ্নমূর্ত্তি কোণ-ঠাসা করিয়া। মূর্ত্তি রচয়িতা মন্দির নির্ম্মাতাদিগের উপরে ঔরঙ্গজেবের বিষদৃষ্টির একটা অর্থ পাওয়া যায়, কিন্তু আমরা যে ভাবে তাহাদের উপর দৃষ্টি করিতেছি তাহার কোন অর্থই নাই—স্বার্থের দিক দিয়াও নয় পরার্থের দিক দিয়াও নয়। ভগ্নমূর্ত্তির পরিচয়ের সঙ্গে নব নব মূর্ত্তি-রচয়িতার পরিচয়, প্রাচীন স্থাপত্যের সঙ্গে স্থপতিগণের সন্ধান যতদিন না আমরা পাই ততদিন আমাদের শ্রমে সার্থকতা লাভ দুর্ঘট।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রথাও সম্পূর্ণ ভারতীয়। তাজের বহুশত বর্ষ পূর্ব্বের রচিত সিংহলের চণ্ডী-শিব নামক পঞ্চচূড় বা পঞ্চরত্ন মন্দির এই প্রথায় গঠিত (১নং চিত্র)। এই পঞ্চচূড় বা পঞ্চরত্ন প্রথা তাজেও সম্পূর্ণ অনুসরণ করা হইয়াছে প্রথম ও দ্বিতীয় চিত্র হইতে এটা আমরা বেশ বুঝিতে পারি।

গঠনে তাজের গুম্বজ জগতের তাবৎ গুম্বজের সহিত পৃথক—এটা ফার্গুসন প্রমুখ পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে সেটা ভারতের পঞ্চরত্ন মন্দিরের অনুরূপ এবং কি ভাবে বা গঠনে তাহা অজন্তাগুহার গুম্বজটির প্রতিরূপ তাহা কি ফার্গুসন কি আমরা কেহই এতদিন অনুভব করি নাই! এক মাত্র Havell সাহেব সেটার দিকে জগতের দৃষ্টি প্রথম আকর্ষণ করিয়াছেন।

মহাসরস্বতী *

বিশ্ব-মহাপদ্ম-লীনা ! চিত্তময়ী ! অয়ি জ্যোতিষ্মতী !
মহীয়সী মহাসরস্বতী !
শক্তির বিভূতি তুমি, তুমি মহাশক্তি-সমুদ্ভবা ;
সপ্ত-স্বর্গ-বিহারিণী ! অন্ধকারে তুমি উষা-প্রভা।
সূর্য্যো-সুপ্ত ভর্গদেব মগ্ন সদা তোমারি স্বপনে ;
সবিতৃ-সম্ভবা দেবী সাবিত্রী সে আনন্দিত মনে
বন্দে ও চরণে।
ছিন্ন-মেঘ অম্বরের নিষ্কল চন্দ্রমা
তুমি নিরুপমা।

উদ্ভাসিছে সত্যলোক নির্ণিমেষ ও তব নয়ন ;
তপোলোক করিছে চয়ন
নক্ষত্র-নূপুর-চ্যুত জ্যোতির্ম্ময় পদরেণু তব।
জনলোকে তোমারি সে জনম-কল্পনা নব নব
পুরাতনে নবীয়ান ;— নব নব সৃষ্টির উন্মেষ !
মহীয়ান মহলোক লভি তব মানস-উদ্দেশ,—
ব্যাপ্ত পরিবেষ।
স্বর্গলোকে স্বেচ্ছা-সুখে জাগ' তুমি গীতে
দেবতার চিতে।

ভূলোকে ভ্রমর-গর্ভ শুভ্র-নীল পদ্ম-বিভূষণা ;
হংসারূঢ়া—ময়ূর-আসনা !

---

* "ঘণ্টা-শূল-হলানি শঙ্খ-মুষলে চক্রং ধনুঃ সায়কং
হস্তাব্জৈর্দধতী ঘনান্ত-বিলসৎ সিতাংশু-তুল্য-প্রভাং।
গৌরীদেহ-সমুদ্ভবাং ত্রিনয়নাং আধার ভূতাং মহা-
পূর্ব্বামত্র সরস্বতী মনুভজেৎ শুম্ভাদি দৈত্যার্দ্দিনীম্॥"

— মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

তুমি মহাকাব্য-ধাত্রী ! মহাকবিকুলের জননী !
কখনো বাজাও বীণা, কভু দেবী ! কর শঙ্খ ধ্বনি,—
উচ্চকিয়া উদ্দীপিয়া ; চক্র-শূল ধর ধনুর্ব্বাণ ;
হল-বাহী কৃষকের ধরি' হল কভু গাহ গান,—
পুলকি' পরাণ !
সর্ব্ব-বিদ্যা-বার্ত্তা-বিধি দেখিতে দেখিতে
গড়ি' উঠে গীতে !

মহাসঙ্গীতের রূপে' গড়ি' উঠে নিত্য অপরূপ
মানবের পূর্ণ বিশ্বরূপ,—
তোমারি প্রসাদে দেবী ! তুমি যবে হও আবির্ভাব
তখনি তো লক্ষ্য-লাভ —তখনি তো মহালক্ষ্মীলাভ ।
দীপকের উদ্দীপনা নিয়ন্ত্রিত করি' রুদ্র ভালে
জাগো তুমি স্বতন্তরা ! রক্তরশ্মি রুষ্টতারা ভালে
যুগ-সন্ধ্যা-কালে ।
কভু ও ললাটে শোভে শুভ্র শুকতারা
পুণ্য-পুঞ্জী-পারা ।

দেবাসুর দ্বন্দ্বে দেবী ! সদ্যোজাত বজ্রের গর্জ্জনে
তব সাড়া পেয়েছি গগনে ।
সিন্ধু হ'তে বিন্দু ওঠে বাষ্পরূপে বিদ্যুত-সম্বল,—
বিন্দু-বিসর্গের দিনে তুমি তারে কর গো প্রবল ।
তুমি কর অকুণ্ঠিত ভার্গবের ভীষণ কুঠার ;
গোত্রমাতা মুদ্গলানী ঋগ্বেদ বাখানে বীর্য্য যার,—
ইষ্ট তুমি তার ।
সূর্য্যে রাখি' যন্ত্র'পরে ছেদিল যে জ্যোতি,—
তুমি তার গতি ।

পার্থে তুমি স্পর্দ্ধা দিলে একাকী যুঝিতে মল্ল রণে
ধ্বংসরূপী মহেশের সনে ।
তুমি কৌশিকের তপ, দেবী ! তুমি ত্রিবিদ্যা-রূপিণী ;
ঊষরে উর্ব্বর কর, জন্ম-মৃত্যু-রহস্য-গুর্ব্বিণী !

অগস্ত্যের যাত্রা পথে তুমি ছিলে বর্ত্তি নির্নিমেষ
তুমি দুর্গমের স্পৃহা—দুরূহ, দুস্তর, দুষ্প্রবেশ
সিদ্ধির উদ্দেশ ;
'অস্তি' নহ, 'প্রাপ্তি' নহ, তুমি স্বর্ণকোষ—
দৈব অসন্তোষ।

রুদ্রের দুহিতা দেবী ! কর মোর চিত্তে অধিষ্ঠান,
সর্ব্ব কুণ্ঠা হোক্ অবসান।
বিদ্যুতেরে দূতী করি' দ্বিধা ভিন্ন করিয়া দ্যুলোক
এস দ্রুত কবিচিত্তে ; দিকে দিকে নির্ঘোষিত হোক্
তব আগমন-বার্ত্তা ; কণ্ঠে মোর দাও মহাগান ;
হে জয়ন্তী ! গাহ 'জয়'—বৈজয়ন্তী উড়াও নিশান
উদ্ভাসি' বিমান।
সর্ব্ব চেষ্টা সর্ব্ব ইচ্ছা গাঁথ ঐক্য সুরে
সুপ্ত চিত্তপুরে।

দুর্লভের গূঢ় তৃষা দীপ্ত রাখ প্রাণের জল্পনা,
অয়ি দেবী মহতী কল্পনা !
নক্ষত্র অক্ষরে লেখ 'ক্ষত ত্রাণ' 'ক্ষতি অবসান' ;
বন্দী-মোচনের হর্ষে তিন লোক হোক্ স্পন্দমান।
দুর্গমের দুঃখ হর',—জগতের জড়ত্বের নাশ
কর তুমি মহাবাণী ! হোক্ বিশ্বে পূর্ণ পরকাশ
দীপ্ত তব হাস।
সিদ্ধির প্রসূতি তুমি ঋদ্ধি আরাধিতা !
হে অপরাজিতা !

লক্ষ কোটি চিত্তে প্রাণে অলক্ষিতে বিহর' আপনি
বুলাইয়া দাও স্পর্শমণি।
সমুদ্র মূর্চ্ছনা আর হিমাদ্রি 'অচল ঠাট' যার
হে মহাভারতী দেবী ! গাহ সেই সঙ্গীত তোমার ;

এস গো সত্যের উষা ! অসত্যের প্রলয় প্রদোষ !
বীণাধ্বনি-ঘণ্টারোলে যুক্ত হোক্ মূর্ত্ত রুদ্র রোষ
শঙ্খের নির্ঘোষ ;
পুণ্যে কর মৃত্যুজয়ী,—পাপে ছন্নমতি ;
মহাসরস্বতী।

এস বিশ্ব-আরাধিতা ! বিশ্বজিত যজ্ঞে মন্ত্র তুমি,—
মনঃ কুণ্ড উঠিছে 'প্রধূমি'।
এস ভব্য-অনুকূলা ! হব্যদাতা আহ্বানে তোমারে
রাক্ষস-সত্রের অগ্নি বর্জ্জিল যে হিমালয়-পারে।
ভেদ-দণ্ড তুমি পাপে, পুণ্যে দেবী ! তুমি দান-সাম ;
রাজ-রাজেশ্বরী বাণী ! চিত্তসুখ ! আত্মার আরাম !
কর পূর্ণকাম।
ব্রহ্ম-ছায়া তুমি অয়ি গায়ত্রী শাশ্বতী !
বিশ্ব-বিম্ববতী !

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

আমার বোম্বাই প্রবাস

(৯)

গুজরাট ও গুজরাটী

গুজরাটের আবহাওয়া আমার তেমন পছন্দ হয় নাই কিন্তু গুজরাটীদের মধ্যে অনেকের সহিত আমার হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল। কি ভাষা, কি লোকদের রীতি বিচিত্র, গুজরাটী ও বাঙ্গালীদের মধ্যে অনেক বিষয়ে মিল আছে, যেন বাঙ্গলার একখণ্ড পশ্চিম ভারতে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

ব্রিটিস গুজরাটের রাজধানী আহমদাবাদ আমার প্রথম কর্ম্মস্থান। এই সহর সাবরমতী নদীতীরে উচ্চভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। সৌন্দর্য্য ও শিল্পকলার দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে ইহা দক্ষিণ ভারতবর্ষে সর্ব্বাগ-গণ্য। সহরের প্রাচীর পূর্ব্বপশ্চিম প্রায় ১ মাইল বিস্তৃত, ১৫ হইতে ২০ ফুট উচ্চ, ইহার চৌদ্দটি প্রবেশদ্বার আর অনেকগুলি বুরুজ ও স্তম্ভে এই প্রাচীর সুসজ্জিত। আহমদাবাদের উপর দিয়া বহুতর রাজবংশের উপদ্রব গিয়াছে—মুসলমান, মোগল, মারাঠী—অবশেষে পেশওয়া রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ হইতে

ইহা ইংরাজরাজের হস্তগত হয় (১৮১৮)।

আহমদাবাদ জরির কাজ, রেশমের কাজ আর যন্ত্র ও হাতচরখায় তৈয়ারি সুতার কাপড়, এই তিনের জন্য প্রসিদ্ধ। কথায় বলে ইহার ভাগ্যগ্রন্থি তিন সূত্রে বাঁধা—সোনা রেশম ও তুলা। অনেকগুলি কাপড়ের মিলে সহস্র সহস্র শ্রমজীবি জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে।

প্রাচীন কীর্ত্তির চিহ্নসকল সহরের স্থানে স্থানে ছাড়াইয়া আছে। তাহার মধ্যে কারু-

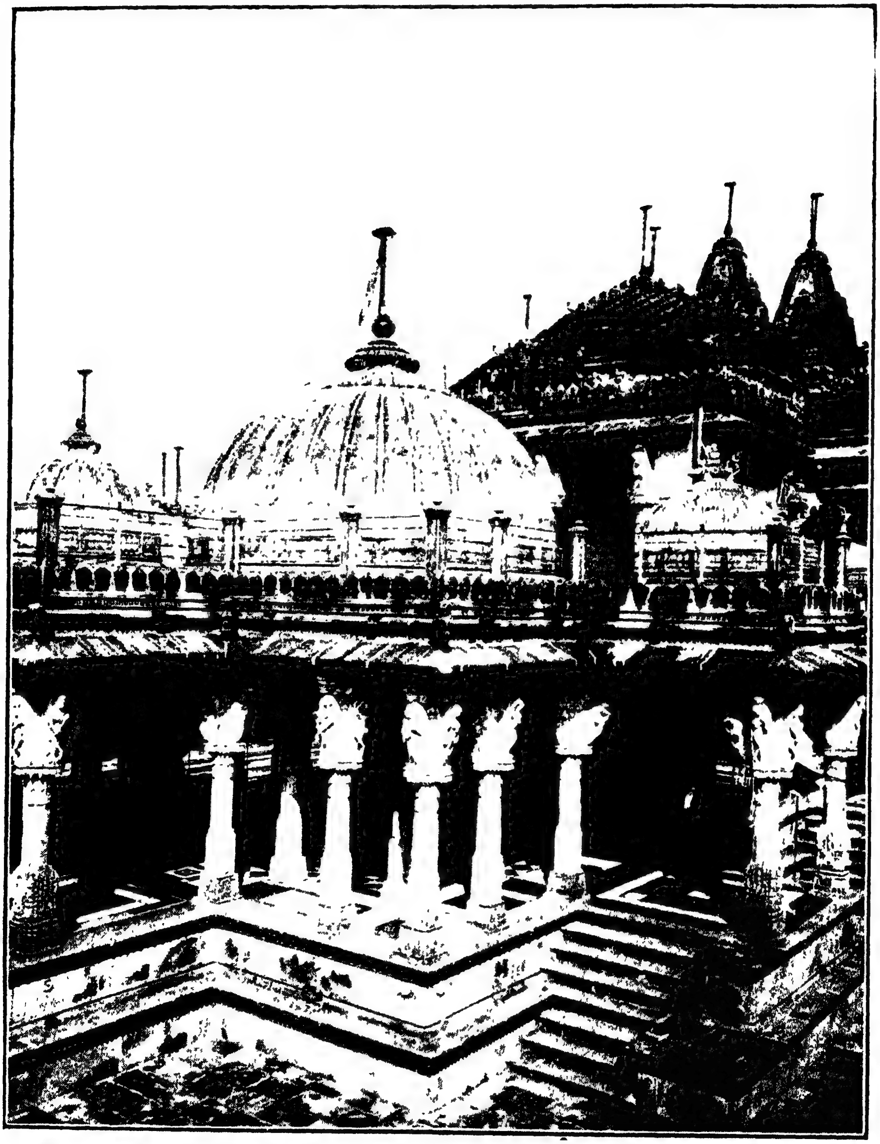

জুম্মা মসজিদ—আহমদাবাদ

কার্য্যময় মসজিদ, সমাধিমন্দির, তিনদরজা, কূপবাপী প্রভৃতি অনেকগুলি দর্শনীয় জিনিস আছে।

আমি প্রথমে যখন আহমাদাবাদে যাই সে সময়ে আমার যে সকল বন্ধু ছিলেন, তাঁহারা সকলেই একে একে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদেব দুইজন আমার বিশেষ স্মরণীয়, ভোলানাথ সারাভাই ও রণছোড়লাল ছোটালাল। ভোলানাথের নামে আহমদাবাদের প্রার্থনা সমাজ মনে পড়ে, যাহার সহিত তাঁহার কর্ম্মজীবন সংগ্রথিত। তিনি এই প্রার্থনা সমাজের অধ্যক্ষ, সর্ব্বময় কর্ত্তা, ইহার উন্নতি সাধনে সর্ব্বতোভাবে যত্নশীল ছিলেন। এখানে আমি যে সকল

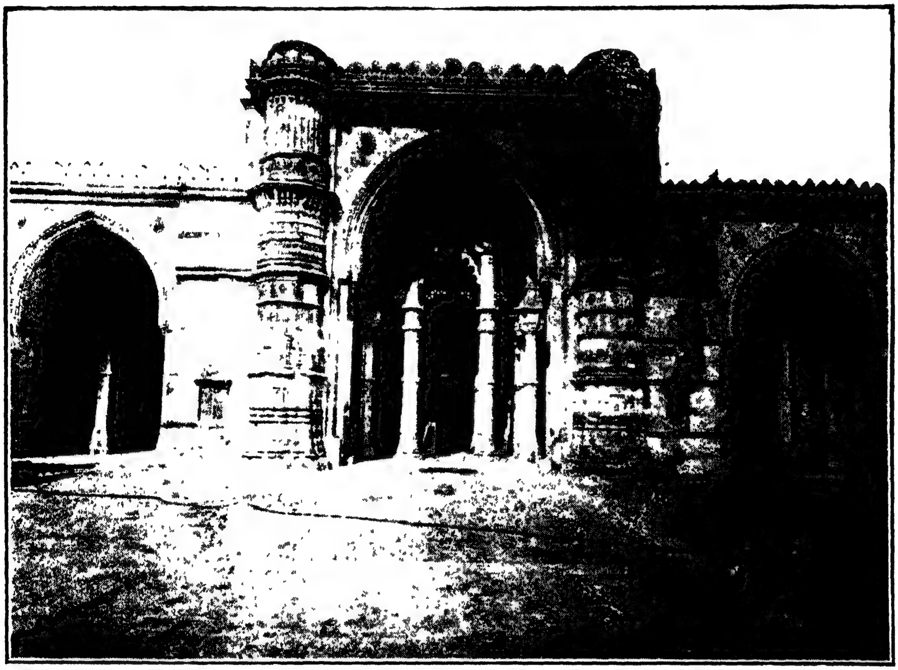

তিন দরজা—আহমদাবাদ

বক্তৃতা দিতাম তিনি তাহা শুদ্ধ গুজরাটীতে লিপিবদ্ধ করিয়া প্রচার করিতেন, এই সূত্রে তাঁহার সহিত আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে। একবার তিনি তাঁহার কন্যা জিতোবাকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় আসেন, আমরা আমাদের এক বহির্ব্বাটীতে তাঁহাদের থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম, তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া আমার পিতৃদেব অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। তাঁহার সরল সাধুভাবে সকলেই আকৃষ্ট হইত। তাঁহার কন্যাও আমাদের অন্তঃপুরে সকলের প্রিয়পাত্রী হইয়াছিলেন। তিনি গুজরাটী ধরণের রুটী ও তরকারী করিয়া খাওয়াইতেন,আমাদের খুব ভাল লাগিত, এমন পরিপাটী মোলায়েম রুটী কি কৌশলে তৈয়ার হয় সবাই জানিতে উৎসুক; মেয়েরা অবশ্য সে গুপ্তমন্ত্র শিখিয়া লইতে বিলম্ব করেন নাই,তা' বলা বাহুল্য।

উপরে ভোলানাথের সহযোগী রণছোড়-লালের নামোল্লেখ করিয়াছি—ধর্ম্মপ্রাণ ভোলানাথ আর বণিকবৃত্তি রণছোড়লাল এঁরা দুজন স্বতন্ত্র প্রকৃতির লোক। রণ-ছোড়লাল বিষয়বুদ্ধিতে অদ্বিতীয় ধনাঢ্য বণিক, সহরের শ্রীসমৃদ্ধি-বর্দ্ধনে কায়মনে তৎপর ছিলেন। ভোলানাথ ভাইয়ের দুইপুত্র। জ্যেষ্ঠ নরসিংহ রাও প্রাদেশিক সিবিল সর্ব্বিসে ছিলেন; অনেক সময় আমরা এক ষ্টেসনে, তিনি রেবেন্যু আমি জুডিস্যাল বিভাগে কর্ম্ম করিতাম, এক্ষণে তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। কনিষ্ঠ কৃষ্ণরাও (মনুভাই) ব্যারিষ্টর হইয়া আসিয়া আহমদাবাদে কর্ম্ম করিতেছেন। রণছোড়লালের পৌত্র চিনুভাই

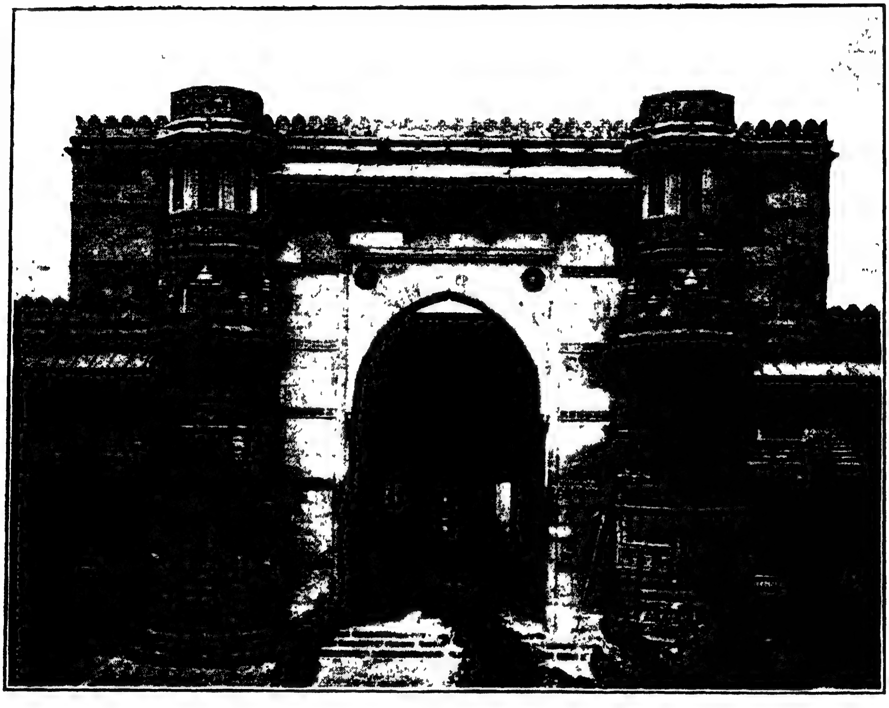

রাণী রূপাবতীর মসজিদ—আহমদাবাদ

তাঁহার পিতার বিয়োগে পিতামহের আসন অধিকার করিয়াছেন। চিনুভাই সম্প্রতি স্বজাতির মধ্যে প্রথম ব্যারণেট পদবী লাভ করিয়াছেন, প্রথম হিন্দু ব্যারণেট বলিয়া তিনি অভিনন্দনীয়। তিনি যে নাইটের পদ হইতে ব্যারণেট পদে অধিরূঢ় হইলেন সে তাঁহার নিজগুণে। দেশহিতৈষিতা, কর্ম্মক্ষমতা, দানশীলতা, এই সকল গুণে তিনি রাজদ্বারে সম্মানিত হইয়াছেন।

এদেশে যে ভাগ্যবান্ পুরুষ সর্ব্বপ্রথমে ব্যারণেট উপাধি পান তিনি বোম্বায়ের খ্যাতনামা পারসী. স্যার জমসদজী জিজিভাই। তাঁহার নামে সাম্রাজ্ঞীর যে আজ্ঞাপত্র প্রচারিত হয় তার তারিখ ১৮৫৮ সাল।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যারণেট—তাঁরাও বোম্বাই- ইব্রাহিম বোম্বাইবাসী মুসলমান, ১৯১০ সালে বাসী পারসী। চতুর্থ ব্যারণেট করিমভাই তাঁহার এই পদোন্নতি হয়। উল্লিখিত চিনুভাই

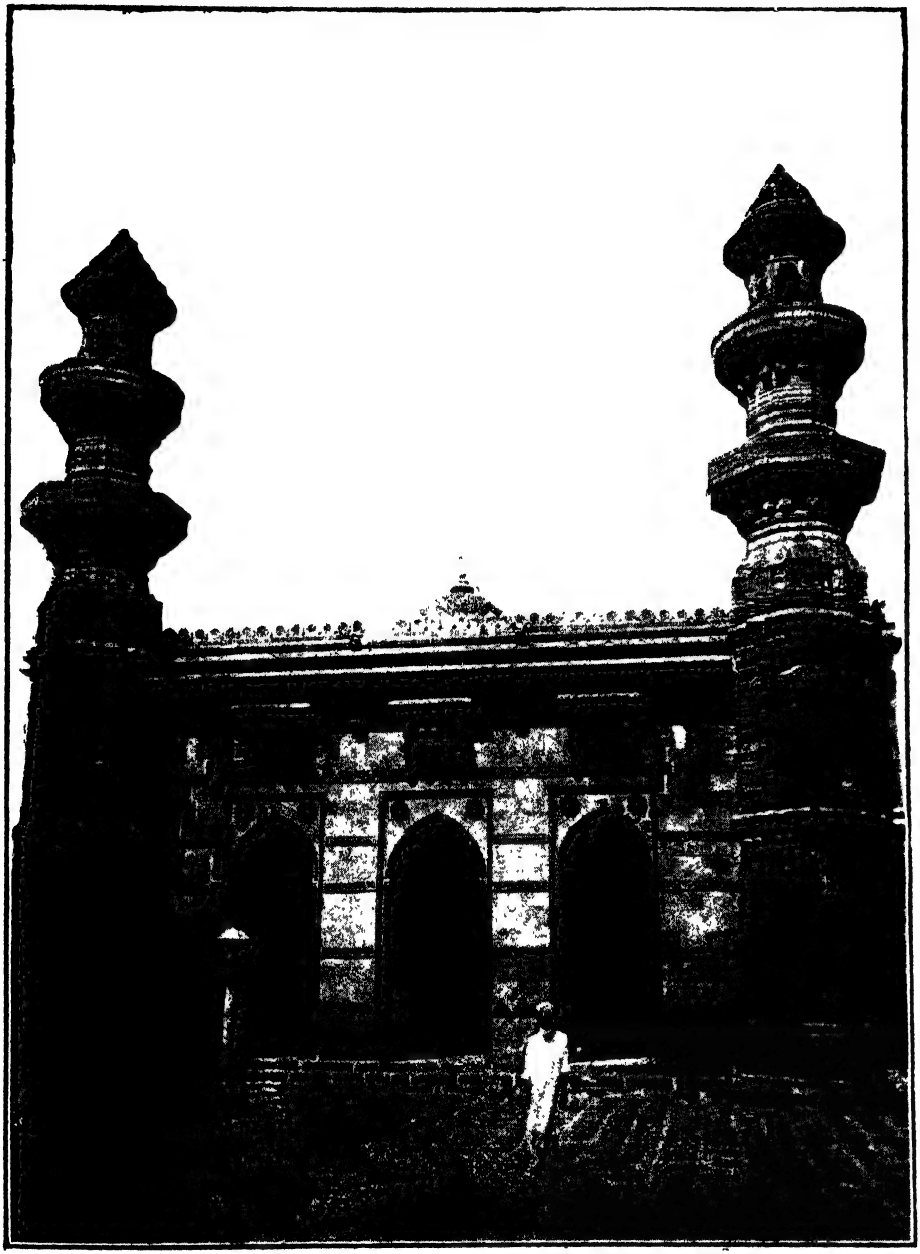

মোহাফেজ খাঁ মসজিদ—আহমদাবাদ

মাধবলাল পঞ্চম ব্যারণেট। ইঁহারা পাঁচ জনেই ব্যবসাদার ধনপতি—দানে মুক্ত হস্ত। পাঁচজনেই বোম্বাই প্রেসিডেন্সির লোক। আশ্চর্য্য এই যে বোম্বায়ের কপালে এই স্পৃহণীয় রাজটীকা পড়িয়াছে, এ পর্য্যন্ত ঐ প্রেসিডেন্সির বাহিরে যায় নাই।

মেরি কার্পেণ্টর

আমি আহমদাবাদ যাইবার কিছু পরে স্বনামখ্যাত Miss Mary Carpenter আমাদের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত। ব্রিষ্টল নগরে তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয়

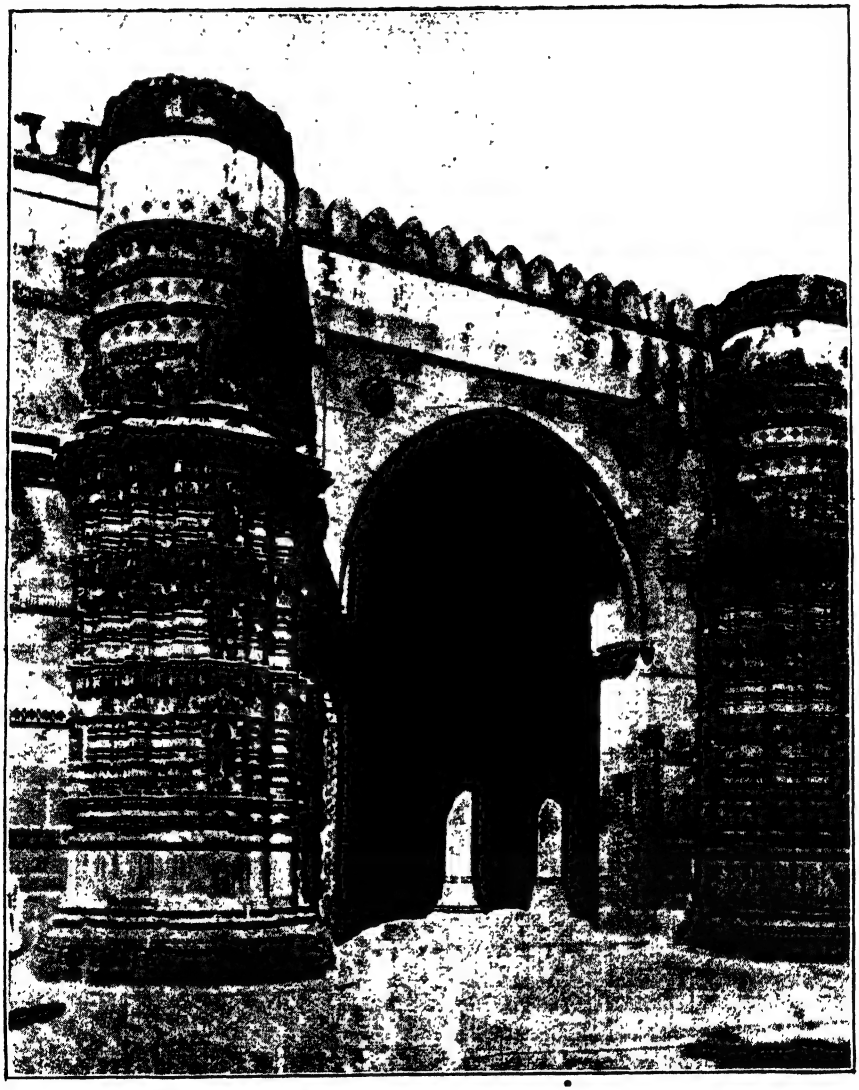

জুম্মামসজিদের এক অংশ—আহমদাবাদ

হয়। রাজা রামমোহন রায় তাঁহার শেষ জীবনে কার্পেণ্টর-পরিবার মধ্যে বাস করেন এবং যখন তিনি রোগাক্রান্ত হইয়া মুমূর্ষু হইয়া পড়িলেন তখন তাঁহাদের স্ত্রীপুরুষ সকলে মিলিয়া তাঁহার সেবাশুশ্রূষায় কায়মনে তৎপর ছিলেন। সে সময়কার কথা কুমারী কার্পেণ্টর তাঁহার "Last days of Raja Rammohan Ray" গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। রাজার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হইয়া অবধি দেশের লোকের প্রতি তাঁর একটা টান জন্মে। আমি ও আমার বন্ধু মনোমোহন ব্রিষ্টলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই, তিনি সাদরে আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন। ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ দেখিয়া আমরা প্রীত হইলাম ও আমাদের দেশের তখনকার সামাজিক অবস্থা তাঁহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিলাম। এই সকল বিষয় লইয়া তাঁহার সহিত আমাদের অনেক কথাবার্ত্তা হইত। তিনি এদেশে আসিবার প্রবল ইচ্ছা জানাইলেন। তখন তিনি তাঁহার মধ্যবয়স পার হইয়াছেন; ঐ পরিণত বয়সে এদেশে আসা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইবে, এই বলিয়া অনেকে তাঁহার মতি ফিরাইবার চেষ্টা করিত কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মন বিচলিত হয় নাই। অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। তিনি বোম্বায়ে আসিয়া আমাদের আহমদাবাদ ভবনে

ভোলানাথ সারাভাই

কিছুকাল অতিথি হইয়া রহিলেন। নাগরিকেরা সাধ্যমত তাঁহার আদরসৎকারে তৎপর হইল। তাঁহার সহিত পরিচিত হইতে সকলেই ব্যগ্র, সকলেই তাঁহাকে নিজ নিজ বাটীতে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইতে উৎসুক। একজন আহেলাবিলাতী রমণী, এদেশ সম্বন্ধে যাঁর কেবল পুঁথিগত বিদ্যা, তাঁহার নবীন চক্ষে আমাদের দেশীয় ভাব কেমন লাগে স্থানে স্থানে তাহার নিদর্শন পাইতাম। তাঁহাকে সেখানকার দেবালয় সকল দেখিতে লইয়া যাইতাম, তিনি ঠাকুর দর্শন করিয়া বিমর্ষভাবে ফিরিয়া আসিতেন—"বুৎপরস্ত" ভারতবর্ষ দেখিয়া তাঁহার মনে যেন কণ্টক বিদ্ধ হইত। কোন হিন্দু পরিবারের মধ্যে গিয়া বাড়ীর মেয়েদের দেখিতে চাহিলে গৃহকর্ত্তা তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া

আপনার স্ত্রী ও কন্যাগণের সহিত আলাপ করাইয়া দিতেন। অবশ্য স্বভাষায় আলাপ করিবার সুবিধা হইত না, দোভাষী রাখিয়া যতদূর সম্ভব তাহাই হইত। মনে পড়ে একদিন তিনি সহরের একটি বিশিষ্ট ভদ্র লোকের বাটীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। গৃহস্বামী তাঁহাকে আপন স্ত্রী পুত্র পরিবারের সহিত পরিচয় করিয়া দিতেছেন—

চিনুভাই রণছোড়লাল

ইনি আমার স্ত্রী—Mrs B (No 1)

মিস কার্পেণ্টার সহাস্য বদনে তাঁহার সহিত shakehand করিলেন।

ইনি Mrs B (No 2)

মিস কার্পেণ্টার চমকিয়া উঠিয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন, হাত বাড়াইতে আর রাজী হইলেন না।

এই Mrs B—(No 3)

মিস কার্পেণ্টার মূর্চ্ছিত প্রায়—কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বাহিরে গিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচেন।

মনে মনে ভাবিলেন—How Shocking! কি বীভৎস কাণ্ড। তিনি যদি বাঙ্গলাদেশে বহুপত্নীক কোন জলজ্যান্ত কুলীন দেখিতেন—না জানি কি করিতেন—! তাহাকে বায়ুগ্রস্ত উন্মাদ ভাবিয়া তাহা হইতে শতহাত দূরে যাইতেন সন্দেহ নাই।

Miss Carpenter যখন কলিকাতায় আসেন অনেকে তাঁহাকে ষ্টেশনে গিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। তখন কলিকাতায় পালকী করিয়া যাওয়া-আসার রীতি ছিল। এক জায়গায় তাঁহাকে একটা সুঁড়ী রাস্তায় যাইতে হইয়াছিল সেখানে পালকী করিয়া না গেলে যাওয়া যায় না; কিন্তু Miss Carpenter কোন মতে পালকীতে উঠিতে চান না, মানুষের কাঁধে চাপিয়া যাওয়া কিছুতেই তাঁহার মনঃপূত হইল না। তিনি গাড়ী হইতে নামিয়া পদব্রজে চলিলেন, পালকী চড়িতে রাজী হইলেন না।

কলিকাতায় আসিয়া একদিন আমাদের এক বন্ধুর বাড়ী গিয়া তাঁহার স্ত্রীর সহিত দেখা করিবার বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। বন্ধুটিকে অনেক সাধ্যসাধনা করা গেল কিন্তু তিনি বাঁকিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন—

মেরি কার্পেণ্টার

"Miss Carpenter, I am sure you will be disappointed"—

Miss C. কি, তুমি বল কি? আমাদের দেশের লোকেরা আপনার স্ত্রীর কথা কত গর্ব্ব করিয়া বলে—তাদের চোখে আপনার স্ত্রী রমণীকুলের সেরা, অন্য কোন নারী রূপে-গুণে তার সমান নয়।

B. কিন্তু দেখুন আমাদের দশা অন্যরূপ।

Miss C. কেন?

B. আমরা ত আর পছন্দ করে বিয়ে করি না, আমাদের বাপ মা মেয়ে পছন্দ করে এনে আমাদের বিয়ে দিয়ে দেন।

Miss C. আচ্ছা বল দেখি, কোন্ নিয়ম ভাল? বিয়ের জন্য পরের চোখে মেয়ে পছন্দ করতে কি কোন পুরুষের মন যায়? তার চেয়ে নিজে দেখে শুনে মনের মত মেয়ে বিয়ে করাতে কত সুখ!

B. কি করি নাচার! দেশাচারে আমাদের হাত পা বাঁধা।

Miss Carpenter কে কাজেই নিরুত্তর হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইল।

সে যাহাই হৌক্ Miss Carpenter-এর মত ভারত হিতৈষিণী বিদুষী নারীরত্ন দুর্লভ। সেই দূর দেশ হইতে এই বয়সে কেবল আমাদের মঙ্গল উদ্দেশ্যে এদেশে আসাই তাঁর ভারতবর্ষের প্রতি অনুরাগের প্রমাণ। তাঁর খুব ইচ্ছা ছিল, আমাদের সঙ্গে মেলা মেশা করেন। যাহাতে আমাদের ভাল হয়, আমাদের মেয়েদের শিক্ষা ও উন্নতি হয় সে জন্য তিনি প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত কিন্তু তিনি যে বদ্ধ সংস্কার লইয়া এই প্রৌঢ় বয়সে এদেশে আসিয়াছিলেন তাহার সহিত দেশবাসীগণের নিকট হইতে সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রত্যাশা করা বৃথা। রামমোহন রায়কে বাঙ্গালীদের নমুনা ভাবিয়া তাঁহার মনে যে উচ্চ ধারণা জন্মিয়াছিল এদেশে তাহার অনুরূপ দেখিতে পাইলেন না। তিনি ভাবিয়াছিলেন এক—দেখিলেন আর, তাঁহার সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইল!

জৈন সম্প্রদায়

আহমদাবাদে অনেক জৈন ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হয়। পঞ্জাব, রাজপুতানা ও অন্যান্যস্থানে জৈনপন্থীরা ছড়াইয়া পড়িয়াছে—গুজরাট তাহাদের এক প্রধান আড্ডা। সব মিলিয়া জৈন সংখ্যা প্রায় ১৫ লক্ষ হইবে। তাহাদের অধিকাংশ লোক বাণিজ্য ব্যবসায় ব্যাঙ্কিং কাজে নিযুক্ত। জৈন চাষা প্রায় দেখা যায় না, জীবহত্যার ভয়ে তাহারা লাঙ্গল ধরিতে নারাজ। আহামদাবাদে দেখিলাম জৈন ও বৈষ্ণবেরা মিলিয়া মিশিয়া সদ্ভাবে বাস করিতেছে; তাহাদের পরস্পর বিবাহ সম্বন্ধও বিরল নহে, কেবল ঐরূপ মিশ্র বিবাহে বরকন্যা উভয় পক্ষের একটা বোঝাপড়া করিয়া লইতে হয়, যেমন রোমান ক্যাথলিক্ ও প্রটেষ্টেণ্ট বিবাহে হইয়া থাকে কতকটা সেইরূপ। প্রকৃতপক্ষে কন্যাকে বরের ধর্ম্ম স্বীকার করিতে হয়। হিন্দুঘরের বধূ বিবাহের পর হইতে জৈনমন্দিরে ও জৈনকন্যা বৈষ্ণব মন্দিরে পূজার্চ্চনা করিয়া থাকে।

আহমদাবাদের নগরশেঠ প্রেমাভাই হেমাভাই নামে একটি সম্ভ্রান্ত জৈনের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল—তাঁহার সহিত জৈনধর্ম্ম লইয়া অনেক আলোচনা হইত। তিনি

নিরীশ্বরবাদের পক্ষ হইয়া অনেক সময় তর্ক করিতেন—তাঁহার কথার ভাবে বোধ হইত যে জৈনেরা হীনযান বৌদ্ধদের মত নিরীশ্বর-বাদী—জগৎ অনাদিকাল হইতে আপনাপনি চলিয়া আসিতেছে, তাহার কোন সৃষ্টিকর্ত্তা তাহারা স্বীকার করে না। কিন্তু জৈনদের দার্শনিক মতের ঠিক নাই। তাহারা বলে, কোন বিষয়, হাঁ, না, দুইই হইতে পারে;

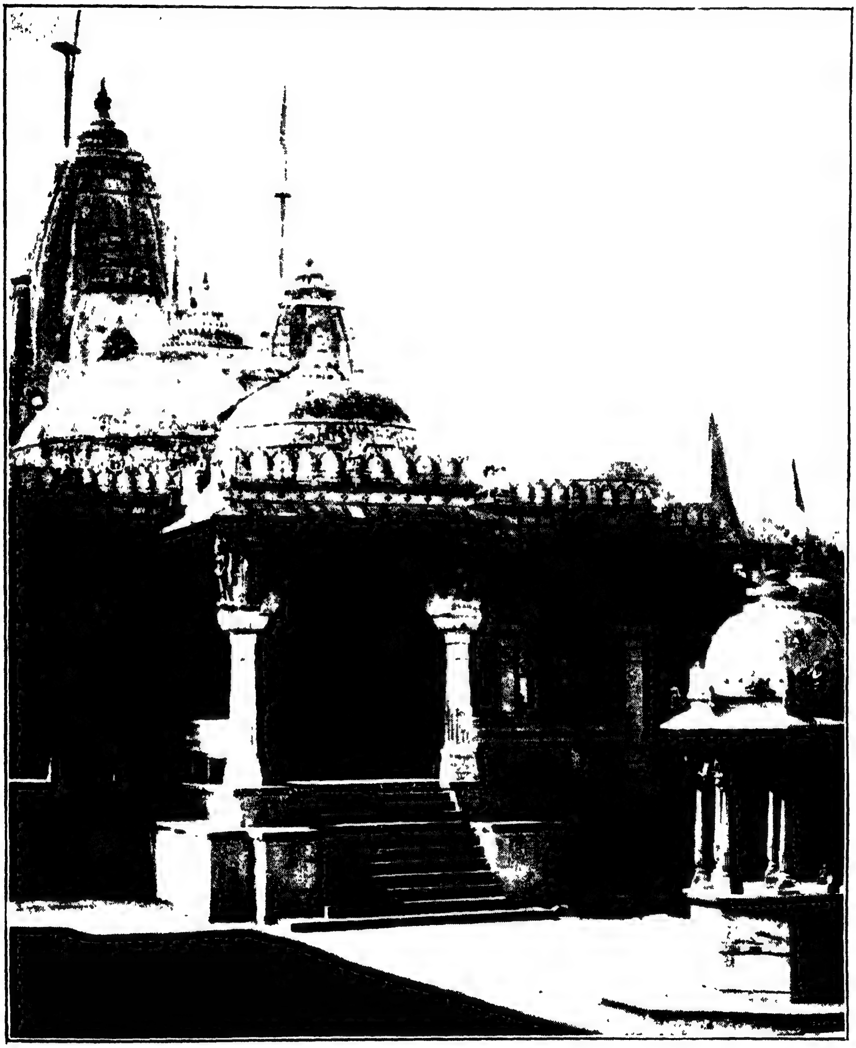

জৈন মন্দির—আহমদাবাদ

যেমন জগৎ নিত্য ও অনিত্য, প্রসঙ্গ ও সময় অনুসারে দুইই বলা যাইতে পারে। এরূপ যুক্তি অবলম্বন করিলে কোন তথ্যের মীমাংসা হয় না। তাহাদের এই দ্বৈধ ভাবের প্রতি কটাক্ষ করিয়া সর্ব্বদর্শন সংগ্রহকার তাহাদিগকে 'স্যাদ্-বাদী' অর্থাৎ

বিকল্পবাদী বলিয়া উপহাস করিয়াছেন। জৈনদের দার্শনিক তত্ত্ব যাহাই হউক, মানুষের স্বাভাবিক আরাধনা প্রবৃত্তি কোথায় যাইবে? দেখা যায় যে ঈশ্বরারাধনার পরিবর্ত্তে তাহাদের ধর্ম্মে বীরপূজা স্থান পাইয়াছে! তাহাদের আদিগুরু যে মহাবীর, তিনিই তাহাদের দেবতা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। জৈনধর্ম্মে বোধ হয় যেন হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্ম মিশ্রিত, বৌদ্ধধর্ম্মের জ্ঞানকাণ্ড ও হিন্দুধর্ম্মের পৌরাণিক ভাগ উহার মতে অনুস্যূত। জৈনমন্দিরে ব্রাহ্মণ পুরোহিত গিয়া পূজার্চ্চনা করে, এমনও দেখা যায়।

বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম, উভয় ধর্ম্মই কর্ম্মফলের নৈতিক প্রাধান্য মানিয়া লয়। আপন আপন কর্ম্ম অনুসারে জীবের যোনি-ভ্রমণে উভয়েরই বিশ্বাস! যে সকল সাধু পুরুষ স্বীয় কর্ম্ম গুণে জিতেন্দ্রিয় হইয়া নির্বৃতি লাভ করিয়া-করিয়াছেন তাঁহারাই জিন, জিনের অনুচর জৈন। জিনের অপর নাম তীর্থঙ্কর। যুগে যুগে এইরূপ ২৪ জন তীর্থঙ্কর উদয় হইয়াছেন ও ভবিষ্যৎ যুগে আরো ২৪ জন উদয় হইবেন। জৈনমন্দিরে এই সকল তীর্থঙ্করের পাষাণ মূর্ত্তি স্থাপিত। ইহাদের মধ্যে ত্রয়োবিংশ ও চতুর্ব্বিংশ জিনদ্বয়, পরেশনাথ ও মহাবীর, জৈনদের বিশেষ পূজার্হ দেবতা। এই সকল তীর্থঙ্কর-উদ্দেশে পরেশনাথের পাহাড়, গিরনার, শত্রুঞ্জয়, আবুর পাহাড় প্রভৃতি নানা স্থানে সুন্দর সুন্দর জৈনমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

'অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ' ইহা বৌদ্ধ ও জৈন উভয়েরই উপদিষ্ট ধর্ম্ম কিন্তু ইহার মধ্যে একটু বৈশিষ্ট্য আছে। বৌদ্ধধর্ম্ম অনাত্মবাদী, তাহার বিপরীত আত্মবাদ জৈনধর্ম্মের সারতত্ত্ব। জৈনদের বিশ্বাস যে, জীবজন্তু, এমন কি বৃক্ষলতা উদ্ভিদ্ কোন কোন জড় পদার্থও আত্মসত্তায় পূর্ণ, এই হেতু অহিংসা ধর্ম্ম তাহাদের বিশিষ্টরূপ পালনীয়। পশু পক্ষীদের আহার যোগানো জৈন গৃহস্থের নিত্য নিয়মিত কর্ম্ম। জৈনদের উদ্যোগে বোম্বাই কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে পশুর হাঁসপাতাল (পিঞ্জরা পোল) স্থাপিত হইয়াছে। উচ্চাঙ্গের জৈন সাধক আপনার শরীরের রক্ত দিয়া মশা ছারপোকা পোষণ করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করেন। পাছে দীপালোকে কীটপতঙ্গের প্রাণহানি হয়, এই আশঙ্কায় তাহাদের রাত্রিভোজন নিষেধ, সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে আহারের নিয়ম। জৈনযতিরা মুখে কাপড় জড়াইয়া রাস্তা ঝাঁট দিয়া চলে, পাছে তাহাদের নাসারন্ধ্র দিয়া কোন জীবাণু প্রবেশ করে, পাছে পদদলিত হইয়া কোন কীট মারা পড়ে। কথিত আছে যে এই অতিমাত্র অহিংসা নিয়ম পালন জৈন রাজ্য নাশের মূল। অন্‌হলবাড়ার শেষ রাজা কুমার-পাল গোঁড়া জৈন ছিলেন, বর্ষাকালে জীব-হিংসার ভয়ে তিনি নিজ সৈন্যসামন্তের চলাচল বন্ধ করিয়া মহা অনর্থ ঘটাইয়া ছিলেন।

ধর্ম্মনীতিতে অনেকটা সাদৃশ্য থাকিলেও সাধন প্রণালী সম্বন্ধে উক্ত দুই ধর্ম্মে বিস্তর প্রভেদ। উভয় ধর্ম্মই সংযম ও অন্তঃশুদ্ধি উপদেশ করেন কিন্তু সাধনা এক নহে। বৌদ্ধধর্ম্মের যোগ প্রণালী মিতাহার, মিতাচার, জৈনপন্থা অন্যতর। বুদ্ধদেব তপশ্চর্য্যায় চূড়ান্ত সীমায় গিয়া

মধ্যপথে ফিরিয়া আসেন—ইন্দ্রিয়সেবা ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ এই দুই প্রান্তের মধ্যবর্ত্তী পথ। জৈনগুরু মহাবীর ১২ বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন ও জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তপঃসাধনে নিযুক্ত ছিলেন—জৈনদের আচার অনুষ্ঠান সেই আদর্শে নিয়মিত; দীর্ঘ উপবাসাদি দ্বারা শরীর শোষণের নিয়ম যতিদের জীবনব্রত। তাঁহারা আর সকল জীবের জীবন রক্ষণে তৎপর, কেবল নিজের শরীরের প্রতি দয়ামায়া পরিত্যাগ করিয়া আত্মহত্যার পথ প্রস্তুত করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করেন না।

জৈনপন্থীর দুই শাখা—শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর। শ্বেতাম্বর জৈন শ্বেতবস্ত্রধারী, দিগম্বর নগ্ন সন্ন্যাসী, আকাশ যাঁহার বস্ত্র, গ্রীকেরা Gymnosophist বলিয়া যাঁদের বর্ণনা করিয়াছেন। একালে উভয় পন্থীই বস্ত্র ধারণ করেন, কেবল দিগম্বর জৈনেরা বিবস্ত্র হইয়া আহার করিবার নিয়ম এখনো পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। বৌদ্ধ ত্রিপিটক শাস্ত্রে দিগম্বর সন্ন্যাসী নিগণ্ঠ (নিগ্রর্ন্থ) অর্থাৎ বন্ধনশূন্য বলিয়া বর্ণিত। বৌদ্ধ শাস্ত্রের বর্ণনা হইতে পাওয়া যায় যে, বুদ্ধের সময় এই সন্ন্যাসী দলের দলপতি ছিলেন নিগণ্ঠ জ্ঞাতিপুত্ত, অর্থাৎ জ্ঞাতৃবংশীয় মহাবীর, জৈন শাস্ত্রে যাঁহার নাম বর্দ্ধমান মহাবীর—ইহা হইতে দিগম্বরদের প্রাচীনত্ব এবং মহাবীরকে বুদ্ধদেবের সমসাময়িক বলিয়া স্থির করা যায়। সম্ভবতঃ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে তাহাদের শাখাভেদের সূত্রপাত।

জৈনধর্ম্মের উৎপত্তি বিষয়ে দ্বিবিধ মত প্রচলিত। কোন কোন পণ্ডিতের মত এই যে জৈনধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের শাখা মাত্র, কিন্তু একথা অপর পণ্ডিতেরা অস্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবার বহুকাল পূর্ব্ব হইতে এদেশে জৈনধর্ম্ম চলিয়া আসিতেছে! জৈনেরা নিজে তাঁহাদের তীর্থঙ্কর মহাবীরকে শাক্যসিংহের গুরু বলিয়া বিশ্বাস করেন। বৌদ্ধমত ভ্রান্ত বলিয়া তাঁহাদের অগ্রাহ্য। ইতিহাসে পাওয়া যায় বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে জৈনধর্ম্ম ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কান্যকুব্জাধিপতি শ্রীহর্ষ প্রথম বয়সে বৌদ্ধ ছিলেন। সপ্তম শতাব্দীর কোন সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

কিন্তু আগে পরে যিনিই আসুন, জৈনধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মে যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। তাহাদের মধ্যে পিতা পুত্রের সম্বন্ধ না থাকুক উভয়কে পরস্পরের জাতভাই বলিয়া মানিতেই হইবে। উভয়েই এক মাতার সন্তান—কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম্ম পৃথক হইয়া পড়িয়া বিশ্বজগতে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে; জৈনধর্ম্ম মায়ের কোল ছাড়িয়া দূরে যান নাই আবার তাঁহার সহিত মিলিত হইতে ব্যগ্র।

বল্লভাচার্য্য

গুজরাটী হিন্দুদের মধ্যে বৈষ্ণবের সংখ্যা বিস্তর। বহুতর বণিক ও ব্যবসায়ী লোক বল্লভপন্থী বৈষ্ণব। বল্লভাচার্য্যের উত্তরাধিকারী আচার্য্যগণ 'মহারাজ' উপাধি ধারণ করিয়াছেন। খৃষ্টাব্দের পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বল্লভাচার্য্য চম্পারণ্যে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে নানা

অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। তাঁহার মেধা এমনি তীক্ষ্ণ ছিল যে প্রবাদ এই যে, ৭ বৎসর বয়ঃক্রমে তিনি বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ করিয়া চতুর্মাসের মধ্যে চতুর্ব্বেদ, ষড়দর্শন ও অষ্টাদশ পুরাণ কণ্ঠস্থ করেন। তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মশাস্ত্রের নূতন সংস্করণ করিয়া শীঘ্রই ধর্ম্মপ্রচারে দেশবিদেশে বাহির হইলেন। ইতিমধ্যে তিনি একবার বিজয়নগরের

বল্লভপন্থী মহারাজ

রাজা কৃষ্ণদেবের রাজসভায় গিয়া স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণদের সহিত দার্শনিক তত্ত্ব লইয়া তর্ক বিতর্কে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া বৈষ্ণবদের প্রধান আচার্য্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। পরে ৯ বৎসরকাল ভারতবর্ষের নানাস্থানে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক অবশেষে কাশীবাসী হইয়া জীবন যাপন করিতে থাকেন। সেখানে বহুবিধ গ্রন্থ রচনা করেন, তাঁহার মধ্যে ভাগবত পুরাণের ভাষ্য বল্লভপন্থীদের বিশেষ আদরের সামগ্রী। দর্শনক্ষেত্রে তাঁহার মত রামানুজের বিশিষ্টা-দ্বৈত বাদ বলা যাইতে পারে। কাশীবাসেই তিনি দেহত্যাগ করেন।

বল্লভের ধর্ম্ম বিলাসের ধর্ম্ম—ভোগৈশ্বর্য্য-পরায়ণ গৃহস্থের ধর্ম্ম। অন্যান্য পণ্ডিতেরা বলেন ধর্ম্মের পথ শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম—

"ক্ষুরস্যধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়োর বদন্তি"

বল্লভনির্দ্দিষ্ট মার্গ অন্যতর—তাহা ত্যাগের মার্গ নহে, পুষ্টিমার্গ। উচ্চাঙ্গ বৈষ্ণব ধর্ম্মে রাধাকৃষ্ণের প্রেম রূপকচ্ছলে গৃহীত—তাহা পরমাত্মার প্রতি জীবাত্মার

প্রেমের প্রতিরূপ ; বল্লভধর্ম্মে এই স্বর্গীয় প্রেম পার্থিব ধূলিদ্বারা কলঙ্কিত হইয়াছে।

করসনদাস মূলজী

বল্লভধর্ম্মের এই অনীতিদুর্গ ভেদ করিতে গুজরাট হইতে এক ধর্ম্মবীর অভ্যুদিত হইলেন—তাঁহার নাম করসনদাস মূলজী। এই মহাত্মার জীবন-কাহিনী এইস্থলে সংক্ষেপে বলা আবশ্যক। ইনি ১৮৩২ অব্দে বৈষ্ণবকুলে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে ইঁহার মাতৃবিয়োগ হয়—পিতা দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়া আপন ভ্রাতার পরিবারে বালকটিকে সঁপিয়া দেন। করসনদাস বোম্বায়ে এলফিনিষ্টন বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন। তাঁহার বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সমাজ সংস্কার

করসনদাস মূলজী

সমস্যার প্রতি তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। ঘটনাক্রমে এই সমাজ-সমস্যা তাঁহার জীবন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল।

যখন তাঁহার বয়স ২১ বৎসর, বিধবা বিবাহের উপর একটা পারিতোষিক প্রবন্ধের বিজ্ঞাপন দেখিয়া তিনি লিখিতে আরম্ভ করেন, তাঁহার লেখার কিয়দংশ কে একজন দুষ্টলোক চুরি করিয়া তাঁহার কাকিমার হাতে আনিয়া দেয়—তাঁহার এই লঘুপাপে গুরুদণ্ড হইল। অভিভাবকের কোপানলে পড়িয়া তাঁহার সমূহ বিপদ উপস্থিত। তাঁহার লেখা পড়া বন্ধ হইল, তিনি গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া পথের ভিখারী হইয়া দাঁড়াইলেন। অন্য কেহ হইলে এই প্রচণ্ড আঘাতে এখানে থামিয়া যাইত, নিজস্ব মতামত একদিকে রাখিয়া তাহার অন্নদাতার মন যোগাইয়া চলিতে একটুও ইতস্ততঃ করিত না, কিন্তু করসনদাস তেমন পাত্র ছিলেন না—ঘা খাইয়া তাঁর মনের আগুন দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। ভাগ্যক্রমে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ যোগাড় করিয়া লইয়া তিনি এ যাত্রা রক্ষা পাইলেন। তাঁহার অন্নচিন্তা দূর হইল এবং সমাজ-সংস্কার সমস্যা পূরণেরও অবকাশ পাইলেন।

তখনকার কালে বোম্বায়ে দেশীয় সংবাদ-পত্রের অবস্থা সন্তোষজনক ছিল না। তাহাদের লিখিত প্রবন্ধ সকল যেমন সারহীন, ভাষাও তেমনি অশোভন ও দোষাশ্রিত। পারসীদের মধ্যে গুজরাটী ইংরাজী মিশ্রিত একপ্রকার খিচুড়ী ভাষা প্রচলিত ছিল। এই অভাব মোচন করিবার জন্য কয়েকজন কৃতবিদ্য পারসী রাস্তগোপ্তার নামক এক সাপ্তাহিক

গুজরাটী পত্র বাহির করেন। করসনদাস তাহার লেখকের মধ্যে একজন ছিলেন কিন্তু তাহাতে তাঁহার মর্ম্মকথা সকল প্রচার করিবার যথেষ্ট প্রসার না পাওয়াতে "সত্য প্রকাশ" নামে তিনি নিজে একটি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিলেন—তখন হইতে সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে তাঁহার লেখনী চালনা করিবার সুযোগ পাইলেন। হিন্দু সমাজের ক্ষতস্থান সকল উদ্ঘাটন করা; মহারাজদের অনীতিগর্ভ অমানুষী কাণ্ডসকল লোকমাঝে রাষ্ট্র করিয়া দেওয়া, এই তাঁর ব্রত; এই কঠোর ব্রত ধারণ করিয়া "সত্যপ্রকাশ" গুজরাট গগনে ধূমকেতুর ন্যায় উদয় হইল। তাহার সামাজিক প্রবন্ধ সকল হিন্দু সমাজের চক্ষুঃশূল হইয়া দাঁড়াইল, বিশেষতঃ তাঁর ভাটিয়া জাতভাইদের তীব্র বিষদৃষ্টি তাহার উপর নিপতিত হইল।

ভাটিয়াদের অধিকাংশ লোক বল্লভপন্থী বৈষ্ণব। তাহাদের ব্যবসাবুদ্ধি যেমন তীক্ষ্ণ ধর্ম্ম বিষয়ে গোঁড়ামীও তেমনি প্রবল। তাহারা মহারাজের একান্ত অনুরক্ত ভক্ত শিষ্য। গোসাঁইজী মহারাজ তাহাদের চক্ষে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের অবতার,ভক্তগণ তনুমন ধনে তাঁহার সেবায় রত। মহারাজ তাঁহার অনুচরবর্গের রাজভক্তি গ্রহণ করিয়াই তুষ্ট নহেন, তাহাদের নিকট হইতে দেব-পূজার দাবী করেন। তাই তাঁহার আরতি বন্দনা, তাঁহাকে নৈবেদ্য অর্পণ, বসন ভূষণে তাঁহার দেহমণ্ডন, তাঁহার আসন, পাদুকা অর্চ্চনা, তাঁহার উচ্ছিষ্ট ভোজন ও চরণামৃত পান,—এক কথায় বিষ্ণুমন্দিরে মহারাজ দেবতার আসন অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। এ সকল তবুও ত পদে আছে, ইহা অপেক্ষা সহস্রগুণে নিন্দনীয় জঘন্য পাপাচার যাহা উল্লেখ করিতেও অঙ্গ শিহরিয়া উঠে, তাহা এই যে, বৈষ্ণব কুলবধূগণ এই পার্থিক কৃষ্ণ সেবায় আপনাদের সতীত্ব উৎসর্গ করিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন।

করসনদাস এই সমস্ত বীভৎসকাণ্ড অবারিত করিয়া ভাটিয়ামণ্ডলীর মধ্যে মহা হুলস্থুল বাধাইয়া দিলেন। তাঁহার তীব্র কশাঘাতে তাহারা নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়িল। তাঁহাকে নানা প্রলোভন দেখাইয়া থামাইবার চেষ্টা হইল—হিন্দু সমাজের অমোঘ বাণ যে জাতি বহিষ্কার,—সেই বাণ সন্ধানের উদ্যোগ হইতে লাগিল কিন্তু মহারাজের অনুচর বর্গের মন্ত্রতন্ত্র সকলি ব্যর্থ হইল।

১৮৬০ সালে গোসাঁইজী মহারাজ সুরাট হইতে বোম্বায়ে পদার্পণ করেন। তাঁহার আগমনে সত্যপ্রকাশের মতামত লইয়া বিষম আন্দোলন উপস্থিত হয়। মহারাজ যুক্তি তর্কে না পারিয়া অশাস্ত্রীয় পাষণ্ড মতের পরিপোষক বলিয়া সম্পাদকের উপর কটুকাটব্য বর্ষণ আরম্ভ করিলেন। করসনদাস তাহাতে পিছপাও হইবার পাত্র নহেন, তিনি তাহাদের আপনাদের অস্ত্রেই তাহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বেদ উপনিষদ পুরাণাদি শাস্ত্রের বচন হইতে বল্লভী মত খণ্ডন করিতে লাগিলেন ও তাহাদের অশাস্ত্রীয় ঘৃণিত আচার ব্যবহার সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া দিলেন। অক্টোবর ১৮৬০ সালের এক প্রকাশিত প্রবন্ধ এই নিন্দাবাদের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে। তাহাতে বিপক্ষদল কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া কিছুকাল ধৈর্য্য

ধরিয়া রহিল, কয়েক মাসান্তে কোথাও কিছু নাই হঠাৎ সত্যপ্রকাশের সম্পাদক ও প্রকাশকের নামে সুপ্রিম কোর্টে এক লাইবেল মকদ্দমা আনিয়া উপস্থিত। তাহার উত্তরে প্রতিবাদীর বক্তব্য এই যে, তাঁহার প্রবন্ধে লাইবেল কিছুই নাই, তিনি যে সকল কথা লিখিয়াছেন তাহা অক্ষরশঃ সত্য ও সমাজের হিতার্থে সেই সকল অভিযোগ প্রচার করিয়াছেন। বৈষ্ণব কুলবালাদের প্রতি ব্যভিচার বল্লভী ধর্ম্মনীতির অঙ্গ, একথা তিনি তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে দেখাইয়া দিতে প্রস্তুত।

এদিকে ভাটিয়ারা জোট বাঁধিয়া স্থির করিল যে তাহারা কেহই মহারাজের বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষ্য দিতে যাইবে না —তাহাদের সভায় এই মর্ম্মে এক প্রতিজ্ঞা পত্র একবাক্যে স্বাক্ষরিত হইল। কিন্তু এরূপ চেষ্টায় কোন ফল হইল না, প্রত্যুত তাঁহারা আপনাদের জালে আপনারাই ধরা পড়িলেন। করসনদাস এই সকল লোকের বিরুদ্ধে কুমন্ত্রণার ফৌজদারী চার্জ আনিয়া তাহাদের বাণ কাটিয়া দিলেন। বিচারে তাহাদের অপরাধ সাব্যস্ত হইয়া কাহারও ১০০০৲ কাহারও ৫০০৲ টাকা অর্থ দণ্ডে তাহাদের পাপের বিলক্ষণ প্রায়শ্চিত্ত হইল।

সুপ্রীম কোর্টে এই লাইবেল মকদ্দমার বিচার চলিতে লাগিল। ৪০ দিন ধরিয়া এই মকদ্দমা চলে। চীফ্ জষ্টিস্ Sir Joseph Arnold বিচারপতি, সুবিখ্যাত বিতণ্ডাকুশল Anstey প্রতিবাদীর কৌন্সলী। বিচারে প্রতিবাদীই জয়ী হইলেন, বাদীর পক্ষ লজ্জায় অধোবদন। Sir Joseph তাঁহার ন্যায়াসন হইতে মহারাজদের বীভৎস কাণ্ডগুলির প্রতি লক্ষ্য করিয়া যথাযোগ্য তিরস্কার ও প্রতিবাদীর অসম সাহস ও বীরত্বের যথাযোগ্য সাধুবাদ দিয়া ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের বিনাশ ঘোষণা করিয়া দিলেন। আমাদের শাস্ত্রবাক্য সফল হইল :—

অধর্ম্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।
অধর্ম্মে সমৃদ্ধি লভে, পূরে অভিলাষ;
পরে রিপুজয়; শেষে সমূলে বিনাশ।

পাপের পথ চিরদিনই ধ্বংসমুখী"—
(Book of Psalms)

এখনো করসনদাসের সমস্ত অগ্নিপরীক্ষা শেষ হয় নাই—এবারকার পালা—বিলাত যাত্রা। এই উপলক্ষে তাঁহার শত্রুপক্ষ তাহাদের অত্যাচরের পুনরাবৃত্তি করিয়া জ্বালাতন আরম্ভ করে,—এই স্থানে এ সকল কথা বিবৃত করিবার প্রয়োজন নাই। এই টুকু বলাই যথেষ্ট যে, করসনদাস মূলজী জীবনের শেষ পর্য্যন্ত অসীম ধৈর্য্য ও সাহসের সহিত ধর্ম্মযুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন—কর্ত্তব্য পথ হইতে তিলমাত্র বিচলিত হন নাই! অবশেষে তাঁহার জীবনের কার্য্য সমাপন করিয়া ১৮৭৪ সালে এই বিপ্লবময় সংসার হইতে অপসৃত হইয়া শান্তিধামে চলিয়া যান।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মূলোচ্ছেদ

নাটিকা

(টলষ্টয়-অবলম্বনে)

কালু কলে কাজ করে—ছিরু তাহার বন্ধু।

প্রথম অঙ্ক

স্থান—কালু মণ্ডলের কুটীর। কাল—সন্ধ্যা।

দাওয়ায় বসিয়া কালুব বৃদ্ধা মাতা সুতা কাটিতেছিল; স্ত্রী বিন্দু ঝাঁট দিতেছিল।

বিন্দু। (ঝাঁট দিতে দিতে) এদের মতলবখানা কি, তা ত কিছু বুঝ্‌তে পারছি না। চাল বাড়ন্ত বলে দিলুম, সন্ধ্যা হতে চল্‌ল, তা এখনও মানুষের দেখা নেই! পদা মাখনা খেলতে গেছে, ফিরে এসেই ভাতের জন্য ধুম বাধিয়ে দেবে'খন, তখন আমি কি করে কাকে সামলাব, তা জানি না—

কালুর মাতা। ও বেলার পান্তা কি কিছু নেই—চেঁচে-পুঁচে দুটিও হবে না?

বিন্দু। ছাই হবে! কাল থেকে বলছি, চাল বাড়ন্ত—তা হুঁসই নেই, হুঁসই নেই! কে কাকে বলছে! থাক্‌গে, বাপু, যাদের সংসার, তারা বুঝুক, আমার কি!

কালুর মা। কালু কি সত্যিই ভুলে বসে আছে! আসুকই না সে—চাল কি আর আনবে না? চাল কটি ধুয়ে চাপিয়ে দিলে ভাত হতে কতক্ষণ!

বিন্দু। কত ক্ষণ তা ত জানি, কিন্তু যে সব ছেলে, তাদের কি তিল তর সইবে! আমার গায়ের মাস্ খেয়ে ফেলবে'খন! আমারও হয়েছে যেমন দশা, এগুলে নির্ব্বংশ—পেছুলেও নির্ব্বংশ!

কালুর মা। আর গজ্-গজ্ করেই বা কি হবে, বাছা? সন্ধ্যে হল, ঘরে আলো দেখাও, দোরে গঙ্গাজলটুকু ছিটিয়ে দাও—কালু এল বলে!

বিন্দু। (ঝাঁটা রাখিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া) হ্যাঁ,—এল অমনি! আজ আবার মাইনে পাবে—! ওদের মাতির বাপ ফিরল, পুকুর ঘাট থেকে আসবার সময় দেখে এলুম, তবু এ মানুষের আর বাড়ী আসবার সময় হয় না।

কালুর মা। বোধ হয়, গস্তে গেছে, চাল কিনতে। ফল-ফুলুরিও কিনবে, তাই দেরী হচ্ছে!

বিন্দু। সেই হলেই রক্ষে! কিন্তু হাতে টাকাটি পড়লে বাড়ীর কথা কি আর সে মানুষের মনে থাকে? ছাই-ভস্ম গিলে বেহেজ্ হয়ে ফিরবে'খন! কোথায় থাকবে চাল, কোথায়ই বা ফল-ফুলুরি! আমি আর পারি না—আমারও যেমন—মরণ নেই—শুধু ভুগতে আছি! ছেলেপিলেদের ঝঞ্ঝাট, সংসারের জ্বালা, এর উপর আবার মাতালের বদ্-খেয়ালী! একদিন একটু সোয়াস্তির মুখ দেখলুম না!

কালুর মা। কি করবে বল, বাছা— সবই বরাতের লিখন বৈ ত নয়!

[সন্ধ্যার অন্ধকার নিবিড় হইয়া আসিল; গ্রাম্য চৌকিদার ভোলা, এক জীর্ণবেশধারী ভিক্ষুককে লইয়া কুটীরাঙ্গনে প্রবেশ করিল।]

চৌকিদার। কি গো কালুর মা, কালু ঘরে আছে?

কালুর মা। না গো, এখনো সে ফেরেনি।

চৌকিদার। ফেরেনি! তা যাক্, তোমাকেই বলি, অতিথ এনেছি গো, বাছা, তোমাদের বাড়ী—তোমরা আমায় একটু সুনজরে দেখ কি না, তাই—

ভিক্ষুক। জয় হোক্ মাঠাকরুণ—

বিন্দু। ন্যাও—আর অত কুটুম্বিতেয় কাজ নেই—অতিথ্ এসেছেন! আপনি খেতে ঠাঁই পায় না, আবার শঙ্করাকে ডাকে! রোজ রোজ এত অতিথ-সেবা করি কোত্থেকে বল দেখি, বাপু? আমাদের কি তালুক দেখেছ না, মুলুক দেখেছ! যাও না, বড় বড় কোঠা-বাড়ীর ত অভাব নেই গাঁয়ে, সেখানে যাও না! নিজের ঝঞ্চাটে মচ্ছি নিজে, এর উপর আবার অতিথ্! বলে, গোদের উপর বিষ-ফোড়া! কেন বে, বাপু, এত কিসের, এ—?

চৌকিদার। আহা, বেচারা নাচার একেবারে—বুঝলে গা, কালুর বৌ—

বিন্দু। নাচার, তা কি করব—? আমারই বা কি এমন জল-জলাট দেখেছ—তা ছাড়া বাড়ীর মানুষ-জন বাড়ীতে নেই—করে কে সব—? এত ঝঞ্চাটই বা পোয়ায় কে?

চৌকিদার। আহাহা, বলি, এই রাতটা বই ত নয়! তোমাদের এই বাইরের দাওয়াটায় পড়ে থাকলে দাওয়াটা ত আর ক্ষয়ে যাবে না গো।—এই বর্ষা, রাত-বেরেত—

কালুর মা। আহা, থাক্, থাক্, বৌমা, —গরিব কোথা যায় বল? থাক গো বাছা, থাক, আজ রাতটা ঐ দাওয়ায় পড়ে থাক—ছি, বৌমা, অমন করে কি মানুষকে তাড়াতে আছে?

ভিক্ষুক। সারাদিন দাঁতে কুটোটি কাটিনি মা—ক্ষেমা-ঘেন্না করে আমায় দুটি খেতে দিও!

বিন্দু। ঐ ন্যাও—বসতে পেলে আবার শুতে চায়! কেন, গাঁয়ে কি আর মানুষ ছিল না, যে দুটি খেতে দেয়?

ভিক্ষুক। আমি ভিখিরী নই, বাছা—বরাতে আজ এ দশা করেছে, নইলে দেশে আমার—

কালুর মা। দেখ ত বৌমা, ঘড়াটার মধ্যে দুটো মুড়ির গুঁড়ো বুঝি পড়ে আছে—মাখনা পাঠশাল থেকে এসে খেলে না—আচ্ছা, আমি না হয় এনে দিচ্ছি! (উঠিয়া একটা ছোট ধামী ভরিয়া মুড়ি আনিয়া দিল।)

ভিক্ষুক। (মুড়ি মুখে দিয়া) আঃ —!

চৌকিদার। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, কালু যে এখনো ফেরেনি—? কোথায় গেছে বুঝি!

বিন্দু। চুলোয়—না-হলে আমার হাড়-মাস কুরে খায় কি করে? এই মেঘ করে আসছে, সবাই যে যার ঘরে ফিরছে—এ মানুষের আর দেখা নেই! কি হল, তাই বা কে জানে!

চৌকিদার। না, ভয় কি—?

বিন্দু। ভয় নেই, তাই বা বলি কি করে? এদিকে ঘরে একটি চাল নেই—ছেলেদুটো ফিরল বলে—ফিরে আজ আমায় খাবে দেখচি।

কালুর মা। বৌমার আমার মুখের আর কামাই নেই! তা ওরই বা দোষ কি? কালুরই অন্যায়। আজ আবার মাইনে পাবে,—এখনো যখন দেখা নেই, তখন বেহুঁস হয়ে বাড়ী না ফিরলে বাঁচি।

বিন্দু। সঙ্গে আবার যদি ওদের সেই ছিরেটা থাকে, তা হলে ত কথাই নেই।

কালুর মা। কেন, ছিরে আবার কি করলে?

বিন্দু। ওমা, কি করলে! সেই ত পালের গোদা! এই মদ ত সে-ই ধরিয়েছে।

ভিক্ষুক। পুরুষ মানুষ—একটু যদি মদ খায়, তাতে দোষ কি!

বিন্দু। নাঃ—দোষ আর কি! তার টালটি যে আমাদের সামলাতে হয়—তখন?

ভিক্ষুক। কি করবে বল—পুরুষ মানুষ, পাঁচ জনের সঙ্গে মিশতে হয়, পাঁচ রকম লোকের কথা রাখতে হয়, তাই একটু-আধটু না খেলে যে চলে না—তোমরা মেয়েমানুষ, ঘরের কাজ-কর্ম্ম নিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা ব্যস্ত আছ, বোঝ না ত আমাদের একটু নেশা-ভাঙ ফুর্ত্তি-আমোদ না করলে চলবে কি করে, বল—

বিন্দু। বটে,—আর আমরা খুব ফুর্ত্তিতে আছি না? চব্বিশ ঘণ্টা এই রান্নাবান্না, বাসন-মাজা, জল তোলা, ছেলেপিলে দেখা—এই নিয়েই ত আছি,—এক দণ্ড হাঁপ ছাড়বার সময় পাই না, এর উপর যদি আবার মাতালের টাল সামলাতে হয়, তাহলে ত দেখছি, একেবারে সুখের চরম! মেয়ে-জন্ম হয়েছে বলে কি এতই সইতে হবে—কেন গা,—দুটি ভাতের জন্যে কেন এত সইব? মেয়েমানুষ বলে কি অমনি বাণের জলে সব ভেসে এসেছি না কি!

ভিক্ষুক। সে কথা ঠিক! আর তা ছাড়া নেশাতেই ত লোকের সর্ব্বনাশ হচ্ছে!

চৌকিদার। হ্যাঁ গো কালুর মা, তোমার এখানে একটু তামুক-টামুক নেই—?

কালুর মা। সে সব কালু কোথায় রেখে যায়, সে-ই জানে—

ভিক্ষুক। কথাটা যখন পাড়লে, তখন বলি—আমি ভিখিরী নই, বাছা, আমার পয়সা-কড়িও এক কালে মন্দ ছিল না। আজ যে এই দুর্দ্দশা দেখছ, তা ঐ নেশার জন্যেই—

কালুর মা। আহা—

বিন্দু। তবে—

ভিক্ষুক। তবে হ্যাঁ—একটু-আধটু খেলে অবশ্য এমন কিছু অনর্থ হয় না—কিন্তু মানুষ এই মাপটুকু ত ঠিক রাখতে পারে না—

বিন্দু। ও পাপ না ছোঁয়াই ভালো—

ভিক্ষুক। সে ত ঠিকই—লোকে চোর হচ্ছে, ফকির হচ্ছে, সে ঐ নেশার জ্বালায়! বদ্ হচ্ছে, সেও ঐ নেশার খেয়ালে! নেশা করেছ, কি গোল্লায় গেছ—সেই জন্যেই না, নেশা করাকে বলে, পাপ!

চৌকিদার। আমি তবে আসি—একটু কাজ আছে আবার। (প্রস্থান)

কালুর মা। ছেলেদুটো এখনো যে ফিরল না, বৌমা—

বিন্দু। খেলায় মত্ত হয়ে সব ভুলে আছে আর কি!

কালুর মা। (ভিক্ষুকের প্রতি) তা তুমি কি কাজ-কর্ম্ম কর—?

ভিক্ষুক। আমি—? ঐ যে গাঁয়ের পাটের কলে কাজ করতুম··! রোজগার-পাতি মন্দ ছিল না—

কালুর মা। তবে, এমন দশা হল কিসে?

ভিক্ষুক। আর কিসে—! ঐ নেশায়,—তবে মদের নয়, কোকেনের।

বিন্দু। কোকেন আবার কি?

ভিক্ষুক। সে এক রকমের নেশা। অল্প বয়সে আমার মা মারা যায়, বাপ আবার বিয়ে করলে। বাড়ীতে সৎমা এলেন, সঙ্গে তাঁর মা এলেন, কোথায় আবার এক পিশি ছিলেন, তিনিও এসে জুটলেন। বাড়ী আমার হল গে যেন সে কুটুম-বাড়ী। সময়ে ভাত পেতুম না, স্কুল যেতে দেরী হত, মাষ্টার প্রথম-প্রথম দাঁড় করিয়ে রাখত, তার পর জরিমানার ব্যবস্থা হল। জরিমানার পয়সা কোথায় পাব যে দেব? দেওয়া হত না, তখন কাণ-মলা, বেত সব রকমই চল্‌তে লাগল। কিন্তু নিত্যি এত অত্যাচার হলে কোন্ ছেলে আর স্কুলে যায়? পালিয়ে বেড়াতুম। স্কুলের কাছে এক ছুতোর-দের আড্ডা ছিল, তারা যাত্রার দল খুলে ছিল। আমি ত সেই যাত্রার দলে গিয়ে জুটলুম। চেহারা নেহাৎ মন্দও ছিল না, গোঁফ-দাড়ি বেরোয় নি,—আমায় দিলে তারা সখী সাজতে। এই সময় তামাক ধরলুম; তার পর কোকেন, এইটি ধরে শেষ এমনি হল যে হাতে পয়সা না থাকলেও এখান-ওখান থেকে কিছু চুরি-চামারি করে নেশাটা-আসটা করতে হত। ছোট চুরি,—ধরা পড়িনি, শেষে সর্দ্দার মারা গেল—যাত্রার দলও ভাঙ্গল।

বিন্দু। বাপ মোটে দেখ্‌ত শুনত না?

ভিক্ষুক। বাপ ত জুড়িয়ে বাঁচল। দায় ছিলুম বই ত নয়! যাত্রার দল ভেঙ্গে যেতে নেশার জন্যে কষ্টটা খুবই বাড়ল। শেষে খুঁজে-পেতে পাটের কলে চাকরির জোগাড় করলুম। নেশা সমানে চল্‌ল—একাদিক্রমে পনেরো বছর কলেই কেটে গেল—বিয়ে-থা করিনি; তার পর এই দু-তিন বছর হল, কাজে কামাই হতে লাগল। আমারও চাকরিতে জবাব হল। কিন্তু হাতে পয়সা নেই—নেশা চলে কি করে? পাকা চুরি ধরলুম। এই কোকেনের নেশা এমন নেশা নয়। ও জিনিসটি চাই-ই, তা যেমন করেই হোক্। শেষে একবার চুরি ধরা পড়ে গেল—দলে অন্য লোকও ছিল, তবে তারা ছিল চালাক, ফস্কে গেল, আমি ছ'মাস জেল খাটলুম। ফিরে এসে সভ্য-ভব্য হয়ে থাক্‌ব ভাবলুম। কিন্তু জো কি! চাকরি আর কোথাও জুট্‌ল না—জেল-ফেরত আসামী—দাগী—তার কি আর চাকরি হবার কোন উপায় আছে!

বিন্দু। তার পর?

ভিক্ষুক। তার পর—এই ভিক্ষেই হল জীবিকা! নেশাটা কিন্তু বাদ পড়ত না। ভিক্ষে করে চাল-ডাল যা পেতুম, তা বিক্রী করতুম,—করে সেই পয়সায় কোকেন কিনে খেতুম!

বিন্দু। ওমা, বল কি! ভাত না খেয়েও নেশা করতে?

ভিক্ষুক। বোঝ না ত, বাছা—এ নেশা বিষম নেশা। লোকে কথায় বলে, কোকেনের নেশা! কচ্ছপে কামড়ালে সে কামড় বরং ছাড়ে, কিন্তু এ নেশার কামড় একবার ধরলে আর ছাড়ান্ নেই!

বিন্দু। তার পর?

ভিক্ষুক। তার পর হল, মুস্কিল। গাঁয়ে যেখানে যা চুরি হয়, পুলিশ চোর ধরতে না পেরে আমাকেই চালান দেয়!

বিন্দু। মিনি দোষে?

ভিক্ষুক। তা না ত কি? আমি একবার যখন জেল ঘুরে এসেছি, তখন আর রক্ষে আছে? হাকিমও যেই শোনে, পুরোনো দাগী, অমনি আর আমার কোন কথা, কোন সাফাই কাণে তোলে না—দু'-চারবার আরো জেল বেড়িয়ে এলুম। তার পর—এই গাঁয়ে আসি, ভিক্ষে করতে। এখানেও ঐ দশা। কাদের বাড়ী গহনা-চুরি গেছল, চোরকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না—পুলিশ আমায় ধরে চালান দিলে—জেলে গেলুম। কিন্তু আসল মজাটি হল এই যে, এ চুরি যখন হয়, তখন আমি এ গাঁয়েই মোটে আসি নি—ভিন্ গাঁয়ে এক কালী-বাড়ীতে পড়ে থাকতুম।

বিন্দু। সে কথা হাকিমকে বললে না, কেন?

ভিক্ষুক। বলিনি কি,—বলেছিলুম—তা হাকিম কি তা কাণে তোলে! সে বললে, সাক্ষী আনো—নাম বল। আমি তখন হাজতে আটকা আছি—জামিন না হলে ত হাজত থেকে বেরুতে দেবে না, তা কে-ই বা জামিন হয়! আর সে সাক্ষীর নামই কি ছাই জানি যে, বলব, তবে সেখানে নিয়ে গেলে—তারা আমায় দেখলে বলতে পারত। সাফাইও মিলত!

বিন্দু। তাই করলে না কেন?

ভিক্ষুক। সে কথা বলেছিলুম—তা যিনি পুলিশের হয়ে মকদ্দমা চালাচ্ছিলেন, তিনি হেসে বললেন, ব্যাটা দাগী চোর—আবার ফন্দী বার করে মন্দ না! হাকিম চোখ রাঙালেন, বললেন, আদালতের সময় নষ্ট করছিস! ব্যস্—আমিও বোবা বনে গেলুম—ভাবলুম, দূর ছাই, আর তর্ক করে কি হবে—তার চেয়ে যাই জেলে—সে-ত আর অচেনা ঠাঁই নয়! বাইরের অবস্থা ত এই, অন্ন ভক্ষ্যো ধনুর্গুণ—তার চেয়ে সেখানে বাঁধা টাইমে খোরাকটা তবু জুটবে। কাল খালাস পেয়েছি—এই চৌকিদারই আমায় এখানে নিয়ে আসে—আশ্রয় চেয়েছিলুম—ওর একটু ধর্ম্মজ্ঞান আছে, দেখছি!

বিন্দু। তাই ত, কি আশ্চর্য্যি, বাপু! তা কোন ভদ্দর-নোকের কাছে দাঁড়ালে কেউ চাকরি দেয় না?

ভিক্ষুক। কে দেবে? গেলেই বলে, আগে কোথায় কাজ করতে, চিঠি আনো। আমি বলি, মিনি-দোষে জেল খেটে এলুম, হুজুর, চিঠি কার আনব? শুনেই তারা দূর্-দূর্ করে।

বিন্দু। কে জানে, বাপু! ধরই যেন, সত্যি দোষ করেই জেল খেটে এসেছে, তার পর কি আর মানুষ শোধরাতে পারে না? শোধরাতে চাইলেও শোধরাতে দেবে না? সত্যিই ত কাজ-কর্ম্ম না পেলে, পেটের দায়ে ভিক্ষে করা কি চোর হওয়া ছাড়া আর উপায়ই বা কি!

ভিক্ষুক। এই! বল ত বাছা!

কালু ও ছিরুর প্রবেশ

কালুর মা। ওমা, এই যে কালু! হ্যাঁরে, চাল-ডাল সব এনেছিস ত?

কালু। (জড়িত স্বরে) ভালো আপদ! বাড়ীতে ঢুকতে না ঢুকতেই অমনি বায়না! যাও, যাও, যাও, আমি চাল-ডাল আনতে পারব না। ওঃ, বাড়ীতে বসে বসে সব নবাবী হুকুম ফরমাস হচ্ছে! হ্যাঁ রে ছিরে—

ছিরু। কেন!

কালু। সেটা কৈ? দে।

ছিরু। এই নাও—

কালু। মা, এই নাও দেখি—খানিকটা হরিণের মাংস কিনে এনেছি—বাজারে এসেছিল। ভারী উম্‌দা জিনিস, তাই এনেছি, এখনি রেঁধে দাও। খাব,—ছিরেও খাবে!

কালুর মা। এতখানি মাংস এনেছিস? আর চাল-ডাল!

কালু। চুলোয় যাক্ গে তোমার চাল-ডাল—এখন মাংস রাঁধো। কথা কাটাকাটি করে না—

কালুর মা। তা হলে রাতে সব খায় কি, বল্‌ত বাছা! লোক ত কমগুলি নয়। বৌমা কি সাধে গজ্-গজ্ করে—

কালু। কে গজ্ গজ্ করে! বৌমা! ওরে আমার বৌমা! দাও ও ছুঁড়ীকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে। খেয়ে খেয়ে ভারী তেজ হচ্ছে সব, না—? (ভিক্ষুককে দেখিয়া) এ আবার কে! কে বাবা, রিপু-কর্ম্ম এখানে বসে আছ?

কালুর মা। আহা, ও একজন অতিথ!

কালু। কে অতিথ? হাম নেহি মাঙ্‌তা! নিকালো!

বিন্দু। কখনো নিকাল হবে না! ওঃ, মাতাল হয়ে সে তম্বী দেখ না।

কালু। কি! তুই! তোর এত বড় তেজ! দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজাটা একবার।

(বিন্দুকে প্রহার করিতে উদ্যত; ছিরে ও ভিক্ষুক ধরিয়া ফেলিল।)

ভিক্ষুক। ছি ছি, মেয়েমানুষের গায় হাত তুলতে আছে!

কালু। আলবৎ তুলব! তুই কে রে বেটা, মুড়্‌লী করতে এলি।

ভিক্ষুক। মুড়্‌লী আবার কি! মেয়েমানুষের গায়ে হাত তুলতে পাবে না।

কালু। বটে! ভারী দরদ দেখছি যে! ও তোর কে রে বেটা যে, তুই বাধা দিবি? ও তোর ইস্ত্রী নয় ত। আমার ইস্ত্রী, খুশী হাত তুলব।

বিন্দু। আমার মরণ হয় ত বাঁচি।

ছিরু। আহা, থাম, থাম,—গোল করো না। নাও, নাও বৌ, মাংসটা চড়িয়ে দাও গে!

বিন্দু। বয়ে গেছে আমার! কখনো চড়াব না! মাতালের চাট রেঁধে দোব? বটে! কখনো না। ছেলে-পিলে সব খায় কি, তার ঠিক নেই, ঘরে চাল বাড়ন্ত, মদের ঝোঁকে নবাবী করে বাবু কতকগুলো মাংস কিনে নিয়ে এলেন! নিজের পেটটিই বুঝেছেন, খালি। খেতে হয়, নিজে রেঁধে খাক্ গে, আমার দায় পড়েছে রাঁধতে!

কালু। আমার খুসী,—আমি খাব। রোজগার আমি করি, না, তুই করিস?

ছিরু। বলি, থাম গো থাম! বৌ, এদিকে এস—আমি চট করে চাল এনে দিচ্ছি। তুমি মাংসটা নাও, চড়িয়ে দাও গে! ওহে, অতিথ, তোমার নাম কি?

ভিক্ষুক। আমার নাম গোকুল!

ছিরু। (ইঙ্গিতে) বলি, আসে-টাসে, না, একেবারে নিরামিষ?

ভিক্ষুক। তা কিছু-কিছু আসে বই কি!

ছিরু। তাস খেলতে জান?

ভিক্ষুক। জানি।

ছিরু। তবে আর কি! কালু, নাও, নাও, মেজাজ সাফ করে ফেল! এই ত আর এক বন্ধু পাওয়া গেছে—আমি ও পাড়া থেকে হীরুকে ডেকে আনি। তাসজোড়াটা পাড়ো, খেলা যাক্। তার পর মাংস রান্না হলে আরামে খাওয়া যাবে। (মৃদু স্বরে) বোতলটা ঠিক আছে ত?

কালু। (মৃদু স্বরে) আছে।

ছিরু। বৌয়ের সঙ্গে ভাব করে ফেল, ভাব করে ফেল,—না হলে মাংস রেঁধে দেয় কে, বাবা? যাই, আমি দুটি চালের যোগাড় দেখিগে, আর অমনি হীরুকে ডেকে আনব! বৌ, যাও গো যাও। আমি চাল এনে দিচ্চি। ভায়া গোকুল, আজ দেখব, কেমন তুমি ওস্তাদ!

দ্বিতীয় অঙ্ক

স্থান—কালুর গৃহ। কাল—পরদিন প্রভাত।

কালুর মাতা ও বিন্দু।

কালুর মাতা। কালু এখনো ওঠে নি, বুঝি? আমি যাই, গরুটাকে বাইরে রেখে আসি। রোদ উঠে পড়েছে।

বিন্দু। আমি তা হলে সাজো বাসন-গুলো পুকুরঘাট থেকে মেজে আনিগে। ছেলেরাও ওঠেনি, উঠলে মা, বলো, ঐখানে ঢাকা-চাপা দুটি পান্তা আছে, আর রান্নাঘর থেকে যেন ডাল-চচ্চড়ি গুছিয়ে নিয়ে সকলে খায়।

কালুর মা। বলব, তুমি যাও বাছা,—সাজ পাট সেরে নাও। গরুটাকে রেখে এসে আমি উনুনে আগুন দেব'খন।

(উভয়ের প্রস্থান)

চোখ মুছিতে-মুছিতে কালুর প্রবেশ।

কালু। ঈস্! রোদ উঠে পড়েছে। এরা বুঝি ঘাটে গেছে! মা—মা—না, কারো সাড়া পাচ্ছি না। মাথাটা একটু, হ্যাঁ, ধরেছে, এই বাঁ রগ্‌টা। নাঃ, এ পোষাচ্ছে না! গোকুলচাঁদ গেল কোথায়? ওহে, ও গোকুল—নাঃ, এখনো ঘুমুচ্ছে, বোধ হয়। লোকটা জবুথবু হলেও এ দিকে মন্দ নয়! এই যে মা—

কালুর মার প্রবেশ

কালুর মা। উঠেছিস্?

কালু। হ্যাঁ। বলি, আনাজ-পত্তর কিছু আছে, না, এনে দিতে হবে?

কালুর মা। তবু ভালো! আমি ভাবছিনু, এখনি বলতে গেলে মারতে আসবি! বৌমাকে যে অত বকিস্, মার-ধোর করিস্, ও নেহাৎ ভালো, তাই, না হলে কি ও সাধে বলে, বাপু? এখন ডাগর হয়েছে, ছেলে-পিলের মা হয়েছে, এখন আর তোর ও রকম করা কি ভালো দেখায়!

কালু। যাক্, যাক্, ও নেশার ঝোঁকে কি করেছি, তা ধরতে নেই!

কালুর মা। তুমি ত বলছ, নেশার ঝোঁক, কিন্তু এ ঝোঁক্ যার মাথায় পড়ে, কাঁহাতক তার বরদাস্ত হয়, বল দেখি, বাপু—

কালু। যখন হুঁস থাকে, তখন ত কিছু বলি না। এখন আনাজ-পত্তরের খবর কি?

কালুর মা। সে বৌমা জানে। ঘাটে গেছে, ঐ যে আসছে। ওকে জিজ্ঞেস্ কর্। আমি যাই, উনুনটোয় আগুন দিই গে। আর শোন্ বাছা, অমন করে পরের মেয়েকে আর বকিস্ নি। তোর ঝঙ্কার শুনলে আমারি হাত পা পেটের মধ্যে যায়, আমি ত তবু মা,—তোকে পেটে ধরেছি। (প্রস্থান)

কালু। ওগো, শোন দেখি—

বিন্দুর প্রবেশ

বিন্দু। কি? আবার বক্‌বে?

কালু। না, না, সে নেশার ঝোঁকে কি বলেছি, সে কি ধরে?

বিন্দু। বটেই ত! তা এ ছাই নেশা করতে কে মাথার দিব্যি দেছে?

কালু। আচ্ছা, আচ্ছা, এবার দেখো—

বিন্দু। আমি চাই না দেখতে, যা-খুসী করগে,—আমি কে যে, কথা কব?

কালু। আবার রাগ করে! না, না, সত্যি, আমি তোমায় খুব ভালবাসি। (বিন্দুর হাত ধরিল)

বিন্দু। আর যাও—আদিখ্যেতা করে না। এখনি ছেলেরা এসে পড়বে। তা কি বলছিলে?

কালু। আনাজ-পত্তর কিছু আছে—না আনতে হবে?

বিন্দু। আছে।

কালু। তবে! আর তুমি আমায় কাল কিছু-নেই বলে ধমকাচ্ছিলে!

বিন্দু। একটু সময় থাকতে বলা ভাল নয় কি? যে তোমার হুঁস!

কালু। তা ঠিক! নাঃ, তুমি দেখছি, আমার লক্ষ্মী!

বিন্দু। তোমার ঢঙ্ রাখ। সর এখন।

(গমনোদ্যতা)

কালু। আচ্ছা, কালকের সে গোকুলচাঁদ গেল কোথায়?

বিন্দু। কি জানি! তাকে ত সকালে উঠে আর দেখিনি! লোকটা আহা, বড় দুঃখী।

কালু। তোমার ত মায়া হবেই। কাল সে তোমার দিক নিয়েছিল কি না।

বিন্দু। তা না, সে জন্যে নয়। নিজের সব কথা বলছিল। আহা, মিনিদোষে চার পাঁচ বার ওকে সবাই জেলে দিয়েছিল!

কালু। কৈ, জেল-ফেরত, তা ত আমাদের কাছে বললে না। লোকটা মোদ্দা খেলে বেশ। কাল ওতে আর ছিরুতে বসেছিল—আমাদের ঘাড়ে দু'খানা পঞ্জা দিয়ে গেছে। তাই তাকে খুঁজছিলুম,—আজ বেরুতে হবে না, ছুটি আছে, দুপুর বেলা খেলে সে পঞ্জার শোধ দেব।

বিন্দু। যাই, আমি কুট্‌নোটা ঠিক করে ফেলিগে!

(প্রস্থান)

কালু। আজ একটু ভাল রকম বাজার করে আনিগে—ছুটির দিন—

(কক্ষমধ্যে গমন)

কালুর মার প্রবেশ

(কালুর মা।) বৌমা—

বিন্দুর প্রবেশ

এই থোড়টুকু বাবুদের বাড়ী দিয়ে আসি মা—কি বল? আহা, ছোট মেয়েটি বিধবা হয়েছে—ভালো জিনিসে এই বয়সেই কপালপোড়া

বিধেতা বাদ সেধেছে—তবু এটুকু যদি মুখে রোচে!

(প্রস্থান)

(নেপথ্যে কালু। ওগো—)

বিন্দু। কেন?

শশব্যস্তে কালুর প্রবেশ

কালু। সর্ব্বনাশ হয়েছে। আমার ঐ জামার পকেটে তিনটে টাকা ছিল - পাচ্ছি না—

বিন্দু। মেঝেয় পড়ে যায় নি ত?

কালু। না, আমি বেশ করে খুঁজেছি। তক্তাপোষের নীচে-অবধি খুঁজেছি, চালের দামটা ছিরুকে দেব বলেছিলুম—তার পর ভুলে গেছি দিতে—সে-ও না নিয়ে চলে গেছে!

বিন্দু। দেখ, আর কোথাও রেখেছ, বোধ হয়!

কালু। না, সে আমার বেশ মনে আছে। আমি ছিরুকে বললুম, পকেটে তিনটে টাকা রইল—চালের দাম; যাবার সময় নিয়ে যেয়ো। সে বললে, আচ্ছা—

বিন্দু। তাইত—তা হলে—

কালু। এ তার কাজ—নিশ্চয় তার কাজ। সেই গোকুলো ব্যাটা—ব্যাটা ঘাড় উঁচু করে দেখছিল, জামাটা কোথায় রাখি। নিশ্চয় এ সেই ব্যাটার কাজ! তাই বেটা ভোরে সরে পড়েছে। তুমি না বললে, সে জেল-ফেরত! তবে আর কোন ভুল নেই!

(গমনোদ্যত)

বিন্দু। যাচ্ছ কোথায়?

কালু। সে ব্যাটার সন্ধানে। (বিন্দু ধরিল) না, ধরো না, ছেড়ে দাও।

বিন্দু। শোন—

কালু। দেরী হয়ে যাবে, ছেড়ে দাও—

(নেপথ্যে—কালু ঘরে আছ?)

বিন্দু। গজু ঠাকুরপোর গলা, না?

কালু। কে? গজু? এস না!

প্রতিবেশী গজুর প্রবেশ

গজু। কি—বাজারে যাচ্ছ?

কালু। যাব ত, কিন্তু ভাই, এক গেরোয় পড়েছি।

গজু। কি গেরো হে?

কালু। কাল এরা এক অতিথকে ঠাঁই দিয়েছিল। ব্যাটা খেয়ে-দেয়ে দিব্যি আরাম করে এখানে শুয়ে ত রাত কাটালে; তার পর আজ আমার পকেট থেকে তিনটে টাকা চুরি করে লম্বা দেছে। ভোরে উঠে দেখি, সে নেই, টাকাও নেই।

গজু। দাঁড়াও—লোকটার চেহারা কেমন, বল দেখি?

বিন্দু। রোগা, ঢ্যাঙ্গা, রঙটা কালো—মুখে কাঁচা-পাকা দাড়ি-গোঁফ—

গজু। গায়ে একটা ছেঁড়া জামা—আর হাতে একটা বাঁশের লাঠি ছিল?

কালু। তা হবে।

গজু। রসো, রসো—আর নাকটা বাঁকা, ঠিক এই গে তোমার টিয়াপাখীর ঠোঁটের মত?

কালু। হ্যাঁ, হ্যাঁ—সেই তা হলে!

গজু। ঠিক—আমি যে এই চক্করবত্তি মশায়ের আটচালাটার সামনে ঐ ধরণের একটা লোক দেখে আসছি, এই মাত্র, হন্‌হন্ করে সে চলেছে।

কালু। ওঃ, তা হলে সে আর যায় কোথায়—ঠিক ধরব ব্যাটাকে! এস হে গজু—

গজু। চল, ছুটে চল—এখনো বোধ হয়, ব্যাটা বোসেদের শিব-মন্দির পেরোয় নি—!

(উভয়ের সবেগে প্রস্থান)

বিন্দু। দেখ, কি সর্ব্বনাশ হয়! (গালে হাত দিয়া বসিল)

কালুর মার প্রবেশ

কালুর মা। কি বৌমা, এমন করে বসলে যে!

বিন্দু। এরা, মা, সেই অতিথটাকে ধরতে ছুটল! জামার পকেট থেকে তিনটে টাকা চুরি গেছে—অতিথকে দেখতে না পেয়ে তার উপর সন্দেহ হয়েছে, তাই ধরতে ছুটল!

কালুর মা। সে-ই যে নিয়েছে, তার ঠিক কি, বাছা?

বিন্দু। কেন মরতে, জেল-ফেরতের কথা তুললুম, মা! কি যে হবে?

কালুর মা। তাই ত! নাঃ, ভালো গেরো, বাছা! তবে শুনবে, বৌমা—একটা ঘটনার কথা? শোন, বলি। সে আজ দশ বারো বছরের কথা—তখন আমার কালু কতটুকুই বা! ও পাড়ার মিত্তিরদের একটা কালো বক্না চুরি গেছল। গাঁয়ের লোক চোর ধরবার সলা আঁটতে লাগল। কেউ বললে, যুগীদের মোনাকে গোয়ালের আগড় খুলতে দেখেছে, কেউ বললে, গরু নিয়ে যেতে দেখেছে! তখনই খোঁজ-খোঁজ! চারদিকে রৈ-রৈ করে লোক ছুটল! এখন ডাকাতে দীঘির ও পারে যে ক্ষেত আছে, মোনা ছিল, সেইখানে। যত লোক খোঁজ পেয়ে ত সেখানে ছুটল—মোনার চুলের ঝুঁটি ধরে সব বলতে লাগল,—'বের কর্ গরু!' সে বেচরা ফ্যাস্ফ্যাল্ করে সবার পানে চায়ে—সে বলে, কি বের করব! সকলে বল্যে, মিত্তিরদের কালো বক্না চুরি করেছিস্—বের করে দে! সে নেয় নি,—কোত্থেকে বের করে' দেবে? কে নিয়েছে, তাও সে জানে না। তা সে কথা কে-ই বা শোনে, কে-ই বা মানে! তখন ত সকলে মোনাকে ধরে লাথি, চড়, ঘুসি মারতে লাগল। মারের চোটে মার বাছা সেখানে মরেই গেল! তার পর দিন পুলিশ চোর ধরে নিয়ে এল—সে একজন পাকা দাগী, গরু নিয়ে গেছল—মোনাকে সে চেনেও না, জানেও না—! যা হোক্, চোর ত জেলে গেল, সঙ্গে-সঙ্গে কতকগুলো ভদ্দর নোকের ছেলে অবধি মোনাকে মেরে ফেলার দরুণ জেল খেটে এল!

বিন্দু। তবেই ত! কি হবে মা? এ আবার যে রকম রাগী মানুষ—

কালুর মা। কিন্তু এ অতিথ্টে বাছা, লোক ভালো নয়। শুনলে ত—কি কোকিল না উঁকিল খেয়ে নেশা করে!

বিন্দু। না হয়, তিনটে টাকাই নিয়েছে মা—তার জন্যে তাকে মার-ধোর করেই বা ফল কি—আর সে জেলে গেলেই বা আমাদের কি লাভ!

কালুর মা। তবু দেখে আর পাঁচটা লোক শাসিত হয়!

বিন্দু। কিন্তু শুনলে ত—এ লোকটাকে কেউ চাকরি দেয় না—ভিক্ষেতেও ওর পেট ভরে না—কাজেই যদি সে চুরি করে থাকে—ঐ না গোলমাল শোনা যাচ্ছে—

কালুর মা ধরেছে না কি কাউকে—! দেখি—

গোকুলকে ধরিয়া গজু, কালু ও প্রতিবেশিবর্গের প্রবেশ

কালু। ঠিক ধরেছি। ব্যাটা কাচার খুঁটে টাকা তিনটে বেঁধে রেখেছিল।

কালুর মা। আহা, ছেড়ে দে বাবা, ছেড়ে দে—টাকা ত তোদের আদায় হয়েছে?

কালু। ছাড়ব বৈকি! ব্যাটাকে আধ-মারা করে থানায় দেব, তবে ছাড়ব!

গোকুল। নাচার বাবা, তাই টাকা তিনটে নিয়েছি—চুরি করি নি, বাবা- খেতে পাই না,—দোহাই বাবা, চাকরি জোটে না, ভিক্ষে মেলে না—

গজু! চুরি করিস নি ব্যাটা? (প্রহার)

কালু। চুরি আবার কাকে বলে রে ব্যাটা? (প্রহার)

১ প্রতিবেশী। দাও ব্যাটাকে আরো দু'চার ঘা, না হলে শায়েস্তা হবে না।

২। কানটা আচ্ছা করে পাকিয়ে দাও!

৩। থানায় নে যাও—জেলের দানা-পানি না খেলে এ রোগ সারবে না!

৪। হ্যাঁ, হ্যাঁ, জেলের হাওয়া খেলেই আরাম হয়ে যাবে!

১। ব্যাটা—গাঁয়ের মধ্যে চুরি!

২। তাও আবার জামার পকেট থেকে—

বিন্দু। আহা, ছেড়ে দাও গো, ছেড়ে দাও। তিনটে টাকা চুরি করে তিরিশ টাকার মার খেয়েছে! ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও!

কালু। দিচ্ছি ছেড়ে! পাঁচ-সাত বার জেল খেটেছিস ব্যাটা, তবু ভয় নেই? ডর নেই? (প্রহার)

গোকুল। দোহাই বাবা, আর কখনো এমন কাজ করব না!

কালুর মা। ও গজু, ও কালু, দে বাবা, ছেড়ে দে - মেরেছিস ত খুব—

১। বল কিগো কালুর মা,—চোরকে কি ছেড়ে দিতে আছে?

২। ওকে জেলে দিতে হবে!

৪। না হলে শাসিত হবে কেন?

কালুর মা। আহা, ও বড় গরিব, বাছা—বড় গরিব!

৩। খবরদার ওকে ছেড়ো না, কালু—আইনকে সাবধান!

বিন্দু। ওগো, দোহাই তোমাদের—ওকে জেলে দিলে কি পৌরুষ বাড়বে তোমাদের? আর ও-ই বা কি শোধরাবে, বল! তার চেয়ে—

কালু। বেশ—তাই হবে। ছেড়েই দেব। (গোকুলকে দুই-তিনটা ঝাঁকানি দিয়া) যা, ব্যাটা,—এতবার জেল খেটেও যখন তোর মতি ফিরল না, তখন তোকে আর জেলে দিয়েই বা ফল কি! যা, তোকে ছেড়ে দিলুম আমি। তোর কিছু নেই, বললি না? চাকরিও জোটে না—? আচ্ছা—নে, যা—ও টাকা তিনটে তুই নে-যা—(টাকা তিনটা ঝন্‌ঝন্ শব্দে ফেলিয়া দিল।)

কালুর মা। এবার থেকে সৎপথে থাকিস্ বাছা, আর চুরি-টুরি করিস নে—এর পর নরকে যেতে হবে যে—সে ভয় নেই?

বিন্দু। সে-ত আর জেল নয়—যে দুদিন পরে খালাস পাবে—চিরকাল সেখানে পচে মরতে হবে। চাকরি না পাও,—ঐ তিন টাকা দিয়েই শাক-সব্জী কিনে ফিরি করে বেড়াও

গে দেখি! একটা ত পেট—তাতে ঢের ভরবে। একটা পেটের জন্মে ক'টা টাকারই বা দরকার যে অধর্ম্ম কর্‌তে হবে?

১। এঃ, কালু, ছেড়ে দিলে—

২। তাই ত!

৩। ছোট লোক—ও ব্যাটার আর বুদ্ধি কি, বল!

কালু। বেশ বাবু, ছোট নোক হই, আমিই আছি। গোকুল, আয়, আমি তোকে চাকরি দেব। কাছারির ধারে আমি একখানা মশলার দোকান খুলব, ভাবছিলুম,—তুই সেখানকার কাজ-কর্ম্ম দেখবি, আর এখানে খাবি-দাবি। কেমন! কি বলিস্?

গোকুল। এ্যাঁ! শুধু ছেড়ে নয়—চাকরিও দেবে! ..(চোখে জল আসিল) কালু, আমি কিছু বুঝতে পারছি না—এমন ত কখনো দেখিনি, শুনিও-নি! চোর বলে লোকে কত মেরেছে, মেরে জেলে দিয়েছে,—তাতে আমার মন কখনো এমন হয় নি কিন্তু! জেলে বসে বসে আক্রোশই বেড়েছে শুধু! পাপের আগুন জেলের হাওয়ায় বেড়েই উঠেছে, কখনো নেবেনি—নিবতে দিই-ও নি! আজ কিন্তু তুমি সে আগুন নিবিয়েছ! আমায় তুমি চেনো না—কালু। কালুর বৌ, কালুর মা,—তোমরাও চেনো না—আমি পাকা বদমায়েস, দাগী চোর। ভদ্দর ঘরে জন্মে নেশা-ভাঙ্ করে আজ আমি এই হয়ে দাঁড়িয়েছি—কখনো ফিরব বলে আশা করি নি—ফেরবার কথা মনেও কখনো উদয় হয় নি। অত লোকের লাথি-জুতো যা করতে পারে নি, যে রোগ সারাতে পারেনি, আজ তোমাদের এই মায়া মমতা তা পেরেছে, সে রোগ সারিয়েছে। আজ থেকে আমি তোমাদের চাকর! আর নেশা নয়, আর চুরি নয়! ভগবান হাত দিয়েছেন, পা দিয়েছেন, তাই খাটিয়ে পেটের সংস্থান করব! কালুর বৌ—তুমি আমার মা—ঠিক বলেছ তুমি,—একটা পেট শুধু—তার জন্মে ক'টা টাকারই বা দরকার যে অধর্ম্ম করব?

(অশ্রু-মোচন)

বিন্দু। আহা—ভালো হও যদি ত তোমারই তাতে ভালো, বাছা—আমাদের আর কি!

৩। কালু, একটু আগে তোকে আমি ছোট লোক বলছিলুম—কিন্তু না, তোর প্রাণ মহৎ, অতি মহৎ!

কালুর মা। আহা, বাছা কেঁদে ফেলেছে গো—

বিন্দু। মানুষের প্রাণ ত বটে মা!

যবনিকা

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

আর্য্য-নারীর প্রাচীন অবস্থা

বৈদিক যুগে আর্য্যনারীর সামাজিক অবস্থা এবং পদমর্য্যাদা কিরূপ ছিল, তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে হইলে স্ত্রীজাতি বুঝাইবার জন্য যে শব্দ ব্যবহৃত হইত, তাহার ব্যুৎপত্তি বিষয়ে আলোচনা করিবার প্রয়োজন আছে। নামে অনেক আসে যায়, —উহা তুচ্ছ জিনিস নয়; কারণ মনের ভাব হইতেই নামের সৃষ্টি, এবং সকল শব্দই অর্থের সহিত অচ্ছেদ্যরূপে যুক্ত। আশা করি, যাঁহারা প্রাচীন তত্ত্ব জানিতে চাহেন, তাঁহারা অল্প একটুখানি ব্যাকরণের বিচারে বিরাগ প্রদর্শন করিবেন না।

অতি প্রাচীনকালের বেদের ভাষার মধ্যে যাহা প্রাচীনতম বলিয়া অনুমিত হয় সেই ভাষায় স্ত্রীজাতির সাধারণ নাম ছিল "নারী"; এই নারী শব্দ "নর" শব্দের স্ত্রীলিঙ্গের রূপ নহে। যাঁহারা বৈদিক ভাষার পরবর্ত্তী সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত, তাঁহারা হয়ত এ কথা শুনিয়া বিস্মিত হইতে পারেন। নর শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে যে নারী হয় নাই, তাহার প্রথম প্রমাণ এই যে, নর শব্দটি সুপ্রাচীন বেদ-সংহিতায় প্রচলিত নাই; ঐ শব্দটি তৈত্তিরীয় সংহিতায়, শতপথ ব্রাহ্মণে এবং অন্যান্য বেদ-পরবর্ত্তী বৈদিক সাহিত্যেই পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপে পাঠকেরা ঋগ্বেদ (১, ২৫, ৫; ১৬৭, ২০; ১৭৮, ৩; ২, ৩৪, ৬; ৩, ১৬, ৪ ইত্যাদি) এবং অথর্ব্ব বেদ (২, ৯, ২; ৯, ১, ৩; ১৪, ২, ৯ ইত্যাদি) দেখিতে পারেন। নৃ শব্দের কর্ম্মকারকের "নর্-অম্" (নৃ+অম্=নরম্) কে পরবর্ত্তী সময়ে "নর-ম্" বলিয়া (ভুল করিয়াই হউক বা অন্য যে কারণেই হউক) যে নর শব্দ সৃষ্ট হইয়াছিল, প্রাচীন বেদে তাহার প্রচলন থাকিলে, সে সময়ের ব্যাকরণের হিসাবে উহার স্ত্রীলিঙ্গে "নরা" অথবা "নরী" শব্দ সিদ্ধ হইত,—"নারী" হইত না।

যে যুগে নর শব্দ ছিল না, কিন্তু নৃ শব্দ ছিল, সেই যুগেই স্ত্রীজাতি বুঝাইবার জন্য "নারী" শব্দের যথেষ্ট প্রচলন ছিল, এবং নিরুক্তকার ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ৯২ সূক্তের ৩য় ঋকের নারী শব্দ নেত্রী অর্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; এবং বৈদিক ব্যাকরণে সর্ব্বত্রই নারী শব্দ "নী" ধাতু হইতে নিষ্পন্ন করা হইয়াছে। কার্য্যবিশেষ পরিচালনে যেমন পুরুষের বিশেষত্ব ছিল, নারীজাতির তেমনই বিশেষত্ব ছিল। পরিবারের যে কার্য্য সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চালাইবার জন্য স্ত্রীজাতি নারী নামে আখ্যাত হইয়াছিলেন, সে কার্য্যের পরিচয় কথঞ্চিৎ পরবর্ত্তী "পুরং-ধি" শব্দ হইতে বুঝিতে পারা যায়। যাঁহারা পুরের বা গৃহের সকল কার্য্যই আপনাদের মনের মত করিয়া স্বাধীনভাবে চালাইতেন, তাঁহাদের নাম ছিল "পুরং-ধি"।

ঋগ্বেদাদির অতি প্রাচীন ভাষায় বিবাহিতা অবিবাহিতা-অভেদে কেবল জাতিমাত্র বুঝাইবার জন্য যেমন নারী নাম ছিল, তেমনি জাতি বুঝাইবার জন্য স্ত্রী শব্দেরও প্রচলন ছিল। ঋগ্বেদে (১, ১৬৪, ১৬; ৫, ৬১, ৮) স্ত্রী শব্দ

ঠিক্ নারীর মত সাধারণ জাতিবাচক পুমাংস্ শব্দের বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত। অথর্ব্ব বেদে (১২, ২, ৩৯) সর্ব্বপ্রথম জায়া বা পত্নী অর্থে স্ত্রীশব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়।

নারী ছিলেন পারিবারিক বিষয়ের নেত্রী; তিনি ভোগ-বিলাসের রমণী বা কামিনী ছিলেন না। রমণী, কামিনী প্রভৃতি অতি ঘৃণিত শব্দ বৈদিক যুগে সৃষ্টই হয় নাই। পুরুষেরা যে প্রকার আদর করিতে গিয়া নারীকে রমণী এবং কামিনী সংজ্ঞা দিয়াছিলেন, অর্ব্বাচীন যুগের সেই আদর হইতেই বুঝিতে পারি যে নারী তখন পুরুষের বিলাসের উপকরণ-রূপেই গৃহীত হইতেন, এবং পুরুষের সম্পত্তি মাত্র ছিলেন। বৈদিক ভাষায় রমণী শব্দ ছিল না, কিন্তু "রামা" শব্দের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই "রামা" শব্দের অর্থ ছিল বেশ্যা। একদিন যাঁহারা নেত্রী ছিলেন, তাঁহারাই পরবর্ত্তী সময়ে পতিতার নামে আদৃতা (?) হইয়াছিলেন। নারীরা বলিতে পারেন যে, ভগবান্ আমাদিগকে এই আদর হইতে রক্ষা করুন।

বৈদিক যুগের পরবর্ত্তীকালের সাহিত্যে দেখিতে পাই যে, স্ত্রীর আদরের সম্বোধনে "প্রেয়সী" শব্দের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। সে কাল হইতে এ কাল পর্য্যন্ত ঐ শব্দটি আমাদের সাহিত্যে খুবই প্রচলিত রহিয়াছে। এ কালে "প্রেয়সী" শব্দ যথার্থ আদরে এবং সম্মানে ব্যবহৃত হইতে পারে; কিন্তু ঐ শব্দটির উৎপত্তির যুগে উহার বড় ভাল অর্থ ছিল না। যাহা যথার্থ কল্যাণকর ছিল, তাহাই ছিল শ্রেয়স্; কিন্তু যাহা মানুষকে শ্রেয়ঃ হইতে দূরে লইয়া যাইত, অথচ তৃপ্তিদায়ক ও মধুর ছিল, সেই বিপথ গমনের যাহা সহায়স্বরূপ ছিল, তাহারই নাম ছিল প্রেয়স্। এই "শ্রেয়স্-বিরোধী" প্রেয়স্ কথার স্ত্রীলিঙ্গে হইয়াছে প্রেয়সী। নারী যখন ধর্ম্মপথের বাধা, মুক্তির বাধা এবং মারের সহচরী হইলেন, তখনই তিনি প্রেয়সী বলিয়া আদৃতা হইতে লাগিলেন। এখানেই ব্যাকরণের কচকচি শেষ করিলাম।

এ কালে ব্রাহ্মণপত্নীরাও শূদ্রার ন্যায় ব্যবহৃতা হইয়া থাকেন; তাঁহারা স্বগৃহে প্রতিষ্ঠিত দেববিগ্রহকে স্পর্শ করিতে পারেন না, এবং তাঁহার পূজায় নিযুক্ত হইতে পারেন না; বেদপাঠেও তাঁহাদের অধিকার নাই। বৈদিক যুগে পত্নী অর্থই ছিল যজ্ঞাদিতে অধিকারপ্রাপ্তা জায়া। কেবল যে এই অধিকারেরই ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে, তাহা নহে; নারী যে ঋষি হইতেন, মন্ত্ররচয়িত্রী হইতেন, এবং নিজে স্বতন্ত্রভাবে দেবতাকে তৃপ্ত করিতে পারিতেন, ইহারও অনেক দৃষ্টান্ত আছে। বিশ্ববারা (ঋ ৫, ২৮) প্রভৃতি নারী-ঋষির কথা, ঘোষা প্রভৃতি রমণীর স্বাধীন ধর্ম্মযাজনের কথা এ দেশের অনেক সহজলভ্য সাহিত্যেই বিচারিত হইয়াছে; কাজেই ঐ কথা লইয়া অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই।

হইতে পারে যে, যে-সময়ে সমাজে বাহ্যসম্পদ খুব অধিক হয় না, সে সময়ে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই অনেক কষ্টসাধ্য কার্য্য অনায়াসে করিতে পারেন; কিন্তু কষ্টসাধ্য কথার বিচার পরিত্যাগ করিয়া কেবল অধিকারের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাই যে, প্রাচীন বৈদিক যুগে আর্য্যনারীর

পক্ষে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়াও দোষের বলিয়া বিবেচিত হইত না। নারী বিশ্‌পলার উপাখ্যানে পাই (ঋ ১, ১১৬, ১৫ ইত্যাদি) যে যুদ্ধ করিতে গিয়া তাঁহার একখানি পা কাটিয়া গিয়াছিল, এবং দেব অশ্বীদ্বয় তাঁহার লৌহজঙ্ঘা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। আমাদের কোমলা অবলারা খাঁটি ননীর পুতুল হইলেই আমাদের আদর্শের মত হয়; কিন্তু ঋগ্বেদের দিনের নারীরা ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাইতেন না। দ্রুতগমনের বিশেষ দৃষ্টান্ত দিবার জন্য ঋগ্বেদে (১, ৫৬, ২) উল্লিখিত হইয়াছে যে স্ত্রীলোকেরা যেমন দ্রুতপদে পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া পুষ্পচয়ন করেন, স্তোত্রসাহায্যে স্তোতাও সেইরূপ দ্রুতপদে ইন্দ্রের স্বর্গে আরোহণ করুন। কথায় কথায় যাহা সাধারণ দৃষ্টান্তরূপে প্রযুক্ত হইত, তাহা সাধারণ ভাবেই প্রচলিত ছিল বলিয়া ধরিতে হইবে। আমি একদিন যখন দার্জিলিং-এর সিন্‌চল পাহাড়ে উঠিতে গিয়া শ্রান্তিবোধ করিতেছিলাম, এবং দুইজন ইউরোপীয় রমণীকে দ্রুতপদে উপরে উঠিতে দেখিয়াছিলাম, তখন এই বৈদিক শ্লোকের কথা মনে পড়িয়াছিল।

বৈদিক যুগে যে বাল্যবিবাহ ছিল না এবং আর্য্যনারীরা যে ইচ্ছা মত অধিক বয়সে বিবাহ করিতে পারিতেন এবং ইচ্ছা করিলে চিরকাল কুমারী থাকিতে পারিতেন, ঋগ্বেদে এবং অথর্ব্ব বেদে ইহার শত শত দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। বহু পরবর্ত্তীকাল পর্য্যন্তও যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহা অনায়াসে প্রমাণিত হয়। সকলেই জানেন যে পূর্ব্ব কালের স্মৃতির বিধানে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদির কাহারও "গোদান" নামক সংস্কার না হওয়া পর্য্যন্ত কদাচ বিবাহ হইতে পারিত না। বৈদিক ভাষায় গোদান শব্দটির অর্থই হইল দাড়ি গোঁফ; দাড়ি-গোঁফ উঠিবার পরের সংস্কারটি কখনও পুরুষের পক্ষে অল্প বয়সে হইতে পারিত না। বিবাহবিষয়ক অনুষ্ঠান সম্বন্ধে গৃহ্যসূত্রাদিতে যে সকল বর্ণনা আছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে বয়ঃপ্রাপ্তা কুমারী ভিন্ন সে অনুষ্ঠান সম্পাদিত হওয়া অসম্ভব ছিল। যাহা হউক, এ প্রবন্ধে কেবল বৈদিক যুগের কথাই বলিব।

খাঁটি বৈদিক ভাষায় "বর" অর্থই হইল wooer। বয়স্কা পত্নীসংগ্রহ করিতে হইলেই যে পুরুষকে বর হইতে হয়, তাহা বুঝাইয়া দিতে হইবে না। কুমারীকে বিবাহের জন্য বশ করিতে হইলে যে মন্ত্র দেবতার কাছে পাঠ করিতে হয়, তাহা ঋগ্বেদে (৭, ৫৫, ৫ ও ৮) উল্লিখিত আছে,—অথর্ব্ব বেদে ত আছেই।

বৈদিক যুগে বিধবার বিবাহের প্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু এই বিবাহ দেবর অথবা পতির নিকটসম্পর্কিত কোন ব্যক্তির সঙ্গে হইত বলিয়া ধরিতে পারা যায়। পরবর্ত্তী যুগের ধর্ম্মশাস্ত্রেও কোন্ কোন্ স্থলে বিধবা বিবাহ হইতে পারে, তাহা বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

বেদে এবং বৈদিক সাহিত্যে ঋষিদিগের পারিবারিক জীবনের যতটুকু আভাষ পাওয়া যায়, তাহাতে এক পত্নী-গ্রহণই সাধারণ ব্যবহারে প্রচলিত ছিল এবং আদর্শ ছিল বলিয়া মনে হয়। নাম করিয়া ধরিতে গেলে যেমন যাজ্ঞবল্ক্যের দুইটি পত্নীর কথা পাওয়া

যায়, সকল স্থলেই সেরূপ প্রমাণ পাওয়া না গেলেও কোন কোন স্থলে ঋষিদিগের যে বহু পত্নী থাকিত, তাহা পত্নীপর্য্যায়ের বিশেষ বিশেষ নাম হইতে অনুমিত হয়। মৈত্রায়ণী সংহিতায় লিখিত আছে যে মনুর নাকি দশটি পত্নী ছিলেন। পত্নীপর্য্যায়ের যে বিশেষ বিশেষ নামের কথা বলিলাম, উহা রাজপত্নীদিগের কথাতেই দেখিতে পাই। রাজার যে পত্নী প্রথম পুত্রবতী হইতেন, সেই পত্নীর নাম হইতে "মহিষী"; দ্বিতীয়া পত্নীর নাম হইতে "পরিবৃক্তী"; তৃতীয়ার নাম হইত "বাবাতা" এবং চতুর্থীর নাম ছিল "পালাগলী", ইহা হইতে চারিটি পর্য্যন্ত বিবাহ বেশ বুঝিতে পারা গেল। সেণ্টপিটার্সবর্গ অভিধানে "পরিবৃক্তী"র অর্থ the neglected বলিয়া লিখিত হইয়াছে। মহিষী না হইয়াও যিনি "সুয়োরাণী" হইতেন, তাঁহার নাম হইত বাবাতা। কোন কোষ-গ্রন্থেই "পালাগলী" শব্দের অর্থ পাওয়া গেল না। কোন রাজকর্ম্মচারীব কন্যা রাজার সহিত বিবাহিতা হইলে যে "পালাগলী" নাম পাইতেন, Weberএর এই অনুমান কোন্ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা জানি না। ব্রাহ্মণের বহু পত্নী থাকিলে প্রথমটিই খাঁটি পত্নীপদবাচ্য হইতেন, এবং তিনিই যজ্ঞে অধিকারিণী হইতেন। প্রথমা স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে পুত্রবতী অন্য কোন ভার্য্যা পত্নীসংজ্ঞা লাভ করিতেন। পত্নী ব্যতীত অন্য বিবাহিতা স্ত্রীরা কেবল জায়া নামে আখ্যাতা হইতেন।

পতি-পত্নীর সম্বন্ধ যে অতি পবিত্র ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা টেনিসনের Princess কাব্যে যখন পড়িতে পাই যে স্ত্রী ব্যতীত পুরুষ অর্দ্ধেক এবং পুরুষ ব্যতীত স্ত্রী অর্দ্ধেক মানুষ মাত্র, এবং উভয়ের সংযোগেই পূর্ণ মনুষ্যত্ব সৃষ্ট হয়, তখন উহাকে উচ্চ ভাব বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকি। পতি-পত্নীর সম্বন্ধের বিচারে এবং প্রাচীন যুগের বিবাহের মন্ত্রে দেখিতে পাই যে খাঁটি ঐ ভাবটি এ দেশে বহুকাল পূর্ব্বে পরিস্ফুট হইয়াছিল। স্ত্রী তাহার স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গ (শতপথ ব্রাহ্মণ ৫, ২, – ১, ১০) এবং স্ত্রী ব্যতীত পুরুষ অসম্পূর্ণ, এবং স্ত্রীপুরুষের সংযোগেই মনুষ্যত্বের পূর্ণতাবিধান (বৃহদারণ্যক ১, ৪, ১৭), ইহাই ছিল প্রাচীনকালের আদর্শ। "বরুণপ্রঘাস" নামক যাজ্ঞিক অনুষ্ঠান লক্ষ্য করিয়া একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, বৈদিক যুগে পতিরা পত্নীদিগের চরিত্রের পবিত্রতার প্রতি বড় লক্ষ্য করিতেন না। কথাটি বড়ই ভুল। অনুষ্ঠানটি এই যে, বরুণপ্রঘাস যজ্ঞবিধির সময় পতি পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিতেন, বিবাহের পূর্ব্বে তাঁহার কোন জার ছিল কিনা। যদি কোন জার ছিল, তাহা হইলে তাহা তাঁহাকে বলিতে হইবে। ইহাতে এই মাত্র সূচিত হয় যে, সদাচার-সম্পন্না হইলে দেবতা সমক্ষে পূর্ব্বের অপরাধের ক্ষমা হইত; কিন্তু চরিত্রের চপলতা আদৃত বা উপেক্ষিত হইত না।

কুমারী অবস্থায় নারী নিজে যাহা উপার্জ্জন করিতেন, এবং বিবাহের পর তিনি যে সকল উপহার প্রাপ্ত হইতেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার নিজের সম্পত্তি ছিল, এবং তিনি সেই সম্পত্তি যথেচ্ছভাবে হস্তান্তরিত করিতে পারিতেন। নারীরা যখন মন্ত্র রচনা করিতে পারিতেন, তখন তাঁহাদের সুশিক্ষার অভাব

ছিল, এ কথা বলা চলে না। নারীরা সকলেই যে নৃত্য এবং গীত শিক্ষা করিতেন, ইহা ঋক্ এবং অথর্ব্ব বেদের অনেক সূক্ত হইতেই বুঝিতে পারা যায়। নারীরা যেমন পেশস্ নামক কারুকার্য্যখচিত বস্ত্র পরিয়া নৃত্য করিয়া থাকেন, দেবদুহিতা উষা তেমনি ভাবে নৃত্য করেন বলিয়া ঋগ্বেদে উল্লিখিত আছে।

বৈদিক যুগে পুত্রকন্যাদিগের নিকট মাতার সম্মান বড় অধিক ছিল। মাতাকে বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রের অধীনে থাকিতে হইবে, পরবর্ত্তী যুগের শাস্ত্রকারদিগের এই নির্দ্দেশ খাঁটি বৈদিক যুগে পাওয়া যায় না। তবে কোন পরিবারে বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ না থাকিলে ভগিনীকে ভ্রাতার রক্ষণাধীনে থাকিতে হইত; ভ্রাতা না থাকিলে "ভ্রাতৃব্যেরা"ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিতেন। ইচ্ছা করিয়া বৈদিক যুগের ভ্রাতৃব্য শব্দটি ব্যবহার করিলাম। এ যুগে Cousin অর্থজ্ঞাপক কোন শব্দ প্রচলিত নাই বলিয়া বৈদিক ভাষার ভ্রাতৃব্য কথাটির প্রচলন করিতে ইচ্ছা করিতেছি।

সত্য যুগের কথা হইলেও বৈদিক যুগে পতিতা রমণী ছিল, এবং তাহারা বড় বড় ঋষিদিগেরও অস্পৃশ্যা ছিল, এ কথা বলা চলে না। পতিতারা বিশ্ বা আর্য্যশ্রেণীর লোকসাধারণের ভোগ্য ছিল বলিয়া তাহাদের নাম হইয়াছিল "বিশ্যা"। শব্দটির ব্যুৎপত্তির কথা বিস্মৃত হওয়াতে সংস্কৃত ভাষায় বৈদিক শব্দের ই-কার স্থানে এ-কার হইয়া গিয়াছিল। বিশ্যার অন্য নাম ছিল "রামা" এবং "ন-গ্না", "গ্না" শব্দের অর্থ প্রথমে ছিল সম্মানিতা মহিলা, এবং পরে অর্থ হইয়াছিল দেব-পত্নী। যাহাদিগের পক্ষে গ্না হওয়া সম্ভব ছিল না, তাহারাই হইত ন-গ্না। কালক্রমে ব্যবহারের নির্লজ্জতার হিসাবে নগ্না অর্থ লজ্জাহীনা হইয়াছিল, এবং ঐ শব্দের একটি পুংবাচক নূতন শব্দ সৃষ্টি হইয়া পরিচ্ছদশূন্য অর্থে "নগ্ন" শব্দ রচিত হইয়াছিল।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

প্রতিহত

কোথায় চলেছে ভাসি তরণী তোমার, তরঙ্গ বিপুল
নীল ক্ষুব্ধ পারাবারে, নিত্য প্রবাহিত আবর্ত্তসঙ্কুল
রহস্যের বক্ষ বিদারিয়া, মত্ত সমীরণ কাণে কাণে
জানায় সেথায় কোন্ অজানার আশা, আকুল পরাণে
তীক্ষ্ণ স্বরে সমুদ্রের পাখী, বেদনার কোন্ আবেদন
বহিছে নিয়ত? হিল্লোল কল্লোলে হায় কেন প্রলোভন?
বর্ষা গেছে নিয়ে তার উদ্দাম পবন, নিয়ত আক্রোশ;
নীলাকাশ নীলপদ্মসম, পূর্ণতার প্রতি বীজকোষ
শরতের সুবর্ণ কিরণে, শুভ্রজ্যোৎস্না, পুণ্য বিভাবরী,
ভক্তি-মৌন শেফালিকা, তরুমূলে হেথা পড়িতেছে ঝরি
প্রসন্ন উষায়, ধীরে আসে হিমবায়ু উদাসীর মত,
শ্রান্ত জীবনের মোর সর্ব্ব ব্যাকুলতা, শান্ত প্রতিহত।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

"বিন্দি, এখনো জল আনতে যাসনি যে।"   (৬৩৫ পৃঃ)

শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার অঙ্কিত চিত্র হইতে

বিন্দু

পরাণ মণ্ডলের বিধবা ভগিনী বিন্দু সে দিন তাহার ভোরের কাজ—ছড়া, ঝাঁট, ঘর-নিকানো প্রভৃতি সারিয়া পুকুর হইতে জল আনিতে যাইবার জন্য ঝাঁপ সরাইয়া যেমন বাহির হইবে অমনি দেখিল তাহাদের গ্রামের হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া নিতাইটা বাড়ির বাহির হইবার সমস্ত পথ জুড়িয়া বেহুঁস অবস্থায় পড়িয়া আছে। কেমন করিয়া বাহির হয় ঠিক করিতে না পারিয়া বিন্দু থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

নিতাই পড়িয়াছিল ঠিক একেবারে মড়ার মতো। তাহার পাণ্ডুর মুখের উপর ঘুমন্ত ভোরবেলার ছমছমে আলো পড়িয়া আসন্ন মৃত্যুর চিহ্নকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছিল। তাহার সমস্ত দেহ কাদায় ভরা;—স্থানে স্থানে খোঁচা লাগিয়া শুষ্ক রক্তের দাগ ফুটিয়া উঠিয়াছে। শরীরময় এত যন্ত্রণার চিহ্ন যে মনে হয় শরীরের উপর তাহার এতটুকু মায়া নাই—শরীর কাটিয়া উড়িয়া যাক, পুড়িয়া আঙার হইয়া যাক তাহাতে সে ভয়ও করে না, গ্রাহ্যও করে না।

বিন্দু যে আজ এই প্রথম নিতাইকে এই অবস্থায় দেখিল তাহা নহে—সে তাহাকে অনেকবার তাহাদের দরজার সামনে এমনি করিয়া পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছে। কিন্তু আজ একটু বেশী-রকম বলিয়া মনে হইল। অন্যদিন তাহার গায়ে এত ধুলা কাদা থাকে না, এত রক্তের চিহ্নও দেখা যায় না;—মুখখানাও তো অত পাংশু বলিয়া মনে হয় না! অন্যদিন সে যখন "নিতাই ওঠো" বলিয়া তাহাকে সরিতে বলে, সে তখনই উঠিয়া বসে, কিন্তু আজ এত ডাকেও যে সে সাড়া দিতেছে না!

বিন্দুর আর জল আনিতে যাওয়া হইল না—একটা পুরুষ মানুষকে ডিঙাইয়া সে কেমন করিয়া যায়! কাজেই কলসীটি রাখিয়া সে দাওয়ার উপর আসিয়া চুপ করিয়া বসিল। তাহার দাদা তখনও উঠে নাই;—দাদার ওঠা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া বিন্দু দাওয়ার অন্ধকার কোণটি ঘেঁসিয়া বসিয়া রহিল।

একলাটি চুপ করিয়া বসিয়া তাহার কেবলই মনে উঠিতেছিল এই নিতায়ের কথা। ছেলেবেলাকার সব কথা তাহার ঠিক স্পষ্ট মনে পড়িতেছিল না—অনেক স্মৃতিই আবছায়ার মতো অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছিল; কিন্তু নিতাই সম্বন্ধে যে কতকগুলা খুঁটিনাটি সে গুলাকে সে মন হইতে কিছুতেই দূর করিতে পারিতেছিল না।

(২)

নিতাই যখন সর্ব্ব-প্রথম গ্রামে আসে তখন তাহার বয়স ছয়মাস। তখন অবশ্যই তাহার এ নাম ছিল না;—পরম বৈষ্ণব বৃদ্ধ রসিকমোহন পরকালে সদ্গতির আকাঙ্ক্ষা করিয়া তাহার এই নাম রাখিয়াছিল। নিতাই এ গ্রামের ছেলে নয়। রসিকমোহন তীর্থ হইতে এই অনাথ শিশুটিকে কুড়াইয়া

আনে। ছেলেটিকে সঙ্গে লইয়া তাহার মা বাপ তীর্থ করিতে গিয়াছিল, কি-একটা সংক্রামক রোগে দুইজনেই একদিনে মারা যায়;—ছেলেটি রাস্তায় পড়িয়া কাঁদিতে থাকে—কেহ তাহার দিকে ফিরিয়াও তাকায় নাই। রসিকমোহন দেখিতে পাইয়া সমস্ত পথ বুকে করিয়া তাহাকে গ্রামে লইয়া আসে। সেই অবধি সে এইখানে।

রসিক একলা মানুষ। সংসারে তাহার স্ত্রী পুত্র কেহই নাই—তাহাতে সে বুড়া হইয়াছে। কেমন করিয়া এই ছয় মাসের শিশুটিকে সে মানুষ করে? কাজেই তাহাকে প্রতিবাসীদের শরণাপন্ন হইতে হইল। কিন্তু ছেলেটিকে ঘরে স্থান দেওয়া দূরে থাকুক রসিমোহনের হঠকারিতার জন্য গ্রাম-শুদ্ধ লোক তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। সকলেই বলিল—কাহার ছেলে, কোন্ জাতের ছেলে তার ঠিক নাই; শেষে কি অজাতের ছেলে একটা ঘরে পুষিয়া মহাপাতক হইবে! বৃদ্ধ রসিকমোহন ছেলেটিকে বুকে করিয়া দ্বারে দ্বারে ফিরিয়াও কোনো পিতার প্রাণে এই হতভাগ্য সন্তানের উপর পিতৃস্নেহ, কোনো মাতার প্রাণে মাতৃস্নেহ জাগাইয়া তুলিতে পারিল না। বাপপিতামহের সনাতন ধর্ম্মজ্ঞান জাগ্রত হইয়া উঠিয়া শিশুর মুখ হইতে মাতৃস্তন্যটুকু পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইতে দ্বিধা করিল না।

হতভাগ্য নিতাই তাহার জীবনের এই প্রথম উষায় গ্রামবাসীদের নিকট হইতে যে নির্দ্দয় প্রত্যাখ্যান পাইয়াছিল, ভবিষ্যতে কখনো আর তাহার প্রত্যাহরণ হয় নাই। গ্রামের মধ্যে বাস করিয়াও সে গ্রামের কেহ ছিল না। গ্রামের কোনো কাজের মধ্যেই তাহার স্থান ছিল না; কোনো আমোদ প্রমোদে, কোনো উৎসবে তাহার ডাক পড়িত না। এমন কি, শোকের সময়, বিশেষ আবশ্যক হইলেও, কেহ তাহার কথা তুলিত না।

(৩)

দাওয়ার উপর বসিয়া বিন্দুর মনে পড়িতেছিল তাহার শৈশবের কথা। সে আর নিতাই প্রায় সমবয়সী। সে যখন তাহার খেলার সঙ্গীদের লইয়া পাকুড়-গাছের তলায় ঠিক-দুপুর বেলাটিতে পুতুল খেলায় মগ্ন থাকিত, তখন এই নির্ব্বাসিত নিতাই একলাটি ম্লান মুখে দূরে দাঁড়াইয়া তাহাদের খেলা দেখিত। তাহার সঙ্গীরা নিতাইকে শাসাইত, খবরদার সে যেন তাহাদের খেলাঘরের ভিতর না আসে! একটা খোলামকুচি দিয়া তাহারা গণ্ডী কাটিয়া দিত এবং চীৎকার করিয়া নিতাইকে শুনাইয়া রাখিত যে এই গণ্ডীর ভিতর প্রবেশ করিলে নিতাইয়ের কিছুতেই নিস্তার থাকিবে না। নিতাই প্রথম প্রথম এ সমস্ত শাসন মাথা পাতিয়া মানিয়া লইত—কিন্তু পরে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিত; তারপর শেষে এক একদিন হঠাৎ ঝড়ের মতো আসিয়া, চকিতের মধ্যে সমস্ত খেলা লণ্ডভণ্ড করিয়া দিয়া ছুটিয়া পালাইত।

নিতাইকে বিন্দু দূরে দূরেই দেখিত; কিন্তু একদিন তাহাকে খুব কাছেই পাইয়াছিল। সে দিন তাহার খেলার সঙ্গী কেহই ছিল না;—সকলেই জ্বরে পড়িয়াছিল। বিন্দু পাকুড়তলায় একলাটি বসিয়া কচি খেজুর

পাতার একটা মুকুট গড়িতেছিল। সেটা শেষ হইয়া আসিয়াছে এমন সময় হঠাৎ কোথা হইতে নিতাই আসিয়া বলিল— "ভাই, আমার সঙ্গে খেলবি?"

বিন্দু তখনই রাজী হইয়া গেল।

সে দিন তাহাদের দুপুর বেলাটা বড় আনন্দেই কাটিয়াছিল। নিতাইয়ের স্ফূর্ত্তি দেখে কে! বিন্দুও এত আনন্দ কোনো দিন কাহারো সহিত খেলায় পায় নাই। সে নিতাইকে যখনই যাহা বলিয়াছে নিতাই তখনই তাহা করিয়াছে; সে যাহা চাহিয়াছে নিতাই তৎক্ষণাৎ তাহা আনিয়া দিয়াছে। কোনো-কিছু লইয়া এতটুকু মনান্তরও হয় নাই—মতান্তরও হয় নাই। ধূলার ঘরকন্না সেদিন জমিয়া উঠিয়াছিল খুব—বিন্দুর ভাগ্যে আসল ঘরকন্না এমন করিয়া জমে নাই কোনো দিন। তারপর খেলা শেষ হইলে নিতাই যখন চাহিয়া বসিল—"ভাই! আমাকে ঐ মুকুটটা দিবি?" তখন বিন্দু অকুণ্ঠিত চিত্তে তাহা দিয়া ফেলিল। তাহার মনে হইয়াছিল, মুকুট গড়াটা যেন সার্থক হইয়া গেল।

পরের দিনও আবার এমনি করিয়া আসিয়া নিতাইয়ের সহিত খেলিবে বলিয়া বিন্দু কথা দিয়াছিল বটে, কিন্তু ভারি আপশোস যে সে কথা রক্ষা হয় নাই;—কোথা হইতে জ্বর আসিয়া সে রাত্রে তাহাকেও আক্রমণ করে!

তাহার পর, বিন্দু সুস্থ হইয়া উঠিয়া নিতাইকে অনেকবার দেখিয়াছে, কিন্তু দূরে দূরে। তাহাদের খেলার গণ্ডীর ভিতর সে আর স্থান পায় নাই। তাহার সঙ্গীরা নিতাইকে কিছুতেই কাছে ঘেঁসিতে দিত না। নিতাই ছল্‌ছল্‌ নয়নে দূরে দাঁড়াইয়া থাকিত—বিন্দুর দিকে কেমন এক রকম কাতর দৃষ্টিতে চাহিত, তাহাতে বিন্দুর বড় মায়া করিত।

খেলাঘর ভাঙিয়া যে দিন বিন্দু শ্বশুর ঘরের জন্য যাত্রা করে—সেদিনে তাহাকে নৌকায় তুলিয়া দিবার জন্য গ্রামশুদ্ধ লোক যখন ঘাটে আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল তখন সে ভিড়ের মধ্যে নিতাই ছিল না বটে, কিন্তু দূরে অশথ গাছের আড়ালে তাহার মূর্ত্তি দেখা গিয়াছিল;—সে বিন্দুর দিকে এক-দৃষ্টে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বিন্দু প্রথমে তাহাকে দেখিতে পায় নাই—তারপর, নৌকা যখন ছাড়িয়া দিল, বিদায়ের অশ্রুজলে তাহার চোখ যখন ঝাপসা হইয়া আসিল, তখন তাহার সেই ঝাপসা-চোখের কুহেলিকার ভিতর দিয়া নিতাই তাহার সামনে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। নৌকা ছাড়িয়া দিতে যে যাহার ঘরে ফিরিয়া গেল, কিন্তু যতক্ষণ দৃষ্টি চলে বিন্দু দেখিয়াছিল, নিতাই স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

তারপর বহুদিন পরে যেদিন সিঁথির সিঁদুর মুছিয়া, অঙ্গের আভরণ খুলিয়া, শোকাশ্রু মুছিতে মুছিতে বিন্দু পিতৃগৃহে ফিরিতেছিল সেদিনও নিতাইয়ের করুণাভরা দৃষ্টি তাহাকে প্রথম সমবেদনা জানাইয়াছিল। সেদিন বিন্দু দেখিয়াছিল, গ্রাম হইতে দুই ক্রোশ পথ দূরে নদীর ধারে তাহারই প্রতীক্ষায় নিতাই একা চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

দাওয়ার উপর বসিয়া থাকিতে থাকিতে

বিন্দুর মনের উপর দিয়া এই কথাগুলাই আজ কেবল যাওয়া-আসা করিতেছিল। নিতাই সম্বন্ধে যেখানে যতটুকু স্মৃতি ছিল সমস্তই যেন আজ জাগরিত হইয়া উঠিয়াছে!—মনের গোপন কুঠুরির মধ্যে যাহা চাবি-বন্ধ ছিল আজ যেন তাহা কেমন-করিয়া খোলা পাইয়া সবেগে বাহির হইয়া আসিয়াছে!—তাহাদের লইয়া বিন্দু সামলাইয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

(৪)

রসিকমোহন যতদিন বাঁচিয়াছিল ততদিন প্রতিবাসীদের সমস্ত অনাদরের লাঞ্ছনা হইতে দূরে রাখিয়া নিতাইকে নিজের স্নেহনীড়ের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। তাহার মৃত্যুর পর হইতেই নিতাই বিশেষ করিয়া বুঝিতে পারিল তাহার নিজের অবস্থাটা কিরূপ। তাহার মনে হইত, সে যেন ধূলাকাদা মাখা পথের কুকুরের মতো, দ্বারে দ্বারে প্রতাড়িত হইয়া, ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। গ্রামের আর-সব মানুষের পরস্পরের মধ্যে যে অধিকার আছে, দাবী আছে তাহা নিতাইয়েরও নিজস্ব মনে করিয়া সে প্রথম প্রথম অম্লান চিত্তে সকলকার মধ্যে একজন হইয়া বসিতে চাহিত; কিন্তু কেহ তাহাকে আমোল দিত না—তাড়াইয়া দিত। এমনি করিয়া একদিন নয়, দুইদিন নয়—প্রতিদিন অস্পৃশ্য জন্তুর মতো তাড়না খাইয়া খাইয়া সে এমনি মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল যে নিজের ভালো-মন্দের দিকে দৃষ্টি রাখার সে কোনো দরকার দেখিত না। সে যাহা খুসী তাহাই করিত;—ভবিষ্যতের কথা না ভাবিয়া রসিকমোহনের বহুকষ্টে সঞ্চিত অর্থ সে জলের মতো খরচ করিয়া দিত। সমস্ত দিন মদ খাইয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইত;—তারপর যখন চৈতন্য লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিত, তখন পথের উপর মুখ গুঁজড়াইয়া পড়িত।

এই একলা, একান্ত নিঃসঙ্গ জীবন;—কাহারো কাছে দুঃখ জানাইবার নাই, সুখের কথা শুনিবারও কেহ নাই;—কেহ একটু স্নেহ করে না, আদর দেয় না, ভালোবাসা দেয় না—তাহার হিতের জন্য কেহ আসিয়া দুটো তিরস্কারও করিয়া যায় না—কেবল তাচ্ছিল্য আর তাচ্ছিল্য! তবে তাহার এ অনাদৃত জীবন সে জাগ্রত রাখিবে কিসের জন্য?—কোন্ সুখে? তাই সে তাহার সমস্ত অস্তিত্বটাকে মাদকতার বিস্মৃতির মধ্যে ডুবাইয়া দিতেছিল। যখনই একটু জ্ঞানের উন্মেষ হইত তখনই তাহা চাপা দিত। এমনি করিতে করিতে তাহার নেশার মাত্রা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছিল। শেষে এমন হইবার উপক্রম হইতেছিল যে, কোন্ দিন বা এই নেশার মধ্যেই সে চিরদিনের মতো তলাইয়া যায়!

যখন তাহার এমন অবস্থা হইত যে তাহার মনে হইত বুঝি বা তাহার অন্তিম কাল উপস্থিত, তখন সে কি জানি-কেন তাহার অবসন্ন দেহটাকে গভীর রাত্রের অন্ধকারের মধ্য দিয়া কোনো-রকমে বহন করিয়া বিন্দুর বাড়ির ঠিক সামনেটিতে আসিয়া পড়িয়া থাকিত। বিন্দু ভোরবেলা জল আনিতে যাইবার সময় যেমন বলিত—"নিতাই সর!" অমনি সে বিন্দুর মুখের পানে

একবার চাহিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া চলিয়া যাইত।

(৫)

বিন্দুর দাদা পরাণ মণ্ডল শয়ন ঘর হইতে বাহির হইয়া বিন্দুকে দাওয়ায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেল। সে বলিল —"বিন্দি, এখনো জল আন্‌তে যাস্‌নি যে!"

বিন্দু বলিল—"কেমন করে যাই দাদা! নিতাই যে পথ আগ্‌লে পড়ে!"

নিতাইয়ের নাম শুনিয়া পরাণ অধিকতর বিস্মিত হইল। তার পর যখন বাহিরে গিয়া নিতাইয়ের মূর্ত্তি দেখিল তখন রাগে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল। "হতভাগা লক্ষীছাড়াটা এইখেনে এসে মরেছে!" বলিয়া পরাণ চীৎকার করিতে লাগিল। কিন্তু সে চীৎকারে নিতাইয়ের কোনো হুঁস দেখা গেল না;—সে যেমন পড়িয়াছিল তেমনি পড়িয়া রহিল। তাহাতে পরাণ আরো রাগিয়া উঠিল। "দেখেচ বেটার নবাবী। এত চীৎকার করচি তবু কোনো খেয়াল নেই।" বলিয়া সে রাগে গস্ গস্ করিতে লাগিল।

পরাণ মণ্ডল যখন দেখিল যে নিতাইয়ের আপনা হইতে উঠিয়া যাইবার কোনো সম্ভাবনা নাই--এদিকে বেলাও ক্রমে বাড়িয়া উঠিতেছে, তখন সে চিন্তিত হইয়া গ্রামের সকলকার সহিত পরামর্শ করিতে গেল। শেষে কি বাড়ির সামনে পড়িয়া লোকটা মরিবে! মরিতে হয় তাহার নিজের ঘরের মধ্যে মরিয়া পচুক—ভালো মানুষের দুয়ারে কেন! অজাতের মড়া ছুঁইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবে কে! জ্বালা এ আপদ!

সকলকার পরামর্শ মতে গ্রামের ডোমপাড়া হইতে জনকয়েক ডোম সংগ্রহ করিয়া আনিয়া তাহাদের সাহায্যে জ্ঞানশূন্য নিতাইকে উঠাইয়া তাহার নিজের বাড়িতে পাঠাইয়া দিয়া পরাণ নিশ্চিন্ত হইল।

গ্রামের মধ্যে যে যাহার আপনার আপনার লইয়াই ব্যস্ত। সমস্ত দিনের মধ্যে নিতাইয়ের কথা কেহ একবার তুলিলও না। সকাল বেলা অজ্ঞান অবস্থায় নিতাইকে দেখিয়া বিন্দুর একটু ভাবনা হইয়াছিল—তার পর সমস্ত দিনটা চলিয়া যায়, আর কোনো খবর না পাইয়া সে ভারি উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিতেছিল। যেখানে শোনে কোনো কথা হইতেছে অমনি বিন্দু কান খাড়া করিয়া তোলে, কিন্তু কোথা হইতেও নিতাই সম্বন্ধে এতটুকু খবর পাওয়া গেল না।

বিন্দু ভা'বতেছিল, আহা বেচারা, একটু শুশ্রূষার অভাবে মারা যাইবে! একটা প্রাণ কি এতই তুচ্ছ!

কিন্তু সে কী করিবে! সে যে মেয়েমানুষ—সে যে বিধবা!

নিতাই ভালো আছে—এই সংবাদটুকু পাইলেই বিন্দু নিশ্চিন্ত হইতে পারে, কিন্তু এ সংবাদ কে তাহাকে আনিয়া দেয়? সে মুখ ফুটিয়া তো কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে পারে না। তবে সে কী করে! বিন্দু হতাশ হইয়া সমস্ত দিন ভিতরে ভিতরে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। অনেকবার মনে মনে বলিল—দূর হোক গে ছাই! পরের জন্য আমার এত ভাবনা কেন? কিন্তু মন এই তাচ্ছিল্য ভাবটাকে তাচ্ছিল্য করিয়াই উড়াইয়া

দিল।—সমস্ত দিনের কাজ-কর্ম্মের মধ্যে নিতাইয়ের চিন্তাটা জোর করিয়া কেবলই ফুটিয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

এক একবার মনে হয়, নিতাই বোধ হয় এতক্ষণে সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই মনে-হওয়াটার উপর নির্ভর করিয়া সে নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছে কৈ! মন যাহা বিশ্বাস করিতে পারে এমন একটা পাকা খবর পাওয়া যে দরকার!

যতই দিনের আলো শেষ হইয়া আসিতে লাগিল বিন্দুর ভাবনা ততই জমাট বাঁধিয়া উঠিতে লাগিল। নিতাইয়ের চিন্তাটা তাহাকে এমন করিয়া পাইয়া বসিল কেন তাহা বিন্দু কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছিল না—সে তো তাহার কেউই নয়, তবে তাহার জন্য এমন করিয়া সে ভাবিয়া মরিতেছে কেন?

বিন্দুর চোখের সামনে কেবলই জাগিয়া উঠিতেছিল নিতাইয়ের সকালবেলাকার সেই বিবর্ণ,—জর্জ্জরিত মূর্ত্তি। যতই সে মূর্ত্তি মনে পড়িতেছিল ততই তাহার হৃদয় করুণায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল এবং এই করুণাকে আশ্রয় করিয়া একটা নূতনতর চেতনা তাহার অন্তরের মধ্যে একটু একটু করিয়া ফুলের মতো বিকশিত হইয়া উঠিতেছিল। বিন্দু যে সেটাকে ঠিক স্পষ্ট করিয়া অনুভব করিতে পারিতেছিল তাহা নহে, কিন্তু তাহার স্ফূর্ত্তি বিন্দুর মনটাকে নাড়া দিয়া তুলিতেছিল এবং তাহার যাহা কাজ তাহা বিন্দুর অজ্ঞাতেই সম্পন্ন হইতেছিল।

বিন্দু ভাবিতেছিল, আহা, নিতাইয়ের কেউ নেই!—শিয়রে বসিয়া শুশ্রূষা করে, কেমন আছ একবার জিজ্ঞাসা করে—এমন আপনার বলিতে জনপ্রাণীও নেই। তৃষ্ণায় ছটফট্ করিলে এক-বিন্দু জলও কেহ তাহার মুখে দিবে না।

গভীর রাত্রে যখন সকলে ঘুমাইয়া পড়িল তখনকার সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে স্ফূর্ত্তি পাইয়া বিন্দুর ভাবনা ক্রমেই দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর মূর্ত্তি ধরিয়া উঠিতে লাগিল। অন্ধকারে আর কিছু চোখে পড়ে না, আর-কিছু মনে আসে না—আসে কেবল নিতাই! নিতাই যেন আশপাশ চারিদিকের সমস্ত স্থানটা অধিকার করিয়া বসিয়া আছে!

বিন্দু ধীরে ধীরে বিছানা ছাড়িয়া উঠিল—ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। কিন্তু পদে পদে একটা ভয় ও লজ্জা তাহাকে যেন ঘরের দিকেই টানিয়া ধরিতে লাগিল। কিন্তু এই গভীর রাত্রে কিসের ভয়—কাহাকে ভয়? সে চুপি চুপি একবারটি গিয়া নিতাইকে দেখিয়া আসিবে মাত্র;—কে তাহা দেখিবে? কেই বা তাহা জানিবে?

বিন্দু ভয়ে ভয়ে টিপিটিপি পা ফেলিয়া বাড়ির বাহির হইয়া আসিল। তখন বৃষ্টি পড়িতেছে—বাহিরে কেহ কোথাও নাই—চারিদিক ঘোর অন্ধকার। সে এই অন্ধকার ও নির্জ্জনতার আবরণের মধ্যে নিজেকে লুকাইয়া একেবারে নিতাইয়ের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল।

নিতাইয়ের তখন সবে মাত্র নেশা ছুটিয়াছে। সে তখন আকুল নয়নে চারিদিকে চাহিয়া বাস্তব জগৎটাকে যেন পরখ করিয়া দেখিতেছিল। কিন্তু কৈ—কোথায় কি? এই যে এতক্ষণ পরে সে

জাগরিত হইয়া উঠিয়াছে, এখন কী লইয়া সে বাঁচিয়া থাকিবে!—কোথায় এতটুকু প্রলোভন! তবে আর শূন্য দৃষ্টি লইয়া চোখ মেলিয়া থাকিয়া লাভ কি!—অন্ধকারের অতলতার মধ্যেই নিমজ্জিত হইয়া যাই। এই ভাবিয়া নিতাই আবার মদ ঢালিতেছিল এমন সময় বিন্দুর পদশব্দে সে চমকাইয়া উঠিল।

অনেকক্ষণ নিতাই বুঝিতে পারিল না—এ কি নেশার খেয়াল—না কী!

বিন্দু জিজ্ঞাসা করিল—"নিতাই, কেমন আছ?"

কথাটা শুনিয়া নিতাইয়ের নিস্পন্দ শরীরের মধ্য দিয়া যেন একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ বহিয়া গেল;—সে গুণমুক্ত ধনুকের মত একেবারে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল।

নিতাই বিস্ময়ের আবেগে উদ্বেলিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বিন্দু, তুমি যে এখানে!"

বিন্দু ধীরে ধীরে বলিল—"তোমায় দেখতে এসেছি!"

অবাক হইয়া নিতাই, বিন্দুর মুখের দিকে চাহিল।—এ কি সত্য? না মায়া?

বিন্দুর কথাটা সে যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। কিন্তু বিন্দুর মুখের দিকে একবার চাহিতেই তাহার সমস্ত সংশয় চূর্ণ হইয়া গেল।

বিন্দু আর কোনো কথা কহিল না। সে ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

নিতাই অনেকক্ষণ হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিল।

তারপর একটু প্রকৃতিস্থ হইলে ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল। তখন বৃষ্টি থামিয়াছে—মেঘ-মুক্ত পূর্ণ চন্দ্র, ঘুমন্ত পৃথিবীর সজল শ্যামলতার উপর শুভ্র আলোর জাল ছড়াইয়া দিয়াছে।—চারি দিকে আলোর ঢেউ ছুটিয়াছে। নিতাইয়ের বোধ হইতেছিল, তাহার অন্তরখানিও যেন আলোর আনন্দে ভরিয়া উঠিয়াছে।

নিতাই ঘরে ফিরিয়া আসিল। বিন্দুর ছেলেবেলাকার-দেওয়া খেজুর পাতার জীর্ণ মুকুটটি বাহির করিয়া একবার মাথায় পরিল; তারপর মদের বোতলটা সমুখ হইতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

কৈফিয়ৎ

(Terza Rima ছন্দে)

শুনাবো নূতন ছন্দে মম ইতিহাস,
কেমনে হইনু আমি শেষকালে কবি।
আগে শুনে কথা, শেষে করো পরিহাস॥

যৌবনে বাসনা ছিল দুনিয়ার ছবি,
আঁকিতে উজ্জ্বল করে সাহিত্যের পত্রে।
বর্ণের স্বর্ণের লাগি পূজিতাম রবি॥

ফলাতে সংকল্প ছিল মোর প্রতি ছত্রে
আকাশের নীল আর অরুণের লাল।
এ দুটি বিরোধী বর্ণ মিলিয়ে একত্রে ॥

দলিত-অঞ্জন কিম্বা আবির গুলাল
অথচ ছিলনা বেশি অন্তরের ঘটে।
এ কবি ছিলনা কভু বাণীর দুলাল ॥

তাইতে আঁকিতে ছবি কাব্য-চিত্রপটে,
বুঝিলাম শিক্ষা বিনা হইব নাকাল।
চলিনু শিখিতে বিদ্যা গুরুর নিকটে ॥

হেথায় হয়না কভু গুরুর আকাল!
পড়িনু কত না জানি বিজ্ঞান দর্শন,
ভক্ষণ করিনু শত কাব্যের মাকাল ॥

সে কথা পড়িলে মনে রোমের হর্ষণ,
আজিও ভয়েতে হয় সর্ব্ব অঙ্গ জুড়ে,—
এ ভবসিন্ধুর সেই সৈকত কর্ষণ!

বন্ধ হল গতিবিধি কল্পনায় উড়ে,
গড়িনু জ্ঞানেতে ঘেরা শান্তির আলয়,—
সহসা পড়িল বালি সে শান্তির গুড়ে।

নেত্রপথে এসে দুটী সুবর্ণ বলয়
সোনার রঙেতে দিল দশদিক ছেয়ে,—
সুশাসিত মনোরাজ্যে ঘটিল প্রলয়।

বলা মিছে এ বিষয়ে বেশি এর চেয়ে,
ছন্দেতে যায় না পোরা মনের হাঁপানি।
এ সত্য সহজে বোঝে দুনিয়ার মেয়ে ॥

ফলকথা কালক্রমে ত্যজি বীণাপাণি,
ছাড়িনু হবার আশা সাহিত্যে অমর।
হেথায় বাঁচিতে কিন্তু চাই দানাপানি!

পূজাপাঠ ছেড়ে তাই বাঁধিয়া কোমর
সমাজের কর্ম্মক্ষেত্রে করিনু প্রবেশ,
সুরু হল সেই হতে সংসার সমর ॥

পরিনু সবারি মত সামাজিক বেশ,
কিন্তু তাহা বসিলনা স্বভাবের অঙ্গে।
সে বেশ পরশে এল তন্দ্রার আবেশ ॥

কি ভাবে কাটিল দিন সংসারের রঙ্গে,
স্বেচ্ছায় কি অনিচ্ছায় জানে হৃষিকেশ।
কর্ম্মক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্র এক নয় বঙ্গে!

এদিকে রূপালি হল মস্তকের কেশ,
সেই সঙ্গে ক্ষীণ হল আত্মার আলোক,—
হইল মনের দফা প্রায়শঃ নিকেশ ॥

দেখিলাম হতে গিয়ে সাংসারিক লোক,
বাহিরের লোভে শুধু হারিয়ে ভিতর,
চরিত্রে হইনু বৃদ্ধ, বুদ্ধিতে বালক!

এ সব লক্ষণ দেখে হইনু কাতর,
না জানি কখন্ আসে বুজে চোখ কান,
সেই ভয়ে দূরে গেল ভাবনা ইতর ॥

হারানো প্রাণের ফের করিতে সন্ধান,
সভয়ে চলিনু ফিরে বাণীর ভবনে,
যেথায় উঠিছে চির আনন্দের গান ॥

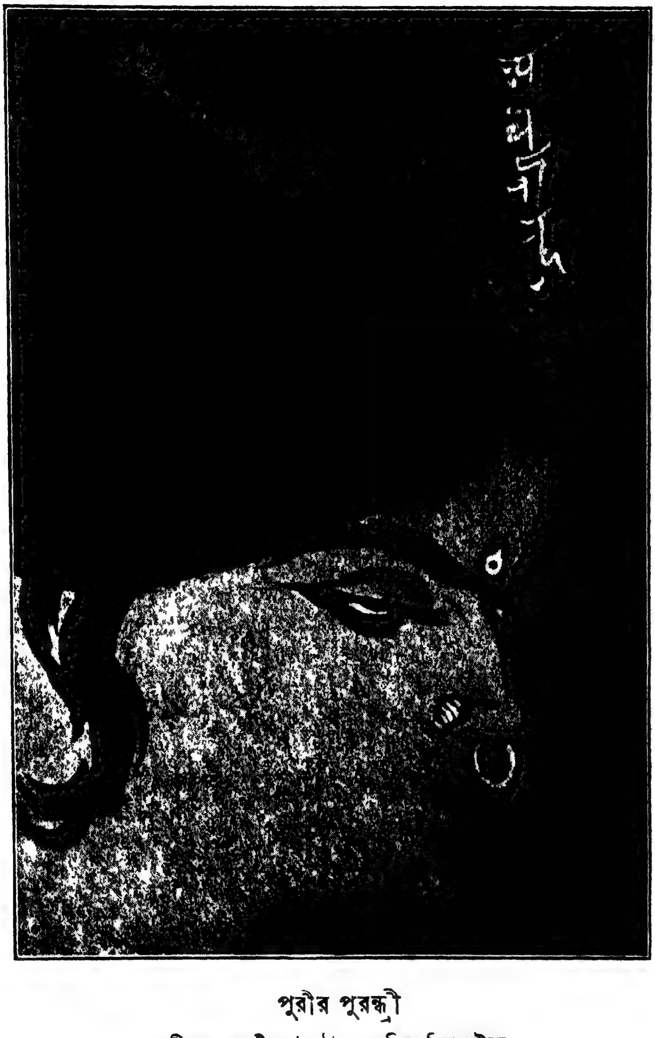

পুরীর পুরন্ধ্রী

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত চিত্র হইতে

ভঙ্গ তরঙ্গে রণে ভঙ্গ

শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত অঙ্কিত চিত্র হইতে

ঝড়ে

দেশী ও বিদেশী

শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত অঙ্কিত চিত্র হইতে

আবার ফুটিল ফুল হৃদয়ের বনে,
সে দেশে প্রবেশি, গেল মনের আক্ষেপ।
করিলাম পদার্পণ দ্বিতীয় যৌবনে ॥

এদিকে সুমুখে হেরি সময় সংক্ষেপ,
রচিতে বসিনু আমি ছোটখাট তান,
বর্ণ স্বর একাধারে করিয়া নিক্ষেপ ॥

আনিনু সংগ্রহ করি বিঘৎপ্রমাণ
ইতালির পিতলের ক্ষুদ্র কর্ণেট,
তিনটি চাবিতে যার খোলে রুদ্ধ প্রাণ ॥

এ হাতে মূরতি ধরে আজি যে সনেট,
কবিতা না হতে পারে, কিন্তু পাকা পদ্য,
প্রকৃতি যাহার "জেঠ", আকৃতি "কনেঠ" ॥

অন্তরে যদিচ নাহি যৌবনের মদ্য,
রূপেতে সনেট কিন্তু নবীনা কিশোরী,
বারো কিম্বা তেরো নয়, পূরোপূরি 'চোদ্দ' !

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

পুরী

আমাদের একটি চলিত কথা আছে "পুন্‌কে শত্রু বড় ভয়ঙ্কর, বড় শত্রুকে পারা যায়—তবু তাকে পারা যায় না।"

আমার একজন ইংরাজ বন্ধু প্রায়ই বলেন—"আমি মশাকে যত ডরাই বাঘকেও তত ডরাই নে।" এ কথাগুলির সার্থকতা এবার পুরী আসিয়া যেমন বুঝিয়াছি আগে তেমন বুঝি নাই। পুরীর সমুদ্র, শোভাস্বাস্থ্য সকলই পুরীর বালির নিকট হার মানিয়াছে।

পুরী মরু রাজ্য; আসমুদ্র কেবলই বালি বালি বালি,—আশে বালি, পাশে বালি, খাদ্যে বালি, বিছানায় বালি, রৌদ্রে বালি ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে,—বৃষ্টিতে ইহার ক্ষয় নাই, আর্দ্রতার চিহ্ন মাত্র নাই, ইহা অক্ষত অব্যয়! দিগন্তে সমুদ্ররাজ অনবরত তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বালুতীর আক্রমণ করিতেছেন, আবার প্রতিহত হইয়া দূরে ফিরিয়া চলিয়াছেন, অবিশ্রান্ত এই সংগ্রাম চলিতেছে, কিন্তু বালির এক কণা নাশ করিতে পারেন নাই—তীরে বালিরাশি যেমন তেমনই আছে।

পুরীর মাটী যেমন কেবলই বালি—পুরীর সমুদ্র তেমনি কেবলই জল। আর যত সমুদ্র দেখিয়াছি,—তাহারা কত পাহাড় কত দ্বীপ বক্ষে ধারণ করিয়া আছে—কিন্তু পুরীর দিগন্ত-বিলোপী সমুদ্রে কোথাও একটি সামান্য প্রস্তরস্তূপ পর্য্যন্ত নাই। ইহা ঠিক বাঙ্গলারই সমুদ্র। সূর্য্য প্রাতঃকালে সমুদ্র হইতে উঠিয়া সন্ধ্যায় সমুদ্রেই লীন হইয়া পড়েন,—অন্য কোন বাধার অন্তরাল সূর্য্যের উদয়াস্ত মহিমাকে প্রচ্ছন্ন করে না।

কি সে চমৎকার শোভা ! স্তরবিন্যস্ত পুঞ্জীকৃত শতবর্ণ মেঘে—স্থূলাতিস্থূল হইতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম লোহিত বর্ণ আভাসমূহের তরঙ্গ তুলিয়া—সে তরঙ্গে দিগ্‌দিগন্ত আকাশ পাতাল অপূর্ব্ব মহিমায় রঞ্জিত করিয়া সূর্য্য নীলমধ্য হইতে আকাশে ওঠেন, নীল প্রদক্ষিণ করিয়া আবার নীলেই মগ্ন হইয়া পড়েন। জানিনা পুরীর এই উদয়াস্ত শোভা কোন চিত্রকর তাঁহার চিত্রফলকে ফলাইতে পারিয়াছেন কিনা। তাহা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়।

সমুদ্রস্নান এখানকার একটি প্রধান আরাম। কিন্তু বলদ্বারা লইতে না জানিলে এ আরামটিকে সহজে আয়ত্ত করা যায় না। ছলে বলে কৌশলে তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া পড়িয়া যদি আপনাকে ঠিক রাখিতে পারা যায়—তবেই সমুদ্রস্নান পরিতৃপ্তিকর, নহিলে কেবল আতঙ্কই সার।

এখানকার মৎস্যজীবি সমুদ্রনাবিকগণ 'নুড়িয়া' নামে অভিহিত। স্নানের সময় তাহাদিগের একজনকে সঙ্গে রাখিলে আর কোন ভয় ভাবনা থাকে না। এজন্য একজন নুড়িয়াকে দুই আনা করিয়া পারিশ্রমিক দিতে হয়। ইহাদের অনেকেই বেশ বাঙ্গলা বলিতে পারে।

ইংরাজেরা প্রায়ই তিনচার জনে সার বাঁধিয়া সার্কাশের ক্লাউনের বেশে—অর্থাৎ তিন কোণা বেতের টুপি ও ইজার বডি পরিয়া দুই দিকে দুইজন নুড়িয়াকে সঙ্গে লইয়া সমুদ্রে নামেন। দূর হইতে পাহাড়ের মত উচ্চ ঢেউগুলা নৃত্য নৃত্য করিতে করিতে তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে—তীরে দণ্ডায়মান নূতন দর্শক আমরা ভীত হইয়া মনে করি এই বুঝি ডুবাইয়া দিল এদের ! আর বুঝি রক্ষা নাই ! কিন্তু তরঙ্গ মাথার উপর আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহারা লাফাইয়া উঠেন, তরঙ্গ তাঁহাদের ডিঙ্গাইবে কি তাঁহারাই তরঙ্গকে ডিঙ্গাইয়া দাঁড়ান। অনবরত এইরূপ যুঝাবুঝি ও লম্ফে ঝম্পে তরঙ্গবল ব্যর্থ করিয়া তাঁহারা স্নান সমাপন করেন। আর ক্ষুদ্র মানবশক্তিকে পরাজিত করিতে না পারিয়াই যেন ক্ষুব্ধ মহা সমুদ্র বল সঞ্চয় করিবার অভিপ্রায়ে উন্মত্ত উদ্দাম-ভাবে ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে কূল হইতে আবার অকূলে ফিরিয়া যান।

সমুদ্র স্নান
শ্রীযুক্ত সুরীন্দ্রনাথ ঠাকুর গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে

পুরীর মুড়িয়া
শ্রীযুক্ত সুরীন্দ্রনাথ ঠাকুর গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে

ভীম তরঙ্গের উপর ক্ষুদ্র মানুষের এত সহজ প্রভুত্ব দেখিয়া আমার মনে হইত, সংযমই সিদ্ধিলাভের প্রকৃত পথ। বাসনা তখনই সম্পূর্ণ সফল হয় যখন বাসনাকে জয় করা যায়। সমুদ্রের জয় তখনই যখন সে বাসনায় উন্মত্ত না হইয়া ধীর প্রশান্তভাবে তলদেশ হইতে জাহাজকে আক্রমণ করে। প্রচণ্ড ঝড়েও রক্ষা আছে—তাহাতে আর রক্ষা নাই। মুড়িয়াদিগের কি মাংসপেশীবহুল দেহ! কি বলিষ্ঠ মূর্ত্তি! কি অসম সাহস। ভীষণ তরঙ্গকেও উপেক্ষা করিয়া ইহারা সময়ে অসময়ে ছোট ছোট তরণীগুলি অকূলে বাহিয়া চলে, ভয়ডর কাহাকে বলে যেন জানে না। দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়।

প্রথমে আমি ভাবিয়াছিলাম, ইহারা উড়িয়া, এ দেশেরই লোক। ভীরু বলিয়া উড়েদিগের একটা অপবাদ আছে—কিন্তু স্বচক্ষে দেখিতেছি ঠিক বিপরীত,—এই জেলেরা যেন মূর্ত্তিমন্ত সাহস,—স্বজাতির ভীরুতা কলঙ্ক পূর্ণমাত্রায় ইহারা ক্ষালন করিয়াছে! সমতল বাঙ্গলাদেশের মাটী কামড়াইয়া থাকিলে চলে, সমুদ্রের বেলা ত এ কথা বলা যায় না—সমুদ্র উড়িয়াদিগকেও এরূপ সাহসী করিয়া তুলিয়াছে, মনে মনে কত না আনন্দ উপভোগ করিতাম!

হায়! সহসা একদিন আমার এতখানি আহ্লাদ এবং এমন মস্ত একটা দার্শনিক সিদ্ধান্ত আমূল ধূলিসাৎ হইল। শুনিলাম মুড়িয়ারা উড়িয়া নয়; (ন-উড়িয়া মুড়িয়া)। ইহারা মান্দ্রাজি তৈলঙ্গী এখানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। তখন মনটা বড়ই খারাপ হইয়া গেল! সমুদ্রতীরবাসী উড়িয়াও সমুদ্রগাহনকুশল নহে! ইহার জন্য অন্যের শরণাপন্ন! হায় হায়! এ মুলুকের সকলই আশ্চর্য্য! জগন্নাথজি ত আশ্চর্য্যের পরাকাষ্ঠা!

একজন সেদিন বলিতেছিলেন জগন্নাথ এ দেশের লাট সাহেব,—কথাটা সঙ্গত মনে হইল না। জগন্নাথজি হইতেছেন এ দেশের সম্রাট; আর লাট সাহেবের দল তাঁহার পাণ্ডাগণ। ইহারা সংখ্যায় বড় অল্প নহে,—মন্দির দ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া জগন্নাথের খাস দরবার পর্য্যন্ত কত যে পাণ্ডা তাহার সংখ্যা নাই। ভগবানকে লাভ করিতে খৃষ্টানদিগের একমাত্র যিশু খৃষ্টকে প্রসন্ন করিতে হয়—এখানে

এই অসংখ্য পাণ্ডার দলকে বশে আনিয়া তবে জগন্নাথের দর্শনলাভ ভাগ্যে ঘটে! বড় সহজ কথা নয়! তাই যাত্রার সময় মনে মনে বেশ একটু ভীত হইয়া সঙ্গের বশীকরণ থলিয়াটি পূর্ণ করিয়া লইতে ত্রুটি করি নাই। কিন্তু মন্দিরে গিয়া বুঝিলাম ভয় জিনিষটা রবারের থলির মত ফুলাইলে খুব ফোলে বটে কিন্তু থাবড়াইয়া দিলে একেবারেই চ্যাপটা হইয়া যায়। পঞ্চ তঙ্কাতেই খাস দরবারের পাণ্ডা-গণ সন্তুষ্ট হইয়া গেল—আর দ্বারের, দালানের ও অন্যান্য নানাস্থলের সঙ্গধারী প্রহরী-পাণ্ডা প্রত্যেককে দুই চারি আনা দিয়াই ঠাণ্ডা করিলাম। অনেকে পাণ্ডাদিগের এই দৌরাত্ম্য অসহ্য মনে করেন—আমার কিন্তু তাহা মনে হইল না। মন্দির দর্শনে যে আনন্দলাভ হয়—তাহার কাছে এ লাঞ্ছনা, অর্থব্যয়--কিছুই নহে।

মন্দিরের বর্ণনা আর কি করিব—

জগন্নাথের মন্দির

চিরকাল ধরিয়া বর্ণনা করিয়াও কেহ ইহার পরিপূর্ণ বর্ণনা করিতে পারেন নাই।* কি প্রকাণ্ড মন্দির! অথচ বাহির হইতে মনেই হয় না—মন্দির তেমন বড়। ভিতরে প্রবেশ কর—বড় বড় দালানের পর দালান,—প্রত্যেক দালানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড থাম। থামে থামে, প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে দেয়ালে দেয়ালে, চূড়ায়, দরজায়,—ভিতরে বাহিরে কেবলই ক্ষোদিত মূর্ত্তি। কোথাও প্রকাণ্ড, কোথায় ক্ষুদ্র,—কোনটি রাখিয়া কোনটি দেখিব বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। প্রাচীর মধ্যে ছোট বড় ১২০টি মন্দির আছে, বলা বাহুল্য সর্ব্বাপেক্ষা বড় মন্দিরটি জগন্নাথের। প্রাচীরের চারিদিকে চারিটি তোরণ! পূর্ব্ব তোরণটি সিংহদ্বার এখানে দুইটি সিংহ বিরাজিত,—দক্ষিণ তোরণ অশ্বদ্বার অশ্বমূর্ত্তি-যুক্ত,—উত্তরে হস্তী মূর্ত্তি—তাই ইহার নাম হস্তীদ্বার, পশ্চিম তোরণ রক্ষকমূর্ত্তিশূন্য, ইহার নাম খাঞ্জাদ্বার। শুনিলাম মন্দির চূড়ার গম্বুজ সমগ্র একখানি পাথর কাটিয়া প্রস্তুত। গম্বুজের চারিধারের চারিখানা বড় পাথরও নাকি জোড়হীন আস্ত পাথর। এখানে লোকপ্রবাদ এই যে, জগন্নাথজির মন্দির একটা বড় পাহাড়কাটা মন্দির!—অসম্ভব নহে,

কণারকের ভগ্ন-মন্দির

* ১৩১৯ সালের বৈশাখ সংখ্যা ভারতীর নীলভূধর নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

কিন্তু কি করিয়া তাহা হইল? পুরীর ত্রিসীমায় ত একটি ছোট পাহাড়ও দেখা যায় না। বোম্বাই প্রদেশে অনেক বড় বড় মন্দির দেখিয়াছি—মহাভারত কথিত বহু পুরাতন প্রসিদ্ধ গোকর্ণ মন্দির দেখিয়া কত না বিস্মিত হইয়াছিলাম। কিন্তু এমন কারুকার্য্য, এমন বিস্ময় জনক কীর্ত্তি আর কোথাও দেখি নাই। ভুবনেশ্বর মন্দিরের কারু কার্য্য নাকি আরও উৎকৃষ্ট। ইচ্ছা আছে একবার দেখিয়া আসিব, জানিনা অদৃষ্টে সে পুণ্যলাভ ঘটিবে কি না!

শোনা যায় জগন্নাথ মন্দিরের সম্মুখবর্ত্তী অরুণস্তম্ভ কণারকের সূর্য্যমন্দির হইতে তুলিয়া আনিয়া এখানে প্রোথিত করা হইয়াছে। জগন্নাথজির ভোগ মণ্ডপের দরজার উপরে যে নবগ্রহ মূর্ত্তি আছে তাহাও নাকি কণারকের সূর্য্য মন্দিরের অংশ বিশেষ।

আমরা এই বিশ্বসৃষ্টিতে দেখিতেছি—সৃষ্টিকে বড় করিয়া গড়িয়া স্রষ্টা নিজে তাহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। এখানেও মন্দিরের অন্যান্য দেবমূর্ত্তি গুলি আপনাদের গঠন সৌন্দর্য্যের আড়ম্বরে জগন্নাথদেবকে একরূপ ঢাকিয়া রাখিয়াছে। জগন্নাথের দারুময় মূর্ত্তিতে একেবারেই শিল্প-সৌন্দর্য্যের অভাব। বস্তুতঃ এ মূর্ত্তি নিরাকার ব্যঞ্জক;—তাই ভক্ত এই মূর্ত্তিতেই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের রূপ দেখিয়া থাকেন। চৈতন্য এইরূপ দেখিয়াই পাগল হইয়াছিলেন। এখানকার একজন পাণ্ডা বলিল, জগন্নাথ

আঠারো নালা

শ্রীযুক্ত কনকেন্দ্রনাথ ঠাকুর গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে

মুক্তি হবেনা দেবদর্শনে তীর্থে পাণ্ডা বিনা ;
ভক্তি সে হোক্ যেমন তেমন, ষোল আনা দক্ষিণা।।

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত চিত্র হইতে

বুদ্ধদেবের অবতার—তিনি নিরাকার। বুদ্ধদেব এবং নিরাকার ভগবানকে তাহারা এক করিয়া তুলিয়াছে। জগন্নাথদেবের পীঠস্থান ঘোর অন্ধকার,—এই অন্ধকার মধ্যে রত্নসিংহাসনে জগন্নাথ সুভদ্রা ও বলরাম এই ত্রিমূর্ত্তি একত্র বিরাজিত।

এমনই অভিভূত হইয়া জগন্নাথ দর্শনে যাইতেছিলাম। যে তাঁহার প্রকোষ্ঠসম্মুখের অন্ধকার দালানে মেজের উপর যে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছিল তাহা দেখি নাই। আর একটু হইলে তাহার উপর গিয়া পড়িয়াছিলাম আর কি। কে একজন আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইল। এই পুণ্য মৃত্যু হইতে বাধা দিয়া সে কি পুণ্য লাভ করিল!

শ্রীক্ষেত্রের অন্নছত্রের দৃশ্য দেখিলে হৃদয় আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠে। হিন্দুর আচারপ্লাবিত দেশে বুদ্ধদেবের উদার ধর্ম্ম-মহিমা আজিও এই অনুষ্ঠানে সমুজ্জ্বল

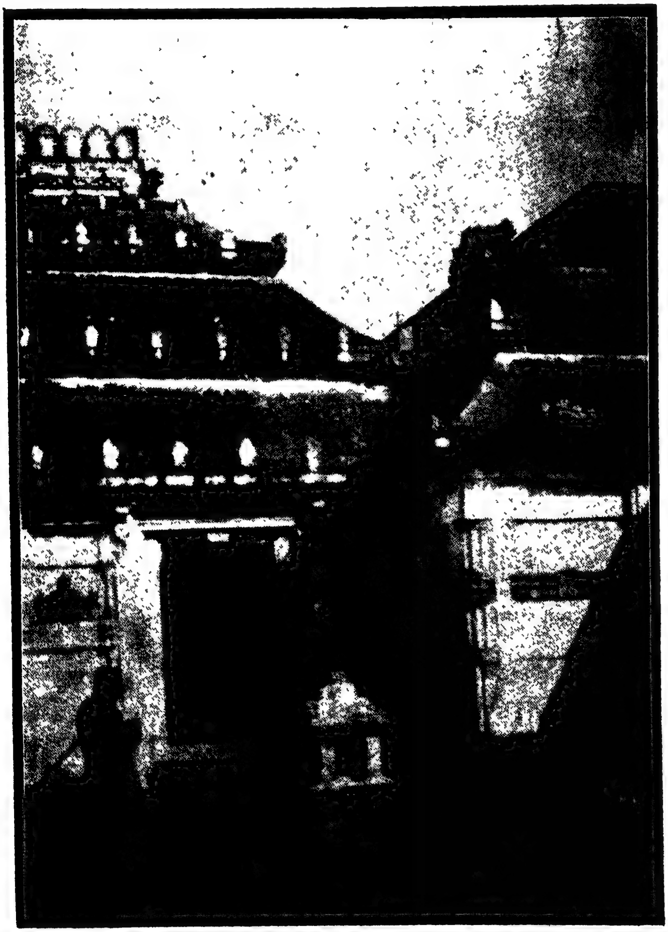

গুণ্ডোবাড়ী

হইয়া রহিয়াছে। বুদ্ধদেবের মহিমা স্মরণ করিলে স্তম্ভিত হইয়া পড়িতে হয়। কোন্ ধর্ম্ম এমন প্রচার লাভ করিয়াছে! কোথায় না ইঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ বিরাজিত! অধুনা সুদূর আমেরিকায় পর্য্যন্ত বৌদ্ধদিগের লুপ্ত কীর্ত্তির আবিষ্কার হইতেছে।

চৈতন্যদেব বহুপ্রয়াসেও জাতিভেদ উঠাইতে পারেন নাই। এমন কি ভক্ত মুসলমানকে জগন্নাথ মন্দিরে লইয়া যাইবার প্রয়াসও তাঁহার ব্যর্থ হইয়াছিল। এই খেদে তিনি মন্দির চূড়ায় জগন্নাথ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন,—জাতিবর্ণ নির্ব্বিভেদে সকলেরই নিকট এই মূর্ত্তি প্রকাশিত। এইরূপ জাতিবর্ণপ্রভাবসমাচ্ছন্ন ভারতে শ্রীক্ষেত্রের অন্নছত্র বৌদ্ধধর্ম্মের একটি মহাকীর্ত্তি।

জগন্নাথ মন্দির ছাড়া পুরীতে দেখিবার স্থান আরও অনেক আছে, গুঞ্জোবাড়ী, আঠারনালা, চন্দন সরোবর ইত্যাদি ইত্যাদি।

গুঞ্জোবাড়ী জগন্নাথদেবের গ্রীষ্মাবাস-মন্দির। রথযাত্রাকালে এইখানে ত্রিমূর্ত্তির অধিষ্ঠান হয়।

আঠারনালা একটি সেতুর নাম। এ সেতু বিনা-খিলানে নির্ম্মিত! আঠারটি নালার প্রত্যেকটির স্তম্ভচূড়ায় তির্য্যকভাবে সজ্জিত পাথরের সারির উপর এই সেতু স্থাপিত।

চন্দন সরোবরের জল অতিশয় নির্ম্মল। ইহার বক্ষে একটি কৃত্রিম দ্বীপ এবং চারিদিকেই বাঁধা ঘাট। ঘাটের প্রস্তর নির্ম্মিত সিঁড়িগুলি জলের মধ্যে ঝক ঝক করিতেছে—দেখিতে বড় সুন্দর।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী
আশ্বিন, ১৩১৯।

গোরিয়াঁ

সে বনলতাটি আপনার নবকোমল জীবনবৃন্ত দিয়া বাংলার রাজধানী গৌড়ের জীর্ণ কঙ্কালটা জড়াইয়া ধরিয়া, সেন-রাজত্বের চিতাসজ্জার উপরে এক বাদল দিনের কাজল আলোয় নিজেকে প্রথম বিকশিত করিয়া তুলিয়াছিল; এবং সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হইতে আসিয়া এক বিদেশী, গহনে গভীরে—বিরাট অরণ্যের অন্ধতম স্তব্ধতার মাঝখানে, জনশূন্য গৌড় জনপদের পরিত্যক্ত রাজপুরে, পাষাণ-শয্যাশায়িতা সেই বনলক্ষ্মীকে প্রথম সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছিলেন;—এইরূপ একটা নবন্যাসের টুকরায়, মনের সহজ অবস্থায়, বিচলিত হইবার কারণ ছিল না। কিন্তু সেদিন বর্ষার প্রভাতে, একটা সুখস্পর্শ শীতলতার মাঝখানে নিজেকে টানিয়া লইয়া, কলিকাতার গলির মাঝে আমাদের বাগানখানির সুগভীর শ্যামলতায় সম্পূর্ণ ডুব দিয়া আমি একা বসিয়াছিলাম; এবং বৃষ্টি-জলে সতেজ পুষ্প-পল্লবের বিপুলতার উপরে দিনের উন্মেষ, ও বাগানের একটি গোপন কোণ হইতে নব বর্ষায় সদ্য প্রস্ফুটিত গৌড়ি ফুলের মৃদু গন্ধ আমায় একটা স্বপ্ন দিয়া বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছিল। এই অবস্থায় সেদিন যাহা কতকটা দেখিয়াছিলাম, কতকটা বা শুনিয়াছিলাম তাহা এই—

পিতা আমার গৌড়-রাজবংশের শেষ বংশধর। ইতিহাস তাঁহাকে জানে না। গৌড়ের রাজসিংহাসন হইতে বিচ্যুত হইবার পর, দুর্দ্দশা হইতে দুর্দ্দশায়, দুঃখ হইতে দৈন্যে, অনন্যসাধারণ রাজ-মহিমার গৌরব-শিখর হইতে অনাড়ম্বর একটা সাধারণ পরিসমাপ্তির মাঝে কবে যে পিতা আমার ধূলিধূসর, হীনতায় মলিন, অবজ্ঞা ও অবমাননায় বিশীর্ণ জীবনের ছিন্ন কন্থা বহন করিয়া আপনাকে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছিলেন তাহাও কেহ জানে না।

আমি সেই দরিদ্র পিতার একমাত্র দুহিতা গৌরী।

মৃত্যুকালে নিঃস্ব পিতা গৌড়-রাজকুমারীগণের স্বাভাবিক গৌরকান্তির উপরে অনির্ব্বচনীয় পাণ্ডুপ্রভাটুকু ছাড়া আমাকে আর কিছুই দিয়া গেলেন না বটে কিন্তু নির্ব্বাণের মুখে প্রদীপের সবটুক যেমন ক্ষীণ একটি শিখায় আপনাকে জাগাইয়া তোলে তেমনি সুবৃহৎ গৌড়-রাজপরিবারের যত মহিমা, যত কালিমা সমস্ত আমার সুপাণ্ডুর গৌর তনুখানির অন্তর বাহির আশ্রয় করিয়া নূতন তেজে শেষ বার জ্বলিয়া উঠিল। সে জ্বালায় আমি নিজেও জ্বলিয়াছিলাম—পরকেও জ্বালাইয়া ছিলাম।

যে দেবীর নামে আমার নাম তিনি ছিলেন দেবী গৌরী—আর আমি ছিলাম মৃত্যুর ন্যায় পাণ্ডুশ্রী, শোণিতপিপাসিনী একটা রাক্ষসী! কিন্তু তবু আমাকে লোকে বলিত গৌরী—প্রেয়সী—দেবী!

ষষ্টি-সহস্র অভিশপ্ত সগর-সন্তানের মত আমার পিতৃগণ যখন আমার নারী-জীবনের ক্ষীণ ধারাটুকুর দিকে সতৃষ্ণ চাহিয়া ছিলেন তখন আমি সেটিকে সুপবিত্র সাগর-সঙ্গমের দিকে না বহাইয়া দিয়া, গৌড় বাদশাহের রংমহালের দিকেই লইয়া চলিলাম —কুটিল পঙ্কিল পথে, তরঙ্গায়িত যৌবনের উদ্দাম শক্তিবলে সমস্ত বাধাকে বিচূর্ণ করিয়া!

হায়! প্রমোদ এবং বিলাস-বিচিত্র যবনিকার অন্তরালে সে দিনের কথা আমার আজও মনে পড়ে—যেদিন আমার গৌরী নাম গোরিয়াঁ। এই তিনটি অক্ষরের মধুর মদির অলস ছন্দের মাঝে আপনাকে প্রথম ধরা দিয়াছিল।

তারপর যেদিন গৌড়ের দিকচক্রবাল অগ্নিদাহ আর চিতা-ধূমে বেষ্টন করিয়া, দুর্ভিক্ষ আর মহামারী প্রলয় তাণ্ডবে ভীষণ আবর্ত্তের মত আসিয়া দেখা দিল, সেদিন আমি বা কোথা রহিলাম, কোথা বা রহিল আমার সে স্বপ্নরাজ্যের স্বর্ণ সিংহাসন! ঘূর্ণ জলে দীপালির প্রদীপটির মত আমার কম্পমান জীবনটুকু লইয়া সহসা একটা অতলের তলে নামিয়া গেলাম।

তারপর, আবার যেদিন প্রভাতের আলোয় ফিরিয়া আসিলাম সেদিন দেখিলাম আমার জীবন প্রদীপ তার সমস্ত মহিমা, সমস্ত কালিমা লইয়া নিভিয়া গেছে এবং আমি মৃত্যুর একটা অপূর্ব্ব প্রশান্তির মাঝে আমার নিষ্কলঙ্ক পাণ্ডুশ্রী লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছি।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিলাতের বিদ্যালয়

আজকাল এদেশের শিক্ষাবিধি অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য হয়ে উঠেছে। সেই জন্যে এখানকার ভাল বিদ্যালয়ে গিয়ে আমি বিশেষ কোনো ফল পাইনে। যে প্রণালী একেবারেই আমাদের অসাধ্য তার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে লাভ কি! আমার ত মনে হয় এত অত্যন্ত বেশি আয়োজনের জটিলতা সফলতার লক্ষণ নয়। যেমন বড়-মানুষের ছেলেরা অত্যন্ত বেশি খেলনা পায় বলে তাদের খেলার যথার্থ সুখ নষ্ট হয়ে যায়, তেমনি ছাত্রদের মনকে বাইরের থেকে নানা উপায় ও কৌশলের দ্বারা অত্যন্ত বেশি নাড়া দিতে থাকলে বাইরের দিকটাতে তাদের চিত্তের গতিকে বাড়িয়ে তোলা হয় বটে কিন্তু ভিতরের দিকে নিশ্চয়ই জড়ত্ব সঞ্চার করা হয়। মনকে অতিশয় আনুকূল্য করলে তার স্বাভাবিক সৃজন-চেষ্টা এবং সেই চেষ্টার আনন্দকে আচ্ছন্ন করে দেওয়া হয়। একথা আমি জোর করে বল্‌তে পারি এই সমস্ত আসবাবগুলোকে বিদায় করবার জন্যে একদিন এদের মালগাড়ি ডাকৃতে হবে। কেননা আসবাবের আধিক্যে মানুষের জায়গা কেবলি সঙ্কীর্ণ হয়ে আস্‌চে—ধন যত বড় হয়ে উঠ্‌চে ধনী ততই ছোট হতে চলেছে। আমার বোধ হচ্চে যেন একথা এরা এখনি বুঝতে আরম্ভ করেছে;—এখন থেকে এরা রিক্ত হবার সাধনায় প্রবৃত্ত হবে। রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে মুক্তিলাভের জন্যে এদের অনেক বীরকে প্রাণপাত করে সংগ্রাম করতে হয়েছে—এবার বহির্বস্তুর বিপুল বন্ধনজাল থেকে মনকে মুক্তি দেবার জন্যে এদের অনেক তপস্বীকে তপস্যা করতে হবে। আমাদের মুস্কিল হবে এই যে এরা যেগুলো ফেলে দিতে থাক্‌বে আমরা সেগুলো সস্তায় পাব বলে কুড়িয়ে এনে ঘর বোঝাই করতে থাকব। য়ুরোপের আবর্জ্জনার বোঝা বোধ করি একদিন আমাদেরি টানতে হবে, আমাদের ধনীদের ঘরে এখনি তার লক্ষণ দেখা যায়। উপায় নেই। বস্তুর মোহের মধ্য দিয়ে না গিয়ে বোধ হয় তাকে কাটিয়ে ওঠা যায় না। দরিদ্র বোধ হয় সত্যভাবে মহৎভাবে দরিদ্র হতে পারে না—দু হাতে ধন ছড়িয়ে ফেলে দিয়ে তবে তাকে দরিদ্র হতে হবে—যে পূর্ণ হয়েছে সেই ত রিক্ত হবার আনন্দ ভোগ করতে পারে, যে শূন্য সে কেমন করে পারবে? সেই জন্যই দেখচি য়ুরোপের বস্তুর বোঝা আমাদের মত দীন দরিদ্রের মনকে কেবলি মুগ্ধ করচে। আমরা হাত বাড়িয়ে বলচি ঐ মোট মাথায় তুল্‌তে না পারলে আমাদের আর মুক্তি নেই। অথচ দেখ্‌তে পাচ্চি এই বোঝার ভারেই য়ুরোপের চিত্তের মধ্যে একটা গভীর ক্রন্দন উঠতে আরম্ভ করেছে। সে একদিন নিশ্চয়ই বল্‌বে—যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্, আজ তারই ভূমিকা হচ্ছে। য়ুরোপ যখন বল্‌বে আমি অমৃত চাই, তখন হয়ত আমরা বল্‌তে থাকব আমরা উপকরণ চাই। মানুষের আত্মার চেয়ে তার উপকরণকে বিশ্বাস করবার অন্ধ প্রবণতা আমাদের মধ্যে

খুব দেখা দিয়েছে সে ত দেখ্‌তেই পাচ্ছেন। আমরা কেবলি লোভ করচি। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ—এ কথাটার মানে আমরা ভুলে বসেছি। এ কথার মানে এই, বস্তুর কাছে হাত বাড়িয়ো না, তাঁর দ্বারে দাঁড়াও। তিনি যা দেন সে ত হাতের মুঠোর উপরে দেন না, তার ত ভার নেই, সে তিনি জীবনের ভিতরে সঞ্চার করে দেন—সে সম্পদ আমাদের আত্মারই অংশ হয়ে যায় সুতরাং তাকে লোহার সিন্ধুকে ভরতে হয় না। "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ" একথার উপরে আমরা ভরসা রাখতে পারিনে—কেননা, "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং" এ কথাটাকে আমরা গ্রহণ করতে পারিনি। আমরা নিজেকে দিয়েই সমস্তকে আবৃত করেছি। কিন্তু আমাদের সর্ব্বদা সতর্ক হতে হবে। বস্তুর উপরে বিশ্বাস, যান্ত্রিক প্রণালীর উপরে নির্ভর আমাদের আশ্রমের তপস্যা ভঙ্গ করবার জন্যে কখনো মোহন বেশে কখনো বিভীষিকার আকারে দেখা দেয়। কিন্তু তার প্রতি যদি দৃকপাত না করেন তাহলে দেখ্‌তে পাবেন সে নিঃশব্দে অন্তর্ধান করবে। আমাদের আশ্রমের ইতিহাসে যা দৈন্যরূপে বাধারূপে দেখা দিয়েছে তা ছায়ার মতই নিজের কোন পদচিহ্ন না রেখে চলে গিয়েছে তা বারবার দেখেছি—ধনীর সাহায্যের দ্বারা আমরা ধনবান হয়নি একথাটি কোনোদিন ভুলবেন না।*

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ব্রহ্মাণ্ড-তত্ত্ব-কল্পদ্রুম

(Paul Parfaitর ফরাসী হইতে)

এখনো চারি বৎসরে পড়ে নাই, ইহারই মধ্যে তাহার পরিবারের লোকেরা, তাহার অদৃষ্ট খুব ভাল বলিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিতে লাগিল। তাহার পিতা তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন:—"এ ছেলেটা একটা কিছু করবেই করবে।"

এই কথাটা কাজে ফলিবে বলিয়া কোন লক্ষণ প্রথমে প্রকাশ পায় নাই; কেননা, বালক পড়াশুনায় যে খুব মেধা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিল তাহা নহে। বালক বিদ্যালয়ে, অঙ্কশাস্ত্র ও ল্যাটিন-পদ্যরচনা অপেক্ষা, ব্যবসায়-বুদ্ধিরই বেশী পরিচয় দিয়াছিল। কিন্তু তাহার এক কাকা ঠিকই বলিয়াছিলেন, ল্যাটিন প্রভৃতিতে পারদর্শী হইলে জীবিকার কোন উপায় হইবে না। উহাতে বিশেষ কিছু লাভ নাই।

বাল্যদশা পার হইয়া আমাদের গল্পের নায়ক ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করিল। একদিন সে হঠাৎ একটা বৃহৎ সংকল্প লইয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিল। এরূপ বৃহৎ সংকল্প সচরাচর কাহারও মাথায় আসে না।

---

* বিলাতের চিঠি হইতে।

আমার একটা কিছু করা চাই! এই "একটা কিছু" সামাজিক নাটক হইবে, কি ঐতিহাসিক গ্রন্থ হইবে, কি দার্শনিক নিবন্ধ হইবে, তাহাই সে অনেকক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। ইহা নির্দ্ধারণ করা একটা গুরুতর ব্যাপার! তবে এইমাত্র স্থির ছিল, একটা কিছু বড় কাজ করিতে হইবে;—একটা বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিতে হইবে।

সে ভাবিল, ইহার জন্য প্রস্তুত হইতে গেলে, তাহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করা আবশ্যক। এইজন্য, তাহার শক্তির লেশমাত্র যাহাতে অপব্যয় না হয় সে বিষয়ে সে খুব সতর্ক থাকিত। তাই এখন কোথাও তাহার টিকিটি পর্য্যন্ত দেখা যাইত না। জনসাধারণকে তাহার গভীর চিন্তার সারটুকু উপহার দিবে বলিয়া সে একাগ্রতা অবলম্বন করিল। তাহার গ্রন্থে কি বিষয় লিখিতে হইবে তাহা এখনও স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। কিন্তু যাই হউক, তাহার পূর্ব্বেই গ্রন্থের একটা নাম স্থির করা বিশেষ আবশ্যক বলিয়া মনে করিল। এই বিষয়ে অনেকক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। যেরূপ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সে লিখিবে বলিয়া সংকল্প করিয়াছে তাহার উপযুক্ত একটা খুব জাঁকালো নাম হওয়াই সঙ্গত। ঐ গ্রন্থ হইতে বিশ্বমানব অশেষ শিক্ষা লাভ করিবে এই মনে করিয়া একটা নাম তাহার মাথায় আসিল। সে স্থির করিয়া ফেলিল।

আমার গ্রন্থের নাম হইবে—ব্রহ্মাণ্ড-তত্ত্ব কল্পদ্রুম! চমৎকার নাম হইয়াছে; উহাতে কিছুই বলা হয় নাই, অথচ সবই বলা হইয়াছে! বিষয় নির্ব্বাচনের পথ মুক্ত রহিল, এবং যত বড় কথাই মনে আসুক না, উহার মধ্যে পূরিবার কোন বাধা হইবে না। ছোট কাঠামের ভিতর বড় জিনিস প্রবেশ করান বড়ই দুষ্কর ও বিরক্তিজনক!

যাহারা জিজ্ঞাসা করিত:—তোমার ছেলে তবে কিছুই করচে না?

আমাদের নায়কের ভাগ্যবান পিতা তাহাদিগকে উত্তর দিতেন:—একটু অপেক্ষা কর না, দেখে নিও ও একটা-কিছু করবেই করবে।

কিছুকাল পরে, আমাদের নায়কের ঘনিষ্ঠ বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল, তাহাদের বন্ধু একটা বৃহৎ গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এবং যেহেতু এখনও বন্ধুদিগের মধ্যে ঈর্ষ্যার কোন কারণ ঘটে নাই, তাহারা পূর্ব্ব হইতেই গ্রন্থের প্রশংসা আরম্ভ করিয়া দিল।

আর আমাদের নায়ক, ধ্যানস্তিমিত-লোচনে এক্ষণে রাস্তা দিয়া চলিতেন,—যেন কি একটা গভীর বিষয়ের চিন্তায় নিমগ্ন। তিনি চিন্তা করিতেছিলেন, গ্রন্থের যেরূপ বৃহৎ নাম, তদুপযুক্ত জিনিস জনসমাজকে কি-উপহার দেওয়া যাইতে পারে।

একজন স্থূলকায় বণিক এই গ্রন্থ রচনার কথা শুনিতে পাইলেন। তাঁর একটি কন্যা ছিল। এই কন্যার উপর, পণলুব্ধ অনেক যুবকেরই সতৃষ্ণ দৃষ্টি পড়িয়াছিল। বণিক বলিলেন:—

এই ছেলেটি খুবই খাটিতেছে। অত বড় গ্রন্থ এক সময়ে অবশ্যই বাহির হইবে। আমার কন্যার জন্য এইরূপ বরই চাই। আমার জামাতার সম্পত্তি থাক্ বা না থাক্

তাতে কিছু আসে যায় না, আমি শুধু চাই, সে একটা কিছু করে।

ব্রহ্মাণ্ড-তত্ত্ব-কল্পদ্রুমের ভাবী গ্রন্থকার একটা কিছু লিখিবার জন্য মাথা খুঁড়িতেছিলেন; তাঁহার সমস্ত শক্তিসামর্থ্য এই উদ্দেশেই যথাসাধ্য নিয়োগ করিতেছিলেন—ইতিমধ্যে অনেক টাকার একটি ভূসম্পত্তি এবং তার সঙ্গে একটি রূপসী পত্নী যেন আকাশ হইতে ঝপ্ করিয়া তাঁহার পদতলে আসিয়া পড়িল।

এই ক্ষুদ্রকায় সুশ্রী মেয়েটি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিল,—এক বৃহৎ গ্রন্থ-রচয়িতার সহিত তাহার বিবাহ হইবে; তখন হইতেই ভাবী পতির প্রতি তাহার ভক্তি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। ভাগ্যবান সেই পুরুষ যাহাকে তাহার ভাবী পত্নী বিবাহের পূর্ব্বেই দেবতার ন্যায় ভক্তি করে! তাই, বিবাহের পর, পতির সহিত ঘর করিবার সময়, দাম্পত্য গগনে একটিও কালো মেঘ দেখা দেয় নাই।

তাহার পত্নী তাহার স্বামীকে সংসারের খুঁটিনাটি কিছুই ভাবিতে দিত না। সে নিজেই অতি যত্নের সহিত সে সমস্ত সম্পন্ন করিত। কেননা, সে জানিত, তাহার স্বামীর মস্তিষ্ক এক্ষণে বৃহৎ গ্রন্থরচনারূপ একটা গুরুভার বহন করিতেছে আর কিছু ভাবিবার তাঁহার সময় নাই।

যেদিন তাঁহার মেজাজ খারাপ থাকিত, তখন তাঁহার পত্নী ভাবিত:—তাঁহার ইচ্ছা-মত গ্রন্থের রচনাকার্য্য অগ্রসর হইতেছে না, তাই আজ মেজাজটা খারাপ হইয়াছে।

যদি কখন তাঁহার মাথা ধরিত, তাঁহার স্ত্রী বলিত:—তোমার বড় বেশী খাটুনি হচ্ছে, অতটা পরিশ্রম করা ঠিক্ না।

এই বলিয়া, তাঁহার পত্নী তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার কাগজপত্র ও তাঁহার পুস্তক সকল কাড়িয়া লইত। কেননা, তাঁহার টেবিলটা অসংখ্য কাগজপত্রে আচ্ছন্ন থাকিত,—তাহার চারিধারে পুস্তক সকল ইতস্ততঃ ছড়ান থাকিত। তিনি তাহার মধ্যস্থলে বসিয়া থাকিতেন এবং প্রহরের পর প্রহর এইরূপ ধ্যানচিন্তায় অতিবাহিত হইত। কোন কাজ হইত না। কিন্তু এই কাজটিকে তিনি একটা প্রহসন বলিয়াও মনে করিতেন না। না—একটুও না। এই বিষয়ে যার-পর-নাই তাঁহার আন্তরিকতা ছিল—ইহাতে লেশমাত্র শঠতা ছিল না।... অন্যদের নিকট হইতে শুনিয়া শুনিয়া, তাঁহার নিজেরও একটা বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, তিনি একটা বৃহৎ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

বিজন প্রদেশে কাজটা আরও নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে মনে করিয়া তিনি পল্লীগ্রামে একটা বাড়ী ভাড়া করিলেন। সেখানে গিয়া নদীর ধারে বেড়াইয়া বেড়াইতেন; বড় বড় গাছের ছায়া-তলে সটান শুইয়া পড়িয়া চিন্তায় নিমগ্ন হইতেন। তাঁহার স্ত্রী যখন পাড়াপড়সীর বাড়ীতে দেখাসাক্ষাৎ করিতে যাইত সেই সময়ে তাহাদের নিকট সরল-অন্তঃকরণে তাঁহার স্বামীর প্রকাণ্ড গ্রন্থরচনার কথাটাও পাড়িত এবং এইরূপে ভাবী গ্রন্থকারের খ্যাতিটা মুখে মুখে আরও চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

যদি কখন তাঁহার পত্নী কোন বাড়ীতে একক সাক্ষাৎ করিতে যাইত, তখন সে এই কথা বলিত:

—মাপ করবেন, আমার স্বামী আস্‌তে পারলেন না,— তিনি একটা কাজে এত ব্যস্ত...

শেষ দুইটি শব্দের উপর একটু বেশী ঝোঁক দিয়া কষ্টের স্বরে বলিতেন।

আর যদি কেহ তাহাকে আহারের জন্য কিংবা দিনটা একসঙ্গে কাটাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিত, তখন সে থতমত খাইয়া আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া বলিত :—

—কথা দিতে আমার সাহস হয় না। আমার স্বামীর হাতে একটুও সময় নাই...যে প্রকাণ্ড কাজ হাতে নিয়েছেন!...

শরতের অবসানে, ব্রহ্মাণ্ড-তত্ত্ব-কল্পদ্রুমের ভাবী গ্রন্থকার প্যারিসে ফিরিয়া আসিয়া সুখী হইলেন; কেননা, তাঁহার মনে হইল, প্যারিসেই তাঁর কাজটা ভাল রকম চলিবে। পল্লীগ্রামে যাওয়াটা তাঁহার ভুল হইয়াছিল। তাঁহার চিন্তাকল্পদ্রুমে ফুল ধরিবার পক্ষে পল্লীগ্রামের হাওয়া উপযোগী নহে।

শীতকাল চলিয়া গেল। ইতিমধ্যে প্যারিসের সাহিত্যিক মণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার "কল্পদ্রুম" সম্বন্ধে অনেক কথা হইয়া গিয়াছে। তাঁহার বন্ধুদের আশঙ্কা হইল, কি জানি যদি আর কেহ ঐ নামে একটা গ্রন্থ আগে-ভাগে ছাপাইয়া তাঁহার ভাবী কীর্ত্তিটাকে নষ্ট করিয়া দেয়। তাহা হইলে তাঁহার এত দিনের শ্রম সমস্তই পণ্ড হইয়া যাইবে।

এই ভীষণ সংকট নিবারণ করিবার জন্য, আমাদের ভাবী গ্রন্থকার প্যারিসের প্রাচীরে প্রাচীরে এই বিজ্ঞাপনটি আঁটিয়া দিলেন।

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে :

ব্রহ্মাণ্ড-তত্ত্ব-কল্পদ্রুম।

শ্রীঅমুক-কর্ত্তৃক রচিত...

প্রকাণ্ড তিন খণ্ডে সমাপ্ত।

মূল্য ২০৲ টাকা

এই দিন হইতে, শুধু তাঁহার কতিপয় বন্ধুর নিকটে নহে,—সমস্ত জনসাধারণের নিকট তিনি "কল্পদ্রুমের" গ্রন্থকার বলিয়া পরিচিত হইলেন।

সময়ে সময়ে সংবাদ পত্রাদিতে এইরূপ লেখা বাহির হইত:—"গতকল্য প্যারিস বার্ত্তাবহের সম্পাদককে "শ্রীঅমুকের" বাড়ী হইতে বাহির হইতে দেখা গিয়াছে। তিনি নিশ্চয়ই "কল্পদ্রুমের" খোঁজখবর লইয়া আসিয়াছেন।"

অথবা:—"এই শীতকালে "কল্পদ্রুম" বাহির হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হইল না। গ্রন্থকার তাঁহার বৃহৎগ্রন্থ ছাপাখানায় পাঠাইতে যাইতেছেন এমন সময়ে তাঁহার মনে হইল, আবার আদ্যোপান্ত নূতন করিয়া লিখিতে হইবে, আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। এরূপ খাঁটি সত্যনিষ্ঠা সাহিত্য-জগতে দুর্লভ।"

অথবা:—"কল্পদ্রুম" গ্রন্থখানার কিয়দংশ সাহিত্য-পরিষদে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক গতকল্য পঠিত হইবার কথা ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, "শ্রীঅমুকের" অসুস্থতা বশতঃ উহার পঠন স্থগিত হইল। বলা বাহুল্য, জ্ঞান-পিপাসু শ্রোতৃবর্গ দুর্লভ জ্ঞানামৃতপানে বঞ্চিত হইলেন।"

অথবা:—

"নিউ-ইয়র্কের ব্ল্যাক্‌সন-এণ্ড-সন্ কেতাব-ওয়ালা, "কল্পতত্ত্বদ্রুমের" অনুবাদের স্বত্বাধিকার লাভ করিবার জন্য শ্রী-অমুক" মহাশয়ের নিকট খুব একটা বেশী রকম মূল্য দিবার প্রস্তাব করিয়াছে। ফরাসী সংস্কারের সঙ্গে

সঙ্গেই অ্যামেরিকান সংস্কারটা বাহির হইবে।"

অথবা :—"তত্ত্বকল্পদ্রুমের গ্রন্থকার একটা বড় দুর্ঘটনা হইতে বাঁচিয়া গিয়াছেন। একটা অম্‌নিবসে ধাক্কা লাগিয়া তাঁহার গাড়ী একটা চৌমাথা-রাস্তার কোণে উল্টাইয়া যায়। তাঁহাকে ও তাঁহার খাস-মুন্‌সীকে গাড়ী হইতে টানিয়া বাহির করা হয়। ঈশ্বরের কৃপায়, তাঁহার কোন আঘাত লাগে নাই। সাহিত্যের বন্ধুগণ সকলেই তাঁর দ্বার রক্ষকের ঠিকানায় তাঁহার নামে অভিনন্দন-পত্র পাঠাইয়াছেন এবং তত্ত্বকল্পদ্রুম প্রকাশিত হইতে আর বিলম্ব হইবে না মনে করিয়া অতীব প্রীত হইয়াছেন।"

অথবাঃ—তত্ত্বকল্পদ্রুমের গ্রন্থকার শীঘ্রই ইটালিদেশ যাত্রা করিবেন। সেখানে কয়েক মাস অতিবাহিত করিবেন বলিয়া সংকল্প করিয়াছেন। ইটালী দেশের সরকারী দফ্‌তরের দলিল-দস্তাবেজ বিশেষ করিয়া অনুসন্ধান করিবেন। যদি আমরা ঠিক সংবাদ পাইয়া থাকি, তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাস, তাঁহার গ্রন্থের একটা ঐতিহাসিক তথ্যসম্বন্ধে যে একটু সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, ঐ সকল লিপি-প্রমাণের দ্বারা তাহার ভঞ্জন হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে।"

যশের তুরীটাকে একচেটিয়া করিয়া রাখার একটা শাস্তি আছে। শীঘ্রই পাণ্ডুমুখশ্রী ঈর্ষ্যা অন্ধকারে বসিয়া, তত্ত্বকল্পদ্রুমের বিরুদ্ধে স্বীয় বিষদিগ্ধ বাণ শাণিত করিতে লাগিল। একজন ঈর্ষ্যাপরায়ণ অজ্ঞ সমালোচক সর্ব্বপ্রথমে বলিল, তাঁহার সুখ্যাতিটা হয়ত একটু বেশীমাত্রায় উঠিয়াছে। এই দৃষ্টান্তে সাহস পাইয়া আর এক সমালোচক এই মর্ম্মে ইঙ্গিত করিল যে, উনি একজন উচ্চ দরের লেখক নহেন; আর একজন বলিল, তাঁহার গ্রন্থে সমস্তই পুরাতন কথা; সর্ব্বশেষে একজন বলিল, তত্ত্বকল্পদ্রুম উহার নিজের রচনা নহে।

যাহাদের ঈর্ষ্যা উত্তেজিত হইয়াছিল, এই সব সমালোচনায় তাহারা আনন্দিত হইল; পক্ষান্তরে, যাহারা ন্যায়বিচারের অভিমান রাখে,—এই সব সমালোচনায় তাহাদের চিত্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তাহারা উত্তর দিল,—যে গ্রন্থ এখনও প্রকাশিত হয় নাই, তাহা ভাল কি মন্দ উহারা কি করিয়া জানিল? ইহাতে স্পষ্টই বিদ্বেষ প্রকাশ পাইতেছে। কিছু অন্যায় দেখিলে যুবকের দল সহিতে পারে না,—ইহা ধরা কথা। নিন্দার ফল এই হইল, যাঁহারা পূর্ব্বে কল্পদ্রুম-গ্রন্থকারের শুভাকাঙ্ক্ষী সুহৃৎমাত্র ছিলেন, তাঁহারা এক্ষণে গ্রন্থকারের গোঁড়া পক্ষপাতী হইয়া দাঁড়াইলেন।

ইঁহাদের মধ্যে একজন একটা চটি বাহির করিলেন; তাহাতে তত্ত্বকল্পদ্রুমের নিন্দুক দিগের মুখ হইতে মুখসটা টানিয়া ফেলিয়া তাহাদের প্রকৃত অভিসন্ধি প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইল। ইহার পরেই যুদ্ধের ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল। দুই পক্ষের আক্রমণ ও উত্তর প্রত্যুত্তরে মুদ্রাযন্ত্র কয়েকমাস ধরিয়া মুখরিত হইয়া উঠিল।

একজন বলিল,—বর্ত্তমান যুগ-যে অবনতির পথে চলিয়াছে—এই তত্ত্বকল্পদ্রুমই তাহার পূর্ব্বসূচনা। আর একদল বলিল,—তদ্বিপরীতে উহা নবীন সাহিত্যের অরুণালোক সূচিত করিতেছে।

এই প্রকারে, রাম না জন্মাতেই,

রামায়ণের বিভিন্ন সংস্কার বাহির হইয়া গেল। কৌতুকের বিষয় এই—গ্রন্থের প্রকৃত অস্তিত্ব আছে কি না এই প্রশ্নটা কাহারো মাথায় আসিল না।

সে যাহা হউক, তত্ত্বকল্পদ্রুমের গ্রন্থকার দেখিলেন, তাঁহাকে লইয়া খুব তর্ক বিতর্ক চলিয়াছে, এবং তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। অনেকগুলি বিদ্বজ্জন-সভায় এইরূপ স্থির হইল যে সভার প্রবেশ-দ্বার উক্ত গ্রন্থকারের প্রতি উদ্‌ঘাটিত করা তাঁহাদের একান্ত কর্ত্তব্য। ক্রমে, ডাকের চিঠির মত তিনি "অ্যাকাডেমি"তেও সহজে প্রবেশ লাভ করিলেন।

এদিকে গভর্ণমেণ্টও ভাবিত হইয়া পড়িলেন। যাঁহার নাম সকলেরই জিহ্বাগ্রে, এবং যিনি ভবিষ্যতে সাহিত্যজগতে সম্মান লাভ করিবেন,—এমন ব্যক্তির জন্য গভর্ণমেণ্ট এখনও কিছুই করিলেন না? গভর্ণমেণ্ট তাঁকে একটা সরকারী পুস্তকাগারে অধ্যক্ষপদ দিবেন বলিয়া প্রস্তাব করিলেন এবং সেই সঙ্গে এইরূপ আশাও প্রকাশ করিলেন যে, এই পদটি প্রাপ্ত হইলে, তিনি যে বৃহৎ গ্রন্থরচনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা সুসম্পন্ন হইবার সুযোগ হইবে। এই পদটি একটা মোটা-বেতনের পদ ও বেশ আরামের পদ। বিশেষ কোন কাজ করিতে হয় না।

প্যারিসের প্রাচীরে প্রাচীরে যখন ব্রহ্মাণ্ড-কল্পদ্রুমের বিজ্ঞাপন প্রথম আঁটিয়া দেওয়া হয়, তাহার পর ১১ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। এরূপ গ্রন্থকারের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি কাহার হৃদয়ে না স্বতঃ উচ্ছ্বসিত হইবে?—কে না এইরূপ বলিবে?

—ইনি তত্ত্বকল্পদ্রুমের গ্রন্থকার! এই গ্রন্থরচনাকার্য্যে ইনি ১১ বৎসর ধরিয়া খাটিতেছেন!

কালসহকারে এই শ্রদ্ধাভক্তি আরও গভীর হইয়া উঠিল। লোকের মুখে নিম্নলিখিত কথা যতই শোনা যাইতে লাগিল, ততই এই শ্রদ্ধাভক্তি আরও বাড়িতে লাগিল :—

—২০ বৎসর ধরিয়া…

—২৫ বৎসর ধরিয়া… ইনি খাটিতেছেন।

—৩০ বৎসর ধরিয়া…!

তাঁহার পৃষ্ঠদেশ, যশোগৌরবের গুরুভার আর যেন বহিতে পারিতেছিল না। যে মাথার ভিতর এত তত্ত্ব টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতেছিল, তাহাতে শীঘ্রই টাক্ দেখা দিল। তিনি যখন কাফির দোকানে এক পেয়ালা চা পান করিবার জন্য প্রবেশ করিতেন, খানসামা কাফি-ঘরের কর্ত্তার দিকে ঝুঁকিয়া বলিত :—

"উনি সেই "শ্রী-অমুক"…! উনি কৃতিত্বের চরম শিখরে উঠিয়াছেন।" অসংখ্য সাক্ষাৎ-কারী—আপনাদের সম্বন্ধেই হউক, অথবা তাঁহাদের প্রিয় আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধেই হউক, তাঁহার গ্রন্থের এক পৃষ্ঠায় স্থান পাইবার আশায় আকৃষ্ট হইত। যে গ্রন্থ সাহিত্য-জগতে এত হুলস্থূল বাধাইয়া দিয়াছে, তাহার মধ্যে—অন্ততঃ তাহার এক ক্ষুদ্র পাদটীকার মধ্যেও—স্বীয় নামের উল্লেখ দেখিবার আশায়, যে নিতান্ত উদাসীন সেও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার বাটী, বহুমূল্য গ্রন্থে ও শিল্পসামগ্রীতে প্লাবিত হইতে লাগিল :—অর্দ্ধকায় মূর্ত্তি, ছাপ-ছবি, চিত্রপট, প্রাচীন মুদ্রা; অতীব দুর্লভ ও কৌতুকাবহ প্রত্নতত্ত্ব-ঘটিত গ্রন্থাদি।

মন্ত্রীর একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু—যিনিও আপনার নাম তত্ত্বকল্পদ্রুমের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত দেখিবার জন্য কম লালায়িত ছিলেন না—তিনি একদা ঐ উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীকে বলিলেন :—

—যিনি বিদেশীয় রাজাদের নিকট হইতে ২৫ খানা সম্মান-উপাধি পাইয়াছেন, তিনি কিনা আজও ফরাসী রাজ্যের সম্মান-উপাধি পাইলেন না! মন্ত্রী উত্তর করিলেন :—

– কেন যে পাইলেন না, আমিও বুঝিতে পারিতেছি না। কিন্তু সহজেই এই ত্রুটির প্রতিকার হইতে পারে।

তত্ত্বকল্পদ্রুমের গ্রন্থকার যেমন এক দিকে খ্যাতির ভারে ভারাক্রান্ত তেমনি আর এক দিকে বয়সের ভারেও ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি ক্ষুদ্র পার্থিব উপাধির জন্য আর লালায়িত ছিলেন না,—তিনি ভাবিতেন "কীর্ত্তির্যস্য সজীবতি"। অমর কীর্ত্তি লাভের আশায় তাঁহার গ্রন্থখানি শীঘ্র প্রকাশ করিবার জন্য এক্ষণে তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু যখনই কেহ তাঁহার নিকটে এই কথা পাড়িত, তিনি মাথা নাড়িয়া উত্তর দিতেন :—

"উঁহু, উঁহু! আমার এখনও অনেক করবার আছে!" যাই হোক, অবশেষে তিনি অঙ্গীকার করিলেন, এই শীতকালের মধ্যেই তাঁহার তত্ত্বকল্পদ্রুম নিশ্চয়ই বাহির করিবেন। কিন্তু, দেশ যাঁহার নিকট হইতে সাহিত্যের একটা নূতন জিনিস আশা করিতেছিল, নির্ম্মম মৃত্যু আসিয়া হঠাৎ তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল।

তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া খুব ঘটা করিয়া সম্পন্ন হইল। সমস্ত সাহিত্য-সভার প্রতিনিধি-গণ উপস্থিত ছিলেন। অন্তিম অনুষ্ঠানের সময় অ্যাকাডেমির একজন সভ্য এই মর্ম্মে বক্তৃতা করিলেন :—

"মহাশয়গণ!

আমার প্রতি যে ভার অর্পিত হইয়াছে যদিও তাহা কষ্টকর, কিন্তু ইহার একটা মধুর দিক্‌ও আছে। যে জীবনের ভস্মরাশি এখনও শীতল হয় নাই, সেই জীবন হইতে অক্লান্ত শ্রমের দৃষ্টান্ত আমরা কি গ্রহণ করিতে পারি না?—ইহা অপেক্ষা সান্ত্বনার বিষয় আর কি আছে? যিনি অপেক্ষাকৃত সামান্য অবস্থার লোক ছিলেন, তিনি কেবল স্বকীয় শ্রমের প্রভাবে, প্রভূত শ্রমের প্রভাবে, অক্লান্ত শ্রমের প্রভাবেই এই উচ্চ গৌরবশিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন।"

এইস্থলে, তাঁহার জীবনের কতকগুলি ঘটনাও বিবৃত করা হইল। তাহার পর, মৃত ব্যক্তির প্রধান সাহিত্য কীর্ত্তির উল্লেখ করিয়া এইরূপ স্তুতিবাদ করা হইল :—

"মহাশয়গণ! আমি যে গ্রন্থের উল্লেখ করিতেছি তাহার কি আবার নাম করিতে হইবে? না, তাহার নাম আপনাদের সকলেরই মুখে-মুখে বিরাজ করিতেছে। আপনারা ঐ গ্রন্থ পাঠ না করিলেও, পঠিতের ন্যায়ই উহার সহিত পরিচিত আছেন। কিন্তু হায়! মানুষের জীবন কি ক্ষণস্থায়ী! যে গ্রন্থ, খ্যাতির পটে অক্ষয় নাম মুদ্রিত করিবে, হায়! নির্দ্দয় কাল আসিয়া তাহাতে বাধা দিল। কাল! তুমি কি নিষ্ঠুর! অনন্তের নিকট আমরা নিতান্তই নগণ্য পদার্থ! কিন্তু একটা জীবনের এতটা শ্রম কখনই

একেবারে নষ্ট হইতে পারে না। অন্তত তাহার উপাদানগুলি সংগ্রহ করিয়া ভাবী বংশকে উপহার দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য। ভবিষ্যদ্‌বংশ ভিন্ন এরূপ গৌরবান্বিত সম্পত্তির আর কে অধিকারী হইতে পারে? আমাদের খ্যাত-নামা ও শোচনীয় সহযোগী স্বয়ং ইহার কোন উপায় করিয়া গিয়াছেন কিনা আমরা জানি না;—তিনি করুন বা না করুন, তাঁহার অন্তিম ইচ্ছার অছিরা, অবশ্য তাঁহার অমর গ্রন্থটিকে বিনষ্ট হইতে দিবেন না, সাহিত্য-মন্দিরে নিশ্চয়ই তিনি একটা উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। যতটা উচ্চে উঠিবার সম্ভাবনা ছিল, হায়! অনিবার্য্য ঘটনাচক্র তাহার প্রতিবন্ধক হইল। ইহা কি কম দুঃখের বিষয়?"

এই বক্তার অভিপ্রায়-অনুসারে, গ্রন্থ-কারের অছিরা তাঁহার বৃহৎ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি-খানি তাঁহার কাগজপত্রের মধ্যে তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিল।

অবশেষে তাহারা একখানা সাদা কাগজ খুঁজিয়া পাইল; তাহার উপর তিন পংক্তিতে এই নামটি মাত্র লেখা আছে—তাহাও আবার কলমের আঁচড়ে কাটা।

ব্রহ্মাণ্ড
তত্ত্ব
কল্পদ্রুম।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

বুধ-গ্রহের নূতন তথ্য

বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহগণ যে, পরে পরে মহাকাশে সজ্জিত থাকিয়া সূর্য্য-প্রদক্ষিণ করিতেছে, ইহা নূতন কথা নয় এবং ইহাদের ভ্রমণ-পথ যে, চিরনির্দ্দিষ্ট তাহাও বহুকাল হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে গ্রহগণের গতিবিধি এবং তাহাদের প্রাকৃতিক অবস্থাসম্বন্ধে এত অধিক নূতন তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে যে, এখন জ্যোতিঃশাস্ত্রকে নূতন করিয়া না লিখিলে চলিতেছে না। জ্যোতিষ্ক-পরিদর্শনের উপযোগী এক একটি নূতন যন্ত্রের আবিষ্কার জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের সম্মুখে সত্যই এক একটি নূতন দৃশ্যপট উদ্‌ঘাটন করিতেছে। আধুনিক জ্যোতিষীগণ সৌরজগতের গ্রহগুলি-সম্বন্ধে যে-সকল নূতন কথা জানিতে পারিয়াছেন আমরা একে একে তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিব।

মহাকায় সূর্য্যের ক্রোড়ে অবস্থিত বুধ-গ্রহটির কথা প্রথমে আলোচনা করা যাউক। সূর্য্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব প্রায় নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল। নেপচুন্ নামক গ্রহটি সৌরজগতের সীমান্ত-প্রদেশে থাকিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে; সূর্য্য হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় দুইশত আশী কোটি মাইল। কিন্তু বুধের দূরত্ব তিন কোটি ষাট্ লক্ষ মাইলের অধিক নয়। এই কারণে বুধকে প্রকৃতই সূর্য্যের ক্রোড়ে অবস্থিত বলা যাইতে পারে। সূর্য্যের এত নিকটে থাকায় বুধ গ্রহটি

বহুদিন আত্মগোপন করিয়া আসিতেছিল। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না, কিন্তু সূর্য্যের প্রখর আলোকের মধ্যে বুধমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া নূতন কিছু আবিষ্কার করা প্রাচীনেরা একপ্রকার অসাধ্য ব্যাপার বলিয়াই মনে করিতেন। বুধের আকার ঠিক্ কি প্রকার এবং তাহার গুরুত্বই বা কত, এই সকল ব্যাপার পূর্ব্বে অনেকটা অনুমানের উপরেই নির্ভর করিয়া বলা হইত, ইহার প্রকৃত আকার এবং গুরুত্বাদি অতি অল্প দিন হইল অভ্রান্তরূপে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

আধুনিক যুগের জগদ্বিখ্যাত জ্যোতিষী সিয়াপেরিলির নাম পাঠক অবশ্যই অবগত আছেন। আমাদের অতি-নিকট জ্যোতিষ্ক মঙ্গল গ্রহটিতে জীব-বাসের সম্ভাবনার কথা ইনিই সর্ব্ব প্রথমে প্রচার করেন। কিন্তু ইহাই তাঁহার জীবনের প্রধান কীর্ত্তি নয়। বুধ গ্রহের ন্যায় যে-সকল জ্যোতিষ্ক বৎসরের অধিকাংশ সময়েই সূর্য্যালোকের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া আমাদের দূরবীণের অন্তরালে থাকিয়া যায়, তীব্র দিবালোকে সেগুলিকে পর্য্যবেক্ষণ করিবার উপায় নির্দ্ধারণই তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি। সূর্য্যালোকে মজ্জমান বুধ গ্রহটির সম্বন্ধে আমরা যে সমস্ত নূতন তত্ত্ব জানিতে পারিতেছি, তাহা সিয়াপেরিলির প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করিয়াই আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমাদের পৃথিবী যেমন প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা সময়ে নিজের অক্ষ-রেখার চারিদিকে একবার পূর্ণাবর্ত্তন দেয়, বুধও ঠিক সেই সময়ে এক একটা পূর্ণাবর্ত্তন শেষ করে বলিয়া জ্যোতিষীদের বিশ্বাস ছিল। পুরাতন জ্যোতিষিক গ্রন্থাদিতে বুধের আবর্ত্তন-কাল চব্বিশ ঘণ্টা বলিয়া আজ লিপিবদ্ধ আছে। দিবালোকের মধ্যে বুধ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এবং বুধ মণ্ডলের উপরে যে কতকগুলির কালো দাগ থাকে সেগুলি ঘুরিয়া আসিতে কত সময় ক্ষেপণ করে, তাহা স্থির করিয়া সিয়াপেরিলি সাহেব, বুধের আবর্ত্তন-কাল চব্বিশ ঘণ্টা দেখিতে পান নাই। তিনি স্পষ্টই দেখিয়াছিলেন, যে চিহ্নটি আজ বুধ-মণ্ডলের কোন নির্দ্দিষ্ট অংশে দেখা যাইতেছে তাহাই ৮৮ দিন পরে বুধের সেই নির্দ্দিষ্ট অংশে ঘুরিয়া আসিয়া দেখা দেয়। কাজেই আধুনিক জ্যোতিষীগণ বুধের আবর্ত্তন-কাল চব্বিশ ঘণ্টার পরিবর্ত্তে ৮৮ দিন বলিয়াই স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আধুনিক নূতন জ্যোতিষিক গ্রন্থাদিতে বুধের পূর্ণাবর্ত্তন কাল ৮৮ দিন বলিয়াই উল্লেখ করা হইতেছে।

আমাদের চন্দ্রদেব প্রায় সাতাইস্ দিনে একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসে। চন্দ্র পৃথিবীরই উপগ্রহ, কাজেই পৃথিবী প্রদক্ষিণ করা ইহার কাজ। কিন্তু ইহাই চন্দ্রের এক মাত্র গতি নয়। আমাদের পৃথিবী যেমন চব্বিশ ঘণ্টায় নিজের অক্ষ-রেখার চারিদিকে একবার ঘুরপাক্ খায়, এবং বুধ যেমন ৮৮ দিনে ঐ প্রকার আবর্ত্তন শেষ করে, চন্দ্রও সেই প্রকার ২৭ দিনে এক একটা পূর্ণাবর্ত্তন দেয়। প্রদক্ষিণ-কাল এবং আবর্ত্তন-কালের এই প্রকার একতা থাকায় চন্দ্রের সেই শশলাঞ্ছিত একটা দিকই সর্ব্বদা পৃথিবীর দিকে উন্মুক্ত থাকে। পূর্ব্ব পণ্ডিতগণ মনে করিতেন, বুধের প্রদক্ষিণ-কাল ও পরিভ্রমণ-কালের মধ্যে এই প্রকার

একতা নাই, কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতগণ ইহার প্রদক্ষিণ ও আবর্ত্তন উভয়ই ৮৮ দিনে শেষ হইতে দেখিতেছেন। কাজেই স্বীকার করিতে হইতেছে, চন্দ্রের ন্যায় বুধেরও একটা নির্দ্দিষ্ট পৃষ্ঠই চিরদিন সূর্য্যালোকে আলোকিত থাকে। চন্দ্রের অপর পৃষ্ঠের প্রাকৃতিক গঠন যেমন আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রহিয়াছে গিয়াছে, বুধেরও অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃষ্ঠদেশ সেই প্রকার চিরদিন আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে রহিয়াছে।

বুধ-গ্রহ আকারে কত বড় জানিবার জন্য কয়েক বৎসর পূর্ব্বের জ্যোতিষিক গ্রন্থ অনুসন্ধান করিলে, ইহার ব্যাসের পরিমাণ তিন হাজার মাইল বলিয়া জানা যাইত। আধুনিক পণ্ডিতদিগের গবেষণার ফলে ইহাও ভুল বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। এখন সকলেই বুধগ্রহের ব্যাস তিন হাজার চারিশত মাইল বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। জিনিসের ব্যাস বৃদ্ধি পাইলে তাহার আয়তনও বৃদ্ধি পায়। কাজেই কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বুধ গ্রহের যে আয়তন স্বীকৃত হইয়া আসিতেছিল, এখন তাহাও ভুল বলিয়া মানিতে হইতেছে। এখনকার হিসাবে, পূর্ব্বের তুলনায় ইহার আয়তন দেড়গুণ অধিক হইয়া পড়িতেছে। বুধ-গ্রহের গুরুত্ব নির্ণয় করিবার জন্য প্রাচীন জ্যোতিষিকগণ দীর্ঘকাল গবেষণা করিয়াছিলেন। বহু পর্য্যবেক্ষণ এবং হিসাবপত্র করিয়া স্থির হইয়াছিল, আমাদের পৃথিবীর কোন নির্দ্দিষ্ট আয়তনের গড়-গুরুত্ব যদি ১০০ মণ হয় তবে বুধ-গ্রহের সেই আয়তনের গুরুত্ব ১২১ মণ হইবে। বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনস্ এবং নেপ্‌চুন প্রভৃতি বড় বড় গ্রহের গুরুত্ব বহুদিন হইতে স্থির হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু গুরুত্বে কোন গ্রহই বুধের সমান হইতে পারে নাই। এই ক্ষুদ্র গ্রহটির গুরুত্বের যে একটা গৌরব ছিল, সম্প্রতি ইহা তাহা হইতেও স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের পৃথিবী এবং শুক্র-গ্রহ বুধের নিকট-প্রতিবেশী; এই কারণে বুধের টানে পৃথিবী ও শুক্র উভয়ই কখন কখন বিচলিত হইয়া পড়ে। এই বিচলনের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়াই বুধের গুরুত্ব নির্ণয় করা হইয়া থাকে। তা ছাড়া এন্‌কি (Encke) সাহেবের আবিষ্কৃত যে ধূমকেতুটি তিন বৎসর তিন মাস কালে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতেছে, তাহারও বিচলন পরীক্ষা করিয়া কেহ কেহ বুধের গুরুত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। গত ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে কয়েক জন জ্যোতিষী নূতন করিয়া বুধের গুরুত্ব নিরূপণের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন; ইহার ফলে বুধকে পৃথিবী অপেক্ষাও লঘুতর দেখা গিয়াছিল। সম্প্রতি টিসারাণ্ড্ (Tisserand) নামক জনৈক বিখ্যাত জ্যোতিষী বুধের আকর্ষণে শুক্রগ্রহের বিচলন পরীক্ষা করিয়া পূর্ব্বোক্ত জ্যোতিষীগণের সিদ্ধান্তের পোষণ করিয়াছেন। ইহার হিসাবে বুধের গুরুত্ব পৃথিবীর গুরুত্বের তিন চতুর্থাংশ অপেক্ষাও অল্প।

যে অক্ষরেখা অবলম্বন করিয়া আমাদের পৃথিবী দিবারাত্রি লাটুর মত ঘুরপাক্ খাইতেছে, সেই রেখাটি তাহার ভ্রমণ-পথের উপরে ঠিক্ খাড়া হইয়া নাই। জ্যোতিষীগণ হিসাব করিয়া বাহির করিয়াছেন, পৃথিবী নিয়তই তাহার মেরুদণ্ড এক নির্দ্দিষ্ট দিকে নির্দ্দিষ্ট

পরিমাণে বাঁকাইয়া আবর্ত্তন করে, অর্থাৎ লাট্টুকে যেমন কখনো কখনো বাঁকা হইয়া দাঁড়াইয়া ঘুরিতে দেখা যায় পৃথিবী ঠিক্ সেই প্রকার বাঁকিয়া ঘুরপাক্ খায়। আমাদের শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতির ঋতুর পার্থক্য এবং গ্রীষ্ম বর্ষা ও শীত প্রভৃতিতে দিনরাত্রির অসমতার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে পৃথিবীর মেরু-দণ্ডের ঐ বক্রতাকেই একমাত্র কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। বুধগ্রহের মেরুদণ্ড পৃথিবীর মত হেলিয়া আছে, কি সোজা হইয়া দণ্ডায়মান আছে, ইহা আবিষ্কার করিবার জন্য প্রাচীন ও আধুনিক জ্যোতিষীগণ বহু পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি জানা গিয়াছে বুধ ঠিক্ সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াই ঘুরিতেছে। এই ব্যাপারটিকেও আধুনিক যুগের একটা প্রধান আবিষ্কার বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বুধের মেরুদণ্ডের অবস্থান-সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত আবিষ্কারটি এক জন পণ্ডিতের গবেষণায় সম্পন্ন হয় নাই। আজকাল প্রত্যেক মান-মন্দিরেরই জ্যোতিষীগণ উহার সত্যতা সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছেন এবং তাহা লইয়া নানা হিসাব-পত্র আরম্ভ করিতেছেন। কাজেই এখন বলিতে হইতেছে ঋতুবিশেষে আমাদের পৃথিবীতে যেমন দিন রাত্রির দৈর্ঘ্য কখনো অল্প এবং কখনো অধিক হয়, বুধ গ্রহে তাহা হয় না। বুধের এক অংশ চিরকালই দিবসালোকে উন্মুক্ত থাকে এবং এক দিকে অনন্ত দিবা ও অপর দিকে অনন্ত রাত্রি ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় না।

আমাদের পৃথিবীর ভ্রমণ পথটি যেমন প্রায় বৃত্তাকার, বুধের পথ সে প্রকার নয়। বৃত্তের উপর ও নীচে চাপ দিয়া অধিক চেপ্টাইয়া দিলে তাহার আকৃতি যে প্রকার হয়, বুধের পথটা সেইপ্রকার চেপ্টা ধরণের। সর্ব্বদা সূর্য্যের দিকে একটা দিক্ উন্মুক্ত রাখিয়া বুধ যখন এই পথ অবলম্বনে সূর্য্যপ্রদক্ষিণ করে, তখন ইহার চির তমসাচ্ছন্ন পিছন্ দিক্‌টার দুই পার্শ্বের কতক অংশ সূর্য্যালোকে আলো-কিত হইয়া পড়ে। আমাদের চন্দ্রেরও অন্ধকারাচ্ছন্ন পশ্চাৎ ভাগের কিয়দংশ ঠিক ঐ প্রকারে মাঝে মাঝে আলোকিত হয়। সুতরাং বলিতে হয়, বুধ গ্রহের একার্দ্ধ চির-কাল আলোকে এবং অপরার্দ্ধ চিরকাল অন্ধ-কারে উন্মুক্ত থাকা সত্বেও, আলোক ও অন্ধ-কারের রাজ্যের সন্ধিস্থলে দিবারাত্রির ভেদ আছে। কিন্তু এই সীমান্ত স্থানের দিনগুলি আমাদের দিনের ন্যায় নয়; এবং বুধলোকের দিন আমাদের ৮৮ দিনের সহিত সমান।

সূর্য্য অস্তগত হইলেই পৃথিবী ঘোর অন্ধ-কারে আবৃত হয় না। পৃথিবীতে অতি ধীরে ধীরে দিবসালোক অন্তর্হিত হয়, এবং রাত্রির অন্ধকারও সেইপ্রকার ধীরে ধীরে লঘু হইয়া দিবালোক উৎপন্ন করে। সন্ধ্যা ও উষার এই অস্পষ্ট আলোকের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, বৈজ্ঞানিকগণ আমাদের আকাশের বায়ু রাশিকেই এই আলোকের কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। সূর্য্য অস্তগত হইয়া আমা-দের চক্ষুর অন্তরালে চলিয়া গেলে ইহার রশ্মিগুলি হঠাৎ নিঃশেষে অন্তর্হিত হয় না আমাদের আকাশে যে সকল বায়ুস্তর সজ্জিত আছে তাহাতে ঠেকিয়া অস্তগত সূর্য্যের রশ্মি বাঁকিতে বাঁকিতে কিছুকাল আবার ভূতলে আসিতে আরম্ভ করে। কাজেই সূর্য্য না

থাকিলেও তাহার ঐ বাঁকা রশ্মিগুলি সন্ধ্যার অন্ধকারকে লঘু করিতে থাকে। বুধের আকাশমণ্ডলে বায়ু বা তাহার মত কোন বায়ব পদার্থের অস্তিত্ব দেখা যায় নাই। কাজেই সেখানে সূর্য্যের রশ্মি বাঁকিয়া আসিতে পারে না। এই কারণে বুধ-লোকের যে দুই ক্ষুদ্র অংশে দীর্ঘ দিনরাত্রির ভেদ আছে, সেখানে সন্ধ্যা বা উষার মৃদু আলোক কখনই দেখা যায় না। ৮৮ দিন পরে যখন রাত্রি উপস্থিত হয়, তখন তাহার অন্ধকার হঠাৎ আসিয়া দেশটাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

আমাদের পৃথিবীর যেমন একটি চন্দ্র আছে, বুধের নিকটে সেপ্রকার চন্দ্র নাই; সে সহচর-হীন হইয়া সূর্য্য-প্রদক্ষিণ করিতেই ব্যস্ত। কাজেই আমাদের দশ বারো ঘণ্টার রাত্রিগুলা যেমন চন্দ্রের আলোকে আলোকিত হইয়া মধুর হইয়া দাঁড়ায়, বুধের দীর্ঘ ৮৮ দিনের রাত্রিতে সে মাধুর্য্যটুকুও অনুভব করিবার উপায় নাই। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ঘোর অমাবস্যা নিশার নিবিড় অন্ধকার ইহাকে ঢাকিয়া ফেলে।

গ্রহদিগের পরিচয় প্রদান করিতে গেলেই তাহাতে জীব বাস করে কিনা এই প্রশ্নটি অনেকে জিজ্ঞাসা করেন। সৌরজগতের ক্ষুদ্রতম গ্রহ বুধের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল তাহা পাঠ করিলে পাঠক অবশ্যই বুঝিবেন, ভূতলে আমরা যে সকল জীবের সহিত পরিচিত আছি, তাহাদের একটিও বুধলোকে গিয়া এক মুহূর্ত্ত জীবিত থাকিতে পারে না। জল এবং বায়ু, প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবন-রক্ষার প্রধান উপকরণ, কিন্তু বুধলোকে এই দুই বস্তুর একান্ত অভাব. কাজেই সেখানে কোন জীবই থাকিতে পারে না। তার পর দিবা রাত্রি, মাস সম্বৎসরের যে সকল বৈচিত্র্যে ভূপৃষ্ঠে এই জীবরাজ্যের সৃষ্টি করিয়াছে, বুধলোকে অধিকাংশ স্থানেই তাহার চিহ্নমাত্র নাই; ইহার একদিকে অনন্ত মহারাত্রি অপর দিকে অনন্ত মহা-দিবা চিরদিন বিরাজ করিতেছে, সুতরাং তাহার কোন অংশে জীব-বাস একবারে অসম্ভব। পৃথিবীর তুলনায় বুধে সূর্য্যের তাপ এবং আলোক উভয়ই অত্যন্ত অধিক পরিমাণে পতিত হইয়া থাকে; বড় দূরবীণের সাহায্যে বুধমণ্ডলে যে সকল সুদীর্ঘ কৃষ্ণ-রেখা আবিষ্কৃত হইয়াছে, আধুনিক জ্যোতিষীগণ সেগুলিকে সৌর-তাপেরই উৎপাতের চিহ্ন বলিয়া মনে করিতেছেন; জল নাই অথচ যথেষ্ট তাপ আছে, কাজেই বুধের শিলামৃত্তিকা ফাটিয়া গিয়া ঐ সকল চিহ্নের উৎপত্তি করিয়াছে। তাপাধিক্যে এবং জলাভাবে যে-গ্রহের এপ্রকার দুর্দ্দশা তাহা কখনই জীব বাসের উপযোগী নয়।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

আয়েষা

শ্রীমতী সুনয়নী দেবী অঙ্কিত চিত্র হইতে

বাস্তুকাহিনী

গোড়া থেকেই বলে' রাখচি কিন্তু গল্পটি বড় ভয়ানক। যদি তোমরা ভীতু হও তাহ'লে এ গল্প পোড়ো না। আর নিতান্তই যদি পড়বার লোভ সামলাতে না পার তো খবরদার! রাত্রে শোবার আগে কখ্‌খনো পোড়ো না।

ব্যাপারটা মিথ্যে নয়—সত্য সত্যই ঘটেছিল।

আমার তখন তরুণ বয়স,—আমি একজন উদীয়মান ঔপন্যাসিক। তখনকার মাসিক পত্রগুলো হাঁটকালে সে খবর পাবে। ভুতুড়ে কাণ্ড, ভৌতিক ব্যাপার এই সব নিয়েই থাকতুম। গোলমেলে রহস্য, মারাত্মক দুর্ঘটনা আর ভয়ের গল্পগুলোই আমার জমত ভালো।

তখন পশ্চিমে থাকি। শীতকালে এক-দিন বেড়াতে বেরিয়ে রাত হয়ে গেল। নিকটে কোথাও থাকবার জায়গা নেই;—ধু ধু মাঠের ওপর থেকে শীতের হাওয়া হাড় কাঁপিয়ে তুলছিল। ঘুরতে ঘুরতে একটা বাগান-বাড়ীর সামনে এসে পৌঁছলুম। শুনলুম, সেটা জমিদার রমণীবাবুর বাড়ী। সেখানেই রাত কাটাবো ঠিক করে' দরজায় ঘা দিলুম। জমিদার বাবু আমায় সাদরে আহ্বান করে' নিলেন, তাঁর বাড়ীতে অতিথ প্রায়ই এসে থাকে;—কেউ কখনো বিমুখ হয় না।

রমণীবাবুর বিষয় পূর্ব্বেই কিছু কিছু শুনে-ছিলুম। তিনি কয়েকবৎসর পূর্ব্বে বাংলাদেশ থেকে এসে এখানেই বস বাস করচেন। লোকটি ভারি অদ্ভুত রকমের—রং তামাসা নিয়েই আছেন। পড়াশুনো বেশ করেচেন, কেতাবও আছে অনেক। একটা ঘর তাঁর শীকারকরা হরেকরকমের মরা পশুপক্ষীতে পূর্ণ;—কেউ যদি কৌতূহলী হয়ে তাদের সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করেন—তিনি অমনি গড়গড় করে' তাদের বিবরণ বলতে আরম্ভ করেন। তাঁর মুখে জানোয়ারের অদ্ভুত অদ্ভুত নাম শুনে লোকের তাক লেগে যায়। তা ছাড়া তাঁর চিত্রশালা আছে; পারিবারিক ঘটনা-লেখা পুঁথিপত্রও আছে বিস্তর। আর এক মস্ত বাতিক ছিল তাঁর কলকব্জার। তাঁর ঘরের দ্বারের কাছে একটা লোহার মানুষ দাঁড়িয়ে থাকত, কেউ দরজা খুললেই সে বন্দুক উঁচিয়ে আগন্তুকের দিকে টিপ করত, দরজা বন্ধ করলেই আবার সভ্যভব্যের মত বন্দুক নামিয়ে ধরত! নবাগত ভীরু আগন্তু-কেরা তা দেখে ভয়ে মৃতপ্রায় হয়ে পড়ত। হলের টেবিলের ওপর কেউ কনুইয়ের ভর দিলেই অদৃশ্য বাঁশি বেজে উঠত! একখানা চেয়ার ছিল তা'তে বসলে আর ওঠা অসম্ভব হোত, চেয়ারখানা লোকটিকে এমনই জোরে আঁকড়ে ধরত! এমন কত কি ছিল।

এ সব ব্যাপার আমি আগেই শুনেছিলুম। রমণী বাবু কিন্তু আমার সঙ্গে এ সব কৌতুক কিছুই করলেন না। তিনি তাঁর লাইব্রেরিতে আমায় নিয়ে গিয়ে পুঁথিপত্র অস্ত্রশস্ত্র পুরাণো শিলমোহর প্রভৃতি দেখাতে লাগলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিষয়ে কত আশ্চর্য্য গল্প,

কত প্রেমের কাহিনী শোনাতে লাগলেন। প্রাচীনকালের সে সব নায়ক নায়িকার সকল স্মৃতি-চিহ্নই লোপ পেয়েছে—আছে কেবল একখানা বর্শা বা একপাটি চটি—এই রকম টুকরো টাকরা জিনিস—কিন্তু সেই গুলোই মনটাকে কখনো ভয়ে আড়ষ্ট, কখনো দুঃখে অভিভূত, কখনো বিস্ময়ে চমকিত করে' তুলছিল! ভালই করেছিলুম এখানে এসে; কত ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান, কত গল্পের খোরাক পাওয়া গেল!

কথায় কথায় সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল। আহারাদি সেরে একটা বড় ঘরে গিয়ে বসলুম। ঘরের মাঝে একটা চুল্লিতে আগুন জ্বলছিল। তার চারদিকে সোফা, আরামকেদারা—আয়েশের বিবিধ সরঞ্জাম। সামনে তেপায়ার ওপর এক এক পেয়ালা চা নিয়ে সোফায় বসে' গল্পগুজবে ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে দেওয়া গেল। রাতও হয়েছিল—সেদিন হেঁটেছিলুমও অনেক;--আগুনের ধারে বসে' বসে' চোখ জড়িয়ে আসছিল

আমার অবস্থা দেখে রমণীবাবু বল্লেন--আপনার ঘুম পেয়েছে, দেখচি।

আমি বল্লুম—হ্যাঁ। শুয়ে পড়লেই হয় এখানে।

রমণীবাবু হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠলেন, বল্লেন—এ ঘরে আপনার শোওয়া হতে পারে না। ঘরটা তেমন সুবিধের নয়। নতুন লোক কেউ টেঁকতে পারে না এ ঘরে। কত লোক মারা গেছেন এখানে!

মারা গেছেন! বল্লেন কি মশাই!—চোখ থেকে ঘুম একেবারে বিদায় নিলে।

"ভুত আসে না কি, এ ঘরে?"

"আসে বল্লে ঠিক হবে না, তাঁরা এই ঘরেই আছেন। দিনই হোক, রাতই হোক—তাঁদের দর্শন দুর্লভ নয়।"

কৌতূহলে আমার ঘুম সে তল্লাট ছেড়ে পালালো। চারিদিকটা একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিলুম।

রমণীবাবু বল্লেন—ভুতের কথা বল্লুম বলে' ভাববেন না যেন যে তারা পায়ে শিকল বেঁধে সাদা চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। এখানে যা আছে সেটা অতি সামান্যই জিনিস—হাতের মুঠোর মধ্যেই ধরা যায়। দেখবেন?

আমি একেবারে লাফিয়ে উঠলুম।

"কই আপনার ভুত? দেখান আমায়!"

তিনি আমায় ঘরের এক কোণে নিয়ে গেলেন। সেখানে একখানা সবুজ পর্দ্দা টাঙানো। পর্দ্দাটা তিনি সরিয়ে দিলেন; দেখলুম, একটা গোল কাঁচে ঢাকা দুটো মড়ার খুলি। আশ্চর্য্য এইটুকু যে, খুলি দুটো পিঠে পিঠ দিয়ে রয়েচে।

এর মধ্যে আর ভৌতিক কি আছে? একটা ওপড়ানো দাঁত যেমন নিরীহ এও তো তেমনি! এতে ভয়ের কারণ কি?

রমণীবাবু বল্লেন—তবে শুনুন। এ বাড়ী আগে দুই ভায়ের ছিল—করিম ও রহিম খাঁ। তাদের ইতিহাসটা ভারি দুঃখের। দুই ভাইয়ের মধ্যে ভয়ানক মনোমালিন্য ছিল, বাড়ী ও সম্পত্তি কার হবে তাই নিয়ে অবিরাম ঝগড়া-বিবাদ চলছিল। একবার বিবাদ মেটবার পরই বড় ভাই ছোট ভাইকে নিমন্ত্রণ করে। এবং তাকে মদ খাইয়ে বেহুঁস করে' ফেলে তার মাথায় লম্বা পেরেক বিঁধে মেরে ফেলে। পেরেকটাও আছে এখানে।

এক বেটা চাকর এ কাজে সাহায্য করেছিল, শেষে সে সব ফাঁশ করে' দিলে—ফলে বড় ভাইটির গর্দ্দান গেল। বধ্যভূমিতে নিয়ম মাফিক তাকে গোর দেওয়া হোল, মুণ্ডটি কেবল বাড়ীর পাতাল-কুঠরিতে সমাহিত করা হোল। যে ভাইটি খুন হয়েছিল তার অস্থিও সেখানে ছিল। এক কোণে দুই ভায়ের মাথা একসঙ্গে পাশাপাশি রেখে দেওয়া হোল—এই দুই শত্রু জীবনে কেউ কা'কেও বরদাস্ত করতে পারেনি বটে, কিন্তু এখন দিব্যি মুখোমুখি করে রইল! তারপর, একবার কি কাজে কে-একজন সেখানে গিয়ে দেখলে মাথা দুটো আর আগের মত মুখোমুখী করে' নেই—দু দিকে মুখ ফিরিয়ে পিঠাপিঠি করে' রয়েচে। লোকটা ভাবলে এ ইঁদুরের কাজ, তাই সে খুলি দুটো আবার মুখোমুখি করে' রেখে দিলে। কিন্তু তার পরদিন গিয়ে দেখে আবার তারা উল্টো দিকে মুখ ফিরিয়ে রয়েচে!

এক সপ্তাহ ধরে' এমনি চলতে লাগলো। লোকটা রোজ খুলি দুটো ঘুরিয়ে রাখে, আবার প্রতি রাত্রে সে গুলো আপনাআপনি ঘুরে যায়। ভেবে ভেবে লোকটা শুকিয়ে যেতে লাগলো। চেহারাটা তার যেন দিনে দিনে ভূতের মত হয়ে গেল। গ্রামের মোল্লা তার অবস্থা দেখে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করে' ব্যাপারটা জেনে নিলেন। তিনি হেসেই খুন। চাকরটাকে বল্লেন—খুলির হাত পা আছে না কি যে আপনাআপনি ঘুরে থাকবে! যত বুড়ো হচ্ছিস তত যেন ভীমরতি হচ্ছে! ও সব কিছু না, চল দেখি গে।

গিয়া দেখেন খুলি দুটো বাস্তবিকই বিপরীত দিকে মুখ করে' রয়েচে!

মোল্লা একটা খুলি ধরে' যেই তোলবার চেষ্টা করেচেন খুলিটা অমনি তাঁর কোড়ে আঙুলে কটাস্ করে' দিলে এক কামড়!

তারপর থেকে কুঠরিটা বন্ধ রইল। চাকরটা দিনকতক বাদে মারা গেল। মোল্লার কোড়ে আঙুলে কামড়ের চিহ্ন তাঁর মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ছিল।

ব্যাপারটা এ পর্য্যন্ত এমন গোপন রাখা হয়েছিল যে আমি সম্পত্তিটা কেনবার আগে কেউ এসব কথা জানত না। পুরাণো লাইব্রেরির বই হাতড়াতে হাতড়াতে একদিন সেই মোল্লার লেখা একখানা পুঁথি হাতে পড়ল, তাতে তিনি ব্যাপারটা আগাগোড়া বর্ণনা করে' গেছেন, কোন্ খানে চোরা কুঠরির দরজার সামনে দেওয়াল তোলা হয়েচে সে কথারও উল্লেখ ছিল। কুঠরি খুঁজে পেতে বিলম্ব হোল না, সেখানে গিয়ে দেখি ঠিক তাই—খুলি দুটো পিঠে পিঠ দিয়ে রয়েচে!

ভুত প্রেতে কোনো দিন বিশ্বাস করি নি। কিন্তু কি জানি তবু কেমন খুলি দুটো স্পর্শ করতে সাহস হোল না। তাই যে পাথরের ওপর সে গুলো বসানো ছিল সেই পাথর শুদ্ধ উঠিয়ে এনে এখানে রেখেচি। সেই থেকে আমার বাড়ীতে যাঁরাই এসেছেন সকলেই পরখ করে' দেখে এ ব্যাপারটায় বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েচেন।"

আমার মুখের ভাব দেখে রমণীবাবু হয়ত বুঝতে পেরেছিলেন যে আমিও চাক্ষুস পরখ করতে ইচ্ছুক, তাই তিনি কাঁচের আচ্ছাদনটি খুলে খুব সাবধানে খুলি দুটো মুখোমুখি করে' রেখে আবার ঢাকা দিয়ে রাখলেন।

তারপর, যে ধারটাতে আমার বিছানা

ছিল সেটা আমায় দেখিয়ে দিয়ে নমস্কার করে' বিদায় নিলেন।

জমিদার বাবু ওপর তালায় থাকতেন। চাকরবাকর থাকতো নীচের তালায়। আমার ঘর আর তাদের ঘরের মাঝে দু তিনটে ছোট বড় দালান।

আমি একেবারে একলা।

মনটা খুব উত্তেজিত হয়ে উঠলেও কেউ আমায় না ঠকায় সে দিকে খুব দৃষ্টি ছিল। দেওয়ালগুলো ভালো করে' দেখলুম, ঘরে প্রবেশ করবার কোনো উপায় নেই। তার পর কোণ্‌টা খুব ভালো করে' দেখলুম, সেখানে কারো আসা অসম্ভব। একখানা শক্ত পাথর কুঁদে কোণ্‌টা তৈরি। দরজায় খিল দিয়ে, তার সামনে সোফাটা টেনে নিয়ে তার ওপর শুয়ে পড়লুম। পর্দ্দা-ঢাকা কোণ্‌টার ঠিক উল্টো দিকে রইলুম আমি।

আর একটা কাজ করলুম। কোণ্‌-ঢাকা রেশমী পর্দ্দাটার একটা নিখুঁত নক্সা আমার নোট-বুকে তুলে নিলুম। কেউ যদি খুলিগুলোর কাছে যায় তো পর্দ্দা ঠেলে যেতে হবে, আর তা হলেই পর্দ্দার ভাঁজ বদলে যাবে, আমার নক্সার সঙ্গে মিলবে না।

আগুন উস্কে দিয়ে তার মধ্যে কতকগুলো কাঠ ফেলে দিলুম। কাছে একটা তেপায়ার ওপর বাতিদানটা রেখে কোনোমতেই ঘুমুনো হবে না স্থির করে' সোফায় শুয়ে পড়লুম।

চা না কি ঘুম তাড়াবার অমোঘ ঔষধ, তাই এক পেয়ালা চা ঢেলে নিলুম। এক চুমুক দিয়েই বুঝলুম এতে ঠিক হবে না—চাই আরো উগ্র কিছু। এমন সময় তাকের ওপর বোতলের প্রতি দৃষ্টি পড়ল। ঠিক হয়েছে! ঐ থেকে কিঞ্চিৎ পান করা যাক!

তাকের কাছে গিয়ে বোতল থেকে অল্প পান করলুম। হাঁ উগ্র বটে—রীতিমত উগ্র! পুনরায় পেয়ালা ভর্ত্তি করে' নিয়ে আমার চায়ের টেবিলের কাছে ফিরে আসতে লাগলুম।

বাঃ এ আবার কি!

—দেখি, আমার সোফার ওপর দুটি ভদ্র-লোক বসে'। বোধ হোল তাদের খুব ভালো-রকমই চিনি কিন্তু নাম কিছুতেই মনে করতে পারলুম না। একজনের ছোট ছোট কোঁকড়ানো ফ্যাকাশে চুল আর মেহেদি পাতা দিয়ে রঙানো এক-মুখ দাড়ি; আর এক-জনের কালো চুল, লম্বা লতানে গোঁফ আর মাথার মাঝে একখানি মণ্ডলাকার টাক। দেখলুম তাঁরা বসে' বসে' দিব্যি আরামে আমার চা-টুকু পান করচেন, এক পেয়ালাতেই একবার ইনি একবার উনি চুমুক দিচ্চেন! প্রথমটা অবাক হয়ে গিয়েছিলুম, তারপর বুকটা ধড়াস্‌ করে' উঠল। সামনে এগোবার সাহস হোল না। একটা অন্ধকার কোণে জড়সড় হয়ে বসে' পড়লুম।

উভয়ে উভয়ের দিকে কেমন-একরকম করে' চাইছিল। শুনতে পেলুম—

"এই যে করিম ভায়া!"

"এই তো রহিম ভায়া!"

"তা হ'লে করিম, আবার এখানে এসে জুটেচ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ রহিম ভায়া—স্থির করেচি এখানেই থাকবো!"

"এখানে তো দুজনের জায়গা হবে না।"

"জায়গা খুব হবে—তবে একজনকে নীচে থাকতে হবে, এই যা।"

"নীচে? কোথায়? একতালার ঘরে না কি?"

"না হে না, আরো নীচে। একেবারে কবরের মধ্যে।"

"তা হ'লে করিম একটা হেস্তনেস্ত করে' ফেলা যাক।"

"বেশ তো! এখুনি হয়ে যাক, কেউ নেই এখন। এই তো উপযুক্ত সময়।"

"তা হ'লে পিস্তল না তলোয়ার? কোনটা চাও?"

"দুটো হলেই ভালো হয়—কিন্তু ফাঁশ হয়ে পড়বে যে!"

"তা বটে! পিস্তলে শব্দ হবে আর তলোয়ারের রক্তারক্তি হবে।"

"তা হ'লে বিষ। কেমন? যার নাম আগে উঠবে সে-ই খাবে।"

"মন্দ নয়। কিন্তু বিষের চিহ্নও তো মুখে থাকে।"

"আমি একটা ভালো মৎলব ঠাউরেচি। এই ত মদ রয়েচে, এস হরদম খাওয়া যাক দুজনে।"

"তারপর?"

"তারপর যার জ্ঞান থাকবে সে বেহুঁসটাকে সাবাড় করবে। এই রয়েচে হাতুড়ি আর এই লম্বা পেরেক। খুলিতে বেশ করে' বসিয়ে দিলে কেউ কিছু জানতে পারবে না।"

"সেটা তোমার সম্বন্ধে না হয় খাটলো, কারণ তোমার চুল খুব ঘন। কিন্তু আমার মাথার মাঝে যে একখানি পূর্ণচন্দ্র!"

"কিছু ভেবো না দাদা। আমি সব ঠিক করে' দেব'খন।"

তাদের কথাবার্তা শুনে আমার রক্ত হিম হয়ে গেল। পালাবো যে তারও উপায় নেই—হতভাগারা ঠিক দরজার সামনে বসেচে!

এক পেয়ালা থেকেই তারা পান করতে লাগলো! পেয়ালা এমন পুরোপুরি করে' ভরতে লাগলো যে মদ উপচে টেবিলের ওপর পড়ছিল!

ক্রমে তাদের দম আটকাবার উপক্রম হোল, মাথা একবার সামনে একবার পিছনে দুলতে লাগলো, মুখ বেজায় লাল হয়ে উঠল। রগের শিরাগুলো সবুজ দড়ির মত স্ফীত হয়ে উঠল।

"ভায়া যে একেবারে কাবু!"

জড়িত কণ্ঠে উত্তর হোল—"আমি না তুমি?"

টেবিলের ওপর বাতির আলো মলিন হয়ে এল। মনে হচ্ছিল অগ্নি শিখার চারদিকে যেন একটা রক্তিম বাষ্প জমে উঠচে। দুজনের মুখ হঠাৎ বেজায় বিবর্ণ হয়ে গেল, মাথা ভারি টলতে লাগলো। কে যে আগে পড়ে বলা যায় না।

বাতির শিখা গাঢ় সবুজ হয়ে উঠেচে। সবুজ আলোয় মুখদুখানা ঠিক মড়ার মুখের মত বোধ হচ্ছিল! আর কথা বলবার শক্তি নেই, স্থির চোখে তারা উভয়ে উভয়ের দিকে চেয়ে আছে, তখনো এ ওর হাতে মদের পেয়ালা এগিয়ে দিচ্ছে।

সহসা বাতির আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠে দপ্ করে' নিবে গেল। লোকদুটো তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হোল।

জানালার মাঝ দিয়ে ঘরের ভিতর চাঁদের আলো এসে পড়েচে। চুল্লির আগুন সেই আধ-আঁধারে গোলাপী আভা ছড়িয়ে দিয়েচে। ঘরের মধ্যে আমি একলা!

হাসি এল। নিশ্চয় স্বপ্ন দেখছিলুম আমি। দাঁত কিড়মিড় করছিল, তবুও মনকে প্রবোধ দেবার জন্যে বারবার বলছিলুম—স্বপ্ন এ! স্বপ্ন ছাড়া কিছুই নয়! এই বার গিয়ে শুয়ে পড়ি! কাপড় ছেড়ে আগাগোড়া লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ি! তারপর ওরা সব কবর থেকে উঠে যত খুসি ঘুরে বেড়াক না। সেরেফ দেখবো না। ব্যস!

বাহিরে চাঁদের রূপালী আলো, ভিতরে আগুনের গোলাপী আলো—বাতির প্রয়োজন নেই! বিছানা সহজেই খুঁজে নেব এখন! আস্তে আস্তে কাপড়চোপড় ছেড়ে ফেললুম—ঘড়িতে দম দিলুম—তারপর বিছানার সামনের পর্দ্দা সরিয়ে শুতে গিয়ে দেখি—ও বাবা! বিছানায় দুই ভাই পাশাপাশি শুয়ে—দুটো বীভৎস মড়া। একজন উপুড় হয়ে মুখ নীচু করে' শুয়েছিল—তার টাকের ওপর পেরেকের মাথাটা চাঁদের আলোয় গাঢ় নীল দেখাচ্ছিল। অন্য ভাই তার-ই পাশে ওপরদিকে মুখ করে' শুয়েছিল।

ভয়ে আমার হাত পা অবশ হয়ে গেল। চীৎকার করতে গেলুম—দেখি স্বর বন্ধ হয়ে গেছে। পালাতে গেলুম—পাচলে না। বুকে যেন একখানা জগদ্দল পাথর চাপানো রয়েচে! প্রাণপণ শক্তিতে অনেক কষ্টে কি একটা উচ্চারণ করলুম, অমনি ঘুম ভেঙে গেল।

সকাল হয়েচে। গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে রৌদ্র ঝিকমিক করছিল। বন্ধ দ্বারের সামনে সোফার ওপর আমি শুয়ে—গত রাত্রে যেখানটাতে ঘুমানো হবে না স্থির করে' শুয়ে পড়েছিলুম ঠিক সেই খানে।

বাতি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল, চা'র বাটিও শূন্য পড়েছিল।

হঠাৎ কোণে দৃষ্টি পড়ল—পর্দ্দাটা যেমন নক্সা করেছিলুম ঠিক তেমনি আছে। তবে নিশ্চয়ই কেউ পর্দ্দা সরায় নি!

দেখা যাক পর্দ্দার অন্তরালে কি ব্যাপার ঘটেচে। রাত্রের কথা মনে পড়ে গেল—পর্দ্দায় হাত দেবার সময় হাতটা কেঁপে উঠল।

আরে তাই তো! খুলি দুটো পিঠো পিঠি করে' রয়েচে! রমণীবাবু কাল রাত্রে আমার চোখের সামনে দুটোকে মুখোমুখী করে' দিয়ে গেলেন—এখন দেখচি পিঠোপিঠি! এ তো স্বপ্ন নয়—এযে স্পষ্ট আমি দেখচি দিনের আলোয়!

গা শিউরে উঠল।

কিন্তু দুটো মড়ার খুলি কি এমন করতে পারে? বিশ্বাস করি না, অসম্ভব।

কিন্তু স্পষ্ট দেখচি যে, ভয়ে কাঁপচি যে!

তা হোক, তবুও বিশ্বাস করি না।

তারপর সেই মোল্লার কথা মনে পড়ে' গেল—সে-ও অবিশ্বাস করে' মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত হাতে কামড়ের দাগ বয়ে বেড়িয়েচে।

কুছ পরওয়া নেই!

আমাকেও নয় কামড়াবে!

কাঁচের আবরণ তুল্লুম। বুকটা দপ্ দপ্ করে' উঠেছিল বোধ হয়—অস্বীকার করব না। হাত বাড়িয়ে খুলিতে হাত দিলুম—তারপর তুলে ধরে' ঘুরিয়ে দেখলুম—

কি হোল ? কামড়ালে না কি ?

না না কামড়ায় নি—কামড়ালে কি আর হাতে ধরে' রাখতে পারতুম।

ব্যাপারটা বুঝতে পারা গেছে—খুলি দুটোতে স্প্রীং আঁটা আছে ; স্প্রীং ঘুরিয়ে দুটোকে মুখোমুখি করে' রেখে দিলে কিছুক্ষণ পরে আপনা আপনি স্প্রীং আস্তে আস্তে খুলে যায় আর খুলি দুটোর মুখও ঘুরে যায় !

চা পানের সময় গৃহস্বামী জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন ঘুমোলেন ?

—ঘুমের বড় বিঘ্ন হয়েছিল। রাত্রে অনেক চা পান করার দরুণ নানাপ্রকার ভূতপ্রেত দেখেচি।

—খুলিগুলো কি করলে ?

—তারা আবার করবে কি ? স্প্রীংয়ের তার যেমন করে তাদের নাচিয়েছে তেমনি তারা নেচেছে।

গৃহস্বামী হেসে ফেল্লেন। বল্লেন,

—তা হ'লে আপনি ভিতরটা দেখেচেন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু এখন আপশোস হচ্ছে না দেখলেই ছিল ভালো।

—কেন ?

—তা হ'লে এমন একটা অত্যাশ্চর্য্য বাস্তুকাহিনী মাটি হয়ে যেত না !*

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গ সাহিত্যের নবযুগ

নানারূপ গদ্য পদ্য লেখবার এবং ছাপবার যতটা প্রবল ঝোঁক যত বেশী লোকের মধ্যে আজকাল এদেশে দেখা যায়, তা পূর্ব্বে কখনো দেখা যায়নি। এমন মাস যায় না, যাতে অন্ততঃ একখানি না মাসিক পত্রেরও আবির্ভাব হয়। এবং সে সকল মাসিক পত্রে সাহিত্যের সকলরকম মালমসলার কিছু না কিছু নমুনা থাকেই থাকে। সুতরাং এ কথা অস্বীকার করবার জো নেই যে বঙ্গ সাহিত্যের একটি নতুন যুগের সূত্রপাত হয়েছে। এই নব যুগের শিশুসাহিত্য আঁতুরেই মরবে কিম্বা তার একশ বৎসর পরমায়ু হবে, সে কথা বলতে আমি অপারগ। আমার এমন কোনও বিদ্যে নাই যার জোরে আমি পরের কুষ্ঠি কাটতে পারি। আমরা সমুদ্র পার হতে যে সকল বিদ্যার আমদানি করেছি, সামুদ্রিক বিদ্যা তার ভিতর পড়ে না। কিন্তু এই নব সাহিত্যের বিশেষ লক্ষণগুলির বিষয় যদি আমাদের স্পষ্ট ধারণা জন্মে, তাহলে যুগ ধর্ম্মানুযায়ী সাহিত্য রচনা আমাদের পক্ষে অনেকটা সহজ হয়ে আস্‌বে। পূর্ব্বোক্ত কারণে, নব্য লেখকরা তাঁদের লেখায় যে হাত দেখাচ্ছেন, সেই হাত দেখবার চেষ্টা করাটা একেবারে নিষ্ফল নাও হতে পারে।

প্রথমেই চোখে পড়ে যে এই নব সাহিত্য রাজধর্ম্ম ত্যাগ করে গণধর্ম্ম অবলম্বন করছে। অতীতে অন্য দেশের ন্যায় এ দেশের সাহিত্য-জগৎ যখন দুচার জন লোকের দখলে ছিল, যখন লেখা দূরে থাক্ পড়বার অধিকারও সকলের ছিল না, তখন

* Maurus Jokai লিখিত গল্প হইতে।

সাহিত্য-রাজ্যে রাজা সামন্ত প্রভৃতি বিরাজ কর্‌তেন। এবং তাঁরা কাব্য দর্শন এবং ইতিহাসের ক্ষেত্রে, মন্দির, অট্টালিকা, স্তূপ স্তম্ভ, গুহা প্রভৃতি আকারে বহু চিরস্থায়ী কীর্ত্তি রেখে গেছেন। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে আমাদের দ্বারা কোনরূপ প্রকাণ্ড কাণ্ড করে তোলা অসম্ভব এই জ্ঞানটুকু জন্মালে, আমাদের কারও আর সাহিত্যে রাজা হবার লোভ থাকবে না, এবং শব্দের কীর্ত্তিস্তম্ভ গড়বার বৃথা চেষ্টায় আমরা দিন ও শরীর পাত কর্‌ব না। এর জন্য আমাদের কোনরূপ দুঃখ করবার আবশ্যক নেই। বস্তুজগতের ন্যায় সাহিত্য-জগতেরও প্রাচীন কীর্ত্তিগুলি দূর থেকে দেখ্‌তে ভাল কিন্তু নিত্য ব্যবহার্য্য নয়।

দর্শনের কুতবমিনারে চড়লে আমাদের মাথা ঘোরে, কাব্যের তাজমহলে রাত্রিবাস করে চলে না, কেননা অত সৌন্দর্য্যের বুকে ঘুমিয়ে পড়া কঠিন। ধর্ম্মের পর্ব্বতগুহার অভ্যন্তরে খাড়া হয়ে দাঁড়ান যায় না, আর হামাগুড়ি দিয়ে অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ালেই যে কোন অমূল্য চিন্তামণি আমাদের হাতে ঠেকতে বাধ্য, এ বিশ্বাসও আমাদের চলে গেছে। পুরাকালে মানুষে যা কিছু গড়ে গেছে, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে সমাজ হতে আল্‌গা করা, দুচারজনকে বহুলোক হতে বিচ্ছিন্ন করা। অপর পক্ষে নবযুগের ধর্ম্ম হচ্ছে, মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন করা, সমগ্র সমাজকে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করা,—কাউকেও ছাড়া নয়, কাউকেও ছাড়তে দেওয়া নয়। এ পৃথিবীতে বৃহৎ না হলে যে কোনও জিনিষ মহৎ হয় না, এরূপ ধারণা আমাদের নেই; সুতরাং প্রাচীন সাহিত্যের কীর্ত্তির তুলনায় নবীন সাহিত্যের কীর্ত্তিগুলি আকারে ছোট হয়ে আসবে, কিন্তু প্রকারে বেড়ে যাবে; আকাশ আক্রমণ না করে মাটির উপর অধিকার বিস্তার করবে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে কাব্য দর্শন আদি আর গাছের মত উঁচুর দিকে ঠেলে উঠবে না, ঘাসের মত চারিদিকে চারিয়ে যাবে। এক কথায় বহু শক্তিশালী স্বল্পসংখ্যক লেখকের দিন চলে গিয়ে, স্বল্পশক্তিশালী বহুসংখ্যক লেখকের দিন আসছে। আমাদের মনোজগতে যে নবসূর্য্য উদয়োন্মুখ, তার সহস্র রশ্মি অবলম্বন করে অন্ততঃ ষষ্ঠি সহস্র বালখিল্য লেখক এই ভূভারতে অবতীর্ণ হবেন। এরূপ হবার কারণও সুস্পষ্ট। আজকাল আমাদের ভাববার সময় নেই, ভাববার অবসর থাক্‌লেও লেখবার যথেষ্ট সময় নেই, লেখবার অবসর থাকলেও লিখ্‌তে শেখবার অবসর নেই; অথচ আমাদের লিখ্‌তেই হবে,—নচেৎ মাসিক পত্র চলে না। এ যুগের লেখকেরা যেহেতু গ্রন্থকার নন, শুধু মাসিক পত্রের পৃষ্ঠাপোষক, তখন তাঁদের ঘোড়ায় চড়ে লিখতে না হলেও ঘড়ির উপর লিখতে হয়, কেননা মাসিক পত্রের প্রধান কর্ত্তব্য হচ্ছে, পয়লা বেরনো—কি যে বেরলো তাতে বেশি কিছু আসে যায় না। তা ছাড়া আমাদের সকলকেই সকল বিষয়ে লিখ্‌তে হয়। নীতির জুতো শেলাই থেকে ধর্ম্মের চণ্ডিপাঠ পর্য্যন্ত, সকল ব্যাপারই আমাদের সমান অধিকারভুক্ত। আমাদের নব সাহিত্যে কোনরূপ "শ্রম বিভাগ" নেই—তার কারণ যে ক্ষেত্রে "শ্রম" নামক মূল পদার্থেরই অভাব, সেস্থলে তার বিভাগ আর কি করে হ'তে পারে?

তাই আমাদের হাতে জন্মলাভ করে শুধু ছোট গল্প, খণ্ডকাব্য, সরল বিজ্ঞান ও তরল দর্শন।

দেশ কাল পাত্রের সমবায়ে সাহিত্য যে ক্ষুদ্রধর্ম্মাবলম্বী হয়ে উঠেছে, তার প্রতি আমার কোনও বিদ্বেষ নেই। এ কালের রচনা ক্ষুদ্র বলে আমি দুঃখ করিনে, আমার দুঃখ যে তা যথেষ্ট ক্ষুদ্র নয়। একে স্বল্পায়তন তার উপর লেখাটি যদি ফাঁপা হয়, তাহলে সে জিনিষের আদর করা শক্ত। বালা গালাভরা হলেও চলে, কিন্তু আংটি নিরেট হওয়া চাই। লেখকরা এই সত্যটি মনে রাখলে, গল্প স্বল্প হয়ে আসবে, শোক শ্লোকরূপ ধারণ কর্‌বে, বিজ্ঞান বামনরূপ ধারণ করেও ত্রিলোক অধিকার করে থাক্‌বে, এবং দর্শন নখদর্পণে পরিণত হবে। যাঁরা মানসিক আরামের চর্চ্চা না করে ব্যায়ামের চর্চ্চা করেছেন, তাঁরা সকলেই জানেন যে, যে সাহিত্যে দম নেই তাতে অন্ততঃ কস (Grip) থাকা আবশ্যক।

২

বর্ত্তমান ইউরোপের সম্যক পরিচয়ে এই জ্ঞান লাভ করা যায় যে গণধর্ম্মের প্রধান ঝোঁক হচ্ছে বৈশ্যধর্ম্মের দিকে, এবং সেই ঝোঁকটি না সামলাতে পারলে সাহিত্যের পরিণাম অতি ভয়াবহ হয়ে ওঠে। আমাদের এই আত্মা-সর্ব্বস্ব দেশে লেখকেরা যে বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করবেন না একথাও জোর করে বলা চলে না। লক্ষ্মীলাভের আশায় সরস্বতীর কপট সেবা করতে যে অনেকে প্রস্তুত, তার প্রমাণ "ভ্যালুপেয়েবল্ পোষ্ট" নিত্য ঘরে ঘরে দিচ্ছে। আমাদের নব সাহিত্যের যেন তেন প্রকারেণ বিকিয়ে যাবার প্রবৃত্তিটি যদি দমন করতে না পারা যায়, তাহলে বঙ্গসরস্বতীকে পথে দাঁড়াতে হবে সে বিষয়ে তিলমাত্রও সন্দেহ নাই। কোন শাস্ত্রেই এ কথা বলে না যে "বাণিজ্যে বসতি সরস্বতী"। সাহিত্য-সমাজে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করবার ইচ্ছে থাকলে— দারিদ্র্যকে ভয় পেলে সে আশা সফল হবে না। সাহিত্যের বাজার-দর সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যত বাড়বে, সেই সঙ্গে তার মূল্য সম্বন্ধে জ্ঞান আমাদের লোপ পেয়ে আস্‌বে। সুতরাং আমাদের নব সাহিত্যে লোভ নামক রিপুর অস্তিত্বের লক্ষণ আছে কি না সে বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি থাকা আবশ্যক, কেননা শাস্ত্রে বলে লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

৩

এ যুগের মাসিক পত্রসকল যে সচিত্র হয়ে উঠেছে, সেটি যেমন আনন্দের কথা তেমনি আশঙ্কারও কথা। ছবির প্রতি গণ-সমাজের যে একটি নাড়ীর টান আছে তার প্রচলিত প্রমান হচ্ছে, মার্কিণ সিগারেট। ঐ চিত্রের সাহচর্য্যেই যত অচল সিগারেট বাজারে চলে যাচ্চে। এবং আমরা চিত্রমুগ্ধ হয়ে মহানন্দে তাম্রকুট জ্ঞানে খড়ের ধূম পান করছি। ছবি ফাউ দিয়ে মেকি মাল বাজারে কাটিয়ে দেওয়াটা আধুনিক ব্যবসার একটা প্রধান অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদেশে শিশুপাঠ্য গ্রন্থাবলীতেই চিত্রের প্রথম আবির্ভাব। পুস্তিকায় এবং পত্রিকায় ছেলে-ভুলোনো ছবির বহুল প্রচারে চিত্রকলার যে কোন উন্নতি হবে সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে, কেননা সমাজে গোলাম পাশ করে দেওয়াতেই বণিকবুদ্ধির সার্থকতা; কিন্তু সাহিত্যের যে

অবনতি হবে সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নাই। নর্ত্তকীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ সারঙ্গীর মত চিত্রকলার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কাব্যকলার অনুধাবন করাতে তার পদমর্য্যাদা বাড়ে না। একজন যা করে অপরে তার দোষগুণ বিচার করে, এই হচ্ছে সংসারের নিয়ম। সুতরাং ছবির পাশাপাশি তার সমালোচনাও সাহিত্যে দেখা দিতে বাধ্য। এই কারণেই যেদিন থেকে বাঙ্গলাদেশে চিত্রকলা আবার নব কলেবর ধারণ করেছে, তার পরদিন থেকেই তার অনুকূল এবং প্রতিকূল সমালোচনা সুরু হয়েছে। এবং এই মতদ্বৈধ থেকে, সাহিত্যসমাজে একটি দলাদলির সৃষ্টি হবার উপক্রম হয়েছে। এই তর্কযুদ্ধে আমার কোন পক্ষ অবলম্বন করবার সাহস নেই। আমার বিশ্বাস এদেশে একালের শিক্ষিত লোকদের মধ্যে চিত্রবিদ্যায় বৈদগ্ধ্য এবং আলেখ্য ব্যাখ্যানে নিপুণতা অতিশয় বিরল, কারণ এ যুগের বিদ্যার মন্দিরে সুন্দরের প্রবেশ নিষেধ। তবে বঙ্গদেশের নব্যচিত্র সম্বন্ধে সচরাচর যে সকল আপত্তি উত্থাপন করা হয়ে থাকে, সেগুলি সঙ্গত কি অসঙ্গত তা বিচার করবার অধিকার সকলেরই আছে, কেননা সে সকল আপত্তি কলাজ্ঞান নয় সাধারণ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। যতদূর আমি জানি, নব্যচিত্রকরদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে, তাঁদের রচনায় বর্ণে বর্ণে বানান ভুল এবং রেখায় রেখায় ব্যাকরণ ভুল দৃষ্ট হয়। এ কথা সত্য কি মিথ্যা শুধু তাঁরাই বলতে পারেন, যাঁদের চিত্রকর্ম্মের ভাষার উপর সম্পূর্ণ অধিকার জন্মেছে; কিন্তু সে ভাষায় সুপণ্ডিত ব্যক্তি বাঙ্গলাদেশের রাস্তা-ঘাটে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না, যদিচ ও সকল স্থানে সমালোচকের দর্শন পাওয়া দুর্লভ নয়। আসল কথা হচ্ছে এ শ্রেণীর চিত্রসমালোচকেরা অনুকরণ অর্থে ব্যাকরণ শব্দ ব্যবহার করেন। এঁদের মতে ইউরোপীয় চিত্রকরেরা প্রকৃতির অনুকরণ করেন, সুতরাং সেই অনুকরণের অনুকরণ করাটাই এদেশের চিত্রশিল্পীদের কর্ত্তব্য। প্রকৃতি নামক বিরাট পদার্থ এবং তার অংশভূত ইউরোপ নামক ভূভাগ, এ উভয়ের প্রতি আমার যথোচিত ভক্তিশ্রদ্ধা আছে, কিন্তু তাই বলে তার অনুকরণ করাটাই যে পরমপুরুষার্থ, এ কথা আমি কিছুতেই স্বীকার করতে পারি নে। প্রকৃতির বিকৃতি ঘটান কিম্বা তার প্রতিকৃতি গড়া কলাবিদ্যার কার্য্য নয়—কিন্তু তাকে আকৃতি দেওয়াটাই হচ্ছে আর্টের ধর্ম্ম। পুরুষের মন প্রকৃতি-নর্ত্তকীর মুখ দেখবার আয়না নয়। আর্টের ক্রিয়া অনুকরণ নয়, সৃষ্টি। সুতরাং বাহ্যবস্তুর মাপজোকের সঙ্গে, আমাদের মানসজাত বস্তুর মাপজোক যে হুবাহুব মিলে যেতেই হবে, এমন কোন নিয়মে আর্টকে আবদ্ধ করার অর্থ হচ্ছে, প্রতিভার চরণে শিকলি পরাণো। আর্টে অবশ্য যথেচ্ছা-চারিতার কোনও অবসর নেই। শিল্পীরা কলাবিদ্যার অনন্য-সামান্য কঠিন বিধিনিষেধ মানতে বাধ্য, কিন্তু জ্যামিতি কিম্বা গণিত-শাস্ত্রের শাসন নয়। একটি উদাহরণের সাহায্যে আমার পূর্ব্বোক্ত মতের যাথার্থ্যের প্রমাণ অতি সহজেই দেওয়া যেতে পারে। একে একে যে দুই হয়, এবং একের পিঠে এক দিলে যে এগার হয়, বৈজ্ঞানিক হিসাবে এর চাইতে খাঁটি সত্য পৃথিবীতে আর কিছুই

নেই। অথচ একে একে তুই না হয়েও, এবং একের পিঠে একে এগারো না হয়েও, ঐরূপ যোগাযোগে যে বিচিত্র নক্সা হতে পারে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নীচে দেওয়া যাচ্ছে।

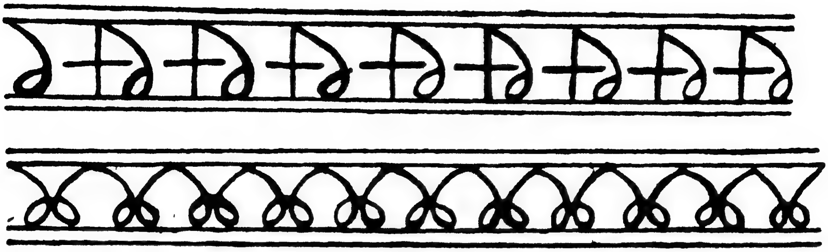

সম্ভবতঃ আমার প্রদর্শিত যুক্তির বিরুদ্ধে কেউ একথা বল্‌তে পারেন, যে "চিত্রে আমরা গণিতশাস্ত্রের সত্য চাইনে, কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সত্য দেখতে চাই।" প্রত্যক্ষ সত্য নিয়ে মানুষে মানুষে মতভেদ এবং কলহ যে আবহমান কাল চলে আস্‌ছে, তার কারণ, অন্ধের হস্তীদর্শন ন্যায়ে নির্নীত হয়েছে। প্রকৃতির যে অংশ এবং যে ভাবটির সঙ্গে যার চোখের এবং মনের যতটুকু সম্পর্ক আছে, তিনি সেইটুকুকেই সমগ্র সত্য বলে ভুল করেন। সত্যভ্রষ্ট হলে বিজ্ঞানও হয় না, আর্টও হয় না,—কিন্তু বিজ্ঞানের সত্য এক, আর্টের সত্য অপর। একটি কোন সুন্দরীর দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং ওজনও যেমন এক হিসাবে সত্য, তার সৌন্দর্য্যও তেমনি আর এক হিসাবে সত্য। কিন্তু সৌন্দর্য্য নামক সত্যটি তেমন ধরাছোঁয়ার মত পদার্থ নয় বলে, সে সম্বন্ধে কোনরূপ অকাট্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেওয়া যায় না। এই সত্যটি আমরা মনে রাখলে, নব্যশিল্পীর কৃশাঙ্গী মানসী-কন্যাদের ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নেবার জন্য অত ব্যগ্র হতুম না; এবং চিত্রের ঘোড়া ঠিক ঘোড়ার মত নয়, এ আপত্তিও উত্থাপন করতুম না। এ কথা বলার অর্থ, তার অস্থিসংস্থান, পেশীর বন্ধন প্রভৃতি, প্রকৃত ঘোড়ার অনুরূপ নয়। Anatomy অর্থাৎ অস্থিবিদ্যার সাহায্যে দেখান যেতে পারে যে, চিত্রের ঘোটক গঠনে ঠিক আমাদের শকটবাহী ঘোটকের সহোদর নয়, এবং উভয়কে একত্রে জুড়িতে যোতা যায় না। এ সম্বন্ধে আমার প্রথম বক্তব্য এই যে, অস্থিবিদ্যা কঙ্কালের জ্ঞানের উপর নির্ভর করে, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর নয়। কঙ্কালের সঙ্গে সাধারণ লোকের চাক্ষুষ পরিচয় নেই; কারণ দেহ-ত্বক্কের জ্ঞান-নেত্রে যাই হোক্, আমাদের চোখে প্রাণীজগৎ কঙ্কালসার নয়। সুতরাং দৃষ্টজগৎকে অদৃষ্টের কষ্টিপাথরে কষে নেওয়াতে পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেওয়া যেতে পারে—কিন্তু রূপজ্ঞানের পরিচয় দেওয়া হয় না।—দ্বিতীয় কথা এই যে, কি মানুষ কি পশু, জীবমাত্রেরই দেহ-যন্ত্র-গঠনের একমাত্র কারণ হচ্ছে উক্ত যন্ত্রের সাহায্যে কতকগুলি ক্রিয়া সম্পাদন করা। গঠন যে ক্রিয়াসাপেক্ষ, এই হচ্ছে দেহ-বিজ্ঞানের মূল তত্ত্ব। ঘোড়ার দেহের বিশেষ গঠনের কারণ হচ্ছে, ঘোড়া তুরঙ্গম। যে

ঘোড়া দৌড়বে না, তার anatomy ঠিক জীবন্ত ঘোড়ার মত হবার কোন বৈধ কারণ নেই। পটস্থ ঘোড়া যে তটস্থ, এ বিষয়ে বোধ হয় কোন মতভেদ নেই। চিত্রার্পিত অশ্বের anatomy ঠিক চড়্‌বার কিম্বা হাঁকাবার ঘোড়ার অনুরূপ করাতেই বস্তুজ্ঞানের অভাবের পরিচয় দেওয়া হয়। চলৎ-শক্তিরহিত অশ্ব, অর্থাৎ যাকে চাবুক মারলে ছিঁড়বে কিন্তু নড়্‌বে না, এহেন ঘোটক, অর্থহীন অনুকরণের প্রসাদেই জীবন্ত ঘোটকের অবিকল আকার ধারণ করে' চিত্রকর্ম্মে জন্মলাভ করে। এই পঞ্চভূতাত্মক পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরে একটি মানস-প্রসূত দৃশ্যজগৎ সৃষ্টি করাই চিত্রকলার উদ্দেশ্য, সুতরাং এ উভয়ের রচনার নিয়মের বৈচিত্র্য থাকা অবশ্যম্ভাবী। তথাকথিত নব্যচিত্র যে নির্দ্দোষ কিম্বা নির্ভুল, এমন কথা আমি বলি না। যে বিদ্যা কাল জন্মগ্রহণ করেছে, আজ যে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গসকল সম্পূর্ণ আত্মবশে আসবে, এরূপ আশা করাও বৃথা।

শিল্প হিসাবে তার নানা ত্রুটি থাকা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। কোথায় কলার নিয়মের ব্যভিচার ঘট্‌ছে, সমালোচকদের তাই দেখিয়ে দেওয়া কর্ত্তব্য। অস্থি নয় বর্ণের সংস্থানে, পেশী নয় রেখার বন্ধনে, যেখানে অসঙ্গতি এবং শিথিলতা দেখা যায়, সেই স্থলেই সমালোচনার সার্থকতা আছে। অব্যবসায়ীর অযথা নিন্দায় চিত্রশিল্পীদের মনে শুধু বিদ্রোহীভাবের উদ্রেক করে, এবং ফলে তাঁরা নিজেদের দোষগুলিকেই গুণ ভ্রমে বুকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চান।

আমার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সাহিত্য, চিত্র নয়। যেহেতু এ যুগের সাহিত্য চিত্র-সনাথ হয়ে উঠেছে, সেই কারণেই চিত্রকলার বিষয় উল্লেখ করতে বাধ্য হয়েছি। আমার ও-প্রসঙ্গ উত্থাপন করবার অপর একটি কারণ হচ্ছে এইটি দেখিয়ে দেওয়া যে, যা চিত্রকলায় দোষ বলে গণ্য, তাই আবার আজকাল এদেশে কাব্যকলায় গুণ বলে মান্য।

প্রকৃতির সহিত লেখকদের যদি কোনও রূপ পরিচয় থাকত, তাহলে শুধু বর্ণের সঙ্গে বর্ণের যোজনা করলেই যে বর্ণনা হয়, এ বিশ্বাস তাঁদের মনে জন্ম'ত না, এবং যে বস্তু কখনও তাঁদের চর্ম্মচক্ষুর পথে উদয় হয়নি, তা অপরের মনশ্চক্ষুর সুমুখে খাড়া করে দেবার চেষ্টারূপ পণ্ডশ্রম তাঁরা করতেন না। সম্ভবতঃ এ যুগের লেখকদের বিশ্বাস যে, ছবির বিষয় হচ্ছে দৃশ্যবস্তু, আর লেখার বিষয় হচ্ছে অদৃশ্য-মন,—সুতরাং বাস্তবিকতা চিত্রকলায় অর্জ্জনীয় এবং কাব্যকলায় বর্জ্জনীয়। সাহিত্যে সেহাই কলমের কাজ কর্‌তে গিয়ে যাঁরা শুধু কলমের কালি ঝাড়েন—তাঁরাই কেবল নিজের মনকে প্রবোধ দেবার জন্য পূর্ব্বোক্ত মিথ্যাটিকে সত্য বলে গ্রাহ্য করেন। ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ জ্ঞানই হচ্ছে সকল জ্ঞানের মূল। বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক নয়। দূরদৃষ্টি লাভ করার অর্থ চোখে চাল্‌শে ধরা নয়। দেহের নবদ্বার বন্ধ করে দিলে মনের ঘর অলৌকিক আলোকে কিম্বা পারলৌকিক অন্ধকারে পূর্ণ হয়ে উঠবে বলা কঠিন। কিন্তু সর্ব্বলোকবিদিত সহজ সত্য এই যে, যাঁর ইন্দ্রিয় সচেতন এবং সজাগ নয়—কাব্যে কৃতিত্ব লাভ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। জ্ঞানাঞ্জন শলাকার অপপ্রয়োগে

যাঁদের চক্ষু উন্মীলিত না হয়ে কানা হয়েছে, তাঁরাই কেবল এ সত্য মানতে নারাজ হবেন। প্রকৃতিদত্ত উপাদান নিয়েই মন বাক্যচিত্র রচনা করে। সেই উপাদান সংগ্রহ করবার, বাছাই করবার, এবং ভাষায় সাকার করে তোলবার ক্ষমতার নামই কবিত্বশক্তি। বস্তুজ্ঞানের অটল ভিত্তির উপরেই কবিকল্পনা প্রতিষ্ঠিত। মহাকবি ভাস বলেছেন যে "সুনিবিষ্ট লোকের রূপ বিপর্য্যয়" করা অন্ধকারের ধর্ম্ম। সাহিত্যে ওরূপ করাতে প্রতিভার পরিচয় দেওয়া হয় না, কারণ প্রতিভার ধর্ম্ম হচ্ছে প্রকাশ করা, অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষ করা, প্রত্যক্ষকে অপ্রত্যক্ষ করা নয়। অলঙ্কার শাস্ত্রে বলে অপ্রকৃত, অতিপ্রকৃত এবং লৌকিক জ্ঞানবিরুদ্ধ বর্ণনা, কাব্যে দোষ হিসেবে গণ্য। অবশ্য পৃথিবীতে যা সত্যই ঘটে থাকে তার যথাযথ বর্ণনাও সব সময়ে কাব্য নয়। আলঙ্কারিকেরা উদাহরণ স্বরূপ দেখান যে "গৌ তৃণং আত্তি" কথাটা সত্য হলেও, ও কথা বলায় কবিত্ব-শক্তির বিশেষ পরিচয় দেওয়া হয় না। তাই বলে 'গরুরা ফুলে ফুলে মধুপান করছে' এরূপ কথা বলাতে, কি বস্তুজ্ঞান কি রসজ্ঞান কোনরূপ জ্ঞানের পরিচয় দেওয়া হয় না। এস্থলে বলে রাখা আবশ্যক যে নিজেদের সকলপ্রকার ত্রুটির জন্য আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের দায়ী করা, বর্ত্তমান ভারতবাসীদের একটা রোগের মধ্যে হয়ে পড়েছে। আমাদের বিশ্বাস এ বিশ্ব নশ্বর এবং মায়াময় বলে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বাহ্য-জগতের কোনরূপ খোঁজ খবর রাখতেন না।. কিন্তু এ কথা জোর করে বলা যেতে পারে, যে তাঁরা কস্মিনকালেও অবিদ্যাকে পরাবিদ্যা বলে ভুল করেন নি, কিম্বা এক-লম্ফে যে মনের পূর্ব্বোক্ত প্রথম অবস্থা হতে দ্বিতীয় অবস্থায় উত্তীর্ণ হওয়া যায় এরূপ মতও প্রকাশ করেন নি। বরং শাস্ত্র এই সত্যেরই পরিচয় দেয় যে, অপরাবিদ্যা সম্পূর্ণ আয়ত্ত না হলে, কারও পক্ষে পরাবিদ্যা লাভের অধিকার জন্মায় না, কেননা বিরাটের জ্ঞানের ক্ষেত্রেই স্বরাটের জ্ঞান অঙ্কুরিত হয়। আসল কথা হচ্ছে মানসিক আলস্যবশতঃই আমরা সাহিত্যে সত্যের ছাপ দিতে অসমর্থ। আমরা যে কথায় ছবি আঁকতে পারিনে, তার একমাত্র কারণ আমাদের চোখ ফোটবার আগে মুখ ফোটে।

একদিকে আমরা বাহ্য বস্তুর প্রতি যেমন বিরক্ত, অপর দিকে অহংয়ের প্রতি ঠিক তেমনি অনুরক্ত। আমাদের বিশ্বাস যে আমাদের মনে যে-সকল চিন্তা ও ভাবের উদয় হয়, তা এতই অপূর্ব্ব এবং মহার্ঘ্য, যে স্বজাতিকে তার ভাগ না দিলে ভারতবর্ষের আর দৈন্য ঘুচবে না। তাই আমরা অহর্নিশি কাব্যে ভাবপ্রকাশ করতে প্রস্তুত। ঐ ভাবপ্রকাশের অদম্য প্রবৃত্তিটিই আমাদের সাহিত্যে সকল অনর্থের মূল হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার মনো-ভাবের মূল্য আমার কাছে যতই বেশি হোক্ না, অপরের কাছে তার যা কিছু মূল্য সে তার প্রকাশের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। অনেকখানি ভাব মরে একটুখানি ভাষায় পরিণত না হলে রসগ্রাহী লোকের নিকট তা মুখরোচক হয় না। এই ধারণাটি যদি আমা-দের মনে স্থান পেত তাহলে আমরা সিকি পয়সার ভাবে আত্মহারা হয়ে কলার অমূল্য আত্মসংযম হতে ভ্রষ্ট হতুম না। মানুষ মাত্রেরই

মনে দিবারাত্র নানারূপ ভাবের উদয় এবং বিলয় হয়—এই অস্থির ভাবকে ভাষায় স্থির করবার নামই হচ্ছে রচনাশক্তি। কাব্যের উদ্দেশ্য ভাবপ্রকাশ করা নয়, ভাব উদ্রেক করা। কবি যদি নিজেকে বীণা হিসেবে না দেখে বাদক হিসেবে দেখেন,তাহলে পরের মনের উপর আধিপত্য লাভ কর্‌বার সম্ভাবনা তাঁর অনেক বেড়ে যায়। এবং যে মুহূর্ত্ত থেকে কবিরা নিজেদের পরের মনো-বীণার বাদক হিসেবে দেখতে শিখ্‌বেন, সেই মুহূর্ত্ত থেকে তাঁরা বস্তুজ্ঞানের এবং কলার নিয়মের একান্ত শাসনাধীন হবার সার্থকতা বুঝতে পার্‌বেন। তখন আর নিজের ভাব বস্তুকে এমন দিব্যরত্ন মনে কর্‌বেন না, যে সেটিকে আকার দেবার পরিশ্রম থেকে বিমুখ হবেন। অবলীলাক্রমে রচনা করা আর অবহেলা ক্রমে রচনা করা যে এক জিনিষ নয়, একথা গণধর্ম্মাবলম্বীরা সহজে মানতে চান না, এই কারণেই এত কথা বলা। আমার শেষ বক্তব্য এই যে, ক্ষুদ্রত্বের মধ্যেও যে মহত্ত্ব আছে, আমাদের নিত্যপরিচিত লৌকিক পদার্থের ভিতরেও যে অলৌকিকতা প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে, তার উদ্ধার সাধন করতে হলে, অব্যক্তকে ব্যক্ত করতে হলে,সাধনার আবশ্যক; এবং সে সাধনার প্রক্রিয়া হচ্ছে, দেহমনকে বাহ্য-জগৎ এবং অন্তর্জগতের নিয়মাধীন করা। যাঁর চোখ নেই, তিনিই কেবল সৌন্দর্য্যের দর্শন লাভের জন্য শিবনেত্র হন; এবং যাঁর মন নেই, তিনিই মনস্বিতা লাভের জন্য অন্য-মনস্কতার আশ্রয় গ্রহণ করেন। নব্য লেখকদের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে, তাঁরা যেন দেশী বিলাতি কোনরূপ বুলির বশবর্ত্তী না হয়ে, নিজের অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয় লাভ করবার জন্য ব্রতী হন। তাতে পরের না হোক্ অন্ততঃ নিজের উপকার করা হবে।

বীরবল।

তন্দ্রাপথে

মেঘের পুরীর পর্দ্দা তুলে'
নীল পাহাড়ের কোল ঘেঁসে
কোন্ তারকার ইঙ্গিতে আজ,
পৌঁছিব গো! কোন্ দেশে?
হাওয়ায়-বাজা বীণার তানে
মন ছোটে আজ কোন্ উজানে?
শূন্য গুহায় নূপুর শুনি'
কোন্ পুলিনে যাই ভেসে?

উড়ো পাখীর সুরের সুরায়,
ভূর্জ্জতরুর আব্‌ছায়ে,
প্রবাল-বরণ বৈকালে আজ
কোন্ পাষাণী গান গাহে?
ফুল-পরাগের ঘোম্‌টা টানি'
লুটিয়ে চলে আঁচলখানি,
লাজুক মেয়ে সৌদামিনী
আল্‌তা পরায় তা'র পায়ে।

বিস্মৃত কোন্ তূর্য্য-ধ্বনি
গর্জ্জে বুকের পঞ্জরে ?
পথ হারায়ে ঝঞ্ঝা ফিরে
রুদ্র গহন সুন্দরে—
ছিন্ন কেতু ঊর্দ্ধে ধরি'
উঠ্‌ছি একা শৈল 'পরি,
নীল অশনি ঝল্‌সে গেছে
দ্রাক্ষাবনের অন্তরে।

লো সুষমা, এসেছি আজ,
ছিঁড়িয়া ডোর শৃঙ্খলে—
ডাক্‌ছে আমায় অস্ত-তারা—
প্রাণ যে আজি চঞ্চলে।
কোন্ পথে ওই অচল চলে ?—
শান্তিজলের ঝর্ণাতলে
ফুট্‌বে কবে মানস-মৃণাল
ফুল্ল সোণার উৎপলে ?

পান্থক আজি ঘর ভাবি না—
ঘর যে আমার ঢের দূরে—
কোথায় বাজে বসন্ত-রাগ ?
মন মজেছে সেই সুরে—
পৌঁছিব গো কোথায় গিয়া ?
উথ্‌লে ওঠে নগ্ন হিয়া—
আঁক্‌ব শোণিত-বিন্দু দিয়ে
শেষ গোধূলির সিন্দূরে।

প্রাচীর-ছায়া যায় কি দেখা
বৈজয়ন্ত নন্দনে ?
স্বপ্ন-চাতক পক্ষ মেলে
মন্ত্রমাখা রঞ্জনে—

মানব-জীবন ঢেউএর মত
কোন্ বেলাতে মর্ম্মাহত ?
নয়ন মুদি ঝর্ণাধুমে
কোমল ঘুমের অঞ্জনে।

কোথায় রে শেষ পান্থশালা
কোন্ রূপালির প্রাঙ্গণে ?
শঙ্কারে আজ নির্ব্বাসিনু
এই বেলা এই নির্জ্জনে—
মুক্তাহারা শুক্তি তুলে'
কোন্ খেলাতে ছিলাম ভুলে ?
নে গেঁথে মন বরণমালা
অনুরাগের রঙ্গণে।

রাত্রিরাণীর আশার বাণী
দিনের হৃদয় দেয় ভরে'—
অনন্ত কাল মৌনী রহে
প্রশ্ন-হারা উত্তরে—
চন্দ্রাতপে ঘুমায় কা'রা ?
হাজার ডাকেও দেয় না সাড়া,
নীল আকাশের প্রসার মাপে
রশ্মি-মুকুট ভাস্বরে।

ডুব দিনু আজ ধ্যান-সাগরে,
সব বাসনার সুপ্তিতে,
জান্‌ব তাঁরে মৃত্যু-ভূমি
পারে নি যাঁর রূপ দিতে—
শুকিয়ে গেছে সোণার মাটি,
কোন্ ফসলে বাঁধ্‌ব আটি ?
তন্দ্রাপথের অন্ত কোথায়
নিত্য দিনের দীপ্তিতে ?

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজা ও রাখাল *

প্রথম দিন

[রাজা সলোমানের সুসজ্জিত কক্ষে, জেরুজালেমের সুন্দরী-মণ্ডলী-পরিবৃতা গোপকন্যা। রাজা এই গোপ-কন্যার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া উঁহাকে প্রাসাদে আনিয়া রাখিয়াছেন। গোপকন্যার কিন্তু এই ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বরের মধ্যে মন টিঁকিতেছে না। আভীর-পল্লীর জন্য এবং আভীর প্রণয়ীর জন্য তাহার বিরহী-হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।]

গোপকন্যা

(উর্দ্ধমুখে বন্ধুর উদ্দেশে)

চুম্বন দাও—অধরের চুম্বন,
বন্ধু! আমার বন্ধু অদর্শন!
মদিরা হইতে মদির যে ভালবাসা
তাই দিয়া তুমি পূরাও প্রাণের আশা।
তোমার অঙ্গ সুরভি ফুলের মালা,
নাম-সৌরভ জুড়ায় সকল জ্বালা;
তরুণ-হৃদয়া যতেক তরুণী তাই
তোমারেই চায়; তুমি বিনা কেহ নাই।

*   *   *

টেনে নাও মোরে কর গো আকর্ষণ,—
তোমারি পিছনে পিছনে ছুটুক মন;
রাজগৃহে আমি বন্দিনী হ'য়ে আছি
তোমারে বারেক নিকটে পাইলে বাঁচি;
মদিরা হইতে মধুর তোমার স্মৃতি
তোমাতে লগন সতী প্রকৃতির প্রীতি।

(পুরন্ধ্রীদিগকে সম্বোধন করিয়া)

ওগো রূপবতী! ওগো রাজ-সহচরী!
চাহনিতে মোরে বিঁধনা, মিনতি করি;
কালো বলে আমি কুৎসিত নহি খুব,
রবির দৃষ্টি লেগে জ্বলে গেছে রূপ।
কালো আমি ঠিক বেছুইন্ তাঁবু সম
রাজ-গৃহে কালো মখমল নিরুপম।
কালো হ'ল তনু তপ্ত বাতাস লেগে,—
ক্ষেত রাখা কাজ ভাই দিল মোর রেগে;—
আঙুরের ক্ষেতে ক'রেছি চৌকীদারী;
আপনার ক্ষেতে আগাছা কাঁটার সারি।

(বন্ধুর উদ্দেশে)

ওগো প্রাণপ্রিয়! কোথা বাজে তব বেণু,
কোন্ মাঠে তুমি আজিকে চরাও ধেনু,—
কোন্ তরুছায়ে তাদের পিয়াও পানি
আজিকার এই দু'পহরে,—নাহি জানি!
ওগো প্রাণাধিক! যাও তুমি মোরে ক'য়ে
কি দোষে র'য়েছি দূর হ'য়ে পর হ'য়ে?

পুরন্ধ্রী

দুঃখিনী তুমি রূপরাণী সুন্দরী!
আমরা তোমায় আশ্বাস দিতে ডরি।
ফিরে তুমি কেন যাওনা আপন গাঁয়,—
নগরের গরু যে পথে গোষ্ঠে যায়,—
সেই পথে কেন যাও না গা তুমি চ'লে
ভায়ের তাঁবুতে জন্মভূমির কোলে।

(রাজা সলোমানের প্রবেশ ও গোপকন্যার মূর্চ্ছা)

রাজা

প্রেয়সী! প্রেয়সী! তুমি যেন সংগতা
মিশর-রাজের ঘোটকী রথোদ্ধতা!

---

* রাজা সলোমানের "Song of songs" অবলম্বনে গঠিত। এই কাহিনী লৌকিক এবং আধ্যাত্মিক উভয় অর্থেই গৃহীত হইয়া থাকে। রচনাকাল খ্রীষ্টজন্মের প্রায় হাজার বৎসর পূর্ব্বে।

"চুম্বন দাও—অধরের চুম্বন,—
বন্ধু! আমার বন্ধু অদর্শন।"

কপোলে তোমার মণি-মুকুতার ঝুরি
কণ্ঠে তোমার সাতটি সোনার ডুরি ;
তোমার লাগিয়া আনিয়াছি গরবিনী
স্বর্ণ-মেখলা রজতের কিঙ্কিনী।

গোপকন্যা

(মূর্চ্ছান্তে)

রাজা যবে এসে বসেন আসন 'পরে
মুসব্বরের গন্ধ আমোদ করে।
উশীর হইয়া বঁধু মোর বুকে আছে
দিনে রাতে ছুটি পদ্ম-কলির মাঝে ;
বন্ধুর কথা এড়িলে না যায় এড়া,
আঙুরের ক্ষেতে জটামাংসীর বেড়া।

রাজা

চেয়ে দেখ, তুমি অপরূপ সুন্দরী !
কপোতের মত আঁখির দৃষ্টি, মরি !

গোপকন্যা।

(রাজার কথার উত্তর না দিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া, বন্ধুর উদ্দেশে)

মরি ! মরি ! সখা অপরূপ তব রূপ,
ওগো মনোজ্ঞ ! তুমি অমৃতের কূপ !
শয্যা মোদের শষ্প—সবুজে আঁকা,
ঘরের বর্গা যত দেবদারু শাখা ;
সরল শালের শাখা এ ঘরের কড়ি,
বিনা হাতে মোরা তুলেছি এ ঘর গ'ড়ি' ;
বন্ধু তোমারে গোপন কথাটি বলি
আমিই গোলাপ—আমিই পদ্ম-কলি।

রাজা

পদ্ম যেমন কণ্টক বন মাঝে
প্রিয়াও তেমনি পুরন্ধ্রীদের কাছে।

গোপকন্যা

সহকার যথা কানন-তরুর মাঝে
বঁধুও তেমনি অন্য লোকের কাছে ;
মনের হরিষে তাহারি ছায়ায় থাকি
সে গাছের ফল মধুর,—দেখেছি চাখি'।
সে মোরে এনেছে উৎসব মন্দিরে
প্রেমের ছত্র ধরেছে আমার শিরে।

(অধীর ভাবে)

সুরার পেয়ালা ধর্ গো আমার মুখে,
ব্যথিত পরাণ, প্রেমের বেদনা বুকে ;
এনে দে আমায় এনে দে গো সুধাফল
ভালবাসা-ভ'রে মন হ'ল বিহ্বল।
তার বাম হাত রয়েছে মাথার নীচে,
ডান হাতখানি আমারে আলিঙ্গিছে।

* * *

দোহাই বহিন্, দেখিস্ বঁধু না জাগে,
বনের হরিণীগণের শপথ লাগে ;
পায়ের নূপুর—না হয়—খুলিয়' রাখ,—
যত খুসী আজ ঘুমাক্—সে—বুকে থাক।

দ্বিতীয় দিন

(গোপকন্যা ও পুরন্ধ্রীগণ)

গোপকন্যা

(উন্মাদের ভাবে)

ওই শোনো ওই ! ওই তো কণ্ঠ তার !
আসিছে ! আসিছে মন্দিরে সে আমার !
পাহাড়ের পথে কিশোর মৃগের মত
আসিছে বন্ধু উল্লাস-ভরে কত !
দেখ্ দেখি তোরা সে কি এল আঙিনায় ?
জানালার ফাঁকে কার আঁখি দেখা যায় !

* * *

বন্ধু এসেছে, আমারে কহিছে ডেকে
প্রেয়সী ! রূপসী ! চলে এস ঘর থেকে ;
দেখ চেয়ে ওগো ! হিমের হয়েছে শেষ,
বৃষ্টি থেমেছে, পুষ্পে সেজেছে দেশ ;

পাখী-পাখালির কাকলির এল বেলা,
গাঁয়ে গাঁয়ে আজ কপোত-কূজন-মেলা।

* * *

খোবানির গাছে ধরেছে সবুজ ফল,
সুরভি আঙুরে রস-ধারা চঞ্চল,
প্রেয়সী! রূপসী! ওঠ তুমি এস চলে;
কি করিছ তুমি পাহাড়ের ও ফাটলে?
এস তুমি এস পাহাড়ি সিঁড়ির বাঁকে,—
গোপন-মিলনে মিলিবার মউ-চাকে;
এস কাছে, দেখি সুন্দর মুখখানি,—
শুনি আরবার মধুর মুখের বাণী। * *

(গান)

(আমার) বাদুড় ছুঁতে চায়।
(আমার) আঙুর ক্ষেতে কাল্ বাদুড়ের
পাখা নুয়ে যায়।

* * *

বঁধু সে আমার আমি সে বঁধুর বঁধু,
পদ্মের বনে বঁধু মোর পিয়ে মধু;
যে অবধি নিশি নাহি হয় অবসান,—
ছায়া না পালায়,—বঁধু করে মধুপান।
বন্ধু! আমার পাহাড়ী হরিণ তুমি,
ফের একবার আঁখির মদিরা চুমি।

* * *

নিশীথ-শয়নে খুঁজেছি তোমারে প্রভু,
খুঁজেছি কেঁদেছি,—পাইনি খুঁজিয়া কভু;
শয্যা ত্যজিয়া নগরে বাহির হব,—
যারে ভালবাসি তার সন্ধান লব।
নগরের বাটে কব কেঁদে অনিবার,—
খুঁজেছি তাহারে, পাইনি নাগাল তার।

* * *

নগর-কোটাল ফিরিছে প্রহর হেঁকে,
থমকি' দাঁড়াল রাজপথে মোরে দেখে
নিশুতি রাত্রে; তাহারে সুধানু হাসি',—
দেখেছ কি তারে?—আমি যারে ভালবাসি!

* * *

তাদের এড়ায়ে সহজে এলাম চ'লে,—
যারে ভালবাসি তাহারে পাইব ব'লে;
পেলাম তাহারে, দেখা হ'য়ে গেল পথে,
ধরিনু ছ'হাত; কহিলাম "কোনো মতে
ছাড়িয়া দিব না, বন্ধু! তোমারে আর
আমাদের ঘরে যেতে হবে একবার।"
ভুজ-বন্ধনে বাঁধি আগ্রহ ভরে
এনেছি আমার বঁধুরে মায়ের ঘরে।

* * *

দোহাই বহিন্! দেখিস্, বঁধু না জাগে,
বনের হরিণীগণের শপথ লাগে;
মন্দিরে বঁধু; বহিন্! মিনতি রাখ,
জাগা'স্‌নে তোরা; ঘুমাক্ সে বুকে থাক।

তৃতীয় দিন

(প্রাসাদের কক্ষে গোপকন্যা; বাহিরে রাজশিবিকার বাহকগণের কলরব; জানালায় পুরন্ধ্রীগণ)

প্রথমা পুরন্ধ্রী

দাব-দহনের বিপুল ধূমের মত
কারা আসে ওই? কলরব কেন অত?
অঙ্গ-সুবাসে বাতাস হয়েছে 'তর',—
মুসব্বরের এল কি সওদাগর?

দ্বিতীয়া

রাজা এসেছেন,—ওই যে শিবিকা তাঁর,—
তিন কুড়ি লোক সাথে সাথে ফিরে যাঁর,—
হাতিয়ার হাতে—সাহসের অবতার;—
উরু-লম্বিত তলোয়ার খরধার।

তৃতীয়া

রাজা সলোমান—সুন্দর তাঁর রথ,—
সোনার পাতায় মণ্ডিত সুমহৎ!

"দেখ, প্রিয়ে, দেখ তুমি কত সুন্দর।"

চাঁদির খাম্ভা, চাঁদোয়াটি কিঙ্খাব,
প্রেম-রথ-রথী দুয়ারে আবির্ভাব!
ওলো পুরনারী! জেরু-জালেমের মেয়ে!
রাজার শিঙার দেখিবি আয়গো ধেয়ে!
দেখ্, দেখ আজ পরেছে জড়োয়া-তাজ!
মণিময় সাজ!—মনের সুখের সাজ!

(বরবেশে রাজা সলোমানের প্রবেশ)

রাজা।

দেখ, প্রিয়ে, দেখ তুমি কত সুন্দর।
হে কপোতাক্ষী! আঁখি তব মনোহর!
কুঞ্চিত কেশ দুলিছে পৃষ্ঠ 'পরে,—
ঘেঁসাঘেঁসি যেন ছাগ-শিশুগুলি চরে।
দন্তের পাঁতি সদ্যস্নাত মেষ,—
প্রতিটি যমজ,—কর্ত্তিত-লোম-লেশ।
রাঙা ফিতা ঠোঁট, মনোজ্ঞ তব বাণী,
পল্লবে-ঘেরা ডালিম ললাট-খানি।
রাজা দায়ূদের মিনার তোমার গ্রীবা,—
হাজার আঁখির ঢাল তাহে শোভে কিবা!
যমজ হরিণ-শাবক তোমার বুকে,—
পুষ্প-শয়নে ঘুমায়ে রয়েছে সুখে।

(নীরবে নিরীক্ষণ; গোপকন্যা নিরুত্তর)

যে অবধি নিশি না পোহায়,—ছায়া টুটে,—
চন্দন-বন-রেণুতে রহিব লুটে;
বিহরিব আমি কর্পূর-পর্ব্বতে;
নির্ম্মলা তুমি, প্রেয়সী পতিব্রতে।

(ধীরে ধীরে প্রস্থান)

গোপকন্যা

(রাখাল-প্রণয়ীর উক্তিসমূহ স্মরণ করিয়া আবৃত্তি করিতেছে)

'লিবানন্' ছাড়ি' এস তুমি মোর বঁধু!
'শ্লেণীর' পাহাড়ে মৌমাছিদের মধু!
'আমানা' পাহাড়ে এস তুমি মোর কাছে
সিংহের গুহা বাঘ্-থানা করি' পাছে;
তুমি যে মথন করেছ আমার মন,—
বধূটি আমার! দোসর! আপন জন!
সাত-ন'র হার তুমি তো পরেছ গলে,
এক ন'র তার পরালে মোরে কি ছলে!

* * *

"বহিনের বাড়া ভালবাসা তুমি দিলে,
তুলনা তোমার সংসারে নাহি মিলে;
মদের অধিক মদির তোমার প্রীতি,
অঙ্গ-সুরভি—সব সুবাসের স্মৃতি।
মধু ক্ষরে সদা ও অধর-মৌচাকে,
রসনার তলে গোরস গোপনে থাকে।
বসনে তোমার কুসুম-বনের বাস;
দোসর আমার! চিত্তের অভিলাষ!

* * *

"বধূটি আমার বেড়া ঘেরা ফুল-বাড়ী;
বাঁধ-দেওয়া নদী, 'নিমুখো' জলের ঝারি!
যে ফুল-বাড়ীতে ফোটে ডালিমের ফুল,
ডালিমের ফল দোলে গো দোদুল-দুল্;
আছে দারু-চিনি আছে তায় জাফরাণ,
মিলেছে তাহাতে মশলা হাজার থান।
কর্পূর-পাতা তুমি সে মুসব্বর,—
বাগানের ঝিল,—অনাবিল নির্ঝর।"

* * *

জাগ্‌রে দখিনা! জাগ্ উত্তুরে হাওয়া!
বন্ধ-বাগানে কর্ তোরা আসা-যাওয়া;
বাহিরের সাথে ক'রে দে 'খুশ্-বু' যোগ,
মালিক আসুক,—ফসল করুক ভোগ।

* * *

"এসেছি কুঞ্জে, এসেছি হে নিরুপমা!
ফুলের ফসল কুড়ায়ে করেছি জমা;

চাকের মধুতে জিহ্বা করেছে স্নান,
মদিরার সাথে দুগ্ধ করেছি পান।
এস সখা-সখী খেয়ে নাও, পিয়ে নাও,
প্রেয়সী! রূপসী! তুমি নাও, তুমি দাও!"

* * *

আমি নিদ্ যাই হৃদয় আমার জাগে,
হৃদয়-কবাটে ঘা দিয়া বন্ধু ডাকে;
কহে "দ্বার খোলো, ওঠ অনিন্দ্য সতী!
নিশির শিশিরে ভিজে গেছি সম্প্রতি।"
আঙ্‌রাখা কোথা? আঁধারে দিয়েছি রেখে;
এখন বাহিরি' কিসে বা অঙ্গ ঢেকে?
পা'দুটি পাখালি' উঠেছি শয্যা 'পরে,
এখন মাটিতে নামি বা কেমন ক'রে!

* * *

দুয়ারের ফাঁকে বাহু সে বাড়ায় ঘরে,
পরাণ আমার 'আথালি-পাথালি' করে;
অবশ অঙ্গে খিল খুলি ত্বরা উঠে
আঙুলে মুসব্বরের গন্ধ ছুটে;
মুসব্বরের গন্ধ সকল গায়,
দুয়ারের খিল্ সৌরভে মূরছায়।

* * *

দুয়ার খুলিনু বন্ধু পশিবে ব'লে,
খুলিনু দুয়ার,—বন্ধু গিয়েছে চ'লে।
সে যবে আমায় ডেকেছিল নাম ধ'রে
বিবশ পরাণ ছিল গো ঘুমের ঘোরে।
খুঁজিলাম কত,—না পেলাম দেখা তার,
ডাকিলাম তারে সাড়া সে দিল না আর।

* * *

নগর-কোটাল রাতে পথে ফেরে খালি,
আমারে তাহারা মারিল গো দিল গালি;
তাহারা কারেও সহজে না দ্যায় ছাড়ি,
তাহারা আমার ঘোম্‌টা লইল কাড়ি'।

* * *

দোহাই বহিন্! দেখা যদি পাস্ তার,
বলিস্ তাহারে আমার যে সমাচার;
বলিস্ তাহারে ভালবেসে পাই ক্লেশ,—
বলিস্ তাহারে ভালবেসে তনু শেষ।

চতুর্থ দিন

(গোপকন্যা এখনও রাজপ্রাসাদে; রাজার ঐশ্বর্য্য সত্ত্বেও সে রাখালের প্রেম ভুলিতে পারে নাই।)

(রাজপ্রাসাদ—গোপকন্যা ও পুরন্ধ্রীগণ)

পুরন্ধ্রী

অন্য মানুষে—মনের মানুষে তোর—
তফাৎ কোথায়? বল্ তো লক্ষ্মী মোর!
বন্ধু তোমার অন্য বঁধুর চেয়ে—
বড় কিসে? বল 'শূলম্'-দেশের মেয়ে!

গোপকন্যা

আমার বন্ধু হাজার রাজার সেরা,
কাকের পক্ষ কেশে তাঁর মাথা ঘেরা;
শুভ্র-শরীর—তাহাতে অরুণ আভা,
হাতের পায়ের নখগুলি লাল তাবা।
নদী কিনারের চকাচকী—আঁখি দুটি
দুধে নেয়ে-ধুয়ে উঠেছে উজলে ছুটি'।
কপোল তাহার ফুলের মতন মিঠা,
ওষ্ঠ-অধরে সুরভি অমিয়-ছিটা;
পানি দুটি রাঙা পদ্মরাগের রাগে,
শ্বেত পাথরের পা দুটি স্মরণে জাগে,
দেবদারু সম শরীর সুঠাম তার,
মুখখানি মধু,—সকল শোভার সার।
সুরূপ সুঠাম এমনি আমার বঁধু;
ওগো পুরনারী! রাজদাসী! রাজবধূ!

পুরন্ধ্রী

বহিন্! তোমার বঁধু গেছে কোন্ দেশে?
তোর সাথে মোরা যাব তার উদ্দেশে।

"খুঁজিলাম কত,—না পেলাম দেখা তার,"

কোন্ দেশে, আহা, হ'ল সে নিরুদ্দেশ ?
বল্, বোন্, বল্, তোর ক্লেশে মানি ক্লেশ।

গোপকন্যা

বন্ধু আমার গেছেন কুঞ্জবনে,—
পুষ্প-চয়নে শতদল আহরণে ;
বঁধু সে আমার, আমি সে বঁধুর বঁধু,
কমলের বনে বঁধু মোর পিয়ে মধু।

(রাজার পুনঃ প্রবেশ)

রাজা

প্রিয়া ! প্রিয়া ! প্রিয়া ! তুমি কী চমৎকার !
তুমি দেব-সেনা—প্রতিমাটি মহিমার !
তুমিই আমার 'জেরুজালেম্' গো রাণী !
তুমিই 'তির্জ্জা'—দ্বিতীয় সে রাজধানী।
চেয়ো না অমন,—আর নয়, আর নয় ;
ও আঁখির কাছে মানিয়াছি পরাজয়।
তোমার চাঁচর চুল দোলে হাওয়া ভরে,—
গিরি' পরে যেন ছাগশিশুগুলি চরে।
দাঁতগুলি যেন যমজ ফুলের কুঁড়ি
প্রতিটি শুভ্র—প্রতিটির আছে জুড়ি।
ডালিমের মত নিটোল কপাল-খানি
চুলের পাতায় ঢেকেছে, হে মৃদু পাণি !

* *

তিন কুড়ি রাণী, চার কুড়ি আছে দাসী,
আছে অসংখ্য কুমারিকা সুধা-হাসি।
যে পাখাটি তবু ভালবাসি সব চেয়ে
সে তার ম'য়ের একটি মাত্র মেয়ে ;
নিষ্কলঙ্ক সতী সে পতিব্রতা,—
সে যে নিরুপমা,—তার সাথে কার কথা ?

* *

পুরনারী সবে তার সুখ্যাতি করে,
কি রাণী কি দাসী—সবে সুখী অন্তরে।

কে এল গো ঘরে উষার মতন মেয়ে !
কে এল, কে এল চাঁদের মতন চেয়ে !
সূর্য্যের মত মহিমায় দিক্ ছেয়ে !

নেপথ্যে রাখাল।

ক্ষেতে ক্ষেতে ঘুরি ফসলের 'হাল' দেখে,—
ডালিম ধরে কি আঙুর ওঠে কি পেকে ;
বুঝিতে না পারি মনের কি আজ মতি,—
এ তনু-রথের কোন্ পথে আজ গতি !

* * *

এস, ফিরে এস 'শূলম্' গাঁয়ের মেয়ে !
জুড়াক্ নয়ন ফিরে তোর পানে চেয়ে ;
কি দেখিবি, মন, শূলামীর অন্তরে ?—
দুই মহাসেনা যুঝিছে পরস্পরে।

গোপকন্যা

আমি বন্ধুর—বন্ধু আমায় চায়—
এস প্রিয়তম ! যাই ফিরে দুজনায়
গ্রামের বাথানে মুক্ত মাঠের কোলে
দেখি গে দুজনে আঙুর কোথায় দোলে
ফল ধরে কিনা ডালিমে দেখিগে, বঁধু
সেথায় তোমারে পিয়াব প্রণয়-মধু।

* *

রাজহংসের মদ-ক্ষরণ-বাসে
হাওয়া ভরি' উঠে নিশ্বাসে নিশ্বাসে।
আঙিনায় আর বাগানের চত্বরে
নূতন-পুরাণো সব গাছে ফল ধরে ;
নূতন-পুরাণো জমাই তোমারি লাগি'
হে বন্ধু ! মোর মায়ের স্নেহের ভাগী !
আমার মায়ের স্তন্য পিয়েছ তুমি
তাইতো তোমার মধুর অধর চুমি' ;
ভাই নহ তবু ভায়ের অধিক গণি'
ভালবাসা তব মধুর মধুর ধ্বনি।

মার ঘরে যাব তোমায় সঙ্গে ক'রে,
বন্ধু আমার ঠেলিতে নারিবে মোরে ;
ডালিমের রস পিয়াব তোমায় বঁধু
খাওয়াব তোমায় মশালা-গন্ধি মধু।

(তন্ময়ভাবে)

বাম হাতখানি রাখিয়ে মাথার নীচে,
ডান হাতে মোরে বেষ্টন কোরো পিছে।

(পুরস্ত্রীদিগের প্রতি)

বহিন্! দোহাই করিস্ নে কোলাহল,
দেখিস্! ও যেন হয় নাক' চঞ্চল ;
বন্ধুরে মোর জাগাস্ নে তোরা বোন্,
আপনি জাগিবে ;—শোন্ গো মিনতি শোন্।

পঞ্চম দিন

গ্রাম-পার্শ্বস্থ প্রান্তর। গোপকন্যা,
রাখাল, গ্রামবাসীগণ।

(রাজা গোপকন্যাকে মিষ্ট কথায় বশীভূত করিতে না পারায় এবং বলপ্রয়োগে রুচি না হওয়ায় উহাকে গ্রামে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি করিয়াছেন।)

গ্রামবাসী

দূর হ'তে কেও আসিছে গরব-ভরে ?
কে আসে গরবে বন্ধুর হাত ধ'রে ?

রাখাল

(গোপকন্যার প্রতি)

যে গাছের তলে প্রথম প্রেমের দান,—
এই সে আপেল,—রয়েছে বর্ত্তমান।
এই সে তোমার জননী জন্মভূমি,—
এইখানে ওগো প্রসূত হয়েছ তুমি।

গোপকন্যা

চিরসাথী আজি কর মোরে, প্রিয়তম !
প্রেম-দেবতার তপ্তমুদ্রা সম —
ধর মোরে তুমি অঙ্গে ও অন্তরে ;
মৃত্যু অধিক ভালবাসা বল ধরে।
প্রেমের মরণ মরণ-অধিক জানি,
তার জ্বালা, ওগো অঙ্গার-জ্বালা মানি।
প্রলয় প্লাবনে না নিবে প্রেমের ভাতি,
সাগরের গ্রাসে না ডুবে প্রণয় বাতি।

রাখাল

না মিলে প্রণয় ধন জন-বিনিময়ে,
ধূলা হয় সোনা প্রেমীর প্রেমের পয়ে।

গোপকন্যা

মরম জানাই বন্ধু তোমার কাছে,
আমার একটি যমজ বহিন্ আছে ;
যৌবন আজো জাগেনি তাহার বুকে,
লজ্জার রং না ফোটে তাহার মুখে।
তারে নিয়ে আমি না জানি করিব কিবা !
অথচ তাহার সমুখে নূতন দিবা ;
মুখে মুখে যবে ফিরিবে তাহার কথা,—
কি করিব নিয়ে লজ্জাবতী সে লতা ?

রাখাল

ভূমি যদি হয় তুলিব দেউল গড়ি ;
কাঠ যদি হয় হুড়কার কড়াকড়ি।

গোপকন্যা

আমি ভূমি, ওগো দেউল আমার স্তন,
আমি মৃত্তিকা পেয়েছি তোমার মন।

রাখাল।

রাজা সলোমান আঙুরের ক্ষেত রাখে,
টাকা নিয়ে জমী জমা দেয় যাকে তাকে ;
এক এক ক্ষেতে সেলামী হাজার টাকা ;
আমার ক্ষেতটি নিছক্ আমারি রাখা।
আমার ক্ষেতটি আমার সুমুখে আছে,
ফলেছে আঙুর ডালিম ধরেছে গাছে ;

"চিরসাথী আজি কর মোরে, প্রিয়তম !"

রাজার জমীতে লাভ তো ভুষি ও 'ভুসো',
রাজার হাজার, কৃষাণের বেলা দু'শো!

(গোপকন্যার প্রতি)

ওগো! আমাদের বাগান-গাঁয়ের মেয়ে!
দেখ একবার আঁখি তুলে দেখ চেয়ে;
বন্ধুরা সব শুনেছে তোমার বাণী!
আমারে শোনাও! আমারে শোনাও রাণী!

গোপকন্যা

তৎপর হও বন্ধু আমার!
বন্ধু! মধুব্রত!
দারু-চিনি-বনে কর গো বিহার
কিশোর মৃগের মত।

যবনিকা

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

সৌধ-রহস্য

অষ্টম পরিচ্ছেদ

এবার আমি যে সব কথা প্রকাশ করিব, তাহা ক্লুম্বার হলেরই অধিবাসিবর্গের মুখের কথা। জেনারেলের কোচম্যান্ ইজরেল টেক্স স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছিল, তাহা সে ষ্টোনিকার্কের আচার্য্য মিষ্টার মাথু ক্লার্কের নিকট যথাযথ বর্ণনা করিয়াছে।

ইজরেল টেক্সের কাহিনী

মাষ্টার ফদারজিল ওয়েষ্ট ও পুরোহিতের অনুরোধ, জেনারেল এবং তাঁর বাড়ীর সমস্ত কথা আমি যতটুকু জানি, প্রকাশ করে বলতে হবে। গরীবের উপর জুলুম, শুধু আমাদের দেশ বলে নয়, সকল দেশের সকল বড় লোকেরাই চিরকাল ধরে করে আস্‌চেন! আমি বেচারা ভাল মানুষের ছেলে, লেখা পড়া-জানি না—তবু আমাকে দিয়ে পুঁথির কথা লেখাতে হবে! বেশ,—তাই হোক! গরিবের ত আর "না" বল্‌বার উপায় নেই!

আমার নিজের সম্বন্ধে আমি কিছু বল্‌তে পারব না। কি জানি, তাহলে অনেকেই হয়ত সময় নষ্ট হচ্চে ভেবে বই বন্ধ করে ফেল্‌বেন! গরীবের কথা শুন্‌তে কারই বা ভাল লাগে? কেবল দুঃখের কথা বইত নয়!

আমার কথা শুধু এইটুকু বলি যে, "টেক্" এই বংশটি ভারী নামজাদা,—আর খুব মানী বংশ। এককালে,—এককালেই বা বলি কেন, এখনও এই বংশেই এমন অনেক লোক আছেন, যাঁরা "টাকার গাছ" বলে বড় লোকের দলে ভারী খাতির পেয়ে থাকেন। আমার এখন যে রকম অবস্থা, তাতে এটুকু জানাতেও আমার লজ্জা হচ্ছে। কিন্তু কি করব, মিঃ ওয়েষ্টের কাছে আমার না কি কিছু পাওনা আছে* সেই জন্যই জানিয়ে রাখ্‌লুম। কি জানি, মিষ্টার ওয়েষ্ট

---

* এই সত্যবাদী মহাসম্মানিত বংশের বংশধর আমার নিকট পুরা মাত্রায় তাহার কার্য্যের মূল্য গ্রহণ করিয়াও আমাকে ঋণী বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন,—আশ্চর্য্য!

আমায় যদি একটা নিতান্ত গরীব হতভাগা বলে জানেন, তাহলে অনায়াসেই ভুলে যেতে পারেন।

আমি লেখা-পড়া জানি না। আমার বাবা আমায় স্কুলে পাঠাবার চেয়ে কাক তাড়ানের কাজেই পটুতা জন্মানোটা পছন্দ করেছিলেন! তিনি আমায় স্কুলে পাঠিয়ে একটি অকর্ম্মণ্য "ফুল-বাবু" তৈরি না করে যে খেটে খাবার মত "মানুষ" করেচেন তার জন্য আমি চিরকালই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাক্‌ব।

অবশ্য লেখা-পড়া বাবা আমায় শেখান্‌ নি—কিন্তু তাই বলে যে আমি ধর্ম্ম-কথার কিছুই জানিনে, এমন নয়। আমাদের স্কট্‌ল্যাণ্ডের যা খাঁটি ধর্ম্ম, তা আমাদের বেশ ভাল করেই শেখানো হয়েছিল। আমরা গরীব বটে কিন্তু কখনও কারো অনিষ্ট করিনি, করবার সাধও রাখিনে। ধর্ম্ম পথে থাকলে অর্দ্ধেক রাত্রেও রুটি মেলে, এ কথাটা আমি খুবই মানি। যখন আমি রবিবার গির্জ্জায় যেতুম,—পথের লোক আমায় "ধার্ম্মিক টেক্" বলে ডেকে কথা কইত। ধর্ম্ম কথা আমি জানিও বিস্তর।

মে মাসের এক সকাল বেলা পথের ধারে মিষ্টার ম্যাকলীনের সঙ্গে আমার দেখা হয়। হাস্‌তে হাস্‌তে সে আমায় জিজ্ঞেসা করলে, "আমি কি চাই,—কোচমানী,—না, মালীর কাজ।" আমার তখন এমন অবস্থা যে কাজ খুঁজে-খুঁজে হায়রান হয়ে গেছি,—কিন্তু সে কথা ওর কাছে ভাঙ্গব কেন? আমি বল্লুম, "তা কোথায় কাজ, কি রকম কাজ, ভেবে দেখি—"আমার কথায় বাধা দিয়ে ছুঁচের মত সরু মুখখানা সিঁটকে সে উত্তর দিলে, "সে তোমার ইচ্ছে,—নিতে পার—না নিতেও পার! কত লোক খুসী হয়ে এই কাজে আস্‌বে। আর যদি নিতে চাও—তাহলে কাল সকাল বেলা আমার আপিসে এসে দেখা করো।"

লোকটা ভারী চাপা—আর কিপ্‌টের ধাড়ী। তার কাছে থেকে দুপয়সা আদায় করা খুবই শক্ত,—হাত দিয়ে তার জল গলে না! এ আমি দিব্যি গেলে বল্‌তে পারি,—ফিরে জন্মে কখনও ওর ভাল হবে না। তা নাই হোক—এ জন্মটা মোদ্দা কাটালে মন্দ নয়। ফাঁকি-ঝুঁকি দিয়ে খুবই পয়সা করে নিয়েচে। একেবারে রূপার আড়ঙ্‌ করে ফেলেচে। যখন শেষ বিচারের দিন আসবে, প্রভুর সিংহাসনের বাঁ দিকে যখন সাদা-কালো নেড়া মাথার গাঁদি লেগে যাবে, তখন সে দলে ম্যাকলীনকে দেখতে পেলে আমি যে একটুও আশ্চর্য্য হব না, এ কথা ঠিক।

পরদিন সকালে হুকুম মত আমি তার আপিসে গেলুম। কেন গেলুম? বলেইচি ত, আমার "গরজ" তখন তার চেয়েও বেশী। কদিন থেকে ডান হাত একরকম বন্ধই যাচ্ছিল। আপিসে ঐ পেট-মোটা বুড়োটার সঙ্গে একজন লম্বা, রোগা, সাদা-মাথা ভদ্দর লোককে দেখতে পেলুম! তার মুখখানা এমন কুঁচকে তুবড়ে গেছে যে, দেখে আমার আক্‌রোটের খস্‌খসে গার কথা মনে পড়ছিল। সে তার চক্‌চকে চোখের কট্‌মটে চাউনিতে আমার দিকে চেয়ে বল্লে,—কি বল্লে জান?—"আমার মনে হচ্চে, তুমি এই দেশেই জন্মেচ, না?"

বেটা যেন গণৎকার! আমি বল্লুম, "হুঁ, ঠিক্ ধরেচেন। কিন্তু এখান থেকে আমি এক পা কোথাও কখনো নড়িনি।"

"সত্যি?" অবাক হয়ে সে জিজ্ঞেসা কল্লে, "বল কি! স্কটল্যাণ্ডের বাইরে কখনও যাওনি?"

"দুবার,—কারমাইলে শুধু দুটিবার গেছলুম! এ কথা কেন বল্লুম, জান? আমি সত্যি কথা বল্‌তে ভালবাসি কি না? আরও আমি শুনেছিলুম যে ম্যাক্‌লীনের দুটো হরিণ আর একটা পেরুর বাচ্ছা চাই। গোলা-বাড়ীতে সে রাখবে। যদি এই সুযোগে দু'পয়সা আসে, কেন না, বলা ত কিছু যায় না আমাকেই যদি সেখানে পাঠায়, আমাদের পুরুৎ মশাই বল্‌ত "করে ভাবার চেয়ে, ভেবে করা ভাল," আমি ত আর সে সব ধর্ম্মের কথা ভুলি না। হুবহু মনে গেঁথে রেখেচি। ভাল কথা, আমি জানি অনেক, তা তোমাদের কি তত শুনতে ভাল লাগবে? যাই হোক, এখন যা বলছিলুম, তাই বলা যাক্।

জেনারেল হিথারষ্টন বল্লে,—জেনারেল ছাড়া আর কেউ নয়, সে বল্লে, "আমি ম্যাক্‌লিনের কাছে শুন্‌লুম, তুমি লেখা-পড়া জান না, না?" তার পর ম্যাক্‌লিনের দিকে চেয়ে বল্লে, "এই ঠিক হবে,—আমি এই রকম লোকই চাই। আজ-কালকার চাকর-বাকরগুলো বেশী বেশী লেখা-পড়া শিখে একদম মাটি হয়ে যাচ্ছে।" পরে আমার দিকে ফিরে বল্লে, "বুঝ্‌লে ঠিক্, তোমার সঙ্গে আমার বেশ মতের মিল হবে। মাইনে মাসে তিন পাউণ্ড, কি বল? কিন্তু একটি কথা, যখন ইচ্ছে, চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশ্ দিয়ে তোমায় জবাব দিতে পারব। এতে কেমন, রাজী ত?"

যতখানি সম্ভব মুখে দুঃখের ভাব এনে আমি জবাব দিলুম, "এ রকম কাজ আমি কখ্‌খনো করিনি মশায়,—এ আবার কি রকম?" কথাটা আমি কিছু মিথ্যা বলিনি। যখন ফারমার কটের কাছে কাজ করেছিলুম, সে আমায় মাসে এক পাউণ্ড করে মাইনে দিত।

তিনি বল্লেন, "ভাল, ভাল! তুমি যদি মেজাজ ঠিক করে থাক্‌তে পার, পবে না হয় মাইনে আরও বাড়িয়ে দেওয়া যাবে। ম্যাকলীনের কাছে শুনলেম, তোমাদের এখানে বুঝি আগাম "বায়না" কিছু দিতে হয়। তা এই নাও। সোমবার সকালে ক্লুমবারে আমার সঙ্গে দেখা করো।"

সোমবার ত বেড়াতে বেড়াতে আমি ক্লুমবারে গেলুম। বাড়ীখানা কি প্রকাণ্ড! তার পেটের মধ্যে বোধ হয় আমাদের সহরের সব লোকগুলোকে তোফা ঠেসে রাখা যায়। ঘর, তা বোধ হয় শ'খানেক হবে। করব ত মালীর কাজ, তা বাগান-ফাগান বড় কিছু দেখলুম না। ছোট একটু-জায়গা নিয়ে খানিকটা বাগান, তাতে গোটাকতক ফুলের আর বাহারে পাতার গাছ। আর ঘোড়া সেটাও প্রায় হপ্তা-তিন চার আস্তাবলের বারই হয়নি, আর কখনও যে হবে, এমন কিছু লক্ষণও দেখলুম না। তবে আমার খাটুনি খুবই হয়েছিল—সে ঐ বেড়াটা দেবার সময়। তা ছাড়া আর কাজ ছিল—ফাই-ফরমাস্‌টা শোনা—যেমন ধর, ছুরিখানা সাফ করা, জুতায় কালি লাগান, এমনি সব

কাজ আর কি! তা এর জন্যে আমার মত একটা জোয়ান মানুষকে রাখ্‌বার যে কি দরকার, তা ত কিছুই বুঝ্‌লুম না! এ'ত একটা বুড়ী ঝি রাখ্‌লেও কাজ চলে যেত!

আমি ছাড়া আর দুজন লোক ছিল—রান্নাঘরে রাঁধুনী লিজা, আর দাসী বারবারা। এদের দুজনেরই প্রথম জীবনটা লণ্ডনে কেটেছে,—এখন আর তিন কুলে কেউ নেই,—আর পৃথিবীর খোঁজ-খবর? তাও তারা কিছু জানে না, জান্‌তে চায়ও না। আশ্চয্যি মানুষ!

তাদের সঙ্গে আমার যে বেশী কথা বলতে হত না, এইটুকুই ছিল আমার ভাগ্যি! একে ত তাদের সময় নেই, সর্ব্বদাই কাজ নিয়ে আছে—তার উপর ভাল কথা যে কি, কাকে বলে, তা তারা মোটেই জানে না। নিজের উপকারের জন্যে জলার বেঙ্‌গুলোও যেটুকু ভাবে, নিজেদের জন্য তারা ততটুকুও ভাব্‌ত না। রাঁধুনী লিজা যখন বল্লে যে, ছ'পেনী খরচ করে মাষ্টার ডোনাল্ড মাক্‌সনের কথা সে শুন্‌বে না, তখনি আমি বুঝ্‌লুম যে, সব চেয়ে বড় বিচারকের হাতে তাদের ফেলে দিয়ে এখান থেকে আমার সরে পড়্‌বার সময় হয়ে এসেচে!

লোকের মধ্যেও চারজন। জেনারেল, কর্ত্রীঠাকরুণ, মাষ্টার মংডগু আর কুমারী বেলা! দু-এক দিনের মধ্যেই আমার মন যেন বল্‌ছিল, সংসারটা যেমন হওয়া উচিত ছিল, ঠিক-যেন তেমনটি নয়। কোথায় একটা কি গোল পাকিয়ে রয়েছে! কর্ত্রীর চেহারা যেন ভূতের মত! সাদা রং, আর কি রোগা! ভয়ানক চেহারা। অনেক সময়,—কেউ কোথাও নেই, আপনা-আপনি বিড়বিড় করে বক্‌চে! বাগানের মধ্যে যখন ঘুরে বেড়াত, তখন মনে হত, বুঝি পাগল হয়ে গেছে। এত যে পয়সার মানুষ, তা একটা ভাল কাপড় কি সোনা-দানা কিছুই গায়ে নেই। মাথার চুলগুলো অবধি এলো-মেলো, হাত ছুড়ে ছুড়ে বিড়-বিড় করে কি যে মন্তর্‌ বলে! ভাবে, কেউ বুঝি দেখ্‌তে পাচ্চে না। কিন্তু আমার চোখে কিছুই এড়াত না।

মনিবের ছেলে-মেয়ে দুটির মুখ দিনরাতই যেন ভার ভার! কিন্তু কর্ত্তার কাছে সবাই হার মেনেচেন,—তাঁর মুখখানা দুঃখে একেবারে ঝুলে পড়েচে,—কোন খুনী বদ্‌মায়েসের গলায় ফাঁস্‌ দিয়ে টান্‌লে তার মুখখানা যেমন হয়, ঠিক সেই রকম! নুনের জাহাজ টাহাজ ছিল, ডুবে গেছে হয় ত! অনেক সময় ঐ রাঁধুনী আর দাসীটাকে জিজ্ঞেস্‌ করেচি যে, সংসারের কোন্‌ খানে আগুন ধরেচে! হয়েচে কি?

তারা নির্ব্বোধ গাধা—তারা বলে কি, জান? তারা বলে, "মনিব কোথায় কি কচ্চে না কচ্চে, সে সব খোঁজে আমাদের কি দরকার?" তারা ঠিক সময়ে খেতে পাচ্চে, মাসের প্রথম মাইনে পাচ্চে, ব্যস্‌!" তারা এমন লোক যে দেখ্‌লেই মনে হবে, পাথরে খোদা দুটো পুতুল,—মন্‌-টন্‌ কিছুই নেই ভদ্দরভাবে যতই জিজ্ঞাসা কর, মুখে কথাটি নেই, যেন বোবা! কিন্তু নিজেদের যখন ইচ্ছা হবে, তখন—ওরে বাপ্‌রে! কি চীৎকার—গাছের উপর কাক-পাখীটি পর্য্যন্ত বস্‌তে পার্‌বে না।

এই রকম করে হপ্তার পর হপ্তা, মাসের

পর মাস কাট্‌তে লাগ্‌ল। বাড়ীটার কিন্তু একটুও ভাল লক্ষণ দেখ্‌তে পেলুম না। খাওয়া-দাওয়া, নাচ্‌, ভোজ চুলোয় যাক্‌, বাড়ীতে কেউই আস্‌ত না,—আবার শুধু তাই? বাড়ীর লোকগুলো অবধি বাইরে বেরুত না। কর্ত্তা দিনদিন রোগা আর দুর্ব্বল হতে লাগলেন—কর্ত্রী-ঠাকরুণের মুখে মেঘ ত লেগেই আছে,—অথচ কোন দিন কারো সঙ্গে তাঁকে ঝগড়া-বচসাও করতে শুনিনি। কি করে জান্‌লুম? তারা যখন এক সঙ্গে সবাই খেতে বস্‌ত,—আমি ঠিক্‌ সেই সময়টিতে জান্‌লার ধারের গোলাপ গাছগুলোকে নিড়তুম,—আর কান খাড়া রাখ্‌তুম, ওদের কথার উপর! ওরা তা জান্‌তেও পার্‌ত না।

যখন ছেলে-মেয়েরা থাকৃত—তখন কোন একটা কথা বড় হতই না কিন্তু তারা না থাক্‌লে যেন কি-একটা ভয়ানক ঘটনা ঘট্‌বে এমনি কথা চলত। কি রকম কি ঘটনা, তা অবশ্য কিছু বুঝ্‌তে পারতুম না! আমি জেনারেলকে অনেক সময় বল্‌তে শুনেচি যে মরবার,—কি কোন বিপদের সামনে দাঁড়াবার তার ভয় করে না। কিন্তু এ রকম করে একটু একটু করে মরা—বহুকাল ধরে অপেক্ষা করে থাকা, আর বিপদটার ঠিক-ঠিকানা না পাওয়া, এ সবে তাঁর শরীর ভেঙ্গে যাচ্চে, সাহসও ফুরোচ্ছে। কর্ত্রী তাঁকে সাহস দিত, ঠাট্টা করবার জন্যে বল্‌ত, "বিপদ নিশ্চয় আস্‌বে না, শেষকালে সব ভালই হবে।" কিন্তু এ সব ভাল কথা কেই বা শুনত?

ছেলে-মেয়েদের কথা আমি সবই জানতুম, সুবিধে পেলেই ওয়েষ্টের সঙ্গে মিশে ওরা ব্রাঙ্কসায়ারে পালিয়ে যেত। কর্ত্তা নিজের দুঃখে এম্‌নি কাতর হয়ে থাকতেন, যে এ সব খবর জান্‌তেও পারতেন না। আমার কথা যদি বল? আমি খাঁটি মানুষ, নিজের কাজের বাইরে একচুলও যাব না,—কেন যাব? কোচম্যান বা মালীর কাজের সঙ্গে তাদের খবর কি? তারা কি কচ্চে না কচ্চে বুড়োকে তা জানানো ত আমার কর্ত্তব্য নয়! আর বুড়োরও ত আক্কেল থাকা দরকার ছিল,—যে যদি একটা ছেলেকে কি মেয়েকে বলা হয় যে, অমুক কাজ তুই করিস্‌নে—তা হলে তারা নিশ্চয়ই আগে সেই কাজ করে বসে।

ভগবান্‌ এক সময় তাঁর ছেলে-মেয়েকে বলেছিলেন যে ঐ জ্ঞান গাছটির ফল খাসনি, আর সব খা। কিন্তু *ছেলে-পিলের স্বভাব,* তারা আগে গিয়ে *সেই ফলটিই তুলে খেলে।* আমার মনে হয়, ভগবানের বাগানের লোকদের সঙ্গে উইগটাউনের এই লোকগুলির যে কোন তফাৎ থাক্‌তে পারে, তার কোন মানে নেই!

এ-ছাড়া আর একটা কথা আছে—সে আমি এখনও বলিনি—কিন্তু সে কথাটাও লিখে রাখতে হবে।

জেনারেল আর তাঁর স্ত্রী এক ঘরে শুতেন না। জেনারেল শুতেন, একেবারে বাড়ীর সব শেষের ঘরটায়। সে ঘরটা অন্য সব সময় চাবি-বন্ধ থাকত। কাকেও সে ঘরে ঢুক্‌তে দিতেন না। বিছানা পাতা,—ঝাড়া ঝোড়া সবই তিনি নিজের হাতে করতেন। আর আমাদের চাকর-বাকরদের ত সে দিকের রাস্তাতেও চলবার হুকুম ছিল না। রাত্রে সমস্ত ঘরে, ঘরের সব জানলায় চারদিকে আলো

ঝোলান হোত। কর্ত্তা নিজে চারদিকে ঘুরে সারা রাত পাহারা দিয়ে বেড়াতেন। সারা রাত বিছানায় শুয়ে শুয়ে তাঁর পায়ের শব্দ শুনতে পেতুম—এ সিঁড়ি দিয়ে উঠচেন, ও সিঁড়ি দিয়ে নাম্‌চেন। মাঝ রাত্রির থেকে যতক্ষণ না সকাল হয়, এই রকমই আনা-গোনার তাঁত বোনা চল্‌ত।

নিশুতি রাতে একা ঘরে বিছানায় পড়ে পড়ে, এই রকম পায়ের শব্দ শুনে শুনে আমার কানদুটিও ঝালাপালা হয়ে যেত। যাই হোক, তিনি পাগলই হোন্, আর ভারতবর্ষ থেকে পুতুল পূজোর তন্তর-মন্তরই শিখে আসুন, তাঁর মাথায় ঘী-টিতে যা কিছু ভাল জিনিষ ছিল, তা কিন্তু পোকায় কুরে খেয়ে ফেলেছেল—একথা আমি জোর করে বল্‌তে পারি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।

বাগ্‌দত্তা

(২৭)

পরদিন প্রভাতীসুরে নহবতের সানাই প্রতিবেশীর ঘরে শিশুদের জাগাইয়া উৎসব গৃহের দ্বারে জড় করিল। নন্দকিশোর নিয়মিত কর্ত্তব্য সম্পাদনার্থ চিকিৎসাগারে আসিয়া স্বল্প পরেই বিমূঢ়ভাবে বাহির হইয়া আসিলেন, উপরে উঠিয়া ডাকিলেন "বিন্ধ্য!" বিন্ধ্যবাসিনী শশব্যস্তে আসিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়াই নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন, "হইয়াছে কি?"

নন্দকিশোর কহিলেন "গৌরী নাম ওর কে রেখেছিল? তোমরা কি?"

সংশয়কম্পিত সভয়কণ্ঠ এমন করিয়া বাধিয়া যাইতেছিল যে যেন তিনি জজের কাছে তাঁহার সর্ব্বস্বপণের মোকর্দ্দমার রায় শুনিতে চাহিতেছেন।

কিছু না বুঝিয়া বিস্মিতা বিন্ধ্যবাসিনী উত্তর করিলেন "তাতো জানিনে, বোধহয় দিদিই রেখে থাকবে, যখন ওকে আনা হয় ওর জামার, বিছানায় ঐ নাম লেখা ছিল। আমরাও সেই থেকে ওকে গৌরী বলে ডাকি।"

জজের রায়ে হতাশার সংবাদ পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাইল, নন্দকিশোরের মুখ নীল মাড়িয়া গেল, জীবনীশক্তি যেন সেই মুহূর্ত্তে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে এমনই বোধ হইল। আশাহীনের অস্ফুট আর্ত্তনাদের মত তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল "বেশ মনে পড়ে?"

"পড়ে বই কি।"

"তবে আমার সব ফুরাল!"

অজানিত ভয়ে সম্মুখবর্ত্তী নারী কম্পিতা হইয়া উঠিলেন—"লাহিড়ীমশাই!"

"জানোনা বিন্ধ্য, ধারণা করতেও পারনি আমার কি সর্ব্বনাশ আজ হলো, আমার কেউ নেই—"

"লাহিড়ী মশাই! একি পাগল হয়ে গেলেন—"

পাগল, যদি হয়ে থাকি বেশি কিছু হয়নি, আগে তবে শোন। মাকে আমার বলে মনে করেছিলাম, আমার বার্দ্ধক্যের অবলম্বন ভেবেছিলাম, সে আমার কেউ নয়, সে তোমার দিদির কাছে গচ্ছিত ভবানী প্রসাদের মেয়ে।

"এতদিনে সে ভবানীপ্রসাদ এখানে এসেছে—বলচে এ তার মেয়ে আমার কেউ নয়, সে বারেন্দ্র নয় রাঢ়ী। এ বিয়ে হতে পারেনা।"

"সে ভুল কচ্চে গৌরী দিদির মেয়ে, দাদা নিয়ে আসেন। তিনি তাহলে শুনতে পেতেন না, বলেন কি? না না।"

নন্দকিশোরের চারিদিকের ভূমি তখন ভীষণবেগে আবর্ত্তিত হইতেছিল, অচল পৃথ্বীর সচলতা অকস্মাৎ ভূমিকম্পের রুদ্রতালে ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার গৌরী তাঁহার নয়? না মনে না বাহিরে!

তবে এ দুদিনের জন্য অন্ধের দৃষ্টিদান কেন করিলে ভগবন্! চিরঅন্ধকারই তো ভাল ছিল।

স্খলিত চরণে সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী কাষ্ঠাসনে ভর দিয়া আপনাকে সামলাইয়া লইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ঘূর্ণিত মস্তক দেহভার বহন করিতে পারিতেছিল না তাই আসন গ্রহণ করিতে হইল। গ্রহণ লাগা সূর্য্যের ঝাপসা আলোর মত সেই প্রদীপ্ত সূর্য্যকিরণ তাঁহার দৃষ্টিপটে পুরাতন বাঙ্গালা কালির হরিদ্রা লেখা ফুটাইয়া তুলিতে লাগিল, সে লেখা অবোধ্য অস্পষ্ট। স্নেহপাত্রীর কৃতঘ্নতা,' ভাগ্যের বিশ্বাসঘাতকতা একসঙ্গে দুইটা প্রচণ্ড আঘাত তাহাও এ বয়সে, সহিয়াছে। গত সন্ধ্যার ঘটনা শেলের মত বক্ষঃপঞ্জরে বিঁধিয়া আছে, হতাশ হৃদয় সেই অবধি যন্ত্রণাধ্বনি করিয়া বলিতেছিল এত করিয়াও কন্যার মন পাইলাম না! তাহাকে সুখী করিতে পারিলাম না।

কিন্তু এই নবীন আতঙ্ক সহসা সে কথা ভুলাইয়া দিল। শুধু এই মাত্র মনে রহিল তাঁহার গৌরী তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছে, সে আর তাঁহার নয়, সে অন্যের, অন্য লোক তাহার পিতা,—তাঁহার কেহ নাই! একটা বুকফাটা তীব্র যন্ত্রণার ক্রন্দন মর্ম্মে মর্ম্মে হাহাকার করিয়া উঠিল, মানবের অহং ভিতরে জাগিয়া উঠিয়া পদতল হইতে মস্তকের কেশগুলাশুদ্ধ কাঁপাইয়া আকুলস্বরে কহিল—'আমার কি হইল?'

দ্বারের বাহিরে শব্দ হইল "নন্দকিশোর বাবু, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে বসিয়ে রাখলেন, উত্তরটাও দিয়ে গেলেন না! আমি ভিতরে যেতে পারি?"

উত্তরের পূর্ব্বেই দ্বার ঠেলিয়া কাশকুসুমসদৃশ শুভ্র মস্তক ও প্রসন্নমুখ লইয়া এক অপরিচিত মূর্ত্তি প্রবেশ করিল। নন্দকিশোর তাহাকে দেখিয়া আসন ছাড়িয়া উঠিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কে যেন তাঁহার হাত-পা গুলা সেই-খানে বাঁধিয়া দিয়া গিয়াছিল,—উত্থান অসম্ভব হইল, অধর ঈষৎ কম্পিত হইল কি একটা অস্পষ্ট অভিবাদনসূচক ধ্বনি, তাহার মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিল কিন্তু তাহার অর্থবোধ হইল না। বিন্ধ্য তাহার সহসা আগমনে সচেতন হইয়া মাথায় কাপড় টানিয়া

দিলেন। আগন্তুক কহিল "আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আমার কাছে লজ্জা কি মা? তাহলে ডাক্তারবাবু আমা'ই অনুমান ঠিক তো?" আবার একটা মুমূর্ষু-কণ্ঠের অস্ফুট যন্ত্রণা ধ্বনি নন্দকিশোরের রুদ্ধ কণ্ঠ ভেদ করিয়া বাহিরে আসিল "হ্যাঁ"।

"তার নাম গৌরী আমার স্ত্রী সূতিকাগারেই রাখেন। আপনি জানেন সূতিকাগৃহেই তাঁহার মৃত্যু হয়, আমিও সেই অবধি দেশত্যাগী। দুই বৎসর পবে মিরাটে ফিরে আপনাদের অনেক অনুসন্ধান করি কিন্তু কোন খবর পাই নি, এবার কলকাতায় এসে এই পাড়ায় একটি আত্মীয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, কথায় কথায় আপনার কথা, আপনার কন্যার বিবাহের কথা উঠে, তিনি কন্যার নাম উল্লেখ করতেই আমি চমকে উঠি, গৌরী —সে তো আমারই মেয়ে—"

"বাবা!" নন্দকিশোর চমকিয়া দেখিলেন দুখানা বল্লরীকোমল বাহুপাশ তাঁহাকে বাঁধিয়া ফেলিয়া একখানা জুঁই ফুলের মত ক্ষুদ্র ও তেমনই সুন্দর মুখ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ঐ মধুর নামে সম্বোধন করিতেছে। সহসা সঞ্জীবনী তাড়িত স্পর্শ তিনি অনুভব করিলেন। নন্দকিশোর পুনর্জ্জীবিতের ন্যায় অকস্মাৎ যেন চমকিয়া জাগিয়া উঠিলেন। এক মুহূর্ত্ত তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া প্রবল বেগে তাহাকে দুইহস্তে টানিয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। আকুল হৃদয় হইতে স্নেহ বিগলিত আর্ত্তনাদ বাহির হইল "মা, মা আমার," পরক্ষণে দুইবাহু শিথিল হইয়া দুই পার্শ্বে ঝুলিয়া পড়িল; অবসাদগ্রস্তভাবে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। "বাবা আমায় নাকি আবার কে একজন নিতে এসেছে!" গৌরীর মুখে ভয়ের স্পষ্ট ছায়া, তাহার ক্ষুদ্র ওষ্ঠাধর কম্পিত হইতেছিল। অদূরবর্ত্তী বৃদ্ধকে সে একবারও লক্ষ্য করে নাই, কিন্তু সংবাদটা কেমন করিয়া ইতিমধ্যেই বাড়ীময় রাষ্ট্র ও তাহাব কর্ণগোচর হইয়াছিল।

বৃদ্ধ কহিল "হ্যাঁ বাছা আমিই তোমায় দেখতে এসেছি—"গৌরী বিদ্যুৎবেগে তাহার দিকে ফিরিয়া সভয়ে নন্দকিশোরের কাছে ঘেঁসিয়া আসিল "ওই বুড়োর সঙ্গেই আবার কি আমায় যেতে হবে?"

কি মর্ম্মভেদী সকরুণ আবেদনের সুর! সে যেন বলিতেছিল এমনই করিয়া কি তোমরা আমায় লইয়া পরিহাসের খেলা খেলিতেছ! নন্দকিশোর উচ্চকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন "উনিই তোমার বাবা গৌরি; উনি হয়তো তোমায় নিয়ে যাবেন, আমি তো তোমার কেউ নই আমি কেমন করে তোমায় ধরে রাখব মা আমার?" হৃদ্‌পিণ্ডটা বোধ হয় এই কথা কয়টার সঙ্গে সঙ্গে ছিঁড়িয়া পড়িবার উপক্রম করিল। তিনি তাহার কেহ নন! তাঁহার সর্ব্বস্বধন, জীবনের একমাত্র সুখ যে তাঁহার সে তাঁহার কেহ নয়!

গৌরী ব্যগ্রহস্তে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল। বৃদ্ধের দিকে চাহিয়া উগ্রস্বরে কহিল আমি যাবো না"।

"না মা তোমায় কোথাও যেতে হবে না, তুমি যাঁর সন্তান হয়ে আছ থাক, সুখে থাক, সুখী কর, আমি ভবঘুরে, চালচুলাও রাখিনি; তোমায় আমি কোথায়

নিয়ে যাবো? বেশ আছ, কেন তোমায় ভালবাসার লোকেদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করব? না, শুধু দেখে গেলাম, আশীর্ব্বাদ করে গেলাম, বাপের আশীর্ব্বাদে ভাল হবে।—

ডাক্তার বাবু! ভয় নেই আপনার ধন আমি অপহরণ করবো না। শুধু এই বিয়েটা বন্ধ করা আমার দরকার ছিল, তা না হলে আমি শুধু দূরে থেকেই একবার দেখে চলে যেতাম! তবে বিদায়, রাঢ়ী পাত্র দেখে বিবাহ দিও, সুখে থেকো মা, সুখী হও"। এতক্ষণে ঘরের বাতাস যেন লঘু হইয়া আসিল, সূর্য্যের জ্যোতিঃ দীপ্ত তেজে জ্বলিয়া উঠিল, পদাঙ্গুষ্ঠ হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত সহজ সবল অবস্থায় ফিরিয়া পাইয়া নন্দকিশোর স্বাভাবিক-ভাবে দুইপদ অগ্রসর হইয়া সাগ্রহে কহিয়া উঠিলেন, "তবে একে আবার আমায় দিলেন?" "ও তো তোমারই"—

কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে কোন সাড়া রহিল না, কেবল গৌরীর দ্রুত নিশ্বাসের একটা অস্ফুট শব্দ থাকিয়া থাকিয়া শুনা যাইতে লাগিল। সে অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিল তাই আশ্বাস পাইয়াও যেন ইহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। এ কি অদ্ভুত ঘটনা তাহার জীবনে ঘটিতেছে? তাহার এক মাসিমা ভিন্ন কেহ ছিল না হঠাৎ একদিন এক ব্যক্তি গিয়া পিতৃ পরিচয়ে তাহাকে সেই মাসিমার বক্ষঃ হইতে ছিনাইয়া লইয়া আসিল, সে বিচ্ছেদ ব্যথা এখনও সে ভুলিতে সক্ষম হইতেছে না, আবার আর একজন হঠাৎ একদিন প্রভাতে আসিয়া বলিল, 'ও নয় আমিই তোমার পিতা! আবার পিতা নিজেও সেই কথায় সায় দিয়া বলিতেছেন, হ্যাঁ উনিই তোমার পিতা, আমি কেহ নই!"

গৌরীর 'পিতা' অবশেষে সেই ভাবোন্মাদনাপূর্ণ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কহিলেন "তবে চল্লাম লাহিড়ী মশাই! আর দেখা হয় কি না হয়, এবার বদরিনারায়ণ যাবো ভেবেছি। মা একবার ফিরে দাঁড়াও তোমার মুখখানি একবার দেখে যাই"—গৌরী নন্দকিশোরের বক্ষে মুখ লুকাইল, তিনি সস্নেহে তাহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া মৃদু স্বরে কহিলেন, "যাও গৌরী ওঁকে প্রণাম করে এসো, কাছে যাও—"

সে এ আদেশ পালন করিল না, বরং জোর করিয়া নিজের মুখখানা যথাস্থানে চাপিয়া রাখিল। নন্দকিশোর পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিয়া অকৃতকার্য্য হওয়াতে ঈষৎ অপ্রতিভ ও বিব্রত হইয়া উঠিলেন। ইহা বুঝিয়া ভবানীপ্রসাদ ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "থাক্, বেটী ভয় করছে পাছে ওর মুখখানা দেখলে এ পাষাণ বুকে প্রাণ সঞ্চার হয়ে যায়, পাছে মায়ার বাঁধনে পড়ে ছেড়ে যেতে না পারি! হয়তো ঠিকই বুঝেছে, কি বলেন ডাক্তার বাবু। আর কাজ নাই—তা হলে নমস্কার মশাই, আপনার মঙ্গল হোক, সুখে থেক মা"। নন্দকিশোর ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "সে কি এখনি কেন যাবেন? দু একদিন—না হয় আজকের দিনটা—"

"জানেন তো সবই ডাক্তার বাবু! কেন মিথ্যে আবার জড়াতে চাচ্ছেন? কি জানেন মানুষের মন! এ দুনিয়াকে বিশ্বাস করতে নাই। আসি তা হলে।"

অল্প পরেই দরজা খোলা ও বন্ধের শব্দে

গৌরী বুঝিল সে ব্যক্তি চলিয়া গিয়াছে। সে মুখ তুলিতেই দুইটি গভীর স্নেহে ভরা উৎকণ্ঠিত উৎসুক নেত্রের সহিত তাহার নেত্র মিলিল, উভয়েই একটু হাসিল, গৌরী অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "বুড়োটা চলে গিয়েছে ?" "হ্যাঁ, কিন্তু ওরকম করে তাঁকে বলতে নেই গৌরী, তিনি তোমার বাবা, আর কত মহৎ তিনি!" কৃতজ্ঞতায় আনন্দে নন্দকিশোর অবরুদ্ধবাক্ হইয়া গললগ্না কন্যাকে আরও কাছে সরাইয়া লইলেন। তাঁহার বুকে মাথা রাখিয়া হর্ষোৎফুল্ল নেত্রে তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে গৌরী কহিল, "রাম বল! সে কেন আমার বাবা হবে? তুমি আমার বাবা।" বিন্ধ্যবাসিনী অপর দিকে মুখ ফিরাইয়া চোখ মুছিতেছিলেন, এইবার হাসিয়া ফেলিলেন।

পত্র-পরিচয়

পত্র-পথে বারেক দেখা আঙুল চারেক জমীর 'পরে—
মসী-মাখা মোহর-আঁকা চৌকা সাদা খামের ঘরে!
কোকিল নহে—ডাকের ডাকে,
আখর-আঁটা বেড়ার ফাঁকে
একটি কেবল কথার হাওয়ার আভাস শুধু তিলেক তরে;
স্পর্শে যাহার মনের বনে ভাবের গাছে মুকুল ধরে।

বসন্তে নয়, নয় বরিষায়—বৈশাখী এক দ্বিপ্রহরে,
নিম্ব-শাখার পাতায়-ঢাকা কেউ-না-থাকা একলা-ঘরে;
এ পরিচয়—কি পবিচয়?
মিলন-রসের কোন্ অভিনয়!
চম্‌কে-চাওয়া থম্‌কে-যাওয়া কোন্ না-পাওয়া পাবার তরে—
একটি নাম আর একটি কথায় না জানি কোন্ শক্তি ধরে!

মূর্ত্তি কোথায়, রূপটি কি তার—কেমন করে' জান্‌ব তারে?
কল্পগাঙে জালটি ফেলে' কি ধরে' আজ টান্‌ব পারে!
ছত্র দুয়েক পত্র-লেখা—
সেই কি তাহার চিত্ররেখা;
চোখটি তাহার চুলটি তাহার জ্বলছে যাহার অন্ধকারে?
নামটি তাহার ফুলটি কি সে মুগ্ধ করে গন্ধ-ভারে!

পত্র-পথে সেই সে দেখা, তাও সে শুধু বারেক তরে ;
আজো তাহার দাগটি আছে গোপন মনের বিজন ঘরে !
কত জনের কত আলাপ—
হয়ত তাদের নাই কোন ছাপ ;
মায়ার মোহের কত বাঁধন কেটেছি এই আপন করে—
তারি মাঝে একটি কোথায় রয়ে গেছে কেমন করে' !

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী ।

হকের ধন

কোনমতে নাকে-মুখে ভাত গুঁজিয়া আহার শেষ করিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে বিপিন উপরে আসিল। ঘরের জানালায় একটা কামিজ হাওয়ায় শুকাইতেছিল। বিপিনচন্দ্র সেটা টানিয়া গায়ে চড়াইল। পরে তাহার উপর কোট উঠাইয়া বোতাম আঁটিতে আঁটিতে হাঁক পাড়িল, "ওগো, আমার জল-খাবারের বাক্সটা দিয়ে যাও—আজ আর দাঁড়াতে পাচ্ছি না। ন'টা বাজে !"

পুস্তকাকৃতি একটা টিনের বাক্স হাতে লইয়া মনোরমা ঘরে আসিল। স্বামীর সম্মুখে বাক্স রাখিয়া মনোরমা অঞ্চল হইতে ছোট একটা ফর্দ্দ বাহির করিয়া বলিল, "কাল-বাদে পরশু অক্ষয়-তৃতীয়া। কাল আবার রবিবার, ছুটি, বেরুবে না ত। বামুন খাওয়াবার জিনিষ-পত্তরগুলো কলকেতা থেকে আজই তাহলে নিয়ে আসা চাই। দেখো, যেন একটিও না ভুল হয়। এতে বাদ দেবার কিছু নেই। ফর্দ্দটা শুনবে ?"

জুতা ঝাড়িতে ঝাড়িতে বিপিন কহিল, "থাক্, আর পড়তে হবে না। বেশী ফ্যাসাদের কিছু নেই ত ? দেখো—"

মনোরমা কহিল, "না, না, ক'দিন আমাদের মাস-কাবারের ময়দা ফুরিয়ে গেছে—তা এখানকার ঐ ধুলো-বালি দিয়েই চালাচ্ছি। তুমি বলেছিলে, শনিবার কিনে আনবে। তা আজ এনো। ভুলো না। না হলে সত্যি ত আর ঐ ধুলো-বালিগুলো বামুনদের পাতে দিতে পারব না।"

বিপিন আর বাক্য ব্যয় না করিয়া ফর্দ্দ ও খাবারের বাক্স পকেটে ফেলিয়া দ্রুত বাহির হইয়া পড়িল। তামাক খাইবারও সেদিন আর অবসর হইল না।

বিপিনের বাড়ী হইতে কাঁকনাড়া ষ্টেশন দশ মিনিটের পথ। কাঁকনাড়া হইতে বিস্তর লোক প্রত্যহ ডেলি প্যাসেঞ্জারি করিয়া কলিকাতার অফিসে চাকুরি বজায় রাখেন। প্রতি ট্রেনেই অফিস-যাত্রীর বিরাম নাই—যাহার অফিস যত কড়া, তাহাকে তত শীঘ্র বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হইতে হয়। বেলা এগারোটায় বিপিনের অফিস হাজিরা লয়।

তাই তাহার নয়টার সময় বাড়ী হইতে বাহির হইলেও চলে। নয়টা সতেরোর ট্রেন দশটা পনেরোয় কলিকাতায় পৌঁছায়। সুতরাং বিপিনের কোন অসুবিধা হয় না।

গাড়ীতেই বিপিন দিবানিদ্রাটুকু সারিয়া লয়। সেদিনও নিত্যকার মত সে নিদ্রার আয়োজন করিল। তন্দ্রা আসিয়াছে, এমন সময় পত্নী প্রদত্ত ব্রাহ্মণ-ভোজনের ফর্দ্দের কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। পকেট হইতে কাগজখানা বাহির করিয়া ভাঁজ খুলিয়া সে পড়িতে বসিল। আঁকা বাঁকা অক্ষরে মনোরমা এক দীর্ঘ ফর্দ্দ তৈয়ার করিয়াছে। ঘি, ময়দা হইতে আরম্ভ করিয়া আনারস, তরমুজ, ছাঁচি ও মিঠা পান অবধি সে ফর্দ্দ হইতে বাদ পড়ে নাই। বিপিন ভাবিল, তাইত! এতগুলা জিনিষ! সারা কলিকাতাটাই আজ ঘুরিতে হইবে, দেখিতেছি। অফিস হইতে বেলা দুইটার সময় সে বাহির হইবে, স্থির করিল। স্ত্রীর উপর একটু রাগও যে না হইল, এমন নহে! পরক্ষণে হাসিও আসিল। সে ভাবিল, বাঙ্গালীর ঘরের মেয়েগুলা সত্যই অদ্ভুত জীব বটে! কলিকাতায় অফিস যাই ত একেবারে হুকুম করিয়া বসিয়াছে, রাজ্যের দ্রব্য-সামগ্রী সেখান হইতে কিনিয়া আনো। এতটুকু ভাবেনা বা বোঝে না, যে, বিশাল সহর কলিকাতার কোথায় কোন্ এক ক্ষুদ্র কোণে অফিস, আর কোথায় থাকে কত দূরে এই সকল ঘি ময়দা ও ফল-মূলের দোকান-গুলা! কলিকাতা কি কাঁকনাড়া যে, একটা অশথতলায় হাট বসাইয়া রাজ্যের দোকানী-পশারী মেলা জমাইয়া দিয়াছে, ছুটিয়া গিয়া এক-নিশ্বাসে জিনিস-পত্র কিনিয়া আনা চলে। না বুঝিয়া সব এমন জিনিসের ফরমাস করিয়া বসে, যে তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতেই সারা দিন কাটিয়া যায়, কেনা ত দূরের কথা!

গাড়ী ইছাপুর ষ্টেশনে থামিলে ভূপেন, মহীন্, ও হাবুল আসিয়া ট্রেনে উঠিল। হাবুল কহিল, "এই যে বিপিনদা, আজ বড় ঘুমোওনি যে! তা যাক্, ভালই হয়েছে। রতন পৌনে আটটার ডাউনে বেরিয়ে গেছে, আমাদের তাস খেলার সঙ্গী কম পড়বে, ভাবছিলুম। তা তুমি ত ঘুমোওনি—বসতে হবে।"

দুই-চারি বার আপত্তি করিয়া বিপিন দেখিল, না খেলিলে ইহারা কিছুতেই নিষ্কৃতি দিবে না। অগত্যা সে খেলায় যোগ দিল।

২

বেলা দুইটার সময় অফিস হইতে বাহির হইয়া স্ত্রীর ফর্দ্দ-মাফিক জিনিস-পত্র কিনিয়া বিপিন যখন শিয়ালদহ ষ্টেশনে আসিল, রাণাঘাট লোকাল তখনও প্লাটফর্ম্মে ইন্ হয় নাই। বাহিরের কুলি কহিল, "হামলোককো ভিতর যানেকা হুকুম নেহি, বাবু—"

কয় ঘণ্টা ধরিয়া ঘুরিয়া-বকিয়া বিপিনের মেজাজের ঠিক ছিল না। সে গর্জ্জিয়া উঠিল, "হুকুম নেহি ত কেয়া হোগা! এ সব কি হাম বয়েগা?" রেলের এক কেরাণী বাবু নিকটে ছিলেন, বিপিনকে তিনি বুঝাইয়া দিলেন, নিয়ম যখন নাই, তখন উহার সহিত বাদানুবাদ করা বৃথা। বিপিন যে ইহা না জানিত, তাহা নহে, তবে সব কেমন তাহায় গোল হইয়া গিয়াছিল। দ্বিপ্রহরের এই রৌদ্রে

শুধুই কি সে ঘুরিয়াছে, পয়সাও আজ বিস্তর খরচ হইয়া গিয়াছে। যাক্, এখন বকাবকি করিয়া লাভ নাই। অগত্যা সে রেল-কুলি ডাকিয়া জিনিস-পত্র তাহার ঘাড়ে চাপাইয়া অগ্রসর হইল। প্লাটফর্ম্মে আসিয়া তাহার মনে পড়িল, ঐ যাঃ! ভারী ভুল হইয়া গিয়াছে! তামাক কেনা হয় নাই,—অথচ একেবারে ফুরাইয়া গিয়াছে। বালাখানার ধার দিয়া আসিল, তবু তখন হুঁস হইল না! কি আপদ! কাল আবার রবিবার, ছুটির দিন। তাস খেলিতে বন্ধু-বান্ধবের সমাগম হইবে। তখন সে আসর জমিবে কি করিয়া? কুলির নম্বরটা দেখিয়া লইয়া জিনিস-পত্র তাহার চার্জ্জে রাখিয়া তাহাকে বখশিসের লোভ দেখাইয়া তামাক আনিবার জন্য বিপিন আবার শিয়ালদহের মোড়ে ছুটিল।

মোড়ে তখন পুতুল নাচ ও ময়ুর-পঙ্খীর আড়ম্বর করিয়া ব্যাণ্ড বাজাইয়া বরযাত্রী, লোক-লস্কর ও গাড়ী-ঘোড়ায় সমস্ত পথ জুড়িয়া এক বর চলিয়াছে, বিবাহ করিতে। সম্মুখে বাধা দেখিয়া বিপিন মহা বিরক্ত হইল। প্রোসেশন চলিয়া গেলে রাস্তার অপর পারের মোড় হইতে এক টাকার তামাক কিনিয়া হন্‌হন্ করিয়া প্রফুল্ল মনে সে ষ্টেশনে ফিরিল।

যাত্রী-বোঝাই গাড়ী তখন প্লাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া ছুটিবার জন্য অধীর আগ্রহে ফুঁসিতেছিল। কুলিকে জিনিস-পত্র উঠাইতে বলিয়া কোনমতে গাড়ীতে ভিড়ের মধ্যে বিপিন একটু স্থান সংগ্রহ করিল; পরে জিনিস-পত্র তুলিয়া গুছাইয়া কুলিকে পয়সা দিয়া নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। ঈষৎ প্রকৃতিস্থ হইলে সহসা সম্মুখস্থ বাঙ্কের উপর তাহার চোখ পড়িল। চোর-কুঠারির মত ট্রেনের কামরা,—অন্ধকারে ভালো নজর চলে না, তবু দেখা গেল, টুকরি-ভরা গোলাপ-জাম ও প্রকাণ্ড একটা তরমুজ বাঙ্কে রহিয়াছে। তাহার তরমুজের চেয়ে এটা বড় কি? অমনি তাহার নিজের তরমুজটার কথা মনে পড়িল! এ-ধার ওধার চারিধারে সে ফিরিয়া দেখিল। কৈ—নাই ত! তবে ভুল হইয়াছে! নিশ্চয়, সেটা প্লাটফর্ম্মে ফেলিয়া আসিয়াছে! সে উঠিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখের দুই-তিন জনকে টপকাইয়া একেবারে কামরার দ্বারের সম্মুখে আসিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ট্রেনও তাহার দীর্ঘ দেহ-ভার নাড়িয়া চলিতে আরম্ভ করিল। বিপিনের সেদিকে লক্ষ্য ছিল না—হাতল ঘুরাইয়া ঠেলিয়া সে কামরার দ্বার খুলিয়া ফেলিল; খোলা দ্বার-পথে যেমন লাফাইয়া পড়িবে, অমনি তাহার কোমর জড়াইয়া সবলে কে তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া ফেলিল। সে সুদৃঢ় বন্ধন মুক্ত করিতে না পারিয়া বিপিন কহিল, "আঃ, কে? আমি তরমুজ ফেলে এসেছি, মশায়, তরমুজ। বিস্তর ঘুরে নগদ দেড় টাকা দাম দিয়ে কেনা—গোয়ালন্দর তরমুজ!"

ভদ্রলোকটি তাহাকে টানিয়া বসাইলেন, কিন্তু তাহার দখল ছাড়িলেন না। পরে ধীরভাবে বুঝাইলেন যে, ট্রেন যখন চলিতে সুরু করিয়াছে, তখন সে চলন্ত ট্রেন হইতে লাফাইয়া পড়িলে নিশ্চয় জরিমানা হইবে। এবং কোর্টে গিয়া পঞ্চাশ টাকা জরিমানা দেওয়ার চেয়ে দেড় টাকার তরমুজটা খোয়া গেলে ক্ষতি যে কম হইবে, সে বিষয়েও তিনি ইঙ্গিত করিতে ভুলিলেন না।

বিপিন কহিল, "আহা, বুঝচেন না, মশায়—"

ভদ্রলোকটি কহিলেন, "বেশ বুঝচি। ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়লে শুধু আপনারই ক্ষতি হত, আর সেইজন্যেই যে আপনাকে ধরেছি, তা ভাববেন না। একে ত এই বেজায় গরমে অফিসে গরম সাহেবকে নিয়ে জ্বলে মরছি, এর উপর যদি আপনার মকদ্দমায় রেল-কোম্পানির তরফে সাক্ষী হয়ে শেয়ালদার পুলিশ কোর্টে হাজিরে দিতে হয়, তাহলে প্রাণে ত বাঁচবোই না, মধ্যে থেকে চাকরিটিও খোয়া যাবে! আপনি কি সে বিপদে না ফেলে ছাড়বেন না?"

গ্রীষ্ম-তপ্ত যাত্রীর দল ভদ্রলোকটির কথায় প্রাণ ভরিয়া হাসিয়া লইল। বিপিন কেমন অপ্রতিভভাবে বাহিরের পানে চাহিল।

ট্রেন তখন গতির বেগ বাড়াইয়া প্লাটফর্ম্ম ছাড়াইয়া খালের পুল অতিক্রম করিয়াছে। উপায় নাই দেখিয়া সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিল—ভদ্রলোকটিও নির্ভয়ে তাহাকে বাহুর বন্ধন হইতে মুক্তি দিলেন।

বিপিন ভাবিল, এখন বাড়ী গিয়া তরমুজ-সম্বন্ধে স্ত্রীর কাছে সে কি কৈফিয়ৎ দিবে? বলিবে কি যে, ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মে ফেলিয়া আসিয়াছে? তাহা হইলে বেকুবির চূড়ান্ত পরিচয় দেওয়া হয় বটে! হুঁসিয়ার ক্রেতা বলিয়া পাড়ায় যে সুনামটুকু সে অর্জ্জন করিয়াছে, তাহাও নিমেষে হারাইতে হয়! বানাইয়া মিথ্যা কিছু বলিবে কি? কিন্তু মনোরমা কলিকাতার মেয়ে। তাহার তীক্ষ্ণ জেরার মুখে মিথ্যা কৈফিয়ৎগুলা বন্যাস্রোতে তৃণ-খণ্ডের মতই ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা হইয়া যাইবে! সাত বৎসর পূর্ব্বে নৈহাটির কোর্টে সে একবার এক মকদ্দমায় সাক্ষ্য দিতে গিয়াছিল, সেখানে উকিল-মোক্তারের জেরা হইতে অনায়াসে অক্ষত দেহে ফিরিতে পারিয়াছিল। কিন্তু স্ত্রীর জেরা,—তাহার কাছে আর পরিত্রাণ নাই। তবে গৃহে ফিরিয়া কি বলা যায়? এই তরমুজের প্রতি স্ত্রীরও আবার মমতার সীমা নাই! গ্রীষ্মে অক্ষয় তৃতীয়ার ব্রাহ্মণকে তরমুজে তুষ্ট করিতে না পারিলে অন্তিমে তাহার স্বর্গলাভে বিষম অন্তরায় ঘটিবে বলিয়াই যে স্ত্রীর হৃদয়ে ধারণা বদ্ধমূল রহিয়াছে! এবং এই ধারণার কথা আজ একমাস ধরিয়া নিত্য মনোরমা বিপিনকে শুনাইয়া আসিতেছে!

এমন সময় ট্রেন সহসা থামিয়া গেল। নাড়া পাইয়া বিপিনের হুঁস হইল। সে দেখিল, দমদমা জংসন ষ্টেশনে ট্রেন আসিয়া পৌঁছিয়া গিয়াছে। কত লোক উঠিল, নামিল। বিপিন ভাবিল, এখানে নামিয়া সে শিয়ালদহে একবার ফিরিবে কি? কিন্তু এই জিনিসগুলা তাহা হইলে যে আবার বহিতে হয়! তাহাও নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে! তাহার উপর সে তরমুজ যে এখনও ষ্টেশনে পড়িয়া আছে, তাহারই বা ঠিক কি! ভাবিয়া একটা মীমাংসা করিয়া লইবার পূর্ব্বেই ট্রেন ছাড়িয়া দিল। বিপিন ভাবিল, থাক্, ও আর ভাবিয়া কোন লাভ নাই।

বেলঘরিয়া ষ্টেশনে ভদ্রলোকটি নামিয়া গেলেন—নামিবার সময় বিপিনের প্রতি একটি সকৌতুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে ছাড়িলেন না। বিপিনের সেদিকে লক্ষ্য ছিল না। সে সেই তরমুজের কথাই ভাবিতেছিল।

মন হইতে যতই সে চিন্তাকে সে তাড়াইবার চেষ্টা করে, ততই যেন মনের মধ্যে তাহা চাপিয়া আঁটিয়া বসে!

ট্রেন যখন পল্‌তা ছাড়াইল, কামরা তখন প্রায় খালি হইয়া গিয়াছে। শুধু বিপিন ও একধারে আর একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোকমাত্র বসিয়া ছিলেন। ভদ্রলোকটি কামরার কোণ ঠেসিয়া দিব্য ঘুমাইতেছিলেন। তাঁহার বর্ণ গৌর, মাথার সম্মুখে টাক্, গায়ে ভাগলপুরী বাফ্‌তারচায়না কোট। কোলের উপর একখানা বাঙলা খপরের কাগজ পড়িয়া আছে। বিপিন দেখিল, বাঃ, গোলাপ জামের টুকরি ও তরমুজটা যে বাঙ্কে এখনও রহিয়া গিয়াছে। তাহার মতই কেহ ভুল করিয়া ফেলিয়া গেল না ত! কিন্তু না, ইঁহারও হইতে পারে ত! ঠিক তাহাই হইবে!

তবু আশার একটা ক্ষীণ জ্যোতি তাহার বিষণ্ণ আঁধার চিত্তের মধ্যে ফুটিয়া উঠিল। ঘুমন্ত ভদ্রলোকটির নিকটে গিয়া তাঁহার গায়ে ঠেলা দিয়া বিপিন ডাকিল, "মশায়, ও মশায়, শুনছেন?"

ভদ্রলোক ধড়মড়িয়া চক্ষু মেলিলেন। কহিলেন, "কি,—হালিসহর এসেছে?"

"না।"

"তবে?" তীব্র দৃষ্টিতে তিনি বিপিনের পানে চাহিলেন। সে দৃষ্টিতে বিপিন হঠিল না, কহিল, "এ তরমুজটি কত দিয়ে কিনেছেন?"

"সে খোঁজে আপনার প্রয়োজন?" বলিয়া ভদ্রলোক চক্ষু মুদিলেন।

বিপিন কহিল, "বলি, ঘুমোলেন না কি?" ভদ্রলোক চোখ খুলিলেন না।

বিপিন তাঁহার গা ঠেলিয়া পুনরায় কহিল, "শুনছেন—?"

"কি?"

"তরমুজটা বেচবেন? আমি কিনি তা হলে।" ভদ্রলোক কট্‌মট্ করিয়া বিপিনের পানে চাহিলেন, কঠিন স্বরে কহিলেন, "পাগল না কি, আপনি? বেশী পাগলামি করেন ত ট্রেনের শেকল ধরে টেনে বে—" বলিয়া আবার নিশ্চিন্ত চিত্তে তিনি চক্ষু মুদিলেন।

বিপিন অবাক হইয়া গেল, ভাবিল, এমন অদ্ভুত লোকও দুনিয়ায় থাকে! তাহার মাথার মধ্যে রক্ত যেন টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতে লাগিল। ক্ষোভে নিরাশায় সমস্ত দেহ তাতিয়া জ্বলিয়া উঠিল। অন্তরের মধ্যে চিন্তার ঝড় বহিল।

ট্রেন ক্রমে শ্যামনগর ছাড়াইল। চারিদিক তখন ঈষৎ আঁধারে ঢাকিয়া গিয়াছে। অন্ধকার গাছগুলার গায় জোনাকির দল চুমকির মত জ্বলিতেছে! এবার তাহাকে নামিতে হইবে। যদি কোন উপায় থাকে ত এই বেলা তাহার জোগাড় দেখিতে হইবে! নহিলে আর কোন আশা কোন পথ নাই। বাঙ্কের দিকে বিপিনের নজর পড়িল। তরমুজটা এখনও তথায় রহিয়াছে। ট্রেণের দোল্ পাইয়া নড়িতেছে! মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া বিপিন পকেট হইতে কাগজ-পেন্সিল বাহির করিয়া দুই ছত্র পত্র লিখিল,—

"মহাশয়, আপনার তরমুজটি আমি লইয়া চলিলাম। বাড়ীতে আমার তরমুজের বিশেষ প্রয়োজন আছে; না হইলে নয়। তরমুজের দামের দরুণ দুইটি টাকা এই চিঠিতে মুড়িয়া আপনার পকেটের মধ্যে ফেলিয়া গেলাম।"

পকেট হইতে দুইটি টাকা বাহির করিয়া চিঠির মধ্যে পুরিয়া ভাঁজ করিয়া ভদ্রলোকটির পকেটের মধ্যে সে কাগজের মোড়কটি সন্তর্পণে বিপিন ফেলিয়া দিল। ভদ্রলোকের নাসিকা তখন বিপুল গর্জ্জনে নিদ্রাদেবীর প্রচণ্ড প্রভাব ঘোষণা করিতেছিল। তিনি কিছুই জানিলেন না।

"কান্‌কিনারা—" প্লাটফর্ম্মের কুলির কণ্ঠ হইতে কয়টি কথা বিপিনের কর্ণে আজ যে মধু বর্ষণ করিল, কোন সঙ্গীতের সুরেও বুঝি তেমন মধু কোন দিন ঝরে নাই! বিপিন হাত-ছানি দিয়া ইঙ্গিতে একটা কুলি ডাকিয়া তাহার মাথায় জিনিস-পত্র উঠাইয়া নিঃশব্দে ট্রেণের কামরা ত্যাগ করিল। ভয়ে তাহার বুক কাঁপিতে-ছিল, গা ছম-ছম করিতেছিল। নামিবার সময় নিদ্রিত সহযাত্রীর পানে সভয়ে একবার সে চাহিয়া দেখিল। অত্যন্ত সতর্ক সন্তর্পিত গতিতে প্লাটফর্ম্ম অতিক্রম করিয়া বিপিন যখন ষ্টেশন-গৃহের বাহিরে আসিল, ট্রেণ তখন বাঁশী বাজাইয়া সরীসৃপের মত দীর্ঘ দেহভার নাড়িতে সুরু করিয়াছে। এঞ্জিনের চিমনি হইতে অগ্নিময় ধূমোদ্গার হইতেছিল। বিপিনের মনে হইল, ট্রেনটা যেন দৈত্যের মত রক্ত বমন করিতেছে! কিছুক্ষণ ট্রেনের পানে স্থির দৃষ্টিতে সে চাহিয়া রহিল। পরে সেখানা দূরে চলিয়া গেলে,তাহার পশ্চাতের লাল আলোগুলা যখন ভীষণ অন্ধকারের মধ্যে তিনটা রক্ত বিন্দুর মত মনে হইতেছিল, বিপিন তখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। উঃ—মস্ত ফাঁড়া কাটিয়া গিয়াছে! যদি সে লোকটার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত, তাহা হইলে কি আর রক্ষা ছিল! তখনই আসিয়া চোর বলিয়া তাহাকে ধরাইয়া দিত! বিপিনের চোখের সম্মুখে এক রাশি লাল-পাগড়ী-পরা মাথা ও লৌহ গরাদযুক্ত ক্ষুদ্র একটা অন্ধকার ঘর নিমেষে যেন মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া জাগিয়া উঠিল। কুলি ডাকিল, "বাবু—" বিপিনের চমক ভাঙ্গিল। সে কহিল, "হাঁ, চল্।"

ঝিল্লী-মুখরিত অন্ধকার গলির পথ ধরিয়া বিপিন গৃহে চলিল। সেদিন কুলিটা কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিল, তাহা সে স্থির করিতে পারিল না। সন্ধ্যার পর ছয় পয়সার জায়গায় বিপিন তাহাকে কি না একটা আধুলি বখ্‌শিস করিয়াছে!

৩

মনোরমা কহিল, "আজ তোমার ফিরতে এত দেরী হল যে? আমি ভাবছিলুম—"

বিপিন কহিল, "বড় ছোট ফর্দ্দখানি দিয়েছিলে কি না! আজ একেবারে কলকেতা সহর প্রদক্ষিণ করে ফেলেছি!"

বাজার দেখিয়া হৃষ্ট চিত্তে মনোরমা কহিল, "যাক্, তরমুজ আর আনারস যে আনতে ভোলনি, এতে আমার খুব আহ্লাদ হয়েছে! তুমি আনবে বলে আমি মনেও করিনি। বোশেখ মাসের দিন, ও দুটি জিনিস বামুনকে দিতে না পারলে কি তৃপ্তি হয়!"

বিপিন সে কথার কোন জবাব দিল না। এই তরমুজের জন্য আজ তাহাকে কম হায়রাণ হইতে গিয়াছে! জেলে অবধি যাইবার যো ঘটিয়াছিল। নেহাৎ অদৃষ্ট গুণে বাঁচিয়া গিয়াছে। লোকটার ঘুম যদি ভাঙ্গিয়া যাইত! ভাবিতে এ গ্রীষ্মের দিনেও

বিপিনের গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। এখনও কে বলিতে পারে, অদৃষ্টে কি আছে! হালিসহরে পৌঁছিয়া যখন সে দেখিবে, তরমুজ নাই—তখন সেই চিঠির টুকরা ও টাকা দুইটা লইয়াই যদি সন্তুষ্ট না হয়! বিপিন স্থির করিল, ও পাড়ার যদুবাবুর ছেলেটি মোক্তারি পড়িতেছে, কাল সকালে গিয়া তাহার সহিত দেখা করিয়া একবার পরামর্শ না করিলে ত নিশ্চিন্ত হওয়া যাইতেছে না! তরমুজ লইয়া এ যে বিষম উৎপাতে পড়া গেল!

অন্ধকার ঘরে পড়িয়া বিপিন কত কি আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল। মাধব আসিয়া দাবার ছক্ পাতিয়া বসিল। খেলায় বিপিনের যথেষ্ট সুনাম থাকিলেও আজ সে নিতান্তই আনাড়ির মত হারিতে লাগিল। মাধব কহিল, "যাও, যাও, আর খেলে না। তোমার মাথার ঠিক নেই। না হলে এই সব চালে—"

মাধবের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বিপিন কহিল, "সারা দিন রোদে ঘুরে মাথাটা ভারী ধরেছে হে—"

রাত্রেও কি নিশ্চিন্তে নিদ্রা হয়। যেমন একটু তন্দ্রা আসে, অমনই মনে হয়, কে ঐ সদরের দ্বারে ঘা দেয় না! জানালার ফাঁক দিয়া অন্ধকার পথে লণ্ঠন হাতে কাহাকেও চলিতে দেখিলে, মনে হয়, বুঝি ফাঁড়ির চৌকিদার তাহারই সন্ধানে আসিতেছে! বিপিনের বুকের মধ্যে কি যেন ঠেলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল! তন্দ্রার ঘোরে স্বপ্ন-বিভীষিকারও অন্ত ছিল না। থানার প্রাঙ্গণ ও কাছারি-ঘরে আসামীর ডক্ চোখের সম্মুখে চাকার মতই যেন ঘুরিয়া ফিরিতেছিল।

দুশ্চিন্তা ও অনিদ্রায় সারা রাত্রি কাটিয়া গেল। রাত্রির অন্ধকারে ভয়টাও অতিরিক্ত ভীষণ ভাব ধারণ করিয়াছিল। এখন দিনের আলোয় মনের আঁধার অনেকখানি কাটিয়া গেল। কিন্তু না—দিনের আলো যতই তীক্ষ্ণ ফুটিয়া উঠিতেছিল, পাখীর ডাকে, লোকের কোলাহলে কর্ম্ম-চক্র যতই আপনার গতির বেগ বাড়াইয়া চলিল, বিপিনের মনখানা ভয়ে ও ভাবনায় ঠিক সেই অনুপাতেই একান্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতে লাগিল। যদুবাবুর ছেলের কাছে আর যাওয়া হইল না। পথে বাহির হইতেও ভয় করে। কি জানি, রাত্রি বলিয়াই হয় ত পুলিশ আর কাল ততটা চাড় করে নাই, আজ দিনের বেলায় পথে বাহির হইলে যদি ধরিয়া বসে! সারা গ্রামে তাহা হইলে তখনই একটা টী-টী পড়িয়া যাইবে। এ অপবাদের পর কাহারও কাছে কি আর সে কখনও মুখ দেখাইতে পারিবে! আর, মনোরমা? বেচারী মনোরমা! স্বামীর এ লাঞ্ছনার কথা শুনিলে সে কি হায় এক দণ্ড বাঁচিবে? তখনই ত সে বিষ খাইয়া মরিবে! তাই যখন মনোরমা আসিয়া তাহাকে কহিল, "ও কি গো, ঘরের কোণে বসে রইলে যে! কাকে-কাকে বলতে হবে, বলে এস না! এর পর রোদ উঠবে, বেরুবে কি করে? তার পর ত দুপুর বেলা তাসের মাতন চলবে। আজই সব বলে এস গে—", বিপিন তখন শুধু ফ্যালফ্যাল করিয়া স্ত্রীর পানে চাহিয়া রহিল; মুখে কোন কথা ফুটিল না। আহা, বেচারী মনোরমা! হরিণীর মত স্বচ্ছন্দ লঘু চিত্তে ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে! সে জানেও না,

কোথা হইতে ব্যাধের গোপন শর এখনই নিমেষে তাহাকে বিদ্ধ, জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিবে। দুর্ভাবনায় তাহার মনের ভিতরটা একেবারে অশ্রু-সিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল! ভরা মেঘের পিছনে জল যেমন স্তম্ভিত রুদ্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, একটা দমকা বাতাসের ঘা খাইলে ঝর-ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়ে, তাহারও চোখের পিছনে অশ্রুর রাশি তেমনই থমকিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। মনোরমা যদি তাহার সহিত আর দুই-একটা কথা কহিত, তাহা হইলেই বিপিনের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া সে অশ্রুর রাশি হু-হু করিয়া ঝরিয়া পড়িত! কিন্তু বিপিনের সৌভাগ্য যে মনোরমা দাঁড়াইল না, ব্যস্তভাবে তখনই রন্ধনশালার উদ্দেশ্যে চলিয়া গেল।

কিন্তু শুধু ত এমন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেও চলে না। বন্ধু-বান্ধব আসিয়া যে বাহিরে ডাক পাড়ে, স্নানাহারের বেলা হইয়া যায় বলিয়া মনোরমা সঘন তাগিদ দেয়। এ সব-গুলার দিকে মনোযোগ অর্পণ না করিলেও সকলের সন্দেহ জন্মিতে পারে, বুঝি কিছু ঘটিয়াছে! অথচ এ বিপদের কথা কাহারও কাছে প্রকাশ করিয়া বলিতে মাথা একেবারে কাটা যায়! মনোরমাকেও এ কথা খুলিয়া বলা চলে না!

রবিবার তাহার খেলা-ধুলা ও আনন্দ-বিশ্রামের ডালি বিলাইয়া বিদায় লইল। বুকের মধ্যে সারা ক্ষণ আশঙ্কার কাঁটা খচ্‌খচ্‌ করিলেও শুধু লোক দেখাইবার জন্য বিপিন ভারাক্রান্ত চিত্তে সে আনন্দ-বিশ্রাম ও খেলা-ধূলার ডালির অংশ গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারিল না।

৪

সোমবার সকালে আবার নিত্যকার মতই নয়টা বাজিল। ভয়-ভাবনা, বজ্রের মত মাথার উপর উদ্যত থাকিলেও অফিসে যাইতেই হইবে। সেদিন আবার গৃহে অক্ষয় তৃতীয়ার ব্রাহ্মণ-ভোজন। মনোরমার অনুরোধ-অনুযোগ-সত্বেও বাড়ীর কাজ-কর্ম্মে বিপিন একবার উঁকিটি অবধি পাড়িল না।

অফিস যাইবার সময় স্ত্রীর মুখখানির পানে কতবার যে সে ম্লান দৃষ্টিপাত করিয়াছে, তাহা সে-ই জানে। স্ত্রী কিন্তু কাজের ভিড়ে সে করুণ দৃষ্টি লক্ষ্যও করিতে পারে নাই! শেষে বাড়ী ছাড়িবার সময় তাহার মনে হইল, একবার ডাকিয়া বলি, "ওগো, বিদায়, চির-বিদায়! আর বুঝি বাড়ী ফিরিব না। এখান হইতে একেবারেই জেলে চলিলাম!" কিন্তু না, এ কথা বলা চলে না। বাহিরের লোক বিস্তর আসিয়া বাড়ীতে জমিয়াছে। খাঁদুর পিসী, রাধির মা, গগির খুড়ী—সকলে অমনি হাঁ-হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিবে! ফলে ব্যাপারখানার মধ্যে যতটুকু করুণ রস আছে, তাহা কাহারও নজরে পড়িবে না, তাহারা শুধু নিঙড়াইয়া ইহার মধ্য হইতে কৌতুক-রসটুকুই নিঃশেষে আদায় করিয়া ছাড়িবে! কাজেই আর স্ত্রীকে বলিয়া-কহিয়া বিদায় লওয়া হইল না। কিন্তু যদি আর গৃহে ফেরা না ঘটে? বিপিনের সারা প্রাণ একটা আকুল উত্তেজনায় হায়-হায় করিতে লাগিল।

ট্রেন আসিলে বিপিন তাহতে চড়িয়া বসিল। সহসা পাশের-কামরায় তাহার নজর পড়িল। ও কি! শনিবারের ট্রেনের সেই ভদ্রলোক—

না? ঠিক! কোন ভুল নাই! সেই মাথায় টাক, ভাগলপুরী বাফ্তার কোট গায়ে—পাশে সেই চাঁচের তৈয়ারী ছোট ব্যাগ! সে কামরায় লোকও একেবারে গিস্ গিস্ করিতেছে। ভদ্রলোকটি এক পেণ্টুলেন-পরা যুবার সহিত কথা কহিতেছিলেন। কি কথা? বিপিন উদ্‌গ্রীবভাবে কান পাতিল।

ভদ্রলোকটি বলিতেছিলেন, "ভাগ্নেটির অশীর্ব্বাদ হয়ে গেল, রবিবার—তাই আর কি শনিবার হালিসহর গেছলাম। শোন, তারপর মজার কথা। ভগ্নীপতি লিখেছিলেন, কলকেতা থেকে যেন কতকগুলো ক্ষীরের খাবার-দাবার আর কিছু ফল-ফুলুরী কিনে নিয়ে যাই! তা বাড়ী থেকে মেয়েরা তার ব্যবস্থাও করে দেছল। আমার ছোট ছেলে ষ্টেশনে এসেছিল, দেখে-শুনে সব উঠিয়ে দেবার জন্য! তা টিকিট কিনে প্লাটফর্ম্মে আসবার সময় দেখি, আমার জিনিস-পত্রের কাছে প্রকাণ্ড এক গোয়ালন্দর তরমুজ পড়ে আছে। অথচ সেটাকে দাবী করবার কেউ নেই—আমার সঙ্গে তরমুজ নেওয়া হয় নি। ছেলে বললে, 'বাবা, তরমুজটা তুলে নি—কেউ ফেলে চলে গেছে নিশ্চয়। এখানে পড়ে থাকলে এখনই রেলের কোন্ বেটা কুলি নিয়ে গিয়ে হয় ত সাবাড় করে দেবে।" বলে সে সটান্ সেটা নিয়ে আমার গাড়ীতে তুলে দিলে। বাক্সে সব রেখে আমি ত একটি কোণ জোগাড় করে দিব্যি বসে গেলাম। আর গাড়ীতে বসলেই, কি জান, আমার কেমন বদ্ স্বভাব, কেবলই ঘুম আসে। এই তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছি, তাই জেগে আছি, না হলে এতক্ষণ বেশ এক ঘুম হয়ে যেত—"

পাশের কামরা হইতে বিপিন উৎকর্ণভাবে সব কথা শুনিতে লাগিল। যুবা কহিল, "তার পর?"

ভদ্রলোক কহিলেন, "তার পর ত দিব্যি ঘুমুচ্ছি—ঠেলা দিয়ে এক ভদ্রলোক বললেন, "মশায়, তরমুজটা বিক্রী করবেন? আমি কিনব।" ভারী রাগ হল। ঘুম চটে যাওয়ায় মনটা একেবারে খিচড়ে গেল। তাকে ধমক দিয়ে ফের ত ঘুমোতে লাগলাম।—কি জবাব দিছলাম, তার কিছুই মনে নেই। তার পর, শোন মজা—হালিসহরে এসে নামবো—দেখি, তরমুজটা নেই। তখন অবশ্য অতখানি খেয়ালও হয়নি। ভগ্নীপতির বাড়ী গিয়ে কুলি ভাড়া দেব বলে পকেটে হাত দিতেই কি একটা মোড়া কাগজ হাতে ঠেকল। বের করে ভাগ্নের হাতে দিলাম। সে পড়লে—এই দেখ, সে চিঠি—"

বলিয়া ভদ্রলোক হাসিয়া পকেট হইতে একটা কাগজের টুকরা বাহির করিয়া যুবার হাতে দিলেন। বিস্ফারিত নেত্রে বিপিন সে কাগজটার পানে চাহিল—এ যে সেই চিঠি,—দুইটা টাকা মুড়িয়া যে চিঠি সেদিন সে ভদ্রলোকটির পকেটে ফেলিয়া দিয়া ট্রেন ত্যাগ করিয়াছিল!

পত্রখানা পড়িয়া যুবা হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ভদ্রলোকটি হাসিয়া কহিলেন, "এখন দেখ একবার গ্রহ। পরের তরমুজ ঘাড়ে করে তার উপর আবার দুটো টাকা খেয়ে পাতক-গ্রস্ত হতে বসেছি! এখন এ টাকা দুটো নিয়ে বিষম বিপদে পড়েছি। ভদ্রলোক এ টাকা না দিয়ে যদি শুধু সে তরমুজটাই নিয়ে যেতেন, তাহলে আর কোন ভাবনাই থাকত

না। এখন এ টাকা দুটো নিয়ে যে কি করি, তা ত ভেবেই পাচ্ছি না।"

একজন বলিল, "সে লোকটি কোথায় নেমে গেলেন, তা জানেন না ?"

ভদ্রলোক কহিলেন, "তা আর জানব কোথা থেকে ? আমার যে তখন মাঝ রাত্রি !"

আর-একজন বলিল,"তাঁর চেহারাখানাও মনে নেই ?" বিপিনের বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল; নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল।

ভদ্রলোক কহিলেন, "না।"

আবার বিপিন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। তাহার বুকের মধ্যে এই কয় ঘণ্টা ধরিয়া যে ঝড় বহিতেছিল, তাহা যেন কতক শান্ত হইয়া আসিল। হাসিও না পাইল, এমন নহে, কিন্তু অনেক কষ্টে সে হাসি সে চাপিয়া গেল।

যুবা কহিল, "তাই ত। কার টাকা, কি করে সন্ধান পাবেন ?"

একজন কহিল, "বঙ্গবাসীতে একটা বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে দিন না—"

"পাগল !" বলিয়া ভদ্রলোক হাসিলেন। পরে কহিলেন, "এক হপ্তা চুপ্‌চাপ্ থেকে দেখি। তার পর ভাবছি, হালিসহরে একটা নূতন দাতব্য চিকিৎসালয় খুলেছে,—ষ্টেশনের ধারেই একেবারে,—ট্রেন থেকে দেখা যায়—"

তাঁহার কথায় বাধা দিয়া একটি ছোকরা কহিল, "ওঃ—ঐ দয়াময়ী দাতব্য চিকিৎসালয়ের কথা বলছেন ?"

ভদ্রলোক কহিলেন, "হাঁ, দয়াময়ী দাতব্য চিকিৎসালয়ই বটে ! তা ভাবছি, এক হপ্তা পরে ভাগনের হাত দিয়ে টাকা-দুটি ঐ চিকিৎসালয়েই পাঠিয়ে দেব। কি বল ?"

আকাশে মেঘ করিয়া রৌদ্রটুকু চাপা পড়িয়াছিল। স্নিগ্ধ শীতল বায়ুও বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বিপিন কামরার জানালার কাঠে মাথা রাখিল। তপ্ত ললাট বায়ু-স্পর্শে জুড়াইয়া গেল। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া সে ভাবিল, আজ যেন তাহার পুনর্জ্জন্ম হইয়াছে।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

তামাকু-তত্ত্ব

হুকা-কলিকা বনাম চুরট-সিগরেট

তামাক একটি সর্ব্বজনবিদিত বস্তু। প্রাদেশিক ভাষায় ইহাকে তামুক ও তামকুড় ও বলে। আবার কলিকাতা অঞ্চলে যখন তামা তাঁবা হইয়া পড়িয়াছে, তখন তামাকেরও তাঁবাক হইবার কথা।(১) যাহা হউক,

নামে কি করে,
গোলাপে যে নামে ডাক, মধু বিতরে ॥

তবে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরাজী কবিতার ভাষায় যেমন poetic diction বলিয়া একটা স্বতন্ত্র রীতি ছিল, সেইরূপ অস্মদ্দেশেও অনেক মনীষীর মত যে সাহিত্যের একটা স্বতন্ত্র নিজস্ব ভাষা আছে। সে ভাষায় তামাকের নাম তামাকু।(২) মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র এই নামটি পছন্দ করিয়াছেন। আমরাও "মহাজনো

(১) হইলে বিলাতি tobaccoর ও আদিম মার্কিন নাম tabaccoর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা-বৃদ্ধিও হইত।

(২) তামাকুর শেষে 'কু' দেখিয়া কেহ 'কু' ভাবিবেন না।

যেন গতঃ স পন্থাঃ” এই নীতির অনুসরণ করিলাম। আবার কেহ কেহ এমন উপাদেয় বস্তুকে গ্রাম্য নামে নির্দ্দেশ করিতে কুণ্ঠিত হইয়া--বিলাতী tobaccoর সঙ্গে সকল সম্পর্ক রহিত করিবার অভিপ্রায়ে ?—“তাম্রকূট” এই সংস্কৃতায়িত শব্দটি উদ্ভাবন করিয়াছেন। অবশ্য “তাম্রচুড়ে”র (মোরগ) সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। অনুমান হয়, তামরস (পদ্ম) ও কালকুট (বিষ) এই উভয় শব্দের সমন্বয় করিয়া কোন রসিকচূড়ামণি এবংবিধ নামকরণ করিয়াছিলেন—অর্থাৎ দ্রব্যটি পদ্মমধু নহে, পদ্মবিষ! (৩) যেমন মিঠেকড়া তামাকু সুখসেব্য, তেমনই এই মিঠেকড়া নামটিও সুভব্য বলিয়া বিবেচিত হওয়া বিচিত্র নহে। তামাক শব্দের অর্থ লইয়াও একটু গোল আছে, গাঁজাখোরেরা গাঁজাকে এই নামে অভিহিত করেন! যাহা হউক, শব্দশক্তি-প্রকাশিকা বা ব্যাকরণ-বিভীষিকা লইয়া নাড়াচাড়া করিব না। সে মায়া কাটাইয়াছি, আর সে জালে ধরা দিব না। এক্ষণে প্রকৃত অনুসরণ করি।

জগতে ধর্ম্মও যেমন বহু, নেশাও তেমনই বহু। সকল ধর্ম্মই যেমন একই আনন্দ-স্বরূপের সন্ধান মিলায়, সকল নেশাও তেমনই একই আনন্দস্বরূপের সন্ধান মিলায়। সকল ধর্ম্মেরই যেমন গোঁড়া আছে, সকল নেশারও তেমনই গোঁড়া আছে। তামাকু-সেবী যেমন বলেন “গুড়ুকে গম্ভীরবুদ্ধি”, তেমনই সিদ্ধি-সেবী বলেন ‘সিদ্ধি খেলে বুদ্ধি বাড়ে,’ (৪) গুলিখোর বলেন “গুলি খা ডালা”, গাঁজাখোর বলেন ‘নেশার রাজা গাঁজা’ ‘গাঁজা তোর পাতায় পাতায় রস।’ তাই তিনি আদর করিয়া তাঁহার আবাধ্যদেবকে তুরিতানন্দ নাম দিয়াছেন। আফিংখোর তাঁহার পেয়ারের নেশাকে কালাচাঁদ বলেন। আহা কি মধুর বৈষ্ণব ভাব (অথবা ‘বিশুদ্ধ’ বাঙ্গালায় বৈষ্ণবী ভাব)! কোকেনের হাল বড় জানা যায় না, বোধ হয় এতদিন কোন কোকেন খোর কবি ছড়া বাঁধিয়াছেন—

“ফাঁকে ফাঁকে কোকেন ফোকেন।
ধাপে ধাপে সগ্‌গে (স্বর্গে) ঢোকেন॥”

তাহার পর সকলের সেরা সাখরচে নেশার ভক্তগণ নিজের সম্প্রদায়ের বাহিরের লোককে নিতান্ত কৃপাপাত্র মনে করেন ও “চাষা না জানে মদের স্বাদ”, “মদের মর্ম্ম বুঝবি কি রে বাঙ্গাল তোরা” ইত্যাদি বাক্যবাণে বিদ্ধ করেন। তাঁহাদের মতে যাহারা সুরাসেবী নহে তাহারা অ-সুর! কেহ কেহ বা ভক্তির ভান করিয়া রাম-প্রসাদকে ভেঙ্‌চাইয়া গান ধরেন—

‘সুরাপান করি নে রে, সুধা খাই যে কুতূহলে।’

কেহ বা চণ্ডীপাঠ করিয়া শোধন করিয়া লইতেছেন ও অ-সুরগণকে ভ্রূকুটি করিয়া বলিতেছেন,—

‘গর্জ্জ গর্জ্জ ক্ষণং মূঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহম্।’

কেহ বা

‘পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পতিত্বা ধরণী-তলে।
উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা’

‘সদ্যো মোক্ষ’ লাভ করিতেছেন, জড়িত-কণ্ঠে তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত ভৈরবীচক্র ও পঞ্চমকারের

(৩) এইজন্যই কি ‘বিষবৃক্ষে’ ঘন ঘন তামাকের কথা আছে?

(৪) ভাংখোর ও ভাঙ্গোর কি একই ? ভাষাতত্ত্বের কথা।

দোহাই দিতেছেন, এবং কৌল, অঘোরী, বামাচারী বা বীরাচারী সাজিয়া, যাহারা 'মদ্যমদেয়মপেয়মগ্রাহ্যম্' বলে তাহাদিগকে 'পশু' বলিয়া সম্ভাষণ করিতেছেন; আবার কেহ বা বেদোক্ত সোমরসের ভাণ্ডে সুরা রক্ষা করিতেছেন। (ইহাকেই কি বাইবেলে বলে pouring new wine into old bottles?)

গোঁড়ারা যাহাই বলুন, আমার কিন্তু মনে হয়, অন্যান্য হরেক রকম নেশার তুলনায় তামাকু বিশুদ্ধ ও নির্দ্দোষ নেশা। যেমন গোমাংস, নরমাংস, শূকরমাংস, কুক্কুটমাংস প্রভৃতি অমেধ্য মাংসের তুলনায় মৃগমাংস বা ছাগমাংস, সেইরূপ মদ গাঁজা গুলি চরস চণ্ডু আফিম ভাঙ্গ মাজুম কোকেন প্রভৃতির তুলনায় নস্য ও তামাকু। আবার তামাকু-সেবনের নানা প্রক্রিয়ার মধ্যে গুড়ুকটানাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

মানুষ নানামূর্ত্তিতে 'সর্ব্বশ্রম-সংহারিণী' তামাকুদেবীর ভজনা করে। শুখা দোক্তা খৈনি মূর্ত্তিরগুলি চুরট সিগরেট বার্ডসাই তামাকপোড়া গুল মিশি নস্য সবই তামাকুর রূপান্তর। বেদজ্ঞের মুখে শুনিয়াছি, ব্রহ্মা সৃষ্টিকালে চতুর্ম্মুখে চতুর্ব্বেদের ন্যায় চারিটি শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন—তামাকুর্জড়াকু-র্গুড়াকু র্নাসাকুঃ। অস্যার্থঃ—তামাকু অর্থাৎ শুখা দোক্তা খৈনি। জড়াকু অর্থাৎ চুরট সিগরেট বিড়ি বার্ডসাই। গুড়াকু অর্থাৎ গুড় দিয়া মাখা গুড়ুক-তামাক। নাসাকু অর্থাৎ নস্য। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।' অর্থাৎ কিনা 'যে ভাবে দেখিবে কৃষ্ণে সেই ভাবে পাবে।' কিন্তু যেমন শ্রীভগবানের নানা মূর্ত্তির মধ্যে দ্বিভুজ মুরলীধর মূর্ত্তিই শ্রীচৈতন্যের প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল, সেইরূপ তামাকুর নানা মূর্ত্তির মধ্যে গুড়ুক-মূর্ত্তিই চৈতন্যশীল জীবের সমধিক প্রীতিপ্রদ হইয়াছে। ইংরাজ কবি বায়রণ হুক্কার গুণগান করিয়াও চুরটের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাঁহার উপাদেয় কবিতাটি পাদটীকায় উদ্ধৃত করিলাম। (৫) কিন্তু তাঁহার ন্যায় ম্লেচ্ছের সিদ্ধান্ত আমরা হিন্দুসন্তান ঋষিবাক্য (৬) বলিয়া গ্রাহ্য করিতে পারি না। আমরা

---

(৫) Sublime tobacco! which from east to west
Cheers the tar's labour or the Turkman's rest,
Which on the Moslem's Ottoman divides
His hours, and rivals opium and his brides;
Magnificent in Stamboul, but less grand,
Though not less loved, in Wapping or the Strand;
Divine in hookas, glorious in a pipe,
When tipped with amber, mellow, rich and ripe;
Like other charmers, wooing the caress
More dazzlingly when daring in full dress,
Yet thy true lovers more admire by far
Thy naked beauties—Give me a cigar.

(৬) ইদানীং "সনাতনী পন্থাঃ"র জনৈক প্রবীণ হিন্দু দিব্যজ্ঞানপ্রভাবে ম্লেচ্ছর্ষি আবিষ্কার করিয়াছেন। বোধ হয় দিব্যজ্ঞানের মাত্রা আর একটু চড়িলে তিনি আকাশকুসুম শশশৃঙ্গ বন্ধ্যাপুত্র—এমন কি ডুমুরের ফুল পর্য্যন্ত দেখিতে পাইবেন।

নব্যবঙ্গের শিক্ষাদীক্ষার গুরু বঙ্কিমচন্দ্রের রায়ে রায় দিয়া হুক্কার জয়-ঘোষণা করিব।

কেহ কেহ হুক্কার হুক্কার-জনক নাম শুনিয়া হয়ত নাসিকা সঙ্কুচিত করিবেন অর্থাৎ নাক সিট্‌কাইবেন। তাঁহাদিগকে শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়-বিরচিত "হুকার জন্ম" (৭) নামক পৌরাণিক উপাখ্যানটি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ইহা হইতে তাঁহারা জানিতে পারিবেন যে, এই ধূম-যন্ত্রের অংশত্রয় খোল, নল্‌চে ও কলিকা যথাক্রমে ব্রহ্মার কমণ্ডলু, নারায়ণের বংশী ও মহাদেবের ডমরুর রূপান্তর—অতএব হিন্দুর চক্ষে পরম-পবিত্র।

জানি, তামাকু-সেবনের অপকারিতা-সম্বন্ধে বিস্তর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ-নিবন্ধ পুস্তক-পুস্তিকা লিখিত হইয়াছে। তৎপাঠে ধূমপান-বিরত নিরীহ ভদ্রসন্তানগণ যথেষ্ট বুকে বল পাইয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু অকাট্য বৈজ্ঞানিক যুক্তির দাপটে এ পর্য্যন্ত কোন ধূমপায়ী তামাকু ছাড়িয়াছেন, এরূপ কোন রিপোর্ট বা রিটার্ণ পাই নাই। দেশে বিজ্ঞানচর্চ্চার অভাবেই অবশ্য এ সব যুক্তি-তর্ক মাঠে মারা যাইতেছে। সেই জন্যই, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ আপামর সাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ব-প্রচার-কল্পে যে ব্যবস্থা করিতে অভিলাষী, তাহা অত্যন্ত সমীচীন মনে করি।

ইহাও জানি যে, অনেকে তামাকুর নিষ্কারণ-শত্রু—এজগতে কোন্ বস্তু বা ব্যক্তির বিরুদ্ধবাদী নাই? যখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরও শত্রু ছিল, তখন 'উৎকৃষ্ণ' তামাকুরও যে শত্রু থাকিবে, তাহা আর বিচিত্র কি? সুরাপান-নিবারিণী নীলফিতাধারিণী সুনীতি-সঞ্চারিণী নেশা-সংশোধিনী প্রভৃতি সভার সভ্যগণ তামাকুকেও মদ গাঁজা গুলি চরস চণ্ডু ভাঙ্গ আফিম মাজুম কোকেনের (৮) সঙ্গে একগোত্র (অর্থাৎ এক গোঠের গরু) বলিতে প্রস্তুত।

যাহা হউক, এরূপ লোকনিন্দা সত্ত্বেও তামাকু-সেবনের প্রথা যে কস্মিন্ কালে পরিত্যক্ত হইবে, তাহার কোন লক্ষণ দেখি না। বহু লোকের বিশ্বাস যে, তামাকু আবহমান কাল এতদ্দেশে প্রচলিত আছে। ইহা যে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে মার্কিন মুল্লুক হইতে য়ুরোপে ও য়ুরোপ হইতে এসিয়া-খণ্ডে আমদানী হইয়াছে, আমরা ম্লেচ্ছের ভুক্তাবশিষ্ট মহাপ্রসাদ-জ্ঞানে খাইতেছি, এই ঐতিহাসিক তথ্য বহু হিন্দু আমলে আনেন না। প্রত্নতত্ত্ব ও গবেষণার উপর কি বিকট বিতৃষ্ণা!

বাস্তবিক এই নির্দ্দোষ অথচ আয়েসী নেশার সত্যযুগে সৃষ্টি হইয়াছে,—এরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত নহে। ইংরেজ কবি কূপার (Cowper) একস্থলে বলিয়াছেন যে তামাকু সত্যযুগে অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু সে কোন কাযের কথা নহে।

সহৃদয় ইংরাজ-জাতি প্রথম হইতেই তামাকুর গুণগ্রাহী। তামাকু সত্যযুগে সৃষ্ট হউক আর না হউক, ইহা যে স্বর্গীয় বস্তু, এ কথা বহু ইংরেজ লেখক একবাক্যে

(৭) উক্ত লেখকের 'আলপনা' নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

(৮) কেহ কেহ বা টানের চোটে কাফি কোকো চা এমন কি সোডা-লেমনেড্‌কেও ঐ দলে ফেলেন। গোলের সরবতটা বাকী থাকে কেন?

স্বীকার করিয়াছেন। তবে অবশ্য ইঁহাদিগের দৌড় চুরুট ও পাইপ পর্য্যন্ত, গুড়ক-মাহাত্ম্য ইঁহাদিগের অজ্ঞাত ছিল। রাজ্ঞী এলিজাবেথের আমলে বিলাতে তামাকুর প্রথম প্রচলন হয়। তৎকালীন শ্রেষ্ঠ কবি স্পেনসার ('divine tobacco') দিব্য অর্থাৎ স্বর্গীয় তামাকু বলিয়া ইহার গুণগান করিয়াছেন। তখনকার নাটক-কারেরাও তামাকুর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। (৯) কর্ম্মবীর র‍্যালে, হকিন্‌স্, ড্রেক প্রভৃতি সকলেই তামাকুর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। র‍্যালে যখন বধ্যভূমিতে নীত হয়েন তখনও ধূমপান করিয়া 'জরামরণমোক্ষায়' ইত্যাদি গীতার বচন সার্থক করিয়াছেন। বিলাতে ও য়ুরোপের অন্যান্য দেশে রাজবিধি দ্বারা তামাকুসেবীদিগকে লাঞ্ছিত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু তথাপি ভক্তগণ অবিচলিত ভক্তিসহকারে কমলাকান্তের ন্যায় 'অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যাং নেশাঞ্চ চিন্তয়েৎ' এই নীতিবাক্য অনুসরণ করিয়াছিলেন। এলিজ্যাবেথের উত্তরাধিকারী প্রথম জেম্‌স্ অসূয়া-পরবশ হইয়া তামাকুর অযথা নিন্দাবাদ করেন। তজ্জন্য তাঁহাকে হাতে-হাতে ফলও পাইতে হইয়াছিল। প্রজাগণ চক্রান্ত করিয়া সুরঙ্গের মধ্যে বারুদে আগুন লাগাইয়া তাঁহাকে পোড়াইয়া মারিবার অভিসন্ধি করিয়াছিল। মাতৃপুণ্যবলে তিনি বাঁচিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু আজও পর্য্যন্ত তাঁহার পণ্ডিত-মূর্খ (the wisest fool in christendom) অপবাদ ঘুচে নাই।

সপ্তদশ শতাব্দীতে পরমজ্ঞানী (Burton) বর্টন তামাকুকে সর্ব্বাতিশায়ী সর্ব্বব্যাধিহর সুদুর্লভ (১০) প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কূপর যদিও একটা কাঁচা কথা বলিয়া ফেলিয়াছিলেন যে তামাকু সত্যযুগে অজ্ঞাত ছিল, তথাপি তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে এই ঘোর কলিকালে তামাকুবিহনে জীবনের ভার দুর্ব্বহ হইত।(১১) উনবিংশ শতাব্দীতে বায়রণ তামাকুর গুণগান করিয়াছেন, প্রসঙ্গক্রমে পূর্ব্বেই এ কথা বলিয়াছি। তাঁহার মতে তামাকু মহতো মহীয়ান্ ('Sublime')। চার্লস্ ল্যাম্ব বায়রণের বিপরীত প্রকৃতির লোক ছিলেন, কিন্তু তিনিও তামাকুর অকপট অনুরাগী ছিলেন; চিকিৎসক-কর্তৃক তামাকু সেবনে নিষিদ্ধ হইয়াও তিনি ভক্তির মাত্রা অণুমাত্র কমান নাই। তবে চন্দ্রেও কলঙ্ক আছে। তাই ল্যাম্বের নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে সুরাপানের কালিমা দৃষ্টিগোচর হয়। একজন অজ্ঞাতনামা কবি ধূমপান করিতে করিতে এমন তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন যে, তিনি তামাকুর ভিতর অধ্যাত্মতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া-

(৯) Chapman's *Monsieur d' Olive* Act II Sc. i.
Ben Jonson's *Every Man in his Humour* Act III Sc. v.

(১০) "divine, rare, super-excellent tobacco which goes far beyond all the panaceas is a sovereign remedy in all diseases."—*Burton.*

(১১) "Tobacco was not known in the golden age, so much the worse for the golden age. This age of iron, or lead, would be insupportable without it."—*Cowper.*

ছিলেন। ইংরাজীরসজ্ঞ পাঠককে কবিতাটি উপহার না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। কবিত্বশক্তির অভাবে কবিতাটির অনুবাদে অক্ষম হইয়াছি।

SMOKING SPIRITUALISED.

I.

This Indian weed, now withered quite,
Though green at noon, cut down at night,
Shows thy decay;
All flesh is hay.
Thus think, and smoke tobacco.

II.

The pipe, so lily-like and weak,
Does thus thy mortal state bespeak;
Thou art e'en such,—
Gone with a touch.
Thus think, and smoke tobacco.

III.

And when the smoke ascends on high,
Then thou behold'st the vanity
Of worldly stuff,
Gone with a puff,
Thus think, and smoke tobacco.

IV.

And when the pipe grows foul within,
Think on thy soul defiled with sin;
For then the fire
It does require
Thus think, and smoke tobacco.

V.

And seest the ashes cast away,
Then to thyself thou mayest say
That to the dust
Return thou must.
Thus think, and smoke tobacco.

কেহ কেহ বিষবৃক্ষের দেবেন্দ্র দত্তর মত, তামাকও খান মদও খান—যেমন গদাধরচন্দ্র দুধও খাইত, তামাকও খাইত। কিন্তু আমরা এই দুই নৌকায় পা দেওয়ার পক্ষপাতী নহি। কেহ কেহ আবার স্থলপথে জলপথে ও ব্যোমযানে যান। কিন্তু আমরা এরূপ ত্রিপথগামী সর্ব্বদ্বারী স্বভাবের পক্ষপাতী নহি। তামাক যদি নিরীহ ভালমানুষটি না হইয়া একটা কুরুক্ষেত্র বাধাইতে প্রস্তুত হইত, তাহা হইলে নিশ্চয় সে জলদ-গম্ভীর-স্বরে সকলকে বলিত—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োসি মে॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥
মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরং।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥
যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাংধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ॥

ফলতঃ অভ্যাসযোগ ভক্তিযোগ জ্ঞানযোগ ধ্যানযোগ কর্ম্মযোগ রাজগুহ্যযোগ জ্ঞানকর্ম্মন্যাসযোগ সব গোলযোগের এখানে নিবৃত্তি। তামাকুপন্থীরা শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাদিগের সাধনার প্রণালীর শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণ করেন। তদ্‌যথা—

তাম্রকূটং মহদ্দ্রব্যং সেবনে চ মহৎ ফলম্।
অশ্বমেধসমং পুণ্যং টানে টানে ভবিষ্যতি॥

শ্লোকটি কল্কিপুরাণে বা মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রে অনুসন্ধেয়। তাঁহারা আরও দেখান যে কল্কিকা হইতেই কলিকাতা, কল্কী অবতার ও কলিযুগোৎপত্তি। আবার ভাষাতত্ত্ব আনিয়া ফেলিলাম। ও সব বাজে কথা যাক্।

"ধূমপানাসক্ত বৃদ্ধ ধূমপানে রত"
শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত "আলপনা" হইতে

ফলতঃ তামাকু-সেবন আমাদের দেশের ধাতের সঙ্গে এমন মিশিয়াছে, আমাদের অস্থিমজ্জায় এমন প্রবেশ করিয়াছে যে, কেমন যেন মনে হয় উহা আমাদের নিতান্তই আপনার জিনিস। আমরা পাণ তামাক (১২) এক কোঠায় বা এক পর্য্যায়ে ফেলি। বরং অবস্থা-বিশেষে পাণ খাওয়ার নিষেধ আছে, কিন্তু তামাকু-সেবনের কোন অবস্থায়ই নিষেধ নাই। "অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।"

নেশা হইলেও ইহা সাত্ত্বিক নেশা। ভগবান্ বিভূতিবর্ণনায় যেমন বলিয়াছেন 'বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽহম্' তেমনই আরও বলিতে পারিতেন নেশানাং তাম্রকূটোঽহম্! কলিতে মানুষ অন্নগতপ্রাণ নহে, তামাকু-গত-প্রাণ।

সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে গুড়ুক টানা ও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের পক্ষে নস্য লোসা (১৩) নিত্য-কর্ম্মপদ্ধতিরই একটি

(১২) এই জন্যই সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করিবার জন্য পাণের অপর নাম তাম্বূল।

(১৩) নস্য লওয়ার অভ্যাস কেবল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অধ্যাপক-শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল (নস্যপ্রিয়াঃ পণ্ডিতাঃ, এখন ধীরে ধীরে 'সভ্য' সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপ্ত হইতেছে।

অপরিহার্য্য অঙ্গ। অতিথি-অভ্যাগতকে বা চলিত কথায় এস জন ব'স জনকে তামাক দেওয়া গৃহস্থের পঞ্চযজ্ঞেরই অন্তর্ভুক্ত। যেমন অধ্যয়ন-মধ্যাপনং যজনং যাজনং তথা, তেমনই তামাক খাওয়া ও খাওয়ান বর্ণাশ্রমীর অবশ্য-কর্ত্তব্য সদাচার।

অধ্যাত্মতত্ত্বের ন্যায় তামাকুতত্ত্বেও অধিকারি-ভেদ আছে। যেমন উপনয়নাদি সংস্কারের পূর্ব্বে বেদে অধিকার জন্মে না, তেমনই সাবালক না হইলে তামাকু-সেবনেও অধিকার নাই। অনধিকার-চর্চ্চায় স্বাস্থ্যনাশ ও ধর্ম্মনাশ হয়। পক্ষান্তরে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেমন ধর্ম্মে মতি হয়, তেমনই গুড়ুকেও মতি হয়। বৃদ্ধ বয়সে উভয় প্রবৃত্তিরই গাঢ়তা জন্মে। তাই স্থবিরদিগের এক হাতে জপমালা, অন্য হাতে হুকা।

স্ত্রীলোকের তামাকু-সেবনে অধিকার নাই, কিন্তু তামাকু সাজার অধিকার আছে— যেমন স্ত্রীজাতির প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিয়া দেবার্চ্চনে অধিকার নাই, কিন্তু পূজার আয়োজন করার অধিকার আছে। তবে যেমন নারীজাতির বেদে অধিকার নাই বলিয়া তাহাদিগকে পুরাণ-পাঠের অধিকার দেওয়া হইয়াছে, সেইরূপ এক্ষেত্রেও নারীজাতি গুড়ুক খাওয়ার পরিবর্ত্তে তামাক-পোড়া, দোক্তাতামাক, গুল ও মিশি ব্যবহার করিতে পারেন। ব্রহ্মবাদিনীগণের বেদে বিদ্যা ছিল, সেইরূপ মেড়ুয়াবাদিনীগণও গুড়ুক টানে।

লেখক তামাকু সেবনে লোককে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিমার্গ শিখাইতে লেখনী ধারণ করেন নাই। তিনি বিলক্ষণ জানেন, মদ্য-মাংসাদির মত, এই বিষয়েও 'প্রবৃত্তিরেষা ভূতানং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।' অতএব লেখক সমাজে যেমন যেমন দেখিতেছেন, তেমন তেমন লিপিবদ্ধ করিতেছেন। যথাদৃষ্টং তথা লিখিতং লেখকে নাস্তি দোষকম্।

তবে এখনকার যেরূপ দিনকাল পড়িয়াছে, তাহাতে সাধারণকে সাবধান করিয়া দিবার জন্য একটি কথার অবতারণা না করিলে প্রবন্ধের অঙ্গহানি হইবে। আজকাল দেখি-তেছি, হুকা-কলিকার বদলে চুরট সিগরেট বিড়িবার্ডসাইএর বেশী বেশী চল হইতেছে। এমন কি, যাঁহারা কখন হুকায় মুখ দেন না, তাঁহারাও ফ্যাশানের খাতিরে সিগরেট টানিতেছেন, এরূপ দৃশ্যও বিরল নহে। যুক্তিতর্ক, বাদপ্রতিবাদ, তুলনায় সমালোচনা, প্রভৃতিও হইতে দেখি। যথা—

সৌখীন ছোকরা বাবুরা বলেন,—হুকা-কলিকায় ফৈজত ঢের, বড় লেঠা, নানান্ নটখটি, তামাকটিকা চাই, হুকাকলিকা চাই; তামাক হয়ত ভ্যাল্‌সা, টিকা হয়ত ভিজা, হুকার খোল দিয়া হয়ত জল পড়ে, নলচে হয়ত বন্ধ, হুকার জলটা হয়ত ঝাল হইয়া গিয়াছে, কলিকা হয়ত ভাঙ্গা, ঠিকরে হয়ত কোথায় পড়িয়া গিয়াছে—অনেক অসুবিধা পোহাইতে হয়, অনেক সময় অপব্যয় হয়, হাত নোংরা হয়, যা'র তা'র হুকায় খাইতে গা ঘিন ঘিন করে, মশারি বিছানা পোড়ে, দাড়িতে আগুন ধরে ইত্যাদি ইত্যাদি। আর এক প্যাকেট হাওয়াগাড়ি সিগরেট ও এক বাক্স দুয়ানি-মার্কা দিয়াশলাই পকেটে রাখ, বস্, রাজারও রায়ত নও, মহাজনেরও খাতক নও। তোফা আরাম, যত ইচ্ছা

জ্বাল আর খাও (প্রায় ঢাল আর খাও এর ধাক্কা)। এই সম্বল লইয়া চাই কি দক্ষিণ মেরু আবিষ্কারে গেলেও আটক নাই।

পক্ষান্তরে, সিগরেটের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ শুনা যায়। ডাক্তার চুণীবাবু হয়ত বলিবেন, সিগরেটে স্বাস্থ্যের হানিকর অনেক রকম জিনিস থাকে। কিন্তু এ কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাঁহারই মত 'বজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ স্বচ্ছন্দে অকুতোভয়ে সুস্থশরীরে খোসমেজাজে বাহালতবিয়তে সিগরেট টানিতেছেন, তাহাও দেখিতেছি। হুকায় যে ভাবে তামাকু খাওয়া হয়, মাখা তামাকুকে যে ভাবে নরম করিয়া ফেলা হয়, জলের ভিতর দিয়া টানিবার সময় ইহার বিষাক্ত ভাগকে যে ভাবে কাবু করিয়া দেওয়া হয়, তাহাতে ইহার উগ্রতা অনেকটা কমিয়া যায়, সুতরাং মাদকতাশক্তিও অনেকটা নষ্ট হয়, ইত্যাদি যুক্তিও প্রযুক্ত হয়। কিন্তু এ হইল বড় বড় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, আমরা অব্যবসায়ী, এ সব কথা আমাদের মুখে ভাল শুনাইবে না। আমাদের সাবেক গুড়ুক খাওয়া ও হালের সিগরেট টানা—এই দুইটি ব্যাপার দর্শক হিসাবে প্রত্যক্ষ করিয়া, মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছে, তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি। বিজ্ঞানের নজীর তুলিব না, সুনীতির বা সুরুচির দোহাই দিব না। আশা করি, এই মন্তব্য সুধী-সমাজে নিরপেক্ষ ও অপক্ষপাতী বলিয়া বিবেচিত হইবে।

আমার মনে হয়, এই দুইটি সামান্য ব্যাপারের তুলনায় সমালোচনা করিলে ভারতীয় সভ্যতা ও য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রভেদটা বেশ ফুটিয়া উঠে। অন্যান্য আচার অনুষ্ঠানের ন্যায়, এক্ষেত্রেও ভারতীয় সমাজ-তন্ত্রতা ও য়ুরোপীয় ব্যক্তিতন্ত্রতা স্পষ্টীভূত। ক্রমে বুঝাইতেছি।

প্রথমতঃ দেখুন, সিগরেটে সবই তৈয়ারী থাকে, কিছু করাকর্ম্মার দরকার হয় না —ঠিক যেন হোটেলে খাওয়া। অতএব য়ুরোপীয় সমাজের স্পষ্ট ছায়া। তাহার পর সিগরেট একা একা টানিতে হয়, কাহাকেও ভাগ দেওয়া চলে না। নিজের পকেট হইতে সিগরেট-কেস ও দিয়াশালাই এর বাক্স বহির করিলাম, নিজে দিয়াশালাই জ্বালিলাম, নিজে সিগরেট ধরাইলাম (স্বয়ং-সিদ্ধ যাহাকে বলে), তা'র পর নিজে হুস হুস করিয়া টানিলাম, আর নিঃশেষ করিয়া টানিতে টানিতে যখন ঠোঁটে ঈষৎ উত্তাপ অনুভব করিলাম তখন দূরে ছুড়ে ফেলিয়া দিলাম, বস্ আপৎশান্তি। কাহারও তোয়াক্কা নাই, কাহারও খাতির নাই, কাহারও মুখা-পেক্ষা নাই, দশজনকে ভাগ দেওয়া নাই। পার্শ্বস্থ ব্যক্তিবর্গের লাভ—ধূমর যন্ত্রণা, দুর্গন্ধের লাঞ্ছনা ও কচিৎ উড়ো ছাই গায়ে পড়া। (১৪) য়ুরোপীয় সমাজের স্ব স্ব প্রধান ভাবের হুবহু নকল। অবশ্য সিগরেট-কেস হইতে বাহির করিয়া এক একটি সিগরেট পার্শ্বস্থ ভদ্রলোক-দিগকে দিয়াশালাই সমেত offer করা যায় বটে, কিন্তু এক হুকায় বা এক কলিকায় তামাক খাওয়ার মত ইহাতে তেমন হৃদ্যতা

(১৪) কোন কোন স্থলে একটি সিগরেট দুই ইয়ার-কে টানিতে দেখিয়াছি—কিন্তু আশা করি আমার পাঠকবর্গের মধ্যে এমন লোক কেহ নাই।

হয় কি? হুকা বা কলিকা যেমন অসঙ্কোচে গ্রহণ করা যায়, সিগরেট তেমন ভাবে গ্রহণ করিতে যেন কেমন একটা দীনতা-প্রকাশ হয়।

আর তামাকু—এক কলিকা তামাকু অনেকক্ষণ পোড়ে, বহু লোক প্রতিপালন হয়, সিগরেট এক মিনিটে পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়, একজন বই খাইতে পারে না। তামাকু এক কলিকা সাজ, তৈয়ারি তামাকু দশজনকে পরিবেষণ কর, অপরিচিত লোকও চাহিয়া খাইবে, লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ করিবে না, মানের হানি হইবে না। ইতর জাতি হইলে কলিকা খুলিয়া প্রসাদ দাও, জাতিভেদের কঠিন নিয়মও তামাকুর কল্যাণে কথঞ্চিৎ শিথিল হইয়া যায়—যেমন 'কয়লাকো ময়লা ছোটে যব আগ করে পরবশে'। তামাকু সাজিবার সময় কেহ বা হুকার জল ফিরাইল, কেহ বা ছিঁচকে দিল, কেহ বা ঠিকরের চেষ্টায় গেল, কেহ বা টিকে ধরাইল, কেহ বা কড়া ও নরম তামাকু ঠিকমত মিশাইয়া লইল, কেহ বা তামাকু সাজিল, কেহ বা কলিকায় ফুঁ দিল, কেহ বা আমপাতার নল তৈয়ারি করিল, সকলে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতেছে—ঠিক হিন্দু পরিবারের তথা হিন্দু সমাজের প্রতিরূপ। ফল কথা, ইহাতে কেমন সৌহার্দ্দ্য-বৃদ্ধি, কেমন হৃদ্যতা, কেমন অন্তরঙ্গ ভাব, কেমন 'বসুধৈব কুটুম্বকং' বলুন দেখি?

তবে দৈবাং দুই একজন লোক দেখা যায় বটে, তাঁহারা অপরের উচ্ছিষ্ট হুকায়, এমন কি অপরের টানা কলিকায়, খান না—যেমন অনেকে স্বপাক ছাড়া আহার করেন না। সেটা অবশ্য নিষ্ঠার পরা কাষ্ঠা, স্পর্শদোষ-পরিহারের উৎকট চেষ্টা, অথবা বিংশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক ব্যাসিলি-নিবারণের বিধিমত ব্যবস্থা। কিন্তু ইহা নিয়মের ব্যভিচার, অতএব ধর্ত্তব্য নহে। ফরশি গড়গড়া গুড়গুড়ির বেলায় এরূপ বারইয়ারি ভাব থাকে না বটে, ওসব যন্ত্রও নিতান্ত নিজস্ব (বা reserved)—কিন্তু সেটা বড়মানুষি, আমীরি। আমরা সাধারণ গৃহস্থের কথাই বলিতেছি। (১৫)

গুড়ুক-তামাকের এই গুণ থাকাতে কেহ বাড়ী আসিলে আমরা তাহাকে তামাকু সাজিয়া দিয়া অভ্যর্থনা করি। (ইদানীং চা ও সিগরেট offer করিতেও দেখি।) যাঁহারা তামাকুর গুণমুগ্ধ, আশা করি, তাঁহারা পূজার বাজারে স্বদেশীমেলায় এক আধ সের ফৌজদারী বালাখানার মশলাদার মিঠেকড়া তামাকু কিনিয়া পল্লীভবনে ফিরিবেন ও দশজন প্রতিবেশীকে খাওয়াইয়া হিন্দুগৃহস্থের কর্ত্তব্য পালন করিবেন। বলা বাহুল্য, আমার এই অনুরোধ খাঁটি নিঃস্বার্থ পরোপকার—কেননা, 'জনম অবধি হম' 'ও রসবঞ্চিত'।*

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
বঙ্গবাসী কলেজ, কলিকাতা।

(১৫) ইষ্টমন্ত্রজপ ও পাড়ার বারইয়ারি পূজায় যে প্রভেদ, ফরসী গড়গড়া গুড়গুড়িতে ও হুকায় সেই প্রভেদ। ইতি সুধীভির্বিভাব্যম্।

* ওল্ড্ ক্লাবের তৃতীয় সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষে পঠিত (৬ই সেপ্টেম্বর ১৯১৩)।

বন্যাদায়

দামোদরের উদরে আজ এ কী ক্ষুধা সর্ব্বগ্রাসী!
বাঁধ ভেঙে, হায়, হন্যা হয়ে বন্যা এল সর্ব্বনাশী।
রাঙামাটির মুলুকে আর রাঙামাটির নেই নিশানা,
চারিদিকে অকূল পাথার—চারিদিকে জলের হানা।
দেউল গুলোর দুয়োর ভেঙে ঢেউ ঢুকেছে হল্লা ক'রে
পয়সা নিতে পাণ্ডা-পুরুৎ দাঁড়ায় নি কেউ কবাট ধ'রে।
নীচু হওয়ার নানান্ দুঃখ—খুলে কি আর বল্‌ব বেশী
বর্ষা হ'ল কোন্ পাহাড়ে,—ডুবল নাবাল বাংলা দেশই।

* * *

এ দামোদর গোবিন্দ নয়,—গো-ব্রাহ্মণের নয় এ মিতে
হাজার গরু ডুবিয়ে মারে,—ধ্বংস করে হৃষ্ট চিতে!
জগৎ-হিতের ধার ধারে না, অন্ধ অধীর অকূল ধারা,
আপন ধর্ম্মে ধায় সে শুধু ক্রুদ্ধ যমের মহিষ পারা;
এই মহিষের বাঁকা দু'শিং—তা'তে আকাল মড়ক বসে,
চুসিয়ে চলে ডাইনে বামে সোনার দেশের পাঁজর খসে।
এ দামোদর গোবিন্দ নয়—সৃষ্টি যে জন পালন করে;
লম্বোদরী জন্তুলা এ—গজ গিলেছে দম্ভ ভরে।

* * *

মুছে দেছে গ্রামের চিহ্ন চেটে নেছে ভিটের মাটি,
মরণ টানে টান্‌ছে ডুরি,—সাতটা জেলায় কান্নাহাটি।
ধনে প্রাণে ঢের গিয়েছে,—হিসাব তাহার কেউ জানেনা,
ছন্দছাড়া, বন্ধুহারা,—খবর তাদের কেউ আনে না।
আল্‌গা চালার কাছিম-পিঠে যাচ্ছে ভেসে কেউ পাথারে
পুড়ছে রোদে উপবাসী ভিজছে মুষল বৃষ্টি ধারে,
হারিয়েছে কেউ পুত্রকন্যা হারিয়েছে কেউ বৃদ্ধ মায়
আজকে আধা-বাংলা দেশে ঘরে ঘরে বন্যাদায়।

* * *

অন্ধ, বুড়া, পঙ্গু কত পালিয়ে যাবার পায় নি দিশা,
কত শিশুর জীবন-উষায় এসেছে হায় অকাল-নিশা;
কত নারী বিধবা আজ অনাথ কত সদ্য-বধূ,
কত যুবার অস্বাদিত রইল জগৎফুলের মধু।
বর-ক'নেতে ভাস্‌ছে জলে হলুদ্ বরণ সূতা হাতে,
ফুল-শেযে কার কাল এসেছে বান এসেছে বিয়ের রাতে।
জল ঢুকেছে সাত শো গাঁয়ে, হাজার ফোঁকর মৌচাকেতে,
ধুয়ে গেছে মধুর ধারা, সঞ্চিত আর নাইক' খেতে।

বট-পাকুড়ের ফেঁক্‌ড়িগুলো অবশ হাতে পাক্‌ড়ে ধ'রে
কত লোক আজ কষ্টে কাটায় সাপের সঙ্গে বসত ক'রে।
অবাক হ'য়ে রয়েছে সব অসম্ভবের আবির্ভাবে,
সত্য স্বপন গুলিয়ে গেছে,—কেবল আকাশ-পাতাল ভাবে।
'হাল্' পুছিলে,—জবাব দিতে কেঁদে ফেলে শিশুর মত.
হারিয়ে মানুষ হারিয়ে পুঁজি গরীব চাষা বুদ্ধি-হত।
ভিক্ষা এদের ব্যবসা নহে,—হাত পাতিতে লজ্জা পায়,
দৈবে এরা ভিক্ষাজীবি,—আজকে এদের বন্যাদায়।

* * *

বানের জলে দুধের ছেলে তক্তপোষের নৌকা চ'ড়ে
ভেসে ভেসে এক্‌লা এল কোন্ গাঁ হতে জলের তোড়ে।
তুল্‌তে ধরে ঠেক্‌ল ভারি তক্তপোষের একটি পায়া,
আঁক্‌ড়ে পায়া জলের তলে মরা মায়ের অমর মায়া।
লুপ্ত আজি পীযূষ ধারা মৃত্যুহত মায়ের বুকে,
দুধের ছেলের ক্ষুধা পেলে কে দেবে দুধ শুষ্ক মুখে?
এক রাতে কার স্নেহের দুলাল হ'ল পথের কাঙাল হায়,
কে দেবে তায় মায়ের স্নেহ? আজ অভাগার বন্যাদায়।

* * *

বানের মুখে সাঁতার টেনে আতুর স্বামীর প্রাণ বাঁচায়ে,
ডাঙায় তুলে কোলের ছেলে, সাঁৎরে যে ফের ফিরল গাঁয়ে
বাঁধা গরুর খুল্‌তে বাঁধন তুল্‌তে নিজের ক্ষুদ্র পুঁজি;
ফিরতে সে আর পারে নি হায় বন্যাজলের সঙ্গে যুঝি';
নেই বেঁচে সেই চাষার মেয়ে দুঃসাহসী দয়াবতী,
আছে তাহার কোলের ছেলে আছে তাহার আতুর পতি;
তাদের কে আজ পথ্য দেবে আজকে তারা নিঃসহায়,
হাতে হাতে মিলিয়ে নে ভাই, আজ আমাদের বন্যাদায়।

* * *

আসল গেছে ফসল গেছে গেছে দেশের মুখের ভাত,
সামনে 'পূজো',—নূতন ধুতির সঙ্গে ভাসে তাঁতীর তাঁত।
কোথায় গেছে হালের বলদ কোথায় গেছে দুধের গাই,
কার ভিটেতে কে মরেছে,—কিচ্ছুরই খোঁজ খবর নাই।
উদাসী আজ কাজের মানুষ সকল-শূন্য-হওয়ার শোকে,
শুন্‌ছে না সে কিছুই কানে দেখছে না সে কিছুই চোখে;
দেশের যারা পুষ্টি কান্তি সেই চাষীদের পানে চাও,
বন্যাদায়ে নিঃসহায়ে ভিক্ষা দাও গো ভিক্ষা দাও।

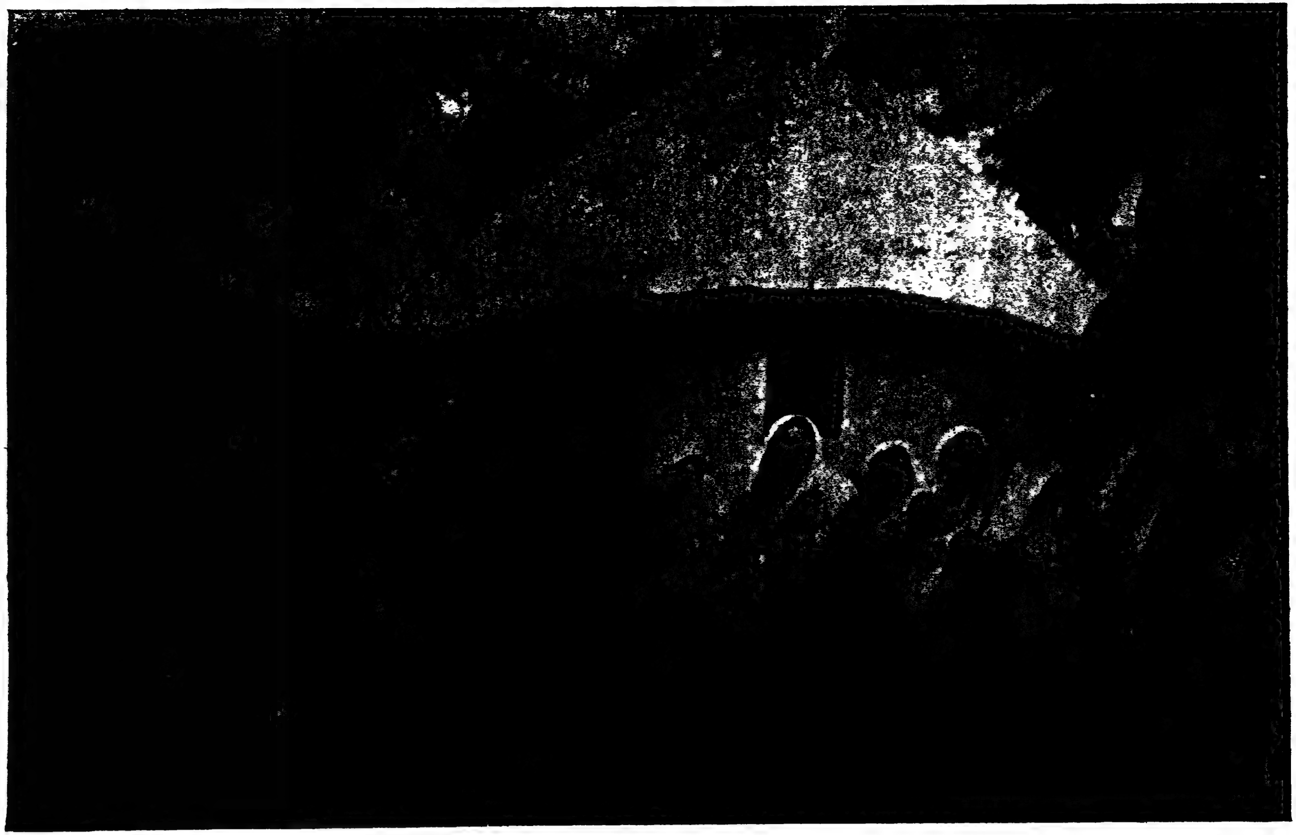

বন্যা-পীড়িত দুঃখী পল্লিবাসীর ভিক্ষা

অনুজ-সমান ছাত্রেরা আজ অগ্রজেরি কার্য্য করে,—
দেশের কাজে অগ্রে চলে,—স্বেচ্ছাসেবার দুঃখ বরে।
আজ্‌কে যেন প্রলয়-বুকে সুপ্ত জ্যোতির্লেখা হাসে
ক্ষুদ্র দানের বটের পাতায় ভাবী দিনের ইষ্ট ভাসে;
দুঃখীরূপে দুঃখহারী আজ আমাদের নেবেন সেবা,
দুন্দুভি তাঁর উঠ্‌ল বেজে, না যাবে আজ এগিয়ে কেবা?
সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা আজ্‌কে শোনো উঠ্‌ছে কেঁদে;—
বধির হ'য়ে থাক্‌বে কে আজ ব্যর্থ জীবন বক্ষে বেঁধে?
এ দায় নহে ব্যক্তিগত,—যেমন ধারা কন্যাদায়,
বাংলা জুড়ে রোল উঠেছে—আজ আমাদের বন্যাদায়।

* * *

আছেন দেশে দুঃখহারী লক্ষদাতা কোটীশ্বর,
তাঁদের পুণ্যে লক্ষপ্রাণী দেখ্‌বে ফিরে সুবৎসর;
কিন্তু তাও যথেষ্ট নয়,—সপ্তকোটির এদেশটিতে।
ভরতে হবে ভিক্ষাপাত্র ক্ষুদ্র দানের সমষ্টিতে।
শাকান্নের যে দু'এক কণা বাঁচে তোমার আমার ঘরে
নিবেদিয়া দাও তা' আজি নারায়ণের তৃপ্তি তরে।
তুষ্টিতে তাঁর জগৎ তুষ্ট দুর্ব্বাসারও ক্ষুধা হরে,
তাঁর নামে দাও মুষ্টি ভিক্ষা জয় হবে দুর্ভিক্ষ'পরে।
গরীব-সেবাই হরির সেবা,—ভারতবাসী ভুলছ তাও?
বন্যাদায়ে নিঃসহায়ে ভিক্ষা দাও গো ভিক্ষা দাও।

* * *

মরুভূমির মানুষ যারা—মরা-জলের দেশে থাকে—
তাদেরও প্রাণ সরস আজি—মরম বোঝে ধরম রাখে;
তারাও আজি মর্ত্ত্যে বসি চিত্ত-আরাম স্বর্গ লভে,
দুঃস্থ-শিরে ভগবানের ছত্র ধরে সগৌরবে।
সার্থকতা দ্বারে তোমার, বন্ধ কর ব্যর্থ কথা,
মরম দিয়া মরম বোঝ ঘুচাও মনের দরিদ্রতা;
ঘুচাও কুণ্ঠা ওগো বন্ধু! শক্তি কারো তুচ্ছ নয়,
হিম হ'তে যে বাষ্প লঘু,—তাতেই বাদল বন্যা হয়।
যুগে যুগে পুণ্যে খোঁজ,—পুণ্য আজি তোমায় চায়,
শূন্য হাতে ফিরিয়ো নাগো; রক্ষা কর বন্যাদায়।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

সাময়িক প্রসঙ্গ

বাংলার জলপ্লাবন

ইংরাজীতে একটা কথা আছে যে "A single touch of nature makes the whole world kin" অর্থাৎ প্রকৃতির একটি সামান্য স্পর্শ সমস্ত পৃথিবীকে আত্মীয়তা বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলে। এ কথার সার্থকতা বাংলার এই জলপ্লাবনে আমরা অনুভব করিতে পারিয়াছি।

এই বন্যাপ্রলয়ে দামোদর ও সুবর্ণ রেখার বাঁধ ভাঙ্গিয়া কত ঘর বাড়ী ভাসিয়া গিয়াছে, কত গ্রাম ভাঙ্গিয়াছে, শত সহস্র লোক আজ অন্নহীন, আচ্ছাদনহীন ও আত্মীয়হীন; সমগ্র বঙ্গদেশ এখন বিষাদের ঘনছায়ায় সমাবৃত। কিন্তু এই বিষাদের মধ্যেই একটা আশার আলো জাগিয়া উঠিয়াছে। সহানুভূতি ও সেবার স্রোত জাতি ধর্ম্ম, পদ ও উপাধির বাঁধ ভাঙ্গিয়া শুধু যে প্রকৃতির জলোচ্ছ্বাসকে রোধ করিতে ছুটিয়াছে তাহা নহে, আমাদের জাতীয় জড়তাকেও শিথিলমূল করিয়া দিয়াছে। অবশ্য চিরদিনই আমাদের দেশের ধনী মহোদয়-গণ অন্নহীনকে অন্নদান নিরাশ্রয়কে আশ্রয়দান করিয়া আসিতেছেন। দয়া সহানুভূতির দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে কখনই বিরল নহে। দেশে যখনই অকাল উপস্থিত হইয়াছে সঙ্গে সঙ্গে উদারহৃদয় বঙ্গজমিদারগণের গৃহে গৃহে বুভুক্ষুদিগের জন্য অন্নসত্রের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। যাহাদের সে সাধ্য নাই, তাহারাও নিজের গ্রাসান্ন হইতে এক মুষ্টি অন্ন দান করিতে কখনও পরাঙ্মুখ নহে। তবে আজ আর এই সহানুভূতি প্রকাশে নূতনত্ব কি? মুমূর্ষকে করাল কালগ্রাস হইতে বাঁচাইবার আকাঙ্ক্ষা লইয়া ছাত্রসমাজ ও অন্যান্য সম্প্রদায় এই বিপদ সময়ে

যেরূপ স্বার্থত্যাগ ও সেবাপরায়ণতার দৃষ্টান্ত দেখাইলেন তাহাই বৈচিত্র্যহীন বাঙ্গালী জীবনে আজ সম্পূর্ণ নূতন।

স্বেচ্ছাসেবক ছাত্রগণকে কত প্রকার বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে তাহার অন্ত নাই; কিন্তু ইহাতেও তাঁহারা বিচলিত হন নাই। তাঁহারা ষ্টেশনে নামিয়া দেখেন, এমন লোক নাই যে আহার্য্য দ্রব্যগুলি বহন করিয়া গ্রামের

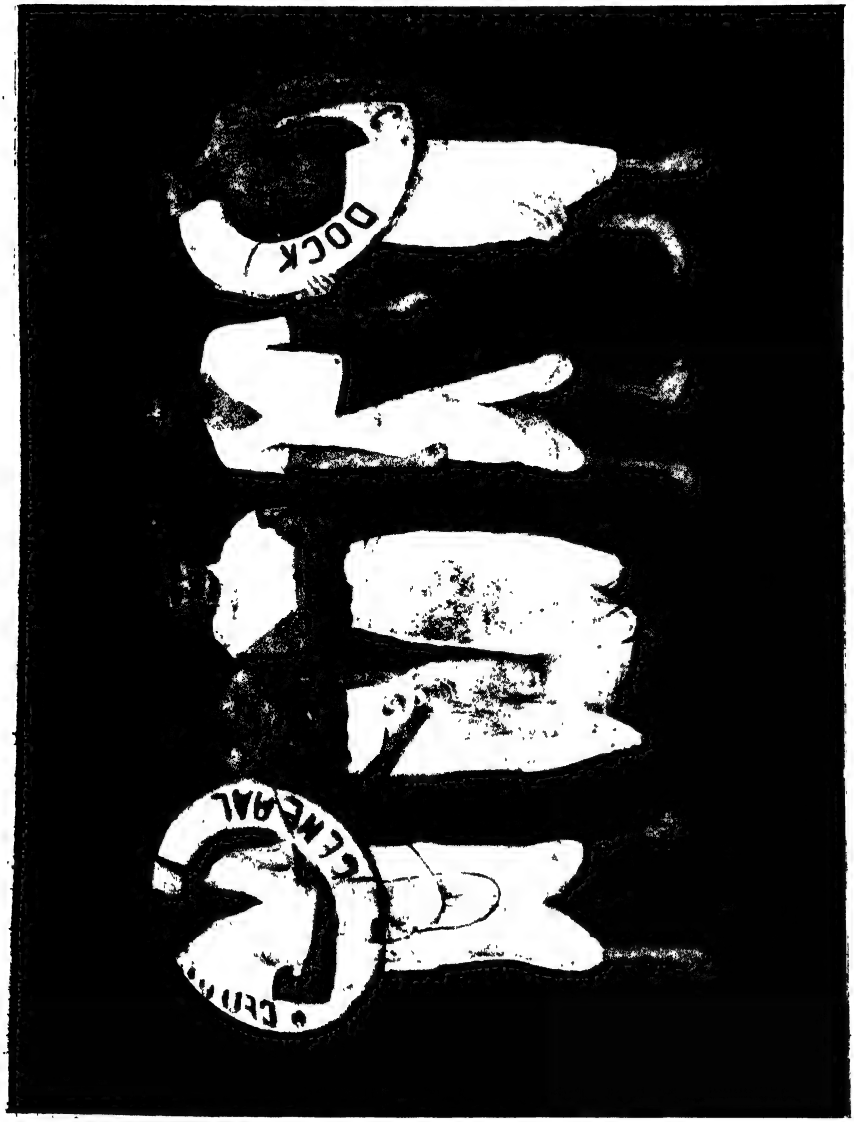

সিটি কলেজের ছাত্রকর্তৃক বিপন্নগণের উদ্ধার চেষ্টা

মধ্যে লইয়া যায়। তাহাদের অপেক্ষায় বসিয়া না থাকিয়া নিজেরাই আহার্য্য দ্রব্যের বস্তাগুলি মাথায় করিয়া বহন করিয়াছেন। একগ্রাম হইতে অন্য গ্রামে যাইতে হইবে কিন্তু চারিদিকে জলস্রোত, —নিকটে কোন নৌকা নাই, শেষে সাঁতার দিয়া গ্রামে উপস্থিত হইতে হইল। গ্রামে গিয়া মরণোন্মুখ ব্যক্তিকে অন্ন বস্ত্র দান করিতে হইয়াছে। এমনও পর্য্যন্ত শুনিয়াছি যে বস্ত্র দান করিতে করিতে যখন সমস্ত

কাপড় ফুরাইয়া গিয়াছে এমন সময় একটি বস্ত্রহীন লোক আসিয়া উপস্থিত হইলে একজন ছাত্র আপনার বস্ত্রার্দ্ধ তাহাকে দান করিয়াছিলেন। জলপ্লাবনের চারিদিকে অনেক গৃহপালিত পশু মরিয়া ছিল, সেগুলি পচিয়া চারিদিকে রোগের উৎপত্তি হইবে বলিয়া ছাত্রেরা নিজের হাতে সেগুলি পুঁতিয়া ফেলেন।

কেবল ছাত্রগণ নহেন, দেশের অনেক উকীল ব্যারিষ্টারও নিজেদের দৈনিক কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ও সংসারের ভার উপেক্ষা করিয়া উৎসাহের সহিত এই সেবাব্রতে যোগদান করিয়াছেন। তাঁহাদের এই সেবাব্রত কেবলমাত্র নিজেদের উপার্জ্জিত অর্থ প্রদানেই পর্য্যবসিত হয় নাই; তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ছাত্রদের মতই সঙ্কটকে উপেক্ষা করিয়া দুঃখী ও আর্ত্তকে নিজ হস্তে সাহায্য দান করিয়াছেন।

কেবল ছাত্র বা উকীল ব্যারিষ্টার নহেন, রামকৃষ্ণ মিশন, মাড়োয়ারী সম্প্রদায় প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়, এই দুর্দ্দিনে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন।

কেবল দেশের পুরুষমণ্ডলী নহে—এই সেবা কার্য্যে অংশ লইবার জন্য নারীসমাজও উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। স্বদেশের এই দুর্দ্দশার প্রতি উদাসীন থাকিয়া কেবল আপনার গৃহ ও আপনার সুখ লইয়া তাঁহারা তৃপ্ত নহেন। তাই তাঁহারাও এই সৎকার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন। সেদিন কলিকাতার একটী মহিলাসভায় তাঁহারা অনেক টাকা তুলিয়া এই সৎকার্য্যে দান করিয়াছেন। এমন কি, সেদিন ইণ্ডিয়ান মিররে পড়িলাম একজন সম্ভ্রান্ত হিন্দু নারী শ্রীমতী কামিনীমণি দাসী স্বয়ং বন্যাপীড়িত স্থানে গমন করিয়া দুঃখী ও আর্ত্তকে সেবা এবং অর্থ ও আহার্য্য দান করিয়াছেন।

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার।

এইখানে একটি কথা। আমরা বন্যাপীড়িতের জন্য যতটা করিয়াছি তাহাই যথেষ্ট নহে; ইহাতে আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না। এরূপ স্থলে ইয়োরোপ কি করিত তাহা ভাবিয়া দেখিলে দেখিতে পাইব, তাহার তুলনায় আমরা অনেক পশ্চাতে আছি। এখনও গৃহহীনদিগের গৃহ হইয়া উঠে নাই, এখনও এমন দান সংগ্রহ হয় নাই যাহাতে হৃতসর্ব্বস্বদিগের কিছুদিনের গ্রাসাচ্ছাদন চলিতে পারে। আশা করি, সকলে তৎপর হইয়া ইহার দিকে মনোযোগ প্রদান করিবেন।

ভাঃ সং

কুচবিহার-গাইকোয়াড় বিবাহ

গত ২৫শে আগষ্ট তারিখে কুচবিহারাধিপতির ভ্রাতা রাজকুমার জিতেন্দ্রনারায়ণের সহিত গাইকোয়াড়ের কন্যা রাজকুমারী ইন্দিরার শুভ বিবাহ ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান যুগের বিশেষত্ব এই যে কোথাও কোনও সংকীর্ণ গণ্ডীর ভিতরে সমাজ তিষ্ঠিতে পারিবে না। আজ একের সঙ্গে বহুর যোগ এত বিচিত্র আকার ধারণ করিয়াছে যে, এককে কোন-মতেই ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ হইতে দিতেছে না। ভারতবর্ষে সমাজকে দীর্ঘকাল সংকীর্ণ গণ্ডীতে থাকিতে হইয়াছে বলিয়া সমাজে নানা বিকৃতির সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব ভারতবর্ষে এক সম্প্রদায়ের সহিত অপর সম্প্রদায়ের, এক প্রদেশের সহিত অপর প্রদেশের, এক জাতির সহিত অপর জাতির ঘনিষ্ঠতাসূচক যে কোনও অনুষ্ঠানকেই শুভানুষ্ঠান বলিতে হইবে। সুদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষও যে একদিন সমস্ত অস্বাভাবিক ব্যবধানকে অতিক্রম করিয়া মহামিলনের দিকে যাত্রা করিবে, গাইকোয়াড়ের ন্যায় উদারচেতা, তেজস্বী নৃপতির কন্যার সহিত সমাজ-সংস্কারক ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের দৌহিত্রের বিবাহ তাহারই ইঙ্গিতমাত্র। বিধাতা ইঁহাদের মিলন সার্থক করুন।

রাজকুমারী ইন্দিরা বোম্বাই বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং বিলাতী সভ্যতার মধ্যে মানুষ হইয়াও ভারতীয় নারীর আদর্শ ভুলিয়া যান নাই। নিউ ইয়র্কের কোন ধনীর গৃহে একবার তাঁহাকে নৃত্যোৎসবে যোগদান করিতে নিমন্ত্রণ করা হয়। কিন্তু ইহা ভারতীয় রমণীর আদর্শ নহে বলিয়া রাজকুমারী সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই।

ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষের দান

আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য মাননীয় ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে দশ-লক্ষ মুদ্রা দান করিয়াছেন, শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই এই শুভ সংবাদে আনন্দিত হইবেন, কেননা স্যর তারকনাথ পালিত ও ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষের এই দান ও দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষের শিক্ষা-ইতিহাসে এক নবযুগ আনিয়া দিল। বর্ত্তমান যুগে সভ্য-জগতের সর্ব্বত্রই শিক্ষা বিস্তারের জন্য এক সজাগ চেষ্টা দেখা যাইতেছে; প্রত্যেক জাতিই ইহা অনুভব করিতেছেন যে, খাঁটি শিক্ষার উপর জাতীয় জীবনের ভিত্তি স্থাপন না করিলে জাতীয় জীবন গঠন সম্ভব হইবে না। এই জন্যেই চীন, জাপান, রুষিয়া, ফিলিপাইন দ্বীপ ও উত্তর আমেরিকা হইতে শত শত যুবক মাতৃভূমির শিক্ষাদৈন্য ঘুচাইবার অভিপ্রায়ে য়ুরোপ ও আমেরিকার এক এক শিক্ষা-কেন্দ্রে সম্মিলিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের মন্দিরে বীণাপাণির সম্মুখে কত পুরোহিত সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া দেবীর সেবক পদে অভিষিক্ত হইতেছেন। এইরূপে

রাজকুমারী ইন্দিরা

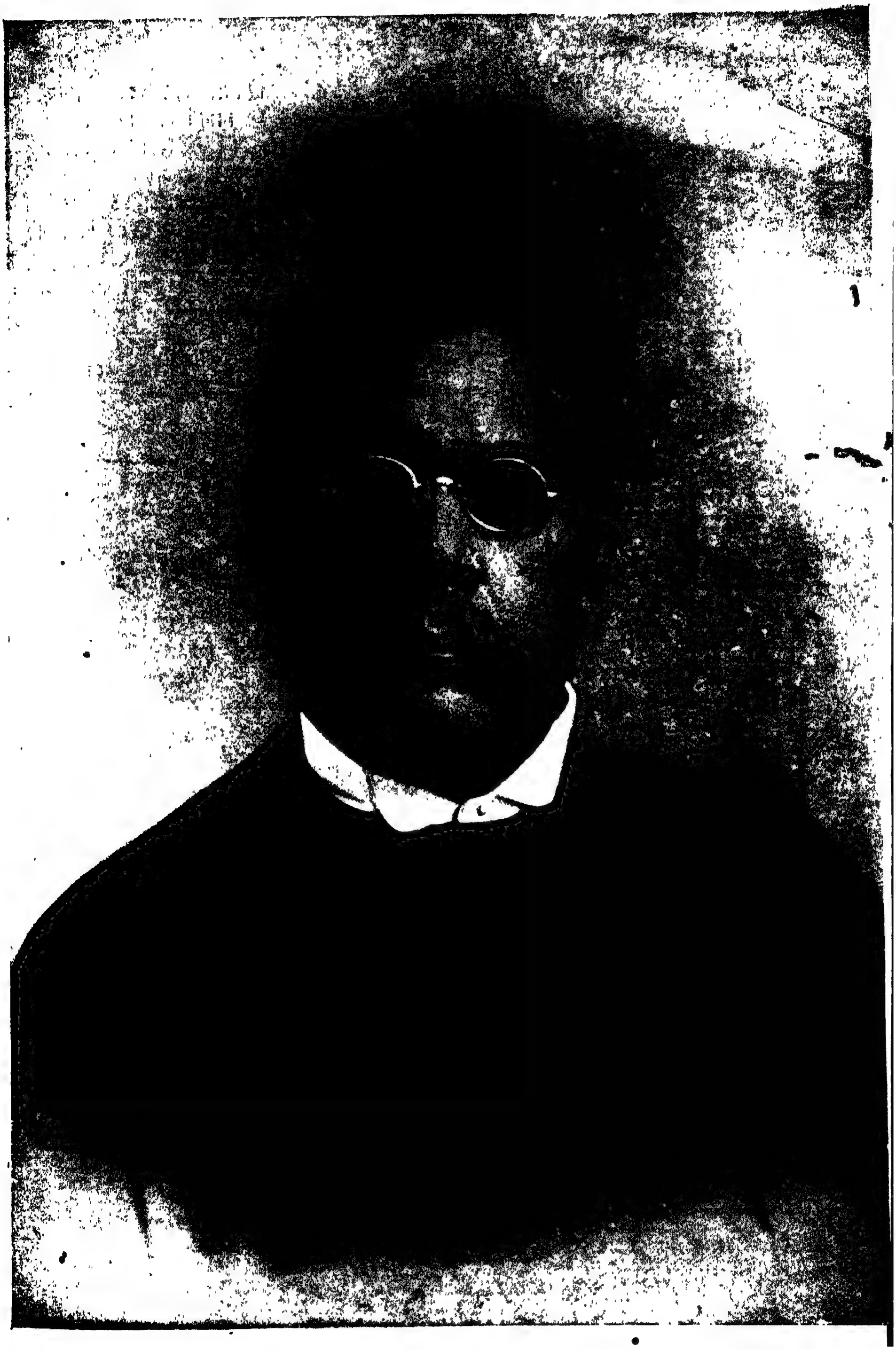

ডাক্তার রাসবিহারি ঘোষ সি. এস. আই

পৃথিবীর চারিদিক হইতে যখন সরস্বতীর বন্দনা আরম্ভ হইয়াছে, এমন সময়ে বাংলাদেশের দুই মহাপুরুষ বিপুল ধনরাশি-অর্ঘ্য লইয়া দেবীর মন্দির উপস্থিত হইলেন, ইহা কি বঙ্গদেশের পক্ষে কম গৌরবের বিষয়? মহামান্য স্যর তারকনাথ পালিত মহাশয়ের মহৎ দৃষ্টান্ত কি বঙ্গদেশ কখনও ভুলিতে পারিবে? বিশ্ববিদ্যালয় ইঁহার দান পাইয়া বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সুব্যবস্থা করিবার আয়োজন করিতেছেন, এমন সময়ে যাহাতে এই বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপদ্ধতি সম্পূর্ণ হয়, উদ্ভিদবিদ্যা, ব্যবহারিক রসায়ন প্রভৃতি শিক্ষা দ্বারা যাহাতে দেশে শিল্প বাণিজ্য কৃষি, উৎকর্ষ লাভ করে, এই জন্য মহাপ্রাণ ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় বিপুল ঐশ্বর্য্য দান করিলেন। বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানের কোনও আয়োজন ইতিপূর্ব্বে ছিল না; ডাক্তার ঘোষ তাঁহার দানপত্রে বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানের বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন। স্বদেশভক্ত ঘোষ মহাশয় নিশ্চয় অনুভব করিয়াছেন যে, আমাদের দেশের যুবকগণের শিক্ষা ইহাদিগকে অনুসন্ধান-প্রবৃত্ত করে না। তাই তাহাদের শিক্ষা নিতান্তই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাপুরোহিত। ইঁহার প্রতিভা একদিন বিদ্যালয়-মন্দিরকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছিল। তারপর সেই মন্দির হইতে আশী লইয়া তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া সেখানেও তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা অস বাগ্মিতার প্রভাবে নিষ্কলঙ্ক যশ অর্জ্জন করিয়াছেন। আজ স্বোপার্জ্জিত বিপুল অর্থ-রাশির একখানি অর্ঘ্য লইয়া তিনি তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ের মন্দিরে উপস্থিত হইলেন,—মন্দির অভ্যন্তরস্থ দেবী তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন—

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থাঃ"।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি।

শোক সংবাদ

আমরা যখন কুচবিহারের রাজকুমার জিতেন্দ্রনারায়ণের শুভবিবাহ সংবাদে আনন্দে মগ্ন আছি,—তখন সহসা যেন বজ্রাঘাতে সচেতন হইয়া শুনিলাম, কুচবেহারের মহারাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ ভূপ ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। কি নিদারুণ সংবাদ!

অল্পদিন হইল ভগ্নস্বাস্থ্য পুনর্লাভের জন্য মহারাজ ইংলণ্ড যাত্রা করেন। সকলেরই আশা ছিল সুস্থশরীরে তিনি পুনরায় দেশে ফিরিবেন। কিন্তু সে আশা নির্ম্মূল করিয়া আত্মীয়স্বজন প্রজাবৃন্দ স্বদেশী বিদেশী সকলকেই মর্ম্মাঘাত প্রদানে তিনি অকালমৃত্যুর ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

হায়! কেবলমাত্র সেদিন যে তাঁহার রাজ্যাভিষেক সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তিনি যে সৌজন্য ও সরলতার আদর্শস্বরূপ ছিলেন। তিনি সৎকার্য্যের উৎসাহদাতা ও দীনের সহায় হইয়া স্বনাম ও পিতৃনাম সার্থক করিবেন এইরূপ কত না আশা আকাঙ্ক্ষায় দেশবাসীর হৃদয় যে আনন্দোৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। হায়! নিষ্ঠুর কাল আসিয়া সকল আশা, সকল আনন্দ অকালে হরণ করিল।

মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপের মৃত্যুতে লক্ষ্মীস্বরূপিণী মহারাণী সুনীতিদেবীর জীবন একান্ত শূন্য হইয়া গিয়াছে—তাহার উপর প্রিয় পুত্রের এই বিচ্ছেদ! কিরূপে তিনি এ শোক যন্ত্রণা সহ্য করিবেন—ভাবিতেও হৃদয়প্রাণ শিহরিয়া উঠে।

কিন্তু যে মহাপুরুষ মানুষের জীবনমৃত্যু লইয়া খেলা করেন—তাঁহার করুণাও অনন্ত। মহারাণী ভক্তের কন্যা, নিজেও ভক্ত, ভক্তবৎসল ভগবান স্বয়ং তাঁহার করুণাবারি সিঞ্চনে ভক্তের অশ্রুজল মোচন করিবেন—অমঙ্গলের মধ্যে যে পূর্ণ মঙ্গল নিহিত আছে—সেই জ্ঞানে প্রবুদ্ধ করিয়া তাঁহার শোক প্রশমিত করিবেন—ইহাই আমাদের আশা বিশ্বাস ও প্রার্থনা।

ভ্রম সংশোধন

এ সংখ্যার ৬৪৯ পৃষ্ঠার পঞ্চদশ পংক্তিতে ও ৬৫০ পৃষ্ঠার চতুর্দ্দশ পংক্তিতে "অন্নছত্র" স্থানে "অন্নসত্র" হইবে।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ১, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।